আর্থিক উন্নতি

বৈশাখ—১৩৫৬ ৪র্থ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—অস্ত্র আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

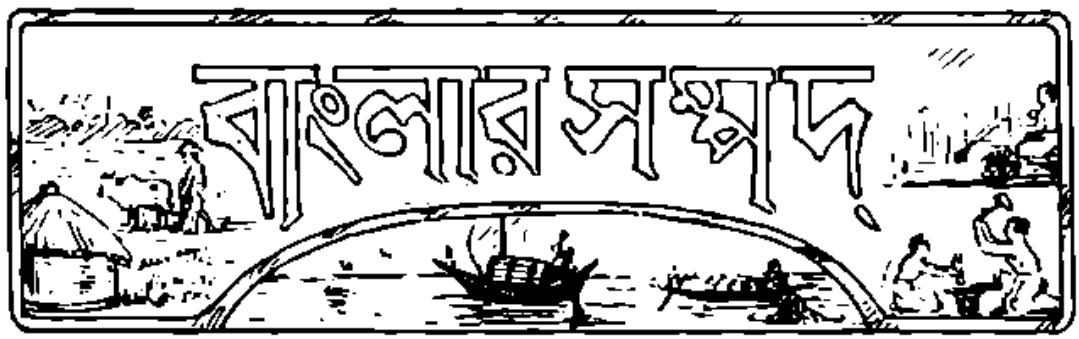

পূর্ব্ব বাংলার ঘন বসতি

পূর্ব্ব বাংলা খুব বেশী ঘন বসতিসম্পন্ন ও বেশী উর্ব্বর। এখানে খুব বেশী বৃষ্টিপাত হয় এবং দুনিয়ার প্রায় অঞ্চলের মধ্যে সব চাইতে বেশী বসতি পূর্ব্ব বাংলায় দেখা যায়। পূর্ব্ব বাংলার নিম্নলিখিত থানাগুলি দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘন বসতির পরিচয় দেয়। এই অঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে সাড়ে তের শত লোক বাস করে; ইহা পশ্চিম ইয়োরোপের পল্লী জন-সংখ্যার প্রায় চারি গুণ।

ঢাকা জিলা

থানা	প্রতি বর্গ মাইলে বসতি
কেরাণীগঞ্জ	১,৮৪১
দোহার	১,৯০০
নারায়ণগঞ্জ	১,৪৭৪
সোনাকান্দা	২,৮৭০
কতুল্লা	১,৫৮৬
বৈদ্যবাজার	১,৪৭৪
নরসিংদি	১,৩০৭
মুন্সিগঞ্জ	২,৩৪৭
রাজাবাড়ী	১,৮১৯
টাঙ্গিবাড়ী	২,৬৮১
শ্রীনগর	১,৭৫৫
সিরাজদীখা	১,৯৩৮
লৌহজং	২,৭০৩

ফরিদপুর জিলা

ভাঙ্গা	
মাদারীপুর	
পালং	
সোনসিং	
শিবচর	

বাখরগঞ্জ জিলা

থানা	প্রতি বর্গ মাইলে বসতি
কালকাঠি	১,৪১০
বানারিপাড়া	১,৪৫৯

ত্রিপুরা জিলা

দত্তকান্দি	
বোমনা	
বাহাদুরপুর	

নোয়াখালী জিলা

বেগমগঞ্জ	১,৩০৬
রামগঞ্জ	১,৩৭০

চীন দুনিয়ার মধ্যে খুব ঘন বসতিসম্পন্ন। কিন্তু ঐ দেশের একটি সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইয়াংসি নদী ও ক্যান্টন ডেল্টার জন-সংখ্যা প্রতিবর্গ মাইলে গড়ে এক হাজারের বেশী নয়। সেইরূপ চেঙ্কু নামক উপত্যকার লোকসংখ্যা প্রতি মাইলে ১৭,০০ এর বেশী নয়। আবার চীন ও পূর্ব্ব বাংলার মধ্যে তফাৎ দেখুন। চীনে ঐরূপ বসতির জন্য এখন হইতেই অনেক চীনা কিষাণকে কাজের অভাবে বেকার বসিয়া থাকিতে হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব বাংলায় ইহার চাইতে বেশী ঘন বসতি হইলেও এখানে কাজের অভাব হইয়া পড়ে নাই, বরং আরও লোকের অভাব আছে।

পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্ত্তী স্থানগুলির পশু উৎপাদনের হার হইতে পূর্ব্ব বাংলার ঘন বসতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মোট চাষের জমির শতকরা হার

ঢাকা জিলা

	থানা	আউশ	আমন	দুই ফসল	লোকসংখ্যা
পুরাতন পলিমাটি	শিবালু	২৪·২	৬৩·০	৫৪	৭৪০
	হরিরামপুর	১২·১	৭৪·৩	৪৯	১,০৫০
	শাবার	১৪·৬	৪৫·৯	৩৩	৬৮৬
	কাপাসিয়া	২২·৩	৪১·৪	১৯	৬৩১
নূতন পলিমাটি	মুন্সিগঞ্জ	৬·৮	৩৪·০	৩২	২,৩৪১
	শ্রীনগর	১৬·৭	৩৯·২	৩১	১,১৫৫

ফরিদপুর

		আউশ	আমন	পাট	দুই ফসল
পুরাতন পলি	পাংশা	৪০	৪৭	১২	২৮
	ভুষণা	৩৯	৭৫	১৫	৩৯
নূতন পলি	মাদারীপুর	৬	৮০	১৬	৩০
	পালং		৮০	১৭	৩৩

বাখরগঞ্জ

পুরাতন পলি	গৌরনদী		৮২·৪		১,২৭১
	কালকাঠি		৬৮·৩		১,৪১০
নূতন পলি	তোলা		৮৩·৭		৭৩৩
	পটুয়াখালি		৮৯·৫	—	৮০১

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, আমন ধান যেখানে বেশী জন্মে, লোক-সংখ্যাও সেখানে বেশী। যে সমস্ত অঞ্চল নদী-জলে বিধৌত হইয়া যায়, সেই সকল স্থানেই আমন ধান বেশী হয়। বাখরগঞ্জ জিলায় আমনই প্রধান ফসল। আবার নারিকেল ও সুপারি গাছ যে দেশে বেশী, লোক-সংখ্যাও সাধারণতঃ সেখানে বেশী দেখা যায়। বাখরগঞ্জ জিলায় বালকাঠির প্রতি একর জমিতে ৩৯টা, পিরোজপুরের ৩৮টা ও মেহেন্দিগঞ্জের ৩০টা করিয়া নারিকেল গাছ আছে।

ত্রিপুরা জিলার যেখনার ভূলবরিয়া, নবিনগর, মতলব বাজার, দাউদকান্দি, চাঁদপুর প্রভৃতি থানায় লোক-সংখ্যা সব চাইতে বেশী। ঐ সকল অঞ্চলের জমি খুব উর্ব্বরা।

নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জিলায় ঘন বসতি নাই। নদীয়ার গড়ে প্রতি একর জমিতে প্রায় নয় মণ আমন ও ১০ মণ আউশ ধান হয়।

যশোহরে ১১ মণ আমন ও ৯ মণ আউশ ধান হয় এবং ২৪ পরগণায় ৯ মণ আমন ও ১০॥ মণ আউশ ধান হয়। পশ্চিম বঙ্গের জমি পূর্ব্ব বঙ্গের মত উর্ব্বরা নয়।

সমবায়ের সার্কুলার

(১)

বঙ্গদেশের অনেক কেন্দ্রীয় সমিতি ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব খুলিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখা নাই। সেজন্য কেন্দ্রীয় সমিতি ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের মধ্যে টাকা আদান-প্রদানে কেন্দ্রীয় সমিতিকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহা ভারত সরকারকে জানান হইয়াছিল। সেই অসুবিধা অপনয়নের জন্য ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা নেবার সময় ও ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইবার সময় যে বিনা খরচে আদান-প্রদান স্বীকারপত্র দ্বারা আদান প্রদানের সুবিধা আছে, তাহা ভারতসরকার কেন্দ্রীয় সমিতিকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন (১৯২৮ সালের ৯নং সাধারণ সার্কুলার)।

(২)

অতীব ঘনিষ্ঠসন্নিষ্ট গ্রাম্য সমিতিসমূহের উপরিস্থিতে এক নূতন বিধান করা হইয়াছে। এই বিধান অনুসারে গ্রাম্য সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ হয় তাহার কোন কোন বিবাদ বিসম্বাদ সমিতির সভ্যগণের দ্বারাই সালিশি বিচারে মীমাংসা করাইবার জন্য সভ্যগণকে বাধ্য করা হইয়াছে। যে সকল সভ্য সমিতির সালিশী বিচারে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদের নিকট হইতে সমিতির টাকা অবিলম্বে ফেরৎ লইবার ও তাহাকে সমিতি হইতে বিতাড়িত করিবার ক্ষমতা সমিতিকে যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে। (১৯২৮ সালের ১১নং সাধারণ সার্কুলার)।

(৩)

গ্রাম্য সমিতিসমূহ হইতে কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হয়। যাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতি হইতে সাধারণ ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হয়, এই মর্ম্মে কেন্দ্রীয় সমিতিকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যদি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমিতিসমূহ সাধারণ সভা নির্ব্বাচন করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, গ্রাম্য সমিতিসমূহ এখনও সমবায়-প্রণালী সম্যকরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাহা হইলে যাহাতে এইরূপ নির্ব্বাচন ভবিষ্যতে আর না হয়, সেজন্য সমবায় বিভাগকে বাধ্য হইয়া কোনও পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। (১৯২৮ সালের ১২নং সাধারণ সার্কুলার)।

(ভাণ্ডার)

গোপালপুর টী কোম্পানী লিমিটেড্

গত ৭ই এপ্রিল সকালে সভায় শতকরা ১১২৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি অংশে ২৮৲ টাকা হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হয় এবং তৎপর গত ১০ই এপ্রিল হইতে লভ্যাংশ বিলি হইতেছে।

ম্যানেজার ৫০০০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ (সদর ও বাগান) তিন মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন।

(মিত্রবার্তা)

বাংলায় অস্বাভাবিক মৃত্যু

বৎসর	পুরুষ	নারী	শিশু	মোট
		আত্মহত্যা		
১৯২৬	১২৪১	১৯২৬	৫৫	৩২২২
১৯২৭	১২৯৯	১৯৩৩	৩৪	৩২৫৭
		জলে ডুবা		
		১০৩৯	৬৮৫	
		৮৭২	৬৪৩৭	
		সর্পাঘাত		
	১৫১৭	১৮৭১	১০১১	৪৩৯৯
	১৩৮৪	১৫৩১	৮১৪	৩৭০৯
		বন্য পশু ও মত্ত পশু দ্বারা		
	৮২	৪৫	১১১	২৩৮
	৪৮	১৩	৮৬	১৪৭
		অট্টালিকা হইতে পতন		
	১৩৫	৩৭	৪৩	
	১৩৩	৫৬	৫১	
		অন্যান্য কারণে		
		৫১১	৫৮৯	২২৪৮
		৫০৯	৫৩৩	২১২৩
		সর্ব্বপ্রকারে মোট		
	৫২৮১	৫৪২৯	৮৬৫৪	
	৪৮৮৩	৪৯১৪	৭৯৫৫	

কলিকাতার পথে কি কি যান চলে ?

কলিকাতার পথে বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত যানগুলি চলিয়া থাকে :—

(১) ট্রাম (২) ট্যাক্সি (৩) ব্যক্তিগত মোটর গাড়ী (৪) বাস্ (৫) মালটানা লরি (৬) কোম্পানী, আফিস বা স্কুল কলেজের মোটরগাড়ী (৭) মোটর সাইকেল (৮) সাইকেল (৯) বিভিন্ন প্রকারের ঘোড়ার গাড়ী (১০) গরু বা মহিষের গাড়ী (১১) মাল বহিবার জন্য মানুষে টানা গাড়ী (১২) রিক্সা (১৩) ঘোড়া।

কলিকাতার কোন্ কোন্ পথে কি কি যানের যাতায়াত বৈধনিক করিবার হইয়াছে তাহা বলিবার যো নাই, কারণ সেই উদ্দেশ্যে কোনো তালিকা সংগৃহীত হয় নাই।

এক বৎসরে দুর্ঘটনায় কত মরিয়াছে ?

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার পথে দুর্ঘটনায় কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

	ট্রামের দরুণ	ট্যাক্সির দরুণ	অন্যান্য মোটরের দরুণ	বাসের দরুণ	মোট মৃত্যুর সংখ্যা
জানুয়ারী		—	৪		৭
ফেব্রুয়ারী	—		১		৪
মার্চ্চ	৪		৪		১২
এপ্রিল	৩		৪		১২
মে	—		৪		৬
জুন		—	৩	—	৫
জুলাই	—	১	৪	—	৫
আগষ্ট	—	—	৫	১	৬
সেপ্টেম্বর		১	৫	১	৮
অক্টোবর		১	৮	৩	
নভেম্বর		২	৫	২	
ডিসেম্বর		৩		২	১৭
মোট সংখ্যা	১৭	১৬	৫৭	১৭	১০৭

আহতের সংখ্যা

এই বৎসরেই পথের দুর্ঘটনায় আহতের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	ট্রামের দরুণ	ট্যাক্সির দরুণ	অন্যান্য মোটরের দরুণ	বাসের দরুণ	মোট মৃত্যুর সংখ্যা
জানুয়ারী			১০৬	১৩	১৭৬
ফেব্রুয়ারী			১১৬	৩০	২৩৮
মার্চ্চ			৯১	২০	২০২

	ট্রামের দরুণ	ট্যাক্সির দরুণ	অন্যান্য মোটরের দরুণ	বাসের দরুণ	মোট মৃত্যুর সংখ্যা
এপ্রিল	১৪	৬৪	৮৬	১৪	১৭৮
মে	১৫	৬১	৬২	২৪	১৬২
জুন	১২	৬৩	৯৪	১৪	১৯৩
জুলাই	১৭	৭৩	৮৪	১৫	১৮৯
আগষ্ট	১৯	৫১	৯১	২৫	১৮৬
সেপ্টেম্বর	১৫	৭১	৯৬	২১	২০৩
অক্টোবর	২১	৭৬	১০৩	১৩	২১৩
নভেম্বর	২১	৬৪	১০৩	৩১	২১৭
ডিসেম্বর	১৬	৬৪	৮৭	৩৩	২০০
মোট সংখ্যা	২১৪	৭৬৩	১,১১৭	২৬৩	২,৩৫৭

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পথের দুর্ঘটনার দরুণ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৩৫ এবং আহত হইয়াছিল ১৮২০ জন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছে ১০৭ জনের এবং আহত হইয়াছে ২,০৫৭ জন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু আহতের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ট্রাম, ট্যাক্সি ও বাস্ এই তিনে মিলিয়া (১৭+১৬+১৭)=৫০ জন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং অন্যান্য সকল প্রকার মোটর যান ৫৭ জনের মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

ট্রাম, ট্যাক্সি ও বাসের দরুণ আহতের সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

	আহতের সংখ্যা		
	ট্রামের দরুণ	ট্যাক্সির দরুণ	বাসের দরুণ
	১৯২	৬৩৫	২২২
	২১৪	৭৬৩	২৬৩

দুর্ঘটনার কারণ কি ?

এই সকল দুর্ঘটনা কেন হয় ? কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বহুরকম দুর্ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া যাহা মনে হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম :—

(১) ভিড়ের তুলনায় কোনো কোনো পথের প্রশস্ততা অত্যন্ত কম—সকল রকম যান ও লোকের চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট স্থানের অভাব।

(২) সড়কের মধ্য দিয়া ট্রাম যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে।

(৩) অনেক চৌমাথায় বা পথের মোড়ে যান চলাচল সংযত করিবার জন্য পুলিশ থাকে না।

(৪) যে সব চৌমাথায় পুলিস থাকে তাহাদের সংখ্যাও প্রয়োজনের চেয়ে কম। অনেক চৌমাথায় দেখিতে পাওয়া যায় একজন মাত্র পুলিসের লোক চারিদিকের যান চলাচলের উপরে দৃষ্টি রাখিয়া উহাদিগকে সংযত করিতে বাধ্য হয়। ফলে চটপট্ কাজ হয় না, এবং মোড় ফিরিবার ও সোজা চলিবার গাড়ীতে সংঘর্ষ হয়। দুই এক চৌমাথায় বা তেমাথায় একজন পুলিসের সঙ্গে একজন সার্জ্জেণ্টকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু সে যান চলাচল সংযত করে না, সর্দ্দারি করে মাত্র।

(৫) দেখা গিয়াছে, অনেক চৌমাথায় যখন উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে যাতায়াত বন্ধ তখন একই সঙ্গে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে উত্তর ও দক্ষিণে এবং উত্তর ও দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে মোড় ফিরিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে।

(৬) যার যার বাঁয়ে চলিবার আদেশটা সকল চালক মানিয়া চলে না। আগে যাইবার জন্য অনেক চালক অনেক সময় ডান দিক্ দিয়া চলিয়া যায়। ফলে সম্মুখ হইতে যেসব গাড়ী আসে তাহার সহিত সংঘর্ষ হয়।

(৭) সকল প্রকার চালকের—বিশেষ করিয়া গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগণের—বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালাইবার অভ্যাস।

(৮) বাস্ চালকদিগের পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া আগে যাইবার চেষ্টায় অত্যন্ত দ্রুত গাড়ী চালানো। বাস্ চালকদিগের ভাষায় ইহাকে 'রেস' দেওয়া বলে। ইহার ফলে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে গাড়ী চালাইতেও দেখিয়াছি।

(৯) অনেক মোটরগাড়ী ও বাসের ব্রেক ভাল নয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

পাট চাষ হ্রাসের আন্দোলন

রঙ্গপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সভায় পাট চাষ হ্রাস সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রতি দেশবাসী সর্ব্বসাধারণ—বিশেষভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা অবশ্য প্রধানতঃ দেশের কৃষকগণের উপরই নির্ভর করে, তথাপি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যও এই উপলক্ষ্যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অকাতরে রৌদ্র-বৃষ্টি সহ করিয়া কৃষক যে ফসল উৎপন্ন করে, তাহাই সমস্ত সমাজের পেটের ক্ষুধা মিটাইয়া থাকে। ইহার বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ রৌপ্য-মুদ্রা প্রদান করিলেই কৃষকের প্রতি সমাজের—বিশেষ ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। সাংসারিক সাধারণের উপরই প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই সমাজ-বিধান প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অন্যান্য উপায়েও কৃষকের অভাব-মোচনের চেষ্টা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

দেখা যাইতেছে যে, সুচতুর বণিকের সুপ্রসারী চক্রান্তজালে বাঙ্গালার চাষী—প্রধানতঃ পাট চাষী তাহার ন্যায্য প্রাপ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া পাট উৎপন্ন করিয়াও এদেশের কৃষক যথোচিত মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে পারিতেছে না;—এদের তাড়নায় নামমাত্র মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া সর্ব্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ইহার পশ্চাতে যে চালবাজী আছে তাহা ব্যর্থ করিয়া কৃষকের অবস্থার উন্নতি-বিধানের জন্যই আপাততঃ অর্দ্ধেক পরিমিত জমিতে পাট চাষ করার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বিশিষ্ট মানবেরা ও অভিজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ প্রাদেশিক সম্মেলনের সভায় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

পাট বুনিবার সময় আসিয়াছে। নানা স্থানে কৃষকগণ জমিতে চাষ দিয়াছে। ইহাই উপরি উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উপযুক্ত সুযোগ। আমরা তাই সকলের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। কংগ্রেসের বাণী নিরক্ষর কৃষকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা না করিলে যে কর্ত্তব্যে গুরুতর অবহেলা করা হইবে একথা বলাই বাহুল্য।

জুট কমিটি প্রচার বিভাগ,
প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি।

পাটের রাষ্ট্রনীতি

পাট চাষ হ্রাসের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়াছে। শুধু কৃষকমহলে নহে,—কিরিঙ্গী পাড়ার ব্যবসায়ী মহলে পর্য্যন্ত একটা রব উঠিয়াছে। বণিকের দল ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়াছে। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ রোজ যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতেই এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সঙ্গে কিরিঙ্গী কাগজগুলিও বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হইয়াছে। এই সঙ্গে টাঙ্গাইল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কতিপয় পাট-ব্যবসায়ী একত্র হইয়া কংগ্রেসের প্রচারিত আন্দোলনের প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। টাকা দিয়া মোল্লা ও মৌলবী নিয়োগ করা হইতেছে। ইহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া বলিতেছে,—১৩৩৬ সালে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ হইবে। তাহাতে পাটের দর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। যে সমস্ত পাট এখন মজুত আছে তাহা বেচিতে বেচিতে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে অধিক জমিতে পাট বুনিয়া লাভবান হওয়া কৃষকের কর্ত্তব্য। সরলবুদ্ধি কৃষকগণকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ভাবিয়াই এরূপ মিথ্যার অভিযান সুরু হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত স্বার্থপর লোক, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া কি কর্ত্তব্য নহে? আমরা আশা করি,—দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া কৃষকদিগকে আপন কর্ত্তব্যের কথা বুঝান প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি (আত্মশক্তি)

কুষ্টিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

১৯২৬-২৭ সনের কার্য্য-বিবরণী

এই ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ৬৪ ও সাধারণ সভ্য-সংখ্যা ২২৮। কার্য্যকারী মূলধন ৪,২২,৬৩৮৲। আলোচ্য বর্ষে নিট্ লাভ হইয়াছে ১৪,৮৫২৲। ৬০।৩।২৭ তারিখে ডিবেঞ্চার বাবদ ৬৩,৭০০৲ টাকা দেনা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ঐ দায়িত্বের পরিমাণ ৯,০৭৭৷০ টাকা হ্রাস করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৬,৯০০৲ টাকার সাধারণ অংশ বিক্রয় হইয়াছে ও ৭০৲ টাকার সেয়ার ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট সেয়ার বিক্রয় হয় নাই। গত বৎসর আশুধান্য ও রবিশস্য বিনষ্ট হওয়ায় এবং পাট ভাল না হওয়ায় আদায় সন্তোষজনক হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ২,৪৯,৬০২৲ টাকা কর্জ্জ দাদন করা হইয়াছে।

বাংলার তামাক

দক্ষিণ বাংলায় তামাকের চাষ খুব কম। উত্তর বাংলায় কুচবিহার, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, পুর্ণিয়া, দারভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে তামাকের চাষ খুব বেশী। দারভাঙ্গার তামাকের পাতা পুর্ণিয়ার তামাক পাতার চাইতে বড়; কিন্তু পুর্ণিয়ার তামাকের ঝাঁজ ও গন্ধ দারভাঙ্গার তামাকের চাইতে ভাল। পশ্চিম মুল্লুকে কিন্তু দারভাঙ্গার তামাকের আদর বেশী। আবার দক্ষিণ বাংলার লোকেরা পুর্ণিয়ার তামাকই বেশী পছন্দ করে।

তামাক দশ রকমের যথা :—বিষপাত, পাকা, পালো, রঙ্গপুরি, মতিহারি, বিলাতী, মতি, হিঙ্গলি, চওড়া পাতা, এবং বলি। মতিহারি আবার দুই রকমের, রঙ্গপুর মতিহার ও পুর্ণিয়া মতিহার। এইসকল তামাক সাধারণতঃ মতিহারি, সৈদপুর, দিনাজপুর, মোগল হাট, জলপাইগুড়ি, কাউনিয়া এবং আসাম অঞ্চলে রপ্তানি হয়।

রঙ্গপুর জেলায় পালো, বিষপাত, চওড়া পাতা এবং মতিহার তামাক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি করা হয় এবং ডোমার, নিলফামারী, দরওয়ানী ও রঙ্গপুর হাটে বিক্রয় করা হয়। এই সকল তামাকের মধ্যে বিষপাত তামাকের চাহিদা ঘোড়ামারা, কাউনিয়া, ভোটমারি, ডোমার হাট সৈদপুর ও মোগলহাটে বেশী।

পুর্ণিয়া জেলায় গঙ্গবর্ডাঙ্গায় মতিহার ও গাছ তামাক খুব বেশী জন্মে। হিঙ্গলী তামাক সকলের সেরা। ইহাকে তামাকের রাজা বলা হয়। ইহা গোবরডাঙ্গা, চাকদহ, কামলা (চাকদহের ৬ মাইল দূরে) এবং নাদনঘাটে আমদানি করা হয়। যাঁহারা তামাকের ব্যবসা করিতে চান তাঁহারা এই সকল অঞ্চল ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়।

দারভাঙ্গা জেলায় দলসিং সেরাই, তেগরা, বাছুয়ার, সাহপুর পাটোরি, হাসান দেওবিয়া, উজারপুর, ওয়াইনি এবং ঘোসি, ঈচট্, মজাফরপুর, মতিহারি, লক্ষ্মীপুর, ও ভাপতেয়াহিতে প্রচুর পরিমাণে তামাক আমদানি হয়। এইসকল অঞ্চলে মুরান, ঘোসি, ফেরি, ছাবুয়া, বিটা, বিলাতি ও কানাইয়া শ্রেণীর তামাক জন্মে। এগুলির মধ্যে বিলাতি ও মুরানই শ্রেষ্ঠ। এগুলির নেশা খুব উগ্র। এই শ্রেণীর তামাক মোকামা, লক্ষ্মী সরাই, গয়া, বিহার ও পাটনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে।

মাঘ হইতে বৈশাখের মধ্যেই তামাকের মরশুম। ফাল্গুনের প্রথম ভাগেই এই সকল তামাক অঞ্চলে পরিদর্শন করা ভাল। ইহার ব্যবসা খুব লাভজনক। গয়া, বিষ্ণুপুর, আমারপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ও দিল্লী উৎকৃষ্ট তামাকের জন্য বিখ্যাত।

পল্লীসেবায় বস্তুনিষ্ঠা

ছাত্রদের গ্রীষ্মাবকাশ সুরু হইয়াছে। দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি তাহাদের ডাকিয়া শুনাইতেছেন :—

(১) বাঙলা দেশে ৮৯৫২৪টী গ্রাম।
সহরের সংখ্যা—১০৫টী।

(২) বাঙলা দেশে শতকরা ৯৪ জন গ্রামে থাকে।
শতকরা ৬ জন মাত্র সহরে থাকে।

(৩) বাঙলাদেশে প্রতি বৎসর ৩ লাখ শিশু মারা যায়। তার মধ্যে গ্রামে ২ লাখ ৮২ হাজার, আর সহরে ১৮ হাজার।

(৪) বাঙলা দেশে গড়ে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ৪ জন, সহরে ১৫ জন।

(৫) প্রতি বৎসর বাঙলার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ১ লাখ, কলেরায় ১২ হাজার, বসন্তে ৬০ হাজার।

(৬) বাঙলার বুকে ১৪৭টি ডাক্তারখানা আছে। তার মধ্যে বে-সরকারী ৮৭৩টি, সরকারী—সাধারণের জন্য ৩২টি, বিশেষ ৫৪টি। প্রায় ১০ হাজার গ্রামের জন্য একটিও সরকারী ডাক্তারখানা নাই।

(৭) বিগত ২০ বৎসরে বাঙলার ৯০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৭৫ হাজার গ্রামেই গড়ে লোক-সংখ্যা হাজারকরা ১১ জন কমিয়াছে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে বাঙলার অধিকাংশ গ্রামেই অত্যন্ত জলকষ্ট দেখা দেয়।

বাংলার রেশম চাষ

বাংলা সরকারের কৃষিদপ্তরের ১৯২৭-২৮ সনের রিপোর্টে প্রকাশ এবৎসর আবহাওয়া সুবিধাজনক না থাকায় বাংলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তুঁত গাছের (মালবেরির) চাষ হয় নাই। ১২টি সরকারী রেশম পোকা চাষের বাগানে এই সনে ২২,৫১২ কাহন কোকুন জন্মে। বিগত সনে ২১,০৮৩ কাহন জন্মিয়াছিল। ইহা হইতে ৫৬,০২৬ টাকা পাওয়া যায়। গত বৎসরে ৬২,১৯২ টাকা বিক্রয় হয়। ওটি পোকার বীজ এবৎসরে কম উৎপাদিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ১৯,০০০ কাহন ওটি পোকার তুলনায় এবৎসরে মাত্র ১৫ হাজার কাহন জন্মিয়াছে।

চট্টগ্রামের বাণিজ্য

চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, বিদেশী বা উপকূলবর্ত্তী সমুদয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের মোট মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৮৩৩ লক্ষ টাকা। এত টাকা কোন দিন বন্দরের আয় হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের মূল্যের তুলনায় লাভ দাঁড়াইয়াছে ৪১৪ লক্ষ টাকা। হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরের লাভের সংখ্যা শতকরা ২৯ বাড়িয়াছে। এইরূপ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট বলিতেছে, "বিদেশীয় এবং উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্য উভয়েই সমানভাবে আয়ের এহেন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।" বিদেশীয় বাণিজ্যের মধ্যে রেলওয়ে সরঞ্জাম, লৌহ এবং ইস্পাত, লবণ, নানাবিধ কলকব্জা এবং মিল-ওয়ার্ক প্রভৃতির অত্যধিক আমদানি এবং চা ও পাটের অতিরিক্ত রপ্তানি দেখা যায়। উপকূল বাণিজ্যের মধ্যে ধান ও চাউলের অত্যধিক আমদানিই একমাত্র কারণ।

এই বন্দরের পূর্ব্ব বৎসরের বিদেশীয় বাণিজ্যের মূল্য ৯,৩৯,১০,০০৬ টাকা হইতে বর্ত্তমান বৎসর ১১,৪১,২৬,১৩২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, এই বৎসর ২,১২, ২৬,১২৬ টাকা অর্থাৎ শতকরা ২২·৪৮ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদেশ হইতে পূর্ব্ব বৎসরে ১,৭৪,৮১,৫৪২ টাকা মূল্যের জিনিষ চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা হইয়াছিল। তৎস্থলে বর্ত্তমান বৎসরে ২,৮১,৬৫,৮৩৬ টাকা মূল্যের জিনিষ আমদানি হওয়ায়, দেখিতে পাই ১,১৬,৮৪,২৯৪ টাকার জিনিষ আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়ে সরঞ্জাম, লৌহ ও ইস্পাত, লবণ এবং কলকব্জা ও মিলওয়ার্ক, পূর্ব্ব বৎসর হইতে যথাক্রমে ১২,৬৮,২৪৭ টাকা, ৪৭,৫৯,৮৪৮ টাকা, ৭,১৬,০১৫ টাকা এবং ৪১,০৮,৮২৮ টাকা অধিক আমদানি হওয়াই এই বাণিজ্য-বৃদ্ধির কারণ।

বর্ত্তমান বৎসরে বন্দরের রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে বন্দরে ৭,৭৪,৮৮,৩৬৪ টাকা মূল্যের জিনিষ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল, আর বর্ত্তমান বৎসরে তৎস্থলে ৮,৭০,৩০,২৯৬ টাকা মূল্যের জিনিষ রপ্তানি হওয়ায় ৯৫,৪১, ৮০২ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চা ও পাটের রপ্তানি-বৃদ্ধিই এই টাকা বৃদ্ধির প্রধান কারণ; বিশেষতঃ, সমস্ত বৎসর ধরিয়া চা-এর বাজার চড়া ছিল। গত বৎসর হইতে বর্ত্তমান বৎসর ৯,১৭,৭০৬ পাউণ্ড অধিক চা রপ্তানি হইয়াছে। এবং মূল্যের দিক্ দিয়া ৪৭,০৬,৭০৩ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর পাট ১০,১৪৫ টন এবং মূল্যে ৪০,৪৬,৮৪৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসর গ্রেট বৃটেন এবং অবশিষ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের

সহিত ব্যবসা সামান্য কমিয়াছে। গত বৎসর বিলাতের সহিত এই বন্দরের সমস্ত বাণিজ্যের শতকরা ৯০৯৭ ভাগে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশের সহিত শতকরা ৭·৬ ভাগে বাণিজ্য চলিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর তৎস্থলে যথাক্রমে, শতকরা ৮৯·৫১ এবং ১·২৮ ভাগে আসিয়া দাঁড়িয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসর উপকূল বাণিজ্য গতবৎসর হইতে ২,০৩,৫৮,৯৪৮ টাকা মূল্যের বৃদ্ধি পাইয়াছে (৫,৪৪,৭৫,৮৭১—৩,৪১,১৫,৯২৩)। সহসা এইরূপ বৃদ্ধির কারণ, প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল ও ধানের আমদানি। গত বৎসর হইতে বর্ত্তমান বৎসর ২,৩২,৫৭,৮১৪ টাকা মূল্যের চাউল, এবং ১৪,৫২,৭৪০ টাকা মূল্যের ধান অধিক আমদানি করা হইয়াছে।

এ বৎসর বন্দরের ১,২২,০৫৮ টাকা মূল্যের উপকূল-রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। (১৩৭০৬৩৪৪—১০৫৮৪৩১৬)। ইহার কারণ, মসলার রপ্তানি এত হ্রাস পাইয়াছে যে, চামড়া, চা, তামাক, প্রভৃতির রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলেও তদ্বারা ক্ষতি পরিপূরিত হয় নাই।

বর্ত্তমান বৎসরের চট্টগ্রাম বন্দরের নদীর আয় বিগত বৎসরের ৩,৬০,০১১ টাকার স্থানে ৫,৫৭,৬১৪ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই নদীর শুল্কই এই বন্দরের প্রধান আয়।

মোহাম্মদ এনামুল হক
(সাপ্তাহিক সওগাত)

বাঙ্গালীর টাকা কোথায় উড়িয়া যায় ?

ঔষধ, খাদ্য ও পথ্যাদিরূপে কত টাকার মাল বাংলায় আমদানি করা হয় তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল।

কড্‌লিভার তৈল

১৯২৫-২৬ সালে	৮,৭৪০ টাকার
১৯২৬-২৭ সালে	২,০২৯ টাকার

অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশান কডলিভার তেলের হিসাব এর মধ্যে ধরা হয় নাই।

পেটেন্ট ঔষধ

	২,৬৮,১৮২ টাকা
	৩,৬৬,৭১১
	৩,৮৯,০১৫
	৩,৬০,৫০২
	৩,১৬,৪২২
	২,২৯,৫২৬

সারসাপ্যারিলা

১৯২১ হইতে ২৭ সাল পর্য্যন্ত মোট ৭৬২ টাকায়। কিন্তু গোটা ভারতে ঐ সময়ে আমদানি মোট ১৯৭১৮০ টাকায়।

ক্যারিনেসস্ ফুড (ইন্ বল্‌ক)

(খেজুর খাস্ত—খানি, এরোরুট, সাগু ইত্যাদি, যাহা টিন ইত্যাদিতে প্যাকবন্দি হইয়া আসে না।)

১৯২৩-২৪	১৮,০২,৮২৯ টাকা
১৯২৪-২৫	২৩,৭৭,৭৩০ „
১৯২৫-২৬	২৩,৩১,৬২৬
১৯২৬-২৭	১৮,৮৬,১১১

শিশুখাদ্যরূপে ক্যারিনেসস্ (বিবিধ)

(যাহা টিন ইত্যাদিতে প্যাক হইয়া আসে।)

১৯২৩-২৪	৪,৮১,৩৪৮ টাকার
„ ২৪-২৫	৬,৩৩,০০২
„ ২৫-২৬	৬,০০,১২১
„ ২৬-২৭	৮,৬৩,০১৭

দুগ্ধজ খাদ্য

(পেটেন্ট ফুড,—হরলিক্স মিল্ক, বেজার্স ফুড ইত্যাদি।)

১৯২৩-২৪	১১,০০,৭৩০ টাকার
„ ২৪-২৫	১২,২৮,৪৯১ „
„ ২৫-২৬	৮,৪৩,০২৭
„ ২৬-২৭	১২,১৬,৩০০ „

খেজুরের, চুষ্কজ ও পেটেন্ট ফুড (মোট)

১৯২১-২২	২৪,৫৪,৪৪৬ টাকার
„ ২২-২৩	২৭,৮২,১৪২ „
„ ২৩-২৪	৩৩,৮৪,৯৭৭ „
„ ২৪-২৫	৪৬,৭৯,২৮৩
„ ২৫-২৬	৩৯,৭৮,২১৪ „
„ ২৬-২৭	৬৯,৬৫,৪৫৮ „

টিনে ও বোতলে ভরা ফল

১৯২১-২২	১,৯১,৭২২ টাকার
„ ২২-২৩	২,৬২,১০৩
„ ২৩-২৪	২,১২,৬৬১
„ ২৪-২৫	১,৮৭,৬৪৮
„ ২৫-২৬	২,৬৫,৬৪১
„ ২৬-২৭	১,৯১,০১০

টিনে ও বোতলে ভরা গাছ

১৯২১-২২	১,৪৮,৪৯১ টাকার
„ ২২-২৩	২,০৫,৯০২
„ ২৩-২৪	১,৩৩,১৫৯
„ ২৪-২৫	১,৮৫,৭০৭ „
„ ২৫-২৬	১,৯৮,০৮২ „
„ ২৬-২৭	২,০৪,৪৭৩

টিনে ভরা অন্যান্য খাদ্য যাহার হিসাব দেখান হয় নাই

১৯২১-২২	১৪,৪০,২৯০ টাকার
„ ২২-২৩	১৫,৪৬,০৮৪
„ ২৩-২৪	১৩,৫৩,২৩০
„ ২৪-২৫	২৬,২৪,৫৪৪
„ ২৫-২৬	৩৮,০৮,৫৯৮
„ ২৬-২৭	৬৯,৫১,৪৩২

বিস্কুট ও কেক

	৪,৭৯,১৮৬ টাকার
	৪,৯৯,৩৪৬ „
	৪,৯০,৮৯০
	৬,৪৪,৬৮৮
	৭,৪৮,৩১৭
	৮,২৭,১৫৫

কোকো ও চকোলেট

আচার ও চাটনী

জ্যাম জেলী

	৩,০১,৯০৭ টাকার
	২,৪২,২০৫
	২,২১,৪৫৬
	২,৪২,৪৭০
	১,৮৯,৪০৯
	১,৯০,২০৯

পনির

১৯২১-২২	২,৮২,৮৭৮ „
„ ২২-২৩	৩,০৪,৯৭৫ „
„ ২৩-২৪	৩,৩৯,৩৮৯
„ ২৪-২৫	২,৭৮,৩৫৯
„ ২৫-২৬	৩,২৫,১৬৪
„ ২৬-২৭	৩,৪৯,৫০২

ঔষধ উপকরণ রূপে বাঙ্গলার রপ্তানি

১৯২১-২২	৮,০৫,৯৫৫ টাকার
„ ২২-২৩	৫,৩৯,৬৬০ „
„ ২৩-২৪	১১,৫২,০১৪ „
„ ২৪-২৫	১৩,১৮,৪৭৪ „
„ ২৫-২৬	২৬,০৫,৩৩১ „
„ ২৬-২৭	১৮,১৭,৩৬২ „

শ্রীহরিদাস পালিত

ভারতের স্থল শুল্ক

১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ভারতের সীমান্ত দেশগুলিতে মাল গমনাগমনের জন্য কোন প্রকার শুল্ক বসাইবার নিয়ম ছিল না। ঐ বৎসরে সপারিষদ্ বড়লাট বাহাদুরকে একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, সেই সীমার বাইরে অথবা ভিতরে গমনাগমনশীল মালের উপর শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা দিয়া একটি আইন পাশ করা হয়। এই সীমার অন্তর্গত স্থানসমূহকে ল্যাণ্ড কাষ্টমস্ এরিয়া (স্থল শুল্কের সীমানা) নাম দেওয়া হয়। ফ্রান্স ও পর্ত্তুগালের অধীন ভারতীয় স্থানসমূহে পূর্ব্বের কতগুলি নিয়ম উল্টাইয়া এই নতুন আইন খাটান হইতে থাকে। তা ছাড়া বর্ম্মা ও শ্যামের সাথাসাথি সীমান্ত প্রদেশগুলির পক্ষেও এই নতুন আইন প্রযোজ্য। অবস্থানুসারে কয়েকটী সীমান্ত দেশীয় রাজ্যের পক্ষে পূর্ব্বের আইনকানুন বজায় রাখা হয়।

পণ্ডীচারী, কারিকাল, মোয়া এবং য়ামান নামক কয়টী সীমান্ত প্রদেশের পক্ষে স্থলশুল্ক নিয়ম মত ধরা হইতে থাকে। সাগর পারের দেশের মালের উপর যে হারে শুল্ক বসান হয়, এই সমস্ত স্থানের মালের উপরও সেই হারে শুল্ক বসান হইয়া থাকে। ১৯২৭ সনের ৬ই জুলাই তারিখে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের সঙ্গে কাথিওয়ার রাজ্যের স্থল শুল্ক বসাইবার একটী আইন পাশ হয়। শ্যামের পক্ষে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মালের উপর স্থল শুল্ক বসাইবার নিয়ম আছে। অন্যান্য সীমান্ত প্রদেশের পক্ষে স্থলপথে ভারতে আমদানি রপ্তানি মালের উপর কোন শুল্ক বসাইবার নিয়ম নাই। তবে ঐ সমস্ত প্রদেশ হইতে যে সমস্ত মাল বিনা শুল্কে ভারতের মধ্য দিয়া চীন, আফগানিস্থান, নেপাল, পারস্য এবং কাশ্মীরে চালান হয়, সেই সমস্ত মাল পরীক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে কয়টী কাষ্টমসের আফিস খাড়া করা আছে।

পারস্য :—যে সমস্ত মাল ভারতের মধ্য দিয়া পারস্যে চালান দেওয়া হয়, তাহার উপর শুল্কের ½ ভাগ ড্র্যাক্ (ফেরৎ শুল্ক) দেওয়ার নিয়ম আছে। ড্র্যাক্ মঞ্জুর করিবার আগে এই সমস্ত মাল স্থানীয় বাণিজ্য-দূত কর্ত্তৃক সহরে পরীক্ষিত হয়।

আফ্‌গানিস্থান :—ইঙ্গো-আফ্‌গান সন্ধিপত্র অনুসারে যে সমস্ত মাল ভারতবর্ষের ভিতর দিয়া আফ্‌গানিস্থানে চালান হয় এবং ঐ সমস্ত মাল যদি আমদানি কালে আফ্‌গানিস্থানে পুনঃ রপ্তানি হইবে বলিয়া প্রচারিত থাকে তবে সে সমস্ত মালের উপর প্রথমে শুল্ক বসান হয়। পরে আফ্‌গান সীমান্তের ইংরেজের কাষ্টমস্ অফিসার যদি ইহা বোঝেন যে, মালগুলি কোন আফ্‌গান সওদাগরের প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে সীমানা পার হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত মালের উপর প্রদত্ত শুল্ক ফেরৎ দেওয়া হয়। আর যদি এই সমস্ত মাল আফগান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমদানি করা হয়, এবং যদি আফগান-বাণিজ্য দূত অথবা আফগান সরকারের অন্য কোন প্রতিনিধি এই মর্ম্মে একখানা অনুমোদন পত্র লিখিয়া দেন যে, এই সমস্ত মাল শুল্ক সরকারী কাজের জন্য আমদানি হইতেছে, কোন প্রকার ব্যবসায় অথবা সরকারী একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য আমদানি হইতেছে না, তবে এইপ্রকার আমদানি মালের উপর উপরোক্ত স্থল শুল্ক মোটেই ধরা হয় না। ইংরেজ কাষ্টমস্ অফিসারকে এইটী ভাল করিয়া দেখিতে হইবে যে, যে সর্ত্তে মাল ভারতে আমদানি হইয়াছিল, সীমানা

অতিক্রমের সময় যেন সেই সব দর্ত পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। আফগানিস্থানে মাল চালান দিবার বেলায় পেশোয়ার, চামান অথবা পারাচীনার ভিতর দিয়া চালান দেওয়ার নিয়ম।

কাশ্মীর :—একটি বিশেষ অধ্যাবস্থ অনুসারে যে সমস্ত মাল বৃটিশ ভারতের ভিতর দিয়া কাশ্মীর এবং জম্মু রাজ্যে চালান দেওয়া হয়, ইংরেজ সরকার ঐ মালের উপর আদায়ী মূল শুল্ক ঐ রাজ্যের দরবারে ফেরৎ জমা দিয়া দেন। এবং ঐ সমস্ত মালের নিজ রাজ্যের সীমানা অতিক্রমের সময় সরকার তাহার উপর কোন শুল্ক ধরেন না। এই ব্যবস্থা ভারতে প্রস্তুত কেরোসিন এবং মোটর স্পিরিটের বেলায়ও প্রযোজ্য হয়। এই প্রকার মালের উপর বৃটিশ ভারতে আবকারী কর আদায় হইয়া থাকে। কাশ্মীর সরকারের নিকট প্রতিনিধিকে রাজ্যের মধ্যে মাল ঢুকিবার কালে তাহা চিনিয়া লইতে হয়।

নেপাল :—বৃটিশ ভারতের ভিতর দিয়া যে সব মাল নেপালে যায়, তাহার মূল শুল্কের আইন কতকটা আফগানিস্থানের আইনকানুনের মত। তবে এখানকার আমদানি মালের উপর—সে ব্যবসার জন্যেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক—দেয় শুল্কের জন্য যদি উপযুক্ত সিকিউরিটি দেওয়া যায়, তবে মূল শুল্ক আর দিতে হয় না।

পর্শা হইতে চীনে যে সমস্ত মাল যায়, তাহার উপরও ড্রবাক্ (ফেরৎ শুল্ক) দেওয়া হইয়া থাকে। তবে কোন কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

ভারতীয় গুড় বনাম বিদেশী চিনি

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দুনিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষই সব চাইতে বেশী চিনি উৎপাদন করিত। তখনকার দিনে বীট চিনি বাজারে ততটা প্রসার লাভ করে নাই। ক্রমে ক্রমে ইয়োরোপে বীট চিনি সরকারী সাহায্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইতে থাকে এবং কিউবা ও জাভা অঞ্চলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বেশী পরিমাণ চিনির উৎপাদন চলিতে থাকে। বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য দেশে চিনি উৎপাদনের যে সকল বিপুল আয়োজন হইয়াছে ভারতে তাহার কিছুই হয় নাই। কারণ ভারতের অধিকাংশ কৃষিজীবী লোকের নিকট বর্ত্তমানেও চিনির চাইতে গুড়ের আদর বেশী। এইজন্য এদেশে চিনির কারখানা স্থাপন করিয়া বিরাটভাবে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা এতদিন উপলব্ধি করা যায় নাই। ইহা ছাড়া এদেশের গুড় প্রস্তুতকারিগণ সহজেই তাহাদের গুড় বিক্রয় করিবার লোক পায়। গুড়ের নিকৃষ্ট পদার্থ মাত্র বা তরল গুড় তামাক বিক্রেতাগণ ও মদ-প্রস্তুতকারিগণ ক্রয় করে। এই সকল কারণে এদেশে চিনির চাইতে গুড়ের আদর এখনও অনেক বেশী। ভারতীয় আর্থিক জীবনের এরূপ অবস্থায় এদেশে গুড়ের পরিবর্ত্তে চিনি প্রচলনের চেষ্টা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতে চিনি তৈয়ারীর ৩১টি ফ্যাক্টরী

১৯১৯-২০ সনে পুসার কৃষি কার্য্যে ইক্ষু-বিষয়ক সংবাদ সরবরাহের জন্য একটি সুগার বিউরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশের ইক্ষু শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যেই ঐ সংবাদ বিভাগ খোলা হয়, কিন্তু আসলে এই বিভাগ হইতে সংবাদ সরবরাহ ছাড়া অন্য কোন কাজ হয় নাই। যে পর্য্যন্ত না এদেশের পুঁজিপতিরা এই শিল্পে টাকা চালিতে প্রস্তুত হইবে, সে পর্য্যন্ত এদেশের ইক্ষু শিল্পের উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। টাকা পয়সাওয়ালা লোকদের এই শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টায় অবশ্য দেশের সরকারকেও সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে। পুসার সুগার বিউরোর সেক্রেটারী মহোদয়ের হিসাব মত এদেশে বর্ত্তমানে ১৮টি চিনি প্রস্তুতের রিফাইনারী চলিতেছে। ইহার মধ্যে ৯টি যুক্ত প্রদেশে, ৪টি মাদ্রাজ প্রদেশে, ৩টি বিহার উড়িষ্যায়, একটি বাংলায় ও একটি পাঞ্জাবে। ইহা ছাড়া মোটা ভারতে ১১টি ফ্যাক্টরী আছে। এগুলি সরাসরি ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুতের কাজে খাটিতেছে। এগুলির ৬টি বিহার উড়িষ্যায়, ৪টি যুক্ত প্রদেশে, ২টি মাদ্রাজে এবং একটী আসামে। মোটের উপর মোটা ভারতে চিনি প্রস্তুতের ৩১টী ফ্যাক্টরী ও রিফাইনারী আছে।

স্বদেশী এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কৃতিত্ব

টাটা এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী সম্প্রতি একটী কৃতিত্বমূলক এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের বোম্বাই-পুনা লাইনের ঠোল ঘাটে ঐ রেলের একটা রিভার্সিং ষ্টেসন আছে। ভোরঘাট হইতে গাড়ীগুলিকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার বড়ই অসুবিধা হইত। এজন্য ২½ মাইল লম্বা একটি ঘোরান ডবল লাইন নির্ম্মাণের ভার টাটা কোম্পানীর হাতে দেওয়া হয়। টাটা কোম্পানী সম্প্রতি ইহার এঞ্জিনিয়ারিং মোসাবিদা প্রস্তুত করিয়া অনেকটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। এইজন্য ২টী নূতন টানেল তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। ইহার একটী প্রায় ¾ মাইল লম্বা। এই টানেল প্রস্তুতের কাজে ব্লাষ্টিং অপারেশনের জন্য একশত টন ডিনামাইট খরচ করিতে হইয়াছে। ১৮ মাস ধরিয়া খান্দেশ পাহার হইতে ৪৫,০০ শ্রমিক সকল প্রকার আধুনিক এঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতির সাহায্যে ৬ লক্ষ টন পাথর ও পাথর কুচি সংগ্রহ করিয়াছে। এই ভাবে অতি-অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এক অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে রেলওয়ে চিফ কমিশনার এই টানেল উদ্বোধনের সময় টাটা কোম্পানীকে প্রভূত প্রশংসা করেন। এই টানেল প্রস্তুত করিতে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রতি সন ১৩ লক্ষ টাকা বাঁচিবে।

ভারতের জন্য রুশ ফিল্ম

রুশিয়াতে একটী ফিল্ম কোম্পানী আছে তাহার নাম "সভ্‌কিনো"। সম্প্রতি এই কোম্পানীর সহিত বিলাতের একটী ফিল্ম কোম্পানীর (বৃটিশ ইন্‌ষ্ট্রাক্সানাল্ ফিল্মস্ লিমিটেড্) একটা চুক্তি হইয়াছে। কল খবরের কাগজে প্রকাশ যে এই চুক্তি অনুসারে বিলাতের উপনিবেশগুলাতে ও ভারতে রুশ ফিল্ম দেখানো হইবে।

১৯ কোটি টাকার ট্রেজারি বিল বিক্রয়

খাজনা হইতে ও অন্যান্য আয় হইতে গভর্ণমেণ্টের খরচ-পত্র মিটান হয়। কিন্তু যে সময় যত খরচ করা দরকার হয় ঠিক তখনি তত আয় সকল সময় হাতে আসে না। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারি বিল বেচিয়া টাকা তোলেন এবং পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাস পরে টাকাটা ফিরাইয়া দেন। যতদিন টাকাটা ফিরাইয়া দেওয়া না হয় ততদিন একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া চলিতে থাকে।

এবারে বাজেট বক্তৃতার সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব-সচিব মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টকে এখনও ৯ কোটি টাকার ট্রেজারি বিল শুধিতে হইবে; শীঘ্রই এই পরিমাণটাকে ৬ কোটি ৯৫ লক্ষে কমানো হইবে; ভবিষ্যতে আরও কমাইয়া ফেলা হইবে, ভারতের টাকার বাজারে ট্রেজারি বিল একটা স্থায়ী ব্যাপার হইয়া যাহাতে না থাকে তাহার জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে।

মাস দুই হইল রাজস্ব-সচিব মহাশয় এই সব কথা বলিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই গভর্ণমেণ্টের নীতি বদ্‌লাইয়াছে দেখা যাইতেছে। কারণ ১০ই এপ্রিল তারিখে একটা ঘোষণা বাহির হইয়াছে যে, ৩ মাস ও ৯ মাসের জন্য ১১ কোটী টাকার ট্রেজারি বিল বিক্রয় করা হইবে।

বাজেট বক্তৃতার পর লোকের ধারণা ছিল যে, ট্রেজারি বিল বিক্রয় আপাততঃ বন্ধ থাকিবে। সুতরাং ঘোষণাটী দেখিয়া টাকার ব্যাপারীরা অবাক হইয়া গিয়াছে।

কিরূপ সুদে গভর্ণমেণ্ট টাকাটা সংগ্রহ করিতে পারিবেন? মনে হয় গভর্ণমেণ্টকে বেশী সুদ দিতে হইবে না। ব্যাঙ্ক-রেট শতকরা ৮ থাকিলেও, "কল-মানির" (যে টাকা যখন ইচ্ছা ফিরাইয়া লওয়া যায়) সুদ ২½ হইতে ৪ এবং তিন মাসের আমানতের উচ্চতম সুদের হার শতকরা ৩½। সুতরাং মনে হয় গভর্ণমেণ্ট ৩ মাসের বিলগুলা শতকরা ৪ হারে সহজেই পাইবেন।

৯ মাসের বিল গত ২ বৎসরের ভিতর বাজারে দেখা যায় নাই। ইহাদের চাহিদা কিরূপ হইবে বুঝা যাইতেছে না। তবে, ৩½ হইতে ৫ হারে সুদ পাইবার লোভে অনেকেই ৯ মাসের বিল কিনিবে বলিয়া মনে হয়।

বাজারে অর্থের আধিক্য ঘটাতে টাকার বৈদেশিক দাম কমিতেছে। ট্রেজারি বিলগুলা বেচা হইলে বাজারে অর্থের

পরিমাণ কমিবে। সুতরাং টাকার বিনিময় হারও চড়িবে। তা ছাড়া, বাজারে অর্থের পরিমাণ কমিলে ব্যাঙ্কগুলা সুদের হারও চড়াইবে। এখন ট্রেজারি বিল বেচিলে টাকার বাজারে উক্ত দুইটী ফল দেখা যাইবে আশা করা যায়।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ

সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদ সহরের বেসান্ত হলে গত ২৩শে জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় একটা সম্মেলন হয়। এই সভায় ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃএর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর আর, আর, কালে, এম এল সি, কোম্পানীর সিন্ধুপ্রদেশ এবং পশ্চিম ভারতের জেনারেল এজেণ্ট মিঃ পাক্সমল হারজানমিকে একটী স্বর্ণ পদক উপহার দেন।

সভায় বহুসংখ্যক ভদ্র মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সেঠ গঙ্গারাম টীলকরাম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ খরহরাম দাস, দৌলতরাম, এম এল সি, সমবেত ভদ্র মণ্ডলীর সহিত রায় বাহাদুর কালের পরিচয় করিয়া দেন এবং বক্তৃতা দিতে গিয়া অন্যান্য কথার সহিত ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে দেশের লোকের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার প্রয়োজনীয়তার বিষয় কতকগুলি কথা বলেন। পরে রায় বাহাদুর কালে কিরূপ দক্ষতার সহিত কোম্পানীর কাজ করিয়াছেন এবং বিশেষতঃ তিনি যে একজন উঁচু দরের ব্যবসায়ী ছিলেন সে বিষয়ে কতকগুলি কথা বলেন।

তারপর মিঃ পাক্সমল নিম্নলিখিতরূপে তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করেন :—

প্রথমে তিনি সভাপতি ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া কোম্পানী বিষয়ে কতকগুলি দরকারী কথা বলেন।

কোম্পানীর গোড়া-পত্তন

১৯১৩ সনে বড় ধন-সম্পত্তির ফলে এই ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কোঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানী রেজিষ্টারী হইবার কিছু পরে এক বৎসরের মধ্যেই কয়েকটা ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া গেল। এবং ঐ সময়ে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া পাঁচ বৎসরকাল স্থায়ী হয়। এই স্বল্পসময়ের মধ্যে কোম্পানীকে বড় ওলিয়ার হইয়া কাজ চালাইতে হইয়াছিল। অন্যান্য কোম্পানীর সহিত তুলনা করিলে এ কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয় খুব সামান্যই হইয়াছিল। কোম্পানীর অংশ বিক্রী করিতে এক পয়সাও কমিশন দেওয়া হয় নাই। কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ নিজেরাই বেশীর ভাগ অংশ কিনিয়া লন। এবং কোম্পানীর শাসনভার মিঃ ডবলিউ, জি, চারনুল নামক একটি সম্ভ্রান্ত নগরবাসী ও সেতারার উকিলের উপর ন্যস্ত হয়। কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা তাঁহারই প্রচেষ্টার ফল।

ব্যবসায় উন্নতি

প্রথম হইতেই কোম্পানী কার্য্যদক্ষতা ও ব্যবসায় উন্নতি দেখাইতে আরম্ভ করে, এবং এই গত ১৫ বৎসর ধরিয়া সমানভাবে কাজ করিতে থাকে। এইরূপে বর্ত্তমানে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চে স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রতি বৎসরই কোম্পানী বেশ সন্তোষজনক ব্যবসা দেখাইতেছে। গত বৎসর কোম্পানী মোট ২১,৪০,০০০ টাকার কাজ করিয়াছে। ১৯২১ সনে মাত্র ১৮,৮৮,০০০ টাকার কাজ করিয়াছিল। এই ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বেশী কাজ নেওয়ার চেয়ে ভাল কাজ নেওয়া বেশী পছন্দ করে।

প্রচুর উদ্বৃত্ত

এ যাবৎ কোম্পানীর মোট ৬টি হিসাব নিকাশ হইয়াছে এবং প্রত্যেক বারেই কোম্পানীর টাকা প্রচুর উদ্বৃত্ত হইয়াছে। বিগত ১৯২৬ সনে যে বৈবাৎসরিক হিসাব হইয়াছে তাহাতে কোম্পানী ৩,২৫,৩২৮ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া কোম্পানী কোনদিন লোকসান খায় নাই, ইহার এই একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় কোম্পানীর পরিচালকগণ কতদূর দক্ষতা এবং মিতব্যয়িতার সহিত ইহার পরিচালনা-কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছেন।

ডিভিডেণ্ড ও বোনাস্

কোম্পানী প্রথম হইতেই অংশীদারদের শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং গত তিন বৎসরে (১৯২৪-২৬ সন) ইহা উঠিয়া শতকরা ১০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ফলে কোম্পানীর অংশ এখন বাজারে দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক হিসাবের বৎসরে কোম্পানী বীমাকারীদের রীতিমত বোনাস্ দিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। গত বারের হিসাব নিকাশেই কোম্পানী সব চেয়ে বেশী বোনাস্ দিয়াছেন। লাইফ (আজীবন) পলিসিতে হাজার করা ২২৷০ সাড়ে বাইশ টাকা এবং এণ্ডাউমেণ্ট (নির্দ্দিষ্ট জীবন বর্ষব্যাপী) পলিসিতে হাজার করা ১৮৲ আঠার টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। দেশী কোম্পানীর মধ্যে এই ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কোম্পানীই সর্ব্ব প্রথম এত অল্প দিনে (মাত্র ১৩ বৎসরে) এত বেশী বোনাস্ দিতে সমর্থ হইয়াছে।

আর্থিক অবস্থা

আবার অর্থের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও এ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খুবই পাকা। কোম্পানীর ব্যয় খুবই কম অথচ জমা টাকাও ভারতীয় অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা অনেক বেশী। মোট দেনার শতকরা ৩২ টাকা হিসাবে জমার খাতে রাখা হয়।

দাবীর টাকা চুক্তি

এ কোম্পানীর সব চেয়ে বড় বিষয় হইতেছে দাবীর টাকা অতি সত্বর চুকাইয়া দেওয়া হয়। গত চারি বৎসরে কোম্পানীর সিন্ধুপ্রদেশের চারিটি দাবীতে মোট ১৮,০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা এত সত্বর চুকাইয়া দেওয়া হয় যে পাওনাদারেরা ইহাতে কোন বেগ পাইতে হয় নাই ঠিক যথাসময়ে দাবীর টাকা পাইয়া তাহারা সন্তুষ্টই হইয়া গিয়াছে। এমন কি খুসী হইয়া কোম্পানীকে প্রশংসাপত্র পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে।

এই বিষয়টী পাঠের পর মিঃ হার আস্তরিক এই কোম্পানীর দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যাহাতে এই দেশী কোম্পানীটি দেশী লোকের পূর্ণ সাহায্য পায় সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলেন।

ভারতীয় কাপড়ের কলে ব্যবহৃত সুতা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলের পরিচালকদিগের নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কলে বিদেশী সুতা ব্যবহার করেন কিনা? যে কয়েকটী কলের পরিচালক যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। টাটা মিল (বোম্বে হাউস, ফোর্ট)—দেশী। কেবলমাত্র স্বল্প পরিমাণ বিদেশী কৃত্রিম রেশম ব্যবহৃত হয়। ২। স্বদেশী মিলস কোম্পানী লিঃ, বোম্বে হাউস, ফোর্ট—পূর্ব্বোক্ত মিলের ন্যায়। ৩। দি বাগেরহাট কো-অপারেটীভ উইভিং, বাগেরহাট, খুলনা—বিদেশী। ৪। এম্প্রেস মিলস (নাগপুর)—বিদেশী (অত্যল্প পরিমাণে কৃত্রিম রেশম ও মিশরের সূক্ষ্ম সুতাও ব্যবহৃত হয়, ৫। দি আলাহ্ ভারজী মিল (সানমিল রোড, লোয়ার পারেল, বোম্বাই)—বিদেশী। ৬। মাণিকজী পেটিট মিলস (টারডেও, বোম্বাই)—দেশী। ৭। দি জুবিলী মিলস লিঃ, (সাইমুনী, বোম্বাই)—দেশী। ৮। দি জামসেদ মিলস (কারণ্ডসন রোড, লোয়ার পারেল, বোম্বাই)—বিদেশী। ৯। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ (১৮, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা)—দেশী। ১০। পোড়বন্দর উইভিং ওয়ার্কস (পোড়বন্দর)—বিদেশী। জাপানী রেশমের সুতা। ১১। দি ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া স্পিনিং (চিঞ্চপুগলী আলাহ্কী ম্যাহুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—বিদেশী জাপানী সুতা। ১২। দি আকোলা কটনমিলস কোং লিঃ, (আকোলা—বেরার)—দেশী। ১৩। কেশরাম কটন মিলস কোং লিঃ, (১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা) দেশী। ১৪। দি নিউ বরোদা মিলস কোং লিঃ (সয় গেট, বরোদা)—দেশী। ১৫। জীয়াজীরাও কটন মিলস লিঃ (গোয়ালিয়র) —দেশী। ১৬। দি সরস্বতী স্পিনিং এণ্ড ম্যাহুফাকচারিং

কোং লিঃ (উমরাদবাগ, রোড)—বিদেশী। জাপানী সুতা। ১৭। দি মফিলাল বীরাভাই স্পিনিং, উইভিং এণ্ড ম্যানুফাকচারিং কোং লিঃ (প্রেমগেটের বাইরে, আমেদাবাদ) —দেশী। ১৮। দি নন্দলাল ভাহুকী মিলস লিঃ (ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ)—দেশী। ১৯। সোয়া সুর্য্য নারায়ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস। পাওাল গেঞ্জ, পূর্ব্ব খোয়াবরী জেলা —দেশী। ২০। দি দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস লিঃ (দিল্লী)—বিদেশী, পাড়ের জন্য বিদেশী সুতা ব্যবহৃত হয়। ২১। সত্যনারায়ণ রামপ্রসাদ মিলস কোং লিঃ (আকোলা, বেরার)—বিদেশী মিশর ও ইংলণ্ডের সুতা। ২২। শ্রীলক্ষ্মী মিলস (সাঙ্গলী) এস, এম, সি—বিদেশী। ২৩। দি মাণিকলাল বীরালাল স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফাকচারিং কোং লিঃ (সারঙ্গপুর, আমেদাবাদ)—বিদেশী জাপানী সুতা। ২৪। দি মধোজী ধরমজী (কোরাস রোড, বোম্বাই)—বিদেশী। ইটালী, ফ্রান্স, ও ইংলণ্ডের কৃত্রিম রেশমসুতা ব্যবহৃত হয়। ২৫। দি ভারত টেক্সটাইল কোং লিঃ পি বি—৩০ আমেদাবাদ,—দেশী। ২৬। দি আমেদাবাদ নিউ ষ্টাণ্ডার্ড মিলস কোং লিঃ পোঃ রেলওয়ে পুরা আমেদাবাদ—বিদেশী, বিলাতী ও জাপানী সুতা। ২৭। দি গার্ডেন উইভিং ফাক্টরী (বাদপুরা ঘোষ পাল, ওয়াদী সুরাট)—বিদেশী। জাপানী ও ইটালীর সুতা। ২৮। দি সীতারাম স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ (ত্রিচুর কোচিনরাজ্য) এস, আই—দেশী। ২৯। দি সিটি অব আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফাকচারিং কোং লিঃ (কাঁকাড়িয়া রোড আমেদাবাদ) দেশী। ৩০। আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ (শাহপুর আমেদাবাদ)—দেশী। ৩১। দি রোশন জাহাঙ্গীর তকিল মিলস লিঃ—দিল্লীগেটের বাইরে, (আমেদাবাদ)—জাপানী ও বিলাতী সুতা। ৩২। অন্নারাজা মিলস কোং লিঃ (পাথরা রোড —বরোদা)—দেশী। ৩৩। মুরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ (সোপারীবাং রোড, পারেল বোম্বাই)—দেশী। ৩৪। দি রোচ কাইন কাউন্টস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ (আগা খাঁ বিল্ডিং ছগালি ষ্ট্রীট (কোর্ট, বোম্বাই)—দেশী। ৩৫। দি চাকেশ্বরী মিলস লিঃ পোঃ চাকেশ্বরী মিলস, জয়রামপুর—দেশী। ৩৬। দি গোবর্দ্ধন স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফাকচারিং কোং লিঃ (রেলওয়ে পুরা পোঃ—নারোদা রোড, আমেদাবাদ)—দেশী। ৩৭। দি আমেদাবাদ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিলস কোং লিঃ (সোমতীপুর, আমেদাবাদ)—বিদেশী জাপানী সুতা। ৩৮। দি প্রেম স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ (উজ্জয়িনী —মুরাম জেলা)—দেশী। ৩৯। দি নিউ রাজপুর মিলস কোং লিঃ (রেলওয়ে পুরা—পোঃ, আমেদাবাদ—বিদেশী—বিলাতী সুতা। ৪০। দি মীনলোদ পালিত মিলস—(কালাচকী পারেল, বোম্বাই—দেশী। ৪১। আর, বি বংশীলাল আকোর চাঁদ (চিমান ঘাট) স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস, ওয়ার্দ্ধা জিলা, মধ্যপ্রদেশ—দেশী। ৪২। বোম্বাই মিলস কোং লিঃ—বোম্বাই—দেশী। ৪৩। দি গুজরাট কটনমিলস কোং লিঃ (নারোদা রোড আমেদাবাদ)—দেশী। কোন কোন সময় পাড়ের জন্য বিদেশী সুতার ব্যবহার হয়। ৪৪। আর, এস রেলক চাঁদ মেহতা স্পিনিং মিলস। (চিমান ঘাট) ওয়ার্দ্ধা জিলা—বিদেশী (আবশ্যকমত)। ৪৫। দি নিউ মাণিক চাঁদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ (রেলওয়ে পুরা) আমেদাবাদ—প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। ৪৭। দি খালা স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস—সবজী মুন্ডী (দিল্লী)—দেশী। ৪৮। ভিক্টোরিয়া মিলস লিঃ (গামদুর রোড)—বিদেশী, জাপানী সুতা। ৪৯। দি মোরাদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস কোং লিঃ মোরাদাবাদ—দেশী। ৫০। দি আমেদাবাদ জুবিলী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফাকচারিং কোং লিঃ (রেলওয়ে পুরা—আমেদাবাদ)—দেশী। ৫১। দি রায়পুর ম্যানুফাকচারিং কোং লিঃ আমেদাবাদ—দেশী। ৫২। দি ষ্টেন্ডেল মিলস নাগপুর লিঃ (ওমরার রোড—নাগপুর সিটি)—দেশী। ৫৩। আর্য্যোদয় স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ—আমেদাবাদ—দেশী। ৫৪। দি কানপুর কটন মিলস কোং—কানপুর—দেশী। ৫৫ নং দি আলেপ্পি মিলস লিঃ (আমেদাবাদে)—দেশী। ৫৬। দি আমেদাবাদ ম্যানুফাকচারিং এণ্ড কালিকো প্রিন্টিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ—দেশী।

(আগামী)

বিলাতের কৃষিকার্য্যে সরকারী সাহায্য

বিলাতে কৃষিকার্য্যে ঋণদান সম্পর্কীয় আইন রাজার হুকুমে ওরা আগষ্ট তারিখে পাশ হইয়া গিয়াছে। ১লা অক্টোবর হইতে এই আইন অনুসারে কার্য্য চলিবার কথা। এই ঋণ আইনের মোদাবিদাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম অংশ ৩ অধ্যায়ে বিভক্ত, আর এই অংশটী লম্বা মিয়াদে কর্জ্জদাদন সম্বন্ধে। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি কর্জ্জদানের কোম্পানী আছে। প্রথম অধ্যায়টী এইরূপ ঋণদানের কোম্পানী-গুলিকে টাকা ধারন দেওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের ক্ষমতা ও অধিকার লইয়া লিখিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রহিয়াছে এইরূপ কোম্পানীর গঠন-বিবরণ ও ইহার ব্যবস্থাপত্র ও ব্যবসায় সর্ত্তগুলির স্বরূপ। তৃতীয় অধ্যায় অনুসারে কোম্পানী নিজের ডিবেঞ্চারগুলি সিকিউরিটির (জামিন) ভিতর ধার্য্য করিয়া লইতে পারে। এইরূপ সিকিউরিটির ভিতর কোন ট্রাষ্টি তার ট্রাষ্ট ফাণ্ডও ঢুকাইয়া দিতে পারে। ৪র্থ অধ্যায়টী বাড়তি মজুত টাকার প্রয়োগ সম্বন্ধে।

এই কর্জ্জদাদন আইনের ২য় অংশ অল্পদিনের মিয়াদে কর্জ্জদাদন সম্বন্ধে। ইহার মোদাবিদা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) এই আইন অনুসারে কৃষক কর্জ্জগ্রহণের জন্য তার জমিজমা, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি সমস্তই ব্যাঙ্কের নিকট জামিন স্বরূপ বা বন্ধক রাখিতে পারিবে। যদি কাহাকে ঋণমুক্ত রাখিয়াও তাহাকে টাকা দেওয়া হয় তাহা হইলেও এই আইন খাটিবে, এবং সুদ, কমিশন ইত্যাদি সমস্তই ঐ বন্ধকী সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

কি কি সম্পত্তির উপর ঋণ দেওয়া যাইতে পারে ?

কৃষিকার্য্যে ধার দেওয়া টাকার সুদের নির্দ্দিষ্ট হারও থাকিতে পারে, এই হার পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে; আবার নির্দ্দিষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল এক সঙ্গে এই দুই ব্যবস্থাও থাকিতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট সুদে যে সম্পত্তি বন্ধক থাকিবে, তাহা কৃষি কার্য্যের প্রয়োজনেই হউক বা জমিজমাই হউক সমস্তই ঋণ গ্রহণের সর্ত্তগুলির মধ্যে খোলাসা করিয়া লিখা থাকিবে। তবে এই বন্ধকী সম্পত্তির ভিতর (ক) গৃহপালিত জানোয়ার-গুলির ঋণ গ্রহণের পর যে সকল বাচ্চা হইবে সেগুলিকে ধরা হইবে এবং (খ) কৃষিজাত গাছপালার মধ্যে যে যে গাছের কথা ঋণের সর্ত্তের মধ্যে লিখা থাকিবে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই গাছের স্থানে যদি অন্য কোন গাছ লাগান হয় সেগুলিও ধরা হইবে।

কৃষকগণ মাঝে মাঝে যেসকল কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি বা কৃসম্পত্তির মালিক হয়, সে সমস্তের উপরেও যাহাতে টাকা আদায়ের অধিকার জন্মে এই জন্য ব্যাঙ্কে কিস্তি অনুসারে দেওয়ার ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছে। তবে ঋণগ্রহণের সর্ত্তে কোনরূপ সম্পত্তির উপর যে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা থাকিবে তাহা সমস্তই বিবৃত হইবে।

ঋণদানের প্রণালী

বিলাতেই এই নূতন আইন অনুসারে কৃষিকার্য্যে ঋণ দুই উপায়ে পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ, যে টাকাটা ঋণ লওয়া হইবে তাহা একেবারেই পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, টাকাটা কিস্তিতে কিস্তিতে লইবার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু

প্রত্যেক কিস্তিতে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী কখনই পাওয়া যাইবে না। সমস্ত টাকাটা লইবার পরও অধমর্ণের আবার নূতন করিয়া টাকা ধার লইবার অধিকার থাকিবে।

কৃষিকার্য্যের অন্য ঋণ দান এরূপভাবে সম্পাদিত হইবে যাহাতে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়।

কৃষিকার্য্যের জন্য এই নূতন আইনে, কৃষক, ব্যাঙ্ক, কৃষি কার্য্যের মূলধন ও কৃষি বিষয়ক ধন সম্পত্তি বলিলে কি কি বুঝা উচিত, অর্থাৎ এই সকলের প্রকৃত স্বরূপ কি সে সমস্তই খোলাসা করিয়া বিবৃত হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট কৃষি-ঋণের জন্য, যতদিন পর্য্যন্ত না ঋণ শোধ হয় ততদিন ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি থাকিবে।

যথা :—ঋণগ্রহণের দলিলে যে সমস্ত সর্ত্ত রহিবে তাহার নড়চড় হইলে ব্যাঙ্কের খাতকের সম্পত্তি ক্রোকের অধিকার জন্মিবে।

খাতকের নিকট টাকা আদায়ের ব্যবস্থা

উপরি উক্ত উপায়ে সম্পত্তি ক্রোক করিবার পর ৫ দিন বা দলিলে যদি তার চেয়ে কম দিন লিখা থাকে তবে সেই কয় দিন পরে ব্যাঙ্কের ঐ ক্রোকে আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার জন্মিবে। ব্যাঙ্ক ঐ সম্পত্তি নীলামেও বিক্রয় করিতে পারে বা কাহারও নিকট অগ্রকাটেও বিক্রয় করিতে পারে এবং মূল্য একবারেও লইতে পারে বা ইচ্ছামত কিস্তিতে কিস্তিতেও লইতে পারে।

ঋণ আদায়ের জন্য এইরূপে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবার পর প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে ব্যাঙ্ক আপন পাওনাটা বুঝিয়া লইবে, সম্পত্তি ক্রোক, নীলাম ও বিক্রয় করিবার জন্য যে খরচা হয় সেটাও ধরিয়া লইবে। এই সমস্ত পাওনা বাদ দিয়া যদি কিছু থাকে, তবে সেটা খাতককে ফিরাইয়া দিতে ব্যাঙ্ক বাধ্য থাকিবে।

নির্দ্দিষ্ট ও একমুশ্তীন ঋণ গ্রহণের অন্যূন পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের নিকট খাতক জন্য নিম্নলিখিত রূপে বাধ্য থাকিবে।

যথা :—দলিলে যে যে সম্পত্তি বন্ধক রাখার উল্লেখ থাকিবে সেই সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিলে বা তাহা হইতে কোন উপায়ে অর্থ যোগাড় করিলে কৃষক সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে বাধ্য থাকিবে। তবে যদি কৃষক অন্য উপায়ে টাকা দিবার ব্যবস্থা করে বা ব্যাঙ্ক অন্য কোন রূপ ব্যবস্থার অনুমোদন করে, তবে এই নিয়ম খাটিবে না। যদি অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা বা চুক্তি না থাকে তবে ব্যাঙ্ক এইরূপে দেয় টাকা হইতে কৃষকের ব্যাঙ্কের দেনা শোধের ব্যবস্থা করিবে।

ব্যাঙ্কের দলিলে যে যে সম্পত্তি বন্ধকের উল্লেখ থাকিবে সেই সম্পত্তির উপর যদি বীমা করার দরুণ অর্থ মিলে, কিংবা কৃষিকার্য্যের সহায়ক জন্তু মরার জন্য, ১৮৯৪ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী পশু-রোগ-সম্বন্ধীয় আইনের বলে, বা শস্যাদি নষ্ট হওয়ার জন্য ১৮৭৭ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী শস্যের বিষয়ক পতঙ্গ ও ব্যাধি বিষয়ক আইনের বলে ক্ষতিপূরণ বাবদ যদি কোন অর্থ কৃষক পায়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট জমা দিতে কৃষক বাধ্য থাকিবে। মৃত পশুর বা যে ক্ষেতের শস্য নষ্ট হইয়াছে সেই ক্ষেত্রের বিষয় সমস্তই অবশ্য দলিলে উল্লেখ করা থাকিবে। যদি অন্য উপায়ে ঋণ-শোধের ব্যবস্থা করা হয় বা ব্যাঙ্ক অন্য কোন ব্যবস্থাতে রাজী থাকে, তবে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। ব্যাঙ্ক যদি অন্য কোনরূপ ব্যবস্থায় রাজী না হয়, তবে এইরূপে প্রাপ্ত টাকা সমস্তই ব্যাঙ্কের নিকট কৃষকের দেনা শোধের খাতে জমা হইবে।

কৃষকের বিক্রয়-ক্ষমতা

ইতিপূর্ব্বে যেসকল বাধা-বাধকতার বিষয় বলা হইল সেগুলি মানিয়া চলিলে নির্দ্দিষ্ট ও একবারে প্রাপ্ত কৃষিঋণের জন্য বন্ধকী সম্পত্তি কৃষক ইচ্ছা করিলে বিক্রয় করিতেও পারিবে। এইরূপ সম্পত্তি ক্রয়কারীর বা, নীলামে বিক্রয় কালে নিলামকারীর পক্ষে, কৃষক ব্যাঙ্কের নিকট আপন বাধ্যবাধকতা সকল মানিয়া চলিতেছে কিনা তাহা খতাইয়া না দেখিলেও চলিবে। ক্রেতা বা নীলামকারীর কৃষকের ব্যাঙ্ক-ঋণ সম্বন্ধে জানা থাকে তাহাতে ক্ষতি নাই।

সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ যদি ব্যাঙ্কের পাওনা

হয়, আর তাহা যদি ব্যাঙ্ককে না দিয়া অন্য কোন লোককে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সেই লোকের নিকট হইতে অর্থ ফিরাইয়া পাইবে না। তবে যদি ব্যাঙ্ক প্রমাণ করিতে পারে যে বিক্রেতা কৃষক ব্যাঙ্কের নিকট তার বাধা-বাধকতা অমান্য করিয়া ঐরূপ করিয়াছে, তাহা হইলে ফিরাইয়া পাইবে। কিন্তু কৃষকের ঋণের বিষয় ক্রেতার জানা আছে, কেবলমাত্র এই ধারণার বলেই ব্যাঙ্কের আপন পাওনা ফিরাইয়া লইবার অধিকার জন্মিবে না।

ব্যাঙ্ক কিস্তি করিয়া যে ঋণদানের ব্যবস্থা করে তাহা কোন কোম্পানী কর্ত্তৃক আইনসঙ্গত উপায়ে ডেবেঞ্চার করা ডিবেঞ্চারের মত ধরিতে হইবে। তবে তাহার কতকগুলি নিয়ম আছে, যথা :—

কিস্তি অনুসারে ঋণের ব্যবস্থা এককালীন নির্দ্দিষ্ট ঋণ-রূপেও গণ্য হইতে পারে। এখন কি কি উপায়ে নির্দ্দিষ্ট ঋণে পরিণত হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) কৃষক যদি দেউলিয়া হইয়া যায়।

(২) কৃষক যদি মরিয়া যায়।

(৩) বন্ধকী সম্পত্তি যদি এজমালী হয়, আর কৃষক যদি ঐ এজমালী সম্পত্তির অংশীদার আর না থাকে।

(৪) এমন যদি কোন ঘটনা ঘটে যার জন্য দলিল অনুযায়ী কোন সর্ত্তের বলে ব্যাঙ্ক এই মর্ম্মে কৃষকের উপর নোটিশ জারি করে।

ঋণ যতদিন পর্য্যন্ত কিস্তি অনুসারে লইবার ব্যবস্থা ততদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের নিকট কৃষকের বাধা-বাধকতা থাকিবে ঠিক নির্দ্দিষ্ট ঋণেরই মত। অর্থাৎ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, বা উহার উপর বীমা করার জন্য টাকা পয়সা মিলিলে বা ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন অর্থ পাইলে সমস্তই ব্যাঙ্কের নিকট আপন দেনা-শোধের জন্য জমা দিতে কৃষক বাধ্য থাকিবে, তবে কৃষিকার্য্যের হালহাতিয়ার বা অন্য ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য উপরি উক্ত উপায়ে প্রাপ্ত অর্থ খরচ করিয়া ফেলিলে কৃষকের দোষ হইবে না। কারণ নূতন হাল হাতিয়ার বা অন্য যাহাই ঐ অর্থ দিয়া কেনা হউক সমস্তই বন্ধকী সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে।

ঋণ জিনিষ বিক্রয়ের বিল নহে

১৮৭৮-১৮৮২ সালের বিল্‌স্ অব্ সেল্ অ্যাক্ট (বিক্রয়-বিলের আইন) অনুসারে কেনা বেচার বিল দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায় এই কৃষি-ঋণও সেইরূপ কার্য্যকর হইবে। তবে এই ঋণ ঠিক বিক্রয় বিলের মত গণ্য হইবে না।

বন্ধকী সম্পত্তির উপর ব্যাঙ্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বত্ব

এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর কৃষক যদি কোন মহাজনের নিকট তাহার জমি বন্ধক দিয়া থাকে, এবং ঋণ শোধের জন্য জমির উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া দিবার কথা থাকে; আবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কৃষক কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য গভর্মেণ্ট অনুমোদিত ব্যাঙ্কের নিকট ঐ জমি বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং উৎপন্ন ফসল বেচিয়া ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ জমির ফসলের উপর, অন্য মহাজনের চেয়ে ব্যাঙ্কের অধিকার সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। মহাজনের নিকট কৃষকের ঋণের সনদ আগে হউক বা পরে হউক, বা জমি সেই মহাজনেরই কাছে থাক্, সমস্তই অগ্রাহ্য হইবে।

দুনিয়ার জাহাজী টনেজ

বাণিজ্য বিষয়ে কোন্ দেশের জাহাজের টনেজ কতখানি তাহার একটা হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, এ বিষয়ে ব্রিটেনের স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহার অধিকারে বাণিজ্য পোতসমূহের টনেজের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ। ব্রিটেনের নীচেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। ইহার টনেজের পরিমাণ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭০ হাজার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীচের স্থান জাপান অধিকার করিলেও ইহার জাহাজের টনেজের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রায় ১ কোটি টন কম। জাপানের মোট জাহাজের শক্তি প্রায় ৫০ লক্ষ টন।

তার পরেই ইতালি, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি, পরস্পর কাছা-কাছি স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রত্যেকেরই বাণিজ্য-জাহাজের শক্তি প্রায় ৩০ লক্ষ টনের কাছাকাছি।

নরওয়ে ও হল্যাণ্ডের জাহাজের টনেজ ২০ লক্ষ টনের

কিছু উপরে হইবে। তার পর সুইডেন, স্পেন, ক্যানাডা, ডেন্‌মার্ক এবং গ্রীস প্রত্যেকের প্রায় ১০ লক্ষ টন শক্তি-সম্পন্ন জাহাজ ব্যবসায় খাটিতেছে।

এইখানে একটা জিনিষ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে যে, ইংরেজ রাজ্যের দেশসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে ক্যানাডা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তার পরেই অষ্ট্রেলিয়ার অধিকারে ৮ লক্ষ টন শক্তিসম্পন্ন জাহাজ থাকায় এদেশ ইংরেজ রাজ্যের তৃতীয় ও সমগ্র দুনিয়ার দেশসমূহের মধ্যে চতুর্দ্দশ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্রাজিল, বেলজিয়াম, রুশিয়া এবং চীন, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ পর্য্যন্ত টনেজের জাহাজ ব্যবসায় খাটিতেছে।

যে পর্ত্তুগালের একদিন সাগরে খুব প্রতিপত্তি ছিল, আজ তাহার মাত্র ১,৫০,০০০ টনেজের জাহাজ বাণিজ্যে খাটিতেছে। তার পরেই নূতন দেশ যুগোস্লাভিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্থান; ইহাদের প্রত্যেকের একত্রিয়ারে প্রায় ২ লক্ষ টনেজের জাহাজ বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে।

এইবার ভারতবর্ষের স্থান। উপরের অতগুলা দেশ ভারতের উপরে থাকিলেও, ২ লক্ষের নীচে যে যে দেশের জাহাজের টনেজের পরিমাণ ভারত তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এইটুকুই ভারতের সান্ত্বনা।

ভারতের কেবল পরেই চিলি, তুরস্ক ও পোল্যাণ্ডের স্থান। কারণ চিলি এবং তুরস্ক তাহাদের জাহাজগুলা নিজ নিজ দেশের উপকূল বাণিজ্যেই বেশী খাটায়। আর পোল্যাণ্ড অল্প কয়েক দিন হইল, তাহাদের দেশীয় বাণিজ্য-জাহাজের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। নতুবা ভারত এতদিন দুনিয়ার সকল দেশের নীচে পড়িয়া যাইত, বা এতদিন গিয়াও থাকিবে।

আমেরিকার শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন

আর্কানসাস, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা নামক ৫টি রাষ্ট্র ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র শ্রমজীবীদের জন্য কোন না কোন ক্ষতিপূরণ আইন বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল আইনানুযায়ী আমেরিকার সকল প্রকার শিল্প-কারখানার মালিকগণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। আলাবামা, আলাস্কা, লুসিয়ানা, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নিউ মেক্সিকো, টেক্সেসি এবং ওয়াইপমিং প্রভৃতি রাষ্ট্রে আদালত কর্ত্তৃক ঐ আইন প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রে ক্ষতিপূরণ আইন কাজে খাটাইবার জন্য একটি করিয়া বিশেষ সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে।

১৯১৪ সনে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণের চেষ্টায় ইণ্টারস্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাক্সিডেণ্ট বোর্ডস এণ্ড কমিশনস নামক একটি আন্তর্জ্জাতিক শিল্প দুর্ঘটনা তদন্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) শিল্প-দুর্ঘটনা কি ভাবে হ্রাস করা যায়, (২) আহত শ্রমিক ও কারিগরের ডাক্তারী ঔষধপত্র, হাসপাতালে চিকিৎসাবিধান করা, (৩) পুনরায় কাজের কাজে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া, (৪) শিল্প দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ও ব্যাধি বীমার হার নির্দ্ধারণ (৫) ক্ষতিপূরণ আইন প্রচলন পদ্ধতি, (৬) শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের বিস্তৃতি ও উন্নতি-সাধন (৮) শিল্প-দুর্ঘটনা ও শ্রমিকগণের ব্যাধি পীড়ার তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি উল্লিখিত আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ম্মাবলী।

ইহার সভ্যগণকে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনকানুন বিষয়ক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা রাখা ঐ অ্যাসোসিয়েশানের একটী কর্ত্তব্য। ইহার বাৎসরিক সম্মেলনে ঐ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা ও সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

অ্যাসোসিয়েশানটির বয়স বর্ত্তমানে সবে বৎসর। সম্প্রতি ইহার পঞ্চদশ বার্ষিকী নিউয়েরেসির পেটার্সন সহরে সম্পন্ন হইয়াছে।

শিল্প-দুর্ঘটনা কমাইবার প্রচেষ্টা

এই অ্যাসোসিয়েশানের তরফ হইতে শিল্প-দুর্ঘটনা কমাইবার প্রচুর চেষ্টা হইয়াছে। প্রত্যেক বার্ষিক সম্মেলনে কারিগরী তত্ত্ব, যেমন শিল্প-যন্ত্রপাতি হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করিয়া থাকেন ও ঐ সম্বন্ধে সারগর্ভ রচনা পাঠ করিয়া থাকেন।

শিল্প-দুর্ঘটনা কমাইতে হইলে ফ্যাক্টরীর কোন কোন শিল্প বিভাগে দুর্ঘটনা বেশী হয় ও ঐ সকল দুর্ঘটনা কেন হয় ইহা অগ্রে জানা আবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রের লেবার্ড দপ্তর ঐ সকল শিল্প-দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ ষ্ট্যাটিসটিকস সংগ্রহের কাজে কয়েক বৎসর হইতে নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্তর্গত শিল্প-কারখানার দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিসটিক্সের আফিসে খবর আসে। তাঁহারা ঐগুলি একত্র করিয়া তাঁহাদের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ক্ষতিপূরণের বিভিন্ন উপায়

একই শিল্প-দুর্ঘটনার জন্য হয়ত একই বয়সের লোকের বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা দরকার হয়। একজন ইস্পাত কারখানার শ্রমিক যদি কারখানার কোন দুর্ঘটনার জন্য তাহার পায়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় ও সেজন্য তাহার একখানি পা ছেদ করা হয়, তাহা হইলে সে ইস্পাত কারখানার কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে। তাহাকে জীবিকার্জ্জনের জন্য অন্য ব্যবসা চুঁড়িতে হয় ও সেজন্য পুনরায় শিক্ষানবীশি করিতে হয়। অন্যদিকে একজন টাইপিষ্ট তাহার একখানি পা হারাইলে তাহার টাইপ করার কাজে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এই জন্য বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিগরদের দৈব দুর্ঘটনার জন্য বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা দরকার। ক্ষতি পূরণ দিবার সময় আহত ব্যক্তি কি ধরণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কত বয়স ও কিরূপ ব্যবসায় সে নিযুক্ত ছিল এগুলি লক্ষ্য করা হয়।

আমেরিকার বিধবা ভাতা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্ব্বত্র শিল্প কারখানার দুর্ঘটনার জন্য কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার পোষ্যদিগকে ভাতা দিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক ক্ষেত্রের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সপ্তাহের জন্য ঐ ক্ষতিপূরণ ভাতা দেওয়া হয়।

কতকগুলি রাষ্ট্রে মৃত শ্রমিকের বিধবাকে তাহার পুনর্ব্বিবাহ বা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় পুনরায় বিবাহ করিলেও তাহারা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কিছু কিছু করিয়া ভাতা পাইবার অধিকারী থাকে।

সম্প্রতি আমেরিকান শিল্প-দুর্ঘটনার অ্যাসোসিয়েশানের তরফ হইতে ভাতাপ্রাপ্ত ১২,০০০ বিধবার অবস্থা তদন্ত করা হইয়াছে। অ্যাসোসিয়েশান মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে আরও অধিকসংখ্যক বিধবাকে ভাতা দিতে হইবে। শ্রমিকগণের ব্যাধি সম্বন্ধে ঐ প্রতিষ্ঠান এখনও সম্পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

আমেরিকার শ্রমিক দপ্তর

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিসটিক্স কতকগুলি শ্রমবিষয়ক লেকচার প্রকাশিত করিয়াছেন। সরকারের শ্রমিক দপ্তরের কাজ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা জানিতে হইলে এগুলি পাঠ করা দরকার। নিউ ইয়র্কের লেবার দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ঐ লেকচারগুলি প্রস্তুত করা হয় ও বিগত ১৯২৮ সনে গ্রীষ্মাবকাশের সময় রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ অব্ দি সিটি অব নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বক্তৃতাগুলি পাঠ করা হয়।

আমেরিকার সরকারী লেবার দপ্তর সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ষ্ট্যাটিসটিক্স কমিশনার মহোদয় বলেন :—

লেবার ষ্ট্যাটিসটিক্স বিউরোগুলিকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, সরকারের অন্য কোন বিভাগে ওরূপ খাটুনি নাই। তবুও রাষ্ট্রে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগটি সব চাইতে বেশী অবহেলিত ও ইহার কাজ কারবারের প্রতি সাধারণে বেশী উদাসীন। অর্থাভাবের জন্যই এইসকল লেবার বিউরো সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে ও প্রশংসা অর্জ্জনে কৃতকার্য্য হয় নাই। কিন্তু কেহ সাধারণ আর্থিক সাহিত্য ও বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্য পুস্তক ও মাসিক পত্রিকাদি উল্টাইলে দেখিতে পাইবে যে, ঐগুলির অধিকাংশ তথ্য ও মাল মসলা এই সকল লেবার বিউরোর কষ্টোপার্জ্জিত ষ্ট্যাটিসটিক্স হইতে সংগৃহীত।

ইয়োরোপে মোটর যুদ্ধের সম্ভাবনা

ফোর্ড ও জেনারেল্ মোটর্স কোম্পানীর মধ্যে ইয়োরোপের মোটরের বাজার অধিকার করিবার জন্য প্রতিযোগিতা চলিতেছে। জেনারেল্ মোটর্স কোং ইতিমধ্যে জার্ম্মাণিতে 'ওপেল ওয়ার্কস' নামে একটা কারখানা খুলিয়াছে। ফোর্ড কোম্পানীও ইতিমধ্যে বিলাতে একটী কারখানা খুলিয়াছে—তাহাতে বৎসরে ২ লাখ গাড়ী উৎপন্ন হয়; ফ্রান্সেও একটী নূতন শাখা কোম্পানী খুলিয়াছে; জার্ম্মাণিতেও একটী প্রকাণ্ড কারখানা খোলা হইয়াছে। দুইটী কোম্পানীই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে নিজ নিজ গাড়ী ইয়োরোপে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চলিত হয়। জেনারেল্ মোটর্সের প্রেসিডেন্ট অ্যালফ্রেড স্লোন ইতিমধ্যে বিলাতে গিয়াছেন এবং বিলাতের অনেক ধনী লোককে হাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেনরি ফোর্ডও ইয়োরোপের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে যে, ইয়োরোপে বেশ জবর একটা মোটর-যুদ্ধ চলিবে। শুনা যাইতেছে যে, প্রায় ১০০ কোটি পাউণ্ড লইয়া এই যুদ্ধ চলিবে।

দুইটী গভর্মেণ্টের জাহাজী ব্যবসা ত্যাগ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্মেণ্টের অনেকগুলা বাণিজ্য-জাহাজ আছে। যুক্তরাষ্ট্র গভর্মেণ্ট জাহাজী ব্যবসাতে নামিয়া অনেক লোকসান দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র গভর্মেণ্টের টাকার জোর বেশী। সেই জন্য উহার সহিত টক্কর দিতে যাইয়া অন্যান্য জাতির জাহাজের ব্যাপারীদের অনেক লোকসান সহিতে হইয়াছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট হুভার ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র গভর্মেণ্ট জাহাজী ব্যবসাতে অন্যান্য জাতির সহিত টক্কর দেওয়া পছন্দ করেন না। সুতরাং গভর্মেণ্ট জাহাজী ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন। গভর্মেণ্টের বাণিজ্য জাহাজগুলা ক্রমে ক্রমে বেচিয়া দেওয়া হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার গভর্মেণ্টও জাহাজী ব্যবসাতে লিপ্ত ছিল এবং সম্প্রতি তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। জগতের মোট বাণিজ্য-জাহাজের শতকরা ৫০ ভাগ ইংরেজের। সুতরাং, এই ২টা গভর্মেণ্ট জাহাজী ব্যবসা হইতে হাত গুটানোতে ইংরেজ জাতি যে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

বিলাতের বেকার-সমস্যার দাওয়াই

বিলাতের নানা শিল্পে অনেকগুলা লোক বেকার হইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের কাজ যোগাড় করিবার উপায় কি? বিলাতের তিনটী রাজনৈতিক দল তিনটী দাওয়াই প্রস্তাব করিয়াছেন। রক্ষণশীল দলের দাওয়াই—সংরক্ষণ-নীতির সাহায্যে দেশের শিল্পগুলাকে বাঁচাইয়া তোলা। তাঁহাদের মতে শিল্পগুলা এইভাবে বাঁচিয়া উঠিলে বেকারদের কাজ জুটিবে। মজুর-দলের দাওয়াই—দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলা ব্যক্তি বা কোম্পানী বিশেষের হাতে না রাখিয়া গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক চালানো; গভর্মেণ্টের হাতে আসিলে শিল্প-বাণিজ্যগুলা সকল দিক্ দেখিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত চালানো সম্ভব হইবে, বেকারদের কাজ যোগানোও তখন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিবে। উন্নতি-শীল দলের হইয়া লয়েড জর্জ্জ একটী স্কীম দিয়াছেন—স্কীমটীর মূলকথা এই যে, বিলাতের সর্ব্বত্র নূতন নূতন রাস্তা করা হইবে এবং পুরাতন রাস্তাগুলাকে আরও ভাল ও চওড়া করা হইবে। এই রাস্তা-নির্ম্মাণের কাজে বেকারদের নিযুক্ত করা হইবে। লয়েড জর্জ্জ বলিতেছেন যে, এই উপায়টী অবলম্বন করা হইলে ১ বৎসরের মধ্যে বিলাতের বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব। লয়েড জর্জ্জের স্কীম বিলাতের সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যান্য দলের লোকেরা লয়েড জর্জ্জের উপর খুব চটিয়াছে এবং তাঁহার স্কীমটীর তীব্র সমালোচনা করিতেছে। বিখ্যাত ধনবিজ্ঞান-সেবী কেইন্‌স্ লয়েড জর্জ্জের মত সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলেন যে, স্কীমটীর সাহায্যে বিলাতের বেকার-সমস্যা সহজে বিদূরিত করা সম্ভব। স্কীমটী খুবই সহজ-সাধ্য এবং মোটেই জটিল নয়। তবুও যে কেন লোকে লয়েড জর্জ্জের কথায় বিশ্বাস করিতেছে না তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে দলের দাওয়াই অধিক-সংখ্যক ভোটারের পছন্দ হইবে, সেই দলই আগামী মে মাসের সাধারণ নির্ব্বাচনে জিতিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য

১৯২৮ সনের প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে যতটা সন্দেহ বা ভয় করা গিয়াছিল বৎসর শেষে সে ভয় কাটিয়া ব্যবসার অবস্থা বরং ভালই দেখা গিয়াছে এবং গত কয়েক মাস ধরিয়া এখানে ব্যবসা বাণিজ্য যেমন জোরের সহিত চলিতেছে, তাহাতে আগামী বৎসর অবস্থা যে আরও ফিরিয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক মাস ধরিয়া এমন জোরের সহিত ব্যবসা চলার পর আবার যে ইহার অবস্থা তালের দিকে দেখা যায় এমনটা বড় হয় না। ১৯২৭ সনের শেষে যতটা বেকার-সমস্যা দেখা গিয়াছিল বর্ত্তমানে তাহা নাই বলিলেও চলে এবং এমন কি মজুরির পরিমাণও বর্ত্তমানে এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, লোকের ক্রয়-শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে মালের কাটতিও খুব বেশী হইতেছে। মালের কাটতি বেশী হওয়ার ফল, কম কাটতি জিনিষের মূল্য ও ইহা হইতে পোষাইয়া লইতেছে। সমস্ত জায়গাতেই মাল এত কমিয়া যাইতেছে যে, ব্যবসার অবস্থা একটু ভালার দিকে গেলেই সমস্ত জমা মাল বিক্রেতা চালান না দিলে উপায় থাকে না।

চিনির বাজার

গত বৎসরের শেষে কিউবান চিনির মূল্য অনেক কমিয়া পাউণ্ড প্রতি ৩৭/৮ সেণ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এ দাম বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তারপর এ বৎসরের প্রথম হইতে নূতন চিনি আমদানি হইয়া দাম কমিয়া আবার পাউণ্ড প্রতি ২ সেণ্ট করিয়া বিক্রী হইয়াছে। চিনির এই দাম প্রায় আশানুরূপই কমিয়া গিয়াছে। তবে উৎপাদনকারীদের পক্ষে উপযুক্ত লাভ রাখিতে বাজারে যে দাম উঠার দরকার বর্ত্তমান বাজারের অবস্থায় তাহা খুব বেশী আশা করা যায় না। ১৯২৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রের মাথা পিছু চিনির খরচ ১০৩/৪ পাউণ্ড। এবং বৎসরে মোট ৫,৫৪২,৬৩৬ টন চিনি দেশে খরচ হয়। ১৯২৭ সনে মোট ৫,২৯৭,০৫০ টন চিনি খরচ হওয়ার তুলনায় ১৯২৮ সনে শতকরা ৪৯ টনের উপর খরচ হইয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানি কাঁচা চিনির উপর শুল্ক বাড়িয়া যাওয়ায়, কিউবান চিনির কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ ৪ জন লোক লইয়া একটা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি টারিফ কমিশনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের চিনির শুল্ক বাড়ান বিষয়ে আপত্তি জানাইবেন।

রবারের ব্যবসা

গত জানুয়ারী মাসে ৩৬,৮৪০ টন কাঁচা রবার যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হয়। ১৯২৮ সনে এদেশে ৪৪৬,৪২১ টন রবার আমদানি হয়। এ সংখ্যা বেশ ভালই ধরা যাইতে পারে। গত ডিসেম্বর মাসে মার্কিণ উৎপাদনকারীরা রবারের কাটতি অসম্ভব রকম কমাইয়া দেন। ফলে সমস্ত মাসে মাত্র ৩১,২৩১ টন রবারের ব্যবহার হয়। জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত রবারের বাজারে কোন রকম পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তবে শেষ সপ্তাহে বাজারের অবস্থা একটু গরম দেখা গিয়াছে। গত বৎসরের শেষের দিকে যুদ্রবর্ণ রবার পাটির দাম ১৭৯০ সেণ্ট ছিল। এ বৎসরের প্রথম হইতে এ দাম বাড়িয়া ২১৯ সেণ্টে উঠে এবং তারপর হইতে বাজার দর প্রায় ২০৩০ সেণ্টে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে রবারের কাটতি ১৯২৮ সনে ৪৪১,৩৩৭ টন হয় এবং ১৯২৭ সনে ৩৭১,০২৭ টন হয়।

তামার বাজার

যতোয়া ব্যবহারে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দেশে তামার চাহিদা থাকিবে বলিয়া মনে হয়। তবে বিদেশী ক্রেতারা ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তাহাদের কেনা শেষ করিবে। সুতরাং বুঝা যায় যে, বিদেশী ব্যাপারে এ ব্যবসাটা দিনকতক বেশ জোরের সহিতই চলিবে। তবে দেশে তামার কাটতি এত জোর হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে তামার স্থানীয় বাজার-দর প্রতি পাউণ্ড ১৩৯ সেণ্ট। আর দেশের এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (রপ্তানি-সঙ্ঘ) এই দর ইয়োরোপের বন্দর পর্য্যন্ত সি আই এফ, (কাষ্টমসের শুল্ক, ইন্সিওরেন্স এবং জাহাজ ভাড়া ধরিয়া) প্রতি পাউণ্ড ১৭ সেণ্ট ধরিতেছেন বলিয়া জানা যায়। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এত বেশী দাম দেখা যায় নাই।

অন্যান্য ধাতু

অন্যান্য ধাতু সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছু নাই। টিনের দাম পাউণ্ড প্রতি শতকরা ½ ভাগ কমিয়া ৪৯ সেণ্টে ঠেকিয়াছে। সীসার দাম চড়িয়া ৩·৮৫ সেণ্টে উঠিয়াছে এবং অতি সত্বর মাল ডেলিভারি দেবার চাহিদাও বেশ দেখা যায়। রবারের দামের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ১৯২৮ সনে মোট ৪৫,৪৪১ টন অধিক্রী হইয়া পড়িয়াছিল এবং ১৯২৭ সনে ৪০,৭৫১ টন অধিক্রী ছিল। ষ্টীয়ার অভাব খনির কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকায় খনিওয়ালাদের বাড়তি মাল ডিসেম্বর মাসে অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

গত জানুয়ারী মাসে আরও সাতটী গালাইখানার কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। গত বৎসরের শেষে মোট ২০১টী গালাইখানার কাজ চলিতেছিল। বৎসরে মোট ৩,৩৬৯,৮৪৬ টন পিগ লৌহ প্রস্তুত হইয়াছে। অথবা গড়ে দৈনিক ১০৮,৭০৫ টন করিয়া প্রস্তুত পিগ্‌লৌহ প্রস্তুত হইয়াছে। আর নভেম্বর মাসে দৈনিক ১১০,০৮৪ টন পর্য্যন্তও উৎপাদন দেখা যায়।

ইস্পাত ঢালাই

ডিসেম্বর মাসে মোট ৪,০১৫,৪৩৪ টন এবং নভেম্বরে ৪,২৪৯,৩৮০ টন ইস্পাত ঢালাই হইয়াছে। ঢালাই কলগুলিকে তাহাদের পূরা ক্ষমতার শতকরা ৮৪·২০ ভাগ খাটান হইয়াছে। সারা বৎসরে (১৯২৮ সন) গড়ে শতকরা ৮৫ ভাগ এবং ১৯২৭ সনে শতকরা ৭৫·৮৩ ভাগ খাটিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ১৯২৮ সনের ঢালাই ইস্পাতের মোট উৎপাদন ৪২,৮৫৩,২২৫ টন এবং ১৯২৭ সনে ৪৩,৩৯১,৭৪৩ টন। ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ষ্টীল কর্পোরেশনের বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে যে, গত ৩১শে ডিসেম্বর তাহাদের খাতায় ঢালাই ইস্পাতের অসমাপ্ত অর্ডারের পরিমাণ ৩,৯৭৬,৭১২ টন ছিল। এই সংখ্যা নভেম্বরের সংখ্যার তুলনায় ৩০৩,৭১২ টন বেশী।

বিলাতে তামার দাম হ্রাস

বিলাতে তামার দাম টন প্রতি ৭৬ পাউণ্ড হইতে টন-প্রতি ৬৪ পাউণ্ড ৭ শিলিংএ নামিয়াছে। তামার দর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে টিন সীসা প্রভৃতি ধাতুরও দর কমিয়াছে। তামার বাজারের একজন বিখ্যাত ব্যাপারীর নিকট জানা গিয়াছে যে দর নামিবার কারণ এই যে, গত কয়েক দিন তামার ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় খুব বেশী পরিমাণে চলিতেছিল। অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, সস্তায় তামা কিনিয়া চড়া দরে বেচিবার জন্যই ব্যবসাদারেরা এরূপ করিতেছে। এই সন্দেহ অমূলক কি না তাহা এখন বলা শক্ত।

বেতার ও কেব্‌ল্ কোম্পানীর সঙ্ঘ

বৃটিশ সাম্রাজ্যে অনেকগুলা বেতার ও কেব্‌ল কোম্পানী আছে। এইগুলাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য নূতন হোল্ডিং কোম্পানী বিলাতে রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে। প্রথমটীর নাম "কেব্‌ল্‌স্ অ্যাণ্ড ওয়্যারলেস লিমিটেড"। এই কোম্পানীর বর্ত্তমান মূলধন ১০০ পাউণ্ড—ইহাকে ভবিষ্যতে ৫ কোটি ৩৭ লক্ষে বাড়ানো যাইবে। এই কোম্পানীটী ইষ্টার্ণ টেলিগ্রাফ কোং, দি অষ্ট্রেলিয়া অ্যাণ্ড চায়না টেলিগ্রাফ কোং, দি ওয়েষ্টার্ণ টেলিগ্রাফ কোং ও মার্কনি—এই কয়টীর সমস্ত সম্পত্তি, শেয়ার ও দেনা কিনিয়া লইবে। ইহার ডিরেক্টারদের মধ্যে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য নাম—সার চার্লস এডিস, সার বেসিল ব্ল্যাকেট (ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিব)। লর্ড ইঙ্কেপ, শ্রীযুক্ত এফ জি কেলাওয়ে এবং শ্রীযুক্ত মার্কনি। অপর কোম্পানীটীর নাম—"ইণ্টার্ণ্যাশনাল কমিউনিকেশানস্ লিমিটেড"। ইহা প্রথম কয়টী কোম্পানীর সম্পত্তি কিনিয়া লইবে; তাহা ছাড়া "প্যাসিফিক কেব্‌ল্ বোর্ড," "ইম্পিরিয়াল ট্রান্স-অ্যাটলাণ্টিক কেব্‌ল্‌স্" ও গভর্মেণ্টের ওয়্যারলেস ষ্টেশনগুলাও কিনিয়া লইবে। প্রথম কোম্পানীটীর প্রেসিডেণ্ট হইবেন—লর্ড ইন্‌ভারফোর্থ। দ্বিতীয়টীর প্রেসিডেণ্ট হইবেন—সার বেসিল ব্ল্যাকেট।

তূলার ব্যবসা

১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নীচের হিসাব মত বিদেশে তূলা রপ্তানি হইয়াছে।

বিলাত	২৮৭,৪১২ গাঁট

ফ্রান্স		চীন ও জাপান	১৬৬,০২০ গাঁট
জার্ম্মানি		অন্যান্য দেশ	৯৩,৭২২
ইতালি			
রুশিয়া		মোট	১৩০,৫৬৮ „

জাপানের প্রধান প্রধান শিল্প

তুলা বয়ন শিল্প

মজুরের সংখ্যা			উৎপন্ন মাল	
পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (১০০০ ইয়েন)
			৩৪৭,১৮২	৭৫৮,৭৫৭
			২৯৯,৪১৪	
			৩১৬,০২১	
		১৮৩,৩২৫		
			৩৬৯,৩৭৮	
৪৪,৬৩১		২০৯,৪৩৩		২২,১৬৮
৩৮,৫১৫			৩৪২,৯৬১	৫৬৯,৮৪৫
৩৮,৬৬৯			৩৩১,৩১০	৬৪৪,৯৫৪
৪৩,৪১৩			৪১২,২১২	৭৮১,৪৪২
			৪৬৬,৭৪১	৬১৯,৪৭০
				৪০৩

রেশম বয়ন শিল্প

২৮	৪,৪৮৯	১২,১৭৭	৩,৩৭৪	৪৩,২৪৪
২৮	৫,৪১০	১২,৪৩২	২,০০৩	২৫,৪০৬
৪২	৫,২০৮	১৩,৫০২	২,৯০০	২৯,০৩৬
৩১	৪,৬৬৮	১৩,০৪১	২,৯০৪	৩১,৫০২
৫১	৭,১৭২	১৯,০১৯	৩,৭২৬	৪৫,১১৪
৩৬	৬,৩২১	১৮,৯৭৭	৪,৩০৩	৪০,০৯৭
৩২	৭,৩২২	২১,৭০৩	৩,০৭০	৬১,৯৭৩
৩৮	৭,৪০৯	২২,৮৬৭	৪,৫৬৩	৬৩,১০৫

পশু বয়ন শিল্প

কারখানার সংখ্যা	মজুরের সংখ্যা			উৎপন্ন মাল	
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (১০০০ ইয়েন)
		৩,৯৭৬		১৬,১৯৭	১৬,২৮২
		৯,২৮৬		৯,২৫৫	১৮,৮৪৩
		৫,৮০৯		১৬,৩১২	১৯,৯১৯
			১১,৩৮৬	১০,৪২১	১৭,২২২
				৯,৭১৭	
				৭,৭৫৪	
				৮,৮০৮	
		৪,৩০২		৭,২৫৩	

জাপানের দেশলাই শিল্প

বৎসর	কারখানার সংখ্যা	মজুর			সেফ্‌টি ম্যাচ		অন্যান্য প্রকার দেশলাইএর মূল্য	মোট মূল্য
		পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পরিমাণ	মূল্য		
					(১,০০০ গ্রোস)	(১,০০০ ইয়েন)	(১,০০০ ইয়েন)	(১,০০০ ইয়েন)
	১৮৫	৫,৪৯৮	১৪,৯২১	২০,৪১৯	৩৮,০৯৯	৩৫,৭০৮	৩,৯৮৫	৩৯,৬৯৩
	১৭০	৪,১৭৮	১২,৬৬২	১৬,৮৪০	৩৭,০৩৮	২৬,৩৩৯	১,৮২৯	২৮,১৬৮
	১৫৮	৪,১০৩	১১,৮১৩	১৫,৯১৬	২৪,৬২০	১৯,৫১৯	১,৩৬৫	২০,৮৮৪
	১৪৩	৩,৫৫৯	১০,৭৯৬	১৪,৩৫৫	২৭,৪৮৯	১৮,৫৬১	৩৯০	১৮,৯৫১
	১১২	২,৯১৬	৮,৮১৩	১১,৭২৯	২৪,১৯৭	১৪,৮১১	—	১৪,৮১১
	৯৯	২,৮৩৩	৮,৪৪৫	১১,২৭৮	২৪,৭৮৭	১৫,৭৯৪	—	১৫,৭৯৪
	৩৩	৩২৪	৬০৮	৯৩০	২৪,১৩৯	১৬,৯৮৮	—	১৬,৯৮৮
	৮৮	২,৫৩৩	৭,৪৫১	৯,৯৮৪	২৪,০৮৭	১৫,৬৬৭	—	১৫,৬৬৭

চীনা মাটীর ও মাটীর বাসন

মজুর			মূল্য			
পুরুষ	স্ত্রী	মোট	অলঙ্কার ও আসবাব	মাটীর বাসন	অন্যান্য	মোট মূল্য
			(১,০০০ ইয়েন)	(১,০০০ ইয়েন)	(১,০০০ ইয়েন)	(১,০০০ ইয়েন)
৩২,২৭৮	১১,৮৬৩	৪৪,১৪১	৫,৬১৩	১৮,৯১০	৬,৮১৬	৩১,৩৩৯
৩৫,৪৪৩	১৩,৭৩৮	৪৯,১৮১	৭,৫৮৯	২৮,৯৮০	৭,৬৪৫	৪৪,২১৪
৩৯,৩৫১	১৫,৩৯০	৫৪,৭৪১	৮,৪০৮	৪১,৭৬৩	১৪,৪৫৯	৬৪,৬৬০
৩৫,৬৯২	১৪,২০০	৪৯,৮৯২	৮,২৯৫	৪০,৪৬৭	১৪,০৭৮	৬২,৮৪০
৩১,৯৭৭	১১,৯৬৭	৪৩,৯৪৪	১০,৫১৮	৩৬,৬৮১	১৩,২৯০	৬০,৪৯২
৪২,৭৮৯	১২,০৭৫	৪৪,৮৬৪	১১,৪০০	৩৭,৫৮৯	১৫,৭৫২	৬৪,৭৪১
৩২,০৮৪	১২,২০৯	৪৪,২৯৩	১৩,২৯৮	৪০,২১৯	১৪,৯৫৬	৬৮,৫৩৩
৩০,৮০৯	১২,৯৬২	৪৩,৭৭১	১৩,৯৬০	৫০,১৫১	১৪,০৬৭	৭৯,১৭৮
৩২,২৮২	১৩,১৪৪	৪৫,৪২৬	১৫,৪৮৫	৪৩,৫৯৩	১৪,৯১২	৭৩,৯১০

জার্মাণির কেমিক্যাল শিল্প

জার্মাণি প্রথমে আলকাতরা থেকে রং উৎপাদন করে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জার্মাণির কেমিক্যাল শিল্প অভূতপূর্ব্ব উন্নতিলাভ করে। জার্মাণ মাল প্রস্তুত-কারক মাল প্রস্তুতের যে পেটেণ্ট লইয়াছিল সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন যার যেমন খুসী এই সকল কেমিক্যাল দ্রব্য তৈয়ার করিতেছে। পূর্ব্বে যেমন এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এখন আর তা নয়। অনেক দেশই এখন এই শিল্পে জার্মাণির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে।

জেনেভা ইণ্টারন্যাশানাল ইকনমিক কন্‌ফারেন্স অর্থাৎ জেনেভা আন্তর্জ্জাতিক ধনবিজ্ঞান সভার জন্য যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে জগতে কেমিক্যাল দ্রব্য কিরূপ প্রস্তুত হইত ও হইতেছে তাহার পরিচয় এই তালিকায় পাওয়া যাইবে।

দেশের নাম	১৯১৩-১৯১৪ ১০ লক্ষ মার্ক মুদ্রায়	%	১৯২৩-১৯২৪ ১০ লক্ষ মার্ক মুদ্রায়	
যুক্তরাষ্ট্র	৩,৪০০		৮,৪০০	৪৭
জার্ম্মাণি	২,৪০০		৩,০০০	১৭
কানাডা	৪,২০০		৪০০	২
সুইডেন			২০০	১
অন্যান্য দেশ			৬,০০০	৩৩
জগতের মোট উৎপাদন	১০,০০০			

তালিকার অঙ্কগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে, দুনিয়ার কেমিক্যাল দ্রব্য যুদ্ধের পূর্ব্বে এক কোটি মার্ক মূল্য পরি-মাণের মত প্রস্তুত হইত; কিন্তু যুদ্ধের পর বাড়িয়া গিয়া ১ কোটি ৮০ লক্ষ মার্কে দাঁড়াইয়াছে। জার্মাণি যুদ্ধের পূর্ব্বে গোটা দুনিয়ার কেমিক্যাল দ্রব্যের ২৪% প্রস্তুত করিত

কিন্তু যুদ্ধের পর মাল উৎপাদন করিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৭%।

দুনিয়ার কোন্ দেশে কি পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

জগতের উৎপাদন	১৯১৩		১৯২৫	
	টন		টন	%
জার্ম্মানি	৫৫,০০০			৪৪·০
যুক্তরাজ্য	২৮৩,০০০	৩৮·৭	৩২৫,০০০	২৬·০
যুক্তরাষ্ট্র	৪৫৩,০০০	৫৮·২	৩৭৫,০০০	৩০·০
ফ্রান্স				
বেলজিয়াম				
ইটালি				
মোট	৭৭১,০০০	১০০·০	১,২৫০,০০০	১০০·০

উপরের এই তালিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, গোটা দুনিয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিড ২৫% বাড়িয়াছে বটে কিন্তু জার্ম্মানি এবং বিলাতে এই বস্তুর উৎপাদন কমিয়াছে। জার্ম্মানির ক্ষতি সব চেয়ে বেশী (৩৩%)। জার্ম্মানির সুপার ফস্‌ফেট শিল্পের দুর্যোগ এই ক্ষতির কারণ। এই কেমিক্যাল দ্রব্য ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অ্যামোনিয়ার উৎপাদনও কম হইয়া গিয়াছে। কোক উৎপাদনের কারখানাগুলিতে অ্যামোনিয়া তৈয়ার হয়। লৌহশিল্পের অবনতির জন্য কোকও আর বেশী তৈয়ার হইতেছে না। কোকের কারখানায় সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার হয় সাল্‌ফেট অব্ অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য। উপরোক্ত "ভারি কেমিক্যাল দ্রব্যের" বাজারে এখন ভীষণ প্রতিযোগিতা, সেইজন্য জার্ম্মানিকে বেগ পাইতে হইতেছে। ভার্সেলিস সন্ধির জন্যও জার্ম্মানির বিস্ফোরক দ্রব্য তৈয়ারির পথে কাঁটা পড়িয়াছে।

এই সময়ের মধ্যে দুনিয়ার নাইট্রোজেন উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নে এ সম্বন্ধে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

	১৯১৩		১৯২৫	
	টন		টন	%
সিন্থেটিক নাইট্রোজেন	৫৫,০০০			৪৪·০
বাই প্রডাক্ট				
(অ্যামোনিয়া)	২৮৩,০০০	৩৮·৭	৩২৫,০০০	২৬·০
চিলি সল্টপেটার	৪৫৩,০০০	৫৬·২	৩৭৫,০০০	৩০·০
মোট	৭৭১,০০০	১০০·০	১,২৫০,০০০	১০০·০

অন্য পক্ষে ১৯২৬ সনে দুনিয়ার বর্ত্তমান প্ল্যান্টগুলিতে নিম্নলিখিতরূপ মাল প্রস্তুত হইয়াছে।

	প্ল্যান্টগুলির মাল উৎপাদনের ক্ষমতা	উৎপন্ন মাল
	টন	টন
সিন্থেটিক নাইট্রোজেন	৮৪৬,০০০	৬৮২,০০০
বাই প্রডাক্ট (অ্যামোনিয়া)	৪১০,০০০	২৮০,০০০
চিলিসল্টপেটার	৪৮৫,০০০	৩৯৯,০০০
	১,৭৩৪,০০০	১,৩৬১,০০০

বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের তালিকা।

দেশের নাম	১৯১৩	১৯২৫
	টন	টন
জার্ম্মানি	১২১,০০০	৪৫০,০০০
যুক্তরাজ্য	৯০,০০০	৮৮,০০০
ফ্রান্স	১৮,০০০	৩০,০০০
ইটালি	৫,০০০	১৭,০০০
সুইডেন	৪,০০০	৭,০০০
জাপান	৩,০০০	৩১,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৩৬,০০০	৯৮,০০০
কানাডা	৫,০০০	২৪,০০০
চিলি	৪৩০,০০০	৩৮৫,০০০

দুনিয়ার সুপার ফস্‌ফেট উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনের পর যেসকল দেশে এই দ্রব্য প্রধানতঃ প্রস্তুত হইত, সে সমস্ত দেশেই ইহার পরিমাণ কমিয়াছে। নিম্নের তালিকায় এই বিষয় বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেশের নাম	১৯১৩ টন	১৯২৪ টন
দুনিয়ার উৎপাদন	১১,৪৪৭,০০০	১০,৬৪৭,০০০
জার্ম্মাণি	১,৮৫০,০০০	৫০০,০০০
বেলজিয়াম	৪২৮,০০০	৪৯০,০০০
স্পেন	৪৬০,০০০	৫৮৮,০০০
ফ্রান্স	১,৯৮০,০০০	২,০০৪,০০০
যুক্তরাজ্য	৮৪৫,০০০	৪০৯,০০০
ইটালি	৯৪১,০০০	১,০১২,০০০
সুইডেন ও নরওয়ে	২৯৭,০০০	১৪২,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৩,২৪৮,০০০	২,৮৩৫,০০০
আফ্রিকা	৪৬,০০০	১৩৩,০০০
জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া	৫১৪,০০০	৬০০,০০০

দুনিয়ার কোলটার রং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জার্ম্মাণি ছাড়া কয়েকটী দেশে এই দ্রব্য উৎপাদন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই রঙের বাজারে জার্ম্মাণির যে স্থান ছিল এখন তাহা অনেক নিম্নে। দেশে যে সমস্ত প্ল্যান্ট বর্ত্তমান সেগুলির মাল উৎপাদনের ক্ষমতা ১৬০,০০০ টন, কিন্তু ১৯২৪ সনে মাত্র ৪৫% মাল উৎপন্ন হইয়াছে।

নিম্নে এ সম্বন্ধে একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

দেশের নাম	১৯১৩ টন	%	১৯২৪ টন	%
জার্ম্মাণি—				
দেশের ভিতর উৎপন্ন				
বিদেশে জার্ম্মাণির				
কারখানা-জাত	৬	—	—	—
যুক্তরাষ্ট্র	২	৩১,০০০	২০	
যুক্তরাজ্য	৩	১৯,০০০	১২	
সুইটসারল্যাণ্ড	৬	১০,০০০	৬	
ফ্রান্স	১	১৫,০০০	৯	
ইটালি	—	—	৫,০০০	৩
জাপান	—	—	৬,০০০	৪
মোট	১৫৭,০০০	১০০	১৫৮,০০০	১০০

দুনিয়ার কেমিক্যাল-শিল্প জগতে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান দেশগুলির আমদানি রপ্তানির পরিমাণ জানা দরকার। কোলটার রং ও কৃত্রিম সার এই দুইটী জিনিষের বেলাতেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

দুনিয়ার কেমিক্যাল দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্য

(দশ লক্ষ মার্কে হিসাব)

	১৯১৩ দাম	১৯১৩ %	১৯২৪ দাম	১৯২৪ %	১৯২৫ দাম	১৯২৫ %
দুনিয়ার মোট উৎপাদন	৩,২০০	১০০·০	৩,৬০০	১০০·০	৪,০৪০	
জার্ম্মাণি	৯১০	২৮·৪	৬১০	১৭·০	৯৩০	
যুক্তরাষ্ট্র	৩১০		৫৭০	১৫·৮	৬৫০	১৬·০
যুক্তরাজ্য	৪০০		৪৩০	১৪·৭	৫৫০	১৩·৬
ফ্রান্স	৩১০		৫৯০	১৬.৪	৫৪০	১৩·৩
চিলি (সল্টপেটার রপ্তানি	৪৭০		৪৪০	১২·৫	৪৫০	১১·১
ইটালি	৮৫		১৩০	৩·৬	১৭০	৪·২
সুইটসারল্যাণ্ড	৬০			৩·১	১৩০	৩·২
জাপান	৫৫			২·২	৯০	২·২

দুনিয়ার কেমিক্যাল দ্রব্যের আমদানি বাণিজ্য

(দশ লক্ষ মার্কে হিসাব)

	১৯১৩		১৯২৪		১৯২৫	
	মূল্য	%	মূল্য	%	মূল্য	%
দুনিয়ার মোট	২,৭৬৫.	১০০·০	২,৭৭৫	১০০·০	৩,০৭৫	১০০·০
আর্জেন্টি	৪২০	১৭·৭	১৬০	৫·৮	২৪০	৭·৮
যুক্তরাষ্ট্র	৫২০	১৮·৮	৫৮০	২০·৯	৭০০	২২·৮
যুক্তরাজ্য	২৯০	১০·৫	৩১০	১১·২	৩৪০	১১·১
ফ্রান্স	২৫০	৯·১	২৯০	১০·৫	২৭০	৮·৮
ইটালি	১৩০	৪·৭	১২০	৪·৩	১৪০	৪·৬
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	৫০	১·৮	৯০	৩·২	৯০	২·৯
চীন		৩·৬		৭·৬	২১০	৬·৮
জাপান		৩·৬		৮·০	২০০	৬·৫
ব্রিটিশ ভারতবর্ষ		২·৫		৫·০	১৫০	৪·৮

এই দুই তালিকার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না। কতকগুলি দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। সেই জন্য এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৯১৩ সনে ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রায় ৩,২০০,০০০,০০০ মার্ক মূল্যের কেমিকাল দ্রব্য চালান হইয়াছে। ১৯২৫ সনে এই মূল্যের পরিমাণ ৪,০০০,০০০,০০০ মার্ক। এই সময়ের মধ্যে সোনার মূল্যও কমিয়া যায় ঐ বৃদ্ধির সমান। সুতরাং দুনিয়ার কেমিকাল শিল্পের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বলিতে হয়।

(১) দেশী

হৃষীকেশ অয়েল মিল

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী হৃষীকেশ অয়েল মিলের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিখিত বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই তারিখটী স্মরণীয় হইয়া থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। মনে করিবার কারণ লিখিতেছি।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের লাহাবংশের রাজা হৃষীকেশ লাহার পুত্রদ্বয়—কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা ও কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এই মিলের স্বত্বাধিকারী। অর্থোপায়ের গতানুগতিক সহজ পন্থা ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত বিঘ্নসঙ্কুল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যবহারিক শিল্পসমূহের সহায়ে যে আজ ইঁহারা ধনবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা দেশের লোকের পক্ষে আশার কথা সন্দেহ নাই। ব্যবহারিক শিল্পপ্রতিষ্ঠার গোড়ায় যে জিনিষটি দরকার অর্থাৎ মূলধন—সেই জিনিষটি ইঁহাদের প্রভূত পরিমাণেই আছে বলিয়া আমরা জানি। এখন কেবল যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র-নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই তিনটীর সংযোগে দেশের শিল্পোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

প্রায় এক বৎসর হইল প্রোফেসর শ্রীযুক্ত বালেন্দুর দাস মহাশয়ের পরামর্শে এই মিলের স্বত্বাধিকারিদ্বয় এইরূপ একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিতে উৎসুক হন। বিষয় আলোচনাদির পর তৈলবীজ হইতে আধুনিক উপায়ে তৈল নিষ্কাষণের জন্য একটী অয়েল মিল স্থাপন করাই ঠিক হয়। বিষয়টির নির্ব্বাচনের অন্যতম একটী উদ্দেশ্য এই যে, কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর নিত্যব্যবহার্য্য সরিষার তৈল খাঁটি অবস্থায় যাহাতে সকলে পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

এই মিলটিতে দুইটী এক্সপেলার যন্ত্র আছে। ঘানির খইল পেষাই করিবার জন্য এই কল কলিকাতাতে আরও আছে; কিন্তু ঘানির সাহায্য না লইয়া একেবারে সরিষার বীজ হইতে তৈল নিষ্কাষণের বন্দোবস্ত এই মিলেই প্রথম করা হইয়াছে এবং ইহাই এই মিলটির বিশেষত্ব। প্রথমতঃ, তৈলবীজগুলিকে অ্যাস্পিরেটর নামক যন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও পুনিশুনা করা হয়। তৎপর ইহাকে বীজ পেষাই যন্ত্রে (সীড ক্রাসিং মিল) গুড়া করিয়া এক্সপেলারে নিষ্পেষিত করা হয়। এই নিষ্পেষিত তৈল সেন্ট্রিফিউজ দ্বারা গাদমুক্ত করিয়া লোহার ট্যাঙ্কে পাম্প করিয়া তুলিয়া রাখা হয়। এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়াতে তৈল মোটেই হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।

আজকাল বাজারে যত প্রকার সরিষার তৈল পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশেই নকল অয়েল অব্ ঘাইগর্ণ, মরিচ ও মূল্য বীচি বা সজনের ছাল সংযোগে অতিরিক্তরূপে ঝাঁঝাল করা হয়। বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের ঝাঁঝ যে যন্ত্রেই তৈয়ারী হউক না কেন এই সমস্ত মিশ্রিত তৈলের ঝাঁঝ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই ঝাঁঝ মোলায়েম ও সুগন্ধযুক্ত হয়; কিন্তু নাকে মুখে লাগে না। এই মিলে উপরোক্ত জিনিষগুলির কোনটিই ব্যবহৃত হয় না। কাজেই নাকে মুখে লাগিবার মত ঝাঁঝাল তৈল না হইয়া স্বাভাবিক ঝাঁঝ ও সুন্দর সুগন্ধযুক্ত স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর তৈলই প্রস্তুত হইতেছে।

এই ব্যবসায়টীর হালচাল বুঝিয়া দেখিবার জন্যই আরম্ভটি ক্ষুদ্র করিয়া করা হইয়াছে। সুবিধাজনক মনে হইলে অচিরেই চাহিদা অনুযায়ী মিল বাড়ান হইবে।

বাঙ্গলার তথা ভারতের তৈল-শিল্পের ভবিষ্যৎ যে অতি উজ্জ্বল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানবের নিত্য ব্যবহার্য্য অনেকগুলি জিনিষই এই শিল্পটীর অন্তর্গত। কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে, যথা, সাবান, মাখনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত মার্গারিন, শেন্ট ও তার্পিন, অয়েল ক্লথ, নকল চামড়া এবং কৃষি কার্য্যের জন্য সার হিসাবে ব্যবহৃত খইল।

পাশ্চাত্য দেশে ইহার এক একটি দ্রব্যের জন্য অতি বড় ফ্যাক্টরীসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এদেশেও যে ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত তাহা নিঃসন্দেহ।

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি প্রারম্ভে ক্ষুদ্র হইলেও আমরা আশা করিতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া স্বত্বাধিকারীদের মূলধন ও বুদ্ধিবৃত্তি-শক্তিসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে বাঙ্গলার তৈলশিল্প সমৃদ্ধিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

কলেরা ও বসন্তে মৃত্যু দেড় হাজার (দুই সপ্তাহে)

বিলাতে কয়েক ব্যক্তি যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে সে সংবাদ কাহারও অজানা নাই। বিশ্বের যে কোনও প্রান্তবাসী যে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বলিবেন,—লণ্ডনে কয়েক ব্যক্তি বসন্ত রোগে মারা গিয়াছে। বিলাতের এই ভীষণ দুর্ঘটনার কথা আজ সপ্তাহকাল ধরিয়া বিশ্বের দিকে দিকে প্রচারিত হইতেছে। বিলাতবাসিগণ কি ভাবে এ মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, ও দেশের চিকিৎসকগণ কিভাবে নিত্য নূতন গবেষণা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে নিত্যই নূতন নূতন সংবাদ হারে বেতারে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই সংবাদ প্রচারের জন্য এ পর্য্যন্ত যত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহা কম পক্ষে পঁচিশ লক্ষ টাকার কম হইবে না। পাঁচ ব্যক্তি বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—এই সংবাদ প্রচারের জন্যই যাহারা পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারেন, তাঁহারা যে এ রোগ নিবারণের জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বস্তুতঃ, এই পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যুতে ইংরেজগণ বিশ্বময় যেরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহাতে এ জাতির চেতনা ও জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার অদম্য বাসনা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

এদেশে

সেই সঙ্গে এদেশের কথা মনে পড়ে। লণ্ডনে ৫ জনের মৃত্যুতে যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহার কত বেশী যে এদেশে প্রত্যহ মৃত্যুমুখে পড়িতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে? পরাধীন জাতির কৈফিয়ৎ চাহিবার অধিকার নাই। তবু জনসাধারণের মনে প্রশ্ন তো ওঠে যে, বসন্ত রোগের প্রতিকারের জন্য, এদেশের নরনারীকে ইহার কবল হইতে বাঁচাইবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথবা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গত ১৩ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে শুধু বসন্ত রোগে যত জন মারা গিয়াছে, তাহার তালিকা বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী বিবরণীতে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে,—

কলিকাতা ২৬, দিনাজপুর ২০, বর্দ্ধমান ১৭, ঢাকা ১০, ময়মনসিংহ ১০, ত্রিপুরা ১০, হাওড়া ৭, হুগলী ৬, ২৪ পরগণা ৫, মুর্শিদাবাদ ৫, পাবনা ৫, আসানসোল খনি উপনিবেশ ৪, চট্টগ্রাম ৪, নদীয়া ৩, জলপাইগুড়ি ৩, মালদহ ৩, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৩, নোয়াখালী ৩, মেদিনীপুর ২, বীরভূম ১, ফরিদপুর ১, বরিশাল ১।

শুধু ঐ সপ্তাহেই যে দৈবাৎ এত লোক মারা গিয়াছে তাহা নয়। গত ৬ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের বাঙ্গলার স্বাস্থ্য-বিভাগের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশিত শুধু বসন্ত রোগের মৃত্যুহার এইরূপ :—

ময়মনসিংহ ৪৫, কলিকাতা ১৯, দিনাজপুর ১৫, ঢাকা ১৩, বর্দ্ধমান ১২, মুর্শিদাবাদ ১২, নদীয়া ১০, হাওড়া ৭, পাবনা ৬, ফরিদপুর ৫, নোয়াখালী ৫, ২৪ পরগণা ৪,

ত্রিপুরা ৪, মালদহ ৩, বরিশাল ৩, হুগলী ২, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ১, চট্টগ্রাম ১, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ১।

কলেরা

এই তো গেল বসন্তের মৃত্যুহার। তারপরে কলেরা আছে। কলেরা রোগের কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অজানিত নয়। তথাপি বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ গত ৬ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও বাঙ্গলার আটটি জেলায় কলেরায় মৃত্যু বাড়িয়াছে। কলিকাতা ৭১-৮১, বীরভূম ৩০-৪০, বাঁকুড়া ৫৩-৩৭, হুগলী ১৩-২১, নদীয়া ৯-১৮, মুর্শিদাবাদ ২৪-৩৫, রাজসাহী ১৩-৩৩, খুলনা ৫-১৭, এবং বরিশাল ১৭-১৯।

এই মৃত্যুহারও আকস্মিক কারণবশতঃ নয়। কারণ, —বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ— গত ১৩ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতা ও বাঙ্গলার এই ছয়টা জেলায় কলেরায় মৃত্যু বাড়িয়াছে। কলিকাতা ৮১-১৬, হাওড়া ৩৭-৬১, রাজসাহী ৩৩-৪১, পাবনা ১৩-২৫ ঢাকা ১২-২৯, চট্টগ্রাম ৭-১৩, এবং ত্রিপুরা ২৫-২৯। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানে ৪৪, বীরভূমে ৩২, বাঁকুড়ায় ২৭, মেদিনীপুরে ১১, হুগলীতে ২৭, ২৪ পরগণায় ২৯, নদীয়ায় ১৪, মুর্শিদাবাদে ২৯ খুলনায় ১২, এবং বরিশালে ১১ জন মারা গিয়াছে।

জলকষ্ট

কলেরার প্রধান কারণ জলাভাব। গ্রীষ্মের দিনে বিশুদ্ধ জলের অভাবে পল্লীবাসিগণ দূষিত জলপান করিয়াই কলেরায় আক্রান্ত হয়। প্রতি বৎসর বাঙ্গলার প্রত্যেক গ্রাম হইতে জলাভাবের জন্য হাহাকার ওঠে। এমন লক্ষ লক্ষ গ্রাম আছে যেখানকার লোকদের বৃহৎ পুষ্করিণীর অভাবে বহুদূর হইতে গাড়ী করিয়া জল আনিয়া কোনক্রমে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু তাহা তো কম ব্যয়সাপেক্ষ ও সহজসাধ্য নয়। শতকরা ৯০ জনের পক্ষেই সে ব্যয় বহন করা অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে দুর্ভাগাদের ঘোলা-ডোবা যেখানে একটুকু পচিল তলানি জল পড়িয়া আছে তাহাই সংগ্রহ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। এমন অবস্থায় কলেরার প্রকোপ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

এবারেও গ্রীষ্ম আসিল। আবার জলের জন্য হাহাকার উঠিল। কিন্তু প্রতিবারের মত এবারেও যে সে হাহাকার দার্জ্জিলিঙ্গের সুদূর শৈলশিখরে বাঙ্গলার ভাগ্য-বিধাতার কাণে পৌঁছিবে এমন আশা নাই। বিশেষ তিনি তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পুনঃ নির্ব্বাচনে ব্যস্ত থাকিবেন, দরিদ্র প্রজাদের অতি ক্ষীণ, তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিবার অবসর থাকিবে না।

নদীয়া হইতে জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন নিজ কালীগঞ্জ, কামারা, হরিনামপুর, সেরপুর প্রভৃতি গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে উক্ত পল্লীবাসিগণ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। এমন কি খাল বিল প্রভৃতি জলাশয়ে পর্য্যাপ্ত জল না থাকায় গবাদি পশুগণ জলাভাবে কষ্ট পাইতেছে। এই অসুবিধা আজিকার নূতন নহে। পূর্ব্বে এ বিষয়ে বহু আবেদন নিবেদন করা হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কয়েকটী ইণ্দারা জেলা ও লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক দেওয়া হইয়াছে মাত্র; কিন্তু ইহা জনসাধারণের ও গরু মহিষাদির পানের ও স্নানের অভাব ঘুচাইবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সাব্ ডিভিসনাল অফিসার, সার্কেল অফিসার এই কালীগঞ্জে প্রায়ই আসিয়া থাকেন; কিন্তু এ বিষয়ে বর্ত্তমান হইতে তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। গরীব দেশ—সাধারণ লোকের নিম্ন অবস্থা। ইহা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটু কৃপাদৃষ্টি করিয়া পুষ্করিণী খনন পূর্ব্বক গরীব প্রজাবৃন্দের জলাভাব মোচন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয় সন্দেহ নাই। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর, ২৫৲ টাকা বেতনে একজন এসিষ্ট্যাণ্ট স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জলাভাবে নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত পল্লী-বাসিগণকে ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা করার ইহাই কি প্রকৃষ্ট উপায়?

(বাঙলার কথা)

কলিকাতার জল সম্বন্ধে অধ্যাপক বাণেশ্বর দাসের বক্তৃতা

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস মহাশয় এক বক্তৃতায় কলিকাতার পানীয় জল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নগরের কর্তৃপক্ষীয়দিগের বিশেষ মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। একমাত্র বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থার হেতু অস্বাস্থ্যকর কলিকাতা নগর স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানের লোক স্বাস্থ্যলাভের জন্য কলিকাতায় আসিত। কিন্তু কলিকাতার এই সুনাম বুঝি আর থাকে না। কিছু দিন হইতে কলিকাতা নানা রোগের আবাসস্থল হইয়াছে। ওলাউঠা, বসন্ত ও এখানকার চিরনিবাসী, ইদানীং আবার প্লেগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, বেরিবেরি প্রভৃতি আসিয়া যোগ দিয়াছে। ইহার উপর অধ্যাপক দাস পানীয় জলের অবস্থার কথা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, অচিরে তাহার প্রতিকার না হইলে কলিকাতা আর বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তিনি বলিয়াছেন, পানীয় জলের দোষই নানা রোগের কারণ। কলিকাতায় যে গঙ্গার জল বিশুদ্ধ করিয়া পানের জন্য সরবরাহ করা হয়, তাহাতে গঙ্গার তীরবর্ত্তী কল-কারখানার পাইখানাসমূহের বিষ্ঠা জলবৎ তরল করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই বিষ্ঠারাশি বৈজ্ঞানিক উপায়ে রূপান্তরিত হইলে যে রোগের বীজাণুশূন্য হয়, এরূপ মনে করা যায় না। অধ্যাপক দাস বলেন, কলিকাতায় যে জল সরবরাহ হয়, উহা যদি ক্লোরাইন দ্বারা পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা সত্বর না হয়, তাহা হইলে নগরে ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যেরূপ ঔদাসীন্য, তাহাতে তাঁহারা যে অধ্যাপক দাসের কথায় কর্ণপাত করিবেন, এমন মনে হয় না। অতএব যাহাতে কর্পোরেশন এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন, নগরবাসীদিগের সে বিষয়ে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী কল-কারখানার পাইখানার মলমূত্র সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কে রূপান্তরিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করার বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বিদ্বজ্জনসাধারণ বহুদিন হইতে আন্দোলন উত্থাপন করেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, উহাতে জলে কোনরূপ রোগবীজাণু বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখন অধ্যাপক দাস যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের বোরাক্ট গঙ্গার জল দূষিত হওয়ায় কলিকাতার পানীয় জল রোগজনক, বিশেষতঃ ঐ জল গুরুতর পেটের পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অধ্যাপক দাস যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয়,—না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না,—তাহা হইলে সরকারের কি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা ও প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে? অধ্যাপক দাসের ন্যায় এক জন বৈজ্ঞানিকের কথা কি তাঁহারা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিবেন? যেখানে দেশের লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি, সেখানে তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য শোভা পায় না।

(বসুমতী)

কুমিল্লার "অভয় আশ্রম"

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণ

নিম্নে কুমিল্লা অভয় আশ্রমের ১৯২৮ সনের কার্য্য-বিবরণের সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি

১৯২৮ সালে নিম্নলিখিত সেবকগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন :—

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেণ্ট, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলচন্দ্র পালিত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

কাজের প্রসার

১৯২৮ সনে আশ্রমের সব বিভাগেই কাজ প্রসার লাভ করিয়াছে। খদ্দর উৎপাদন ও বিক্রী বাড়িয়াছে। ১৯২৭

সনে ১৪২,৮২০৲ বিক্রী হইয়াছিল, আর ১৯২৮ সনে বিক্রী হইয়াছে ১৮৮০৯১৲। খদ্দর যাহাতে বেশী টেকসই ও পাতলা হইতে পারে তাহার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে শতকরা ৯০ ভাগের উপর খদ্দর চট্টগ্রাম বিভাগে উৎপন্ন হয়। এই খদ্দর কুমিল্লার তুলা হইতে প্রস্তুত হয়, এবং কুমিল্লার তুলার আঁশ ছোট বলিয়া সূতা সরু হয় না, কাপড়ও তুলনায় বেশী টেকসই হইতে পারে না। যদি লম্বা আঁশের তুলা ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে খদ্দর পাতলা ও বেশী টেকসই হইতে পারে। এই জন্য বরকামতা (ত্রিপুরা) কেন্দ্রে ওয়ার্দ্ধা তুলা (কুমিল্লা তুলার চেয়ে লম্বা আঁশ) ব্যবহৃত হইতেছে এবং বর্ত্তমানে সেখানে মাসিক ২৫/—৩০/ মণ ওয়ার্দ্ধা তুলায় সূতা হয়। ফলে সূতা কিছু সরু হইয়াছে, এবং আশা করা যায় কাপড় টেকসইও বেশী হইবে।

শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষাবিভাগ বেশ সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে যত স্কুল আছে সব এক কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছে। প্রত্যেক স্কুলকে ছাপান ফর্ম্মে মাসিক রিপোর্ট দিতে হয়। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আশ্রমের অধীন সমস্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমানে মোট ছাত্র-সংখ্যা ১২২৭। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযোগী পুস্তকের অভাব পূরণের জন্য বই লিখিত হয় ও হইতেছে।

গত বৎসর ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা, খদ্দরের উপকারিতা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে হইয়াছে।

ডাক্তারী বিভাগে বেশ সুস্পষ্টই উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। আউটডোর ডিসপেন্সারী ও হাসপাতালে রোগী সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। গত বৎসর ৫ জন ছাত্র মেডিক্যাল স্কুল হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। ইহারা সকলেই কুমিল্লা আশ্রম বা আশ্রমের অন্যান্য কেন্দ্রে কাজ করিবে স্থির করিয়াছে।

কৃষি ও ডেয়ারী বিভাগেও আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯২৮ সালে ২০০/ মণ ধান ও আশ্রমের ৫০ জনের ৬ মাসের উপযোগী তরকারী আশ্রমের ক্ষেত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একজন আশ্রম-কর্ম্মী ঢাকায় একটী ডেয়ারী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

খদ্দর বিভাগ

নিম্নে ১৯২৪ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত খদ্দর বিক্রীর পরিমাণ দেওয়া হইল।

খদ্দর বিক্রীর পরিমাণ

১৯২৪	২১৮২২৲
১৯২৫	৭০৬২০৲
১৯২৬	১৪২৯৮০৲
১৯২৭	১৪২৮২০৲
১৯২৮	১৮৮০৯১৲

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যে খদ্দর বিক্রী বাড়িতেছে তাহা ইহা হইতে বেশ সুস্পষ্ট হইবে।

খদ্দর যে দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে, ১৯২৮ সনে তাঁতি, কাটুনি ধোপা, ধরণী প্রভৃতিকে মজুরী বাবদ নিম্ন-প্রদর্শিত যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই সুস্পষ্ট হইবে।

তাঁতি	২৯৪২২৲
কাটুনি	৩০৪৫৩৲
ধরণী	৭০৮১৲
ধোপা	৩৪৯৮৲

বৎসরের শেষ ভাগে নূতন তিনটী বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে; (১) রংপুর, (২) দিনাজপুর, (৩) আগরতলা। মোটের উপর বর্ত্তমানে ২৩টী উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে আছে:—(১) কুমিল্লা আশ্রম। (২) কুমিল্লা সহর কাশিয়পাড়। (৩) কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। (৪) ভবানীপুর মেসেঞ্জার ঘোষ রোড। (৫) কেণী-নোয়াখালী। (৬) মুন্সির হাট নোয়াখালী। (৭) বরকামতা ত্রিপুরা। (৮) মাধাইয়া ত্রিপুরা। (৯) চৌদ্দগ্রাম ত্রিপুরা। (১০) দুর্গাপুর চট্টগ্রাম। (১১) বেলবন্দী

বাঁকুড়া (১২) বাঁকুড়া সহর। (১৩) ফরিদপুর সহর। (১৪) মেদিনীপুর সহর। (১৫) বহরমপুর সহর। (১৬) ঢাকা সহর। (১৭) কৃষ্ণনগর সহর। (১৮) পাবনা—জিলা ফরিদপুর। নারায়ণগঞ্জ সহর। (২০) বরিশাল সহর। (২১) আগরতলা সহর। (২২) রংপুর সহর। (২৩) দিনাজপুর সহর।

প্রায় ১৯০ হাজার টাকার খদ্দর উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে মূলধন খাটিয়াছে ১,২১,০০০৲। ঐ মূলধন নিম্নলিখিত ভাবে প্রাপ্ত।—

নিখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ (হাজার করা বার্ষিক ১৲ সুদে)	
শতকরা বার্ষিক ৯৲—১২৲ সুদে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ (৩১-১২-২৮ তারিখে)	৪৮,৮২৪৲
চাঁদা ইত্যাদি প্রাপ্ত	১৯,৮৯০৲
মোট	১,২১,০০৪৲

এই মূলধনে ইহার চেয়ে বেশী কাজ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। আর খদ্দর-ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসায়ের মত নহে যে সুদ দিয়াও স্বচ্ছন্দে কাজ চালান যাইতে পারে। বর্ত্তমানে খদ্দরের বিক্রয়-মূল্য ও উৎপাদন-খরচ হিসাব করিলে সুদ দিয়া বিনা লোকসানে কাজ চালান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাই ঋণের ঘাড় শোধ করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলার দেশপ্রেমিক ও ত্যাগী সন্তানদের নিকট হইতে ঐ টাকা পাওয়ার আশায় বিনীত অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রং বিভাগ

খদ্দরের কার্য্যের কথা লিখিতে যাইয়া রং সম্বন্ধে কিছু লেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে আশ্রমের অধীনে সর্ব্বপ্রকার পাকা রং দ্বারা খুব সমভাবে রঞ্জিত খদ্দর উৎপন্ন হইতেছে। নানা প্রকারের খাকি রংয়ের খদ্দর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত রং পাকা—ধোপার আঁটিতে বা ঘামে নষ্ট হয় না। সমস্ত পরিবারিক নিঃসঙ্কোচে এই সমস্ত রং ব্যবহার করিতে পারেন।

জাতীয় শিক্ষা

আশ্রমের শিক্ষা-বিভাগের কাজ মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) প্রাথমিক শিক্ষা ও (২) উচ্চ শিক্ষা। আশ্রমের পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে মোট ১২৫৭ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

মোটের উপর ৩১টী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে ১৭টী ঢাকা জিলায়, ৯টী ত্রিপুরা এবং ৪টি বাঁকুড়া জিলায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা মোট ১০৫৮। নিম্নে বিদ্যালয়ের নাম ও ছাত্রসংখ্যা প্রদত্ত হইল। ত্রিপুরা জিলা ১। রাজপাড়া বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ৪৩, ২। মুরাদপুর বালিকা বিদ্যালয় ছাত্রীসংখ্যা ১৯, ৩। জগন্নাথপুর, ছাত্র সংখ্যা ২৩, ৪। বিজয়পুর, ছাত্রসংখ্যা ৩৭, ৫। কালীপুর ছাত্রসংখ্যা ২০, ৬। তালতলা, ছাত্রসংখ্যা ২৭, ৭। কুমিল্লা সহর নৈশ বিদ্যালয়, ছাত্র সংখ্যা ১৫, ৮। বেলাসর বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ৫৪, ৯। পুটিয়া, ছাত্রসংখ্যা ৪৭, ১৯২৯ সনের জানুয়ারী মাসে আরও দুইটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ঢাকা জিলা (নবাবগঞ্জ কেন্দ্র) ১। হরিশ্চন্দ্রপুর বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ৩৫, ২। মহাইল, ছাত্রসংখ্যা ৩০, ৩। চন্দ্রখোলা, ছাত্রসংখ্যা ৪০, ৪। কিরকি, ছাত্রসংখ্যা ২০, ৫। কৃষ্ণনগর, ছাত্রসংখ্যা ৩৫, ৬। নওপা, ছাত্রসংখ্যা ২৫, ৭। দেওতলা, ছাত্রসংখ্যা ২০, ৮। কাশিমপুর, ছাত্রসংখ্যা ৪০, ৯। রাজপাড়া, ছাত্রসংখ্যা ৩০, ১০। বজ্রনগর, ছাত্রসংখ্যা ২০, ১১। বক্সিপাড়া, ছাত্রসংখ্যা ৮০। ঢাকা জিলা—মালিকান্দা কেন্দ্র) ১। মালিকান্দা পাঠশালা, ছাত্রসংখ্যা ৬০, ২। মেঘনা ছাত্রসংখ্যা ৪৭, ৩। নারিশা ছাত্রসংখ্যা ৪১, ৪। রাড়িখাল ছাত্রসংখ্যা ৫০, ৫। রাইপাড়া বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ৪৮, ৬। রাইপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ১৬, বাঁকুড়া জিলা ১। বাঁকুড়া সহর নৈশ বিদ্যালয় ছাত্র-সংখ্যা ২৫, ২। বেলনী নৈশবিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ৩৪,

৩। বিহার ঘুঙ্গিয়া—ছাত্রসংখ্যা ২৬, ৪। বেতুক ছাত্রসংখ্যা ২৫, ৫। বাঁকুড়া সহর বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ১১।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য বর্ত্তমানে আশ্রমের তিনটী বিদ্যালয় আছে। ছাত্র সংখ্যা ১৯৯। (১) অভয় আশ্রম শিক্ষায়তন (কুমিল্লা) ছাত্রসংখ্যা ২০। (২) নবাবগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যা, ৯৪। (৩) মালিকান্দা জাতীয় বিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যা ৮৫। শিক্ষায়তনের ছাত্রগণ সকলেই আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ করে। এই শিক্ষায়তনের প্রধান উদ্দেশ্য কর্ম্মী তৈরী করা। ছাত্রদিগকে আদ্য সর্ব্বান্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনিক সুতা কাটিতে ও কিছু কিছু কৃষি কার্য্য করিতে হয়। ইহাও শিক্ষার একটী অঙ্গ। বর্ত্তমানে শিক্ষায়তনে ২০টী ছাত্র আছে। খাওয়া, কাপড় চোপড় ইত্যাদি বাবদ প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক ১৪৲ দিতে হয় অবশ্য উপযুক্ত বিবেচিত হইলে কম টাকায় ছাত্র লওয়া হয়। গত বৎসর ২জন ছাত্র বিদ্যালয়ের পড়া সমাপ্ত করিয়াছে, একজন বিহার বিদ্যাপীঠে ও আর একজন আশ্রম মেডিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে।

স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা বেশী হইলে ছাত্রেরা যখন স্কুলে পড়া সমাপ্ত করিবে তখন তাহাদের জন্য আরও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাই। আমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন লোক আছেন যাঁহারা বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে পারেন; কিন্তু সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকের অভাব। শেষোক্ত বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে পারেন আশ্রম এরূপ দেশ-প্রেমিক কর্ম্মীর সাহায্য প্রার্থনা করেন।

নবাবগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা—৯৪)—ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত এবং ঐ পরিষদ হইতে মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে।

মালিকান্দা জাতীয় বিদ্যালয়ে ৮৫ জন ছাত্র আছে। অন্য ২টী বিদ্যালয়েও যেমন সকলকে খদ্দর পরিধান করিতে হয় এখানেও তদ্রূপ। মালিকান্দা বিদ্যালয়ে দশ বৎসরের উপর যে সমস্ত ছেলেদের বয়স তাহাদিগকে প্রতিদিন চরকায় সুতা কাটিতে হয়। ছোট ছেলেদের মধ্যে তকলী প্রচলন করা হইতেছে। মালিকান্দায় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ছেলেদিগকে হিন্দী পড়ান হয়; কিন্তু শিক্ষায়তনে উভয় বিষয়ই পড়ান হয়।

জাতীয় শিক্ষা প্রচলন করিতে যাইয়া দুইটী অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে। (১) উপযুক্ত পুস্তক ও (২) উপযুক্ত শিক্ষক। শৈশবকাল হইতে যাহাতে শিক্ষার্থীদের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় এরূপ পুস্তকের খুবই অভাব। অধিকাংশ ইতিহাসের পুস্তকই কাল্পনিক ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। এই অভাব পূরণের জন্য আশ্রম এডুকেশন বোর্ড পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করা যায় আগামী পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় এই অভাব অনেকটা দূর করিতে পারা যাইবে।

ডাক্তারী বিভাগ

এই বিভাগে (১) একটী আউটডোর ডিসপেন্সারি (২) ২০ জন রোগী থাকিবার উপযুক্ত একটী হাঁসপাতাল (৩) একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় (ছাত্রেরা সাধারণতঃ আশ্রমে থাকিয়াই পড়াশুনা করে।) ও (৪) একটি সেবাসমিতি আছে।

গত বৎসর ডিস্পেন্সারিতে ৩১৫৭টী রোগী ১৮৯৮ বার উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়া ৬৬৩, কালাজ্বর ১৬৫, আমাশয় ১৪৭, কৃমি ২৭১, বক্রকীট ৬, যক্ষ্মা ২৪, উপদংশ গণোরিয়া ইত্যাদি ১০৭। পুরুষ ২৪৩৬ ও মহিলা ৭২১। এই বিভাগের খরচ অবস্থাপন্ন রোগিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ এবং কলিকাতার অনেক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাগণের প্রদত্ত ঔষধ হইতে চলিয়া যায়। গত সনে ডিসপেন্সারিতে ১৫৭৪/০ আনা খরচ হইয়াছে।

(১) হাঁসপাতাল

হাঁসপাতালে ২০টী রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। গত বৎসরে ২১৫ জন রোগী হাঁসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে। গত সনে মোটের উপর হাঁসপাতালে ৪৪০০/১৫ টাকা খরচ হইয়াছে। ঐ টাকা নিম্নলিখিত ভাবে পাওয়া

গিয়াছে :—(ক) রোগীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত—১০৩৪৶১০, (খ) জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির দান—১১১৫৲, (গ) ত্রিপুরা রাজ—দান—২১৫৲, (ঘ) সহরে মুষ্টি ভিক্ষা হইতে প্রাপ্ত—১৮২৷৫ (ঙ) ঔষধ প্রাপ্ত—৮৬৪৷০, (চ) অজ্ঞাতভাবে প্রাপ্ত—২৪৮৷৶০, মোট—৪৪৬৮৷০

(২) মেডিক্যাল স্কুল

এই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই আশ্রমে থাকিয়া পড়াশুনা করে। এই স্কুলের উদ্দেশ্য একদল দায়ীত্ব ভাবে অনুপ্রাণিত ডাক্তার তৈরী করা—যাহারা শিক্ষা সমাপনান্তে আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও নানা জায়গায় বসিয়া ডাক্তার হিসাবে দেশের সেবা করিবে। তদুপরি চরকা, খদ্দর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবে। বর্ত্তমানে এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ২০। গত বৎসর প্রথম ৫ জন ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কার্য্য সুরু করিয়াছে।

(৩) সেবা সমিতি

কুরিয়া সহরে বাড়ী বাড়ী হইতে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ, প্রয়োজন হইলে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা এবং অত্যাবশ্যক রিলিফের কাজ করা এই সেবাসমিতির উদ্দেশ্য।

কয়লার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-ভবনে ইণ্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েসনের বার্ষিক সভা হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত ই এম টার্লটন এম এস সি। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কয়লার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় মোটেই নয়—বরং বেশ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। ভারতীয় কয়লার ব্যবসার প্রধান ভিত্তি হইতেছে রপ্তানি বাণিজ্য। এই রপ্তানি বাণিজ্য ১৯২৮ সনে বেশ বাড়িয়াছে। ১৯২৩ সনের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। ১৯২৮ সনের রপ্তানির পরিমাণ ২২ লক্ষ ৮০ হাজার টন। আমদানি করা কয়লার পরিমাণও কমিতেছে; ১৯২৩-২৪ সনে ৬ লক্ষ ১৪ হাজার টন আমদানি করা হয়। ১৯২৮-২৯ সনের প্রথম ৮ মাসের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮ শত ৭৫ টন। সারা দুনিয়ার অবস্থাটা আলোচনা করিলেও অবস্থাটা মোটেই সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয় না। তেল ও হাইড্রো ইলেকট্রিকের ব্যবহার বাড়িতেছে বটে, কিন্তু সারা দুনিয়ার কয়লার চাহিদা মোটেই কমিতেছে না। ১৯১২ ও ১৩ সনে সমগ্র জগৎ যত কয়লা খরচ করিয়াছিল। ১৯২৭ ও ২৮ সনে তাহা অপেক্ষা ২০ কোটি টন বেশী কয়লা হজম করিয়াছিল।

আরও কয়েকটী আশার কথা আছে :—(১) খনি-ওয়ালারা নানা দিকে খরচ কমাইয়াছে; (২) নূতন নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্য লওয়া হইতেছে; (৩) ভাল খনি ও ভাল সীমন্তলাতেই বেশী করিয়া কাজ চালানো হইতেছে; (৪) জাহাজের বয়লার চালাইবার জন্য কয়লা যে তেলের চেয়ে কম উপযোগী নয় তাহা নৌ-এঞ্জিনিয়াররা দেখাইতেছেন; বয়লার চালাইবার জন্য যদি কয়লা ব্যবহার করা নাও হয়, কয়লা হইতে উৎপন্ন তেলের সাহায্যে বয়লার চালানো চলিতে পারে; (৫) গুঁড়া কয়লার দর সম্বন্ধে কয়লাওয়ালাদের একটা ভুল ধারণা ছিল এবং সেই ভুলমতে বিক্রয় করিয়া বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়াছিল; (৬) চীন কয়লার দর সম্বন্ধেও একটা ভুল ধারণা ছিল। কিন্তু ভুল করিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ভুলের সাহায্যে বিক্রয়ের দর শাসন করা গত বৎসরে সম্ভব হয় নাই); (৭) যে সব কয়লা রেলে করিয়া দূরে পাঠানো হইবে তাহার ভাড়া কমিয়াছে।

ভারতীয় বীমার দেশী-বিদেশী

কলিকাতার "ইংলিশম্যান" শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথনের জন্য প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। বীমা সম্বন্ধে প্রতিনিধির সঙ্গে বিনয় বাবুর কথোপকথন হয়। নিম্নে সেই কথোপকথনের সারাংশ উদ্ধৃত হইল :—

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বীমা কোম্পানীর এই সংখ্যা-বৃদ্ধি দ্বারাই স্পষ্টরূপে বোঝা যাইতেছে যে, ভারতে কিরূপ শিল্পোন্নতি ঘটিতেছে। যৌথ ব্যাঙ্কগুলির

বহুই এই বীমা কোম্পানীগুলির সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কারণ এই উপায়ে পুঁজি সঞ্চিত হইতেছে, এই পুঁজি দিয়া নানা শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে।

বর্ত্তমানে ৬০টা বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে। ঐ সকলের দ্বারা বৎসরে প্রায় ১০ কোটি টাকার কাজ হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে টাকার কাজ হইত এখন তাহার প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশী টাকার কাজ হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে প্রিমিয়াম আদায় হইত এখন তার প্রায় তিন গুণ বেশী আদায় হইতেছে। পূর্ব্বে হইত সওয়া কোটি টাকা এখন হইতেছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা।

বর্ত্তমানে ভারতে বিদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ২০টা। উহাদের প্রিমিয়াম কাজ ভারতীয় কোম্পানী-গুলির প্রিমিয়াম কাজের চেয়ে কম। বিদেশী কোম্পানী-গুলির হাতে মাত্র আছে শতকরা ৪৩ অংশ এবং ভারতীয় কোম্পানীর হাতে আছে শতকরা ৫৭ অংশ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় কোম্পানীগুলির হাতে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ প্রিমিয়াম তহবিল ছিল। ইহাতেই বুঝা যায় ভারতীয় কোম্পানীগুলির পরিসর কিরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বীমা জগতে ভারতের এই অগ্রগতি ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে নানা প্রকার কর্ম্ম-প্রচেষ্টারই পরিচায়ক।

পরিণামদর্শী ভারত-সন্তান

বীমাকারী হিসাবে ভারতবাসীর প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মহাযুদ্ধের পর ভারতবাসী পরিণামদর্শী হইতে বা ভবিষ্যতের প্রতি নজর রাখিতে শিখিয়াছে। ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করিতে শিখিতেছে। ভারত চলিয়াছে এক বিরাট সামাজিক পরিবর্ত্তনের পথে। বোধ হয় এই অভিমত রেলের, মিলের, কুঠির, এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার, ব্যাঙ্কের ও দপ্তরি আফিসের কোম্পানী প্রভৃতির চাকুরেদের বেলাতেই খাটে। নতুন নতুন শিল্পে চাকুরী করার জন্য এই সমস্ত লোক বীমার কদর বেশ ভালরূপেই বুঝিয়াছে। শিল্পের উন্নতি যতই বেশী হইবে বীমাকারী মানুষের সংখ্যাও তত বাড়িয়া যাইবে। কারণ কলকারখানায় যে সকল লোক চাকুরী করে তাহারাই বীমা করিবে। নতুন শিল্পের সংখ্যা যত বাড়িবে বীমার বাজারেরও তত প্রসার হইবে।

ভারত-সন্তানের বীমা-সুধা

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষাবৃদ্ধি হইতেছে। এই শিক্ষাবৃদ্ধির জন্য ভারতবাসীর মনে বীমা করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। এখন আমাদের দেশে আই, এ, আই, এস-সি ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬,০০০। সাত আট বৎসরের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশান স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা প্রায় শতকরা ৫০ জন বাড়িয়াছে। প্রফেসনাল স্কুলগুলির ছাত্র-সংখ্যাও এই সময়ের মধ্যে প্রায় ঐ হারেই বাড়িয়াছে। সাধারণ ও প্রফেসনাল এই উভয়প্রকার শিক্ষাবৃদ্ধির জন্যই ভারতবাসীর মনে বীমা করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বীমাকোম্পানীর ক্যানভাসারগণকে লোকে ঘৃণার চোখে দেখিত। কিন্তু এখন এই সমস্ত মানুষকে লোকে বন্ধু বলিয়া আদর করে এবং বিপদবান্ধবের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া সম্মান করে। বীমা কোম্পানীর এজেন্টগণ সমাজসংস্কারের প্রকৃত অথচ নীরব কর্ম্মী। এই ক্যানভাসার ও এজেন্টগণের মধ্যে অনেকেই বেশ চতুর লোক এবং বীমা ব্যবসায়ে নিপুণ বা সিদ্ধহস্ত।

বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির মনে ভারতে তাদের ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ও ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে দুইটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ কেবলমাত্র জীবনবীমা ক্ষেত্রেই ভারতীয় কোম্পানীগুলি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; কিন্তু খনিজাগত বা শিল্পগত বীমাক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানীগুলির টিকি পর্য্যন্ত দেখার উপায় নাই। অগ্নি, জাহাজ, মোটর, এবং দৈবদুর্ঘটনা সম্বন্ধীয় বীমার ভারতীয় কোম্পানিগুলির হাতে শতকরা ৭।৮ অংশ আছে কিনা সন্দেহ। শিল্পবাণিজ্য

ব্যাঙ্কিএর মত শিল্প-বাণিজ্য বীমাও আমাদিগের হস্তগত করার দরকার।

দ্বিতীয়তঃ, অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলি যদি তাহাদের পুঁজি ভারতবর্ষের মধ্যেই খাটায় তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ জনমত আছে তাহা দূর হইয়া যাইবে। সর্ব্বত্র শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি যথেষ্ট লাভজনক হইতেছে, সুতরাং ইহাদের পুঁজিই বা সেরূপ হইবে না কেন? সুতরাং অভারতীয় কোম্পানীগুলি ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারতার জন্য অর্থ খাটাইলেই দেখিতে পাইবে যে, কেবলমাত্র অগ্নি, মোটর, জাহাজ ইত্যাদি বীমা ক্ষেত্রেই যে লভিয়া লাভ করিতেছে তাহা নয় জীবনবীমা ক্ষেত্রেও তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আর একটী সুবিধা—এই সমস্ত কোম্পানীর ব্যবসা নীতি হইতে ভারতীয় কোম্পানীগুলিও আধুনিক বীমা পরিচালন পদ্ধতি শিখিয়া লইবার অবসর পাইবে। ভারতীয় ও অভারতীয় কোম্পানীগুলির পরস্পরের মধ্যে এখন নিবিড় সহযোগিতার দরকার।

অধ্যাপক মহাশয় আরও বলেন, একটা নূতন বীমা আইন বিধিবদ্ধ করার দরকার। অ-ভারতীয় কোম্পানী-গুলিকে যাহাতে ভারতের ব্যবসাক্ষেত্রে পুঁজি চালিতে হয় সেরূপ কতকগুলি বিধি, ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে বিধিবদ্ধ করাইয়া লইতে হইবে। অভারতীয় কোম্পানীগুলিরও এই আইনে কোন রূপ ভয় পাওয়া উচিত নয়।

এখন কিরূপে বীমা তহবিল খাটাইতে হইবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার। ভারত শিল্প-বাণিজ্য হিসাবে অনুন্নত দেশ। সুতরাং পুঁজি খাটান-নীতি সম্বন্ধে ভারতীয় কোম্পানীগুলি আমেরিকান কোম্পানীগুলির একেবারে উল্টা। মার্কিণে ব্যবসা ও সম্পত্তিই মোটা অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিই মোটা অংশ লইয়া থাকে। অদূর ভবিষ্যতে কর্পোরেশান, মিউনিসি-পালিটি, ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতিও বীমা কোম্পানিগুলির নিকট ধার লইতে থাকিবে। এই সমস্ত স্থানই বীমা তহবিল খাটাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ টাকা এইভাবে খাটিতেছে। এই হার আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই ধারণা। মিউনিসি-পালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন সভাগুলি ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং রেলপথ ও সড়ক ইত্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে। এই সমস্ত কাজের জন্য বীমা তহবিলের অর্থ যে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

"ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা"

১৪ই এপ্রিল রবিবার সকাল দশটার সময় বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের ৭ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের জন্য "ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা" আলোচ্য বিষয়রূপে মনোনীত হইয়াছিল। পরিষদের গবেষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছু কিছু লেখাপড়া করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল জ্ঞাত হওয়াই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

আলোচনার প্রারম্ভে গবেষণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। তিনি বলেন যে, "ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা" শব্দতত্ত্ব ("ফিললজি") বিষয়ক কিছু নহে।

একটী অভিধান হইতে কতকগুলা কথা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলেই যে পরিভাষার সৃষ্টি হয় তাহা নহে। যে বিদ্যা সম্বন্ধে পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইবে, সে বিদ্যার "বস্তু" ও "তত্ত্ব" সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলে পরিভাষার সৃষ্টি অসম্ভব।

পরিভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহা বস্তু-বিজ্ঞানের তর্কশাস্ত্র মাত্র। প্রত্যেক বিজ্ঞানই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে এবং সেগুলি ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইহার ফলে কতকগুলি নূতন শব্দের ব্যবহার হয়, এবং তাহার ভালমন্দ যাচাই করিতে শুধু ইহাই লক্ষ্য করা দরকার যে, তাহা বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষীভূত বিষয়গুলি যথার্থ ভাবে প্রকাশ করিতেছে কিনা। এইভাবে পরিভাষা সৃষ্টি কোন বিশেষ কালের বা বিশেষ দেশের সমস্যা নহে; বিজ্ঞানমাত্রই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত।

পাশ্চাত্যেরা ধনবিজ্ঞান বিষয়ে বিশিষ্ট শব্দগুলি কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছে সে সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটী বিশদ বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, অ্যাডাম স্মিথ যে সব শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন সেগুলা সবই তাঁহার সময়ে চলিত ছিল না। সুতরাং তিনি সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলার পারিভাষিক অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রিকার্ডো ও মিল ঠিক সেই শব্দগুলাই চলিত কথারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অ্যাডাম স্মিথকে বোধ হয় হাজার খানেক শব্দ বাড়িয়া বাহির দেখিতে হইয়াছে।

তাহার পর বিলাতী আর্থিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তাহার ফলে ধন-বিজ্ঞানের শব্দ-সম্পদ্ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। অ্যাডাম স্মিথের পর রিকার্ডোর পুস্তক পড়িলেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে হয়। রিকার্ডোর জীবনকালে ইংলণ্ডে বিশেষভাবে শিল্পবিপ্লব ঘটিতেছিল। ইহাতে নানাপ্রকার আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তাহা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। ফলে নূতন নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে। রিকার্ডোর পর জন ষ্টুয়ার্ট মিল অর্থশাস্ত্রের বস্তুগত ও শব্দগত যে উন্নতি সাধন করেন তাহারও মর্ম এইরূপ।

প্রত্যেক যুগেই কৃষি শিল্প বাণিজ্য বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আর রাষ্ট্রও বাড়িয়াছে। এইরূপ জীবনের বাড়তি-মাফিকই পণ্ডিতেরা শব্দ সম্পদ্ বাড়াইয়া চলিয়াছেন। নয়া নয়া বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া পারিভাষিক আসিয়া পড়া হইয়াছে। এই হইল অর্থশাস্ত্রের পারিভাষিকের ধারা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী পণ্ডিত গস্‌সেন ধনবিজ্ঞানের ভিতর মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা ও অঙ্ক-বিজ্ঞান ঢুকাইয়া ধনবিজ্ঞানের শব্দসম্ভার বাড়াইবার পথ খুলিয়া দেন। সহ-সাময়িকেরা গস্‌সেনের আদর করেন নাই।

গস্‌সেন ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, অর্থ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত কার্যকলাপের অন্তরালে মনস্তত্ত্বঘটিত কাণ্ড আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই বিজ্ঞানবীর যে চিন্তাধারা প্রবর্তিত করেন, তাহাতে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তাহার ফলে ভাষাও পুষ্ট হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখক-সম্প্রদায় ধন-বিজ্ঞানকে অঙ্কের মাপকাঠিতে ফেলিয়া ইহাকে নূতন রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

বিশ বৎসর পরে জেভনস্ (ইংরেজ), মেঙ্গার (অষ্ট্রিয়ান) ও ওয়ালরা (সুইস)—এই তিন পণ্ডিত কর্তৃক গস্‌সেনের আলোচনা-প্রণালী একই সঙ্গে স্বাধীনভাবে নূতন করিয়া অনুসৃত হয়। ইতালিয়ান পণ্ডিত পারেতো তাঁহার গ্রন্থে উপরোক্ত গস্‌সেন, জেভন্স, মেঙ্গার প্রভৃতির সাদৃশ্য প্রচার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজ অধ্যাপক মার্শাল এমন একখানা বই লিখিলেন যাহাতে পূর্বের গ্রন্থগুলা আর পড়িবার দরকার হয় না বলিলেই চলে। অ্যাডাম স্মিথ হইতে মিল পর্যন্ত বিলাতের সনাতন "ক্লাসিক্" ধারাকে জেভন্স-মেঙ্গার-ওয়ালরার বিদ্যা দিয়া গুণ করিলে যে ফল দাঁড়াইতে পারে তাহাই হইতেছে মার্শালের মাথা ও মাথা-প্রসূত গ্রন্থ।

মার্শালই দুনিয়ার শেষ পীর নন। তাঁহার পরবর্তী যুগ আজকাল চলিতেছে। নতুন নতুন সমস্যা, নতুন নতুন মীমাংসা দেখা দিয়াছে।

বর্তমানে বিলাতের পিগু ও জার্মাণির হার্মস্ ইত্যাদি পণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর ধনতত্ত্ববিৎ। মার্শালের সময় হইতে আর্থিক জীবনে ও তত্ত্বে যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তদনুযায়ী শব্দ ও ভাষা ইঁহারা গড়িয়া লইতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক সরকার বিজকে কোন কোন বিষয়ে হার্মস্-পন্থী বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

চার্লস্-গ্রবর্ত্তিত "ডেন্ট ডিক্ট শাক্ট দিক্সেস আর্থিক্স" নামক বিপুল বিশ্বকোষ-সদৃশ ধনবিজ্ঞান-পত্রিকার আলোচনা-প্রণালীই বিনয় বাবুর নিকট আদর্শ স্বরূপ। তিনি ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য বটে। তাঁহার রচনায় ফরাসী কাগজপত্রের ছাপ কম নয়। কিন্তু পঠন-পাঠনের আর গবেষণার অনেক কাজেই তাঁহাকে জার্মাণ চিন্তাধারার বেশী সাহায্য লইতে হয়।

বাঙ্গলায় ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে? বিনয় বাবুর মতে—যেদিন হইতে বাঙ্গলায় খবরের কাগজ জন্মিয়াছে। কারণ, খবরের কাগজের অর্থই হইতেছে গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা আরম্ভ করা। আর গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিতে হইলেই অর্থনৈতিক আলোচনা বাদ দেওয়া চলে না।

বিনয়বাবুর মতে বাংলার ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একেবারে অভিনব বস্তু নহে। যে দিন হইতে বাঙ্গালীর আধুনিক আর্থিক জীবনের সুরু হইয়াছে সে দিন হইতে কতই এই আলোচনা ও তাহার ফলে আর্থিক পরিভাষার সৃষ্টি হইতেছে। এই পরিভাষার গোড়া পাকড়াও করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ে গিয়া ঠেকিতে হইবে। "স্বদেশী যুগের" আর্থিক আন্দোলন এবং আলোচনাও ইহার আধার যোগাইয়াছে। বঙ্গভাষার আর্থিক জীবন সম্বন্ধীয় শব্দগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা একসঙ্গে নানাদিক্ হইতে উদ্ভূত কিংবা আহৃত হইয়াছে।

ফার্সী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দী, আর ইংরেজী, কম সে কম এই পাঁচ ভাষার শব্দ-সম্পদে আমাদের বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা কাজে করিতে গিয়াও একশ' বেড়শ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীরা সজ্ঞানে-অজ্ঞানে এই পাঁচ পাঁচটা ভাষার সাহায্য লইতেছে।

বিনয়বাবু নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, তিনি সজ্ঞানেই হিন্দী, সংস্কৃত আর ইংরেজী এই তিন ভাষার ভাণ্ডার হইতে হামেসা শব্দ লুটিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার উপর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার যাহা হওয়াও তাঁহার সম্ভব হইয়াছে।

আর এক কথা। 'একশ বেড়শ' বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীরা এই যে অর্থনৈতিক পরিভাষা গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে উকীলদের দপ্তরখানা, সরকারী আদালত, জমীদারের কাছারী, বেপারী-দালাল-আড়তদারদের খাঁটি, বহির্ব্বাণিজ্যের বুজরুদির আফিস ইত্যাদি কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। হাটবাজার হইতে শব্দ আমদানি করিয়া সংবাদপত্রের লেখকেরা, উকীল-দালাল-হাকিমেরা বাংলার ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা পুষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিনয়বাবু নিজেও এই সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে শব্দ-সংগ্রহের কাজে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহার উপর পাড়াগাঁর নানা জাতির, নানা পেশার নরনারী যে সকল আটপৌরে শব্দ কায়েম করিতে অভ্যস্ত সেই সমুদায় হইতেও নানা শব্দ আপনা-আপনি আসিয়া জুটিয়াছে। এই ধরণের শব্দগুলার ভিতর যেগুলি বেশ সরস ও জোরাল এবং সঙ্গেই যোগগুলা হইবার সম্ভাবনা, সেই সব বাছিয়া বাছিয়া চালাইয়া দিবার দিকে বিনয়বাবুর নিজেরও ঝোঁক খুব বেশী। তাঁহার মতে এই ধরণের "পাঁচ ফুলে সাজি" সৃষ্টি করা, নেহাৎ সংস্কৃতপন্থী কট্টর "টুলো" পণ্ডিত ছাড়া বোধ হয় প্রত্যেক বাঙ্গালীরই সাহিত্য-সাধনার ভিতর পাকড়াও করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা বাংলার কৌলীন্যের দাবী করে না; ইহা একদম খিঁচুড়ী ও বর্ণ-সঙ্করের সন্তান। ইহা পুরাপুরি ঘরোয়া ও আন্তর্জ্জাতিক। বাংলা ভাষার অন্যান্য ঘরের মতন ধনবিজ্ঞানের কোঠেও "গুরু-চাণ্ডালী"র অবতারণা চলিতেছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রে তাঁহাদের আলোচনা আরম্ভ করেন। নরেনবাবু বাঙ্গলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গক্রমে বলেন যে, খাঁটি ধনবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। এই পুস্তকের নাম "অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার"। লেখকের নাম শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থখানা ছাত্র-বৃত্তিতে পড়ানো হইত। আজকাল আমরা এরূপ উন্নত হইয়াছি যে, ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর নীচে ধনবিজ্ঞান পড়ানো হয় না। ১৯০৭ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক গিরীন্দ্রকুমার সেন প্রণীত "ধনবিজ্ঞান" নামক একখানা বই বাহির হয়। এক বৎসরের মধ্যে বইখানার প্রথম সংস্করণ

ফুরাইয়া গিয়াছিল। নরেনবাবু ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ করেন। কতকগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে বটে কিন্তু এই চেষ্টা ধারাবাহিক বা উদ্দেশ্যমূলক হয় নাই। এজন্য অন্যপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

এইস্থলে নরেনবাবু স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের এক অভিমতের উল্লেখ করেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানচর্চ্চার যথেষ্ট উন্নতি করিতে হইলে বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করিলে চলিবে না। এজন্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অভ্যাগামী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এই ইউনিভার্সিটি যদি উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া ক্রমাগত বই লিখাইতে আরম্ভ করেন ও সেই সকল বই বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচন করেন কেবল তবেই স্থায়িভাবে এই উন্নতি করা সম্ভব হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যের ধনবিজ্ঞানশাখায় কোন্ কোন্ শব্দের ব্যবহার চলিতে থাকিবে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহায়তা লওয়া আবশ্যক। নরেনবাবু বলেন যে, স্যর ব্রজেন্দ্রনাথের এই সারগর্ভ মতানুযায়ী কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে।

তিনি আরও বলেন—বাংলা সাহিত্য এই হিসাবে হিন্দীসাহিত্যের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিমে এলাহাবাদ সহরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে "ভারতবর্ষীয় হিন্দী অর্থশাস্ত্রপরিষদের" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পরিষদ বিগত ৩ বৎসরে ৫ খানি ধনবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ বাহির করিয়াছে। হিন্দীভাষায় ১৪ খানি গ্রন্থের অনুবাদ আছে। শেষোক্ত বইগুলির মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থ অন্যতম। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বাঙ্গালী রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের এযাবৎ কোন বাংলা অনুবাদ হয় নাই।

তাহার পর নরেনবাবু এবং সুধাকান্তবাবু পরিভাষা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যেসকল শব্দ চয়ন করিয়াছেন তাহার দুইখানি পৃথক তালিকা প্রদর্শন করেন।*

নরেনবাবু তাঁহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দগুলার সংগ্রহ পাঠ করেন। প্রতিশব্দগুলা তিন উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছে :—(১) বাঙ্গালা গ্রন্থ ও দৈনিক মাসিক ইত্যাদি অধ্যয়ন; (২) ধনবিজ্ঞান-সেবীদের সহিত আলোচনা (৩) ব্যবসায়ী, দালাল, ব্যাঙ্কার প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা।

নরেনবাবু ও সুধাকান্ত বাবুর সংগৃহীত বহুসংখ্যক শব্দ লইয়া আলোচনা হয় এবং কোন্ কোন্‌টী ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবার যোগ্য, তাহা স্থির করা হয়। অনেক নূতন শব্দও সংগৃহীত হয়।

ইঁহাদের সংগৃহীত শব্দগুলি সাধারণের বোধ্য হইবে কিনা তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য সভায় উপস্থিত পাট-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র পাল এবং শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়দ্বয়ের মতামত লওয়া হয়। পরিষদের অন্যান্য গবেষকবর্গ এবং শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

* সবই খসড়া হিসাবে আকারে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। পাঠকেরা নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের দু' চার গণ্ডা আরও শব্দ পাঠাইয়া দিলে তাহাও এই প্রবন্ধের ভিতর জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। বলা বাহুল্য পরিভাষা-সংগ্রহের কাজ কোন দিনই বন্ধ হইতে পারেনা।—সম্পাদক।

গবেষণা-সহায়ক তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

আমরা আমাদের তাহের উদ্দিন আহ্‌মদের অকাল মৃত্যুতে যার পর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকগণ তাঁহার রচনার সহিত সুপরিচিত। বঙ্গীয় বনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষকগণের সঙ্গে তিনি গবেষণা-সহায়করূপে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার নিজ নামে প্রকাশিত রচনাবলী ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ রচনা তাঁহার নিকট আমরা পাইয়াছি। "আর্থিক উন্নতি"র অধিকাংশ সংবাদ-সমালোচনা-সম্বর্ত্তে সম্পাদক বা লেখকদের নাম প্রকাশিত হয় না। লেখাগুলা একটা লাবরেটরী, জ্ঞান-মন্থন, "সেমিনার" বা অনুসন্ধান-কেন্দ্রের সমবেত পঠন-পাঠনের ফলস্বরূপ লোক-সমাজে দেখা দিয়া থাকে। এই কারণে তাহের উদ্দিনের অনেক প্রবন্ধ পাঠকদের নিকট তাঁহার নাম প্রচার করিতে পারে নাই।

১৯২৪ সনের শেষের দিকে সম্পাদকের সঙ্গে তাহের উদ্দিনের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখনই তাহের উদ্দিন সম্পাদকের ছাত্র হিসাবে লেখাপড়া করিতে সুরু করেন। আজ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ধরিয়া তিনি নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে বস্তুনিষ্ঠ বনবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকা-পুস্তিকাদি পাঠ করিতেছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত জিদ ও রিস্ত প্রণীত "অর্থনৈতিক মতবাদের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে নানা অধ্যায়ের বাংলা তর্জ্জমা-নাম সঙ্কলন করা তাহের উদ্দিনের অন্যতম কার্য্য ছিল।

গবেষণা-সহায়ক হিসাবে তাহের উদ্দিনকে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে এবং কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতে যাইয়া প্রায় প্রতিদিনই দেশী ও বিদেশী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বীমা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইত। এই সকল তর্জ্জমা ও সারসংগ্রহ কাজে তিনি যেরূপ দক্ষতা লাভ করিতেছিলেন। তাঁহার বিচার ও সমালোচনা-শক্তি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছিল। আমেরিকা ও জাপান এই দুই দেশের আর্থিক খুঁটিনাটি বুঝিবার দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক দেখা যাইত। তাহা ছাড়া জেনেভার লীগ অব নেশন্‌সের আওতায় প্রকাশিত "আন্তর্জ্জাতিক মজুর মাসিক" তাঁহার নিত্য সহচর হইয়া উঠিতেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া যতখানি বিদ্যা থাকিলে গ্রাজুয়েটরা সাধারণতঃ এই ধরণের লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে সাহস করে তাহের উদ্দিনের ততখানি পাশ-করা বিদ্যা ছিল না। তিনি ছিলেন অসহযোগ যুগের ম্যাট্রিক-বয়কট-করা যুবা। তাহা সত্ত্বেও তিনি যতখানি বিদ্যানুরাগ, বিচক্ষণতা এবং সাহিত্য-শক্তি দেখাইয়াছেন তাহা যে কোনো অভিজাত যুবকের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বস্তু। বিদ্যাক্ষেত্রে তাঁহার ক্রমিক উন্নতি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

তাহের উদ্দিন ইংরেজি শর্টহ্যাণ্ড লইয়াও দক্ষ-হস্ত ছিলেন। তিনি সম্পাদকের প্রদত্ত ইংরেজি বক্তৃতার পুরাপুরি শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। অধিকন্তু বাংলা বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড-লেখা সুবিস্তৃত সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াও তিনি সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সম্পাদক প্রণীত "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" এবং "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক দুইখানা (৯০০ পৃষ্ঠা) বড় বইয়ের অনেক অধ্যায়েই তাহের উদ্দিনের হয় শর্টহ্যাণ্ড না হয় তর্জ্জমা স্থান পাইয়াছে।

তাহের উদ্দিন যারপর নাই পরিশ্রমী, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, দায়িত্বজ্ঞানশীল ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে "আর্থিক উন্নতি"র পঠন-পাঠন-ক্ষেত্র লোক-বলে দরিদ্র হইল। বাঙ্গলার অন্যতম চিন্তাশীল উদীয়মান লেখকের তিরোভাবে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

(২) বিদেশী

ইংরেজ চাষীর "ইন্দ্র-পূজা"

লণ্ডন, ১৯শে এপ্রিল

গ্রেট বৃটেনে বহুদিন ধরিয়া বারিপাত হয় নাই। ইহার ফলে প্রায় সকল ফসলই কয়েক সপ্তাহ করিয়া পিছাইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য উপাসনা মন্দিরে আগামী রবিবারে বারিপাতের জন্য উপাসনা করা হইবে।

ঝরণা সকল শুকাইয়া গিয়াছে। ফলে দার্জ্জিলিংয়ের চোত জমিগুলিতে এক বিন্দুও জল পাওয়া যাইতেছে না।

ম্যাটলকের নিকটবর্ত্তী খনির মালিকগণ ইহাতে বিব্রত হইয়াছেন। তাহারা এক ভবিষ্যদ্বক্তা নারীর নিকট গিয়া ভবিষ্যৎ বারিপাতের বিষয় জানিয়া লইবার কথা স্থির করিয়াছেন।

(রয়টার)

দুনিয়ার শক্তি-উৎস

প্রায় ৪৮টী জাতির প্রতিনিধি সম্মিলিত হইয়া দুনিয়ার শক্তি-উৎস সম্বন্ধে যে বিবরণী বাহির করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, শক্তি-উৎপাদনকারী হিসাবে কয়লার ব্যবহার ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। ১৯২৬ সাল হইতে তাঁহারা এই গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবীর কয়লা আরো চার হাজার বৎসরেও নিঃশেষ হইবে না তথাপি শক্তি-সংগ্রহের জন্য ১৯১৩ সালে যত কয়লা ব্যবহার করা হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা ৪০০০০০০০ টন কম কয়লার ব্যবহার হয়। এবং কয়লার ব্যবহার খুব দ্রুতই কমিয়া যাইতেছে। পেট্রল ইত্যাদির ব্যবহার, নিম্নশ্রেণীর ইন্ধন ব্যবহার এবং প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কয়লার ব্যবহার একেবারে কমিয়া যাইতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তির ভবিষ্যৎ এখন উজ্জ্বলতম বলিয়া মনে হয়। ১৯১৩ সালে যত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইয়াছিল ১৯২৭ সালে তাহা অপেক্ষা চার গুণ অধিক শক্তি উৎপাদিত হইয়াছে।

পেট্রল বাঁচাও

পেট্রলের বাজারে সার হেনরি নাম প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি তিনি টাইমস পত্রিকার এক প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পেট্রলের উৎপাদন যে হারে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে জগতে শীঘ্রই পেট্রলের অভাব অনুভূত হইবে। পেট্রলের উৎপাদন বৃদ্ধি যদি কমানো যায়, তাহা হইলে এখন যে হারে উৎপাদন চলিতেছে, তাহা আগামী ২০ বৎসর বজায় রাখা সম্ভব হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি কমাইবার জন্য সার হেনরি পেট্রল কোম্পানীগুলার যুক্তিবদ্ধ হওয়া পছন্দ করেন না। তাঁহার মতে, উহারা যদি এ বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা করে তাহা হইলেই যথেষ্ট।

পেট্রল বাঁচাইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেডারাল ট্রেড কমিশন মার্কিণ পেট্রল পরিষদকে জানাইয়াছে যে, এই সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলার একটা যুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া দরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেরও তাহাতে যোগ দেওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের যে সব রাষ্ট্রে পেট্রল উৎপন্ন হয়, সেই সব রাষ্ট্রের মত জানিবার জন্য গভর্ণরদের চিঠি লেখা হইয়াছে।

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি কমাইতে হইবে

জগতের নানা দেশে চিনির উৎপাদন বাড়িয়া যাইতেছে। এরূপভাবে চিনির উৎপাদন বাড়িতে থাকিলে চিনির দর

কমিয়া যাইবে। সুতরাং কি হারে উৎপাদন করিলে চিনির বাজার নষ্ট না হয়, তাহা নানা দেশের উৎপাদকদের মিলিয়া মিশিয়া ঠিক করা দরকার। সম্প্রতি জেনেভায় এ বিষয়ে একটা পরামর্শ সভায় বৈঠক বসিয়াছিল। সভায় যোগ দিয়াছিলেন জাতি-সঙ্ঘের বনবিজ্ঞান সমিতির প্রতিনিধিরা এবং চিনি নিয়ে যে সব দেশের স্বার্থ আছে সেই সব দেশ হইতে আগত বিশেষজ্ঞরা। আগামী ৩।৪ বৎসর চিনি-উৎপাদনের হার বাঁধিয়া দেওয়া এবং খাদকদের মধ্যে চিনি খাওয়া বাড়ানোর চেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ চলিতেছিল। তাহা শেষ হইয়াছে। পরামর্শের ফলে কিরূপ কাজ করা স্থির হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (১৯২৭-২৮)

এই পরিষদের ১৯২৭-২৮ সনের বার্ষিক বিবরণী বাহির হইয়াছে। নিম্নলিখিতরূপ গবেষণাকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বা এখনও চলিতেছে, যথা :—'১৮০০ সনের পর হইতে দুনিয়ায় মানবজাতির উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস' 'মাইগ্রেশান অ্যাণ্ড কলোনিজেশান অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী' 'ক্রিটিক্যাল সার্ভে অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স রিলেটিংটু আমেরিকান লেবার মার্কেট,' 'যুক্তরাষ্ট্রে হেল্থিকোর উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্ব ইতিহাস', 'ফ্লাক্চুয়েশান অব্ আউটপুট অ্যাণ্ড ওয়ার্কারস্,' 'সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের নিগ্রো' 'যুক্তরাষ্ট্রে নেগ্রিজ্যান বহুর সমস্যা'।

সমাজবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ

পনরখণ্ড বিরাট গ্রন্থ। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য, সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে সাড়ে সাত ডলার সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমিতিগুলির সভ্যগণের পক্ষে সাড়ে চার ডলার। প্রথম খণ্ডখানি ১৯২৯ সনের গ্রীষ্মের মধ্যে বাহির হওয়ার কথা। প্রথম খণ্ড বাহির হওয়ার পর বৎসরে দুই কিংবা তিন খণ্ড করিয়া ক্রমশঃ বাহির হইবে। প্রাপ্তি-স্থান, কেম্ব্রিজ প্রেস, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী।

সমাজ-বিজ্ঞানের সারাংশ

সম্প্রতি আমেরিকায় একখানি নূতন পত্রিকা বাহির হইতেছে। পত্রিকাখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "সমাজ-বিজ্ঞানের চুম্বক সারাংশ"। পত্রিকার নামকরণ হইতেই বোঝা যাইতেছে কি বিষয় উহাতে বাহির হইবে। সমাজ-বিজ্ঞানের ৭টি শাখার (যথা, ইতিহাস, বনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, তুলনামূলক তথ্যসংগ্রহবিদ্যা-ষ্ট্যাটিস্-টিক্স্ ও নৃতত্ত্ব—কোনটীই বাদ দেওয়া হয় নাই) এই-সমস্ত বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধের প্রায় ১৫,০০০ চুম্বক প্রথম বৎসরে বাহির করা হইবে। পত্রিকাখানি হইবে মাসিক্। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা হইতেই সার সঙ্কলন করা হইবে। পত্রিকার সম্পাদকগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে ২৬০০ খানি সাময়িক পত্রিকা হইতে চুম্বক লওয়া হইবে। ইহার ভিতর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে ১০০০ খানি পত্রিকা লওয়া হইতেছে এবং পত্রিকাগুলি পরীক্ষাও করিতেছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়। কিয়েল এবং বার্লিনের গবেষণা-মন্দিরও এই পত্রিকায় রসদ যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

এই পত্রিকার সম্পাদনকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে একটী সম্পাদক-সঙ্ঘ দ্বারা। এই সম্পাদক-সঙ্ঘের মধ্যে থাকিবে ডিরেক্টরগণের একটী বোর্ড, আন্তর্জ্জাতিক উপদেষ্টা-সম্পাদক সমিতি, পরামর্শদাতা সম্পাদক এক দল, এবং আটজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত একটী কেন্দ্রীয় সমিতি। নিম্নলিখিত সমিতিগুলির প্রতিনিধি লইয়া বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্ গঠিত হইবে; যথা—আমেরিকান নৃতত্ত্ব সমিতি, আমেরিকান বনবিজ্ঞান সমিতি, আমেরিকান ভৌগোলিক সমিতি, আমেরিকান ঐতিহাসিক সমিতি, আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি, আমেরিকান সমাজতত্ত্ব সমিতি ও আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সমিতি। এই চুম্বক-সঙ্কলনকার্য্যে প্রায় ৮০০ জন লোক মোতায়েন রহিয়াছে। পত্রিকা প্রকাশিত হয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্ত্তৃক। এই পরিষদই, পত্রিকাখানি বাহির করার জন্য আংশিক অর্থ-সাহায্য করে।

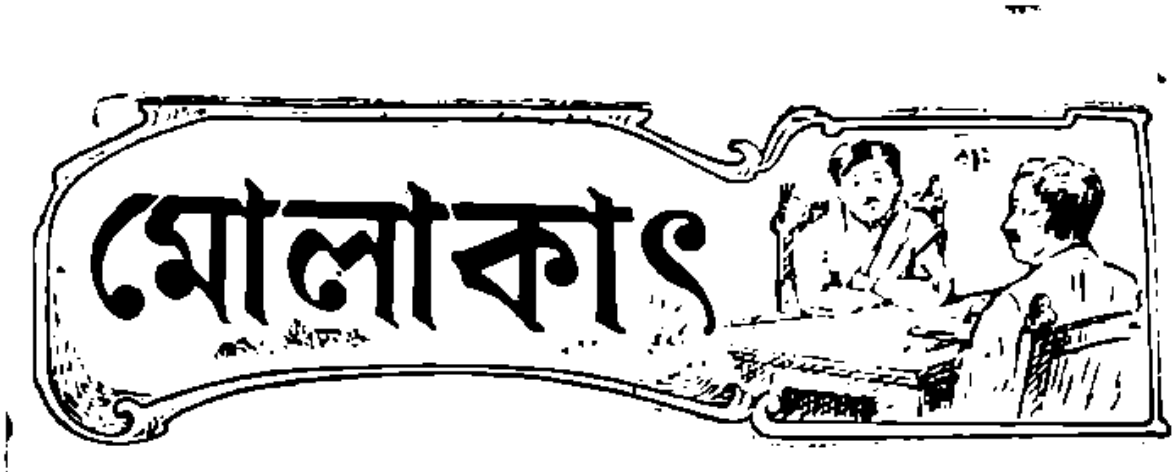

চাই বাঙ্গালীর তাঁবে আরো কাপড়ের কল

[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেটের একজন ডিরেক্টর। সম্প্রতি ইহারা বাঙ্গালা দেশে এক কাপড়ের কল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তার সার নিম্নে দেওয়া গেল। শ্রীসুধাকান্ত দে]

প্রঃ—আপনারা কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট লিমিটেড্ নাম দিয়া যে কোম্পানী খাড়া করিয়াছেন, তার উদ্দেশ্যটা কি? কোন্ কোন্ ব্যবসায় নামিবেন?

উঃ—নাম হইতেই বুঝিতে পারিবেন, একটা মাত্র ব্যবসার দিকে নজর আমাদের নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমরা আমাদের শক্তি তুলার দিকে অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে একটা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার দিকে প্রয়োগ করিতেছি। এইটা খাড়া করিতে পারিলে অন্যান্য দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ আমাদের ঘটিবে।

প্রঃ—আপনাদের প্রতিষ্ঠানটার নামে কেশবলাল জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহার কোন সার্থকতা আছে কি?

উঃ—হাঁ। আমরা যাঁর কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাঁর নাম কেশবলাল মেহ্তা। আমরা বাঙ্গালী, শিখিয়া গিয়া হয়ত বোম্বাইওয়ালাদের সহিতই টক্কর দিব, তথাপি এই ভদ্রলোক আশ্চর্য্য যত্ন ও আন্তরিকতার সহিত আমাদিগকে তাঁর বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। তাই এই কোম্পানী খাড়িবার কালে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নামটা জুড়িয়া দিয়াছি।

প্রঃ—এই কোম্পানীর "আমরা" বলিতে কাহাদের বুঝিব?

উঃ—সভ্যদের। ইহাঁরা এক্ষণে সংখ্যায় ১২ জন হইয়াছেন।

প্রঃ—আপনাদের কোম্পানীর আর্থিক যোগানটা কিরূপ ভাবে চলিতেছে?

উঃ—মোট ৪০টা শেয়ারে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক শেয়ারের দাম ২৫০৲ টাকা। আমাদের ছাপা মেমোরেণ্ডামে উদ্দেশ্য, শেয়ার প্রভৃতির কথা বিবৃত রহিয়াছে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনারা যে কাপড়ের কল খুলিতে চাহিতেছেন, আপনারা বাঙ্গালার বাজার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি এখানে কাপড়ের যথেষ্ট টান আছে কি না?

উঃ—দেখুন, বঙ্গলক্ষ্মী বলি আর মোহিনী মিল বা চাকেশ্বরী কটন মিল বলি, বাজারে ইহাদের কাপড় পড়িয়া থাকে না। বরং কাপড়ের দোকানে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিতে হয়। অর্থাৎ ইহাদের এখন উৎপাদনের যত ক্ষমতা আছে তা আরও ঢের বাড়িলেও যোগান কুলাইয়া উঠিতে পারিবে না।

প্রঃ—আমার প্রশ্নটাকে দুইভাগে চিরিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রথমতঃ দেখুন, বাঙ্গালার বাজার বিলাতী, বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বাঙ্গালী মিলওয়ালারা দখল করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের টানটা মিটাইতেছে। এখন আপনি যদি সেইখানে বাঙ্গালীর তৈরী কাপড় আনিয়া ফেলেন তবে বেশ বড় রকম প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে না কি? এই প্রতিযোগিতায়

আমাদের নিশ্চিত অধঃপাত হইবে আপনি তা বলিতে পারেন কি ?

:—আপনার প্রশ্নটা সমীচীন বটে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তা আপনাকে পরে বুঝাইয়া বলিব। কিন্তু ঠিক এখনি তা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ গত ১৯।২২ বৎসরের হিসাব লইলে আপনি দেখিবেন, বিলাতী কাপড় কিরূপ হটিয়া যাইতেছে। হিসাবটা এই :—

আমাদের কাপড় যোগাইত—

১৯০০ সনে—ম্যাঞ্চেষ্টার ৬৪%
ভারতীয় কলগুলি ৯%,
তাঁত ইত্যাদি ২৭%

আমদানি ২৬%
ভারতীয় কল ৪২%
তাঁত ইত্যাদি ৩২%

আপনি এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালা দেশে বোম্বাই ও আমেদাবাদের অবস্থা অব্যাহত থাকিবে এমন কি কিছু বাড়িবে বলিয়াও যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি বাঙ্গালী পরিচালিত কলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেননা যে ২৬% বা তাহি কাছাকাছি পরিমাণ আমদানি হইতেছে তা যোগাইবার জন্য স্বচ্ছন্দে এখানে অনেকগুলি কল চলিতে পারে।

প্রঃ—বিলাতী কাপড় বাঙ্গালায় পরাজিত হইতেছে, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই পরাজয়ের সুযোগটা যে বোম্বাই ও আমেদাবাদ আগে ও বেশী গ্রহণ করিবে না এমন কথা আপনি বলিতে পারেন কি ? বাঙ্গালার বাজারে অদূর ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে যে বোম্বাই আমেদাবাদের সঙ্গে বাঙ্গালার একটা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইবে, তা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই, সেই প্রতিযোগিতায় আমরা পরাজিত হইব না, তা আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন কি ?

উঃ—আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে একটা বিষয় আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কাপড়ের বাজারে সেন্টিমেন্ট অর্থাৎ মনোভাব কম ওলটপালট ঘটায় না। দেখুন, কোন বাঙ্গালী বিলাতী কাপড় কিনিতেছে, এ আপনি আজকের দিনে সহজে কোথাও দেখিতে পাইবেন না। তারপর বাঙ্গালার মিলের তৈরী কাপড় পাইলে কেহ সহজে অন্য স্থানের কাপড় কিনে না। কাপড়ের ব্যবসায়ীদের ইহা প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা।

প্রঃ—আমি এই সেন্টিমেন্টের শক্তির কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু আপনারা কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছেন। আপনারা কি শুধু সেন্টিমেন্টের উপর ভর করিয়া এত বড় একটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ? ব্যবসায়ী হিসাবে আর্থিক খতিয়ানটাই আপনাদের নিকট বড় হওয়া উচিত নয় কি ? আমি সেই দিক্ হইতে জানিতে চাই বাঙ্গালার অবস্থা কি প্রকার।

উঃ—কল প্রতিষ্ঠা করিলে আর্থিক দিক্ হইতেও আমরা লাভবান্ হইব, ইহা আপনাকে দেখাইতে পারিব। কাপড়ের কাটতি নির্ভর করে প্রধানতঃ দুইটা জিনিষের উপর (১) গুণ (২) দর। বাজারের অন্যান্য কাপড়ের চেয়ে কম না হোক্ অন্ততঃ ঐ দরে দিতে না পারিলে, আমাদের কাপড় বিকাইবে না। আর গুণে ত নিকৃষ্ট হইলে চলিবে না। সুখের বিষয়, এই দুই দিকেই বাঙ্গালার কাপড় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাঙ্গালীর কাপড়ের কলে প্রায় আমেদাবাদের তুল্য উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরী হইতেছে। আর দরেও বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলনায় আমাদের সুবিধা রহিয়াছে। কয়লার খনি আমাদের ঘরের কাছে থাকায় আমরা ৫% সুবিধা ভোগ করিতেছি। এই ৫% সুবিধা কম নয়।

প্রঃ—কাপড় প্রস্তুতের কোন্ দফা বাবদ কত খরচ পড়ে জানিতে পারি কি ?

উঃ—সব চেয়ে মোটা অংশটা যায় কাঁচা মাল অর্থাৎ তুলার

অন্ত ৬২·৪%। স্পিনিং বিভাগের ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড চার্জ্জ ১৭·৫%, আর উইভিং বিভাগের ঐ চার্জ্জ ২০%। মোটা কাপড় (কি চাদর ইত্যাদি) তৈরীর জন্ত পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ইত্যাদির তুলায় চলিতে পারে। কিন্তু ধুতির জন্ত আপনাকে মান্দ্রাজ ও পাঞ্জাবের তুলা আমদানি করিতেই হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালা ও বোম্বাই আমেদাবাদের একই রকম অবস্থা। তাহারা পাঞ্জাব ও মান্দ্রাজ হইতে তুলা আমদানি করে। মুরব্বি ও উচ্চহারে ভাড়া ইত্যাদি উভয়েরই সমান দাঁড়ায়। তবে ওদের ঘরের কাছে কয়লা নাই, আমাদের আছে। এইটা আমাদের লাভ।

প্রঃ—বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বাঙ্গালা তিনটার অবস্থা তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিন, আমরা কোন্ অবস্থায় রহিয়াছি।

উঃ—কলিকাতার বাজারে প্রতিযোগিতা যদি আরম্ভ হয় আমেদাবাদকে সহজে হঠানো সম্ভবপর হইবে না বটে, কিন্তু বোম্বের সঙ্গে যে জিতিয়া যাইব, তা আপনাকে এখনই বুঝাইয়া দিতেছি। আপনারা বোম্বে মিলওয়ালাদের বিস্তর লাভের কথা শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাদের সে স্বর্ণ যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। ১৯১৭ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত বোম্বাই মিল গুলির লভ্যাংশ বিতরণ ক্রমাগত কমিয়াছে। যথা:—

১৯১৭—২২·২%
১৯১৮—২৫·৭%
১৯১৯—৪০·১%
১৯২০—৩৫·২%
১৯২১—৩০·০%
১৯২২—১৬·৪%
১৯২৩—৪·৯%
১৯২৪—৩·২%
১৯২৫—২·২%

আর ১৯২১ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের লভ্যাংশ বিতরণের হার দেখুন—

১৯২১—৬০½%
১৯২২—৩০¼%
১৯২৩—১২½%
১৯২৪—১২½%
১৯২৫—১৪½%

দুইয়ের তুলনা হইতে উভয়ের ব্যবসার অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রঃ—বোম্বাইর এ প্রকার অধঃপতনের কারণটা জানিতে পারি কি?

উঃ—কারণ একটা নয়, অনেক আছে। আপনাকে কতকগুলি একে একে বলিতেছি। প্রথমতঃ, আপনি একটা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কিনা জানি না—ষ্ট্রাইক ধর্ম্মঘট ইত্যাদির কেন্দ্র বেশীর ভাগ বোম্বাই, আমেদাবাদ নয়। ধর্ম্মঘটের দরুণ বোম্বাইর কলওয়ালারা ভয়ানক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। তাদের মজুর-সমস্যা আজ পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, জাপানী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় বোম্বাই বেশ কাবু হইয়াছে। জাপানী বস্ত্রের উপর শুল্ক বসাইবার উৎসাহ কেন বোম্বাইর এত তীব্র, তা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ, বোম্বাইতে জলের কর অত্যন্ত বেশী। জিনিষপত্রের দাম ও ঘর-ভাড়া কলিকাতা বা আমেদাবাদের চেয়ে বেশী। চতুর্থতঃ, বোম্বাই রক্ষণশীল। ব্যবসায় বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব উদ্ভাবন ইত্যাদিকে কাজে লাগাইবার শক্তি রাখা চাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ না খাওয়াইবার দরুণ বোম্বাইকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। অন্ত দিকে, আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলি এখন এক দল আদর্শবাদী লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, যারা মুরুব্বির বলে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেদের উন্নতি করিয়া লইতেছে। মজুর-সমস্যা অকিঞ্চিৎকর, মজুরেরা বেশী পটু, যন্ত্রপাতি সব একেলে, অপচয় নিবারণের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কাজেই প্রতিযোগিতায়

আমেদাবাদ মিলিবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

প্রঃ—আচ্ছা যেকালে বোম্বাই মজুর-সমস্যায় এরূপ বিব্রত হইতেছে, সেকালে আমেদাবাদে ঐ সমস্যা দেখা দিতেছে না ইহার কারণ কি ?

উঃ—মজুর আন্দোলন, মজুর সমস্যা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহার উগ্রতা হ্রাস করিবার ভার ব্যবসাপতিদের উপর। এই দেখুন বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা তাদের অত্যন্ত লাভের মুখে মজুরি ৩৫% বাড়াইয়া দিয়াছিল। যে সময় ৪০% ডিভিডেণ্ড বিতরিত হইতেছে সে সময়ে ৩৫% এর বেশী মজুরি দেওয়া যত সহজ, ৫২% এর সময় তত সহজ কি ? বোম্বাই ভবিষ্যতের এই দিকে না চাহিবার দরুণ বিপদে পড়িয়াছে। অন্যদিকে আমেদাবাদ বাড়াইয়াছিল মাত্র ১২%। এ বিষয়ে আমেদাবাদে ও বোম্বাইতে আরও একটা পার্থক্য দ্রষ্টব্য। অনসূয়ের আম্বালাল সারাভাইয়ের নাম আপনারা জানেন। কিন্তু ইনি যে মজুরদের জন্য কি করিয়াছেন তা জানেন না। ইনি তাঁর মিলে বোনাসের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। অর্থাৎ মিল ভাল চলিলে ও একটা নির্দ্দিষ্ট হারের উপরে লাভ করিলে মজুরদেরকেও একটা লভ্যাংশের ভাগ বিতরিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে ষ্ট্রাইকের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। আমেদাবাদের কলের মালিকগণ এ বিষয়ে সতর্ক ও আদর্শবাদীও বটে।

প্রঃ—তা হইলে আপনার মতে বোম্বাইয়ের সহিত টক্করে আমাদের ভিন্নের ভাবিবার নাই। কিন্তু আমেদাবাদের সহিত পারিবে কি ?

উঃ—আমেদাবাদের মিলের কাপড়ই বাঙ্গালার বাজারে বেশী বেচিতে পাইবেন। চাদর ইত্যাদি মোটা জিনিষ আসে বোম্বাই হইতে। বস্তুতঃ, আমেদাবাদ প্রায় ম্যাঞ্চেষ্টারের তুল্য উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম ধুতি প্রস্তুত করিতেছে। আমেদাবাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা কতদূর কি করিতে পারিব এখন বলা শক্ত। তবে কলের সুবিধা আমাদের ১নং সুবিধা। আর বাজার আমাদের ঘরের ভিতর, আমেদাবাদের মত দূরে চালান করিতে হইতেছে না ইহা ২ নং সুবিধা।

প্রঃ—আপনাদের কাপড়ের কল স্থাপন উপলক্ষ্যে সাধারণভাবে কোন কথা বলিতে চান কি ?

উঃ—দেখুন, এঞ্জিনিয়ারিং, স্পীনিং ও টেক্‌নিক্যাল দিক্ হইতে আমাদের ভাবিবার কিছু নাই। আমরা সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত লোক ভর্ত্তি করিয়াছি, যারা বাস্তবিক উৎকৃষ্ট কাপড় সস্তায় তৈরী করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের অন্তরে টাকার ৮ পয়সাওয়ালা লোকেরা যদি আমাদের সহিত আসিয়া যোগ দেন ত আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাতে তাঁদের মনঃক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। আমরা অবিলম্বে লাভজনকভাবে কল চালাইতে পারিব বিশ্বাস করি। বাঙ্গালা দেশের একটা বড় অভাব যদি বাঙ্গালীর ছেলে মিটাইতে পারে, সেটা খুব শোভন হয় না কি ?

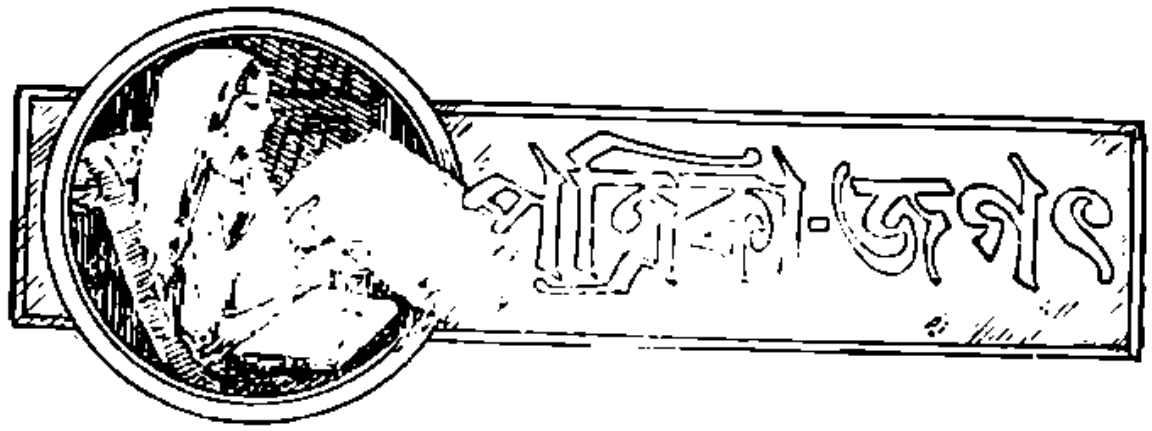

"ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন"

এইখানে একসঙ্গে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ (১৯২৯) এই তিন সংখ্যার রচনা-সম্ভারের পরিচয় দেওয়া হইল। এই মাসিক পত্রিকাখানির যে কোন সংখ্যা খুলিলে ইংরেজের বিশাল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বিরাটত্ব অনুভব করা যাইবে।

জানুয়ারী সংখ্যায় আছে: (১) ব্যাঙ্কিং বছর—গ্রেট ব্রিটেনের ব্যাঙ্কগুলির কারবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (২) ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ও মাল-বাজারের সংযোজন (৩) মুদ্রানীতি ও দেশের ব্যবসা বাণিজ্য (৪) ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ইমারতের পুনর্গঠন (৫) আধুনিককালে ট্রাষ্টি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক (৬) কানাডায় বার্কলেজ ব্যাঙ্ক (৭) ইটালো-বেলজিয়ান ব্যাঙ্ক (৮) কানাডায় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান (৯) বার্কলেজ কলোনিয়াল ব্যাঙ্কের উন্নতি (১০) নাইট ব্যাঙ্কিং (১১) দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যাঙ্কিং (১২) উত্তর আমেরিকায় স্বর্ণপতি (১৩) চীনা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক (১৪) কতকগুলি ব্যাঙ্ক রিপোর্টের তুলনামূলক পরিচয় (১৫) আর্থিক সমালোচনা—মুদ্রাসঙ্কট (১৬) ব্লক একসচেঞ্জ (১৭) বিলস্ অব্ একসচেঞ্জ বা হুণ্ডির কাজ কারবার।

ফেব্রুয়ারী সংখ্যা: (১) বিলাতী ব্যাঙ্কগুলির মুনাফা ও উদ্বৃত্ত পত্র (২) ধার ও ব্যবসা, ১৯২৮ (৩) নয়া কৃষি ব্যাঙ্ক (৪) আর্জেন্টাইন ব্যাঙ্কিং, ১৯২৮ (৫) ব্যাঙ্কার্স ক্লিয়ারিংস, ১৯২৮ (৬) ভারতে ভূমিবন্ধকী বা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কিং (৭) ব্যাঙ্ক রেট চার্ট ও ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ (৮) লণ্ডনের বিলিময় বাজার একসচেঞ্জেস (১১) আর্থিক দুনিয়া—মুদ্রা-সমস্যা (১১) কতকগুলি ব্যাঙ্ক রিপোর্টের তুলনামূলক সমালোচনা (১২) কলিকাতা ব্যাঙ্কার (১৩) ব্যাঙ্কের খরিদ্দার ও তাহাদের ঋণ-ক্ষমতা (১৪) ১৯২৮ সনের বীমা কারবার। মার্চ সংখ্যায় আছে:—(১) ব্যাঙ্কার ও শিল্প (২) ব্যাঙ্ক রেটের চড়া হার, ভারতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক শতকরা ৮ টাকা হারে সুদ ঘোষণা করিয়াছে (৩) ভারতীয় ব্যাঙ্কিং (৪) রাইস ব্যাঙ্ক রিপোর্ট (৫) কয়াদী ব্যাঙ্কের রিপোর্ট (৬) সুইস ব্যাঙ্কের পুঁজি (৭) অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যাঙ্কিংএর প্রসার (৮) ব্যাঙ্ক রিপোর্টের সমালোচনা (৯) ব্যাঙ্ক রিপোর্ট ও সভা সমিতি।

"ব্যাঙ্কার"

জানুয়ারী ১৯২৯ সংখ্যায় আছে: (১) ব্যাঙ্কারের ডায়রী, ক্ষতিপূরণ অনুসন্ধান, গ্রীক লোন, জার্মাণির স্বর্ণ, স্কাণ্ডিনেভিয়ার আর্থিক ইউনিয়ান, ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক অবস্থা, ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্ত্তন। (২) ব্রিটিশ শিল্প ও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নীতি। (৩) ১৯২৮ সনের ব্যাঙ্কিং। (৪) জার্মাণির ঋণ ও বিশেষজ্ঞগণ। (৫) শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ান ও পুঁজিপতির আত্মরক্ষা। (৬) গ্রাণ্ডলাড সিটি কোং ইমারত। (৭) চেকের ইতিহাস। (৮) সুইট-সার্লাণ্ডের ব্যাঙ্কিং। (৯) আমেরিকান ব্যাঙ্কিং সমস্যা।

"মান্থলি লেবার রিভিউ"

আমেরিকা—নভেম্বর ১৯২৮ সংখ্যায় আছে:—

(১) লৌহ ইস্পাত শিল্পে এমল্গামেটেড্‌ সোসাইটির বিবরণ। (২) শিল্প রিসার্চ্চ সমিতি। (৩) ইউনিয়ান বেতন হার, ১৯২৮। (৪) শিল্প দুর্ঘটনা বোর্ড ও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ। (৫) আমেরিকার বড় বড় সহরের ইমারত প্রস্তুতের খরচ। (৬) আমেরিকার সরকারী লেবার ব্যুরোর কারবার। (৭) আমেরিকার শিল্প সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ানের মতামত। (৮) বার্ম্মার খনি অবস্থা, ১৯২৭। (৯) শিল্প কারখানায় স্ত্রী-মজুর। (১০) বালকবালিকার কারখানা শ্রম। (১১) আমেরিকার মেটালার্জ্জিক্যাল ওয়ার্কসে দুর্ঘটনা। (১২) আমেরিকার সেফটি কংগ্রেস। (১৩) ছাপাখানায় মানুষের জীবনী শক্তি। (১৪) উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পারিবারিক ক্ষতি। (১৫) বলিভিয়ার স্ত্রী-ক্ষতিপূরণ আইন। (১৬) বীমাজগৎ।

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ সংখ্যা। (১) অষ্ট্রেলিয়ার শিল্প-বিরোধ ও আপোষ নিষ্পত্তি আইন, মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোহেন্‌ওয়ারের এই প্রবন্ধে দেখিতেছি যে ১৯২৭ সনে অষ্ট্রেলিয়ার শ্রম-বিরোধের জন্য ১,৭১২,০০০ কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে আর ২,৬৬৬,০০০ পাউণ্ড বেতন মারা গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ের তুলনায় আজকাল শ্রমিকদের বেতন শতকরা ১০ ভাগের কিঞ্চিৎ বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। লেখক অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমবিরোধ-সংক্রান্ত ১৯২৮ সনের আইনের বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধে করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার পার্ল্যামেণ্টারি লেবার পার্টি এই আইনের উপর খুব চটা। তাঁহারা আগামী নির্ব্বাচনে এই আইন সামনে রাখিয়া নির্ব্বাচন-যুদ্ধে লড়িবেন ও নির্ব্বাচনে জয়ী হইলে তাঁহারা নয়া পার্ল্যামেণ্টে এই আইনের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন, এই মর্ম্মে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই আইন নাকি এরূপ মারাত্মক যে, ইহা ট্রেড ইউনিয়ান গুলিকে নিষ্পেষণ করিবে। (২) মার্কিণ শিল্প বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা। ভবিষ্যৎ ক্রীতা সমাজের রুচি কিরূপ হইবে, তাহাদের কোন জিনিষ বেশী দরকার হইবে এই সকল বিষয় আগে হইতে ঠিক বুঝিতে পারিলে ব্যবসা-বাণিজ্য সেই ভাবে পরিচালনা করিলে লাভবান হওয়া যায়। দুই দশ বৎসর পরের মানব সমাজের হাত বুঝিতে পারা খুব কঠিন কাজ। আমেরিকায় এই কাজের জন্য বিস্তর বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছে। আন্তর্জ্জাতিক লেবার আফিসের জনৈক রিসার্চ্চ গবেষক মার্কিণের ভবিষ্যৎ চিন্তা সম্বন্ধে এই আলোচনা করিয়াছেন। (৩) জাপানী শিল্পকারখানায় মেয়ে মজুর—শ্রীযুক্ত এফ আদ্‌লাওয়া, পি, এইচ, ডি মহোদয় বর্ত্তমান জাপানের শিল্পোন্নতি ও তাহার কারণ বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। (৪) কতকগুলি ইউরোপীয় দেশের ইমারত শিল্পে সাময়িক বেকার অবস্থা। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যাটিস্টিকস্‌ অধ্যাপক হার্স এই প্রবন্ধে ইংলণ্ডের ১৯১৩-১৯২৭ এই ১৪ বৎসরের ইমারত-শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(৫) রিপোর্টস—আমেরিকার মেয়ে শ্রমজীবী ও বিশেষ আইনের ফল। সুইডেনে শিশু শ্রমজীবী ১৯২৭-২৮। কুইনসল্যাণ্ডে বেকার বীমা, ১৯২৭-২৮।

(৬) ষ্ট্যাটিস্টিকস্‌—দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অধুনা পরিবর্ত্তিত বেতন-হার।

(৭) কাজ ও বেকার—গোটা ইয়োরামেরিকার কিরিস্তি।

(৮) জীবন ধারণের মাপকাঠি ও খুচরা বাজার দর—দুনিয়ার বিভিন্ন সহরের পারিশ্রমিক হার ও খাদ্যদ্রব্যের খুচরা দাম।

(৯) মাইগ্রেশান—হিজরত—আমেরিকায় ১৯২৭-২৮ সনে কতজন হিজরত করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯২৭। বোম্বাই হইতে ১৯২৭ সনে মোম্বাসা, ইউগাণ্ডা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, দারুল এসলাম, আবাদান, মোহাম্মেরা, বসরা, বাহরিন, পারস্য, ইরাক ও ব্রিঃ সোমালিল্যাণ্ডে ভারতের কত কারিগরদের মাইগ্রেশান। ১৯২৭ সনে সিংহলে ১৫ লক্ষ ১৪ হাজার ভারতবাসী বসতি স্থাপন করে। ইহা ছাড়া বিনা সাহায্যে ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪০জন ঐস্থানে গমন করে ও বসতি স্থাপন করে।

"দি ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল"

জানুয়ারী ১৯২৯। (১) মাসপঞ্জী—বোম্বাইএর প্রম অবস্থা, ল্যাঙ্কাশিয়ার মিলের জোট, ম্যানচেষ্টার ভারতীয় মিলকে ভয় করে, বোম্বাই এগ্জিবিশন কংগ্রেস। ব্রিটিশ টেক্সটাইল মেশিনারি প্রদর্শনী, রেওঁ (কৃত্রিম রেশমে) ইংরেজের উন্নতি, জাপানে রেওঁ শিল্প, লাংহাইএ কাঁচা রেশম তলব আধিক্য, করাসী প্রাচুর্য্য, সাইপ্রাসে রেশম উৎপাদন। হর্ড বার্কেনহেডের ব্যবসাজীবন, ম্যাচ তৈয়ারী, যুক্তরাষ্ট্রের রেওঁ শিল্প, ভারতে আমেরিকান ডাইষ্টাফ। (২) তুলার বাজারে মৃত্যু—পরলোকে লার্ড চার্লস ডব্লিউ ম্যাকারা। (৩) মার্কেট রিভিউ। (৪) ভারতের ডাইষ্টাফ আমদানি, ১৯২৮। (৫) স্রেট শিল্পের দুরবস্থা। (৬) ভারতের অগ্রসর শিল্প-অভিজ্ঞান—দশ বৎসরের উন্নতি। (৮) ইংরেজের যন্ত্র শিল্প, অস্ত্র কাজ ও অন্যান্তের ব্যবসায়। (৯) ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ শিল্পের সুবিধা। (১০) উত্তর সীমান্ত প্রদেশে যন্ত্র শিল্প—প্রাচ্য কার্পেট তৈয়ারী। (১১) ভারতের টেক্সটাইল মিলস। দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস কোং লিমিটেড। (১২) পাঞ্জাবে বয়ন-শিল্প। (১৩) ভারতীয় মিল কর্ম্মকর্ত্তাগণ। (১৪) আমেদাবাদে কেলিকো প্রিন্টিং। (১৫) যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা—দুনিয়ার অধিকাংশ সম্পদের মালিক। (১৬) ভারতের রং শিল্প। (১৭) গৃহ-শিল্পে আধুনিকতা। (১৮) পুরাতন টেক্সটাইল মেশিনারি। (১৯) ভারতের রপ্তানি শিল্প।

"টাইম্‌স্ ; ট্রেড অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট"

২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯

)

বৃটিশ শিল্প-প্রদর্শনীর জন্ম-কথা

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের বাজারে নানা বিদেশী জাতি ভাগ বসাইয়াছিল। বিলাতের জন-সাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট যে এ কথা জানিত না তাহা নহে। তবুও শিল্প-প্রসারের জন্ত গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করে নাই। শিল্পের উন্নতি আপনাআপনি হইবে—শিল্পের স্বাধীন বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই—এই নীতিই বিলাতের ভোটারদের ও গবর্ণমেণ্টকে পাইয়া বসিয়াছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বিলাতের লোকের তাল করিয়া চোক ফুটিল। শিল্প-ক্ষেত্রে বিলাত অন্যান্ত দেশের উপর কতটা নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা বেশ বোঝা গেল। কামান তৈয়ারীর জন্ত, কল, রং এমন কি বেগুনীর জন্তও বিলাত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল।

অবস্থা গুরুতর বুঝিয়া বোর্ড অব্ ট্রেড উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। হর্ড মোণ্টন ও অন্যান্ত কয়েকজনের চেষ্টায় রং ও বিস্ফোরক তৈয়ারের বন্দোবস্ত হইল। অন্যান্ত যে সব জিনিষ অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলা প্রস্তুতের জন্ত কয়েকটা কোম্পানী তার লইল।

শিল্প-জগতে বিলাতের যখন এই অবস্থা তখন বৃটিশ শিল্প-প্রদর্শনীর জন্ম হইল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের ব্যবসায়ীরা লাইপৎসিগের মেলায় গিয়া জিনিষপত্র পছন্দ করিয়া অর্ডার দিত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, পণ্য-নির্ম্মাতাদের সহিত সম্পর্কে আসা তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইল। "টাইমসে" এই সময়ে একটী পত্র বাহির হয়। তাহাতে প্রস্তাব করা হয় যে ক্রেতাদের সহিত বিলাতের পণ্য-উৎপাদকদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্দেশ্তে একটী মেলা স্থাপনের চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

যুদ্ধের পর বিলাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন কারখানা দেখা দিয়াছিল। পণ্য সম্বন্ধে বিদেশের উপর নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করাই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। একটী শিল্প প্রদর্শনী খুলিলে এই সকল উৎপাদকদের উৎসাহিত করা সম্ভব হইবে—গবর্ণমেণ্ট এ কথাটাও ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন।

প্রদর্শনী-স্থাপনের জন্ত বোর্ড অব্ ট্রেডের "বাণিজ্য-সংবাদ" বিভাগের জনকয়েককে ভার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত খাটিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিরল। কর্ম্মীদের মধ্যে জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবকও ছিল, তবে বেশীর ভাগই বিলাতের সিবিল সার্ভিসের লোক।

যাহারা প্রদর্শনী-স্থাপনের জন্য খাটিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিলাতের বাণিজ্য-বিস্তারে বিশেষ কাজ দেখাইতেছেন।

১৯১৪ সনের মে মাসে ইসলিংটন সহরের কৃষি-ভবনে এই প্রদর্শনী প্রথম খোলা হয়।

বিলাতে উৎপন্ন হয় নাই এমন পণ্য প্রদর্শনীতে আদৌ স্থান পায় নাই। যে সকল পণ্য পাঠানো হইয়াছিল, তাহা সত্যই বিলাতে উৎপন্ন হইয়াছিল কি না, তাহা পরখ করিবার জন্য শিল্প-প্রদর্শনীর কর্ম্মচারীরা পণ্য-প্রদর্শকদের কারখানাগুলা পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল।

প্রথমবারের প্রদর্শনীতে যে সব জিনিষ দেখানো হয়। সেগুলা বর্ত্তমানের উৎকর্ষে পৌঁছিতে পারে নাই, ইহা সত্য। তাহা হইলেও, নানাশ্রেণীর এত পণ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল যে, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

প্রথমবারের প্রদর্শনীর শেষ দিনে পণ্য-প্রদর্শকরা বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্টকে একটী ভোজ দেয়। সেই ভোজে তাহা প্রস্তাব করে যে, শিল্প-প্রদর্শনীটীকে একটী বার্ষিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক। প্রেসিডেন্ট মহাশয় এই প্রস্তাবে সম্মত হন।

যুদ্ধের সময় প্রতি বৎসরে প্রদর্শনী খোলা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রথমতঃ, সকল শিল্পকেই এই সময় গবর্ণমেণ্টের নানা আইনকানুন মানিয়া চলিতে হইত; দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সকল বাড়ীগুলাই গবর্ণমেণ্ট সামরিক কাজে লাগাইতে সুরু করেন। যাহা হউক, প্রদর্শনী কোন বৎসর বন্ধ থাকে নাই। ১৯১৬ ও ১৯১৭ সনে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মে প্রদর্শনী বসে। ১৯১৮ সনে লণ্ডনের ডকল্যাণ্ডস্ নিকটে একটী মাল গুদামে খোলা হয়; ১৯১৯ সনে 'ষ্টুটান প্যালেসে'; ১৯২১ সনে—'হোয়াইট সিটী'তে।

১৯১৯ সনে বার্ম্মিংহাম বিভাগ নামে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। এই বৎসর হইতে বেলা একই সময়ে বার্ম্মিংহাম ও লণ্ডনে বসিতে থাকে। ১৯২৪ সনে লণ্ডনের ওয়েম্বলি পল্লীতে বিরাট সমারোহে প্রদর্শনী খোলা হয় বলিয়া বৃটিশ শিল্প-প্রদর্শনীটী নিতান্ত নগণ্য বলিয়া মনে হয়। ১৯২৫ সনে প্রদর্শনী কেবল বার্ম্মিংহামেই বসিয়াছিল, লণ্ডনে বসে নাই।

১৯২৬ সনে গবর্ণমেণ্ট প্রদর্শনীর সাহায্যের জন্য ২৫ হাজার পাউণ্ড দিয়াছিলেন। ঐ বৎসর প্রদর্শনীর কথাটা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে চারিদিকে আরও ছড়ানো হয় এবং ট্রেণের ভাড়া আরও কমানো হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর জন-সাধারণকে প্রদর্শনীতে ঢুকিতে দেওয়া হইত না, তাহারা অনেক সময়ে পণ্য-প্রদর্শকদের টিকিট লইয়া লুকাইয়া ঢুকিত। ১৯২৬ সন হইতে কিছু কি লইয়া সন্ধ্যাবেলা তাহাদিগকে ঢুকিতে অনুমতি দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপত্রও যাত্র ঐ সনে প্রথম ঢুকিতে পায়।

বলা হইয়াছে যে মেলার দুইটী বিভাগ। কিন্তু সকল জিনিষ এই দুইটীতে স্থান পায় না। যাহা জিনিষ—যেমন চীনামাটী ও কাচের জিনিষ, কাগজ, চামড়া, খেলানা, রং, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি—সকলে দেখানো হয়। ভারি জিনিষ-গুলা (লোহালক্কড়, বাড়ী তৈয়ারীর মালপত্র, বৈদ্যুতিক, এঞ্জিনিয়ারিং ও খনি-খনন সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি) বার্ম্মিংহামে দেখানো হয়।

বিলাত গবর্ণমেণ্টের "ওভারসীজ ট্রেড" (বৈদেশিক বাণিজ্য) বিভাগটী লণ্ডন বিভাগের ভার লইয়া থাকে। বার্ম্মিংহাম চেম্বার অব কমার্স ও বার্ম্মিংহাম কর্পোরেশান (ওভারসীজ ট্রেড বিভাগের অধীনে) বার্ম্মিংহাম বিভাগটী চালাইয়া থাকে।

২)

বার্ম্মিংহাম চেম্বার অব কমার্স

বার্ম্মিংহাম বাণিজ্য-ভবনটী অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ১৭৮৩ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে বার্ম্মিংহাম সহরের অধিবাসীরা একটা সভাতে একটী কমিটী গঠন করে এবং সেই কমিটীকে একটী স্থায়ী-সভা গঠনের ভার দেয়। কমিটীর চেষ্টার ফলে 'জেনারল্ কমর্শ্যাল কমিটি, নামে একটী প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়। ১৭৯০ সনে এই প্রতিষ্ঠানটী

তালিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার স্থলে একটী 'কমার্শ্যাল সোসাইটি' স্থাপন করা হয়।

১৮১০ সনের ২১শে জুলাই তারিখে সহরবাসীদের একটী সভায় একটী বাণিজ্য-ভবন গড়িবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের ফলে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা তাহাই বর্ত্তমান "বার্ম্মিংহাম চেম্বার অব্ কমার্সে"র যথার্থ পূর্ব্বপুরুষ। ১৯১০ সনে বাণিজ্য-ভবনের শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। বাণিজ্য ভবনের প্রথম শতবর্ষের ইতিহাস শ্রীযুক্ত জি হেনরি রাইট প্রণীত "ক্রনিকল্‌স্ অব্ দি চেম্বার (১০০ পৃষ্ঠা) নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

১৯০২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বাণিজ্য-ভবনটী পুনর্গঠিত হয়। এই সময়েই একটী পুরা সময়ের মাইনে করা সেক্রেটারী প্রথম নিযুক্ত করা হয়।

বর্ত্তমানে ইহার সভ্যের সংখ্যা ৩০০০। ইহা বিলাতের দ্বিতীয় বৃহত্তম চেম্বার।

১৯০৩ সনে ইহার পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সাহায্যে বাণিজ্য-ভবনের কাউন্সিলের সহিত সভ্যদের ঘনিষ্ঠতা রক্ষিত হয়। বিদেশে পত্রিকাটীর যথেষ্ট কাটতি বলিয়া ইহার সাহায্যে বিদেশে বার্ম্মিংহামের মালেরও কাটতি বাড়ে।

১৯০৪ সনে চেম্বারের 'কমার্শ্যাল ইয়ার বুক' (বাণিজ্য বার্ষিকী) প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময় হইতে প্রতি বৎসরই ইহা প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিকীতে নানা শ্রেণীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বাণিজ্য-ভবনের সভ্যেরা কি কি জিনিষের ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাহার বিবরণও স্থান পায়। জগতের সর্ব্বত্রই ইহার কাটতি। ইহার সাহায্যে বার্ম্মিংহামের ব্যবসা যে বাড়িয়াছে তাহার নানা প্রমাণ আছে।

বাণিজ্য-ভবন আর একটী প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বাহির করিয়াছে। ইহার নাম—'অফিসিয়াল গাইড টু বার্ম্মিংহাম (বার্ম্মিংহাম-প্রদর্শিনীর সহায়)। ইতিমধ্যেই গ্রন্থখানির তিনটী সংস্করণ হইয়াছে।

বাণিজ্য-ভবনের প্রধান উদ্দেশ্য—কল-কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটী কাউন্সিল বাণিজ্য-সভার কাজকর্ম্ম চালাইয়া থাকে এবং সরকার, পার্লামেন্ট, রেল কোম্পানী প্রভৃতির সহিত ব্যবসায়ীদের হইয়া কথাবার্ত্তা চালাইয়া থাকে। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহা কয়েকটী স্থায়ী কমিটির সাহায্য লইলেও, সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ভার নিজের হাতেই রাখিয়াছে।

বাণিজ্য-ভবনটি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয় না; কেবল যেসকল আইন-কানুন ব্যবসায়ীদের স্বার্থের বিরোধী সেগুলাকে বাধা দেয়, আর যেগুলা তাহাদের স্বার্থের অনুকূল সেগুলা পাশ করাইবার চেষ্টা করে।

দুনিয়ার সকল দেশেই কোথায় কিরূপ আইন-কানুন হইতেছে, বা আমদানি শুল্কের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং বিলাতের ব্যবসায়ীদের স্বার্থের উপর সেই সকল আইনকানুন ও আমদানি শুল্কের প্রভাব কিরূপ সে সম্বন্ধে বাণিজ্যভবন রীতিমত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া থাকে।

১৯১১ সন হইতে বিলাতে প্রতি বৎসর একটী বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী বসিতেছে। ইহার এক ভাগ বসে বার্ম্মিংহামে আর এক ভাগ লণ্ডনে। বার্ম্মিংহাম বিভাগটি প্রধানতঃ বার্ম্মিংহাম বাণিজ্য-ভবন কর্ত্তৃকই চালানো হইয়া থাকে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘবদ্ধতা আধুনিক আর্থিক জীবনের একটী প্রধান ব্যাপার। ব্যবসায়ী সঙ্ঘগুলা কি রকম ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, তাহা উপরের দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে। ১৭৮৩ সন হইতে চেষ্টা সুরু হয়। তারপর নানা পরিবর্ত্তনের পরে ১৮১৩ সনে—অর্থাৎ ৩০ বৎসর পরে—বাণিজ্য-ভবনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হইল। প্রতিষ্ঠা ১৮১৩ সনে হইলেও, রীতিমত সেক্রেটারী নিযুক্ত হইল ১৯০২ সনে—অর্থাৎ আরও ৮৯ বৎসর পরে।

একটী বাণিজ্য-ভবন যে কেবল ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়—ইহা যে লেখাপড়ারও একটী প্রধান আড্ডা—দুনিয়ার নানা স্থানের খবরাখবর সংগ্রহ ও তার চর্চ্চা করা, পত্রিকা ছাপানো, বই প্রকাশ করা—এগুলাও যে বাণিজ্য ভবনের কাজের মধ্যে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জার্মাণ মজুরদের "কর্ম্ম-সভা"

আমরা জানি যে মজুরেরা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ট্রেড-ইউনিয়ান গঠন করিয়া থাকে। ট্রেড-ইউনিয়ানের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াতে তাহারা একজোটে কাজ করিতে পারে। তা ছাড়া, বেকার বা রুগ্ন অবস্থায় মজুরদের সাহায্য করা, ধর্ম্মঘটের সময়ে মজুরদের চালানো, মজুরদের হইয়া মনিবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহা—এ সব কাজও ট্রেড-ইউনিয়ান করিয়া থাকে।

ইয়োরামেরিকার নানা দেশে মজুর-সঙ্ঘ বা ট্রেড-ইউনিয়ানের অস্তিত্বের কথা আমরা অবগত আছি। ভারতবর্ষেও ট্রেড-ইউনিয়ান আছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জার্ম্মাণি কেবল মামুলি ট্রেড-ইউনিয়ান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই। জার্ম্মাণি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে।

১৯২০ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জার্ম্মাণিতে এক নূতন আইন জারি হয়। তদনুযায়ী, অন্ততঃ ২০ জন মাহিয়ানা করা লোক নিযুক্ত করে এরূপ প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্রে—তা সে আফিস, ব্যাঙ্ক বা ফ্যাক্টরী বা আর যাহা কিছু হউক না কেন—একটা করিয়া "কর্ম্মসভা" কায়েম করিবার নিয়ম হয়। কর্ম্ম-সভার সভ্যেরা কর্ম্মকেন্দ্রের মজুরদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইবে স্থির হয়। আইনানুসারে কর্ম্মসভার একতিয়ারটা এইরূপ :—(১) কর্ম্মকেন্দ্রের পটুতা বাড়াইবার জন্য মনিবদের পরামর্শ দেওয়া; (২) মজুরদের অভিযোগ মিটাইতে চেষ্টা করা এবং মনিবে মজুরে যাহাতে সংঘর্ষ না বাধে তাহার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা; (৩) মজুরদের সম্বন্ধে আপোষে মীমাংসা করিয়া যাহা কিছু স্থির হইয়াছে, তাহা কাজে লাগানো; (৪) মনিব-পক্ষ কর্ত্তৃক প্রস্তুত কর্ম্মকেন্দ্রের নিয়মাবলীতে সম্মতি জানানো (৫) কারখানার ভিতর মজুরেরা যাহাতে নিরাপদে ও স্বাস্থ্যের হানি না করিয়া কাজ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা; (৬) মজুর-মঙ্গল-সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলা সম্পাদন করা।

এতদ্ব্যতীত কর্ম্মসভার অন্যান্য কার্য্যও আছে। মজুরেরা যেখানে ট্রেড ইউনিয়ানের সহায়তায় মনিবদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চুক্তি করিয়াছে, সেখানে চুক্তি ঠিক পালন করা হইতেছে কিনা তাহা দেখা কর্ম্মসভার অন্যতম কাজ। যেখানে চুক্তি নাই সেখানে কর্ম্ম-সভা চুক্তি করিতে চেষ্টা করে। মনিবেরা যাহাতে অসঙ্গত কারণে মজুরদের না তাড়াইয়া দেয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখাও কর্ম্মসভার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম-সভা জিনিষটা ট্রেড-ইউনিয়ান হইতে অনেকটা তফাৎ। ট্রেড-ইউনিয়ানের সহায়তায় মজুরেরা কর্ম্ম-কেন্দ্রের বাহির হইতে তাহাদের প্রভাব জারি করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কর্ম্ম-সভা স্থাপনের ফলে, মজুরেরা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সাহায্যে, কারখানা ব্যাঙ্ক প্রভৃতির শাসনের ভিতরকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী হয়।

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর জার্ম্মাণির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মহা বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কর্ম্ম-সভাগুলার জন্ম। প্রথমে কমিউনিষ্টরা কর্ম্মসভাগুলাকে নিজ আয়ত্তে আনিয়া ট্রেড-ইউনিয়ান-আন্দোলনের বিরোধী একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কর্ম্ম-সভাগুলার উপর ট্রেড্-ইউনিয়ানের প্রভাব বজায় থাকে। ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়িতেছিল। এই সময়ে বাজার-দর চড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়াইয়া লওয়া কর্ম্ম-সভা-

ওদার একটা প্রধান কাজ ছিল। ১৯২৩ সনের নভেম্বর মাসে সোণার সহিত কাগজী মুদ্রার সম্বন্ধ একটা বিশেষ হারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং কাগজী মুদ্রার পরিমাণও কমানো হইতে থাকে। ইহার ফলে অনেক ফ্যাক্টরী বেশ মাল্লিতে পাকে। বেকারের সংখ্যা খুব বাড়ে, ট্রেড-ইউনিয়ানের সভ্যের সংখ্যা কমিয়া যায়। অনেকগুলা কর্ম্ম-সভারও পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। ১৯২৫ সনে ট্রেড-ইউনিয়ানগুলা আবার জীবন্ত হইয়া উঠে। ঐ বৎসরের শেষে বড় বড় প্রতিষ্ঠান-সমূহে কর্ম্ম-সভাগুলা বেশ কাজ করিতেছিল। কিন্তু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে তাহাদের সংখ্যা আরও কমিয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের আফিসগুলাতে উহারা একেবারেই লোপ পায় বলিলেও চলে।

কর্ম্ম-সভার সাহায্যে মজুররা অনেক কিছুই করিতে পারিবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। মজুররা ক্রমেই কর্ম্ম-সভাগুলাতে বিশ্বাস হারাইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা কর্ম্ম-সভার প্রতিনিধিদের আদৌ নির্ব্বাচিতই করিতেছে না।

এরূপ ঘটিবার নানা কারণ আছে :—(১) কর্ম্মসভায় মজুর-প্রতিনিধিদের জোর অনেকটাই নির্ভর করে তাহাদের নিজেদের উপর নয়, কিন্তু মজুররা কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে কতদূর সঙ্ঘবদ্ধ তাহার উপর; অর্থাৎ যে সব মজুর শক্তিশালী ট্রেড-ইউনিয়ানে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই, তাহারা কর্ম্ম-সভায় প্রতিনিধি পাঠাইয়া বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারে না; (২) মজুর-প্রতিনিধি ও মনিবে মিলিয়া মিশিয়া সকল ক্ষেত্রে কাজ করিতে পারে না। যেখানে দুই দিকেই সহযোগিতার সহিত কাজ করিবার একটা আন্তরিক ইচ্ছা আছে, কেবল সেইখানেই পরামর্শ করিয়া কাজ চালানো সম্ভব হইয়াছে; (৩) যে সব মজুর কর্ম্মসভার জন্য নির্ব্বাচিত হয়, তাহাদের কাজ চালানোও বড় সহজ নয়; যদি তাহারা বেশী বিক্রম না দেখায় তাহা হইলে মজুররা তাহাদের ভীরু বলে, আর যদি তাহারা বেশী বিক্রম দেখায় তাহা হইলে মনিবরা তাহাদের শত্রু বলিয়া গণ্য করে; (৪) মজুর-প্রতিনিধিদের উপর আইন যে সব কাজ চাপাইয়াছে, সে সব কাজ করিবার জন্য যেরূপ জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা দরকার, তাহা তাহাদের অনেকেরই নাই; কর্ম্ম-সভা প্রণালী ভাল করিয়া কাজ না করিবার ইহাও একটা কারণ।

জার্ম্মাণ মজুরদের কর্ম্মসভা সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহার নাম—"দি ওয়ার্কস্ কাউন্সিল: এ জার্ম্মাণ এক্সপেরিমেণ্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেমোক্রাসি"। গ্রন্থকার—সি, ডাব্লিউ পাইলবোরা। প্রকাশক—কিলাতের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস এবং নিউইয়র্কের ম্যাকমিলান কোম্পানী। ৩০৪+৮ পৃষ্ঠা। ১৯২৮ সনে প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানা পড়িলে কর্ম্ম-সভার দোষগুণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে।

সামাজিক উন্নতি

দুনিয়া প্রকৃতপক্ষে উন্নতির পথে চলিতেছে কি অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসের দার্শনিক তত্ত্ব এবং সঙ্গে দুনিয়ার উন্নতিবাদ, এই দুইটি বিষয়েই গত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে লোকের আস্থা কমিয়া আসে। অনেকের ধারণা, দুনিয়ার উন্নতিবাদ মাত্র একটি দার্শনিক তত্ত্ব, বা ধারণা; সত্যিকার জগতে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই। বার্ণার্ড মোজেজ্ কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার দখলও ছিল অগাধ। কিন্তু তিনিও সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। এবং সেই জন্য শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার স্রোত পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কালিফোর্ণিয়ার ছাত্র, প্রফেসর এ, জি, টড্ ১৯১৮ সনে "থিয়োরিজ্ অব্ সোশ্যাল প্রোগ্রেস" অর্থাৎ ("সমাজের উন্নতি তত্ত্ব") নামে একখানি বই লিখিয়া সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে আবার পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে কতকগুলি বইও বাহির হইয়াছে। তবে বইগুলির মধ্যে কতকগুলি সামাজিক উন্নতির পক্ষে

রায় প্রকাশ করিয়াছে এবং কোন খানি বা বিপক্ষেও রায় প্রকাশ করিয়াছে। মার্টিনের "প্রোগ্রেস্ অ্যাণ্ড হিষ্টরি" (উন্নতি এবং ইতিহাস) এবং বেরির "আইডিয়া অব্ প্রোগ্রেস" (উন্নতির ধারণা) এই দুই গ্রন্থে সামাজিক উন্নতির প্রতি আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু জীন ইঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এবং হবার্ট স্পেন্সারের "প্রোগ্রেস্ অ্যাণ্ড সায়েন্স" (উন্নতি বিজ্ঞান) নামক পুস্তকে দুনিয়ার উন্নতি এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর মানুষের আস্থা, এ সমস্তই খণ্ডন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যপন্থাবলম্বী গ্রন্থকারও দু'একজন আছেন, যেমন, পার্ক এবং বার্জেস্। দুনিয়ার উন্নতি যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে ইঁহারা বিষম ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যাঁহারা সামাজিক উন্নতির, তথা দুনিয়ার উন্নতির ওকালতি করিবার জন্য আসরে নামিয়াছেন তাঁদের বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর যথেষ্ট আস্থা আছে। কিন্তু যাঁরা দুনিয়ার উন্নতিবাদের পরিপন্থী তাঁদের মতে প্রাণের বা চেতনার রাজ্যে বিজ্ঞানের করণীয় কিছুই নাই,—বিজ্ঞান এখানে একেবারে পঙ্গু এবং অসহায়। টড্ সমাজ মনোবিজ্ঞান (সোশ্যাল সাইকলজি) এবং মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসের মাপকাঠি লইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মার্টিন কেবলমাত্র ইতিহাসের তরফ হইতে ইহার বিচার করিয়াছেন। ওয়েষ্টারমার্ক প্রধানতঃ দর্শন এবং প্রাণতত্ত্ব বিদ্যার (বাইওলজি) সাহায্যে সামাজিক উন্নতিবাদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাজতত্ত্ব (সোসিয়লজি) ধনবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানও ঘাঁটিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আলোচনা, অন্যান্য লেখকের মত অতটা সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হয় নাই। ওয়েষ্টারমার্কের নিজস্ব মৌলিকতাও এ বিষয়ে নিতান্ত কম নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তবুও তাঁহার রচিত গ্রন্থ সেরূপ সন্তোষজনক হয় নাই।

হার্জিলারও একখানি বই লিখিয়াছেন, বইখানির নাম "সোশ্যাল প্রোগ্রেস্" অর্থাৎ সামাজিক উন্নতি। সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে যত বই বাহির হইয়াছে তার মধ্যে এই বইখানিই সব চেয়ে ভাল। বইখানি লিখিতও হইয়াছে শৃঙ্খলার সহিত। ইতিহাস কাহাকে বলে, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহাই বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কি কি প্রণালী অবলম্বন করিলে এবং কি কি বস্তু বর্ত্তমান থাকিলে সমাজের উন্নতি ঘটিতে পারে প্রধানতঃ তাহাই তাঁহার আলোচনার বিষয়। সমাজদর্শন সম্বন্ধে পুঁথিপত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; গ্রন্থকার এই অগাধ পুঁথি-সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন এবং পরিপাকও করিয়াছেন। অন্য কোন গ্রন্থকারই এত পুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই। সমাজ-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাকিছু নূতন তথ্য বা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সমস্তই ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন। সামাজিক উন্নতির জৈবিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক ভিত্তিগুলিও ইনি সম্যক বিচার করিয়া দেখিয়াছেন।

সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে কলম্বসের বইখানি হার্জিলারের বইয়ের মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু বইখানি যথেষ্ট সুপাঠ্য হইয়াছে। সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে ইঙ্গিত বা আভাষ দিয়াছেন তাহাও নিতান্ত ফেলিয়া দিবার নয়। ইনিও ইতিহাস দর্শন, বাইওলজি বা প্রাণতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজ-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি কোন শাস্ত্রই বাদ দেন নাই, কিন্তু তবুও তাঁহার গ্রন্থরচনায় সেরূপ কোন শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় না। কলম্বসের পড়াশুনাও যে নিতান্ত কম তা নয়, তবে হার্জিলারের মত ইনি হজম করিতে পারেন নাই। তিনি সেরূপ মনোযোগ দিয়া বইখানি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁর বইখানির লিখন-পদ্ধতি চমৎকার। একমাত্র ষ্টাইলের জোরেই তিনি কেল্লা ফতে করিয়াছেন। সুতরাং বইখানি জনপ্রিয় হইবে বলিয়া মনে হয়। এল উড এবং চ্যাপিন কেবলমাত্র ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যেই আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা যে সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন তাহা তাঁহারা স্বীকারও করেন না। তবে দুনিয়ার উন্নতি সম্বন্ধে যে একেবারে কোন কথাই বলেন নাই তাহা নয়, তবে তাঁরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ এতদুভয়ের তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যে যবনিকার অন্তরাল রহিয়াছে, এল উড তাহা সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই, দুই একবার উঁকি মারিয়া চাহিয়াছেন মাত্র। তিনি দুনিয়ার

উন্নতি গ্রাফের রেখার সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত গ্রাফ্ দেখিয়া এই মনে হয় যে, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত নয়, মানুষের উন্নতির দিন ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে। চ্যাপিনের বইখানির নাম কাল্‌চারাল চেঞ্জ। পুস্তকে তিনি বর্ত্তমানেরই ওকালতি করিয়াছেন বেশী, এবং এই সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন। তবে, অনাগত এবং অতীত সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদি নানাবিধ শাস্ত্রের আধুনিক তথ্যাবলীর পরিচয় ইহার গ্রন্থে যথেষ্ট মিলে। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় যে, একই রকম ঘটনা বারে বারে সংঘটিত হয়, ইহাকে সাধারণতঃ "ইতিহাসের পুনরাগমন" বলে। চ্যাপিন এ সম্বন্ধে এক আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, একই রকম ঘটনা দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে ঘুরিয়া ফিরিয়া পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয় বটে; কিন্তু প্রতিবারেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। মানবের সভ্যতার এই যে পরিবর্ত্তন ইহার মূলে কি কি সত্য নিহিত আছে, অর্থাৎ কোন কোন পন্থা অবলম্বন করিলে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তৎসম্বন্ধেও চ্যাপিন আলোচনা করিয়াছেন। ইহা চ্যাপিনের মৌলিকতা বা বিশেষত্ব। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি কি উপায়ে সমাজের উপকারে লাগান যাইতে পারে হার্ট সে সম্বন্ধে দুই খণ্ড বই প্রকাশ করিয়াছেন। 'সোশাল হ্যাইজিন' অর্থাৎ "সমাজের স্বনিয়ম" নামক খণ্ডে চিকিৎসা জগতে আবিষ্কৃত নূতন সত্যগুলির সহিত সমাজের সনাতন নিয়মপদ্ধতি বা আচারব্যবহারগুলির কিরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন। হার্ট খুব দুনিয়ার গবেষক এবং গবেষণার তথ্যাবলী বা মালমশলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় যথেষ্ট। তাঁর আর একটি গুণ এই যে, তিনি নিতান্ত প্রতিভার পণ্ডিতের মত নীরস ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সঙ্কলন মাত্রই করেন নাই বা নিছক প্রচারকার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে আপন খেয়াল খুশী মাফিক ভাবের বন্যাও প্রবাহিত করেন নাই। সমস্ত বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিয়া নূতন সত্য নূতন আলোক আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নিজেকে মনোবিজ্ঞান এবং সমাজ মনোবিজ্ঞানের ছাত্র মনে করেন এবং সেই তরফ হইতেই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া দেখিয়াছেন।

সমাজতত্ত্ব (সোসিয়লজি) সম্বন্ধে অনেক পাঠ্য পুস্তক আছে। মোটামুটি এইগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আলোচ্য বিষয় সামাজিক সমস্যাসমূহ এবং তাহাদের প্রকৃত সমাধান, দ্বিতীয় শ্রেণী ব্যক্তিগত এবং সমাজগত এই দুই জাতীয় মনোবিজ্ঞান-ঘেঁসা, এবং তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকগুলির উপাদান ঐতিহাসিক তথ্য এবং তত্ত্ব নিচয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পুস্তকই প্রকৃতপক্ষে কলেজের প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক। প্রফেসর হাব্বিন্সের "ইনট্রোডাক্‌শান টু দি হিষ্টরি অব্ সোসাইটি" নামক পুস্তকখানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর। সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে আরও একখানি নূতন বই বাহির হইয়াছে, সেখানি হাব্বিন্সের এই পুঁথির একেবারে বিপরীত। এই নূতন পুস্তকখানি সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। হাব্বিন্সের মতে, গোষ্ঠী, জাতি, কৃষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা—এই সমস্তই সমাজ দর্শনের আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়। হাব্বিন্সের পুথিখানি বেশ ভালই হইয়াছে। ভাষা এবং লেখন-রীতি বেশ সুপাঠ্য। হাব্বিন্সের মতানুযায়ী মানবের সভ্যতার ইতিহাসের উপরই যদি সমাজদর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে হাব্বিন্সের পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু সমাজ-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় যদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ঘাতপ্রতিঘাত এবং এই সকল ঘাতপ্রতিঘাতের মনোবিজ্ঞান-মূলক বিশ্লেষণেরই উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে, দুঃখের সহিত বলিতে হয়, যে হাব্বিন্স এই নব্য বিদ্যাক্ষেত্রে সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

১। "দি প্রিন্সিপল্‌স অব ওয়েজেস" (মজুরির নীতি) —উইলেম এল ভাঙ ; পি এস কিং, লণ্ডন ; ১২+১৩৯ পৃষ্ঠা ; ৮ শি ৬ পে : ১৯২৮।

২। "ইকনমিক্‌স্‌ ও প্রিনসিপল্‌স্‌ অ্যাণ্ড ইণ্টারপ্রিটেশান" (ধন বিজ্ঞানের নীতিসমূহ ও তাহাদের ব্যাখ্যা) —আর ই কাউন, ল, নিউ ইয়র্ক ও শিকাগো ১৮+৮৭৭ পৃষ্ঠা ; ৪·৫০ ডলার ; ১৯২৮।

৩। "ইকনমিক্‌স্‌ অব্‌ কনজাম্পশান" (খাদন সম্পর্কীয় ধনবিজ্ঞান)—ডব্লিউ সি ওয়েট ; ম্যাকগ্র হিল নিউ ইয়র্ক ; ১২+২৮৩ পৃষ্ঠা ; ৩ ডলার ; ১৯২৮।

৪। "দি প্রস্পারিটি অব অষ্ট্রেলিয়া : অ্যান্‌ ইকনমিক অ্যানালিসিস" (অষ্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধির অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ) —ফ্রেডারিক সি বেনহাম ; পি এস কিং, লণ্ডন ; ১০+২১৬ পৃষ্ঠা ; ১২ শি৬ পে ; ১৯২৮।

৫। "দি ওয়ার ডেটস : অ্যান্‌ আমেরিকান ভিউ" (সমর-ঋণ সম্বন্ধে একটী মার্কিণ মত)—পি ডেন্ট্রার ও জে এইচ সিমউইক ; ম্যাকমিলান, নিউ ইয়র্ক ; ১৮০ পৃষ্ঠা ; ১·৫০ ডলার ; ১৯২৮।

৬। "ইকনমিক হিষ্টরি অব ইয়োরোপ", (ইয়োরোপের আর্থিক ইতিহাস)—এম এম নাইট, এইচ ই বার্ণেস, এফ ফ্লিগেল ; হাউটন মিফ্লিন, বোষ্টন ; ৯+৮১৩ পৃষ্ঠা ; ৪·৫০ ডলার ; ১৯২৮।

৭। "রাশিয়ান পাব্লিক ফিনান্স ডিউরিং দি ওয়ার। ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিষ্টরি অব দি ওয়ার্ল্ড ওয়ার। রাশিয়ান্‌ সিরিজ" (যুদ্ধের সময় রুশিয়ার সরকারী রাজস্ব। মহা যুদ্ধের আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস। রুশ সিরিজ)—এ এম মাইকেলসন ও অপর কয়েকজন ; ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, কনেক্টিকাট। নিউ হ্যাভেন ; ৪৮৪ পৃষ্ঠা ; ৫ ডলার ; ১৯২৮।

৮। "এ পিকচার অব ওয়ার্ল্ড ইকনমিক কণ্ডিশানস্‌ (দুনিয়ার আর্থিক অবস্থার বৃত্তান্ত)—ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কনজারেন্স বোর্ড, নিউইয়র্ক ; ১১+১১৮ পৃষ্ঠা ; ২ ডলার ; ১৯২৮।

৯। "গ্রেন গ্রোয়ার্স কো-অপারেশান ইন ওয়েষ্টার্ণ ক্যানাডা" (পশ্চিম কানাডায় শস্যোৎপাদকদের সমবায় সমিতি)—হেরল্ড এ প্যাটন ; ষার্ভার্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ ; ১৯+৪৭১ পৃষ্ঠা ; ৫ ডলার ; ১৯২৮।

১০। "দি আমেরিকান হোয়েলম্যান্‌ : এ ষ্টাডি অব লাইফ্‌ অ্যাণ্ড লেবার ইন দি হোয়েলিং ইণ্ডাষ্ট্রী" (মার্কিণ তিমি-শিকারী : তিমি-শিকারে জীবন ও শ্রমের বর্ণনা)—ই পি হোম্যান, লংম্যানস গ্রীন। নিউ ইয়র্ক ; ৩৬৯ পৃষ্ঠা ; ৫ ডলার ; ১৯২৮।

১১। "গভর্ণমেণ্ট ওনারশিপ অ্যাণ্ড অপারেশান অব রেলরোডস" (রেলগুলা সরকারী সম্পত্তি হওয়া ও সরকার-কর্তৃক পরিচালিত হওয়া)—ডাব্লিউ এম ডাব্লিট স্প্রেন্‌ ; ম্যাকমিলান, নিউ ইয়র্ক ; ৪৯২ পৃষ্ঠা ; ৫ ডলার ; ১৯২৮।

১২। "ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব আমেরিকান রেলরোডিং" (মার্কিণ রেল রেল-পথের ১ শত বৎসরের ইতিহাস) —থে ডাব্লিউ ষ্টার (কনিষ্ঠ) ; চার্লস্‌ সিড্‌। নিউ ইয়র্ক ; ৩৫৬ পৃষ্ঠা ; ৩·৫০ ডলার ; ১৯২৮।

১৩। "ইণ্টার্ন্যাশনাল ট্রেড ইন ষ্টেপল কমোডিটিজ" (প্রধান প্রধান মালগুলাতে বহির্বাণিজ্য)—এডওয়ার্ড ই প্র্যাট ; ম্যাকগ্র হিল, নিউ ইয়র্ক ; ৮+৫৭০ পৃষ্ঠা ; ৫ ডলার ; ১৯২৮।

চতুর্থ বর্ষের গোড়ায়*

(১)

ইতিহাস পড়লে না কি জানা যায় যে ভারত এক সময়ে জগতের একটা শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র না কি ভারতের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। একথা যে নিছক মিথ্যা নয় তার প্রমাণও আছে। ভারতবর্ষকে পাবার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী যে লাঠালাঠি চলেছে, যে জাতি ভারতবর্ষকে পেয়েছে সেই জাতিরই যেরূপ ধনবৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে মনে হয় এ কথাটা অনেক পরিমাণেই সত্য।

কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি? ভারতবর্ষ যেমন এক সময়ে ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রভূমি ছিল, তেমনই আজ এ দেশ দারিদ্র্যের লীলানিকেতন হয়ে উঠেছে। আজ জগতের দরিদ্র দেশের উদাহরণ দিতে গেলে যেমন চীনকে টেনে আনা হয়, তেমনি ভারতকেও টেনে আনা হয়। এ দেশের লোক দারিদ্র্যে অনাহারে পাথে পাথে মরে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ—এগুলা যেন ভারতে স্থায়িভাবেই বাসা নিয়েছে।

এই দারুণ দারিদ্র্যকে ভারতে যে স্থায়িভাবে থাকতেই হবে, এর কোন মানে নেই। অভাব অনাটনের এ তাণ্ডব নৃত্য চিরদিন যে সহ্য করতেই হবে, তা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

জগতে আজ অনেক দেশই রয়েছে যাদের লোকসংখ্যা ভারতের তুলনায় নগণ্য ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ভারতের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, তবুও তারা আজ জগতের সেরা।

এটা কি করে সম্ভব হ'ল? এর একমাত্র কারণ এই যে, তাদের মানুষের মত থাকবার দারুণ ইচ্ছা আছে। মানুষের মতই খেতে পরতে, ভোগ করতে, জীবন কাটাতে, তারা চায়। যেখানে সবাই ভোগের পিপাসায় আকণ্ঠ শুষ্ক সেখানে তারা ত্যাগের বাণী আওড়ায় না, সোজাসুজি ভোগই চায়। আর ভোগ করবার জন্য যা কিছু দরকার তা তারা প্রচণ্ড বিক্রমে আহরণ করে।

ভারতবর্ষের গণ্ডগোল বেঁধেছে এইখানে। দারিদ্র্যের নিদারুণ চক্রতলে নিষ্পেষিত ভারতের জন-সাধারণ পার্থিব ভোগের জন্য ছটফট করছে। অথচ মুখে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বুলিগুলা আওড়াচ্ছে, আর বাস্তব আচরণে শ্রেষ্ঠ বার্থিকের আচার ব্যবহার নকল করছে। এমন হাস্যজনক দৃশ্য জগতে আর দেখা যায় না। এমন ভণ্ডামিও জগতে বিরল।

"বহুজনকে বীরের মত ভোগ করতে হবে"—এই বাণী দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করাকেই "আর্থিক উন্নতি" তার ব্রত বলে মেনে নিয়েছে।

শুধু তাই নয়। কেবল দার্শনিক তত্ত্ব ছড়ানোই "আর্থিক উন্নতি"র ধর্ম্ম নয়।

ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই কি ক'রে ধনৈশ্বর্য্যে জগতে অদ্বিতীয় করা যায় এ চিন্তাও দিবারাত্র "আর্থিক উন্নতির" মাথায় খেলছে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—এই তিনের সমন্বয়েই পাশ্চাত্য দেশগুলা তাদের ধন-সম্পদ্ লাভ করেছে, ভারতবর্ষেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যে নেই তা নয়—কিন্তু তা একান্তই মান্ধাতার আমলের। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে পাশ্চাত্য জাতিগুলা প্রাণান্ত সাধনার ফলে যে উন্নতি লাভ করেছে তা আজ ভারতবর্ষের আয়ত্ত করা ছাড়া উপায় নেই। পাশ্চাত্য জাতিগুলা কৃষি শিল্প বাণিজ্য বলতে কি বোঝে, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বলতে আমরাই বা কি বুঝি—তা পাশাপাশি ধরা, আর তুলনার সাহায্যে আমাদের নিকৃষ্টতাটা কতদূর যেয়ে তা স্পষ্টভাবে জাহির করে দেওয়া—এটা "আর্থিক উন্নতি" তার অন্যতম কর্ত্তব্য বলে মেনে নিয়েছে। অঙ্ক, তথ্য, দৃষ্টান্ত দিয়ে "আর্থিক উন্নতি" ক্রমাগত বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, ধন-সম্পদ্ লাভ করার কলাকৌশল

---

* বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ কর্ত্তৃক পৃথক পৃথকভাবে লিখিত।

সম্বন্ধে জগতের জীবন্ত জাতিগুলা আজ কত এগিয়ে রয়েছে, ভারতবর্ষই বা কত পেছিয়ে পড়েছে।

পাশ্চাত্যেরা কেবল যে ধনবৃদ্ধির বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান—ব্যাঙ্কারী, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, রেল ও জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতিই গড়ে তুলেছে তা নয়,—তার সঙ্গে সঙ্গে ধন-বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা বিরাট বিদ্যাও গড়ে তুলেছে। তার নাম হচ্ছে ধনবিজ্ঞান। ধনবিজ্ঞানের সাহায্য না পেলে, কেবল ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ্, ব্যাঙ্কারীওয়ালা, ব্যবসাদারদের সহায়তায় মার্কিন, ইংরেজ বা জার্মাণ, এত ধনী হয়ে উঠতে পারতো না। দেশকে ধনী করতে হলে যেমন একদল বাস্তব ধন-স্রষ্টা দরকার, তেমনই এমন এক দল লোকের দরকার যারা জাতির ধনবৃদ্ধির উপায়গুলা সম্বন্ধে দিনরাত্রি মাথা খেলাবে এবং কোন্‌দিকে কিরকমে দেশের উৎপাদন-শক্তি প্রয়োগ করলে দেশ ধনী হতে পারবে সে বিষয়ে চিন্তা করবে।

জাতির আর্থিক উন্নতিসাধনে, অর্থনৈতিক চিন্তা-বীরদের সেই চিন্তাগুলার প্রয়োজনীয়তাও "আর্থিক উন্নতি"র নজর এড়ায় নি। জগতের উন্নত দেশগুলার প্রথম শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-সেবীরা কি কি বিষয়ে কি ধারার চিন্তা করছেন, ভারতের অর্থ-শাস্ত্রীরাই বা কি কি কথা চিন্তা করছেন, তা একটুও বিকৃত না ক'রে; তাঁরা যে ভাবে বলছেন ঠিক সেই ভাবেই, সোজা বাংলায় বাংলার নর-নারীর সাম্‌নে ধরা, বাংলার ক্ষুদ্রতম পল্লীতেও পৌঁছে দেওয়া "আর্থিক উন্নতি" তার একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করে।

গত তিন বছর ধরে "আর্থিক উন্নতি" ধন-বৃদ্ধির কলা-কৌশল ও ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব অনেক বাঙালীর বাড়ীতেই পৌঁছে দিয়েছে। আজ সে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করছে। এই বছরে সে তার ব্রত যাতে আরও একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে পারে, এই প্রতিজ্ঞা করেই কর্ম্মক্ষেত্রে নামছে। সেই সঙ্গে, এই সঙ্কল্পও আজ সে প্রত্যেক বাঙালীকে জানিয়ে রাখছে যে, আর্থিক ব্যাপার ও অর্থনৈতিক বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙালীর জড়তা ও নিশ্চেষ্টতা সে ভাঙবে-ই এবং ধনৈশ্বর্য্য বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিগুলার শ্রেষ্ঠ হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক বাঙালীর বুকে সে জাগিয়ে তুলবে-ই।

(২)

বাঙ্গালী জাতি ভাব-প্রবণ। বাস্তবহীন মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা ও লেখার প্রতিই তার ঝোঁক। বস্তু-নিষ্ঠা হৃদয়ঙ্গম করিতে সে এখনও শিখে নাই। উন্নতিশীল জাতিসমূহের সহিত পাল্লা দিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, তাহাকে এই বস্তুনিষ্ঠার সেবা কিছু দিন ধরিয়া করিতে হইবে। পশ্চিমা লোকেরা কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এত বড় হইয়াছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে শিখিলে তবেই আমরা বড় হইবার উপায়গুলির সন্ধান পাইব। সংখ্যা-বিবরণীই এই আলোচনার প্রাণ। সিপীলিকাশ্রেণীর মত সাধারণ সংখ্যাগুলা দেখিয়া-আঁৎকাইয়া উঠিলে চলিবে না; এই সংখ্যাগুলিকে নিংড়াইয়া তাহাদের অন্তরের কথা বাহির করিতে হইবে। "আর্থিক উন্নতি" এই উদ্দেশ্যে তাহার পাতায় পাতায় পাঠকবর্গের সম্মুখে রাশি রাশি সংখ্যা-বিবরণী ধরিয়া দেয়। "বাংলার সম্পদ" ও "আর্থিক ভারত" অধ্যায় দুইটায় যে ধরণের মালমশলা ঠাসা থাকে তাহা লইয়া বাঙ্গালী অর্থশাস্ত্রী আলোচনা আরম্ভ করিলে, ব্যাঙ্ক কারবার, যৌথ কারবার, চাষ আবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের অন্যান্য দেশের তুলনায় এবং গোটা দুনিয়ার তুলনায় বাঙ্গালী কোন স্থান অধিকার করে এবং কি ভাবে বাংলার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে সে বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবে। বাঙ্গালী অর্থ-শাস্ত্রীর জন্য আলোচনার মালমশলা নানা পত্রিকা হইতে আহরণ করিয়া মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়াই "আর্থিক উন্নতি"র প্রধান কাজ। ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-প্রণালী দেখিলেই বোঝা যাইবে কি ভাবে এই আলোচনাটা করা যাইবে। মিসরীয় সভ্যতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দেশেই সংখ্যা-বিবরণী রাখার রেওয়াজ আছে; প্রাচীনকালে প্রধানতঃ অধিবাস, কর ও সৈন্যবর্গের সংখ্যা-তালিকা রাখা হইত কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই সংখ্যা বিবরণী রাখাটা একটা বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারই এ

যুগে সকল দেশে সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভারতেও তাহাই হয়। কিন্তু এই রিপোর্টগুলি সকল প্রকার সমস্যা আলোচনার সহায়তা করে না। অনেক অংশেই এগুলি অসম্পূর্ণ। পরিবার-সংখ্যা, পরিবারের আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন ব্যক্তির পেশা, আয়, সন্তানের শিক্ষা, উপার্জন আরম্ভ করার বয়স, বৃদ্ধ ও বালকের কর্ম করিবার ক্ষমতা, বসত-বাটীর ভাড়া ও আয়তন প্রভৃতি নানা সমাজ-তাত্ত্বিকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সরকারী সেন্সাস রিপোর্ট ও বার্ষিক সংখ্যা বিবরণী হইতে ইহা জানিবার উপায় নাই। বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-বিবরণী আবশ্যক। বাঙালী অর্থশাস্ত্রীকে এইরূপ বিশেষ সমস্যার জন্য নিজেকেই সংখ্যা-বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে। অন্তত পরিশ্রমে গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ঘুরিয়া নানাবিধ সংখ্যা-বিবরণী সংগ্রহ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তবেই বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান সাহিত্য মৌলিক গবেষণায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। পশ্চিমা পণ্ডিতেরা এমনি করিয়াই জটিল সমস্যার অনুশীলন করেন।

(৩)

চারিদিকে একটা বিশ্ব মৈত্রী, বিশ্ব সমবোতার হাওয়া বহিতেছে। এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের দিনে দিনে বহুপ্রকার বোঝাপড়া চলিতেছে। এইরূপ একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে "আজ হইতে যুদ্ধকে নির্বাসিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সালিশী দ্বারা সকল প্রকার কলহ বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, এই ধুয়া এশিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে, দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষেও বটে—মারাত্মক। চিরকালের জন্য যুদ্ধশান্তির অর্থ এশিয়া ও আফ্রিকার আত্মহত্যা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত কাম্য হইলেও জাতীয় আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি সর্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নাও হইতে পারে। এই সকল দিকে অনেক সময়ে যুদ্ধ টনিকের কাজ করে। চিরাচরিত বহু কুসংস্কার ও বহু সংস্কার ধূলীভূত হইয়া যায় এবং পৃথিবীর সর্বপ্রকার নবভাব ও উদ্দীপনার সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

গত মহাযুদ্ধে আমেরিকার দৃষ্টান্ত হইতেও অনেক কথা পরিস্ফুট হইতে পারে। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী দেশে পরিণত হইয়াছে, ইহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ১৯১৪ সন হইতে আজ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক কথায়, আমেরিকার অভ্যুদয় সমগ্র দুনিয়ার ঈর্ষার কারণ হইয়াছে। অথচ এই দেশ যুদ্ধের পূর্বে ইয়োরোপের নিকট অনেক কোটি টাকা ধারিত। যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপ আজ আমেরিকার এক বড় অধমর্ণ।

বস্তুতঃ, আর্থিক স্বাধীনতা, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি কোন এক দেশের বরাবরকার সম্পত্তি হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ক্ষমতা ও শক্তি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সঞ্চারিত হওয়া দরকার হইতেছে। যারা বর্তমান অবস্থাকে চিরস্থায়ী অবস্থা করিতে চায়, তাদের যুক্তি কোনমতে তানাম্ জগতের কাছে গ্রাহ্য হইতে পারে বর্তমান অবস্থাই দুনিয়ার ইতিহাসে শেষ কথা হইতে পারে না। সুতরাং বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন দেখিবার মত সাহসও থাকা চাই।

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন বহু কারণে ঘটিতে পারে। তন্মধ্যে যুদ্ধ একটা খুব বড় কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই।

যুদ্ধের কালো দিকের ছবি তুলিয়া যাইতেছি, এমন নয়। রক্তপাত, লোকক্ষয়, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি অমঙ্গল সংসারের একটা দিক্। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখিতে হইবে যে ধ্বংসের পর পুনর্গঠন-সমস্যায় মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রয়োজন হয়। বর্তমান সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সমস্যাহীন সভ্যতা নয়, সমস্যাবহুল সভ্যতা। পদে পদে ইহাকে বহুপ্রকার সমস্যার সমাধান করিয়া চলিতে হয়, এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই। যুদ্ধের পর পুনর্গঠন-সমস্যাতে জাতির সভ্যতার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ আবশ্যক হয়। অন্যদিকে, নূতন নূতন জাতির উদ্ভব বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়। জগতের ইতিহাসে তার ঢের দেখ।

আমাদের দেশে কোন দিক্ দিয়াই বিগত মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। বাঙালীর ছেলে

অধিনথে অন্ততঃ আর্থিক ইজ্জৎটা মাপিতে সুরু করিয়া দিক। ডয়েল প্ল্যান, আন্তর্জাতিক ঋণ ইত্যাদি লইয়া ইংরেজেরা আজও গণ্ডা গণ্ডা বই লেখা হইতেছে। আমরাই বা পিছনে পড়িয়া থাকি কেন? তারপর ১৯১৪ সনের যুদ্ধ লইয়া আলোচনা করিতে-বসিলেই দেখা-যাইবে, ইংরোআমেরিকার অন্যান্য যুদ্ধ-সাহিত্য বিপুল বস্তু। ইহাতে বহু লোকের খাটিবার অবকাশ রহিয়াছে।

(৪)

বাংলার সম্পদ্

"আর্থিক উন্নতি"র তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। এই শিশুপত্রিকা বিগত বৎসরে বাংলার আর্থিক চিন্তায় কতখানি রসদ্ যোগাইয়াছে,—এবং সেজন্য বাংলা সাহিত্য কতখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এ বিষয় আলোচনা করিতে প্রথমেই পত্রিকার বিষয়-বিভাগ চোখে পড়িবে। যাবতীয় আলোচ্য বিষয় কয়েকটী মূল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে "বাংলার সম্পদ্"। এই বিভাগে বাংলার আর্থিকজীবনের সকলপ্রকার তথ্যই স্থান পাইয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম-সমস্যা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকল বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতগুলি বিষয়ের দিকে সহজেই মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল :—

কৃষি

বাংলার কৃষিসম্পদ্ বলিলে প্রথমেই ধানের কথা মনে পড়িবে। "আর্থিক উন্নতি" এই বিষয়ে বিগত বৎসরের বাংলার ধান-আবাদী জমির মোট পরিমাণ সম্বন্ধে খবরা-খবর দিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলার অনাবাদী জমিরও একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছে। ইহার পর বাংলার-জনমজুরের হার এবং দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিশদরূপে একাধিক সংখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। তথ্যগুলি-বিভিন্ন সংখ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইলেও বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুবিধা হইতে পারে। "আর্থিক উন্নতি"র তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ধানের পরেই পাটের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধান বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য হইলেও পাট বাঙ্গালী কৃষক-সম্প্রদায়ের আর্থিক মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই পণ্যের উৎপাদন এবং মূল্যের উপরেই বাংলার চাষীর স্বাচ্ছন্দ্য অস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে। "আর্থিক উন্নতি" ইহা সমঝিয়াছে বলিয়াই এই পণ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। প্রথমতঃ, পত্রিকার তাহ সংখ্যায় বাংলার পাট চাষের প্রাথমিক অনুমান সম্বন্ধে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল তাহা পৃথক করিয়া পূর্ব্ব তিন বৎসরের সহিত তুলনামূলকভাবে দেখান হইয়াছে। পৌষ সংখ্যায় পাটের বাজারে মূল্য কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, পাটের চাষ কমাইয়া দিলেই যে কৃষককুল লাভবান হইবে তাহা নহে। ইহার জন্য পাটের দাম যাহাতে স্বাভাবিক কারণে টান-যোগানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই স্বভাব-নিয়ন্ত্রণের অন্তরায় হইতেছে ফড়িয়াগণ। ইহারা নানা কৌশলে পাট-চাষীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কি উপায়ে পাট-চাষী ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে আলোচনায় সে সমস্যা উত্থাপন করা হইয়াছে। ফাল্গুন সংখ্যায় বাংলার পাট বিষয়ে যাবতীয় তথ্য এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলার কি পরিমাণ জমিতে কত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়, এবং তাহার কত অংশ রপ্তানি হইয়া থাকে সকল কথারই অবতারণা করা হইয়াছে। উৎপন্ন পাটের দরুণ কি প্রকার মূল্য আদায় হইয়া থাকে, পাট চাষী এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে কিরূপে এই মূল্যবিভাগ হয়, এবং বাংলার আর্থিক জীবনে পাটের স্থান কোথায় কিছুই বাদ যায় নাই।

শিল্প

বাংলার শিল্পপ্রসার এবং শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি" কোন খবর দিতেই কসুর করে নাই। বিগত বৎসরে বাংলার উল্লেখযোগ্য সকল প্রকার শিল্পানুষ্ঠান সম্বন্ধেই, বিশেষ করিয়া পাটকল সম্বন্ধে এই পত্রিকা যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রেমচাঁদ জুট মিলস্, কণ্ঠহুলি জুট মিলস্, দি ইষ্টবেঙ্গল জুট মিলস্ ইত্যাদি কতকগুলি বড় বড় পাট কলের সকল বার্ত্তাই এই পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। কাপড়ের কল সম্বন্ধেও কোন তথ্য বাদ যায় নাই,—ঢাকেশ্বরী কটন মিল, বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আবশ্যক তথ্যগুলি পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তারপর চা'এর চাষ সম্বন্ধেও এই পত্রিকা যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছে। আষাঢ় সংখ্যায় বাঙ্গালীর চা কোম্পানী সম্বন্ধে উদ্ধৃত বিস্তৃত তালিকাই তাহার সাক্ষ্য দিবে। ইহা ছাড়া আরও যে সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে "আর্থিক উন্নতি" তাহারও খোঁজখবর লইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কয়টি—রাজমহল আর্থেন অয়ার কোং লিঃ (জ্যৈষ্ঠ), দি বেঙ্গল-বার্ম্মা-ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী (আশ্বিন), দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড্ (কার্ত্তিক), ঝুমিরা টীপ কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড।

গোটা বৎসরে বাঙ্গালী তাহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পে কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া কোন কোন নূতন শিল্পে মাথা খেলাইতে আরম্ভ করিয়াছে "আর্থিক উন্নতি" পড়িলে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর মিলিবে।

ব্যবসা বাণিজ্য

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি" যে সকল তথ্য দিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চৈত্র সংখ্যায় বাংলার হাট বাজার সম্বন্ধে যে আলোচনা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে পাঠকবর্গ অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। ইহাতে ব্যবসায়ী বাঙ্গালী সম্বন্ধে বাহুল্য-বর্জ্জিত অনেক কথাই বলা হইয়াছে। ভাদ্র সংখ্যায় উদ্ধৃত 'বাংলায় বাঙ্গালীর ব্যবসা ক্ষেত্র' শীর্ষক প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঘ সংখ্যায় কলিকাতায় কাপড়ের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও চিন্তা করিবার বিষয় আছে। বাণিজ্যবার্ত্তা হইতে গৃহীত মাছের ব্যবসা শীর্ষক প্রবন্ধও সাধারণ পাঠককে অনেক নূতন কথা শুনাইবে। বৈশাখ সংখ্যার সিগারেটের চাহিদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করিলে অনেকেরই চোখ খুলিবে। উক্ত সংখ্যায় 'ডেডাল' সম্বন্ধীয় আলোচনাও তথ্যবহুল। ইহা ছাড়া বৈশাখ সংখ্যায় 'কলিকাতায় আমদানি রপ্তানি' ও 'চট্টগ্রামের বাণিজ্যবৃদ্ধি' বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক এইগুলি পড়িয়া বাংলার বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন। পাটের আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ করিতে "আর্থিক উন্নতি" কম মেহনৎ করে নাই। যখন যে ব্যাঙ্কের বার্ষিক বিবরণী বাহির হইয়াছে এই পত্রিকা তখনই তাহা প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। আষাঢ় সংখ্যায় "ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙ্গালী" সম্বন্ধে যে তালিকা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে পাঠকমাত্রই বাংলার ধনশক্তি সম্বন্ধে ঠিক অনুমান করিতে পারিবেন। বাংলার বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে "আর্থিক ভারত" বিভাগে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিবিধ অনুষ্ঠান

আর্থিক বাংলার আরও কতকগুলি বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এই পত্রিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। বৈশাখ সংখ্যায় "পোর্টট্রাষ্ট ও আর্থিক বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধ এই এলাহি কারবারকে সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোচিত "কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ" নামক প্রবন্ধ পড়িলেও বাঙ্গালী পাঠকের এক নূতন বিষয়ে মাথা খুলিবে।

ইহা ছাড়া "আর্থিক উন্নতি" বাংলার আরও অনেক বিষয় লইয়া নাড়াচোড়া করিয়াছে। "বাংলার পল্লীগ্রাম সমূহের লোকসংখ্যা" সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইহাতে পাওয়া যাইবে (আশ্বিন সংখ্যা)। বাংলার ডিলাবোর্ড-গুলির আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপার এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে (ভাদ্র সংখ্যা)। বাংলার আর্থিক জীবনের কোন বিশিষ্ট ঘটনাই বাদ পড়ে নাই।

আর্থিক ভারত

পত্রিকার এই বিভাগেও আর্থিক উন্নতি কম নজর দেয় নাই। বাংলাদেশ ছাড়াও গোটা ভারতের কতকগুলি আর্থিক সমস্যা আছে। সেগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্যই এই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে বাংলার সহিত গোটা ভারতের বিষয়মূলক পার্থক্য নাই, সেখানে এইপ্রকার বিভাগের ফলে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিবার সুবিধা হইয়াছে। এই বিভাগে যেসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

ভারতীয় শিল্প

ভারতবর্ষের যে সকল শিল্প এখনও সম্যক্ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, অথচ যাহার যত্নে উন্নতি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে,—সেগুলির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার কয়েকটি শিল্পের নাম উল্লেখ করা গেল, যেমন, ভারতের চিনি শিল্প, ভারতবর্ষের তৈলবীজ ও আধুনিক তৈলনিষ্কাশন প্রণালী (বৈশাখ); ভারতবর্ষে কি কি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে; ভারতে কত সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয় (জ্যৈষ্ঠ); ভারতে কয়লার উৎপাদন (অগ্রহায়ণ); ভারতের কার্পেট ও কম্বল শিল্প, কয়লার খনি (পৌষ)।

ভারতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণমূলক বিবিধ অনুষ্ঠান

গোটা ভারতে যে সকল অনুষ্ঠান দেশীয় অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমগ্র দেশের ধনশক্তি পুষ্ট করিতেছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যথা, ভারতে জীবন বীমার প্রসার (বৈশাখ); ব্যাঙ্ক ভারত, যৌথ কারবারের উন্নতি (জ্যৈষ্ঠ); ভারতে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার (ভাদ্র) ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা

ভারত গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি অনুষ্ঠান ব্যবসায়িক নীতি দ্বারা পরিচালিত করিতেছে। দেশের ধনশক্তি বাঁচাই করিতে হইলে ইহার সম্বন্ধেও আলোচনা করা দরকার। বিগত বৎসরে আর্থিক উন্নতিতে এই প্রকার যে সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এই—ভারতীয় রেলের অতীত ও ভবিষ্যৎ (বৈশাখ), ভারতের ডাক বিভাগ (জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ); সরকারি রেলপথের খরচ, গভর্ণমেণ্ট অধিকৃত রেলওয়ের আয় (ভাদ্র ও মাঘ) ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি ব্যবস্থা এবং আইনের দ্বারাও ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। আর্থিক-উন্নতি এসম্বন্ধেও ভাঁসিয়ার। তাই ইহাতে ভারতোপকূল নৌ-বাণিজ্য বিল (আষাঢ়), ভারতে সামরিক ব্যয় (শ্রাবণ) প্রভৃতির আলোচনাও স্থান পাইয়াছে।

বহির্বাণিজ্য

ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি" অনেক প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। "আর্থিক উন্নতির" বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পত্রিকা ভারতবর্ষের আমদানি রপ্তানি মালের বহর এবং মূল্য নিরূপণ করিতেই ব্যস্ত হয় নাই, সেই সঙ্গে যে সকল বস্তুর আমদানি এবং রপ্তানি সমস্যামূলক হইয়া রহিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবার জন্যও ইহা সচেষ্ট রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিষয়গুলির নাম করা গেল, যথা,—চাউল আমদানি রপ্তানি (আষাঢ় এবং কার্ত্তিক); বিদেশী সূতা ও কাপড় কত আমদানি হয় ও কোন্ কোন্ দেশ ভারতের সূতা যোগায়; চামড়া রপ্তানি

(শ্রাবণ); ভারতে লোহা ইস্পাত এবং কলকব্জার আমদানির পরিমাণ, গোসাপের চামড়ার ব্যবসা (ভাদ্র); চীনা মাটির বাসন আমদানি (কার্ত্তিক); কয়লা আমদানি রপ্তানি (কার্ত্তিক); পশম ও নকল রেশম আমদানি, ভারতের বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের স্থান (অগ্রহায়ণ); ভারতীয় বাণিজ্য বিবরণ, ভারতে বিলাতী কাপড়, উত্তর আমেরিকার সহিত ভারতের কারবার, ইংলণ্ড ভারতের নিকট হইতে কি কি কিনে, ইয়োরোপে ভারতীয় মাল (ফাল্গুন); ভারতে সিমেণ্ট আমদানি (চৈত্র) ইত্যাদি।

দুনিয়ার ধনদৌলত

"আর্থিক উন্নতি" বাংলার সম্পদ্ এবং ভারতের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সেই সঙ্গে বর্ত্তমান দুনিয়ার ধনদৌলত সম্বন্ধেও খোঁজখবর লইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের উন্নতিশীল দেশগুলি যে পথে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে ভারতবর্ষকে নিকট ভবিষ্যতে সেই পথেই শিক্ষানবিশি করিতে হইবে; সেজন্য এই সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠকমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে:—

বৈশাখ—মার্কিণ ব্যাঙ্কের উঠানামা। ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈববীমা।

ভাদ্র— হাওয়ায় হাওয়ায় মাল চলাচল। রেকার দমকা ও আর্থাণ সরকার। বাষ্প ও জলশক্তি—ব্যবসায়ে বিজলীর রেওয়াজ।

আশ্বিন—১৯২১ সনের করাসী বজেট। বিলাতে সংরক্ষণ-নীতির প্রসারের চেষ্টা। বিভিন্ন দেশের তুলার ক্ষেতের পরিমাণ।

কার্ত্তিক—মার্কিণে ভারতীয় অস্ত্রের কাটতি। লোক সংখ্যার তুলনায় রাস্তা। আর্থাণ লৌহ ইস্পাত শিল্প। শিল্প-বাণিজ্যে জাপানের উন্নতি।

অগ্রহায়ণ—জাপানে স্বদেশী আন্দোলন। কোন্ দেশ কত চা খায়। বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা। অষ্ট্রেলিয়ার বিবিধ পেশন ও তাহার সংখ্যা। আমেরিকায় বায়স্কোপ শিল্পের ব্যবসা।

পৌষ— ১৯২৭ সনে দুনিয়ায় আমদানি ও রপ্তানি কারবার। রুশিয়ায় চায়ের প্রচার। কাটেল পুলের পথে নয়া দুনিয়া। আমেরিকায় চা আমদানি। চীনা সিল্ক। দুনিয়ার বস্ত্র রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের স্থান।

মাঘ— বিলাতে সেকার কমাইবার চেষ্টা। বিভিন্ন দেশে তামাক উৎপাদন।

ফাল্গুন—করাসী গ্রামে বিদ্যুৎ বিস্তারের জন্য ১৮ কোটি ফ্রাঁ। তুর্কির ঘরপাতি শিল্প। প্রমজীবিগণের বাসোপযোগী স্থান।

চৈত্র— বিলাতের পুঁজি রপ্তানি। পাঁচটি দেশে মাথা পিছু খাজনা। মার্কিণ চায়ের কিরিস্তি।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

এই বিভাগে ব্যক্তি-বিশেষ বা বিখ্যাত সঙ্ঘের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যে শিক্ষণীয় অনেক বস্তু থাকিতে পারে তাহা আবিষ্কার করা "আর্থিক উন্নতি"র বিশেষত্ব। এই প্রকার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল যথা:—ভারতীয় বীমা কোম্পানী সাম্মলনে গৃহীত প্রস্তাব (জ্যৈষ্ঠ); আন্তর্জ্জাতিক শিপিং কনফারেন্স (শ্রাবণ); বিলাতে অর্থকরী শিল্পবিদ্যা (আশ্বিন); ভারতীয় বণিক সভাসমূহ (জ্যৈষ্ঠ); বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মিলন (পৌষ); শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের বঙ্গের শিল্পোন্নতি সহায়ক আইনের খসড়া (মাঘ); ফরিদপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে ডাঃ যতীন মৈত্রের অভিভাষণ (আষাঢ়); আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মিলন (আষাঢ়); আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন (ফাল্গুন), ইত্যাদি।

মোলাকাৎ

মোলাকাৎ ব্যবস্থাটা "আর্থিক উন্নতির" একেবারে নিজস্ব বলিলেই চলে। ইহার সহায়তায় বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সাক্ষাৎ আলাপে, ব্যবসাজগতের অনেকপ্রকার তথ্য

আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি" একেবারে পুঁথিগত বিদ্যার উপরেই আস্থাবান হইতে পারে নাই। বিগত বৎসরে প্রতিমাসে একটি করিয়া মোলাকাৎ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটির বিষয়ই খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাংলা ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "ধন-বিজ্ঞানের গবেষণাপ্রণালী" শীর্ষক মোলাকাৎটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পত্রিকা-জগৎ

"আর্থিক উন্নতি"র আর একটী কৈফিয়তি এই যে, এই পত্রিকা পাঠকবর্গকে নানাপ্রকার দেশী বিদেশী পত্রিকার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। অন্যূন ৫৭ খানি দেশী বিদেশী পত্রিকা হইতে নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া "আর্থিক উন্নতি"তে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। পত্রিকাগুলির মধ্যে ১ খানি আর্মাণ, ১ খানি ফরাসী, ২ খানি ইতালিয়ান, ২ খানি বাংলা এবং বাকীগুলি ইংরেজি ভাষায় লেখা।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থসমালোচনাও আর্থিক উন্নতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বিগত বৎসরে মোট ৪০ খানি গ্রন্থের সমালোচনা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। যে যে দেশ হইতে এই সকল বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম এবং বইয়ের সংখ্যা সম্বন্ধে নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

(দেশ)	(পুস্তকের সংখ্যা)	
ফ্রান্স	৪	
আর্মাণি	৪	
ইংলণ্ড	৩	
আমেরিকা	১৯	
অষ্ট্রেলিয়া	১	
ক্যানাডা	১	
ভারতবর্ষ—		
ইংরাজি	৫	৮
বাংলা	২	
হিন্দী	১	

ইহা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ১৬টী প্রবন্ধের সমালোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

এই বিভাগে "আর্থিক উন্নতি"র পাঠক অনুমান প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাবলীর খোঁজ পাইয়াছেন। যে যে দেশ হইতে এই সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম ও পুস্তকের সংখ্যাসহ নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

(দেশ)	(পুস্তকের সংখ্যা)
আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র)	৫০
ইংলণ্ড	৩৬
ফ্রান্স	২৭
আর্মাণি	২২
ইতালি	৮
ভারতবর্ষ (গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট)	৪
" সাধারণ গ্রন্থ	৬
জাপান	২
অষ্ট্রেলিয়া	১
চায়না	১
রাশিয়া	১

প্রবন্ধাবলী

"আর্থিক উন্নতি"র শেষভাগে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত বৎসর মোট ৬২টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দুইটী দীর্ঘ প্রবন্ধ যথাক্রমে দুই এবং চারি কিস্তায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ৭টী প্রবন্ধ একখানি পুস্তকের আংশিক অনুবাদ। ইহা ছাড়া আরও ৩টী প্রবন্ধ অপর একখানি পুস্তকের আংশিক তর্জ্জমারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কোন কোন সংখ্যায় প্রবন্ধাবলীর পর নানারূপ তর্কপ্রশ্নের অবতারণা করিয়া কতকগুলি সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(৫)

আর্থিক বাংলা

বাঙ্গালীর আজ হাজার রকম অভাবের মধ্যে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চ্চার অভাবও একটা। অর্থনৈতিক চিন্তায় মাথা খেলানোর দিকে বাঙ্গালী জাতির খেয়াল নেহাৎ কম। বাংলার নরনারীকে এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মগজ চালাইবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম কাজ।

"আর্থিক উন্নতি"র আটটা আলাদা আলাদা বিভাগ। এই বিভাগগুলির প্রত্যেকটাতেই হরেক রকম তথ্য থাকে, এবং আলোচনাও যাহা হয় তাহা বস্তুনিষ্ঠ ভাবেই হইয়া থাকে। আজ ১৩৩৫ সনের সালকাবার। এই বৎসর 'আর্থিক উন্নতি'র বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ করিয়া 'বাংলার সম্পদ্' ও 'মোলাকাৎ'এর ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের যে চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। অবশ্য বাঙ্গালীর সকল রকম আর্থিক প্রচেষ্টা ও চিন্তাই যে 'আর্থিক উন্নতি'র আলোচনার স্থান পাইয়াছে তাহা নহে। হাজার পৃষ্ঠার আয়তনের কাগজে তাহা করা সম্ভবপরও নহে। তবে এই অসম্পূর্ণ আলোচনার ভিতর দিয়াও এক বৎসরে বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের গতি-বিধি ধরণধারণ এবং কোনদিকে মাথা খেলিয়াছে তাহার একটা আভাষ পাওয়া যায়।

কৃষি সম্পদ্

এই বৎসরে ফসলের মধ্যে পাট, চা, ধান ও আলু লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে পাটের উপরই নজর পড়িয়াছে বেশী। গত বৎসর বাংলাদেশে ২৯৮২১০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, এই বৎসর হইয়াছে ২৭১১২০০ একর জমিতে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর মোটের উপর শতকরা ৬ ভাগ কম বপন হইয়াছে। ইহার কারণ সময়মত বৃষ্টির অভাব ও কংগ্রেস পক্ষ হইতে পাট চাষ কমাইবার আন্দোলন।*

বিগত ২৫ বৎসরের পাটের হিসাব এখানে দেখান হইল।

বৎসর	বিলে খরচ	রপ্তানি	অন্যান্য কারখানায় খরচ	
	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল
১৮৯৯-১৯০৪	২৫'৭৭	২৪'৯৫	৫	৬৫'৭২
১৯০৪-১৯০৯	৩০'৪৩	৪২'১৫	৫	৮০'৪২
১৯০৯-১৯১৪	৪২'০১	৪২.২১	৫	৮৯'২২
১৯১৪-১৯১৯	৪২'৪৬	২৩'৩১	৫	৮০'৭৭
১৯১৯-১৯২৪	৪৮'৮১	৩০'৮৯	৫	৮৪'৫০
১৯২৪-১৯২৫	৫৫'১৯	৩৮'২২	৫	৯৮'৪১
১৯২৫-১৯২৬	৫৩'৪৪	৩৪'১৭	৫	৯৩'৬১

গত ২৫ বৎসরে পাটের টান গড়ে ৮৫ লক্ষ বেল পরিমাণ হইয়াছে। ১৯২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ সনে ৯০,১২,-১০০ ও ৯৯ লক্ষ বেল চাহিদার চেয়ে বেশী জন্মিয়াছে। চাহিদামাফিক উৎপাদন রাখিতে হইলে পাট চাষ শতকরা তিন ভাগ কমাইতে হয়।

এই এক বৎসরে পাটের আবাদ কমাইবার জন্য যে আন্দোলন হইয়াছে তাহাতে পাট চাষীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার অথবা পৃথিবীর পাটের বাজার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বাড়াইবার বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় নাই। পাটের জন্য সমবায় ক্রয়-বিক্রয় ভাণ্ডার যাহা দুই একটা হইয়াছিল, তাহাদের কাজও সন্তোষজনক হয় নাই। বাংলার কৃষককে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে মার্কিণও কানাডার মতো কৃষকদের 'পুল্' বা সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে হইবে।

গত পাঁচ বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, বাংলায় গড়ে প্রতি সন ৯৫ লক্ষ বেল পাট জন্মে। ইহার মধ্যে ৮৫ লক্ষ বেলের কতক পাটকলগুলিতে চট বস্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণে খরচ হয় ও কতকটা পরিমাণ বাছাই পাট সরাসরি জাভা, মার্কিণ বা অন্যান্য বিদেশী মুলুকে চালান যায়। অবশিষ্ট পাট বাঙ্গলার ঘরোয়া কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাংলার পাট-সম্পদের আনুমানিক মূল্য শত কোটি টাকা। সরকারী হিসাব অনুযায়ী বাংলার কৃষক গড়ে শতকরা ৮৲ করিয়া পাটের দাম পায় এবং এই ৮৲ হিসাবে

কৃষকরা প্রতি সন ত্রিশ কোটি টাকা পায়। ভারত সরকারের মতে কৃষকের অন্ততঃ মণকরা ১০৲ পাওয়া উচিত। অর্থাৎ সাড়ে সাত কোটি টাকা তাহার আরও বেশী পাওয়া চাই।

রপ্তানি শিল্পের দ্বারা ৭৫ কোটি টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায়। এই বিরাট রপ্তানি-শিল্পের সমস্তই একরূপ ইংরেজের হাতে। এই রপ্তানি শিল্পের কল্যাণে রেল, জাহাজ, বীমা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কোম্পানী মোটা হয়। ইহারা প্রায় ৮ কোটি টাকা পায়। ভারত সরকারের খাজাঞ্চিখানায় পাটশুল্ক বাবদ কমসে কম পৌনে চার কোটি টাকা প্রতি সন জমা হয়। স্থানীয় ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ১৬ লক্ষ টাকা পায়।

বাংলার কৃষক পড়ে মণকরা ৮৲ দর পায়। রেল, জাহাজ ভাড়া ও কমিশন ইত্যাদি বাদে বিদেশী রপ্তানিকৃত কাঁচা পাটের মূল্য মণকরা ১৫৲ হিসাবে পড়ে। তাহা হইলে দেখা যায়, বাংলার কৃষক আট টাকা পাইলে মহাজন আড়তদার, পাট রপ্তানিকারিগণ মণকরা ৭৲ লাভ করে।

পাটকল

জার্মানি, ডাচ ও বাংলা দেশের পাটকলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে বাঙ্গালীর জীবনে পাট-কলের প্রভাব কতদূর। এই এক বৎসরে বাংলা দেশে ৫।৬টা নূতন কল স্থাপনের যোগাড় হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৩টা বাঙ্গালীর—একটা নারায়ণগঞ্জে, একটা চট্টগ্রামে এবং তৃতীয়টা কলিকাতার নিকটে। বিদেশীদের তাঁবে পুরাণো কলের সঙ্গে টক্কর দিয়া যদি বাঙ্গালীর এই ৩টী কল বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনে ভবিষ্যতে কিছু পরিবর্তনের আশা করা যায়।

চা

চায়ের ব্যবসায়ে বাঙ্গালী নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আসাম ও অন্যান্য স্থানের কমসে কম ৪০টা চাবাগান বাঙ্গালী-দের তাঁবে রহিয়াছে। পঞ্চাশ লক্ষের কিছু বেশী টাকা বাঙ্গালীর এই চা বাগানগুলির মূলধন। চা বাগান পরিচালনায় ওস্তাদ বাঙ্গালীর প্রধান আড্ডা জলপাইগুড়ী। চা বাগানের দৌলতেই জলপাইগুড়ীতে একাধিক বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। চা বাগানের পরিচালনায় বাঙ্গালী মাথা খেলাইয়াছে বটে, কিন্তু চা কোম্পানীগুলিকে টাকা ধার দিবার এবং বিদেশে চা বেচিবার কাজগুলি এখনও চালাইতেছে প্রধানতঃ অ-বাঙ্গালী। এই বৎসরে এদিকেও বাঙ্গালীর নজর পড়িয়াছে।

ধান

বাংলায় গত বৎসর ৪৩ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত টন ধান হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ধান জন্মিয়াছিল ৫৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩ শত টন। ধানের উৎপাদন কমিয়াছে। প্রতি বাঙ্গালীর পেট ভরিবার মতো চাল রাখিয়া বিদেশে চালান দিবার মতো উদ্বৃত্ত চাল থাকে কি?

অনাবাদি জমি

বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল কর্ষণযোগ্য অনাবাদি জমি আছে তাহার অনুপাত নিম্নরূপ :—

জিলা	অনাবাদি জমির তুলনায় কর্ষণযোগ্য অনাবাদি জমির পরিমাণ
ফরিদপুর	৯·৫
ঢাকা	২·৭
ময়মনসিংহ	১১·৫
বরিশাল	১১·৬
মুর্শিদাবাদ	৪৮·০
নদীয়া	৪০·৪
বর্দ্ধমান	২০·৫
হুগলী	১৭·৫

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় কর্ষণযোগ্য জমি অনাবাদি পড়িয়া রহিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে বেশী। কেন? খুঁটিনাটি করিয়া কারণ আলোচনা করিলে অনেক রকম কারণ পাওয়া যাইবে, কিন্তু প্রধান কারণ এই যে পশ্চিমবঙ্গে লোকে কৃষির দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই।

উহার মূলে রহিয়াছে সারবনের অভাবে জমির উর্ব্বরতা নাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যহানি। বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের সহিত বাংলার নদী, খালগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিলেও এই এক বৎসরে বাঙ্গালী নদী সমস্যা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামায় নাই।

চিনি ও গুড়

বাংলাদেশে চিনি ও গুড় দুইই ব্যবহৃত হয়। তবে গুড়ের চেয়ে চিনির কাটতি বেশী। কিন্তু বাঙ্গালীর উল্লেখযোগ্য চিনির কারখানা একটিও নাই। সমগ্র বাংলায় একমাত্র যশোহরের কোটচাঁদপুর ও সুকচর গ্রামে খেজুর গুড় হইতে বেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত হয়। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কোটচাঁদপুরে প্রায় ১৫০টী কারখানা ছিল এবং সেই কারখানা হইতে কমপক্ষে ১৫০০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিক্রী হইত। সে সময়ে এই চিনি ইংলণ্ডে চালান হইত এবং সেখান হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়া কলিকাতার সাহেব মহলে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সাদা আতা চিনির আমদানির সঙ্গে সঙ্গে দেশী চিনির বিক্রয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এই বৎসরে কোটচাঁদপুরে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু বাজারে তাহার ও বিক্রী হইবে কিনা সন্দেহ।

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করিয়া দিনাজপুর জিলায় আখের গুড় তৈরী হয় যথেষ্ট। এই সব গুড় চালান হয় পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে। কিন্তু চিনির সঙ্গে টক্কর দিতে যাইয়া এই গুড়ের ব্যবসাতেও মন্দা পড়িয়াছে। এই দুইটী ব্যবসা বাঙ্গালীর হাত হইতে ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী ইহা লইয়া বেশী মাথা ঘামায় নাই। "আর্থিক উন্নতি"তে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মাছের ব্যবসা

বেকার সমস্যা বাংলার একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাছের চাষ ও ব্যবসার উপর বাঙ্গালী যুবকের নজর পড়িলে বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

সরকারী কৃষিক্ষেত্র

বেকার-সমস্যা সমাধানে ফরিদপুর কৃষিক্ষেত্রও হাত দিয়াছে। এই স্কীম অনুসারে এক বৎসর গভর্ণমেণ্টের কৃষি-কার্য্যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ শিক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক যুবককে ১৫ বিঘা খাস মহালের জমি এবং দুই শত টাকা দেওয়া হইবে। ১লা মার্চ্চ হইতে প্রথম দল শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমগ্র দেশের তুলনায় কৃষি শিক্ষার বর্ত্তমান ব্যবস্থা যে কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষিবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে এদেশীয় কৃষক বালকগণের উৎসাহ না থাকার প্রধান কারণ আমাদের যাহা মনে হয় তাহা এই যে, দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। তাই কৃষক বালকগণ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবে না মনে করিয়াই তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। আধুনিক কৃষি যন্ত্রাদি ও উপকরণাদি কৃষকগণকে বিনা সুদে ধারে সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিলে বোধ হয় তাহারা এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে।

আইন কানুন

দুনিয়ার আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলার জমীদার ও রায়তের সম্বন্ধটাকেও কিছু কিছু ঘষিয়া মাজিয়া লওয়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাল সামলাইবার জন্য এই বৎসরে প্রজাস্বত্ব আইনটার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়ার উন্নতিশীল জাতিগুলির কৃষি-বিষয়ক আইন কানুনের তুলনায় বাংলার কৃষি আইন কত পিছাইয়া রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার তাঁহার 'নয়া চক্ষের জমীদারি' প্রবন্ধে। এখন বাংলা দেশের আইন কানুন তৈরী করিবার সময় বাঙ্গালীর জীবনের উপরে দুনিয়ার চিন্তা ও গতির প্রভাব নজরে রাখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

কলকারখানা

এই বৎসরে কলকারখানার উপর বাঙ্গালীর নজর পড়িয়াছে বেশী। লক্ষ লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া কাপড়ের কল, পাটকল, তেলের কল, লোহার কারখানা, বিচালীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইতেছে।

এত বেশী পুঁজি লইয়া হরেক রকম কল কারখানার প্রতিষ্ঠা হওয়াতে বুঝিতেছি যে, বাঙ্গালী দুনিয়ার আবহাওয়ার আওতায় আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ আর্থিক বাংলার একটা আঁচ পাওয়া যাইতেছে এই কল কারখানা-গুলির জন্ম-বৃত্তান্তে। বাঙ্গালীর আর ঘরকুণো হইয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না। তাহাকে চলিতে হইবে দুনিয়ার সকল জাতির সঙ্গে তালে তালে, কখনো পাল্লা করিয়া, কখনো বা আলিঙ্গন করিয়া।

সিগারেটে টান

ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী বাংলা দেশে ১৩টী কেন্দ্র খুলিয়াছে। উহার মধ্যে ৮টা কেন্দ্রে শুধু গত ডিসেম্বর মাসেই ৫৷৹ লক্ষাধিক টাকার সিগারেট বিক্রয় হইয়াছে। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রেও প্রতিমাসে ৩ লক্ষ টাকার সিগারেট বিক্রয় হয়। অন্যান্য কেন্দ্রের বিক্রয়ের কথা জানা যায় নাই। বাংলার তামাক ব্রহ্মদেশে লইয়া যাইয়া সিগার বানাইয়া আনিয়া বাংলার বুকে বসিয়া বিক্রয় করিয়া মুনাফা পায় বর্ম্মীরা; অথচ বাঙ্গালীর তাঁবে সিগার বা সিগারেটের কারখানা নাই।

বায়স্কোপে যুবক বাংলা

বায়স্কোপের ব্যবসাতে বাঙ্গালী মাথা খেলাইতে সুরু করিয়াছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন সহরে যতগুলি বায়স্কোপের ব্যবসা বাঙ্গালীর তাঁবে রহিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি উল্লেখযোগ্য:—চাকায় ২টা, নারায়ণগঞ্জে ১টা এবং করিদপুরে ১টা। এই ব্যবসাতে বাঙ্গালী সবে মাত্র টাকা ঢালিতে সুরু করিয়াছে; কিন্তু ব্যবসাটা এখনো রহিয়াছে অবাঙ্গালীর হাতে। বাংলা দেশে ফিল্ম্ তৈয়ারীর ব্যবসা সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা বাঙ্গালীর দখলে আসিয়াছে বলা চলে না।

সরকারী শিল্প বিভাগ

এই বৎসরে সরকারী শিল্প বিভাগ সাবান প্রস্তুত, গালা পরিষ্কার, মোটা পেন্সিল রং করা, কাচের উপাদান সংগ্রহ, কাচের উপর রূপালি কাজ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা দ্বারা অনেক শিল্পীর উপকার করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া বর্দ্ধমানে তেলের কল, কলিকাতায় কার্ডবোর্ড প্রস্তুতের কারখানা, আলকাতরা প্রস্তুতের কারখানা, চট্টগ্রামে ও কুষ্টিয়ায় বরফের কারখানা, শাবনায় মোটা পেন্সিল কল ও সুকী মিল, ষ্টীমট্রাকের কারখানা, মাদারীপুরে ঘুঘের কারখানা, জলপাইগুড়িতে লোহার কারখানা, বাগেরহাটে তেলের কল ও খোল পেষাই কল, রং ও মুদ্রণ যন্ত্র, কাচের কারখানার চিমনি বসান প্রভৃতি কার্য্যেও সাহায্য করিয়াছে।

দেশলাই, কালি, খাম, গঁদ, শীল করিবার মোম, ছুতার পালিস্, কসমেটিক, লৌহদ্রব্য, শণের দড়ি, গরুর গাড়ীর চাক প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া বহু লোক জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে কিন্তু ঐ সব শিল্প রক্ষার জন্য এখনও সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই।

পথ ঘাট নদী বন্দর ইত্যাদি

পথঘাট, নদী, বন্দর ইত্যাদি দেশের আর্থিক উন্নতি অবনতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু বাঙ্গালী এই সকলের আর্থিক কথা লইয়া খুব বেশী মাথা ঘামায় নাই।

কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট বা বন্দর-শাসন-সঙ্ঘের কর্ম্ম-কাণ্ডে বাঙ্গালীর একতিয়ার অতি অল্প। এই বন্দর শাসন-সঙ্ঘের তাঁবে কয়েক কোটি টাকা উঠে ও খরচ হয়। অর্থাৎ মজুর ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের হাজার হাজার লোকের অন্নবস্ত্র এই সঙ্ঘের আওতায় পরিচালিত হইতেছে। অধিকন্তু বহুসংখ্যক অ-বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর বেপারীর লাভ লোকসানও এই সঙ্ঘের উন্নতি অবনতির সঙ্গে সুসম্বদ্ধ। কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট লইয়া মাথা খেলাইলে বাংলার নরনারীর জীবনে একটা নব জাগরণ দেখা দিবে।

কলিকাতার বন্দরের বহর বাড়িয়াছে। চট্টগ্রামের বন্দর বড় হইতেছে। বন্দরের বাড়তির সহিত আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য জড়িত। বাংলার বন্দরের আর্থিক কথা লইয়া চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে; কিন্তু এই বিষয়ে বেশী বাঙ্গালী অগ্রসর হইয়া আসেন নাই।

নদী খাল আর্থিক বাংলার মেরুদণ্ড। অথচ বড় বড় নদী হারিয়া মজিয়া যাইতেছে। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলার নদীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কত শিল্প বাণিজ্য যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তাহার ইতিহাস এখনো সংগৃহীত হয় নাই। পদ্মার হড় খালের শেষ সীমায় না পৌঁছাইলে চৈতন্য হইবে না। কাজেই নদী-সমস্যা বাঙ্গালীর জীবনে খুব বড় সমস্যা হইলেও বাঙ্গালী জাতি ইহার সমাধানের জন্য এখনো মরিয়া হইয়া লাগে নাই।

১৯২৬-২৭ সনে বাংলায় ১৭,৯৮০ মাইল রাস্তা ছিল। ইহার মধ্যে ২৪১৩ মাইল কাঁচা ও ১ ৪৪৭ মাইল পাকা রাস্তা। ১৯২৫-২৬ সনে ২,৪৯৫ মাইল কাঁচা ও ১৫,০০৫ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। এক বৎসরে ১৮ মাইল কাঁচা ও ১৪২ মাইল পাকা রাস্তা বাড়িয়াছে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বেড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঁচা রাস্তার অধিকাংশই নামমাত্র রাস্তা; যানবাহনের যাতায়াতের উপযুক্ত নহে। বর্ষাকালে লোকাল বোর্ডের অনেক রাস্তা খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। যে সব রাস্তা ভাল তাহার উপর দিয়াও দ্রুতগামী যানবাহন, যেমন মালবাহী মোটর গাড়ী চলিতে পারে না। নদী মজিয়া যাইতেছে, রাস্তার দোষে, দ্রুতগামী যানবাহনের অভাবে স্থল পথেও মাল চালান দিবার অসুবিধা হইতেছে। রেলের সুবিধাও অধিকাংশ গ্রামের নাই। এই সব কারণে বাংলার পল্লীর অনেক শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের আড্ডা বাংলার গঞ্জ ও বন্দর হইতে উঠিয়া যাইয়া ক্রমশঃ রেল ষ্টেশন ও সহরের দিকে চলিয়াছে। বাংলার ১৬৭০২২টা গ্রামে প্রায় ৮,২০,০০০০০ লোকের বাস। এতগুলি লোকের গ্রামে থাকিতে হইলে পল্লীর শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বাঁচাইয়া রাখা দরকার। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

জাহাজ কোম্পানী

বাংলার অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অপর স্থানে মাল চালান হয় গরুর গাড়ীতে, মোটর লরীতে, রেলে, নৌকায় ও জাহাজে। ইহার মধ্যে গরুর গাড়ী ও নৌকা দ্রুতগামী নহে বলিয়া ব্যবসায়ীদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। গরুর গাড়ীর পরিবর্তে হাল্কা লরী এবং নৌকার এঞ্জিন লাগাইয়া কাজ চালান যায় কিনা তাহা ভাবা দরকার। দেশের ভিতরে চালানি কারবারে প্রধান বাহক রেল ও ষ্টীমার। বহু দেশের নদীমুখে প্রতিদ্বন্দ্বী বেশী ষ্টীমার কোম্পানী না থাকায় এবং গভর্ণমেণ্টও আইনের কড়াকড়ি না করায় বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীগুলি বেপরোয়াভাবে মালের ভাড়া বাড়াইয়া আপন আপন ব্যবসা চালাইতেছে। কলিকাতার জগন্নাথ ঘাট হইতে পোড়াবাড়ী পর্য্যন্ত মালের ভাড়া প্রতি মণ ৷৶৫। কিন্তু তাহা হইতে আরও ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী নিতাইগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া চারি আনা। মাল বহনের দর কমান উচিত। এই সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়িগণ যথেষ্ট আন্দোলন করেন নাই।

বাংলার স্বাস্থ্য

১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে শিশু জন্মিয়াছিল ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৮০টী। ১৯২৫ সালে বঙ্গদেশে শিশু জন্মিয়াছিল ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯১টী। ১৯২৬ সালে প্রাদেশিক জন্মের হার প্রতি মাইলে ২৯·৬। প্রতি মাইলে উহার পঞ্চবার্ষিক গড় ২৮·৯। বাংলাদেশের নগরসমূহে ১৯২৬ সালে উহার সংখ্যা ছিল প্রতি মাইলে ১৮·৪। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ছিল প্রতি মাইলে ১৯·৮। ইহা হইতে জানা যাইতেছে বাংলাদেশে ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালের জন্মসংখ্যা শতকরা ৬·৬ পরিমাণে কমিয়াছে।

শিশু মৃত্যু

১৯২৫ সালে বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩ শত ৮২। ১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে শিশু মৃত্যুর

সংখ্যা ২ লক্ষ ৪১ হাজার ১ শত ৮৪। এক বৎসরেই শিশুর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৮·৬ বাড়িয়াছে।

কলেরা

১৯২৬ সনে বঙ্গদেশে যত লোক মরিয়াছে তাহার শতকরা ৭ অংশ এক কলেরা রোগেই মারা গিয়াছে।

বসন্ত

বসন্তরোগে ১৯২৬ সালে মৃত্যুসংখ্যা দশবার্ষিক গড় মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা শতকরা ৬৬ পরিমাণে বাড়িয়াছে।

জ্বর

১৯২৬ সালে জ্বর রোগে মৃত্যুসংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৬৪৪ জন। ১৯২৫ সালে ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ২২৮ জন।

কালাজ্বর

১৯২৬ সালে কালাজ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ১৪ হাজার ২৭৫ জন। ১৯২৫ সালে ১৬ হাজার ৭৬৬ জন।

ধনুষ্টঙ্কার

ধনুষ্টঙ্কারে বৎসরে ৫৫ হাজার লোক মারা যায়।

যক্ষ্মা

যক্ষ্মায় বৎসরে ১৫ লক্ষ লোক ভোগে।

উপরের হিসাব হইতেই বাংলার স্বাস্থ্যের আভাষ পাওয়া যাইবে। ডাঃ বেন্টলী বলেন "প্রতি বৎসর বাংলায় ১৫ লক্ষ মারা যায়। ইহার ½ চেষ্টা করিলে বাঁচান যাইতে পারে।"

কলিকাতা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ী, মেদিনীপুর, পাবনা, নদীয়া, যশোহর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে উত্তরোত্তর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুহার বাড়িতেছে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

ব্যাঙ্কের মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস। কাজেই ব্যাঙ্কের অবস্থা দেখিয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের দৌড় বুঝিতে পারা যায়। বাংলা দেশে অ-বাঙ্গালীই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মোড়ল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী মাথা খেলাইতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কনামধারী লোন্ অফিসেই বাংলার শক্তি ও টাকা খাটিতেছে বেশী। এইগুলিকে একত্রবদ্ধ করিয়া উন্নত ব্যাঙ্কের কাজ চালানো যায় কিনা তাহা লইয়া বাঙ্গালীর মাথায় চিন্তা আসিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি বসিবে। এই অনুসন্ধান কার্য্যের উপর বাঙ্গালীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়া দরকার।

শ্রমিক জীবনের গতি ও ধর্ম্মঘট

যুদ্ধের পর হইতেই বাংলার শ্রমিক ও চাকুরেগণ নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য জোট বাঁধিয়া আন্দোলন করিতে সুরু করিয়াছে। পাটকলে মজুর লড়াই কলিকাতা ও হাওড়ায় মেথর ধর্ম্মঘট, জাহাজীদের কথা, লিলুয়ার ধর্ম্মঘট, মজুরবৃন্দের দাবী, মেথর ও ডোমসমিতি প্রভৃতি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, পশ্চিমের হাওয়া বাংলার সমাজকে নাড়া দিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে ৫৮টী ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর হইয়াছিল ৪০টী। মোটমাট ১৩৩৯৫০ জন লোক কাজ বন্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর করিয়াছিল ৬১২৭১ জন। এই কাজ বন্ধ করার ফলে ১২৮৩১৫৩ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। শতকরা ৪৩টী কলহ হইয়াছে পাটকলে, ৪৭টী হইয়াছে অন্যান্য কারখানায়। বেতন-বৃদ্ধির জন্য ৩২টী, বোনাস্ সম্পর্কে ২টী, কর্ম্মচ্যুত করায় ৪টী, ছুটিছাটা সম্পর্কে ১টী এবং অন্যান্য কারণে অবশিষ্ট ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পাটকলে কাজের সময় সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শতকরা ৩৩টী ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ৮টী ধর্ম্মঘট শ্রমিকদিগের স্বপক্ষে মিটিয়াছে, ৪১টী তাহাদের বিপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছে এবং ৯টী মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

আর্থিক বাংলার সমাজকথা

বিগত সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার। ইহার মধ্যে মাত্র ২৭ লক্ষ ১১ হাজার লোকে প্রায় দুই কোটি হিন্দুকে

অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। কি প্রকারে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভবপর হইল তাহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষতঃ শেষোক্ত বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা কম। উত্তর বঙ্গের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রাজবংশী ও কোচ। ওয়ার্ড ও সাঁওতালদের আগমনও হইয়াছে। এতকাল ইহারা নির্ব্বিবাদে মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছিল, কিন্তু এই বৎসরে দেখিতে পাই ইহাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকিয়াই বর্ত্তমান যুগের সুখ সুবিধা ভোগ করিবার জন্য। হিন্দুমিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ১৩৩৫ সনে বহু অহিন্দু হিন্দু হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের উপর এ পরিবর্ত্তনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

বাংলার শিক্ষা

১৯২১-২২ হইতে ১৯২৬-২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের বাংলা দেশের শিক্ষাবিবরণী হইতে দেখা যায়, এই পাঁচ বৎসরে বঙ্গদেশ শিক্ষায় তেমন অগ্রসর হয় নাই। এই পাঁচ বৎসরে হাইস্কুলের সংখ্যা ৮৭৮টার স্থলে বাড়িয়া ১৮৫টা হইয়াছে। ছাত্র-সংখ্যা ১ লক্ষ ৯০ হাজারের স্থলে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়স-বিশিষ্ট ছাত্রদিগের প্রতি ৫ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন লেখাপড়া শিখে।

প্রত্যেক ইয়োরোপীয় ছাত্রের জন্য মোট ব্যয় হয় বছরে প্রায় ৩৮০৲ টাকা, আর ভারতীয় ছাত্রের জন্য হয় ৩৫৯ টাকা। ৩৮০৲ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১০০৲ টাকা দেন, আর ৩৫৯ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৬৲ টাকা প্রদান করেন।

দুর্ভিক্ষ

১৩৩৫ সনে বাংলা দেশের নিম্নলিখিত স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল :—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বালুরঘাট, মালদহ, নদীয়া, বাঁকুড়া, রাজসাহী ও বর্দ্ধমান। দুর্ভিক্ষের কারণ অনাবৃষ্টি। দুর্ভিক্ষের কষ্ট লাঘবের জন্য জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে কোনরূপ দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে তজ্জন্য কোনও-চেষ্টা হয় নাই।

এই এক বৎসরের "আর্থিক উন্নতি"তে বাংলার হাট-বাজার, মেলা প্রদর্শনী, ইউনিয়ানবোর্ড, জিলাবোর্ড, মিউনি-সিপালিটি, বাংলা সরকারের আয়ব্যয়, বনবিভাগ, পুলিশ, বাংলার ডাকঘর, ডাক কর্ম্মচারীদিগের আর্থিক অবস্থা, বাংলার পল্লীর জল সরবরাহ, তেজাল পাওয়া ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সততা প্রভৃতি বহু বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমান বাংলার আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দুনিয়ার সঙ্গে তুলনায় বাংলাকে বুঝিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। মোট কথা এই এক বৎসরের 'আর্থিক উন্নতি' তুলনামূলক তথ্য ও আলোচনা দ্বারা বস্তুনিষ্ঠ-ধনবিজ্ঞানের যথেষ্ট মালমসলা জোগাইয়াছে।

চীনে সামাজিক আইন প্রণয়ন

"প্রত্যেক মজুরের নিজস্ব জমিজমা থাকিবে" ইহাই ছিল চীনের মুক্তিদাতা সুন-ইয়াৎ-সেনের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতির মূল মন্ত্র। চীনের শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী এবং এইজন্যই ইহাদের কল্যাণের কামনায় চীন রাষ্ট্রনীতির প্রধানতঃ ব্যস্ত-ছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের একটা বড় কাজ। কিন্তু তিনি দেখিয়াছিলেন যে চীন খুব দরিদ্র; একমাত্র ব্যক্তিগত বিত্তসম্পত্তির সাম্য স্থাপনদ্বারা গোটা জাতির উন্নতি সম্ভবপর নয়। জাতীয় ধনদৌলত বৃদ্ধির একমাত্র উপায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা।

সুন-ইয়াৎ-সেনের আদর্শ ছিল সংস্কারমূলক রাষ্ট্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা। তিনি সোস্যালিজ্‌ম কথাটার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সোস্যালিজ্‌ম কথাটা খুব ব্যাপক, এক এক দেশে ইহার এক এক রূপ প্রয়োগ।

১৯২৩ সনে চীনের জাতীয় দল কুমিংটাংএর উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম ক্যান্টন সহরে এক জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ও ইহাতে ঐ দলের সামাজিক নীতি বিঘোষিত হয়। কুমিংটাংএর এই প্রথম অধিবেশনে ধার্য্য হয় যে, মজুর ও কিষাণের অবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং বার্দ্ধক্য ব্যাধি অক্ষমতার সময় তাহাদের সাহায্য করা এবং ইহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য। মজুরগণ যে নানাবিধ অত্যাচার ও অবিচার হইতে মুক্তিলাভের সংগ্রাম করিতেছে এই জাতীয় দল তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্যও ঐ সভায় প্রতিশ্রুত হন। এবং নিম্নোক্ত মর্ম্মে ঐ সভায় কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়:— জাতীয়তাবাদী গভর্মেণ্ট (১) মজুর আইন প্রবর্ত্তন করিবেন (২) মজুরদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবেন (৩) সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহাদের দিবেন।

জাতীয় দল পেষোক্ত প্রতিজ্ঞানুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তখন ক্যান্টনে৩০০ ও হংকংএ ২০০ ট্রেড ইউনিয়ান দল ছিল। ১৯১৯ সনে চীনে সর্ব্ব প্রথম ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯২০-২১ সনে হংকং সহরে জাহাজী লোকদের ধর্ম্মঘট ও ১৯২৩ সনে পিকিং—হংকং রেল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সাফল্যে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন চীনে খুব জমিয়া যায়।

১৯২৩ সনের নভেম্বর মাসে সুন-ইয়াৎ-সেন ট্রেড ইউনিয়ান দল গড়িবার জন্য এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। ১৯১২ সনের চীনা পেনাল কোড ও ১৯১৪ সনের লেবর রেগুলেশনের বিধিতে চীনে দল গড়িবার স্বাধীনতা ছিল না। পিকিং সরকার একটি ট্রেড ইউনিয়ান বিল প্রণয়ন করিলেও তাহা কার্য্যতঃ বলবৎ হইত না। ১৯১২ সনের পেনাল কোডের ধারায় ধর্ম্মঘটকারীদের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাস দিবার ব্যবস্থা ছিল। ১৯১৪ সনের আইন দ্বারা ধর্ম্মঘট, বেতন বাড়ী বা অন্যান্য অভিযোগ জ্ঞাপনার্থ শ্রমিক দল কর্ত্তৃক আহূত সভাসমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই আইন লঙ্ঘনকারীদের ৩ মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। সুন-ইয়াৎ-সেন তাঁহার ইস্তাহারে এই আইনগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক ক্যান্টনের ট্রেড ইউনিয়ান আইন দ্বারা এগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কাজে সহায়তা করিবার জন্য জিলায় জিলায় ট্রেড ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয় ও এগুলি সরকার কর্ত্তৃক রেজিষ্ট্রীভুক্ত করা হয়। কুমিংটাং তাহাদের এই সকল শ্রমিকরক্ষার আইনকানুন দ্বারা সমগ্র চীনের শ্রমিক ও কৃষাণদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়।

ডাক্তার সুন-ইয়াৎ-সেন ১৯২৫ সনে পরলোকগমন করেন; কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি আজিও চীনে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ১৯২৫ সনে এক কোয়াংটাং প্রদেশে দুই লক্ষ শিল্প কারখানার মজুর ও ৫ লক্ষ কৃষাণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

এই সময়ে সাংহাইতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। জানিকিয়ু রাজপথে বিদেশী পুলিশ কতকগুলি চীনা ছাত্রের শোভাযাত্রার উপর গুলি ছোড়ে এবং ইহাতে কতকগুলি চীনা যুবক প্রাণত্যাগ করে। এই ব্যাপারে চীনা জনসাধারণ খুব উত্তেজিত হয় ও তাহারা বিদেশী বয়কটের আন্দোলন তীব্রভাবে চালাইতে থাকে। এক মাস পরে ক্যান্টন সহরেও ঐরূপ এক চীনা জনতার উপর গুলি করা হয় ও কতকগুলি চীনা যুবককে খুন জখম করা হয়। এইসকল ঘটনার ফলে চীনে বিদেশী বিদ্বেষ প্রবলভাবে দেখা দেয় ও চীনা জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বয়কট সংগ্রাম চালাইবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে। কাজে কাজেই ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন অল্পদিনেই জমিয়া যায়। উপর্য্যুপরি দুইটী দুর্ঘটনার পর বিদেশী পরিচালিত শিল্প কারখানার শ্রমিকগণ দলে দলে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করে। ক্যান্টনের জাতীয় নেতাগণের আহ্বানে হংকংএর লক্ষাধিক শ্রমিক কারখানা ত্যাগ করিয়া ক্যান্টনে গমন করে। ক্যান্টনে এই লক্ষাধিক শ্রমিকের আগমনে সাম্রাজ্য-

বাদ বিরোধী ক্যান্টনবাসীদের উত্তেজনা খুব প্রবল হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সভ্য-সংখ্যা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পায়। ১৩৯টী ট্রেড্ ইউনিয়ন দল লইয়া ক্যান্টন সহরে এক ওয়ার্কার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ কনফারেন্স আহূত হয়। ১৩৯টী ট্রেড ইউনিয়ন দলের সম্মিলিত এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত দাবীগুলির এক প্রোগ্রাম যোয়ালভাবে নির্দ্ধারিত হয়। আতীয় দল কুমিং টাং কর্তৃক শ্রমিকদের এই প্রোগ্রাম বিবেচিত হয়।

১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসে ক্যান্টন সহরে কুমিং টাং এর তৃতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে শ্রমিকদের জন্য এগারটি সামাজিক নীতি ধার্য্য হয় এবং এগুলি শ্রমিকদের সুতনতম দাবী বলিয়া গৃহীত হয়।

(১) সামাজিক আইনকানুন প্রবর্ত্তন।

(২) কারখানায় দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের নিয়ম বাঁধাবাঁধি করা এবং দশ ঘণ্টার উপরে লোক খাটান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

(৩) নিয়ন্ত্রিত মজুরী বা বেতন নির্দ্ধারণ।

(৪) স্ত্রীমজুর ও শিশুদের রক্ষা বিধান; ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকদের কারখানায় খাটান নিষেধ করা; ঔষধালীর সময় নির্দ্ধারণ; প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগকে ছুটীর সুযোগমিয়ানা দিবার ব্যবস্থা; এই ধরণের ছুটী পূরা দুই মাসের কম হইবে না।

(৫) ফ্যাক্টরীগুলি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যপ্রদ করা; সামাজিক বীমার প্রবর্ত্তন।

(৬) সভাসমিতি, বক্তৃতা ও প্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার।

(৭) ভোটাধিকার—শিক্ষিত হউক বা না হউক সম্পত্তি জমাজমি থাকুক বা থাকুক তাহাতে কোন বাধা হইবে না। সকলকেই সমান ভোটাধিকার দিতে হইবে।

(৮) শ্রমিকগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা।

(৯) শ্রমিকগণের মধ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

(১০) চুক্তিতে খাটান উঠাইয়া দেওয়া।

(১১) ছুটীর পুরা মাহিয়ানা।

ইহা ছাড়া কংগ্রেস এক তদন্ত সমিতি কায়েম করিবার প্রস্তাব করেন। স্থাপনাদিষ্ট গভর্ণমেণ্ট তাহাদের এলাকায় উল্লিখিত দাবী অনুসারে কাজ করিতেছেন কিনা ঐ সমিতি সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। স্থাপনাদিষ্ট গভর্ণমেণ্টের এলাকার বাহিরেও যাহাতে এই সকল প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধন হয় সেজন্যও কুমিংটাং আন্দোলন চালাইবেন।

১৯২৬ সনের প্রথম ভাগে ক্যান্টন সরকারের মতদ্বৈধতার জন্য এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ক্যান্টনে ইতিমধ্যে শ্রমিক আন্দোলন খুব প্রবলভাবে চলিতে থাকে এবং ঐ সনে ক্যান্টনে সমগ্র চীনের তৃতীয় শ্রমিক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। ইহার নাম সিং-কু-জি-পাও। মোটা চীনের ১২ লক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের ৪ লক্ষ প্রতিনিধি ঐ সভায় যোগদান করেন এবং এই সভায় সামাজিক আইনকানুন প্রণয়নের জন্য আরও কতকগুলি দাবী স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় কুমিংটাং কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় এগুলিও কতকটা সেই ধরণের। এই কনফারেন্সে নির্দ্ধারিত হয় যে,—

(১) রবিবার ও অন্যান্য ছুটীদিনে এবং বড় বড় পর্ব্বের দিনগুলিতে কারখানাগুলি অবশ্য বন্ধ রাখিতে হইবে ও ঐ সকল ছুটীর দিনে পুরা মাহিয়ানা শ্রমজীবিগণকে দিতে হইবে।

(২) স্ত্রী-মজুর ও বালিকাবালিকাকে রাত্রে কারখানায় খাটান বন্ধ করিতে হইবে।

(৩) শ্রমিকগণের সর্ব্বোপরিতায় শ্রম-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা লেবার আফিস খুলিতে হইবে।

(৪) গবর্ণমেণ্টকে অনতিবিলম্বে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐ বীমার অর্থ যোগাইবে সরকার ও কারখানাদার।

(৫) শ্রমিকদের জন্য আইন প্রণয়নের সময় সর্ব্বদা সিং-কু-জি-পাও বা চীনা ট্রেড ইউনিয়নকারিগণের জাতীয় ফেডারেশানের সম্মতি ও সাহচর্য্য লইতে হইবে।

এই সময় পিকিং সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এইজন্য জাতীয় কংগ্রেস ও লেবার কংগ্রেসের এই সকল দাবী কার্য্যে পরিণত করিবার পথে

কতকগুলি বাধার সৃষ্টি হয়। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে পিকিং ও ক্যাণ্টন দুই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ক্যাণ্টনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পিকিংএর বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রথম অভিযানে অগ্রসর হয় ও সমগ্র শ্রমিকগণের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। ক্রমেই ক্যাণ্টনের বল ভারি হইতে থাকে। শ্রমিকগণই জাতীয়তাবিহীন গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-জয়ের প্রধান কারণ। এই যুদ্ধে ইহারা ইহাদের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ইহাদের দাবী আরও বেশী করিতে থাকে। দেশের মধ্যে মজুর অসন্তোষ খুব বাড়িয়া যায়। যুদ্ধে বিরত জাতীয়তাবিহীন গভর্ণমেণ্ট ইহাদের এই অসন্তোষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইহাদের দাবীমত কতকগুলি সাধারণ আইন প্রণয়ন করেন। ১৯২৬ সনের হেমন্তকালে কতক-গুলি লেবার আইন পাশ করা হয়। ইহাতে শ্রমবিরোধ মিটমাট করিবার জন্য এক বাধ্যতামূলক পঞ্চায়েৎ কাজের কথা হয়। উভয় পক্ষ এই পঞ্চায়েতের নিকট তাহাদের অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করিবে এবং এই পঞ্চায়েৎ তাহার উপযুক্ত বিচার করিবে। ইহাতে সরকারের একজন প্রতিনিধি ও শ্রমিকদের দুইজন ও কারখানাদারদের দুইজন প্রতিনিধি থাকিবে। নিষ্পত্তির সময় সকল প্রকার ষ্ট্রাইক ও লক আউট বন্ধ রাখিতে হইবে। বলা নিষ্পত্তির আবেদনের পূর্ব্বে যদি এগুলি সুরু হয় তবে এগুলি চলিতে পারিবে।

১৯২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ক্যাণ্টনের জাতীয়তাবিহীন গভর্ণমেণ্ট, শ্রমসংক্রান্ত নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করেন।

ধর্ম্মঘটের সময় কাজ চালাইবার জন্য মনিবগণ নূতন লোক নিয়োগ করিতে পারিবে না। তাঁহারা অবশ্য নিজেরা কাজ করিতে অধিকারী থাকিবে।

মাহিয়ানা বৃদ্ধির জন্য যদি ধর্ম্মঘট করা হয় তাহা হইলে মনিবদিগকে ধর্ম্মঘটের দিনগুলির জন্য ধর্ম্মঘটের পরে ধার্য্য নূতন বেতনের তালিকানুযায়ী মাহিয়ানা দিতে হইবে।

যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ান বা শ্রমিক সঙ্ঘ বর্ত্তমান আছে সেগুলির বিরোধিতা করিবার জন্য মনিবগণ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান খাড়া করিতে পারিবে না বা ঐগুলিকে সাহায্য করিবে না।

শ্রমিকগণ অন্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেনা বা কারখানা দোকানপাট প্রভৃতি দখল করিয়া তাহার মালপত্র স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। মনিবদের নিজের কাজেও ইহারা হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নয়।

ক্যাণ্টনের কলকারখানার মালিকরা চুক্তি হিসাবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য লোক খাটাইত ও যখন ইচ্ছা তাহা-দিগকে বিদায় দিত, এইরূপ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ক্যাণ্টনের জাতীয় সরকার ১৯২৭ সনে এই সম্পর্কে আরও কতগুলি আইন প্রণয়ন করেন। ঐ আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যে, মনিবগণ যখন ইচ্ছা তাহাদের অধীন কর্ম্মচারী বা কারিগরদিগকে কাজে বরখাস্ত করিতে অধিকারী থাকিবেন, কিন্তু কাহাকেও বরখাস্ত করিবার সময় তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বরখাস্ত-কারীকে কমপক্ষে দুই মাসের পুরা বেতন দিতে হইবে।

চীনে এই সকল আইনগুলি বিশেষ বিশেষ অসুবিধা-জনক অবস্থার প্রতিকারকল্পে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এই-গুলিই বর্ত্তমানে সমগ্র চীনের শ্রমসংক্রান্ত নীতি পরিচালিত করিতেছে।

১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাণ্টনের জাতীয় সরকার হাসপাতালের কর্ম্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত এক আইন করেন। ইহা দ্বারাই চীনে সর্ব্বপ্রথম কাজের ঘণ্টা, ন্যূনতম বেতন ও শ্রম দুর্ঘটনা প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ হয়।

জাতীয় দলের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমিংটাংএর প্রবর্ত্তিত এই সকল সামাজিক আইনকানুন গোটা চীনে পরিব্যাপ্ত হয়। হুপে প্রদেশ দখলের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাক্টরী সংক্রান্ত এক আইনের খসড়া তৈয়ারী করা হয়। এ পর্য্যন্ত এই আইন কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

বর্ত্তমানে আরও অনেকগুলি প্রয়োজনীয় শ্রমিক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

কৃষির উন্নতিকল্পেও বর্ত্তমান জাতীয় চীন সরকার জমির সিকি কর রহিত করিয়া দিয়াছেন। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনকানুন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

১৯২৭ সনের আগষ্ট মাসে জাতীয় দলের রাজধানী উহান

হইতে ন্যানকিংএ স্থানান্তরিত হয়। নূতন রাজধানীতে একটি লেবার আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ঐ আফিস উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং বর্ত্তমানে শ্রমসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রীর লেবার দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়।

চীনের লেবার দপ্তরকে (১) শ্রমিক সঙ্ঘগুলির তত্ত্বাবধান করিতে হয়; (২) চীনের ফ্যাক্টরী ও খনিগুলি দেখাশুনা করিতে হয়; (৩) শ্রমিক সন্তানদের লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়; (৪) বেকার শ্রমিকদের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য সাহায্য দিতে হয়; (৫) সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রচলন করিতে হয় এবং ব্যাঙ্ক ও লেবার কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করিতে হয়; (৬) মালিক ও মজুরের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং (৭) আন্তর্জ্জাতিক সকল প্রকার লেনদেন কার্য্য পরিচালনা করিতে হয়।

সেদিন চীনের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী এইচ এইচ কুং মহোদয় বর্ত্তমান ন্যানকিং সরকারের সামাজিক নীতি সম্বন্ধে এক বক্তব্য করিয়াছেন।

ইনি বলেন, দেশকে আর্থিক আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান চীন সরকার সর্ব্বপ্রথমে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

গত ১৯২৮ সনে লেবার লেজিস্‌লেশান কমিশনের বিস্তৃত রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া ন্যানকিংএর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক বিস্তৃত লেবার আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

মোটের উপর কুমিংতাংএর বা বর্ত্তমান জাতীয় সরকারের সামাজিক নীতি হইতেছে প্রত্যেক শ্রমিকের নিজের জমি থাকিবে। (মিং সেন চু আই)। ইহাই ডাক্তার সুন-ইয়াৎ-সেনের মন্ত্র। এবং ইহাই বর্ত্তমান জগতে রিফর্ম্মিষ্ট ষ্টেটসোশ্যালিজম নামে অভিহিত।

চীনের জাতীয় দল, কুমিংতাং সর্ব্বাগ্রে চীনা কিষাণ ও চীনা মজুরের অবস্থার উন্নতির জন্য লড়িয়াছিল। সেইজন্যই এত অল্প সময়ে তাহারা সমগ্র জাতির মুক্তি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। চীনের জাতীয় দল গোড়া হইতেই চীনের কুলি, কিষাণ, মজুরের প্রতি দরদ দেখাইয়াছিল। সেইজন্য তাহাদের সমবেত শক্তির সাহায্য ইহারা জাতীয় বিপ্লব আনয়নের কার্য্যে পাইয়াছিল।

বর্ত্তমান চীনে শ্রমিকের ইজ্জৎ অনেকখানিবৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিক আজ ধনিক, ও শিক্ষিতের সমান সুবিধা ভোগ করে। জাতীয় দলের সামাজিক নীতির কল্যাণে আজ চীনের ৩০ কোটি শ্রমিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এরূপ আশা করা যায় যে, ডাক্তার সুন-ইয়াৎ-সেনের কর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হইলে চীনে আর্থিক গণতন্ত্র স্থাপিত হইবে।

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক বিবরণ

লণ্ডনে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার একটী সাধারণ সভায় স্যর চার্লস্ ম্যাক্লিয়ড সভাপতির আসনে বসিয়া ১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব সহ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সমৎসরের কাজে ব্যাঙ্কের মোট ৫৩০,৮৯৯ পাউণ্ড লাভ হইয়াছে তবে গত বৎসরে লাভ আর একটু বেশী হইয়া ৫৪১,০২৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এবং গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর ৭১৬,৪৯৯ পাউণ্ড হইতে ৮০৭,০২৮ পাউণ্ড বেশী টাকা জমার ঘরে উঠে। তবে আলোচ্য বৎসরে জমার ঘরে এত বেশী টাকা উঠিবার কারণ, গত বৎসর হইতে অনেক টাকার জের এই ঘরে টানিয়া আনা হইয়াছিল। এই জমা টাকার মধ্যে ৫০,০০০ পাউণ্ড রিজার্ভ ফণ্ডে জমা দিয়া মোট রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ ৩,০০০,০০০ পাউণ্ডে তোলা হইবে। গৃহসংক্রান্ত তহবিলে ৩০,০০০ পাউণ্ড জমা পড়িবে, কর্ম্মচারীদের পেনশন তহবিলে ৫০,০০০ জমা দেওয়া

হইবে এবং পূর্ব্বের প্রকাশিত ডিভিডেণ্ডের উপর শতকরা ২০ পাউণ্ড হিসাবে আবার একটা আধকর শুল্ক ডিভিডেণ্ড দেওয়াতে ৪০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে, এবং বাকী ২৭৭,৩২৮ পাউণ্ড আগামী বৎসরের জমার ঘরে জের টানা হইবে। এই জমার টাকা সমস্ত যে খারাপ এবং পচা ঋণের টাকা বাদ দিয়া ধরা হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের কার্য্যকর্ম্ম বেশ সন্তোষজনকই হইয়াছে।

আয়ব্যয়ের হিসাব

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবারকার আয়ব্যয়ের হিসাবের অঙ্কে বিশেষ কোন তফাৎ দেখা যায় না। যে একটু আধটু তফাৎ লক্ষ্য হয় এটুকু সাধারণ জোয়ার ভাঁটার মতন ব্যাঙ্কের ব্যবসা মাত্রেই হইয়া থাকে। গত বৎসরের মত এবারেও টাকার মূলে যে সমস্ত দেনা পাওনা ছিল, সেসমস্ত টাকা প্রতি ১ শিঃ ৬ পেঃ হিসাবে পাউণ্ডে পরিণত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এবং এই হিসাবের অঙ্ক দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের কাজ মন্দ চলে নাই। কারেণ্ট (চল্‌তি) হিসাবে, ফিক্সড্ ডিপোজিট্ (কায়েমী জমা) এবং অন্যান্য হিসাবে সময় সময় জমার অংশ কমিয়া যাইবে একথা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল। তবু এবৎসর মোট জমার খাতে ৩৪,০৮৮,২২৯ পাউণ্ড এবং পূর্ব্ব বৎসরে ৩৩,৬৫৫,১২০ পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছে। দেয় বিলের টাকা এবং অ্যাক্সেপ্টেন্স এর পরিমাণ এবৎসর কিছু কম ছিল।

জমার বিভিন্ন রূপ

জমার ঘরে টাকা ও বিলিয়নের পরিমাণ ৫,৩৩৩,৮২৭ পাউণ্ড এবং গত বৎসর ছিল ৪,৫৩০,৭০৭ পাউণ্ড। ভারত সরকারের টাকার সিকিউরিটির পরিমাণ ৬,৫৮৯,৮০৭ পাউণ্ড এবং গত বৎসর ছিল ৬,৮৬১,৯৮৮ পাউণ্ড। ভারত সরকারের ডিবেঞ্চার এবং অন্যান্য প্রকারের সিকিউরিটির পরিমাণ ৬,২৬১,৪৮৪ পাউণ্ড। গত বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ৬,৩১৬,১২২ পাউণ্ড। জমার খাতে টাকা, ভারতীয় সিকিউরিটি এবং ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সর্ব্বসমেত ১৮,১৮৫,১১৯ পাউণ্ড। এই সংখ্যার সহিত যদি বিল অব্ এক্সচেঞ্জের জমার ৭,১৬৮,৫২৭ পাউণ্ড জোড়া যায় তবে মোট জমার পরিমাণ ২৫,৯৫৩,৬৪৬ পাউণ্ড দাঁড়ায় এবং দেনার খাতে কারেণ্ট, ফিক্সড্ ডিপোজিট্ ও অন্যান্য হিসাবে মোট ৩৪,০৮৮,২২৯ পাউণ্ড দেখা যায়। ডিস্কাউণ্ট এবং ধারের খাতে মোট ১৪,২২৪,৫৬২ পাউণ্ড জমা ছিল। পূর্ব্ব বৎসর হইতে এবার এ সংখ্যাটা একটু বেশীই দেখা যায়।

ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র

গত বৎসর হইতে এবারকার সংখ্যা এ খাতে আরও কম দেখা যায়। অনেকদিন হইতেই এ খাতে খরচ কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। তবে এবারও যে এ ঘরে ৩০,০০০ পাউণ্ড রাখা হইয়াছে তাহার কারণ মাঝে ব্যাঙ্কের ব্যবসা চালাইবার জন্য দরকারমত বড় বাড়ী ও আসবাব পত্র সময় সময় ঐ টাকা হইতেই যাহাতে কুলাইয়া লওয়া যায় সে ব্যবস্থা রাখা।

পেনসান তহবিল

অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত এ ব্যাঙ্কেরও কর্ম্মচারীদের পেন্‌সান তহবিল খুব বাড়ান দরকার। ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার সংখ্যা দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রায় ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ডের পাকা ধারের সিকিউরিটি আছে এবং ইহা ব্যাঙ্কের লাভ-লোক্‌সানের হিসাবে (ব্যালান্স সিট্) অন্তর্ভুক্ত বাজার দরেই দেখান হইয়াছে। ব্যালান্স সিটের মোট ৪১,৬৩৯,৩১৮ পাউণ্ড। গত বৎসরের সংখ্যা ৪১,৪৮৯,৭৮১ পাউণ্ড। কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতিযোগিতার দরুণ লাভ অনেক কমিয়া গেলেও এবারকার লাভ মোটের উপর মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা অরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রমানাথ পাল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৬ ৪র্থ বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—শুধু আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

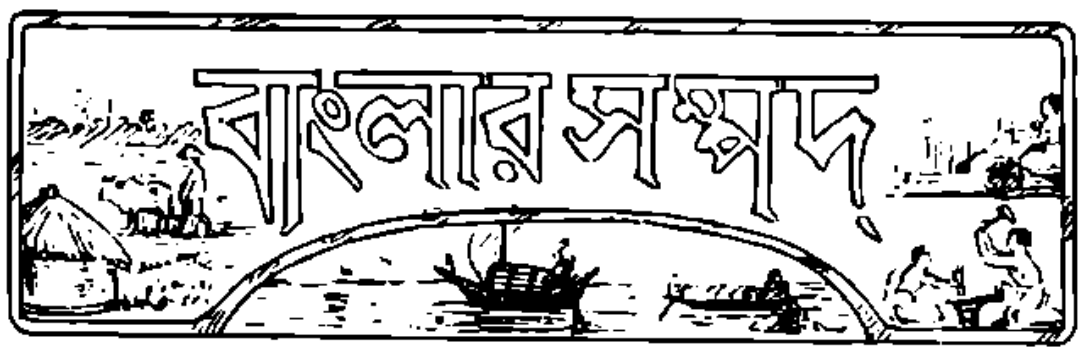

কলিকাতার অন্যতম অভাব একটী সুচিন্তিত রাস্তা-নীতি

বিলাতে রাস্তার অভাব নাই। রাস্তার দিক্ দিয়া বিচার করিলে জগতের সকল দেশ অপেক্ষা বিলাত অগ্রসর। তবুও সম্প্রতি লর্ড বিলাতে আরও রাস্তা করিবার স্কীম তৈয়ার করিয়াছেন। ইহার কারণ, বিলাতে মোটরের সংখ্যা অগণিত। এখন বিলাতে যত মোটর আছে সবগুলা রাস্তায় লাগাইলে প্রতি ৩৪ গজ অন্তর একটী করিয়া মোটর বসাইতে হইবে। মোটরের সংখ্যা আরও বাড়িতেছে। মোটরের সংখ্যার তুলনায় রাস্তা শীঘ্রই অল্প অনুভূত হইবে। ইহা বুঝিয়াই লর্ড ওঁহার নূতন স্কীম তৈয়ার করিয়াছেন।

বিলাতের মত দেশে উন্নতশ্রেণীর অসংখ্য রাস্তা থাকা সত্ত্বেও যদি রাস্তা তৈয়ারের বিশেষ দরকার হয়, তাহা হইলে কলিকাতার মত সহরে (সমগ্রভারত বা বাংলার কথা উল্লেখ না করাই ভাল) রাস্তার সংখ্যা বাড়ানো ও বর্ত্তমান রাস্তাগুলা উন্নত ও প্রশস্ত করা যে বিশেষ আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতার লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, সহরের চারিদিকে খোলা জমি আছে, অথচ লোকগুলা কলিকাতার মধ্যেই গাদাগাদি করিতেছে। নূতন নূতন সহরতলী মোটেই গড়িয়া উঠিতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ—রাস্তার অভাব। কলিকাতার মধ্যস্থল হইতে নূতন নূতন রাস্তা চারিদিকে বাহির হইয়া যদি সহরের বাহিরের খোলা জমিগুলাকে সহরের সহিত যুক্ত করে, কলিকাতার সহিত হাওড়া যদি অনেকগুলা সেতুর সাহায্যে নানাস্থানে যুক্ত হয়, তাহা হইলে অনেক লোক সহরতলী হইতে সহরে আসিয়া দিনের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আবার সহরতলীতে ফিরিয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে সহরে বাসিন্দার ভিড় কমিয়া যাইবেই। সহরের চতুর্দ্দিকের স্থানগুলাকে সহরের সহিত-যুক্ত করিলেই চলিবে না। সহরের ভিতর না ঢুকিয়া এক সহরতলী হইতে অন্য

সহরতলীতে যাইতে যাওয়া যায় তাহার জন্য চক্রাকারে রাস্তা থাকাও দরকার। বলা যাইতে পারে যে, মাটীর উপর নূতন নূতন রাস্তা না করিয়া, ভূগর্ভ রেল বা মাথার উপর দিয়া যাইবার রেল তৈয়ারের বন্দোবস্ত করিলেই ত হয়। কিন্তু কলিকাতার পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে না, কারণ কলিকাতার মাটী নরম।

নূতন নূতন রাস্তা করিবার কথা তুলিলেই নানা আপত্তি উঠিয়া থাকে, যেমন, কলিকাতার বাহিরে ম্যালেরিয়ার ভয় আছে, সেখানে বড় জল জমে, তা ছাড়া কলিকাতার বাহিরে ভাল পানীয় জল ও বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব। ঐ সকল অসুবিধার কোনটীই বিদূরিত করা অসম্ভব নয়। এঞ্জিনিয়াররা মাথা খাটাইয়া প্রথম দুইটী অসুবিধা দূর করিতে পারিবে। কলিকাতার বাহিরে লোক বাস করিতে আরম্ভ করিলেই শেষোক্ত অসুবিধা দুইটা দূর করিবার বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব। তার পর একটা বিশেষ আপত্তির কথা উঠিয়া থাকে—খরচটা জুটিবে কোথা হইতে? এ বাধাটাও সরানো বিশেষ শক্ত নয়। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যে ভাবে রাস্তা তৈয়ারের খরচ যোগাড় করিতেছে সেরূপভাবেই খরচের টাকা জোটানো সম্ভব।

কলিকাতার রাস্তা তৈয়ারী বিষয়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যথেষ্ট কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা তত ফলদায়ক হয় নাই। এ বিষয়ে যতটা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কাজ করা উচিত ছিল, ট্রাষ্ট তাহা করিতে পারে নাই।

শ্রীরামপুরে বৈদ্যুতিক শক্তি যোগানের বন্দোবস্ত

শ্রীরামপুরে এ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের বন্দোবস্ত ছিল না। পাটকলগুলাতে ও স্থানীয় কারখানা-ওয়ালাদের ঘাড়ীতে বৈদ্যুতিক শক্তি যোগানের বন্দোবস্ত আছে বটে, কিন্তু শ্রীরামপুরের জনসাধারণ এ পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। এ জন্য নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। গৃহস্থেরা কেরোসিনের দাহ্যকর আলো জ্বালাইতে বাধ্য হইত। গ্রীষ্মকালে টানাপাখা বা হাতপাখা ছাড়া ঘর ঠাণ্ডা করিবার কোন উপায় ছিল না। কলিকাতা হইতে লরি করিয়া বরফ না লইয়া গেলে বরফ খাওয়া বন্ধ থাকিত। স্থানীয় আদালত, কলেজ, হাসপাতাল, বয়ন-বিদ্যালয় প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠান-গুলিও নানা অসুবিধায় ভুগিত। এখন এই সব অসুবিধা দূর হইবার উপায় হইয়াছে। কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী শ্রীরামপুরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য তিন মাইল লম্বা মেন বসাইয়াছে। গত ২০শে এপ্রিল তারিখে রাধাবল্লভজীর মন্দিরে শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার হাওয়েলস কর্ত্তৃক প্রথম আলোর সুইচ টেপা হয়।

শ্রীরামপুরের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। ইহার দুইটী কারণ, প্রথম, পাটকলের মজুরদের অবস্থিতি, দ্বিতীয়, উত্তর কলিকাতার অনেক বাড়ী ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভাঙ্গাতে তাহাদের অনেকের শ্রীরামপুরে বসতিস্থাপন। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে দোকানের সংখ্যাও বাড়িতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে এখানে আরও কাপড়ের মিল ইত্যাদি খোলা হইবে বলিয়া মনে হয়। ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা আরও বাড়িবার খুবই সম্ভাবনা।

শ্রীরামপুরের রাস্তায় এখনও কেরোসিন আলোই জ্বলে। বাড়ীর বার্ষিক দামের শতকরা ৩ হারের বেশী খাজনা লইবার মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা নাই। এত অল্প আয়ে রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং আপাততঃ রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিবে না।

বরফের গাড়ীতে চন্দননগরের কলা পাঠানো

উত্তর পশ্চিমের ষ্টেশনগুলা ও বাংলা দেশের মধ্যে ফলের ব্যবসা বাড়াইবার জন্য চন্দননগরের কলা-উৎপাদকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছে।

বরফের গাড়ী করিয়া কোয়েটা হইতে কলিকাতায় আঙ্গুর আসিয়া থাকে। এই গাড়ীগুলা ফিরিয়া যাইবার সময় খালি হইয়া ফিরিয়া যায়। চন্দননগরের কলা-উৎ-পাদকরা এই খালি গাড়ীগুলা কলা দ্বারা পূর্ণ করিয়া উত্তর পশ্চিমে পাঠানো সুবিধাজনক বুঝিয়া রেলকোম্পানীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে আরম্ভ করে। কথাবার্ত্তা

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এখন কেবল ভাড়া ও কলা প্যাক করিবার প্রণালী লইয়া কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

বরফের গাড়ী করিয়া কলা পাঠানোর দু'টা অসুবিধা। প্রথমতঃ, আঙ্গুর যেমন সুন্দর করিয়া প্যাক করা যায়, কলা তেমন প্যাক করা সম্ভব হইবে না; দ্বিতীয়তঃ, মে হইতে আগষ্ট মাসে আঙ্গুর বেশী পরিমাণে কলিকাতায় আসিয়া থাকে। ঠিক ঐ কয় মাসে চালান দিবার জন্য বেশী পাকা কলা পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়।

ভারতীয় রেলপথগুলাতে বরফের গাড়ীর যোগান বড় কম (১৯২৮ সনের কৃষি কমিশন বলেন যে একথা সত্য নহে। তাঁহাদের মত এই যে ফল ও দুধের ব্যবসা বাড়াইবার জন্য বরফের গাড়ী যোগাইতে ভারতীয় রেলগুলা কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই)।

কোয়েটাতে যে সব বরফের গাড়ী খালি ফিরিয়া যায় সেগুলাতে দক্ষিণ আফ্রিকার আপেল পাঠাইবার কথা মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে। কিন্তু তিনটী কারণে তাহা সম্ভব নয় (১) উত্তর পশ্চিমে যে সব আপেল পাওয়া যায় তার তুলনায় বরফের গাড়ীতে পাঠানো আপেলের দর বেশী হইবেই, সুতরাং লোকে তাহা কিনিবে না; (২) দক্ষিণ আফ্রিকার আপেল সারা বৎসর নিয়মমত আসে না—কখনো বেশী ও কখনো কম আসিয়া থাকে; (৩) উত্তর পশ্চিমের ষ্টেশনগুলাতে বরফের ঘর নাই; বরফের গাড়ীতে পাঠানো আপেল বরফের ঘরে না রাখিলে তাহা সাধারণ আপেল অপেক্ষা শীঘ্র পচিয়া যাইবে।

খালি গাড়ীগুলাতে দক্ষিণ আফ্রিকার আপেল পাঠানো যেমন সোজা নয়, তেমনি বাংলার কলা পাঠানোও সোজা নয়। দু'টা অসুবিধার কথা আগেই বলা হইয়াছে। আর একটা অসুবিধা এই, অসংখ্য লোক প্রত্যেকে অল্প পরিমাণে কলা উৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নাই; রেল কোম্পানীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার সময় কলা উৎপাদকেরা এই কারণে অত্যন্ত অসুবিধা ভুগিয়া থাকে।

এই সম্পর্কে আর একটী কথা উল্লিখিত হইতেছে। কলিকাতায় অনেক পরিমাণে কল আসিয়া থাকে। আসেই আসিয়া থাকে লক্ষ লক্ষ কল। গত বৎসর জুন মাসে হাওড়া হইতে হাওড়ায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার কল আমদানি হইয়াছিল। আম ও অন্যান্য সব ফল সাধারণ মালগাড়ীতেই আসিয়া থাকে। আম কাঁচা অবস্থায় আগের দিন এক্সপ্রেসে চালানো হয়। তারপর দিন কলিকাতায় পৌঁছিয়া সেগুলা বিক্রয়ের যোগ্য হইয়া উঠে।

জগতের অন্যান্য দেশে বরফের গাড়ীর সুবন্দোবস্ত হওয়াতে ফলের ব্যবসায় খুবই সুবিধা হইয়াছে। দূরবর্ত্তী স্থানগুলাতে ফল পাঠানো সম্ভব হইয়াছে। ফলের ব্যবসায়ীদের লাভও বাড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ দেশ ঐ বিষয়ে এখনও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। রাজকীয় কৃষি কমিশন বলিয়াছেন যে, বরফের গাড়ীর চাহিদা দেখিলেই রেল কোম্পানী বরফের গাড়ী যোগাইয়া থাকে। কৃষিকমিশনের এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, এ দেশের ব্যবসায়ীরা বরফের গাড়ীর উপকারিতা ভাল করিয়া বুঝে না। কিন্তু তাহা কি সত্য?

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান আজ ম্যালেরিয়ার আবাস। বর্দ্ধমানে কৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৭৭০ সালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাবড়ার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাংলা সুবার মধ্যে এই জেলা সর্ব্বাপেক্ষা শস্যশালী—বর্দ্ধমান অরণ্যের মধ্যে কুসুমকানন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিল্টন বলিয়াছেন, বর্দ্ধমানের আটের সাত অংশ শস্যশালী। কোলব্রুক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে,—প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে—লিখিয়াছেন, তখনকার দিনে বর্দ্ধমানের প্রতি বর্গ মাইলের খাজনা পাওয়া যাইত ৮৪২৲ টাকার বেশী। সেই বর্দ্ধমানে ১৮৭২—১৮৮১ সালে ১২টী থানায় প্রায় দেড় লক্ষ লোক কমিয়াছে। এই জনসংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে কৃষির অবনতির—কি সম্বন্ধ তাহা জানা যায় ২০ বৎসরের মৃত্যুহার এবং শস্যের পরিমাণ পর্য্যালোচনা করিলে। যে বৎসরে কৃষির অবস্থা ভাল ছিল, মৃত্যুসংখ্যাও সে বৎসর আট লক্ষ হাজার কম ছিল।

বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার জনপদধ্বংসী সন্নিগ্রাম এবং অবিরাম জ্বর সম্বন্ধে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার ইলিয়ট বলিয়াছেন যে, মড়কের একটী প্রধান কারণ চাষের অভাব। যে সব জায়গায় চাষ উঠিয়া গিয়া জঙ্গল হইয়াছে সেই সমুদয় স্থানেই রোগের প্রকোপ এবং মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কৃষির সঙ্গে যে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং রোগ ও মৃত্যুর আধিপত্য খর্ব্ব করিতে হইলে, বাংলার শতকরা ৮০ জন অধিবাসীর (কৃষিজীবীদের) জীবিকা সম্বন্ধে উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উৎপন্ন শস্য ও জন্মমৃত্যুর সম্বন্ধ

উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের সহিত মানুষের জন্মমৃত্যু ও জীবনী শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

বৎসর	উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ	জন্ম	মৃত্যু
	কোটি টন	হাজারকরা	হাজারকরা
১৯১৪	৩·৭	৩৭·৪	২৯·৬
১৯১৮	৩	৩২·৫	৩৭·৮
১৯২২	৩·৪	৩৪·২	৩১·৫
১৯২৫	৩·১	৩৬·৫	২৫·৪

যে বৎসর ধান্য বেশী হইয়াছে, সেই বৎসর জন্ম বেশী হইয়াছে এবং মৃত্যু কম হইয়াছে, আবার যে বৎসর ধান্য কম হইয়াছে সেই বৎসর জন্ম কম হইয়াছে ও মৃত্যু বেশী হইয়াছে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ

পিট সাইলেজ প্রস্তুত করিবার উপায়

সাধারণতঃ সতর্কতা অবলম্বন করিলে বঙ্গদেশে অতি উত্তম পিট সাইলেজ (গোতা ঘাস বা গর্ত্তে সংরক্ষিত ঘাস ইত্যাদি পশুখাদ্য) তৈয়ার করা যায়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত পিট সাইলেজ তৈয়ার করার উপযুক্ত সময়। এই প্রকারে প্রস্তুত সাইলেজ সমস্ত বৎসর রসাল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। জোয়ার, ভুট্টা এবং চীনা জাতীয় ঘাস গর্ত্তে সংরক্ষণ করিতে হইলে এই সকল ফসল এরূপ সময়ে বপন করিতে হইবে যাহাতে ফসল মাটীর নীচের জল শুষে নীচে নামিতে থাকিবে তখন উহাদের কাটা যায়। স্থানীয় আবহাওয়া ও স্থানের তারতম্য অনুসারে ইহা ঠিক করিতে হইবে। মোটের উপর সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ হইতে অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়।

উঁচু জমিতে একটি গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে, উহা উর্দ্ধ সংখ্যায় ১০ ফুট গভীর করা যাইতে পারে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, গর্ত্তটী এরূপ গভীর হইবে যেন মাটীর নীচের জলের স্তরের উপর থাকে। ১২ ফুট দৈর্ঘ্য, ১০ ফুট প্রস্থ এবং ৬ ফুট গভীর একটী গর্ত্ত চা'র জোড়া বলদের জন্য যথেষ্ট সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। গর্ত্তের ধার ও তলদেশ হইতে কাটা আলগা মাটী গর্ত্তের বাহিরে ফেলিয়া দিবে। তলদেশে ৬ ইঞ্চি পরিমাণে পুরাণ খড়, আগাছা ইত্যাদি ফেলিবে। গর্ত্তের ভিতরের চারিপাশের ঢাল নীচের দিকে নামিবে। যাহা সাইলেজ করিতে হইবে তাহা কাটিবামাত্রই গর্ত্তের নিকটে আনিবে যাহাতে উহা শুকাইয়া না যায়। আটীগুলি খুলিয়া ২।৩ জন লোক উহা গর্ত্তে এরূপভাবে ছড়াইয়া দিবে যেন গোড়ার দিক্ যতদূর সম্ভব গর্ত্তের ধারে পড়ে। ইহার পর উহা উত্তমরূপে বিশেষতঃ ধারের দিকে পা দিয়া মাড়াইয়া দিবে, চাপে বসিয়া যাওয়ার জন্য এরূপভাবে মাড়ান বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ যদি গর্ত্তের মধ্যে ঘাস ইত্যাদি খাদ্য আলগা অবস্থায় থাকে তবে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহাতে সবগুলি ঘাস উত্তমরূপে সকলস্থানে চাপে বসিয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ঘাস ইত্যাদি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই কাটিতে হইবে। জোয়ার এবং চীনা জাতীয় ঘাস ফুল হইবার সঙ্গে সঙ্গে এবং ভুট্টা ছড়া বাহির হওয়ার সময় কাটিবে।

যদি ঘাস ইত্যাদি শুষ্ক হইয়া থাকে তবে উহা উত্তমরূপে জলে ভিজান দরকার। প্রত্যেক ৬ ইঞ্চি স্তরে করিয়া ঘাস দিলেও চলিতে পারে।

ঘাস ইত্যাদি এই ভাবে স্তরে স্তরে সাজাইয়া পা দিয়া মাড়াইয়া জমির উপর অন্ততঃ ৬ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া তুলিবে। প্রয়োজন হইলে জল দিবে। পরে একদিনের জন্য

কাজ বন্ধ রাখা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাতে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘাসগুলি উত্তমরূপে মাড়াইয়া দিবে। পরদিবস আরও ২ ফুট পর্য্যন্ত (অর্থাৎ জমির উপর ৮ ফুট) ঘাস ইত্যাদি দিয়া উপরিভাগ চালা ঘরের আকারে সাজাইয়া তুলিবে। ইহার পরদিবস ঘাস ইত্যাদি দ্বারা কতকটা চাপা দিবে, লক্ষ্য রাখিবে যেন ধারগুলি ঠিকমত থাকে। পুরাণ খড়, আগাছা ইত্যাদি দ্বারা উপরিভাগ ঢাকিয়া দিয়া উত্তমরূপে জল দিয়া ভিজাইয়া দিবে। পরে উপরে এক ফুট মাটী ভাল করিয়া পিটাইয়া দিবে। কিছুদিন পরে ঘাসগুলি চাপে বসিয়া গেলে উপরের মাটী ফাট ধরিবে। এই ফাটগুলি যেমন হইবে তখনই উহা বন্ধ করিয়া দিবে, নচেৎ ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিবে এবং ঘাসগুলি ছাতা ধরিয়া নষ্ট হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন :—সাইলেজ তৈয়ারের জন্য ফসলে উপযুক্তরূপ রস বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। ফসল এরূপ না থাকিলে জল দিয়া ভিজাইতে হইবে। ফসলগুলি গর্ত্তে ফেলিয়া উত্তমরূপে মাড়াইয়া দিবে। ফসল শুষ্ক থাকিলে ভাল সাইলেজ তৈয়ার করা যায় না। গর্ত্তগুলি এরূপভাবে বন্ধ করিতে হইবে যেন কোন প্রকারে বাতাস উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।

গর্ত্তে ফেলিবার প্রায় দুই মাস পরে সাইলেজ ব্যবহারের উপযোগী হয়। গর্ত্ত খুলিবার সময় অর্দ্ধেক আন্দাজ খুলিয়া উহা হইতে সাইলেজ খড় কাটা চাকু অথবা দা দ্বারা কাটিয়া বাহির করা ভাল। গরমের দিনে গর্ত্তের খোলা অংশ ত্রিপল অথবা খড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজনীয় কারণ তাহা না হইলে রসীয় অংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং তাহাতে সাইলেজ খারাপ হয়। গর্ত্ত হইতে প্রতিদিন ২ কি ৩ ইঞ্চি পরিমাণ সাইলেজ উঠাইয়া ব্যবহার করিবে। যে পরিমাণ সাইলেজ তোলা হইবে তাহা সেই দিনই কাটিয়া গরুকে খাওয়াইবে। খোলা বাতাসে রাখিয়া দিলে উহাতে ছাতা ধরে।

খড় অথবা অন্য কোনরূপ শুষ্ক খাদ্য পাওয়া গেলে প্রত্যেক গরুকে উহার /৪ সের এবং সাইলেজ /৫ সের একত্রে মিশাইয়া খাইতে দিবে। (পল্লীবাসী)

পাট চাষে কৃষকের ক্ষতি

পাট বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষিসম্পদ্ হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ধান চালের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, পাট অপেক্ষা ধান চাষে কৃষকের অধিক লাভ। ধান ও পাট চাষের লাভালাভের বিষয় আমরা জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ অভিজ্ঞ কৃষকের মুখে যাহা শুনিয়াছি পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কৃষকের নাম শ্রীহাবী প্রামাণিক। সাকিন চড়াডাঙ্গা, থানা পাবনা। বয়স ৫০।৫২ বৎসর। সে বলিল তাহার ভাইএর সঙ্গে এজমালী এক বিঘা জমির অর্দ্ধাংশে সে পাট বুনিয়াছিল এবং তাহার ভাই অপরার্দ্ধে ধান বুনিয়াছিল। তাহার হিসাব যথা :—

ধানের হিসাব—জমি ½ বিঘা

লাঙ্গল যেওয়া	৩৲
সার	১৲
বেহুন	১৷৷০
নিড়ান	১৲
কাটান	২৲
মাড়াই	১৲
মোট খরচ	———
	৯৷৷০

উৎপন্ন আউশ ধান্য ২৫ কাঠা (পনর সেরে এক কাঠা)

„ আমন ধান্য ১০ „

মোট ———

৩৫ „

মূল্য প্রতি কাঠা ১/০ হিসাবে	৩৭৲০
বিচালী	৪৲
	———
	৪১৲০
	৯৷৷০
	———
নিট আয়	৩১৷৷০

পাটের হিসাব—জমি ১ বিঘা

লাঙ্গল দেওয়া	৩৲
সার	১৲
বেহন	।৹
নিড়ান (দুই বার)	২৲
কাটা ও পচান	২৲
ছাড়ান	৫৲
মোট খরচ	১৪৷৹

উৎপন্ন পাট ৫/৹ মণ

প্রতি মণ ৬৲ হিসাবে

পাটকাঠি (এদেশে বিক্রী হয় না)	১৲
মোট আয়	৩১৲
বাদ খরচ	১৪৷৹
নিট আয়	১৬৷৹

দেখা যাইতেছে যে ধান চাষে লাভ ৩১৷৹ — ১৬৷৹ = ১৫৷৹ আনা অধিক হইয়াছে।

হাজী গ্রামাণিক পাট বিক্রয়ে ঠকিয়াছিল। এবার ঐ অঞ্চলে সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৭৷৹ টাকা মণ দরে পাট বিক্রী হইয়াছে। সে যদি উহা পাইত তবে ৫/মণে তাহার আয় ৭৷৹ টাকা বেশী প্রাপ্তি হইত। তাহা হইলে তাহার নিট লাভ হইত (১৬৷৹ + ৭৷৹) — ২৪৲ টাকা।

তথাপি তাহার ৭৷৹ ক্ষতি হইত। ঐরূপ হিসাব দিয়া সে বলিল, "আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি ধান অপেক্ষা পাট চাষে অত্যন্ত ক্ষতি ও প্রণান্ত পরিশ্রম।

প্রশ্ন—তবে তোমরা পাট বুন কেন?

উত্তর—পাট বেচিতে কোনরূপ কষ্ট হয় না, বরং বেচিতে গাঁথিলেই পাওয়ানাদার, মহাজন ও জমিদারের দেনা দেওয়া যায়। কিন্তু ধান বেচিতে অত্যন্ত মমতা হয়। তাতেই ত আমরা মনে করিয়াছি এবার পাট খুব কম বুনিব বেশী পাট বুনায় অত্যন্ত ক্ষতি।

শ্রীকেদারনাথ সরকার
(ত্রিপুরা হিতৈষী)

বাংলায় জল সেচনের ব্যবস্থা

(১) দামোদর খাল

বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় প্রায় ২০০,০০০ একর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থার জন্য দামোদরের একটী খাল খনন করিবার খসড়া করা হয়। ১৯২৬-২৭ সনে প্রথম এই কাজ হাতে নেওয়া হয়। ১৯২৭-২৮ সনের শেষ পর্য্যন্ত এই কাজে মোট ৮,১৩,৮৪৫ টাকা খরচ হইয়াছে। সমস্ত স্কীমের জন্য মোট ১৮,১৪,২৮১টাকা খরচের একটী মোসাবিদা করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের (১৯২৭-২৮ সনে) মোট খরচের মধ্যে ৪,৪০,৩৬০ টাকা জমি দখল, নদীর ভিতর ড্যাম তৈরী এবং খাল খনন কাজে ব্যয় হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনের ইরিগেশান রেভিনিউ রিপোর্টে প্রকাশিত সরকারী হিসাব হইতে উপরোক্ত সংখ্যাগুলি লওয়া হইয়াছে।

(২) বক্রেশ্বর ইরিগেশান স্কীম

বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরের জলসেচনের কাজ প্রথম ১৯২৭-২৮ সনে হাতে লওয়া হয়। এই কাজের জন্য আনুমানিক খরচের পরিমাণ ৪,৯০,৫৯৬ টাকা ধরা হইয়াছে। খরচের মোট অংশ ১৪,৬৫০ টাকার বেশীর ভাগ খালের কতকটা জায়গা খুঁড়িতে খরচ হইয়া গিয়াছে। এই স্কীম অনুযায়ী কাজ শেষ হইলে এই খালে প্রায় ১০,০০০ একার খানি জমির জলের ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

(৩) মেদিনীপুর খাল

মেদিনীপুর খালের কাজের জন্য আলোচ্য বৎসরে মোট খরচ কিছুই হয় নাই। এই খালে (মেদিনীপুর এবং পাঁশকুড়াতে) দুইটী ড্যাম তৈয়ারী হইয়াছে। প্রধান ও শাখা খালের মধ্যে ৩৯৯ মাইল কৃষিকার্য্যে জল সেচন এবং নৌ-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকী ২৮০·২১ মাইল পয়ঃপ্রণালী। আলোচ্য বৎসরে মোট ৭৮,৯৬০ একার জমির জল সেচন হয় এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে হয় ৭৪,০৩২ একার। ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে যে তিন মাস শেষ

হইয়াছে, তাহাতে মোট ১৫,৩২২ একার জমির জল সেচন হইয়াছে।

এই খাল হইতে আলোচ্য বৎসরে মোট আদায় ২,৯৩,১৬১ টাকা এবং মোট ব্যয় ২,০২,২৪৫ টাকা। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে নিট আয়ের পরিমাণ ৯০,৯১৬৲ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে ২৪,৮০৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরের লাভের অংশ বাড়ার কারণ এই যে, ঐ বৎসরে জলকরের হার পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তা ছাড়া, ব্যয়ের অংশও আলোচ্য বৎসরে অনেক কম হয়।

(৪) গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক খাল

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক খালের কাজ আলোচ্য বৎসরে মুলতুবি রাখা হইয়াছে। তবে পশ্চিম সহরতলীর নদীগুলি তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যাওয়ায়, এই খালের কাজ শীঘ্রই হাতে লইবার কথা চলিতেছে।

(৫) পূর্ব্ববঙ্গের খাল

কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত যে খাল আছে তাহার কতক অংশ স্বাভাবিক, আবার কোন কোন স্থানে কৃত্রিম খাল কাটিয়া পরস্পরের সংযোগ করিয়া, বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই খালের দৈর্ঘ্য ৮৩৪ মাইল এবং এই খাল দ্বারাই জলপথে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা। আলোচ্য বৎসরে এই খালের জন্য বিশেষ কোন মোটা খরচ হয় নাই। এবৎসরে এই খালের কাজের জন্য মোট ৩,৬৩,২৪৪ টাকা আয় এবং ৫,৮১,৬১৮ টাকা ব্যয় হয়। সুতরাং ১,১৮,৫৩৪ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে এই লোকসানের পরিমাণ ছিল ২৩১,৫৯৬ টাকা। আলোচ্য বৎসরে এই ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার কারণ এই যে, খাল মেরামতাদি কার্য্যের জন্য খরচ এবার অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৬) সুন্দরবন ষ্টীমার পথ

এই ষ্টীমার পথ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ববঙ্গের খাল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার। আলোচ্য বৎসরে এই খাতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার মধ্যে ৩৭,৪৬৪ টাকা ষ্টেমার ভাড়া দিয়া পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই টাকাটা এই বৎসরের আয়ের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। আলোচ্য বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ ৬২,২৪৮ টাকা এবং ব্যয় ১,৭৬,৭২৪ টাকা। সুতরাং ঘাটতি হইয়াছে ১,১৪,৪৭৬ টাকা, তৎপূর্ব্ব বৎসরের ঘাটতি ৪৪,৯১২ টাকা। এবৎসরে ঘাটতি এত বেশী পড়ার কারণ এই যে, জলপথের একখানি ষ্টেমারকে সম্পূর্ণ মেরামত করিতে অনেক টাকা খরচ হইয়া যায়। তা ছাড়া, গাবখান তারানি খালের মধ্যে জায়গায় জায়গায় চড়া পড়িয়া যাওয়ায়, সেগুলি খুঁড়িতেও এবৎসর ব্যয় কম হয় নাই।

(৭) বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার জলসেচন ব্যবস্থা

এই তিনটী জেলার ভিতর দিয়া একটী খাল কাটাইবার প্রস্তাব অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে এই তিনটী জিলাতেই জলাভাব প্রভৃতির দরুণ দুর্ভিক্ষ বেশী দেখা যায়। এই খাল কাটা হইলে দেশের জল সেচনের সুবিধা হইবে ও এই দুর্ভিক্ষ অনেক কমিয়া যাইবে আশা করা যায়। এই প্রস্তাব মঞ্জুর হইলে যখন কার্য্য আরম্ভ হইবে তখন ইরিগেশন আক্ট অনুসারে এই কার্য্যের কিয়দংশ গবর্ণমেণ্ট হাতে লইবেন এবং বাকী অংশ বঙ্গীয় কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতি আইনের ৪র্থ ধারা অনুসারে ঐ বিভাগের দ্বারা সাধিত হইবে।

উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের মূলধন মোট ৫০ হাজার টাকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী এবং মাখলা গ্রাম এই ব্যাঙ্কের এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এই উন্নতির দরুণ মাখলা গ্রামের অধিবাসিগণ উত্তরপাড়া ব্যাঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাখলায় পৃথক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী ১৯শে মে রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় উত্তরপাড়া ব্যাঙ্কের

এলাকা হইতে মাপলা গ্রাম পৃথক হওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কের সদস্যগণের একটী অতিরিক্ত সাধারণ অধিবেশন হইবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উত্তরপাড়া সমবায় কৃষি ও দুগ্ধ সমিতি

সমিতি উত্তরপাড়া ও ভদ্রকালীগ্রামের সদস্যগণের মধ্যে দৈনিক যেরূপ করিয়া খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছেন। এই দুগ্ধ সমিতির কৃষিজীবী সদস্যগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইতেছে। উত্তরপাড়া ও ভদ্রকালী গ্রামের অধিবাসিগণের তুলনায় খাঁটি দুগ্ধের কাটতি আরও অধিক হওয়া প্রয়োজন। সমিতি সম্প্রতি ভদ্রকালী গ্রামে আন্দাজ ২৫ বিঘা জমি গোচারণের জন্য ৯ বৎসরের মিয়াদে জমা লইয়াছেন। এই মাঠে উত্তরপাড়া ও ভদ্রকালী গ্রামের অধিবাসিগণের গবাদি পশুর চরিবার সমান অধিকার। সমিতি মাঠটি জমা লইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। সমিতির গোচারণ-মাঠে প্রজননের জন্য উত্তম বৃষের অভাব আছে।

(বঙ্গবাণী)

বাঁকুড়া সংবাদ

অগ্নিকাণ্ড

কয়েক দিন হইল আগুন লাগিয়া শালবনী ও পাঁচবাগা গ্রামদ্বয়ের অনেকগুলি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

জলাভাবের আশঙ্কা

অত্যধিক গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত এ জেলার বহু জায়গায় শীঘ্রই স্নান এবং পানের জন্য জলাভাব হইবে বলিয়া অনেকেই বিষম আশঙ্কা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই কোন কোন জায়গায় জলাভাব বশতঃ গবাদি পশুসমূহের ভারি কষ্ট দেখা যাইতেছে।

গ্রীষ্মাধিক্যে পীড়ার আশঙ্কা

গ্রীষ্মাধিক্য হেতু অনেকেই কলেরা, বসন্তাদি পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। বেলা ১টার পর অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত অনেকের বাটীর বাহির হওয়া বিষম দায় হইয়া পড়িয়াছে। বহু লোকেরই ধারণা যে ইদৃশ গরম বিগত ১৩১২ বৎসরের ভিতর দেখা যায় নাই। আবার বাতাস বন্ধ হওয়া হেতু কোন কোন দিন রাত্রিকালেও লোকের অস্বিস্তির জন্য যার পর নাই কষ্ট হইতেছে।

রাস্তা ঘাট

জেলা বোর্ডের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও জেলার বহু রাস্তা এবং ঘাটের এ পর্য্যন্ত নিয়মমত সংস্কার করা হয় নাই। আশা করি কর্ত্তাদের ঐ বিষয়ে অতঃপর শীঘ্রই নেকনজর পতিত হইবে। এ দিকে উপরি উক্ত সংস্কার ব্যাপারে যাহাতে জেলার গরীব প্রজার শোষিত ধন অর্থের কোন মতেই অপব্যয় করা না হয় এপক্ষেও কর্তৃপক্ষের কড়া নজর রাখা আবশ্যক বিবেচনা করি।

হরীতকী ও মহুয়ার ব্যবসা

জেলায় হরীতকী এবং মহুয়া অর্থাৎ মউল ফুলের ব্যবসা সম্বন্ধে ক্রমোন্নতি হইতে দেখিয়া আমরা অনেকটা আনন্দিত হইয়াছি।

মৎস্যের চাষে অবনতি

এ জেলায় আগেকার মত মৎস্যের চাষে উন্নতি দেখা যাইতেছে না; বরং কোন কোন জায়গায় তদ্বিষয়ে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিই ঘটিয়াছে। মৎস্যের চাষাবাদে যাহাতে সত্বর উন্নতি সংসাধিত হয় তজ্জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

বন জঙ্গলে কাষ্ঠাভাব

জেলার বহু বন জঙ্গলে প্রয়োজনানুযায়ী কাষ্ঠাদি মূল্য দিয়াও সময়মত পাওয়া যাইতেছে না। ইদৃশ কাষ্ঠাভাব নিবন্ধন অনেকের কষ্টের অবধি নাই। গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে বহু ব্যক্তিকেই অন্য জেলা হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইতেছে।

(বঙ্গবাণী)

যশোহর নগর সভা

যশোহর নগর সভার বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট প্রস্তুত হইয়াছে। বাজেটে বর্ত্তমান বৎসরের আয়ের পরিমাণ ধার্য্য হইয়াছে ৫৭৪২৬৲ টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩১০২৲ টাকা। ইহার মধ্যে ঋণের সুদ বাবদ ১৬০৬৲ টাকা ও ঋণ শোধ বাবদ ৪২০৫৲ টাকা ব্যয়িত হইবে। আর কয়েকটা বিষয়ের জন্য ব্যয় নিম্নরূপ :—

রাস্তার আলো—২০৮০৲

জলের কল মেরামত—৫০০০৲

নূতন পুষ্করিণী ও কূপ খনন ও মেরামত—১০০০৲

ষ্ট্রেন—৩১০৪৲

রাস্তা পরিষ্কার—২৮৬৬৲

স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের মাহিয়ানা—১০০৲

রাস্তা মেরামত—৪৫০০৲

(রাস্তার জন্য মোট ৬৮৬০৲ টাকা)

টোল ও মজুরের জন্য—২০০৮৲ টাকা

নগরপিতা আশা করেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে করদাতাগণের নিকট হইতে ৪৭৫৭৫৲ টাকা কর আদায় করিবেন।

রাস্তায় রাস্তায় ধূলার প্রাচুর্য্য। মোটর ও বাস্ চলিতেছে বিস্তর। নগরবাসীরা ধূলার উৎপাতে অস্থির। ধূলা নিবারণের জন্য অর্থাৎ রাস্তায় জল দিবার জন্য বাজেটে খরচ বরাদ্দ হইয়াছিল ৫০০৲ টাকা, কিন্তু খরচ হইয়াছিল মাত্র ১২৪৲ টাকা; তাহার পূর্ব্ব বৎসর খরচ হইয়াছিল ৪৫০৲ টাকা। নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক "যুগ শঙ্খ" এ সম্বন্ধে টিপ্পনী কাটিয়া বলিতেছেন "সহরের স্বাস্থ্য রক্ষা বাবদ অন্য বিষয়ে অনেক টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু ধূলা নিবারণও কি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নহে?" এই টিপ্পনীর ফলে দেখিতেছি জনবহুল ধূলিময় রাস্তাগুলির এক একটিতে প্রতিদিনই জল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাজেট আলোচনার সময় ভাইস্-চেয়ারম্যান্ বা সহ-সভাপতি একটী জল দিবার মোটরগাড়ী আনিয়া আধুনিক উপায়ে জল দিবার প্রস্তাব করেন। ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে সভাপতি মহাশয় সে প্রস্তাব স্থগিত করেন। রাস্তায় জল দেওয়া বাবদ ৫০০৲ টাকার স্থলে ৯০০৲ টাকা করিবার একটী প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা নাকচ হইয়াছে। মেথরদিগের মাহিয়ানা বাড়িয়াছে এক টাকা করিয়া। এই বাজেট নির্দ্ধারণ ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। সেটী হইতেছে কমিশনারদিগের ঔদাসীন্য। বার্ষিক বাজেটের ন্যায় গুরুতর বিষয়ের আলোচনার সময়েও ১৮ জন কমিশনারের মধ্যে মাত্র ৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীসুকুমার মিত্র, যশোহর।

ভারত গভর্মেণ্টের বিলাতে টাকা পাঠানো

ভারত গভর্মেণ্টের খরচ কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। সিভিলিয়ান ও সামরিক কর্ম্মচারীদের ছুটীর মাহিয়ানা, পেনশান, ঋণের সুদ প্রভৃতি নানা খরচ মিটাইবার জন্য ভারত গভর্মেণ্টকে প্রতি বৎসরে বেশ মোটা টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। বৎসরে একবার করিয়া যে একটা থোক টাকা পাঠানো হয়, তাহা নহে। সারা বৎসর ধরিয়া হপ্তায় হপ্তায় কিছু কিছু টাকা পাঠানো হয়। গত ৪ঠা মে তারিখে যে হপ্তা শেষ হইয়াছিল সেই হপ্তায় কোন টাকা পাঠান হয় নাই। ১লা এপ্রিল (১৯২৯) হইতে ৪ঠা মে (১৯২৯)—এই সময়ের মধ্যে ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড পাঠানো হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড বিলাতে ভারতীয় নোটের যে রিজার্ভ আছে, তাহা হইতে লওয়া হইয়াছিল। ভারতে ভারতীয় নোটের যে রিজার্ভ আছে তাহাতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ভারতীয় মুদ্রা রাখিয়া ভারত গভর্মেণ্ট ভারতীয় নোটের রিজার্ভের মোট পরিমাণটা ঠিক রাখিয়াছিলেন।

সরকারী বন বিভাগের গবেষণা

ভারতের বন-সম্পদ্ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা চলিতেছে। বাঁশের মণ্ড (পাল্প্) হইতে নকল রেশম প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিনা সে সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। এই গবেষণা-কার্য্য যদি সফল হয়, তাহা হইলে ইহা ভারতের পক্ষে এক মস্ত বড় আবিষ্কার বলিতে হইবে।

কাঠ বাঁচাইবার উপায় সম্বন্ধে সরকারী বনবিভাগ গবেষণা চালাইতেছেন। কয়েক বৎসর হইল ৬ হাজারের উপর শালের খুঁটা এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এইসকল খুঁটা পচে নাই। মাঝে মাঝে এই সকল খুঁটা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। রেল লাইন স্লিপারগুলি সংরক্ষিত করিবার জন্যও নানা প্রকার গবেষণা চলিতেছে। ২৪০০ ঘন ফুট করাতের গুঁড়া ও সংরক্ষিত করিয়া কনজেকেশান হল এবং ব্রাঞ্চ অফিসারগণের বাঙ্গলোর মেঝের তলে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ঘরের মেঝেকে খুব শক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যতে-গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে এইরূপ সংরক্ষিত করাতের গুঁড়ার ব্যবহার খুব বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কামানবাহী শকট এবং ট্রেঞ্চারে ব্যবহারোপযোগী দৃঢ় কাষ্ঠনল নির্ম্মাণের জন্য শাল কাঠকে নানা উপায়ে নরম করিবার চেষ্টা চলিতেছে। রয়্যাল অর্ডন্যান্স বিভাগে এইরূপ জিনিষের প্রয়োজন। অনেকবার অকৃতকার্য্য হওয়ার পর এ বিষয়ে আংশিক ফল মিলিয়াছে। রয়্যাল অর্ডন্যান্স বিভাগ এতদুদ্দেশ্যে জব্বলপুরে একটী কারখানা খুলিয়া এ বিষয়ে গবেষণা চালাইতেছে।

ইছাপুর গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র শস্ত্রের কারখানাতেও রাইফেল বন্দুকের কাঠের অংশগুলি ভারতীয় কাঠ দ্বারা তৈয়ার করা যায় কিনা তাহার একটী বড় গবেষণা চলিতেছে। দেশের কয়েক প্রকার বনজাত কাঠ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নরম করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। যদি গবেষণা সফল হয় তাহা হইলে ভারতে যাহা কখনও আশা করা যায় নাই এমন একটি নূতন আবিষ্কার সাধিত হইবে।

১৯২৯ সনের মার্চ্চে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

বর্ত্তমান সনের মার্চ্চ মাসের ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের খতিয়ান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, আমদানি এবং রপ্তানি দুইই বাড়িয়াছে, তবে ভারত হইতে পুনরায় যে সমস্ত মাল রপ্তানি করা হয় তাহার পরিমাণ কিন্তু কমিয়াছে।

বেসরকারী মাল আমদানি হয় ২২,১৮ লক্ষ টাকার অর্থাৎ গত মাসের চেয়ে ২,৩৮ লক্ষ বেশী। ভারতের কাঁচা মাল, এবং কারখানাজাত মালের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ৩,৭৪ লক্ষ টাকায়। ১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে রপ্তানি হইয়াছে ৩১,৩৬ লক্ষ টাকার। ফেব্রুয়ারী মাসে রপ্তানি হইয়াছিল ২৭,৯২ লক্ষ টাকার। পুনঃ রপ্তানি ২ লক্ষ টাকা কমিয়া ৫৫ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

মার্চ্চ মাসে সোণারূপার বেসরকারী আমদানির পরিমাণ ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার, ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার, গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার। ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে সোণা রূপার আমদানির ও তাহার পূর্ব্ব বৎসরে সোণা রূপার আমদানির পরিমাণ নীচে দেওয়া যাইতেছে।

	১৯২৮-২৯ (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ) (লক্ষ টাকা)	১৯২৭-২৮ (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ) (লক্ষ টাকা)	শতকরা
সোণার আমদানি	২১,২২	১৮,১৪	
সোণার রপ্তানি	২	৪	
রূপার আমদানি	১৫,৯২	১৬,৪৪	
রূপার রপ্তানি	২,৮৮	২,৫৯	

এই বৎসরের মার্চ্চ মাসে সোণারূপা এবং মালপত্র লইয়া ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী দাঁড়ায় ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, ফেব্রুয়ারি মাসে ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, এবং ১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে দাঁড়াইয়াছিল ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে ভারতের আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী ছিল ৫২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে, ৪৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বেশী ছিল।

আমদানির রূপান্তর

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, ১৯২৯ সনের মার্চ্চে খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, এবং তামাক আমদানি হয় ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার অর্থাৎ ১ কোটি টাকা বেশী; কাঁচামাল ২ কোটি ৪ লাখ টাকার, অর্থাৎ ২৩ লক্ষ টাকা বেশী। কারখানাজাত মাল ১৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকায়, অর্থাৎ ৭৯ লক্ষ টাকা কম। খাদ্যদ্রব্য এবং তামাক বেশী আমদানি হওয়ার কারণ অষ্ট্রেলিয়া হইতে খুব বেশী মাত্রায় গম চাষান আসিয়াছে। আলোচ্য বৎসরের মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আসিয়াছে ১ লক্ষ ১১ হাজার টন, (দাম ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা), অথচ এক বৎসর পূর্ব্বে এই সময়ে মাত্র ৪ লক্ষ টাকার ২,০০০ টন গম আসিয়াছিল। ইতোচায়না থেকে মাদ্রাজ প্রদেশে আমদানি করা ছাঁটা চাল এই বৎসরের মার্চ্চ মাসে ৮,০০০ টন কম আসিয়াছে, অর্থাৎ ১১ লাখ টাকার কম চাল আমদানি হইয়াছে। মদলা আমদানি ১০ লাখ টাকার কমিয়াছে।

আমদানি করা কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিন তেলের আমদানি ৫,১২৫,০০০ গ্যালন হইতে ১৩,০০০,০০০ গ্যালন দাঁড়াইয়াছে; মূল্যও বাড়িয়াছে ২৮৫০,০০০ টাকা হইতে ৬,৯০০,০০০ টাকা। কেরোসিনের আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু অপর পক্ষে আবার তুলার আমদানি কমিয়াছে ২০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের মার্চ্চে ১৮০০ টন তুলা

আমদানি হইয়াছিল, এই বৎসরের মার্চ্চে মাত্র ১৪০০ টন আমদানি হইয়াছে। আমদানি করা কারখানা-জাত ধাতুঘটিত মালের মোট ওজন ১০৭,০০০ টন, দাম ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসের ধাতু-নির্ম্মিত মালের ওজন ছিল ১১৯,০০০ টন এবং তাহার দাম ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ২১ লক্ষ টাকার আমদানি কমিয়াছে। এই ২১ লাখ টাকা কমতির মধ্যে লোহা-লক্কড়ের আমদানি কমিয়াছে ৮ লাখ টাকার এবং অন্যান্য ধাতু-নির্ম্মিত মালের আমদানি কমিয়াছে ১৩ লাখ টাকার।

অ্যানিলিন রঙের আমদানি ১,৫১১,০০০ পাউণ্ড (দাম ২৩ লাখ টাকা) হইতে ১,২২১,০০০ পাউণ্ডে (দাম ১৫ লাখ টাকা) হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তুলার এবং নকল রেশমের কাপড়চোপড়ের আমদানি হ্রাস হইয়াছে ৩০ লক্ষ গজ (অর্থাৎ ২৩ লক্ষ টাকার)।

মোটরকারের আমদানি বৃদ্ধি

মোটর গাড়ীর আমদানি বৃদ্ধি ১,২৮৫ খানি হইতে ১,৬০৫ খানিতে উঠিয়াছে; মূল্যও বৃদ্ধি হইয়াছে ২৯ লাখ হইতে ৩৩ লাখ টাকা। তুলার সুতার আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছে ১০ লক্ষ গজ (১৫ লাখ টাকা)। কাপড়-চোপড়ের আমদানি বাড়িয়াছে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ গজ হইতে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ এবং দাম বাড়িয়াছে ৪ কোটি ৯৮ লাখ হইতে ৫ কোটি ৯ লাখ টাকা। কোরা কাপড় বাড়িয়াছে ১ কোটি গজ (অর্থাৎ ২৫ লাখ টাকা বেশী) এবং ধোলাই কাপড় কমিয়াছে ২০ লক্ষ গজ (অর্থাৎ ৬ লাখ টাকা কম)। রঙীণ কাপড়চোপড়, ৪ কোটি ৪০ লক্ষ গজ হইতে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ গজে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দর নামিয়া যাওয়ায়, মূল্য ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। চীনামাটি প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বাসন কোসনের আমদানি কমিয়াছে, (—১০॥ লক্ষ টাকা) কাচ ও কাচের বাসনও কমিয়াছে (—৬ লক্ষ টাকা); কিন্তু রঙ্গনের কলের (+৬ লক্ষ টাকা) এবং ইলেক্‌ট্রিকের জিনিষ পত্রের (+৫ লক্ষ টাকা) আমদানি বাড়িয়াছে।

রপ্তানির রূপান্তর

১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এবং তামাক রপ্তানি হইয়াছে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার অর্থাৎ ১৯২৮ সনের মার্চ্চের রপ্তানির চেয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা কম। এই হ্রাসের কারণ চাল এবং কফির রপ্তানি কমিয়াছে। চাল রপ্তানি ৩৭৪,০০০ টন হইতে ৩০৩,০০০ টনে নামিয়াছে, দামও কমিয়াছে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকায়। কফি রপ্তানি হ্রাস ৩১,০০০ হন্দর; মূল্য হ্রাস ২৬ লক্ষ টাকা। চা রপ্তানি হইয়াছে ২১ লক্ষ টাকা কম এবং যব ১৮ লক্ষ টাকা কম। কাঁচা মাল ও কারখানা-জাত মালের রপ্তানির পরিমাণ ১৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা; বৃদ্ধির পরিমাণ ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে তুলা রপ্তানিই সবচেয়ে বেশী। তুলা রপ্তানি ৬৮,৭০০ টন (দাম ৬,৯২ লক্ষ টাকা) হইতে ৯১,৯০০ টনে (দাম ৯,৭৯ লক্ষ টাকা) দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে জাপান গ্রহণ করিয়াছে ৪৩,০০০ টন (অর্থাৎ ৪৩%), চীন ১৬,৪০০ টন, জার্ম্মানি এবং বেলজিয়াম ৯,০০০ টন, ইটালি প্রায় ৮,০০০ টন এবং বিলাত, ৬০০০ টন। অবশিষ্ট তুলা ফ্রান্সে চালান গিয়াছে। পাট রপ্তানি বাড়িয়াছে ৪২,০০০ টন হইতে ৬৫,০০০ টন; দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে ১,১৮ লাখ হইতে ১,৯৯ লাখ টাকা। জার্ম্মানি পাট লইয়াছে ১৯,৫০০ টন, বিলাত ১৬,৫০০ টন, ফ্রান্স ৮,৯০০ টন। লাক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে ৩২ লক্ষ টাকার, সেগুন কাঠ ১১ লক্ষ টাকার, কাঁচা চামড়া ১০ লক্ষ টাকার। অন্য পক্ষে আবার তৈল বীজের রপ্তানি হ্রাস হইয়াছে ১০১ লক্ষ টাকার। তৈল বীজের মধ্যে চীনা-বাদামের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে ৩৮ লক্ষ টাকার, তুলার বীজ ২২ লাখ টাকার, মসিনা ১৯ লাখ টাকার। কাঁচা চামড়াও রপ্তানি হইয়াছে ১০ লক্ষ টাকা কম।

শিল্পদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে ৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার অর্থাৎ ৪৭ লক্ষ টাকা কম। রপ্তানির হ্রাসের জন্য চট এবং টান করা চামড়াই প্রধানতঃ দায়ী। চট রপ্তানি ১০ কোটি ১০লক্ষ গজ হইতে ১১ কোটি ৫০লক্ষ গজে নামিয়াছে, দামও ২ কোটি ৫০ লাখের স্থানে ২ কোটি ২৮ লাখ দাঁড়াইয়াছে।

চটের থলে ১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে রপ্তানি হইয়াছিল ৩ কোটি ৬৪ লাখ, কিন্তু ১৯২৯ সনের মার্চ্চমাসে রপ্তানি হইয়াছে ৩ কোটি ৭০ লাখ। ১৯২৮ সনের রপ্তানি মালের দাম ছিল ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, আর ১৯২৯ সনের রপ্তানি মালের দাম ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। ট্যানকরা চামড়া ৫৫০ টন (২৫ লক্ষ টাকা দামের) কম রপ্তানি হয়।

বাণিজ্যের গতি কোন দিকে ?

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে বিলাত হইতে ৪৯% মাল আমদানি হয় কিন্তু ১৯২৯ সনের মার্চ্চে এই হার কমিয়া ৪৪%এ দাঁড়াইয়াছে। উক্ত দুই মাসে বিলাতে রপ্তানির হার যথাক্রমে ১৯%ও ১৫%। জার্ম্মানি, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানির হার যথাক্রমে ৫%, ৮% এবং ৬% এবং ঐ দেশগুলাতে রপ্তানির হার যথাক্রমে ১০%, ১৫% এবং ১০%।

ব্রিটিশ ভারতে বিদেশ হইতে আগত মাল লইয়া ব্রিটিশ ভারত হইতে বিদেশগামী মালবাহী জাহাজ সকলের মোট টনেজের পরিমাণ, ১৯২৯ সনের মার্চ্চে যথাক্রমে ৭১০,০০০ এবং ৮২৩,০০০। ১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ৬৭৭,০০০ এবং ৬৯১,০০০ এবং গতবৎসরের মার্চ্চে ৬৫৭,০০০ এবং ৭৮৪,০০০। ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে ব্রিটিশ ভারতে আগত এবং ভারত হইতে বিদেশগামী জাহাজের টনেজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,২৩০,০০০ এবং ৮,৪৫০,০০০; পূর্ব্ব বৎসরের অঙ্কগুলা যথাক্রমে ৭,৬৫০,০০০ এবং ৭,৯২৫,০০০।

ভারতের খনিজ সম্পদ্

ভারতের খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে ১৯২৭ সনের যে সরকারী বিবরণ বাহির হইয়াছে নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৭১৩টী খনির জন্য 'কনসেশন' মঞ্জুর করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৭৫৯টি খনিকে 'কনসেশন' মঞ্জুর করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'কনসেশনের' মধ্যে দুইখানি খনি খননের লাইসেন্স, ৩৮০৩ খানি ভবিষ্যৎ খননের লাইসেন্স এবং ১০৯ খানি খনির ইজারা পত্র।

এন্টিমনি

বার্ণা কর্পোরেশন লিমিটেড্, নামক ধাতু-শোধক কারখানার সীসা নিষ্কাশন কালে এন্টিমনি-মিশ্রিত সীসা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ সীসা, ২১ ভাগ এন্টিমনি এবং ৬ হইতে ৮ আউন্স পরিমাণ রূপা থাকে। ১৯২৬ সনে ১,০৫৭ টন এবং ১৯২৭ সনে ৫০৩ টন এন্টিমনি মিশ্রিত সীসা উৎপন্ন হইয়াছে। মূল্য ক্রমাগতে ৩,২০৫০০ টাকা এবং ১,৩৩,০৫৬ টাকা।

তাম্র

১৯২৬ সনে সিংহভূম জেলায় ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লিমিটেডের মোসাবোনী খনির কাজ আরও কলকারখানা নির্ম্মাণের জন্য টাকা উঠাইবার অপেক্ষায় বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ১৯২৭ সনে লণ্ডনের অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এণ্ড জেনারেল ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। ৫২,৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং অবিলম্বে ঘাটশিলার অন্তর্গত মৌভাণ্ডারে কোম্পানীর নূতন স্থানে নূতন কারখানা নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ৬২৪,৫০৯টন পরিমাণ তাম্র ওর মজুত আছে। ইহার মধ্যে আনুমানিক ২৪,২০২ তাম্র আছে। ১৯২৭ সনে ৫,০০০ টন তাম্র ওর পাওয়া গিয়াছিল। মূল্য ২,০০,০০০ টাকা।

হীরক

আলোচ্য বর্ষে যথাভারতে ১১২,৭৪ ক্যারাট হীরক উৎপন্ন হইয়াছে, মূল্য ৪৪,৯৪০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন হইয়াছিল ৬৮,৬০ ক্যারাট, মূল্য ২৮,৫৬৯ টাকা।

স্বর্ণ

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মোট ৩৮৪,২১২,৫ আউন্স সোনা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উৎপন্ন সোনার

পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। আলোচ্য বর্ষে এই হ্রাস বন্ধ হইয়াছে। মহীশূরে ১,১৭৬ আউন্স সোনা কম উৎপন্ন হইলেও এবং সিংহভূমে যে সোনা বেশী উৎপন্ন হইত তাহা বন্ধ হইয়া যাইলেও মাদ্রাজের অন্তর্গত দক্ষিণ অনন্তপুর গোল্ড মাইনস লিমিটেডের নূতন খনিতে অনেক পরিমাণ সোনা উৎপন্ন হইয়াছে।

কোলার গোল্ড ফিল্ডে ৭টী খনিতে সোনা উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে "চ্যাম্পিয়ান রীফ" এবং উরগাম খনির গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৭ সনের শেষ দিকে যথাক্রমে ৮,১১০৫ ফুট এবং ৬৪৮৩৫ ফুট দাঁড়ায়। কোলার খনিগুলিতে মোট ১৮৯১৮ জন লোক কাজ করে।

লৌহ

১৯২৭ সনে ভারতবর্ষে মোট ১,৮৪৬৭৩৪ টন লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা শতকরা ১১০ ভাগ অর্থাৎ মোট ১৮৭,৪৪০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে মযূরভঞ্জ রাজ্যে ৬৯২,১৩৭ টন লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার উৎপাদক টাটা কোং। সিংহভূমের উৎপাদিত ১,০০,০৩১টনের মধ্যে টাটা কোম্পানী তাঁহাদের নোয়াখুন্দি খনি হইতে ৫০৭,৫৮০ টন, বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী তাহাদের পানপয়া, অজিতা এবং ম্যাকমিলান খনি হইতে ৩০২,২৪৮ টন এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল কোং তাহাদের ওরা নামক স্থানের খনিগুলি হইতে ১৯১,৭২৪ টন উৎপন্ন করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৫,৪৭৫ টন অন্য দুইটি কারখানা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে "বার্মা কর্পোরেশন লিমিটেড" কর্ত্তৃক লৌহ উৎপাদিত হয়। আলোচ্য বর্ষে আমলেশ্বপুর কারখানার টাটা আয়রণ কোম্পানীর উৎপাদিত লৌহ এবং ইস্পাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৪,৬০৪ টাকা এবং ২,০২১৭৪২ টাকা। বলডুইন খনির মিশ্রিত ধাতুসমূহ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ২৩,১০৫,৬৫৬ আউন্স রূপা বাহির হইয়াছে। মূল্য ৮৮,৪৯,৭০২ টাকা। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সীসা এবং রূপা উভয়েই মূল্য যথাক্রমে টন প্রতি ৪১৫৮ টাকা এবং আউন্স প্রতি ১৸৯ ছিল। আলোচ্যবর্ষে এই মূল্য হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে টন প্রতি ৩৩০৯ টাকা এবং আউন্স প্রতি ১৸৩ পাই দাঁড়াইয়াছে।

ক্রয়ক্ষমতায়

ভারত ও পশ্চিম এশিয়া

ভারতীয় ট্রেড মিশন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর (১) ভারতবর্ষ ১২৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী মাল ক্রয় করে। ভারতের পরেই (২) দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান। ইহার ক্রয়ক্ষমতা ৭৪৯ লক্ষ পাউণ্ড। (৩) মিশর প্রতিবৎসর ৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী মাল কেনে। (৪) তুরস্ক বৎসরে ২৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বিদেশী জিনিষ আমদানি করে। (৫) পারস্য আমদানি করে ১৪০ লক্ষ পাউণ্ডের, (৬) সিরিয়া ১১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী জিনিষ ক্রয় করে এবং (৭) কেনিয়া ও ইউগেণ্ডা একত্রে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী মাল আমদানি করে।

নিকট প্রাচ্যে ভারতীয় মাল

ভারতবর্ষ হইতে নিকট প্রাচ্যের কোন্ কোন্ দেশ কতটা পরিমাণ পণ্যসম্ভার ক্রয় করে তাহার তালিকা এখানে দেওয়া হইল।

(১) আফ্রিকা	২৪ লক্ষ পাউণ্ড
(২) পারস্য	২৪
(৩) মিশর	১৭
(৪) ইরাক	১৪
(৫) এডেন	১০ "
(৬) সুদান	৮ "
(৭) কেনিয়া ইউগেণ্ডা	৭
(৮) ট্যাঙ্গানিয়াকা	৫

ইয়োরোপে ভারতীয় মাল

১৯২৫-২৬ সনে ভারতবর্ষ ইয়োরোপের নিকট ৯১ কোটি টাকার মাল বিক্রয় করে। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ রপ্তানি

করিয়া মাত্র ৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে ভারতবর্ষ আবার ৮২ কোটি টাকার মাল বিক্রয় করে। ইয়োরোপের আর্থিক সঙ্কট ও মুদ্রা-সমস্যা ১৯২৬-২৭ সনের খাটতির জন্য দায়ী।

ভারত কি কি জিনিষ বিদেশে পাঠায় ?

ভারতের রপ্তানি শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ কাঁচা মাল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ বিদেশীদের নিকট যাহা বিক্রয় করে তাহার শতকরা ৮০ ভাগ তুলা, পাট, তৈলবীজ এবং শস্য। নিম্নের তর্ক হইতে বিস্তৃত খবর পাওয়া যাইবে।

দ্রব্যের নাম	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
তুলা	২৭,৮৪	১৪,০৬
পাট	২০,৮৯	১৬,৮৬
বীজতৈল	১৯,৯৪	১৪,২৭
খাদ্য শস্য	৯,২৬	৭,০৩

ইহাই হইল ভারতের পয়লা নম্বর মাল।

দেখিতেছি :—

চামড়া		২,৯৮	৩,৫৯
রেশম		৫৯	৫৫
ম্যাঙ্গানিজ		১,০৭	১,০৪
লাক্ষা	৮৯	৬৭	১,১৮
কফি	৮২	৬০	১,৩০

তুলার দাম পড়িয়া যাওয়ায় ও আমেরিকা কম্বরে তুলা সরবরাহ করায় ভারতীয় তুলা প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিতে পারিতেছে না। সেই জন্য তুলার বিক্রয় রপ্তানি মালের কিয়ৎ কম হইয়া যাইতেছে।

১৯২৫-২৬ সনে ভারতীয় তুলা বেল প্রতি ২২৭ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে মাত্র ১৭৭ টাকা করিয়া ভারতীয় তুলার গাঁইট বিক্রয় হইয়াছে। ইতালীই ভারতীয় তুলার বড় খরিদ্দার। (বাঙ্গেম)

মীরাটে বাজার দর

আলু পাঁচ পয়সা সের, বেগুন দুই পয়সা সের, কাঁচা আম চার পাঁচ সের, কুমড়া চার পয়সা সের, আটা দুই আনা সের, ডরমুজ দুই আনা সের, পটল আট আনা সের। গাঁজা নামক এখানে বন্দরের মত একপ্রকার কাপড় হাটে বিক্রয় হয়। ইহা খুব সস্তা। ১২ গিরা চওড়া কাপড় তিন আনা গজ। এই গজে একটা কামিজ হইতে পারে। এই কাপড় খুব টেঁকসই এবং পুরা স্বদেশী। ইহা কাচিলে ঠিক বন্দরের মত সুন্দর দেখায়।

(কমবাসী)

১৯২৮-২৯ সনের চায়ের বাজার

১৯২১-২২ সন হইতে চায়ের এমন দুরবস্থার আর কখনও দেখা যায় নাই। ১৯২১-২২ সনের পূর্ব্বেও এমন দুর্দ্দশা খুব কমই দেখা গিয়াছে। অনেকগুলি কোম্পানীকে লোকসান দিতে হইয়াছে। সমস্ত চা বাগিচাগুলির একত্রিত লাভের পরিমাণ গত কয়েক বৎসরের লাভের তুলনায় খুব অল্প। আলোচ্য বৎসরের আরম্ভ থেকেই মাল জমা হইতে থাকে। চা বাগিচাগুলিতে চা উৎপন্ন হইয়াছে খুব বেশী, সুতরাং দাম পড়িয়া যায়। এমনি কি অনেক সময়ে আবাদের খরচার চেয়েও কম দরে চা বেচা হইয়াছে।

চায়ের দাম কমার জন্য অন্যান্য দেশের চাহিদা বাড়ে; কেবল বিলাতের চাহিদা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। গত বৎসরের মধ্যে কিন্তু ভাল চা বেশ ভালই বিকাইয়াছে। ভাল চায়ের দামও সেরূপ পড়িয়া যায় নাই। ১৯২৭-২৮ সনে যে দাম ছিল, আলোচ্য বৎসরেও প্রায় সেই দরই মিলিয়াছে। কিন্তু কাছাড় ও শ্রীহট্টের চা বাগিচাগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কেবল দর নামিয়া যাওয়ার জন্যই বাগিচাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নয়, মালও সেরূপ উৎপন্ন হয় নাই।

চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রায় সমস্ত দেশেই ১৯২৮-২৯ সনে চা বেশী মাত্রায় উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় বিলাতে রপ্তানি হইয়াছে খুব কম। অন্যপক্ষে, এক বিলাত ছাড়া আর সমস্ত দেশেই চা রপ্তানির বহর যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, যাহাতে ক্ষতিও না হয়, আবার দরেও

দু'পয়সা আসে, এইভাবে কমদামে চা বেচিবার ব্যবস্থা করিলে দুনিয়ার চায়ের বাজারের অভাব হইবে না। কিন্তু বেশী লাভের দিকে ঝোঁক দিলেই চা কাটিবে না। সেই জন্য আলোচ্য বৎসরের শেষাশেষি যখন চায়ের দাম চড়াইয়া দেওয়া হয় তখন আবার বিদেশের চাহিদা কমিয়া যায়। গুঁড়া চায়ের কাটতি কিন্তু সারা বৎসর ধরিয়া ভালই চলিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে চা বিক্রয় হইত সপ্তাহে একবার। অনেক সময় নীলামেও চা বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু সপ্তাহে একবার মাত্র চা বিক্রয় করার ব্যবস্থা থাকায় চায়ের কাটতি সেরূপ হইত না। সেইজন্য গত দু'এক বৎসর ধরিয়া সপ্তাহে দুইবার করিয়া চা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে।

কলিকাতা চা-বণিক্ সমিতি (টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন) তাঁহাদের বাৎসরিক সভায় স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ২৫,০০০ বাক্সের বেশী চা বিক্রয় করিতে হইলে সপ্তাহে দুইবারই বিক্রয় করিতে হইবে; ভবিষ্যতে যদি চা বিক্রয়ের বহর আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আরও বেশী বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিক্রয়ের জন্য চা প্যাক করা সম্বন্ধেও নজর রাখার দরকার। ছোট ছোট প্যাকে চা বিক্রয় করিলে অনেক মেহনৎ বাজে নষ্ট হয়। সেইজন্য এরূপ নিয়ম করার দরকার যাহাতে ৫০০ পাউণ্ডের কম চা এক প্যাকেটে না থাকে। আলোচ্য বৎসরের শেষ ভাগে চায়ের প্যাকেটে লেবেল বা ট্রেড মার্ক দেওয়ার দিকেও নজর দেওয়া হয়। চায়ের গুণাগুণ, কোন দেশের চা ইত্যাদি তথ্য যাহাতে লেবেলে ধরা পড়ে সেদিকে মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় চায়ের তরফ হইতে ইহা বলা চলে যে, ভারতীয় চায়ের গুণই উহার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনের কাজ করিবে, সুতরাং চাকরদিগের এইদিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক পক্ষে, এই বৎসরে ভাল চা বেশ চড়া দরেই বিকাইয়াছে। সুতরাং আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া চায়ের আবাদ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। চা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যেও খুব প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত যে দেশ ভাল চা যোগাইতে পারিবে, সেই দেশই জয়লাভ করিবে।

চা-বাগিচার কুলি এবং চা-বাগিচার সেস্

পূর্ব্বেকার চেয়ে বর্ত্তমানে চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা ঢের ভাল। সমস্ত জেলাতেই কুলি-সংগ্রহের সুবিধা মিলিতেছে, বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা ঘটায় চা-বাগিচায় দলে দলে কুলি আসিতেছে। ১৯২৮ সনের ৩০শে জুন তারিখে আসামের চা-বাগিচাগুলির কুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০২৫,২২১ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ঐ তারিখে কুলির সংখ্যা ছিল ১,০১০,১৭০ জন।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মত আলোচ্য বৎসরেও সেস্ কমিটির লক্ষ্য ছিল কিসে চায়ের কাটতি বাড়ানো যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে কমিটি ১৯২৮ সনের মরাশুমে ৫১ লাখ হইতে ১৯২৯ সনে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় পরিণত করাইয়াছে। ট্রেনে তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রিগণের সুখ সুবিধার জন্যও সেস্ কমিটি রেলওয়েগুলিকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছে। বাজারে বাজারে চায়ের গুণাবলী প্রদর্শন আলোচ্য বৎসরেও চালান হয় ১১১,৪৩৪টী। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এইরূপ প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ৪২,৪৩০টী। লোকে যে কি পরিমাণ চা খাইয়াছে তাহা নির্ণয় করা খুব শক্ত। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, ভারতবাসীর চায়ের ক্ষুধা দিন দিন বাড়িতেছে।

আমেরিকাতেও চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য জোর প্রচার কার্য্য চালান হইয়াছে। এই জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করা হয় ১০,০০০ পাউণ্ড। আর্জ্জেন্টিনেও প্রচার চলিতেছে। এইরূপ অর্থব্যয় ছাড়া "টি অ্যাণ্ড কফি ট্রেড্ জার্ণালের" 'ভারতীয় চা-সংখ্যা' নামে একখানি বিশেষ সংখ্যা বাহির করার জন্যও কিছু ব্যয় করা হইয়াছে। বিলাতের দরিদ্র ধনি-বন্ধুদের মধ্যে ২০০০ পাউণ্ড মূল্যের চা বিতরণ করা হইয়াছে।

বিলাতের জাহাজ-শিল্প ও জাহাজী ব্যবসা

জাহাজের ভাড়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতের জাহাজ-নির্ম্মাতারা ১৪০টী নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের অর্ডার পাইয়াছে। গত ৭ বৎসর ধরিয়া জাহাজী ব্যবসা ও জাহাজ-শিল্পে দারুণ মন্দা চলিতেছে। এইবার অবস্থাটা ফিরিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

কিন্তু বেশী আশান্বিত হইবার সময় এখনও আসে নাই। ১৯২৮ সনের সারা বৎসরের তুলনায় ভাড়া বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ১৯২৭ সনের শেষভাগে যে হারে ভাড়া পাওয়া যাইত, এখনও ভাড়ার হার তাহা অপেক্ষা অনেক কম। ১৯১৩ সনের তুলনায় ভাড়ার হার শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে। কিন্তু খরচ আরও বেশী বাড়িয়াছে। নাবিকদের মাহিয়ানা শতকরা ৭০ ভাগ, ডাঁড়ারের খরচা শতকরা ৫০।৬০ ভাগ, এবং আলোর খরচ শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়াছে। জাহাজের রাম বাড়াতে বীমার খরচ বাড়িয়াছে। মাল উঠানো নামানোর খরচও বাড়িয়াছে। খরচ যে হারে বাড়িয়াছে, ভাড়া সেই হারে বাড়ে নাই। ঘাটতিটা মিটান হইতেছে কিরূপে? প্রথমতঃ, জাহাজ কোম্পানীগুলার পরিচালনা-প্রণালী আরও উন্নত করিয়া, দ্বিতীয়তঃ, যতদূর সম্ভব বাজে খরচ বাদ দিয়া।

বিলাতের জাহাজ-কোম্পানীগুলার ১৯২৮ সনের অবস্থা ১৯২৭ সন হইতে ভাল। মূলধনের উপর শতকরা ৬এর কিছু কম হারে লাভ দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানী-গুলা আগে বেশ মোটা রিজার্ভ (১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড) জমাইতে পারিয়াছিল। এই রিজার্ভগুলা ভাঙ্গা হইয়াছে বলিয়াই লাভ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

১৯২৭ সনে অনেকগুলা নূতন জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন না থাকায় অতগুলা জাহাজ দরকার হয় নাই, সুতরাং ভাড়ার হারও কমিয়া গিয়াছিল। এবৎসর যে সকল নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে, জগতের ব্যবসার বর্ত্তমান পরিমাণের পক্ষে তাহা দরকার হইবে কিনা তাহা চিন্তার বিষয়। যদি দরকার না হয়, তাহা হইলে ভাড়া আবার কমিয়া যাইবে।

ব্যবসাদারেরা আশা করিতেছে যে, চীনদেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, চীনদেশ ও ইহার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বিশাল ভূমিখণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত বেশী বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। কশদেশ আবার সমৃদ্ধ হইলে ব্যবসা বাড়িবে—একথাও তাহারা ভাবিতেছে। প্রাচ্যে যদি ব্যবসা বাড়ে তবেই জাহাজ কোম্পানীগুলা বাঁচিয়া যাইবে।

জাহাজের কারখানাগুলার অবস্থা আগেকার চেয়ে ভাল হইলেও, বিশেষ সন্তোষজনক নয়। গত বৎসরের প্রথম দিকটায় অর্ডারের সংখ্যা ক্রমাগতই কমিয়া আসিতেছিল তাহার ফলে এখনও মজুরদের ১ ভাগ কাজের অভাবে বসিয়া আছে। তবে গত বৎসরের শেষের দিকে অনেক-গুলা যাত্রী-বাহী জাহাজের অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। "কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে" অনেকগুলা যাত্রি-বাহী জাহাজের অর্ডার দিয়াছে। 'হোয়াইট ষ্টার লাইন' একটা প্রকাণ্ড অ্যাটলান্টিকগামী জাহাজের অর্ডার পাঠাইয়াছে।

নির্ম্মাণ শেষ হইলে এই জাহাজটীই নাকি জগতের মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার দৈর্ঘ্য হইবে ১ হাজার ফুট। অনেকগুলা অতীয় আসিয়াছে বটে, কিন্তু জাহাজের কারখানাগুলা আরও জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহাদের যতগুলা জাহাজ নির্ম্মাণের ক্ষমতা আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না, শীঘ্র দেখা যাইবে বলিয়াও মনে হয় না।

দুনিয়ার চিনি উৎপাদন

১৯১৪-১৫ সনে সমগ্র দুনিয়ায় ১৭,৫৭৪,৫০০ টন চিনি উৎপাদন করা হয়। ইহার মধ্যে ১০,২০৫,০০০ টন ইক্ষুজাত চিনি ও ৭,৩৫৯,৫০০ টন বিট চিনি। যুদ্ধের সময় চিনি উৎপাদনের হার খুব কমিয়া যায়। ১৯২১-২২ সন হইতে যুদ্ধের পূর্ব্বের মত চিনি উৎপাদন হইতে থাকে। ঐ সনে ১৭,৬৬২,০০০ টন চিনি জন্মে। ১৯২৪-২৫ সনে গোটা জগতের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২২,৭৮০,০০০ টন। ইহার মধ্যে ১৪,৬০০,০০০ টন ইক্ষু চিনি ও ৮,১৮০,০০০ টন বিট চিনি। ১৯২৮ সনে ১৯২৭ সনের চাইতে সাড়ে সতর লক্ষ টন চিনি বেশী উৎপাদিত হইয়াছে। ঐ সনে আড়াই কোটি টনের উপর চিনি জন্মিয়াছে। দুনিয়ায় এপর্য্যন্ত এরূপ অধিক পরিমাণ চিনি উৎপাদন করা হয় নাই। কিউবা ও জাভায় ইক্ষু চিনি বেশী উৎপাদন করা হইতেছে; মধ্য ইয়োরোপে বিট চিনি প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে। ইয়োরোপীয় বাজারে চিনি রপ্তানি লইয়া জাভার সঙ্গে কিউবার ঘোর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। কিউবা বর্ত্তমান বৎসরে ইক্ষু-উৎপাদনের নির্দ্দিষ্ট সীমাটা তুলিয়া দিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। ভারতবর্ষে ৩০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। দুনিয়ার আর সমস্ত দেশের চাইতে ভারতে ইক্ষুভূমি বেশী; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতকে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে বিদেশী চিনি আমদানি করিতে হয়। ইহার একমাত্র কারণ, ভারতের চিনি-শিল্প অন্যান্য দেশের অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

পরলোকগত বিধবাদের সম্পত্তি
বিলাতে ইন্‌ল্যাণ্ড রেভিনিউ রিপোর্টের হিসাব

গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ইন্‌ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনারদের এক রিপোর্টে বৃটিশদের সম্পত্তির কে কিরূপ উত্তরাধিকারী তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিধবারা যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ ১১৭৭৮০৫৪ পাউণ্ড; তন্মধ্যে একজন মহিলার অর্থ ৩৯৪৮২২৪৫ পাউণ্ড।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের কার কত সম্পত্তি তাহাও ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে।

পুরুষরা রাখিয়া গিয়াছেন ৩১৬৮০৭৪৮৫ পাউণ্ড (ইহা মোট সম্পত্তির শতকরা ৭০ অংশ) আর মেয়েরা..... ১৩৬৬৫২৪৮৯ পাউণ্ড (মোট সম্পত্তির ৩০ অংশ)। তন্মধ্যে একজন পুরুষ যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ ৪৮০৯৬২৮৬ পাউণ্ড।

গত বৎসর যে মৃত্যু-শুল্ক পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ ৭৭১০০৬২৪ পাউণ্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল ৬৭৪৬১৭৯১ পাউণ্ড। যে সকল ষ্টেট শুল্ক প্রদান করে তাহার সংখ্যা ১১৬৫০০। ইহাদের মূল্য অনূন ৫১১০৭০২১৪ পাউণ্ড হইবে।

প্রায় ২৪ লক্ষ লোক ইন্‌কম ট্যাক্সের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছে। যে সকল লোক ট্যাক্স ধার্য্যের যোগ্য তাহাদের পরিমাণ ২২৫০০০০। (বঙ্গবাণী)

জাপানের গৃহপালিত পশু (বৎসরের শেষে)

সন	গরু	ঘোড়া	ভেড়া	ছাগল	শূকর
১৯১৭	১,৩০৪,০০১	১,৫৬০,২৪২	৩,১৯২	১০৯,৯৬২	৩৫৯,৯৯৯
১৯১৮	১,৩০৭,১২০	১,৫১০,৬২৬	৪,৫৪৬	৯১,১৭৭	৩৯৮,১৫৫
১৯১৯	১,৩৪৪,৮৬৫	১,৪৭২,৬৮২	৪,৬৮৩	১২৮,৫০৪	৪৭০,০৮২

সন	গরু	ঘোড়া	ভেড়া	ছাগল	শূকর
১৯২০	১,০৭৬,০৪৯	১,৪৬৮,৪০৮	৮,৫১৯	১০০,২০২	৫২৮,১১২
১৯২১	১,৪০৯,৮০০	১,৫১৯,৭৮৫	৯,৭৪১	১৪১,৯৭৬	৪৯৯,৮৩৬
১৯২২	১,৪৫৯,২২৬	১,৫৭৬,১৭৯	১১,০৮৪	১৫০,৫৯৬	৫১১,৫৪৪
১৯২৩	১,৪৬৯,০১৯	১,৪৯১,৫৯১	১৪,৯৫০	১৫৮,৯৩৪	৬৬৭,৮২০
১৯২৪	১,৪৫৬,২৪০	১,৫৬৮,৬৮৫	১৫,৭১০	১৫৭,৮৫২	৭৪০,২৮০
১৯২৫	১,৪৫৯,৬৫০	১,৫৫৩,৩০৮	১৭,০৫৯	১৬৮,২৬৫	৬৭২,৫৮০
১৯২৬	১,৪৬৫,১৪৯	১,৪৮৬,৪৫০	১৭,৯০১	১৭৯,০৪৯	৬২১,৪৬৬

নিহত পশুর সংখ্যা (সারা বৎসরে)

সন	কসাইখানা	গরু ও বাছুর	ঘোড়া	শূকর
১৯১৭	৫২৩	২৭৭,৪৫৪	১০০,০৫৮	২৪৫,৭৭১
১৯১৮	৫২৬	২২৬,১০৮	৮৬,৮০০	৩২৭,০৭৪
১৯১৯	৫২৯	২৪২,১২৮	৭০,৪০০	৩৫৭,০৮৭
১৯২০	৫৩৮	২৭১,৯০৩	৬৩,২৫৫	৪১১,১৫৪
১৯২১	৫৩৮	৩০৩,৮২২	৬৪,৫০৫	৪৩৩,১৫৬
১৯২২	৫০৬	৩০৯,৮৫৯	৭১,৮২২	৩৫৯,৩৪৯
১৯২৩	৫৫২	৩০৭,৩৬৪	৭৩,৮৮২	৩৮৮,৬২৩
১৯২৪	৫৫৭	৩৪৪,৪৫০	৭৭,৪৪৫	৫৮৮,৯৬৭
১৯২৫	৫৭৬	৩১৮,৩১০	৭৭,০১১	৭৬৬,১৮৭
১৯২৬	৫৯৪	৩০১,৭৫০	৭৪,১৫৪	৫৯৭,২৬৪

জার্ম্মাণির শিল্পসঙ্কট

মাসাধিককাল স্থায়ী মালিক-মজুরের বিরোধের পর ওয়েষ্টফ্যালিয়ান লৌহ ইস্পাত কারখানাগুলির কাজ আবার গত জানুয়ারী মাস হইতে চলিতেছে। কিন্তু বিরোধের মূল কারণগুলি সম্বন্ধে এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। দুই পক্ষ কোন মীমাংসায় না আসিতে পারায় জার্ম্মাণ চ্যান্সেলর এই বিরোধে হস্তক্ষেপ করেন এবং জনৈক মন্ত্রীকে সালিশ নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রমিক মন্ত্রীকে সালিশ নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁহার মীমাংসা মালিকদের পছন্দসাফিক হয় নাই। সুতরাং তাহারা কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া দেয়।

অবশ্য এবারও যদি মালিকরা ইঁহার নিষ্পত্তি মানিয়া না চলে, তাহা হইলে তাহাদের সমূহ বিপদ হইবে। কারণ, ইতিমধ্যেই মোট শ্রমজীবীর তিন ভাগের একভাগ ট্রেড ইউনিয়নের খাতায় নাম লিখাইয়া দিয়াছে। মালিকরা তাহাদের ন্যায্য দাবী মানিয়া না লইলে, তাহারা একেবারে সরাসরি কমিউনিষ্ট দলে ভিড়িয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কা খুবই আছে।

রুঢ় প্রদেশে এরূপ অধিকদিন বিরোধ স্থায়ী হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণির ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে।

এই বিরোধ আরও কিছুকাল চলিলে জার্ম্মাণিকে কাবু হইতে হইবে। এই বিরোধের ফলে শিল্প কারখানায় দুর্ব্বলতা আসিয়া গিয়াছে। অনেক কারখানার কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে ১০ লক্ষ বেকারকে সাহায্য দিতে হইয়াছে। ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা

ছিল ৬ লক্ষ। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগ হইতে বেকার সমস্যা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গত শীতের সময় বেকারসংখ্যা অনুমান ১৫ লক্ষ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

এই শিল্প সঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ পুঁজির বাজারের অচলতা। জার্ম্মাণিতে টাকা বা পুঁজির অভাব হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে জার্ম্মাণি বিদেশী পুঁজির সাহায্য পাইয়াছিল বলিয়াই তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য খানিকটা চাঙ্গা করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ শিল্পবাণিজ্যের সঞ্জীবনের জন্য যে পরিমাণ পুঁজির আবশ্যক তাহা সরবরাহ করিবার ক্ষমতা জার্ম্মাণির নাই। আমেরিকা আর জার্ম্মাণিকে অল্প সুদে যত ইচ্ছা টাকা ধার দিতে রাজী নয়। আমেরিকা নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। জার্ম্মাণির লৌহ ইস্পাত কারখানাগুলির বিরোধ নিষ্পত্তি না হইলে এবং বিদেশী পুঁজির উপযুক্ত সাহায্য না পাইলে, তাহার বর্ত্তমান শিল্প-সঙ্কট আরও কিছুকাল স্থায়ী হইবে।

কানাডায় বার্কলেজ ব্যাঙ্ক

বিগত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ঘোষণা করা হয়, শীঘ্রই কানাডায় একটি নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহার নামকরণ হইবে বার্কলেজ ব্যাঙ্ক (কানাডা),—অর্থাৎ, বিলাতের অন্যতম বাঘা ব্যাঙ্কের ইহা হইবে একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কটির পুঁজি হইবে ৪ লক্ষ ডলার। ইহা বার্কলেজ ব্যাঙ্ক (ডমিনিয়নস্ কলোনিয়াল অ্যাণ্ড ওভারসীজ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। কানাডায় বার্কলেজ ব্যাঙ্কের একটা শাখা আগে হইতেই আছে, কিন্তু তাহা কেবল এজেন্সি ব্যাঙ্কেরই ক্ষমতা আছে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান আর্থিক জোট

বিগত ডিসেম্বর মাসে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিদের এক কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সুইডেনের "রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক" নরওয়ের "নর্জেস ব্যাঙ্ক" ও ডেনমার্কের "ন্যাশনাল ব্যাঙ্কেন-ই-কোবেন হাগেন" প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান আর্থিক ইউনিয়নের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করেন। ইহারা সকলেই ঐরূপ একটি ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং ঐ তিনটি দেশের স্বর্ণ-মুদ্রা কিভাবে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা যাইতে পারে সে বিষয়ে এক মোসাবিদা করেন। নোটের লেনদেন সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত থাকে; কারণ ৩টি দেশে রেট একরূপ নয়। তিনটি দেশের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককর্ত্তৃক প্রচলিত নোটকে সোনার টাকায় ভাঙ্গানোর এক কমিটি নিযুক্ত হয়।

বিলাতে গোচারণ মাঠ

পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের কিলমারনক নামক স্থানে একটি কৃষি কলেজের ফার্ম্ম আছে। এখানে ৫৫টি আয়ারশিয়ারের গাভী আছে। ইহাদের প্রত্যেকে গড়ে বছরে সাড়ে নয় হাজার পাউণ্ড বা একশ মণের উপর দুধ দেয়। এখানকার আরও ১০টী ফ্রিজিয়ান গাভীর প্রত্যেকে বছরে গড়ে সাড়ে দশ হাজার পাউণ্ড দুধ দেয়। এই ফার্ম্মে মোট ৬৫টি গাভী আছে।

ইহাদের চোরাকির জন্য ৪২ একর ঘাসের জমি আছে। ইহা ভারতের পতিত জমির মত নয়। এখানে যন্ত্রমত চাষ দিয়া উৎকৃষ্ট ঘাস উৎপন্ন করা হয়। এই ঘাসগুলি ৪ হইতে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা। ঐ সকল জমিতে আবার গোচারণেরও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। মোট ৪২ একর জমির উপরই প্রত্যেক দিন ৬৫টী গাভী বিচরণ করেনা। ৪২ একর জমি ৭ ভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক ছয় একর জমিতে ৪ দিন ধরিয়া ৬৫টী গাভী চরানো হয়। এইভাবে প্রত্যেক জমি খণ্ডে গাভীরা ২৪ দিন পরে পরে বিচরণ করে। এই সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট জমিগুলিতে ঘাস জন্মান হয়।

জাপানে স্ত্রী-মজুর

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সের সপ্তম অধিবেশনের (জেনেভা ১৯২৫) প্রস্তাবানুযায়ী বিগত কয়েক বৎসর হইতে আন্তর্জ্জাতিক লেবার আফিস হইতে এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশের শ্রম-অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান চালান হইতেছে। সম্প্রতি আরও এক আনুপাতিক,

পি এইচ ডি মহোদয় জাপানী শিল্প কারখানায় স্ত্রী মজুর সম্বন্ধে বিশদভাবে গবেষণা চালাইয়াছেন। তাঁহার বিবরণীতে দেখা যায় যে, জাপানের বস্ত্র শিল্প কারখানার কারিকর ও শ্রমিকদের শতকরা ৮০ ভাগ বালক ও স্ত্রী মজুর। তিনি আরও বলিতেছেন যে, সমগ্র জাপানে পুরুষ মজুরের চেয়ে মেয়ে মজুরের সংখ্যা বেশী।

১৯২০ সনের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, জাপানের মোট ৫৫৮ লক্ষ ৪৯ হাজার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৪৯ জন বা ২৭,০৮৯,০০০ জন লাভজনক কাজে নিযুক্ত আছে। ইহাদের পোষ্যের সংখ্যা ২৮৭ লক্ষ ৬০ হাজার বা শতকরা ৫১ জন। উপার্জ্জনক্ষম লোকদের শতকরা ৩৫ জন বা ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার জাপানী হয় প্রভুর মত অন্য লোক খাটায়, অথবা নিজেরাই নিজের বিষয় সম্পত্তি শিল্পকারখানা পরিচালনা করে। ১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার লোক ইহাদিগকে সাহায্য করে এবং অবশিষ্ট ১৫৯ লক্ষ ৭০ হাজার বা শতকরা ৫৯ জন পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পে কি হারে স্ত্রী ও পুরুষ মজুর আছে তাহা এইখানে দেখান হইল :—

শিল্প	স্ত্রী মজুর	পুরুষ মজুর
কৃষিতে	৫,৮৯৫,০০০	৩,১২৫,০০০
মৎস্য ব্যবসাতে	৪০,০০০	৩৪০,০০০
খনিতে	২৮,০০০	৩৪৮,০০০
কল কারখানার কাজে		
ব্যবসা বাণিজ্যে		
যান বাহনে		
মুটিয়া বা ঐ ধরণের স্বাধীন খাটুনির কাজে	১২২,০০০	১৪১,০০০
অন্যান্য কাজে	১৭৪,০০০	২৯১,০০০
মোট	৮,১৬৭,০০০	৭,৮০৩,০০০
	১৫,৯৭০,০০০	

উপরের তালিকা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, কৃষি কার্য্যে জাপানী মেয়েদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই জাপানে মোট পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় স্ত্রী শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। এই সম্পর্কে, আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মোট ১৫৯ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৯০ লক্ষ ২০ হাজারই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান দ্রুতগতিতে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্" বা কারখানা শিল্পের দিকে অগ্রসর হইলেও এখনও যে তাহা কৃষি-প্রধানই রহিয়া গিয়াছে তাহা এখান হইতেই প্রমাণিত হয়।

জাপানের মোট শ্রমিকের ½ ভাগ স্ত্রী-মজুর কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

গত ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসের জাপানী সেবার গেজেটে দেখা যায় যে, ফ্যাক্টরি, খনি ও যানবাহনে জাপানের ৪,৭০৪,০০০ জন মজুর খাটিতেছে; ইহাদের মধ্যে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার পুরুষ ও ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার মেয়ে। মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের ½ ভাগ।

১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসের অঙ্কগুলা এইরূপ :—

ফ্যাক্টরী	পুরুষ	স্ত্রী
সরকারী	১০৪,১৩৩	২৯,৪৩৪
মিউনিসিপালিটির	৪,৯২০	৮৪৯
ঐ *	১,৫৭৮	২৮৮
ব্যক্তিগত	৭১৫,১১৫	৮৫০,৪৭১
ঐ *	২৭০,৮৩৪	১২৮,৫০৮
মোট ফ্যাক্টরী	১,০৯৯,৫৮১	১,০০৯,৫৪০
খনিতে	২২৮,৬৭৮	৬৪,২০৭
ট্রান্সপোর্টে	২৯২,৮২৮	২৬,৭৭৪
সাময়িক শ্রমে	১,৪৩৭,৬৪৫	৪৪৪,৪৬৪
মোট	৩,১৪৮,১৩২	১,৫৪৫,০২৫
	৪,৭০৩,১৫৭	

* ১৯২৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের রিটার্ণ (রোডোকিয়ো বা জাপানী লেবার গেজেট,—এপ্রিল, ১৯২৮)।

কানাডার গমের বাজারে মন্দা

কানাডার গমের বাজারে একেবারে মন্দা পড়িয়াছে। প্রায় ১০০টি জাহাজ ভর্তার প্রতীক্ষায় বন্দরে বাঁধা আছে; কিন্তু ভর্তার আর আসিতেছে না। সাগর পারে একেবারে চালিয়া নাই। প্রায় ৫০ লক্ষ বুশেলও বেশী গম মন্ট্রিয়েল, পোর্ট কলবোর্ণ এবং লেক ঈরী টার্মিনালে পড়িয়া রৌদ্র উপভোগ করিতেছে। তাহা ছাড়াও বিস্তর গম জাহাজের খোলের মধ্যে পচিতেছে। কানাডাতে গত বৎসরের গমই প্রায় দুই কোটি মণ মজুত আছে। তাহাও রপ্তানির জন্য প্রস্তুত। কেবল ক্রেতা জুটিলেই হয়। এই সব কারণে এই সপ্তাহে উইনী-পেগ বাজারে গমের মূল্য প্রতি বুশেলে অর্থাৎ ১৷৷০ সেরে ১১ সেন্ট করিয়া কমিয়াছে। অপরদিকে লিভারপুলের বন্দরে কানাডার চেয়ে কম দরে আর্জেন্টিনা হইতে বিস্তর পরিমাণে গম আমদানি হইতেছে।

দুনিয়ার শক্তি সরবরাহ

রেল, ষ্টীমার, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি চালাইবার জন্য শক্তির দরকার হয়। এই শক্তি আসে কোথা হইতে? কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইতে এই শক্তি সংগ্রহ করা হয়। শক্তির এই নানা উৎসের মধ্যে কোনটার উপর মানুষ কি পরিমাণ নির্ভর করে? জগতের ৪৮টী দেশের প্রতিনিধি মিলিয়া ১৯২৬ সন হইতে এ বিষয়ে একটী অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন। তাঁহাদের রিপোর্টটী এখন বাহির হইয়াছে। রিপোর্টটী নানা জটিল সংখ্যারাশিতে ভরা। উহার সার কথা মোটামুটি এই যে, কয়লার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই কমিতেছে। জগতে এখনও যত কয়লা আছে তাহাতে ৩ হাজার বছর কাটিতে পারে। কিন্তু কয়লা যথেষ্ট থাকিলেও কয়লার ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। ১৯১৩ সনে যত পরিমাণ কয়লা সারা দুনিয়ায় খরচ হইত এখন তাহা অপেক্ষা ৩০ কোটি টন কয়লা কম খরচ হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, কয়লার প্রতিদ্বন্দ্বীরা (তেল, জল-শক্তি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি) ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ, বিদ্যুতের ব্যবহার খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে যত বিদ্যুৎ খরচ হইত এখন তাহার ৪ গুণ খরচ হইতেছে। বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ খরচের মোট পরিমাণ ১৯ হাজার কোটি ইউনিট? বিদ্যুতের ব্যবহার কেবল যে পাশ্চাত্যেই বাড়িতেছে তাহা নয়, প্রাচ্যের দেশগুলিতেও খুব বাড়িতেছে।

বিলাতে আকাশ ট্যাক্সি

লণ্ডনে হাইড-পার্ক-কর্ণার হইতে ১২ মাইল দূরে হ্যান্‌ওয়ার্থ নামক স্থানে ২টী এরোড্রোমের আড্ডা তৈয়ার হইয়াছে। প্রথমটী একটী এরোড্রোমের ন্যায়ের মেয়াদের ব্যবহার করিবে—সেইজন্য উহার নিকট নৃত্যকক্ষ, শয়নাগার, টেনিস ও ব্যাকেট কোর্ট প্রভৃতিও তৈয়ার হইয়াছে। দ্বিতীয়টীতে অনেকগুলা আকাশ-ট্যাক্সি থাকিবে। এখান হইতে বিলাতের যে কোন স্থানে যাইবার জন্য এরোপ্লেন পাওয়া যাইবে। ভাড়া অতি অল্প মাইল প্রতি মাত্র ১ শিলিং।

কাজ পাইবার জন্য হুড়াহুড়ি

সম্প্রতি বিলাতের বারমণ্ডসি সহরের ড্রেনের কাজ সম্পর্কে ২০০ লোক দরকার হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনে জানানো হইয়াছিল যে প্রত্যেককে মাহিয়ানা দেওয়া হইবে হপ্তায় ৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং করিয়া; কাজের মেয়াদ মাত্র ৩ মাস।

কর্ম্মপ্রার্থীদের স্থানীয় টাউনহলে যাইয়া আবেদন দাখিল করিতে বলা হইয়াছিল। যেদিন আবেদন লওয়া হইবে বলা হইয়াছিল, সেদিন ১ হাজার লোক বারমণ্ডসি টাউন-হলের বাহিরে জড় হইয়াছিল। আবেদন লইবার সময় ঠিক করা হইয়াছিল সকাল ৮টা, কিন্তু তোর ৪টা হইতেই ভিড় জমিতে সুরু হয়। ধাক্কাধাক্কির ফলে ১ জন লোক জখম হইয়াছিল।

৮টার সময় টাউনহলের দরজা খোলা হইলে হুড়মুড় করিয়া লোকগুলা ভিতরে ঢুকিল। তাহার পর, সেই হাজার লোকের প্রত্যেকের নাম এক এক টুকরা কাগজে টুকিয়া একটী বাক্সে রাখা হইল। বেকারদের চারজন

প্রতিনিধিকে ডাকিয়া আনিয়া নাম তুলিতে বলা হইল। প্রথমে যে ২০০ জনের নাম উঠিল তাহারাই কাজ পাইল।

বিলাতের বেকার-সমস্যা কিরূপ প্রবল তাহা উপরের বিবরণ হইতে বুঝা যায়।

জার্ম্মানির ফিল্ম শিল্প

জার্ম্মানির ফিল্ম শিল্প অতি অল্পদিনের—বছর কুড়ির বেশী নয়। অল্পদিনের হইলেও দেশের আর্থিক জীবনে এই শিল্প একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বে এই শিল্পে অগ্রণী ছিল ম্যাণ্ডিনেভিয়া, ফ্রান্স ও ইতালি; কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। দুনিয়ার বাজার এখন জার্ম্মানি ও মার্কিণ দখল করিয়া বসিয়াছে।

ফিল্ম শিল্পের বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবল বাজারের পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতমাত্রই নয়, আর্ট হিসাবেও এর দাম আছে। জার্ম্মাণ ফিল্মগুলা কোন না কোন বইকে ভিত্তি করিয়া গঠিত। দেশের বড় বড় লেখকেরা এই সমস্ত বই লিখেন। কোন নাটক পুরাবৃত্ত সাহিত্য গ্রন্থ হইতে বর্ণিত বিষয়টী লওয়া হয়। ফিল্ম শিল্প জনসাধারণের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। থিয়েটারের দর্শনী অত্যন্ত বেশী, তা ছাড়া সকলের বাহিরে এগুলি দেখিবার উপায় নাই। বায়োস্কোপের সাহায্যে পল্লীর লোকেরা বড় লেখকের লেখার বিষয়ও জানিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় ছবিতে দেখিয়া আনন্দও উপভোগ করে।

ফিল্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রথমতঃ লেখকের আর্টের শক্তির উপর এবং দ্বিতীয়তঃ অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যের উপর। জার্ম্মাণ অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্য প্রশংসনীয়; সুতরাং জার্ম্মাণ ফিল্মগুলাও সুন্দর হয়। ফিল্ম শিল্প অল্প ছাটাইতেছেও অনেকের। দেশের বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ফিল্ম ব্যবসায়ে কাজ না পাইলে বেকার বসিয়া থাকিত, না হয় দেশ ছাড়িয়া তাহাদিগকে বিদেশে যাইতে হইত।

জার্ম্মাণ ফিল্মগুলি বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক উপাখ্যান লইয়া গঠিত। দেশের বড় বড় লাইব্রেরী, পাঠাগার ইত্যাদি হইতে ফিল্ম প্রস্তুতকারীরা এ সম্বন্ধে সাহায্য পায় বটে। জার্ম্মাণ ফিল্ম আর্টিষ্টরা বর্ত্তমানের কাহিনীগুলি সমস্তে অর্জ্জন করিয়াছে। জার্ম্মাণ ফিল্মের নিজেরও একটা বিশেষত্ব আছে। শিক্ষাদানের কার্য্যেও ফিল্মকে জার্ম্মানিতে লাগান হইয়াছে। ফিল্মশিল্পের একটী বিভাগ কেবলমাত্র এই কাজেই যোগাইতেছেন। বিজ্ঞান শিখাইবার সময় শিক্ষণীয় বিষয়টীকে স্কুল কলেজের ছেলেদের নিকট মনোরম করিয়া তুলিতে, সাধারণ লোকদের সহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরিচয় স্থাপন করিতে বায়োস্কোপগুলি অনেক সাহায্য করিতেছে।

কয়েক বৎসর হইল জার্ম্মাণ ফিল্ম শিল্পের বিভিন্ন শাখাগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটী কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিয়াছে। ফিল্ম প্রস্তুতকারক, ফিল্ম ধার দেওয়ার কোম্পানী, ফিল্ম আমদানি রপ্তানিকারক, ফিল্ম ষ্টুডিওর মালিক, এবং বায়োস্কোপের মালিক—ইহারা সকলেই এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বায়োস্কোপ-দর্শকগণের উপর যে শুল্ক ট্যাক্স চাপানো হইয়াছে, তাহা তুলিয়া দিবার জন্য এই সমিতি চেষ্টা করিতেছে। বায়োস্কোপের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনরূপ আইনকানুন পাশ না হয়, কোন প্রকার শুল্ক বসাইবার চাপান না হয়, সেদিকে নজর রাখাও এই সমিতির মস্ত বড় কাজ। গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে একটী ডিপার্টমেণ্টও আছে, ফিল্ম-শিল্পের উন্নতির জন্য এই সমিতি তাহার সহিত একযোগে কাজ করিতেছে। ইয়ুর্প-আমেরিকা লাইনের বড় বড় ষ্টীমারগুলি উক্ত কোম্পানীরই বায়োস্কোপ দ্বারা সজ্জিত। উক্ত কোম্পানীর কেবল যে সব চেয়ে বেশী সিনেমা আছে তা নয়, অনেক বড় বড় এবং আধুনিকতম সিনেমাও এই কোম্পানীর তাঁবে আছে।

(১) দেশী

ভারতে কেরোসিন উৎপাদন

রয়াল সোসাইটি অব্ আর্টস্ তরফে পেট্রোলিয়াম টেক্‌নলজিষ্টস্ ইন্‌স্টিটিউশনের এক সভায় মিঃ এস, ভাড্‌লি ষ্ট্যাম্প বার্মার তৈলক্ষেত্র সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। মিঃ ষ্ট্যাম্প বলেন যে, সমগ্র দুনিয়ার উৎপন্ন তেলের ভারতীয় অংশটা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ১৯১২ সনে ভারতে দুনিয়ার তেলের ২·০৯%, উৎপন্ন হয়, কিন্তু ১৯২০ হইতে ১৯২৮ সনের মধ্যে ভারতের অংশটা শতকরা ০·৭ ভাগের নীচে কমিয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া লোকের ধারণা ছিল ভারতে অজস্র তৈল-সম্পদ্ গুপ্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই ধারণার মূলে কোনই সত্য নাই। যে সকল খনিতে কার্য্য চলিতেছে সেগুলিতে যথেষ্ট তৈল আছে বটে; কিন্তু নূতন বড় বড় খনির সেরূপ কোন সন্ধান মিলিতেছে না।

ভারতীয় মজুরের জীবন

বিলাতের খনির মজুরদের এক বিরাট সভাতে শ্রীযুক্ত আর্থার হার্টশর্ণ সম্প্রতি এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় খনির মজুরদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারতে এমন অনেক খাদে তিনি নামিয়াছেন, যেখানে পুরুষরা মাত্র ১০ পেনি বা ১ শিলিংএর জন্য দৈনিক ১০ ঘণ্টা খাটে এবং স্ত্রীলোকেরা ৭ পেনি বা ৮ পেনির জন্য আরও বেশী ঘণ্টা পরিশ্রম করে।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় মজুরদের মাহিয়ানাই যে কম আর তাহাদের জীবনযাপন-প্রণালীই যে অত্যন্ত ভীষণ—ভারতীয় মজুরের জীবন সম্বন্ধে ইহাই সমগ্র সত্য নহে। তাহাদের অজ্ঞতা অসাধারণ—ভারতের কোটি কোটি লোক লিখিতে পড়িতে জানে না। তা ছাড়া, মজুর-সঙ্ঘের আন্দোলন তাহাদের মধ্যে তেমন ব্যাপ্ত হয় নাই। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের মজুরদের যে সব দুর্দ্দশা ছিল, ভারতীয় মজুরেরা ঠিক সেই সব দুর্দ্দশাই ভোগ করিতেছে—উপসংহারে হার্টশর্ণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

ভারতে বিজলীর ব্যবহার বাড়ানো একান্ত দরকার

গত এপ্রিল মাসে শ্রীযুক্ত এ টি কুপার (ইনি বোম্বাই সহরের বিজলী সরবরাহ কোম্পানীর অধীনে অনেক দিন চাকরী করিয়াছিলেন) বিলাতের রয়েল সোসাইটী অব আর্টসের ভারতীয় বিভাগে একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"ভারতে বিজলী ব্যবহারের বৃদ্ধি।" ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাকচির অবস্থা কিরূপ ছিল এবং এখনই বা কিরূপ হইয়াছে। আগে কিরূপ রেলগাড়ী ও ইঞ্জিন ব্যবহার করা হইত এবং এখন বোম্বাই প্রদেশের বিজলী-চালিত রেলে কিরূপ গাড়ী ও ইঞ্জিন চালিত হয়, তাহা বায়স্কোপের সাহায্যে তিনি দেখাইয়াছিলেন। বিজলীর ব্যবহার বাড়িলে ভারতের অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা ঐ ছবিগুলা দেখিয়া বুঝা গিয়াছিল।

কলিকাতা ও জামসেদপুর কত পরিমাণ বিজলী খরচ করে তিনি তাহার তুলনা করিয়াছিলেন। জামসেদপুরের লোকসংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ। কলিকাতার লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ, অথচ জামসেদপুর কলিকাতারই সমান (প্রতি বৎসর ১৫ কোটি ইউনিট) বিজলী ব্যবহার করে।

ভারতের শ্রমিকেরা নিয়মিতভাবে কাজ করে না। এই জন্য কারখানাওয়ালাদের বেশ পাইতে হয় বলিয়া। শ্রীযুক্ত কুপার বলেন যে, এই কারণে কারখানাওয়ালারা যাহা হইবার বাষ্পের শক্তি অপেক্ষা বিজলীর উপর নির্ভর করিবে। বস্তুতঃ, ইহা ছাড়া আরও নানা কারণে ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য বিজলীর ব্যবহার বাড়ানো একান্ত দরকার।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের আয়

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কলিকাতাস্থ পরামর্শদাতা কমিটির গত অধিবেশনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট বলেন যে, ১লা এপ্রিল হইতে ২৭এ এপ্রিলের মধ্যে গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর ৯½ লক্ষ টাকা আয় কম হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী এবং সাধারণ পণ্য দ্রব্য কম হওয়ার দরুণই আয় কমিয়াছে। কয়লার চালান বাড়িয়াছে। কয়লার জন্য ৪½ লাখ টাকা আয় বাড়িয়াছে।

দুর্গাপূজার জন্য যে কন্‌সেশান টিকিট বেচা হয় তাহা ৭ দিন অবধি চলে। এজেণ্ট বলেন যে, ঐ টিকিট যাহাতে ৮ দিন অবধি চলে তাহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিটের দাম সাধারণ ভাড়ার ১½ গুণের স্থানে ১¾ গুণ করিবার কথা আলোচিত হয়। এজেণ্ট বলেন যে, ইতিপূর্ব্বে ভাড়া কমানো হইয়াছে; ভাড়া কমানোর জন্য যাহা লোকসান হইয়াছে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া তাহার যতক্ষণ না পরিপূরণ হইতেছে, ততক্ষণ আর ভাড়া কমাইবার কথা আলোচিত হইতে পারে না।

কয়লার ভাড়া কমাইবার কথা হইয়াছে। কিন্তু কবে থেকে কম হারে ভাড়া আদায় করা হইবে সে সম্বন্ধে এজেণ্ট কোন খবর দিতে পারিলেন না।

২টি নূতন ট্রেনিং কলেজ

গবর্ণমেণ্ট দুইটী নূতন ট্রেনিং কলেজ খুলিতেছেন, এরূপ শুনা যাইতেছে। একটী পুরুষদের জন্য, অপরটি নারীদের জন্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাট স্কুল আছে প্রায় ১ হাজার। বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক স্কুলে ৪ জন গ্রাজুয়েট অথবা ট্রেনিং কলেজ হইতে পাশ করা শিক্ষক চাই। ঢাকা ট্রেনিং এবং হেয়ার ট্রেনিং নামে বর্ত্তমানে পুরুষদের জন্য মাত্র দুইটী ট্রেনিং কলেজ আছে। ১৪০ জন মাত্র এই কলেজ দুইটীতে শিক্ষা পাইতে পারে। তদুপরি ২০টী ছাত্র আসাম হইতে লওয়া হয়।

ট্রেনিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য প্রতি বৎসর বহু ছাত্র আবেদন করে; কিন্তু স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকেরই হতাশ হইতে হয়।

নারী শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার জন্যও মাত্র দুইটী কলেজ আছে—ডাইয়োসিসান এবং বেথুন হাউস।

(২) বিদেশী

অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক পুস্তকসমূহের বিরাট গ্রন্থবিবরণী প্রস্তুতের চেষ্টা

১৯২৫ সনে "দি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্ অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্স" হইতে ঘোষিত হয় যে বৃটিশ লাইব্রেরি অব্ পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিকস্ সায়েন্সে যত পুস্তক ও পুস্তিকা আছে তৎসমুদয়ের একখানি গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা হইবে। পরে কার্য্যের আয়তন আরও বাড়ান হইয়াছে। কারণ লণ্ডন সহরের ধনবিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য পুস্তকাগারের পুস্তকগুলাও উক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করা হইবে স্থির হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডস্মিথস্ লাইব্রেরি অব্ ইকনমিক লিটারেচার নামক পুস্তকাগারের গ্রন্থসমূহ, রয়াল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ সোসাইটি ও রয়াল অ্যাথ্রোপলজিকাল সোসাইটি, এই দুইটী সমিতির পুস্তকাগারের ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি এবং ইউনিভার্সিটি কলেজের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত

করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রায় ৭৫০,০০০ বিভিন্ন বিষয় এই গ্রন্থপঞ্জীর ভিতরে স্থান পাইবে। গ্রন্থপঞ্জীখানির নাম রাখা হইবে "এ লণ্ডন বিব্লিওগ্রাফি অব্ দি সোস্যাল সায়েন্সেস্" অর্থাৎ 'লণ্ডন সমাজ বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী'। এই বৎসরের প্রথম দুই মাসের ভিতরেই বইখানি ছাপান সুরু হইবে, এবং তাহার কিছু পরেই প্রকাশ হইবে। গ্রন্থখানি চারখণ্ডে বিভক্ত হইবে, এবং পাতার সংখ্যা হইবে কমসে কম ৫০০০। গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম তিন খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের বিষয়াদির বর্ণানুক্রমিক পরিচয় প্রথম তিন খণ্ডে পাওয়া যাইবে। শেষের-খণ্ডে গ্রন্থকার গণের বর্ণানুক্রমিক পরিচয় মিলিবে। এই বৎসরের ১লা মের পূর্ব্বে গ্রাহক হইলে মূল্য পড়িবে ৫ গিনি; ১লা মের পরে গ্রাহক হইলে মূল্য পড়িবে ৬ গিনির কম নয়। গ্রন্থের প্রথম ও ভাগ বাহির হইবার ১ বৎসরের মধ্যে যে সব অতিরিক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবে তাহার জন্য প্রাথমিক চাঁদাদাতাগণকে অতিরিক্ত কিছুই দিতে হইবে না। লাইব্রেরিয়ান, দি লণ্ডন স্কুল অব্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স্, হাঙ্টন ষ্ট্রীট, অলড্উইচ, লণ্ডন—এই ঠিকানায় বইয়ের অর্ডার পাঠাইতে হইবে।

ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান টেলিগ্রাফ কোম্পানী

গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে লণ্ডনের ১৮নং ওল্ড ব্রড্ ষ্ট্রীটে ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান কোম্পানীর দ্বিষষ্টিতম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় উক্ত কোম্পানীর সভাপতি শ্রীযুক্ত এইচ্ এল এম ষ্টিভেন্স যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম্ম দেওয়া যাইতেছে ঃ—

যে সব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের জমির ভিতর দিয়া উক্ত কোম্পানীর তার গিয়াছে তাহাদের সহিত কোম্পানীর সম্বন্ধ গত বৎসর (১৯২৮) ভালই ছিল। গত বৎসর কাজ ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। কেবল ক্রিমিয়াতে তুষারপাতের জন্য কাজ একবার বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে কাজ বেশীদিন বন্ধ থাকে নাই। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে তার যোগাইয়াছিলেন তাহার সাহায্যে অনেক দিনের মধ্যেই আবার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কৃষ্ণ সাগরের তারের সাহায্যে বার্ত্তাপ্রেরণ সারা বৎসরই চলিয়াছিল। কোন গোলমাল হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে একবার তার কাটিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা শীঘ্রই জোড়া দেওয়া হয়। করাচি ও লণ্ডনের মধ্যে এবং ইয়োরোপে পারস্য ও ভারতের প্রধান লাইনগুলায় সংবাদ প্রেরণের গড়পড়তা সময় সন্তোষজনক ছিল। বিশুদ্ধভাবে সংবাদ প্রেরণে কোম্পানীর সুনাম একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কোম্পানীর লাইনের নানাস্থানে রিজেনারেটর বসাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। করাচি ও লণ্ডনের মধ্যে একটী লাইনে সংবাদ একই সময়ে দুই দিক্ হইতেই পাঠানো হইতেছে। ইহাতে সংবাদ প্রেরণের গতি-বেগ আরও বাড়িয়াছে। ইয়োরোপ, পারস্য ও ভারতের মধ্যে সংবাদ প্রেরণের বন্দোবস্ত আরও উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বাসিন হইতে একটী পৃথক লাইন আছে।

১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনে আয় ২৬,৩০০ পাউণ্ড কমিয়াছিল। ব্যয়ও ৫,১০০ পাউণ্ড কমিয়াছিল। ব্যয় আরও কমাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। রুশিয়া ও পোল্যাণ্ডে লাইন পুনর্নির্ম্মাণের জন্য, লাইনের পারস্য বিভাগের খরচার জন্য এবং জমিজমা ক্রয়ের জন্য মোট ১৫০০০ পাউণ্ড সরাইয়া রাখা হইয়াছে। শতকরা ৭ হারে ডিভিডেণ্ড এবং প্রতি শেয়ারের জন্য ১৫ শিলিং (করমুক্ত) হিসাবে বোনাস (অর্থাৎ শতকরা ৩ হারে)—মোট শতকরা ১০ হারে অংশীদারদের লাভ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। যাহারা কোম্পানীর চাকরীতে বৃদ্ধ হইয়া অবসর গ্রহণ করে, তাহাদের জন্য যে ফাণ্ড হইয়াছে, তাহাতে ১৫ হাজার পাউণ্ড জমা দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত খরচগুলা বাদ দিলে ১৪,৮৬৭ পাউণ্ড ৮ শি, ৩ পে বাকী থাকে। এই টাকাটা ১৯২৯ সনের হিসাবে লইয়া আসা হইয়াছে। ১৯২৭ সনের শেষে বাঁচিয়াছিল ১৯ হাজার পাউণ্ড। ইহার তুলনায় ১৯২৮ সনে যাহা বাঁচিয়াছে, তাহা অত্যন্ত কম। কিন্তু ১৯২৭ সনে যাহা বাঁচিয়াছিল, সাধারণতঃ কোন বৎসরই অত টাকা বাঁচে না।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা—বিলাতে ও বিলাতের বাহিরে—সর্ব্বত্রই বেশ দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছিল।

কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে অন্তত—টেহেরান লাইন যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল তাহা চলা অসম্ভব হইত।

দুনিয়ার ডেয়ারী কংগ্রেস

গত সনে আষাঢ় মাসে লণ্ডন সহরে দুনিয়ার ডেয়ারী কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ৩৭টী জাতির তরফ থেকে দুই হাজার প্রতিনিধি ঐ বিশ্বসম্মেলনে যোগদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক ডেয়ারী কেমিষ্ট (রাসায়নিক), জীবাণু-বিশেষজ্ঞ, পশু বিশেষজ্ঞ, পশু গবেষক প্রভৃতি সকল রকম লোকই ছিলেন। অনেকেই স্ব স্ব দেশের গবর্ণমেণ্টের অথবা পশু-পরীক্ষাগারের তরফ হইতে ঐ কংগ্রেসে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য আগমন করেন। এ ছাড়া নিউজিলাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে অনেক চাষী গৃহস্থ নিজেদের খরচায় ঐ বিশ্বমেলায় আসিয়া যোগ দেন। ইঁহাদের অনেকের ডেয়ারী বড় বড় সহরে প্রভূত পরিমাণে দুধ সরবরাহ করে।

ফরাসী, ইংরাজী ও জার্ম্মাণ এই তিন ভাষায় সভার কাজ পরিচালনা করা হয়। অনেক তথ্যপূর্ণ রচনাসম্ভার ঐ অধিবেশনে পঠিত হয় এবং ঐগুলি লইয়া তুমুল আলোচনা হয়।

প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ডের বিভিন্ন দুগ্ধ উৎপাদনের ডাঁটী বা গো-শালাগুলি পরিদর্শন করেন। বিলাতের গো-শালা বা ডেয়ারীগুলি দেখিলে বাস্তবিকই চোখ জুড়ায়। ঐ সকল ডেয়ারীতে কি সুন্দর সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গাভী পালন করা হয়। তাহাদের বাসস্থান কি পরিষ্কার ঝিটকাট্! তাহাদের আহারের কত সুবন্দোবস্ত! দুগ্ধদোহন ও সহরে দুগ্ধ সরবরাহের পদ্ধতি বিশেষরূপে বিজ্ঞানসম্মত।

পবিত্র জীবাণুপূত দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ইংরেজ গোয়ালারা বদ্ধপরিকর। ভারতের গোয়ালার মত ইংরেজ গোয়ালা গাভীর বাঁট হইতে দুধের শেষ ফোঁটাটী বাহির করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না; আবার গাভীর বাঁটগুলি কি-উপায়ে দুগ্ধ-ভারাক্রান্ত হইবে তাহার দিকে ইংরেজ গোয়ালার তীব্র দৃষ্টি আছে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে সে গাভীর উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্যের বন্দোবস্ত করে। গোচারণের মাঠে গাভী যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পায় তাহার ব্যবস্থা করে। বিলাতের গোয়ালারা গরুর খাদ্যের জন্য স্বতন্ত্র জমিতে চাষ করিয়া তাহা ঘাস বা অন্য খাদ্য শস্য উৎপন্ন করে।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ এ সকলই স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের অর্থ নৈতিক মতামত

[স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে আমার উপরি উক্ত বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম নিম্নরূপ।—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত]

প্রঃ—এখন কি বিষয়ে গবেষণা করা আপনার মতে সর্বাপেক্ষা সুসঙ্গত ?

উঃ—বাংলার পাট একটা মস্তবড় জিনিষ, এই নিয়ে যদি অনুসন্ধান চালানো যায় তবে একটা বড় কাজ হয়।

প্রঃ—কিরকমভাবে অনুসন্ধান চালাতে বলেন ?

উঃ—তিনটে দিকে অনুসন্ধান চালাতে হবে। প্রথমতঃ, উৎপাদন সম্বন্ধে। চাষীরা পাট তৈরী করতে কত খরচ পড়ে, কত দরে এবং কাদের কাছে তারা বেচে, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান। ফ্যাক্টরীতে মজুররা কি রকম ভাবে থাকে, কত রোজগার করে, কি রকম ব্যবহার পায় ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, বাজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান। আমাদের দেশের কাঁচা পাট চট ইত্যাদি কাদের হাত দিয়ে জগতের কোন্ কোন্ দেশে কত দরে বেচা হয়, সে বিষয়েও খোঁজ নিতে হবে।

প্রঃ—বই ও রিপোর্টে এ সব খবর পাওয়া সম্ভব হবে কি ?

উঃ—পাটকলওলার বার্ষিক রিপোর্টগুলা থেকে কিছু কিছু সহায়তা হবে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ খবরই ঘুরে সংগ্রহ করতে হবে। পাটকলের শ্রমিক-সঙ্ঘের নেতাদের কাছে অনেক ভেতরকার দরকারী কথা জানা যাবে। পাটের দালাল ও গাঁয়ের চাষীদের কাছে গিয়ে বাকী খবর সংগ্রহ করতে হবে।

প্রঃ—দেখছি এ অনুসন্ধানটা নিতান্ত সোজা ব্যাপার হবে না : এর জন্যে রীতিমত সময় ও টাকা খরচ করা দরকার ; তাই নয় কি ?

উঃ—তা সত্যি।

প্রঃ—পাট সম্বন্ধে অনুসন্ধানটা এত প্রয়োজনীয় মনে করেন কেন ?

উঃ—আমাদের দেশটাকে যদি বাঁচাতে হয়, তা সম্ভব হবে কেবল চাষের ভেতর দিয়ে। আমার চাষের জিনিষের মধ্যে পাট হচ্ছে প্রধান। পাট ভারতের একচেটে। পাটের সাহায্যে দেশটাকে অনেকটা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

প্রঃ—পাটের সাহায্যে দেশটাকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব ! কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

উঃ—পাটকলওয়ালারা পাট বেচে কি বিপুল লাভ করছে, শতকরা ২০০৲।৩০০৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেয়। অথচ যারা পাট উৎপন্ন করছে সেই চাষীরা ভাল ক'রে খেতে পরতেও পায় না। এই চাষীদের সমবায় সমিতির সাহায্যে (বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক,) যদি সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তা হলে তারা কম দামে পাট ছাড়বে না, বেশী দাম চাইবে। পাটকলওয়ালারাও বাধ্য হয়ে তাই দেবে, কারণ, তারা যদি শতকরা ২০০৲।৩০০৲ টাকা হারে লাভ না পেয়ে, শতকরা ২০৲।৩০৲ হারে লাভ পায় তা হলেও তারা কারখানা বন্ধ করবে না। শতকরা ২০০৲।৩০০৲ হারে লাভ কোন কারখানাওয়ালাই

সাধারণতঃ আশা করতে পারে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেই তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল করতে পারবে। আর, তাদের অবস্থা ভাল হওয়া মানেই বাংলাদেশের একটা মোটা ভাগ লোকের অবস্থা ভাল হওয়া।

প্রঃ—পাট যেন আমাদের একচেটে, সুতরাং পাট আটকে রেখে এর দর বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য কৃষিজাত জিনিষের যোগান আটকে রেখে দর বাড়ানো কি সম্ভব?

উঃ—হাঁ, তাও সম্ভব। গম, চাল প্রভৃতির চাহিদা সম্বোচ প্রসার-শক্তিহীন (অর্থাৎ চাহিদার প্রকৃতি এ রকম যে এদের যোগানের পরিমাণ কিছু কমালেই দর খুব বেশী বেড়ে যায়)। এদের যদি যোগান আটকানো যায় তা হলে এদের চাহিদা "ফিক্‌টিক কোয়াটিটি"তে বাড়বে। সুতরাং, চাষীরা অনেকটা লাভ করতে পারবে।

প্রঃ—সমূহ-ধর্মঘটের দ্বারা দেশে উন্নতি কতদূর সম্ভব?

উঃ—ধর্মঘটের দ্বারা দেশটা বেশী অগ্রসর হতে পারবে বলে মনে হয় না। ধর্মঘট বড় বায়সাপেক্ষ অস্ত্র। ওটা যত কম ব্যবহার করা হয় ততই ভাল। ধর্মঘটের সোজাসুজি কুফল—কাজের ঘণ্টা নষ্ট, মাহিয়ানা লোকসান—তা ত' আছেই, এর অন্য কুফলও আছে। ধর্মঘটের ফলে মজুররা যে প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কিছু খেতে পরতে পায়ছিল, তাকেই ধ্বংস করা হয়—ধর্মঘট করাটা হচ্ছে যে হাঁসটা সোণার ডিম পাড়ছিল, অতিলোভে তাকেই মেরে ফেলার মত মুর্খামি।

এই যেখনা "বিলাতে" সাধারণ ধর্মঘট করলে, কিন্তু তা সফল হল কি? বরং তার ফল হল এই যে, ওদের ঐ যে প্রকাণ্ড ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেস—যার পেছনে পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে—অত বড় প্রতিষ্ঠানটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে বল্লেই হয়। প্রত্যুত্তি-সূচক ধর্মঘট কড়া আইন ক'রে বন্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক কাজের জন্যে চাঁদা নেওয়া বন্ধ করেছে। এই সমস্তর জন্যে ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা খুব কমে গেছে।

প্রঃ—বিলাতে সাধারণ ধর্মঘটটা বিফল হ'ল কেন?

উঃ—তার কারণ অতি সোজা—বিলাতের লোকসংখ্যার অধিকাংশ বেশ আরামে থাকে। এদের প্রত্যেকেরই কমবেশী পুঁজি আছে, এরা সকলেই ছোট খাটো পুঁজিপতি। সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক গড়নটা বদলাবার পক্ষে তারা কখন মত দিতে পারেই না, বরং তারা প্রাণপণে সমাজের বর্ত্তমান গড়নটাকে বজায় রাখতে চেষ্টা। বিলাতের অল্পসংখ্যক লোকই ভাল ক'রে খেতে পরতে পায় না। এরাই বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট, এরাই কেবল ধর্মঘট করে বা জোরজার করে বর্ত্তমান আর্থিক বন্দোবস্তগুলা উলটে দিতে চায়। এদের চেষ্টাতেই গতবারের সাধারণ ধর্মঘটের সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে সমাজের বেশীর ভাগই অল্প-বিস্তর ধনী, সেখানে সাধারণ ধর্মঘট করা মানে সমাজকেই আঘাত করা, সমাজের অধিকাংশেরই সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণা করা। এর ফলও হল ভীষণ—প্রায় সমস্ত দেশটাই ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো—ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসও প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল।

প্রঃ—আপনার মত যখন এই যে, যে দেশে ধনী বেশী সে দেশে সার্ব্বজনীন ধর্মঘট টিঁকতে পারে না, তা হলে যে দেশে গরীব বেশী সে দেশে সার্ব্বজনীন ধর্মঘটের খুব সুযোগ আছে। সুতরাং, আপনার মতে দরিদ্র-প্রধান ভারতবর্ষ এই অস্ত্র প্রয়োগের একটা ক্ষেত্র?

উঃ—না, ভারতবর্ষের পক্ষে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের লোকেরা এতদূর অসাড়, নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে যে সার্ব্বজনীন ধর্মঘটের জন্যে এদের সঙ্ঘবদ্ধ করা অসম্ভব। এদের যদি বলা যায়, "তোরা মরছিস্ যে, জাগ্‌না কেন।" এরা বল্‌বে, "মরবার জন্যেই ত' আমরা জন্মেছি। বাঁচবার ত' আমাদের দরকার নেই।" দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা মুখ বুজে সইবার এত সহিষ্ণুতা জগতে আর কোথাও

দেখা যায় না—সহিষ্ণুতাই ত এদের সর্ব্বনাশ করেছে। মায়াবাদের তত্ত্ব এদের শিরায় শিরায় চোকার ফলে এরা আরও অকর্ম্মণ্য হয়ে উঠেছে। এই সব লোক নিয়ে কি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট চলে?

প্রঃ—মহাত্মা গান্ধী ত' অনেকটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটেরই পক্ষে। তাঁর কার্য্যকলাপ আপনার কেমন লাগে?

উঃ—মহাত্মা গান্ধী প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি, অদ্ভুত ত্যাগ তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনিও একটা মস্ত ভুল করছেন। চরকা ও রাজনীতির মধ্যেও তিনি ধর্ম্মকে টেনে এনেছেন। ধর্ম্ম কিছু মন্দ জিনিষ নয়। ধর্ম্মের সার জিনিষটাকে খুবই শ্রদ্ধা করি—কিন্তু ধর্ম্মের কুসংস্কারগুলাকে ত সমর্থন করতে পারি না। গান্ধীর শিক্ষার ফলে এই কুসংস্কারগুলা বৃদ্ধি হয়েছে।

প্রঃ—গোড়ার কথাটাতেই আবার ফিরে আসছি। তা হলে আপনার মত হচ্ছে এই যে, ভারতের আর্থিক অবস্থা ভাল করতে হলে চাষের উন্নতি ও চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করাটা একান্ত দরকার?

উঃ—হাঁ, ঠিক তাই। চাষ হিসাবে ভারতবর্ষ যে বড় এটা আমাদের হাতে একটা মস্তবড় অস্ত্র। এই অস্ত্রটা বুদ্ধিমানের মত প্রয়োগ করতে পারলে দেশটাকে অনেক দূর অগ্রসর করা সম্ভব।

প্রঃ—দেশের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির পক্ষে পুঁজিতন্ত্রকে বাধা বলে গণ্য করা উচিত কি?

উঃ—নিশ্চয়। শুধু পুঁজিতন্ত্র নয়, জমিদার-তন্ত্রও বটে। এ দুটা না থাকলে, বিজ্ঞানের ইতিমধ্যে যত উন্নতি হয়েছে, তাতে তার করে খেতে পরতে পারার জন্যে দৈহিক শ্রম ঘণ্টায় বেশী খাটবার দরকার নেই।

প্রঃ—জনসাধারণ খুব কম খাটে, এটা কি খুব বাঞ্ছনীয়?

উঃ—নিশ্চয়। যদি অল্প খাটুনিতে জীবিকা অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, তবে সকলেই খাওয়া পরার চিন্তাতেই দিনরাত না কাটিয়ে, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, ধর্ম্ম প্রভৃতি—যার যাতে প্রবৃত্তি আছে—তার আলোচনায় সময় দিতে পারবে। তাতে প্রত্যেকেই আনন্দ পাবে অফুরন্ত, সমাজেরও উন্নতি হবে যথেষ্ট।

প্রঃ—আপনি এদেশের লোকের অভাব বাড়াবার পক্ষপাতী, না কমাবার পক্ষপাতী?

উঃ—অন্য দেশে লোকের অভাব আকাঙ্ক্ষা এত বেশী যে তা কমানো দরকার হয়েছে, কিন্তু ভারতের লোক-গুলার অভাব-বোধ এত কম যে তা জাগিয়ে তোলা দরকার হয়েছে।

প্রঃ—আপনি এ পর্য্যন্ত যে সব কথা বলেছেন তাতে মনে হয় যে ভারতের জাগরণের উপায় হচ্ছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সঙ্ঘবদ্ধতার প্রণালী আয়ত্ত করা। ভারতবর্ষের কি তা হলে জগৎকে দেবার মত কিছুই নেই?

উঃ—আছে বই কি। ভারতবর্ষে এমন কতকগুলা জিনিষ আছে যা জগতের আর কোথাও নেই। মোটা উদাহরণ দিচ্ছি। ভারতবাসী অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি। বিরোধের পর শীঘ্রই শান্তির ভাব আনা কেবল ভারতবাসীর পক্ষেই সম্ভব। জগতের সর্ব্বত্রই আজ জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ চলেছে, সংগ্রাম যখন বাধবে তখন তা নির্ম্মমভাবেই চলবে। সেই সংগ্রামের পর মিলন-সময় আনা বড় সহজ হবে না। তা আনতে পারবে কেবল ভারতেরই লোক। তারপর, অন্য দেশে ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখা হয়, এর ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিছক উচ্ছৃঙ্খলতায় দাঁড়াতে পারে। ভারতবর্ষে সমাজকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখা হয়। তার ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিছু কিছু বাধা পায়। সেইজন্য ভারতেও পশ্চিমের মতই ব্যক্তিত্ব খানিকটা পুষ্ট হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-প্রাধান্যের কুফলের বন্ধুর কেবল ভারতই যোগাতে পারে। ভারতবর্ষের আরও একটী দেবার জিনিষ আছে—সেটী হচ্ছে সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম-দর্শনের সাধনা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব উপলব্ধি—এটা ভারতেই সম্ভব হয়েছে। এটা ভারতেরই একচেটে জিনিষ, আর এটা জগতের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকও বটে।

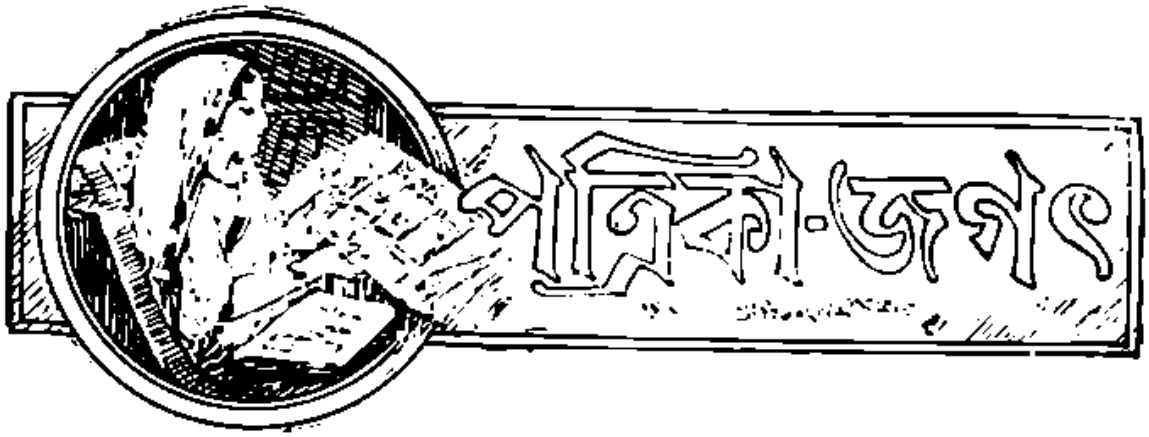

"ইকনমিক জার্ণাল" ; জুন ১৯২৮

(১)

মার্কিণ শিল্পগুলার কি দুর্দ্দিন উপস্থিত ?

১৯০০ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন বৎসরে গড়ে শতকরা ৩ হারে এবং লোক-বৃদ্ধি বৎসরে গড়ে শতকরা ১½ হারে বাড়িয়াছিল। লোক-বৃদ্ধি অপেক্ষা উৎপাদন-বৃদ্ধি বেশী হওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অসামান্য ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ।

উৎপাদন-বৃদ্ধির কারণগুলা কি ? সংক্ষেপে সেগুলা বিবৃত করা যাইতেছে :—(১) ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ডের সুব্যবস্থায়—মুদ্রা ও কর্জ্জের পরিমাণ দরকার হইলে বাড়ানো হয়, আবার দরকার শেষ হইলেই কমানো হয় ; (২) মাল বেশী পরিমাণে জমা করা হয় না, চাহিদা বাড়িলে তখনি মাল উৎপন্ন করা হয় ; (৩) বিক্রয় বাড়াইবার জন্য, অর্থাৎ খরিদ্দারদের বিশেষ বিশেষ জিনিষ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করাইবার জন্য যথেষ্ট খরচ করা হয় ; (৪) সকল সময়েই উন্নততর কলকব্জার সহায়ে উৎপাদনের খরচা কমাইবার চেষ্টা করা হয় ; (৫) যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য পেশাদারী 'উদ্ভাবক' আছে, তাহারা কখন কি নূতন জিনিষ উদ্ভাবন করিতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখা হয় ; এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাগুলা কাজে লাগানো হয় ; (৬) যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসরই কলেজ হইতে অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়নবিৎ বাহির হয়, কলেজ হইতে নূতন পাশ করা লোকদের বেশী মাহিয়ানা দিতে হয় না, কোথায় কি ভাবে খরচা কমানো যাইতে পারে সে বিষয়ে চর্চ্চা করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়নবিদ্‌দের দলে দলে ভর্ত্তি করা হয় ; (৭) পুঁজির অভাব নাই—ধনীদের টাকা এত বেশী যে তাহাদের সমস্ত অভাব ও খেয়াল মিটাইতেও তাহাদের আয়ের খুব অল্প ভাগই খরচ হয়, বাকী ভাগ শিল্পে খাটানো ছাড়া উপায় নাই ; শিল্পগুলাও তাহাদের লাভের সবটাই অংশীদারদের দেয় না—তার একটা মোটা ভাগ (শতকরা ৩০ হইতে ৪০) শিল্পগুলাতে আবার খাটানো হয় ; (৮) খরচ কমাইবার জন্য শিল্পগুলা সুবিধা বুঝিলেই সঙ্ঘবদ্ধ হয় ; (৯) সকল সময়েই বিবিধ নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতেছে ; যেমন, রেডিও উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা রেডিও শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

১৯২৭ সনের শেষে শিল্পগুলার লাভের হার কমিয়া যায়, বেকারের সংখ্যাও বাড়ে। ইহার অর্থ কি ? যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দ্দশার দিন কি আরম্ভ হইতেছে, শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা সুরু হইতেছে কি ?

শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা যে সব সাধারণ কারণ হইতে উদ্ভূত হয় (যেমন মুদ্রা বা কর্জ্জের অত্যধিক বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে মাল উৎপাদন, অসংখ্য কারবার ফেল হওয়া ইত্যাদি) তাহাদের একটীও যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না। লাভের হার কমিবার ও বেকারবৃদ্ধির কারণগুলা তাহা হইলে কি ?

বলা হইয়াছে, শিল্পগুলাকে উন্নত করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিতেছে, উন্নততর কলকব্জা সৃষ্টি হইলেই তাহার সাহায্য লওয়া হইতেছে। প্রত্যেক কারবার ছোট হইতে বড় এবং আরও বড় হইতে চেষ্টা করিতেছে, বড় কারবারগুলা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে—

অর্থাৎ শিল্প-জগতে সকল সময়েই একটা ওলটপালট চলিতেছে। এই সব নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শিল্পগুলা খাপ খাওয়াইতে বেশ পাইতেছে বলিয়াই ১৯২৭ সনের শেষে উহাদের একটু দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। এই ধরণের দুরবস্থার শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই, ইহা উন্নতিরই পরিচায়ক এবং ইহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না।

অবশ্য, অল্পাধিক এগুলাও ঐ সাময়িক দুরবস্থার জন্য আংশিকভাবে দায়ী, একথাও ভুলিলে চলিবে না।

ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর বিলাতের শিল্পসমূহের অবস্থা

ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পগুলাতে অনেক ওলটপালট দেখা দিল। কিন্তু বিলাতের গভর্মেণ্ট তখন আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত, ঘরোয়া ঘটনার দিকে নজর দিবার তত সময় ছিল না। এবিষয়ে বেসরকারী চেষ্টা দরকার বুঝিয়া বিলাতের উদারনৈতিক দল একটী কমিটি নিয়োগ করেন। শিল্পগুলার অবস্থা ও তাহাদের উন্নতির উপায় আলোচনা করিবার জন্যই এই কমিটি নিযুক্ত করা হয়। গত বৎসরে এই কমিটির রিপোর্টটি বাহির হইয়াছে।

রিপোর্টটি নিতান্ত ছোট খাটো জিনিষ নয়। ২ লাখ কথায় এই রিপোর্টটি ভরা। তা ছাড়া ৪১টী সংখ্যা-তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উপক্রমণিকায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত উদারনৈতিক দলের মতভেদটা দেখানো হইয়াছে। সিদ্ধান্তগুলার একটা ৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী সার সঙ্কলন রিপোর্টের শেষে স্থান পাইয়াছে।

৪টী ভাগে রিপোর্টটি বিভক্ত। যুদ্ধের পর বিলাতের শিল্পগুলার অবস্থা প্রথম ভাগে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—(১) যুদ্ধের পর বিলাতের সকল শিল্পগুলারই যে মন্দা অবস্থা ছিল তা নয়, কেবল বস্তানি শিল্পগুলারই অবস্থা খারাপ ছিল; (২) শিল্পগুলার অবস্থা খারাপ হইবার কারণ যুদ্ধ নয়, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কয়েকটী বিশেষ অবস্থাই তাহার কারণ। উক্ত দুইটী কথাই পূর্ণতঃ সত্য নয়। যুদ্ধের পর বিলাতের অন্য শিল্পগুলার অবস্থা যে খারাপ হয় নাই এবং রপ্তানি-শিল্পগুলারই অবস্থা খারাপ হইয়াছিল তাহার কারণ, অন্য শিল্পগুলা নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছিল আর রপ্তানি-শিল্পগুলার উপর বোঝা ছিল অত্যন্ত বেশী। দ্বিতীয় কথাটীও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যুদ্ধের জন্য বিলাতকে যথেষ্ট খরচ করিতে হইয়াছে, যুদ্ধের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ওলটপালট হইয়াছে তাহার টাকাও কম নয়।

দ্বিতীয় ভাগটিতে বিলাতী শিল্পের গড়নের কথা বলা হইয়াছে। কমিটি বলেন যে, বিলাতের বৃহদাকার শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের ৫ ভাগ সরকার-চালিত শিল্পে খাটিতেছে। রেল কোম্পানীগুলা ও সমবায় সমিতিগুলা বিশেষ বিশেষ আইনের দ্বারা শাসিত। এগুলা আংশিক ভাবে সরকারের অধীন বলা চলে। এই সকল ব্যবসায়ে অংশীদারেরা যাহাতে সুদ ছাড়া আর কিছু না পায়, আর কাজের ধরণ অনুযায়ী যাহাতে ডিরেক্টারেরা নির্ব্বাচিত হয়, এ সম্বন্ধে নিয়ম করা দরকার। যে সব যৌথ কারবার সাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ (যেমন ট্রাম চালান, গ্যাস সরবরাহ করা ইত্যাদি) লইয়া ব্যবসা করে না, সেগুলা যদি অংশীদারদের শাসনের বাহিরে গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও বিশেষ আইনের সাহায্যে শাসন করা দরকার। এই সব যৌথ কারবারের হিসাবপত্র যাহাতে নিয়মিতভাবে বাহির হয় এবং যোগ্যব্যক্তি যাহাতে ইহাদের ডিরেকটার নির্ব্বাচিত হন সে সম্বন্ধে নিয়ম হওয়া দরকার। যে সব শিল্প-সঙ্ঘ ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটে অধিকার স্থাপন করে, তাহাদের অস্তিত্বে আপত্তি নাই, তবে তাহাদের ভিতরকার ব্যাপারগুলা প্রকাশ্যে আনিবার ক্ষমতা বোর্ড অব্ ট্রেডের হাতে থাকা দরকার।

বিলাতের নবগঠিত মূলধন কোন্ কোন শিল্পে কি কি পরিমাণে খাটাইতে হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য একটী বোর্ডগঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। আর্থিক বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (ইকনমিক জেনারেল ষ্টাফ) কায়েম করিবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সংখ্যা-তালিকাগুলা যাহাতে আরও নিখুঁত, সম্পূর্ণও টাটকা হয় সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবারও কথা আছে।

মনিব-মজুরের সম্বন্ধের আলোচনা তৃতীয় ভাগটিতে স্থান পাইয়াছে। কমিটি বলেন যে, এমন কোন বিশেষ ঔষধ নাই যাহার সাহায্যে মনিব-মজুরের সম্বন্ধটা ভাল হইয়া যাইবে। যাহা হউক, তাহারা কয়েকটি উপায় অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন—(১) শিল্প-বিবাদ মিটাইবার জন্য শ্রমিক মন্ত্রীকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে,—বাধ্যতামূলক আপোষের সাহায্য লওয়া হইবে না; (২) যে সব কারবার সাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগাইয়া থাকে, সে সব কারবারে মনিব-মজুরে বিবাদ ঘটিবার পূর্ব্বে বিবাদ মিটাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা; (৩) মজুরেরা যাহাতে কারবারের লাভের অংশ পায় তাহার বন্দোবস্ত করা; (৪) মনিবেরা এখন স্বেচ্ছাচারীর মত কারখানা শাসন করিয়া থাকে। এই স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার জন্য আর্শাণদের অনুকরণে মজুরদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কর্ম্মসভা গঠন করা ও কর্ম্মসভাকে কারখানার উপর কিছু কর্ত্তৃত্ব দেওয়ার কথাও বলা হইয়াছে।

ভবিষ্যতের আর্থিক কার্য্য-প্রণালী কিরূপ হইবে তাহা চতুর্থ ভাগটিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রধান সমস্যা হইতেছে বেকারদের লইয়া—বেকারের সংখ্যা কমানো যায় কি করিয়া? কমিটির প্রস্তাব এই যে, বিশেষ করিয়া কৃষির উন্নতি করিলে অনেক লোককে কৃষিতে কাজ দেওয়া সম্ভব হইবে। এই প্রস্তাবের মূলে ধারণা এই যে, খাদ্য শস্য সম্বন্ধে বিলাতের পরমুখাপেক্ষিতা ধ্বংস করা দরকার। কিন্তু কমিটি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বিলাতের শস্য আমদানি কমিয়া যাইলে, অন্য যেসকল বিলাতী কারখানাজাত মাল কম করিয়া কিনিবে, ফলে বিলাতের শিল্পগুলার ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে। গৃহ-নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তার ও রাস্তা নির্ম্মাণের কাজেও বেকারদের লাগানো হইবে বলা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অনেক টাকা ঢালিয়াছেন এবং তাহার ফলে গৃহ-নির্ম্মাণ শিল্পে অনেক লোক ঢুকাতে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেকার হইয়া বসিয়া আছে। বৈদ্যুতিক শিল্পেও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কিছু করিবার নাই। যতটা বৃদ্ধির দরকার, তা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলা ইতিমধ্যেই করিতেছে। রাস্তা-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা কমিটী খুব বেশী বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, মোটর-বৃদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকার করিলেই রাস্তা-নির্ম্মাণের একটা সুসঙ্গত কারণ পাওয়া যায়। কিন্তু কমিটি মোটর অপেক্ষা রেলেতেই বেশী বিশ্বাসী। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের কারণ এই যে, রেল মোটরের মতই বোঝাইতে পারে এবং মোটরের চেয়ে বেশী মাল বহিতে পারে।

শেষ ভাগটীতে জাতীয় রাজস্বের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কমিটীর তিনটী কথা উল্লেখযোগ্য:—(১) "খরচ কমানো" কথাটার অর্থ কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝানো হইয়াছে। (২) জাতীয় আয়ব্যয়ের হিসাব আরও শৃঙ্খলার সহিত রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হইয়াছে; (৩) দেখানো হইয়াছে যে, আয়-ব্যয়ের হিসাব এরূপভাবে রাখা হয়, যাহাতে প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় কত তাহার প্রকৃত ধারণা করা শক্ত; আয়ব্যয়ের হিসাবে এইরূপ কৌশল খাটানো নিন্দনীয়।

রিপোর্টটী সরকারী রিপোর্ট নয়; একটী রাজনৈতিক দলের রিপোর্ট। তাহা হইলেও, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহায়তার জন্য রিপোর্টটী লেখা বা সিদ্ধান্তগুলা খাড়া করা হয় নাই। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর সাহায্যে রিপোর্টটী লেখা হইয়াছে।

রিপোর্টটীতে যে সব প্রস্তাব করা হইয়াছে সেইগুলা অনুযায়ী যে কাজ হইবেই তাহা বলা চলে না। কিন্তু তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই। শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা পাওয়া যাইবে। বিলাতের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য নানা উপায় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক এখন আরও উঁচু ঘরের হইতে পারিবে।

১৯২৪ সনের বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী

১৯২৪ সনে লণ্ডন সহর হইতে ৫ মাইল দূরে ওয়েম্বলি নামক পল্লীতে একটী প্রকাণ্ড প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বিলাতের ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থানের পণ্য-সম্ভার এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। প্রদর্শনীটা যে কত বড় ব্যাপার হইয়াছিল তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা সহজ হইবে যে, উহার বাড়ী, বাগান প্রমোদোদ্যান ও রঙ্গভবন ইত্যাদি তৈয়ার করিতেই ১ কোটি পাউণ্ড (১৫ কোটি টাকা) লাগিয়াছিল। মোটের উপর প্রায় আড়াই কোটি লোক এই প্রদর্শনী দেখিয়াছিল।

এই প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষেরও জিনিষপত্র দেখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। একটী প্রকাণ্ড বাড়ীতে ভারতীয় দ্রব্যসম্ভার রক্ষিত হইয়াছিল। দশ বিঘা জমির উপর ভারতীয় প্যাভিলিয়নটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বার বিঘা জমি-ওয়ালা একটী বাগান ছিল। ২৫ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বাড়ী ও বাগান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভারতীয় প্যাভিলিয়ান ছাড়া কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালটা, ব্রহ্মদেশ, সিলোন, হংকং, পশ্চিম আফ্রিকা, গোল্ডকোষ্ট, কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিয়াকা, জাঞ্জিবার, নোয়ালিল্যাণ্ড, সুদান, রোডেশিয়া, সেণ্ট হেলেনা, বাহামা, বৃটিশ হণ্ডুরাস, জামেকা, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, পেনাঙ্ বৃটিশ গায়না, জিব্রাল্টার প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা দেশের প্রত্যেকের জন্য এক একটী পৃথক পৃথক প্যাভিলিয়ান নির্ম্মিত হইয়াছিল। উল্লিখিত প্রত্যেক দেশে যাহা কিছু লিখিবার বা দেখিবার জিনিষ আছে, তাহা সেই দেশের প্যাভিলিয়ানে স্থান পাইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত, প্রমোদোদ্যান, এম্পায়ার ষ্টেডিয়াম্ (বিরাট দর্শনক্ষেত্র), প্যালেস্ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং (যন্ত্রপাতির প্রাসাদ), প্যালেস অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী (শিল্প-প্রাসাদ) প্রভৃতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর বিবরণ বাংলা ভাষায় পাইতেছি "মাতৃমন্দির" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত "বিলাত ভ্রমণ" নামক সদ্যঃ প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে। ইহার প্রকাশক—শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী, ২০০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অক্ষয়বাবু "ইকনমিক জুলোজী ওয়ার্কসে"র জন্য উক্ত প্রদর্শনীর বেঙ্গল কোর্টে একটী ষ্টল লইয়াছিলেন। বাংলার আর সমস্ত ষ্টলই গভর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। কেবল অক্ষয়বাবুর ষ্টলটীই সরকারী সাহায্য না লইয়া চালানো হইয়াছিল। ষ্টল লওয়ার ফলে অক্ষয়বাবু ৬ মাসে বিশ হাজার টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছেন। বিলাত হইতে ব্যবসা করিয়া এত টাকা আনা বাঙালীর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম। প্রদর্শনী শেষ হইলে পর অক্ষয়বাবু ৬ মাস ধরিয়া ইংল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের শিল্প-প্রধান সহরগুলাতে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থটীতে একই কথার পুনরুক্তি স্থানে স্থানে দেখা যায়। "বিলাতের খুটিনাটি ঘটনাবলী" শীর্ষক অধ্যায়টীতে এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার মধ্যে কোন বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। এই সামান্য দোষগুলা বাদ দিলে, গ্রন্থখানি যে সত্যই সুন্দর হইয়াছে তাহা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। গ্রন্থকারের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় গ্রন্থের নানা স্থানে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল।

বইখানির কয়েকটা অংশ তুলিয়া পাঠকদের উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্যালেস্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী (শিল্প-প্রাসাদ) সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সমগ্র গ্রেট বৃটেনের মধ্যে কোথায় কি দ্রব্য প্রস্তুত হয় তা এখানে দেখানো হয়েছিল। ডাক্তারি শাস্ত্রের ও রসায়ন শাস্ত্রের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সাজাতে প্রায় ৩৭৫০০ স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। তুলা, কাপড় প্রভৃতি সাজাতে প্রায় ৩২১৮৭ স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। তুলা কেমন করে জমিতে রোপিত হয়, তুলার গাছ কেমন দেখতে, কেমন করে গাছ হতে তুলা হয়, তুলা হতে কেমন করে সুতা প্রস্তুত হয়, সুতা হতে কেমন করে কাপড় তৈরী হয়, তা সমস্তই বিশদভাবে এখানে বোঝানো হয়েছিল। পশমজাত দ্রব্যাদি সাজাতে প্রায় ১৫০০০ স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। ঘড়ি, যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, কাগজ, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি সিগারেট, রবার, খেলার সরঞ্জাম, কাচ চামড়ার দ্রব্যাদি ও আসবাব পত্র, লেস প্রভৃতির পৃথক পৃথক এক একটী বিভাগ এই ইণ্ডাষ্ট্রী প্যালেসিয়ামে স্থান পেয়েছিল।"

প্যালেস্ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিংএর (যন্ত্রপাতির প্রাসাদ) বর্ণনাটা এইরূপ—"এতবড় কংক্রিটের তৈরী বাড়ী পৃথিবীর আর কোথাও নির্ম্মিত হয় নি। এই বাড়ীখানা তৈরী করতে এক কোটি স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। এই বাড়ীর মধ্যে সত্যিকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঞ্জিন ও রেলগাড়ী রেললাইনের উপর দিয়ে ভীষণবেগে চলাফেরা করে দর্শকদের মনে আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। এই বাড়ীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য আসল রেললাইন পাতা হয়েছিল। মাথার উপর দৈত্যতুল্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁচটী ক্রেন ইঞ্জিন প্যাসেঞ্জার গাড়ী, মালগাড়ী, সমস্তই শূন্যে ঝুলে ধরে দর্শকদের ইঞ্জিন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এই বাড়ীর মধ্যে কৃত্রিম ডকের মধ্যে কেমন করে জাহাজ তৈরী হয়, কেমন করে লোহা বাঁধা হয়—তা সবই বিশদভাবে বোঝানো হয়েছিল। ইলেক্‌ট্রিসিটির গুণে যা কিছু সম্ভব হতে পারে, তা সমস্তই এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। ইহা ব্যতীত মোটরগাড়ী, মোটর সাইকেল প্রভৃতি কেমন করে তৈরী হয়—"এসবই বুঝিয়ে দেখানো হয়েছিল।"

ইংরাজের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন—"বিগত মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের ধনসম্পদ্ অনেক হ্রাস পেয়েছে বটে, তথাপি এমন একটা লোক এখানে দেখা যায় না যার পরিধানে মলিন বস্ত্র, এমন লোক দেখা যায় না যে খেতে পায় না, এমন লোক দেখা যায় না যার অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যাঘাত হচ্ছে। প্রত্যেকেই যেন সমপরিমাণে সুখী।"

ইংরেজের কর্ম্মোদ্যম সম্বন্ধে একটী উক্তি—"কেমন করে ইংরেজ পৃথিবীটাকে ভোগ করছে ভাবলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া এদের শস্যক্ষেত্র, আফ্রিকা এদের ফলের বাগান, নিউজিলাণ্ড গোশালা, ভারতবর্ষ ধনভাণ্ডার, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার, নিজ দেশ গ্রেটবৃটেন শিক্ষা ও শিল্পাগার, আর সারা জগৎ বাণিজ্য-ক্ষেত্র।"

লণ্ডন-সহরের বৃত্তান্ত, সানলাইট সোপ ফ্যাক্টরীর বর্ণনা এবং তাম্র ও পিত্তলের কারখানার কথা—বইখানার এই কয়টা অংশ আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে।

ছাত্রমহলে গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষাণ জাগরণ

বিগত যুদ্ধের শেষভাগে রুশিয়ায় শিল্পবিপ্লব সুরু হয়। কিন্তু কেবলমাত্র যে কলকারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষই বিপ্লব সাধন করিতে পারে তাহা নয়, তথাকথিত শান্তিপ্রিয়ী কৃষাণকুলও কম বিপ্লবধর্ম্মী নয়। যুদ্ধের পর পূর্ব্ব ইয়োরোপে কৃষকগণ আন্দোলন চালাইয়া জমাজমির উপর নিজেদের স্বত্ব কায়েম করিয়া লইয়াছে। এই জন্য এই বিপ্লব গ্রীন রাইজিং অর্থাৎ সবুজ বিপ্লব, বলশেভিক-বিপ্লবকে লোহিত বিপ্লব বলা হয়, সেইজন্য কৃষাণ আন্দোলনকে সবুজ-বিপ্লব বলা হইয়াছে। সম্প্রতি কৃষাণ আন্দোলন সম্বন্ধে একখানি বই বাহির হইয়াছে। বইখানির নাম "গ্রীন রাইজিং" নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান কোম্পানী, ১৯২৬ ১০+২৬৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৮শিঃ ৬পেঃ। গ্রন্থকার ডব্লিউ বি, বিজেল।

গ্রন্থখানির প্রথম ৬০ পাতায় কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ওল্ড টেষ্টামেণ্ট থেকে আরম্ভ করিয়া মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট কালেসের নূতন জমি জমা নীতি পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেন নাই। গ্রন্থকারের এইরূপ 'ধান ভানিতে মহীপালের গীতে'র কোনই সার্থকতা নাই। নূতন কিছুই তিনি দিতে পারেন নাই। আবার এমন সব আজগুবি মতবাদ খাড়া করিয়াছেন যাহা দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তাঁহার মতে গোটা দুনিয়ার কৃষাণ ইতিহাসের গোড়া থেকে আগা পর্য্যন্ত একটী নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বিদ্যমান। মোট কথা বিষয়টী তিনি তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। কৃষাণ অসন্তোষের প্রধান প্রধান কারণ হইতেছে শুল্ক অপচায়, অসুবিধাজনক জমিজমার স্বত্ব, ফসল বিক্রয়ের বা চালান দিবার অসুবিধা ইত্যাদি। গ্রন্থকার কৃষাণ অসন্তোষের এই বিষয়গুলি পৃথক পৃথকভাবে দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। গ্রন্থকার আর একটী নূতন তথ্য মাথা হইতে বাহির করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে সমস্ত বিদ্রোহই কৃষাণ-বিদ্রোহপ্রসূত। ইতিহাস পড়িয়া তেমন কোন আভাষ পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার নিজের মতবাদ সমর্থনের জন্য কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলা সেরূপ সন্তোষজনক হয় নাই।

গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষের আট অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষাণ আন্দোলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। গ্রন্থের এই অংশটী প্রকৃত-পক্ষে মূল্যবান। পাঠকবর্গ সেসের অধ্যায়গুলিতে এমন তথ্যাদি পাইবেন যাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। আমেরিকার কৃষাণ-কুল উপেক্ষার বস্তু নয়। তাহাদের প্রতিপত্তি এতদূর যে আমেরিকায় "তৃতীয় রাজনৈতিক দল" গঠনের চেষ্টা তাহাদের দ্বারাই বারে বারে আরব্ধ হইয়াছে। গ্রাঞ্জার আন্দোলন, "দি ফার্ম্মারস্ অ্যালায়েন্স," "দি পপুলিষ্ট পার্টি," "দি নন্ পার্টিজান লিগ্" প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলন-কারী দল কৃষাণদিগেরই কীর্ত্তি। কি জন্য এই সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া যায় গ্রন্থকার তাহারও হদিস নিরূপণ করিয়াছেন। এই সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও উহাদের চেষ্টার ফলেই আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দলগুলি স্ব স্ব নীতির অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। লোকে সাধারণতঃ শিল্প বাণিজ্য বৃদ্ধির দিকেই বেশী নজর রাখে, কিন্তু মালচালান, কারেন্সি, ব্যাঙ্কিং, শুল্ক-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে কৃষাণদের মনোভাব কিরূপ তাহা বুঝা দরকার। আমেরিকান কৃষকের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সমস্যা উপস্থিত। আমেরিকায় ফসল উৎপন্ন হইতেছে খুব বেশী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দাম কমিয়া যাইতেছে। আমেরিকান কৃষক আজ দেখিতেছে যে, কতকগুলি দ্রব্য সম্বন্ধে যেমন পশম, চিনি, সব্জী তেল ইত্যাদি সরকারের শুল্ক-নীতি বেশ সুবিধাজনক, কিন্তু খাদ্য শস্য, তুলা, প্রভৃতি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অথচ এই সমস্ত জিনিষ বিদেশে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি দেশের শিল্পসংরক্ষণের পক্ষে। সুতরাং কৃষকগণ দেশের শিল্পজাত দ্রব্য চড়াদামে কিনিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ বিদেশে কৃষিজাত দ্রব্য বেচিয়া আশানুরূপ অর্থ তাহারা পাইতেছে না। লোক-আমদানি সম্বন্ধে সরকারের কড়াকড়ির জন্যও কৃষকগণ সস্তা মজুরের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হইতেছে। কৃষকগণের বিবেচনায়, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শ্রমজীবিগণ ইহারাই আইন কানুনের সুবিধা ভোগ করিতেছে, সুতরাং কৃষাণগণও যাহাতে আইন কানুনের সুবিধা পায় সেই জন্য তাহারা আন্দোলন সুরু করিয়াছে। ডক্টর বিজেল কৃষাণকুলকে সমবায় বিক্রয় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন এবং যদি কোনরূপ সুবিধাজনক আইনকানুন পাশ করাইতে পারে সেজন্যও চেষ্টা করিতে বলেন। কিন্তু এ সমস্ত যদি বিফলই হয় তাহা হইলেও কৃষাণদের আন্দোলন সমাজের পক্ষে ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে তিনি ইহা আদৌ আশঙ্কা করেন না।

পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য

বর্ত্তমানে ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থোৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাষ্ট্র অল্পবিস্তর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিল্প-ব্যবসা সঙ্ঘবদ্ধভাবে উন্নত প্রণালীতে চালাইতে হইলে এবং উহাকে মানবের হিতকর প্রতিষ্ঠানে

পরিণত করিতে হইলে এই সমস্ত রাষ্ট্রকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া নিতান্ত দরকার। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মজুর-গণের হিতা স্থির করিয়া দেওয়া, কারণ মজুরগণের কর্ম্ম-দক্ষতার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানি নূতন বই বাহির হইয়াছে। বইখানার নাম "ওয়েজেস্ অ্যাণ্ড দি ষ্টেট্," লণ্ডন: ১৯২৬; ১+৩৪৩ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকর্ত্তার নাম ই এম বার্ণস্।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মজুরি বর্ত্তমান; (১) মাত্র প্রাণরক্ষার উপযোগী মজুরি; (২) মধ্যম রকমের মজুরি; একই ধরণের অন্যান্য শিল্পে বা কারখানায় যে হারে মজুরি দেওয়া হয় এবং (৩) ব্যবসার সাধ্যানুযায়ী মজুরি প্রদান। মজুরি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র যেসকল আইন কানুন প্রণয়ন করিয়াছে তাহা এই তিনটী খুঁটার উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখিকা এই খুঁটা তিনটী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া-ছেন। বইখানিতে অনেক কাজের কথা তো আছেই, তা ছাড়া জানিবার বিষয়ও আছে যথেষ্ট।

মজুরি নিয়ন্ত্রণের মোটামুটি তিনটী বিষয় লইয়া গ্রন্থকর্ত্রী বইখানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা:—(১) মজুরি নিয়ন্ত্রণের আইনগুলির স্বরূপ (নেচর অব্ ওয়েজ রেগুলেশান); এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্রী নানাদেশের এই জাতীয় আইন কানুনের কথা বলিয়াছেন; (২) কি ভাবে এই আইন অনুসারে কাজ চলে; (৩) কোন কোন নীতি বা মতবাদের উপর এই আইনগুলি খাড়া করান হইয়াছে ইহা ছাড়া প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে, উপসংহারে সমস্ত বিষয়ের সারাংশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিতে হয়।

এই গ্রন্থ অনুসারে, মজুরি আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, কারখানায় মজুরদের হাড়ভাঙ্গা অতিরিক্ত খাটুনি বন্ধ করা এবং মজুরির হার বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শ্রমিক-বিপ্লব যাহাতে না ঘটে সেরূপ ব্যবস্থা করা। বইখানির উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, যে তিনটী খুঁটার উপর মজুর আইনগুলি কায়েম করা হইয়াছে, তাহার কোন একটীই যথোপযুক্ত নয়, মজুর-সমস্যার সমাধান করিতে হইলেই এই তিন খুঁটারই সমান ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রন্থকর্ত্রীর মতে মজুরির সহিত মনোৎ-পাদনের নিকট সম্বন্ধ। মালিকের অবস্থা বুঝিয়া দু'পয়সা যদি মজুরকুলকে দেওয়া হয় তাহা হইলে নিতান্ত জলে পড়ে না। কারণ মজুররা যদি একটু ভাল খাইতে পরিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে এবং বেশী খাটিতেও পারিবে, সুতরাং মাল উৎপাদনও হইবে বেশী বেশী।

গ্রন্থখানিতে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে,—তাহা যথোপযুক্ত ধন-বণ্টনের ব্যবস্থা। সাধারণ মজুরির হার কিরূপ উচিত এবং বিশেষ কোন শিল্পের বেলাতেই কিরূপ মজুরি হওয়া উচিত সমস্ত বিষয়ই লেখিকা আলোচনা করিয়াছেন। বইখানি মজুরদের পক্ষে লিখা হইলেও তাহাতে মজুরদের একেবারে স্বর্গরাজ্যে স্বর্গে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। অর্থগৃধ্নু মালিকদের যেরূপ আক্কেল্ করার দরকার, তেমনি অতি অসহিষ্ণু ট্রেড্ ইউনিয়নগুলির অসঙ্গত দাবিসকলের প্রতিও বুদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা উচিত গ্রন্থকর্ত্রী এরূপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্রীর "ফ্যাক্টরি পরিদর্শন" "ফ্যাক্টরি শাসন" এই দুইটী অধ্যায়ে জানিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। গ্রন্থকর্ত্রীর শেষ মন্তব্য এই যে, মজুর-সমস্যা, তথা মজুরি সমস্যা নিতান্ত তামাসার বস্তু নয়, দশ বছরের মধ্যেই যে সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এমন সোজা জিনিষও নয়। অনেক কাঠ খড় পোড়াইতে হইবে, অনেক মেহনৎ করিতে হইবে। কোন্ কোন্ লাইনে কাজ চালাইলে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন। অনেক নূতন অর্থনীতির কথা এবং মজুরি-সমস্যার অনেক নূতন তথ্য এই পুস্তকে যে মিলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১। "দি কনজিউমার্স গুড্‌স্ অ্যাট্ অ্যাড্‌ভার্টাইজিং" (খাদক বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রেখে)—পি, টি, বেরিংটন; হার্পার, নিউইয়র্ক ও লণ্ডন; ১৪+১৯৮ পৃষ্ঠা; ২'৫০ ডলার; ১৯২৮।

২। "প্রিনসিপল্‌স্ অব্ বিজ্‌নেস্ ল" (ব্যবসা-সংক্রান্ত আইনের মূলনীতিসমূহ)—ই আর হিলাডু ও সি জি হাওয়ার্ড; প্রেন্‌টিস্-হল, নিউইয়র্ক; ২৮+৭৮১ পৃষ্ঠা ৪ ডলার; ১৯২৮।

৩। অ্যানালিসিস্ অব্ রেভিনিউজ্ অ্যাণ্ড এক্সপেন্সেস্ অব্ ওহিও ডেলি নিউজ্‌পেপার্স, ইয়ার নাইনটিন টোয়েন্টী এইট্" (১৯২৮ সনে ওহিওর দৈনিক সংবাদপত্রগুলার আয়ব্যয়ের বিশ্লেষণ)—জে এ হাটরি; বিউরো অব্ বিজ্‌নেস্ রিসার্চ, ওহিও ষ্টেট ইউনিভার্সিটি, কলাম্বাস; ৪৮ পৃষ্ঠা ৫০সেণ্ট; ১৯২৮।

৪। "দি নেচার অব্ আন্‌কেয়ার মেথড্‌স্ অব্ কম্পিটিশান ইন্ দি রিটেল-ফিল্ড" (খুচরা ব্যবসাতে প্রতিযোগিতার জন্য কিরূপ অন্যায় উপায় অবলম্বিত হয় তাহার বিবরণ)—এইচ্ এইচ্ শিক্লেদি; ওহিও ষ্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলাম্বাস; ৭+১১০ পৃষ্ঠা; ৫০ সেণ্ট; ১৯২৮।

৫। "এ থিওরি অব্ দি লেবার মুভ্‌মেণ্ট" (মজুর-আন্দোলন সম্বন্ধীয় একটী তত্ত্ব)—সেলিগ্ পার্ল্‌ম্যান্; ম্যাক্‌মিলান, নিউইয়র্ক; ১২+৩২১ পৃষ্ঠা; ১৯২৮।

৬। "রিপোর্ট অব্ দি টোয়েন্টি এইট্থ অ্যানুয়েল কনফারেন্স অব্ দি লেবার-পার্টি, বার্মিংহাম, ১৯২৮" (বিলাতের মজুর-দলের অষ্টাবিংশতি-তম বার্ষিক সভার রিপোর্ট)—দি লেবার পার্টি, ট্র্যান্সপোর্ট হাউস, স্মিথ স্কোয়ার, লণ্ডন; ৩৫৪ পৃষ্ঠা: ১ শিঃ ৫ পে; ১৯২৮।

৭। "রিপোর্ট অন্ অ্যান্ এনকোয়ারি ইন্টু ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি বাজেট্‌স্ ইন্ আমেদাবাদ" (আমেদাবাদের মজুর পরিবারগুলার আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় একটা অনুসন্ধানের রিপোর্ট)—হিজ্ ম্যাজেষ্টিজ ষ্টেশনারি অফিস, বম্বে ৫+৪৮ পৃষ্ঠা; ১৯২৮।

৮। "রিপোর্ট অব্ অ্যান্ এনকোয়ারি ইন্টু দি হাউজিং অ্যাণ্ড কষ্ট অব্ লিভিং অব্ দি ওয়ার্কিং-ক্লাসেস্ ইন্ রেঙ্গুন" (রেঙ্গুনস্থ মজুর-শ্রেণীর জীবনযাত্রার প্রণালী ও খাওয়া পরার খরচ সম্বন্ধীয় একটা তদন্তের রিপোর্ট)—হিজ্ ম্যাজেষ্টিজ ষ্টেশনারি অফিস, রেঙ্গুন; ৪+২২১ পৃষ্ঠা; ৪ শিঃ ৬ পে; ১৯২৮।

৯। এ হ্যাণ্ডি ইন্ পাব্‌লিক্ ফিন্যান্স (সরকারী কোষ লইয়া গবেষণা)। এ সি পিগু, এম এ লণ্ডন, ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড্। ১৯২৮। পৃষ্ঠা ১৭+৩২৩।

১০। আর্থাদি আণ্ডার দি সোভিয়েট প্ল্যান (সোভিয়েট প্ল্যান প্রবর্তিত হইবার পর আর্থাদি)। অধ্যাপক ম্যাক্স লেরিড্ (অনুবাদক এস্ মিল্টন হার্ট)। লণ্ডন, পি এস্ কিং অ্যাণ্ড সন। ১৯২৯। পৃষ্ঠা ৯+২৪১। ১০ শিঃ ৬ পে।

১১। একোনোমিক্ র‍্যাশিওনেলে (যুক্তি অর্থাৎ গণিতমূলক অর্থশাস্ত্র)। এড্ ডিভিসিনিয়া। প্যারিস, গাস্তোঁ দিয়োঁ এত্ সি। পৃঃ ৪৪৩। মূল্য ৩০ ফ্রাঁ।

১২। ইন্টারডিপেনডেন্সি অব্ সাপ্লাই অ্যাণ্ড প্রাইসেজ্ (যোগান ও দরের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়)। জি এফ্ ওয়ারেণ ও এফ্ এ পিয়ারসন। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-পরীক্ষাগার কর্তৃক প্রকাশিত। ইথাকা, নিউ-ইয়র্ক। ১৯২৮। পৃঃ ১৪৪।

মহীশূরে শিল্পোন্নতি

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

শিল্প বাণিজ্য ব্যাপারে পূর্ব্বে রাষ্ট্র বড় একটা হস্তক্ষেপ করিত না, হস্তক্ষেপ করাটা অন্যায় বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষস্থ এক বৃটিশ গভর্মেণ্ট ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্র, এমন কি ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পর্য্যন্ত এই পুরাতন মতবাদ একেবারে পরিহার করিয়াছে। তবে বৃটিশ ভারতের গভর্মেণ্টের সুর আজকাল অনেকটা নরম হইয়াছে। ভারতের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে তাঁহারা যেন ততটা নারাজ নন্, কিন্তু তাঁহারা এখনও পুরামাত্রায় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা এতদিন আমাদের অক্ষমতা এবং অযোগ্যতার দোহাই দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদিও ভারতবাসিগণের অযোগ্যতার অনেকাংশে লাঘব হইয়াছে তবুও কর্ত্তারা ইহাকে বিশেষ আমল দিতেছেন না। ভারতবাসীর আর্থিক জীবনে বর্ত্তমানে এমন একটা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে যে এ সময় সরকারের হস্তক্ষেপ করা কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বিশেষভাবে যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক। বিদেশী পুঁজিপতিগণের স্বার্থে বেশী নজর রাখার জন্য সরকার অনবরত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, শিল্প-অনুন্নয়নের শৈশবাবস্থায় যে কত প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে ভুলক্রমেও লক্ষ্য করেন নাই। সরকার এবং দেশবাসীর চোখ ফুটাইবার জন্য মহীশূরের ১৫ বৎসরের আর্থিক ইতিহাস যে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবার পর দুনিয়া জুড়িয়া শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা অবসাদ আসিয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সনে কিন্তু এই অবসাদ কাটিয়া গিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনের পর দুনিয়ার শিল্প-বাণিজ্যে এক নূতন শ্রীবৃদ্ধির যুগের সূচনা হইয়াছে। সুতরাং অর্থবিজ্ঞানবিদ্‌গণ যদি গত ১৫ বৎসরের তথ্য যাঁটিয়া কোন অর্থনৈতিক ব্যাপারের আলোচনা করিতে যান তবে প্রমাদগ্রস্ত হইবেন। মহীশূর রাজ্যের ১৯২৭-২৮ সনের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর ৯২'৩০ লক্ষ মণ, মূল্য ১২'০৪ কোটি টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩-১৪ সনের ব্যবসার পরিমাণ ৪৮'১৪ লক্ষ মণ, দাম ৪'৪৭ কোটি টাকা। অবশ্য আলোচ্য এই দুই সনে বিভিন্ন পণ্যের দামের অনেক পার্থক্য আছে। ১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় ১৯২৭-২৮ সনে জিনিষ পত্রের দাম প্রায় শতকরা ৫০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামের এই পার্থক্য বাদ দিয়া তুলনা করিলে দেখা যায়, ১৯১৩-১৪ সনের চেয়ে ১৯২৭-২৮ সনে মাল পত্র বেচা কিনা হইয়াছে ৫৯% বেশী, এবং মূল্যবৃদ্ধির তরফ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, শতকরা ৩৬ টাকার বেশী মালপত্র ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। আবার শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান দেখিয়াই সমস্ত বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদনিচয়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা তাহা দেখিয়াই জানিতে পারা যায় দেশটী কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। মহীশূরে যে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে তাহা একটা ব্যাপারে বেশ বোঝা যাইতেছে। মহীশূরে কয়লা আমদানি খুব কমিয়া গিয়াছে। মহীশূরে কতকগুলি হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক ষ্টেশন কায়েম করার জন্যই কয়লার কাটতি এত কম হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে কয়লা আমদানি হয় ৩৪½ লক্ষ মণ, মূল্য ২৩½ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ গোটা আমদানি বাণিজ্যের ৩১%; কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে কয়লা আমদানি হয় মাত্র ২২½ লক্ষ মণ, মূল্য ১৭½ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ গোটা আমদানি বাণিজ্যের ২০% মাত্র। প্রধানতঃ কোলার স্বর্ণক্ষেত্রেই কয়লা আমদানি কম হইয়াছে। শিবসমুদ্রমে বিজলী উৎপন্ন হইতেছে এবং এই স্বর্ণ-ক্ষেত্রের কলকারখানা সমস্তই চালিত হইতেছে এই বিজলীর সাহায্যে। ১৯২৭-২৮ সনে শিবসমুদ্রমের এই জেনারেটিং ষ্টেশন কোলার স্বর্ণক্ষেত্রে ১৭,৮৮০ অশ্বশক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিতে ১১,৬৮০ অশ্বশক্তি এবং রাস্তা বাড়ী ঘর আলোকিত করিবার জন্য ৪,৪৭০ অশ্বশক্তির বিজলী যোগাইয়াছে।

ভারতে জীবনযাত্রার প্রণালী খুব নিম্ন। কিন্তু এই প্রণালী যে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে তাহা কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। মহীশূর রাজ্যে ১৯১৩-১৪ সনে ভারতীয় সুতা আমদানি হয় ২১৯ হাজার মণ (দাম ২৪ লক্ষ টাকা) এবং সুতা রপ্তানি হয় ১৭৯ হাজার মণ (দাম ১৭৪ লক্ষ টাকা)। ১৯২৭-২৮ সনে কিন্তু ভারতীয় সুতার আমদানি কমিয়াছে, কারণ আমদানি হইয়াছে মাত্র ৯৯ হাজার মণ (দাম ৫৯ লক্ষ টাকা), কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৫৯২০ হাজার মণ (দাম প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা)। বর্ত্তমানে মহীশূর রাজ্যের কাপড়ের কলগুলিতে প্রায় ১,৩২,৫৪০ খানি টাকু চলিতেছে। মহীশূর হইতে বস্ত্র রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনের রপ্তানি ৯,০০০ মণ, (মূল্য ৩ লক্ষ টাকা). কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনের রপ্তানি ৫৭,৬০০ মণ (দাম ৮২৪ লক্ষ টাকা)। ভারতীয় বস্ত্রের আমদানিও বাড়িয়াছে ৭৪,০০০ মণ (দাম ৪০৪ লক্ষ টাকা) হইতে ১১৭৪ হাজার মণে (দাম ১৬৮ লক্ষ টাকা)।

মহীশূর রাজ্যের বস্ত্র-বাণিজ্যের ১৫ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দুইটি বিষয় বেশ বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ, এই রাজ্যে বয়নশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বস্ত্রের আমদানি ও রপ্তানি সমান গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রজা সাধারণের অবস্থারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

মহীশূরে পশম আমদানি ও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমদানি ২৩,০০০ মণ (দাম ৪,১৫,০০০ টাকা) হইতে ৪৭,৫০০ মণে (দাম ১০ লক্ষ টাকা) বাড়িয়াছে। ১৯২৮-২৯ সনে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার পশম আমদানি হইয়াছে। রেশম রপ্তানির বাড়িয়াছে ১২৫%। রপ্তানির পরিমাণ ৩,৬০০ মণ এবং দাম ২১৯ লাখ টাকা হইতে বাড়িয়া ৮,২০০ মণে এবং দাম ৪৮ লাখ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে রেশম আমদানি হয় অত্যন্ত কম, মাত্র দেড় লাখ টাকার। কিন্তু ১৯২৫-২৬ সনে আমদানি হয় ৩ লাখ টাকার, ১৯২৬-২৭ সনে ১৩·৩২ লাখ এবং ১৯২৭-২৮ সনে ৯·৬০ লাখ টাকার আমদানি হইয়াছে। এই অঙ্ক দেখিয়া মনে হয় মহীশূরের রেশম-শিল্পের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিতেছে। কেবলমাত্র রেশমশিল্পের বেলাতেই মহীশূরের সহিত বৃটিশ ভারতের পার্থক্য দেখা যাইতেছে। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া নাই। কিসে রেশমের সুতা ভাল হইতে পারে ইহাই এখন মহীশূর গবর্ণমেণ্টের মস্ত বড় ধান্ধা। ব্যাপারটী ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য বিদেশ হইতে অনেক বিশেষজ্ঞ আনান হইয়াছে। যদি এই সমস্ত ওস্তাদের পরীক্ষা সফল হয় আর মহীশূর কলগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে শীঘ্রই মহীশূরে এক সমৃদ্ধিশালী রেশমশিল্প দেখা দিবে।

মহীশূরের চর্ম্ম-শিল্পের উপর দিয়াও কম ঝড় বহিয়া যায় নাই। যুদ্ধের আগে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪২,০০০ মণ (দাম ৩২ লক্ষ টাকা)। ১৯১৬-১৭ সনে রপ্তানি দাঁড়ায় ৮৭,০০০ মণ (দাম ৭১৯ লাখ টাকা)। ১৯২০-২১ সনে রপ্তানির বহর আবার কমিয়া গিয়া দাঁড়ায় মাত্র ২০,০০০ মণে (দাম ৩০ লক্ষ টাকা)। কিন্তু ট্যানারিগুলির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আবার সুদিন আসিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে রপ্তানির পরিমাণ ৯৫,০০০ মণ (দাম ৮০৪ লাখ টাকা)। কাঁচা চামড়া রপ্তানির পরিমাণ ২৬,০০০ মণ।

মার্কিণ কৃষির গোড়াপত্তন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অর্থ-জগতে আজ সকল দেশের শীর্ষস্থানীয়। এ দেশের অবস্থা চিরদিন সমান ছিল না। কি করিয়া মার্কিণ জাতিটা অল্প সময়ে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল তাহার বিবরণ সংগ্রহ ও পাঠ উন্নতিকামী জাতির পক্ষে আবশ্যক। এইরূপ বিবরণ দ্বারা একদিকে যেমন জ্ঞান-লাভ হইতে পারে, অপরদিকে তেমনই লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আর্থিক উন্নতির বিহিত পথের সন্ধান সহজ-সাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা।

কোন দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে কেবল মাত্র এক দিক্ দিয়া প্রকাশ অথবা বিকাশ পাইতে পারে না। আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক প্রভৃতি ঘটনাবলীর সমবায়ে জাতীয় ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন জাতিকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে উহার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগের বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ, একটিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া অপর কোনটির আলোচনা একপ্রকার অসম্ভব। এই নিমিত্ত কোন দেশের আর্থিক উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, ঐ দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসও কতক পরিমাণে জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে। একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন জাতির ইতিহাসের ধারা স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র ভাবে বিভিন্ন দিক্ দিয়া ছুটিয়া চলে না। আর্থিক বা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ইতিহাসের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য নাই। কেবল আলোচনার সুবিধার জন্য কৃত্রিমভাবে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির ইতিহাস ঐ দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিলেও সম্বন্ধ অগ্রাহ্য না করিয়া উহার স্বতন্ত্র আলোচনা চলিতে পারে।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নামে সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং উহার স্বাধিকারগুলি ধূলীভূত হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ অতিবাহিত হইয়া যায়।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ইয়োরোপের তিনটি প্রধান জাতি নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। ইহারা ইংরাজ ফরাসী ও স্পানিয়ার্ড। ওলন্দাজ এবং সুইডিস্ জাতিদ্বয়ও উক্ত জাতিত্রয়ের সহিত উপনিবেশ স্থাপন-কল্পে কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজ, ফরাসী ও স্পানিয়ার্ড স্ব স্ব উপনিবেশ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইল। ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত হইল নূতন মহাদেশের পূর্ব্বাংশে আটলান্টিক উপকূলে। সুপ্রসিদ্ধ হ্রদাবলীর এবং মিসিসিপি কূলভূমির সান্নিধ্যে ফরাসী স্বীয় উপনিবেশ স্থাপন করিল। আবিষ্কৃত ভূমির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্পানিয়ার্ডের অধিকার রহিল। ইংরাজের উপনিবেশে লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ফরাসীদের উপনিবেশ কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন গ্রাম ও বস্তি সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ফ্লোরিডা, টেক্সাস্, নিউমেক্সিকো এবং কালিফর্ণিয়া নামক স্থানগুলির মালিক ছিল স্পানিয়ার্ড।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজের এবং সুইডিসের অধিকৃত অনেক স্থান ইংরাজের হাতে আসে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মিসিসিপি নদীর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমগ্র স্থানটা ইংরাজের অধিকৃত হয়, এক্ মিসিসিপি নদীর পশ্চিমাংশে স্পেনের প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরিডা ও তৎসংলগ্ন স্থান আবার স্পেনের হস্তগত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পরিসর একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে মিসিসিপি নদী পর্য্যন্ত এবং অপরদিকে মার্কিণ হ্রদ-মণ্ডলী ও রেড-নদের নদী হইতে স্পেন-অধিকৃত ফ্লোরিডার সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া

দাঁড়ায়। ধনোৎপাদন, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রতি উপনিবেশগুলি উদাসীন ছিল না। বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে ধনলাভের জন্য কোন না কোন প্রকার চেষ্টা চলিত। এ সময়ে ইংরাজের অধিকৃত উপনিবেশগুলি অন্যান্য উপনিবেশ অপেক্ষা আর্থিক উন্নতির পথে একটু বেশী অগ্রসর হইতেছিল। আর্থিক উন্নতির জন্য প্রকৃতভাবে চেষ্টা করিবার মত অবস্থা ও ইচ্ছা ঔপনিবেশিকদিগের তখনও হয় নাই। দেশ নূতন, কোথায় কি আছে না আছে জানা নাই; অপরদিকে ইয়োরোপীয় কর্তৃপক্ষরা উপনিবেশগুলির অবস্থা উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন না। উপনিবেশগুলি একটা আর্থিক পরীক্ষা-যুগের ভিতর দিয়া চলিতেছিল মাত্র। তথাপি ঔপনিবেশিকরা ধনোৎপাদনের কয়েকটি পথ বাছিয়া নিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভার্জিনিয়ায় এবং মেরিল্যাণ্ডে তামাক উৎপন্ন হইতেছিল, কেরোলিনায় ধান ও নীলের চাষ চলিতেছিল, এবং নিউ ইংলণ্ডে মৎস্যের ব্যবসা প্রসার লাভ করিতেছিল। ইহা ছাড়া ঔপনিবেশিকরা আমেরিকার আবহাওয়ার উপযোগী ওলিভবৃক্ষ ও মেডসার জাতীয় ধান্যের ফসল উৎপন্ন করিতে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।

উপনিবেশগুলির আর্থিক উন্নতির পক্ষে যে সব বাধা ছিল, মূলধন ও মজুরের অভাব তাহাদের মধ্যে অন্যতম। যন্ত্রপাতি হাতিয়ারের জন্য মূলধনের আবশ্যকতা বেশী ছিল না, কারণ আর্থিক জগতে ঐগুলির বিশেষ প্রচলন তখনও হয় নাই। অর্থোৎপাদনের জন্য মজুরের দৈহিক শ্রমের উপরই বেশী নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু মজুরের প্রাচুর্য্য না থাকায় উপনিবেশগুলিকে অঙ্গীকারাবদ্ধ ভৃত্য, ক্রীতদাস এবং সহযোগ-শ্রম প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আধুনিক কল-কারখানার অস্তিত্ব তখন ছিল না; ধনোৎপাদনের জন্য বিশিষ্টজ্ঞানের আবশ্যকতা অনুভূত হইত না। এখনকার তুলনায় উপনিবেশগুলির ধনোৎপাদিকা শক্তি নিতান্তই অল্প ছিল, সুতরাং ধনের সঞ্চয়ও বেশী হইতে পারে নাই। মূলধন ও মজুরের অভাব থাকায় প্রকৃতি-জাত সহজলভ্য পদার্থ এবং বহির্ব্বাণিজ্যের উপর উপনিবেশগুলিকে অধিকতর নির্ভর করিতে হইত। কাঠ, মাছ, পশুলোম এবং সহজ-সাধ্য কৃষিজাত তামাক প্রভৃতি ব্যবসার প্রধান উপকরণ ছিল এবং ঐগুলি লইয়াই উপনিবেশগুলির বহির্ব্বাণিজ্য চলিত। এক নিউ-ইয়র্ক ভিন্ন সকল স্থানে কৃষিই লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল। খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং বিদেশে রপ্তানি করিবার মালপত্র কৃষি হইতে পাওয়া যাইত। বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল নিউ-ইয়র্ক।

ঔপনিবেশিকদের পক্ষে প্রথম অবস্থায় কৃষিকার্য্যটা বড় সহজ ছিল না। ভিন্ন পারিপার্শ্বিকের ভিতর কৃষির অবস্থাও ভিন্ন রকম হয়, এজন্য প্রকৃত অবস্থার অবগতির জন্য বহু পরীক্ষা, যত্ন ও অধ্যবসায় আবশ্যক। ঔপনিবেশিকদের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। তাহারা আমেরিকায় আসিয়া দেখিলেন অবস্থা ইয়োরোপ হইতে স্বতন্ত্র। আমেরিকার ভূমি যে সব শস্যের পক্ষে উপযোগী সেগুলির অনেকের সম্বন্ধেই তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তামাক, তুলা, ধান, নীল প্রভৃতি তাহারা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে জন্মায় নাই। বহুদিন পরীক্ষার পর কৃষির সাফল্য সম্বন্ধে তাহাদের আশা ও বিশ্বাস জন্মিল। উপনিবেশগুলির ইয়োরোপীয় কর্তৃপক্ষরা স্ব স্ব দেশের অভাব নিবারণের জন্য যে সব কৃষিজাত দ্রব্য চাহিয়া পাঠাইতেন, ঔপনিবেশিকরা তৎসমুদায় উৎপাদনের জন্য বেশী মনোযোগ দিতেন। কেন না ঐ সব দ্রব্যের কাটতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত না। ইংরাজেরা ইংলণ্ডে যাহা উৎপাদন করিতে পারিতেন না, ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা আমেরিকায় তাহা জন্মাইয়া ইংলণ্ডে পাঠাইতেন। ইয়োরোপীয় কর্তৃপক্ষের চাহিদামত সকল জিনিষই উৎপন্ন করা চলিত না, অনেক পরিশ্রম বৃথা পরীক্ষায় ব্যয়িত হইত। ভার্জিনিয়ায় ঔপনিবেশিকরা বহু দিন পর্য্যন্ত রেশমের ও আঙ্গুরের চাষের উপর ঝোঁক দিয়াছিলেন। রেশমের জন্য অনেক কিছু করা হইয়াছিল। তুঁতের চাষ, রেশম সম্বন্ধীয় ফরাসী ও ইতালীয় গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ, ইয়োরোপ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন প্রভৃতি সত্ত্বেও বিশেষ কিছু ফল পাওয়া গেল না। ভার্জিনিয়ার ঔপনিবেশিকরাও রেশমের পরীক্ষা নিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত খাটিয়াছিলেন, কাজে বিশেষ কিছু হয় নাই। নিউ

ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিকরা তুলা, ধান, নীল প্রভৃতি লইয়া চাষ করিতেছিলেন; কিন্তু এখানকার ভূমি ঐ সব শস্যের উপযোগী না থাকায় চেষ্টা বৃথা হইতেছিল। দক্ষিণের উপনিবেশগুলি অলপাই ও মাকচিনির চাষ নিয়া পরিশ্রমের অপচয় করিতেছিল, বস্ত্র বয়িবের বস্তুতা দূরীকরণ, রেড্ ইণ্ডিয়ানদিগকে রেশমের কার্য্যে ও মুক্তা সংগ্রহে নিয়োগ প্রভৃতি নিয়াও পরীক্ষা চলিতেছিল। এ সকল পরীক্ষার অনেকগুলিরই আর্থিক উপযোগিতা ছিল না, সুতরাং কেবল পরিশ্রম ও অর্থের অসদ্ব্যবহারই হইতেছিল। আবার, অনেক পরীক্ষায় বেশ সুফল ফলিতেছিল। এইরূপে, সাফল্য ও নিষ্ফলতার ভিতর দিয়া ঔপনিবেশিকগণ পরবর্ত্তী যুগের আর্থিক উন্নতির ভিত্তি গঠন করিতেছিলেন।

আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদিগের নিকট ঔপনিবেশিকরা অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভুট্টা রেড ইণ্ডিয়ানদের একটী প্রধান আহার্য্য বস্তু ছিল এবং উহারা এই শস্যের চাষে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ইয়োরোপীয়দিগের ঔপনিবেশিক জীবনের সাফল্য বহু পরিমাণে এই ভুট্টার উপর নির্ভর করিয়াছিল। যখন কৃষিকার্য্যের জন্য যথেষ্ট শ্রমজীবী পাওয়া যাইত না এবং পাওয়া গেলেও অন্যান্য ফসলের অবস্থার কোন নিশ্চয়তা ছিল না, তখন ভুট্টাই ঔপনিবেশিকদিগের এবং তাহাদের পালিত গো-অশ্বাদির আহারের প্রধান উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্লাইমাউথের ঔপনিবেশিকরা একজন সম্ভ্রান্ত রেড ইণ্ডিয়ানের নিকট ভুট্টার চাষ শিখিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ার ঔপনিবেশিকগণ দুইজন বন্দী রেড্-ইণ্ডিয়ানের নিকট ভুট্টার চাষ শিখিয়া লন। এইরূপে ভুট্টার চাষ উপনিবেশগুলির অনেক স্থানেই প্রচলিত হইয়াছিল। আর একটী কার্য্যেও রেড্ ইণ্ডিয়ানরা ঔপনিবেশিকদিগকে সহায়তা দান করিয়াছিল। ঔপনিবেশিকরা যে প্রক্রিয়ায় বন পরিষ্কার করিয়া কৃষি-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিত তাহাতে প্রথম ফসলের জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইত। রেড্ ইণ্ডিয়ানরা ঔপনিবেশিকদিগকে শিখাইল কি করিয়া গাছের জীবনী শক্তি নষ্ট করিতে হয় এবং মৃত গাছগুলি দণ্ডায়মান থাকিতেই কি করিয়া চতুর্দ্দিকে চাষ-আবাদ করিতে হয় এবং ফসল-কর্ত্তনের পর ক্রমশঃ মৃত বৃক্ষগুলি দূর করিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। বন-পরিষ্কারের নামে ঔপনিবেশিকদের পূর্ব্বে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইত, কারণ এ কার্য্যে দারুণ শারীরিক শ্রমের আবশ্যক হইত। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের প্রথা অবলম্বন করার পর হইতে বন-পরিষ্কারের আতঙ্ক অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল। আড়াই শত বৎসরের অধিক কাল ঔপনিবেশিকরা রেড্ ইণ্ডিয়ানদের প্রদত্ত শিক্ষার সদ্ব্যবহার দ্বারা অনেক বন পরিষ্কার করিয়া বহু জনপদ ও কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি করিলেন। ইয়োরোপের সভ্যতা আদিম আমেরিকার অসভ্যতার সংস্পর্শ পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

নিউ ইংলণ্ড প্রদেশের ভূমি ও সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থা কৃষিকার্য্যের উপযোগী না থাকায় ঔপনিবেশিকদিগকে ভুট্টা, আলু, শাক-সব্জী ও গো-খাদ্য ঘাস ও বিচালি উৎপন্ন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ভুট্টাই প্রধান ফসলে পরিণত হইয়াছিল। ইহা একদিকে যেমন একটী প্রধান আহার্য্য বস্তুর কাজ করিত, অপর দিকে তেমনি ব্যবসার প্রধান পণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এতদ্ব্যতীত উহাতে বিনিময়ের কাজও চলিত। বিনিময়ের জন্য এই শস্যের নির্দ্দিষ্ট একটা পরিমাণের সহিত প্রচলিত মুদ্রার সমন্ধ আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত। যেমন, এক বুশেল ভুট্টা চারি শিলিংএর সমান অথবা অন্য কোনরূপ অনুপাত। ম্যাসাচুসেট প্রদেশে প্রথম অবস্থায় গমের চাষ আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উহা একরূপ উঠিয়া যায়। ইহার কারণ গমের ফসল কখন কিরূপ হইবে তাহা বুঝা যাইত না। নূতন জমিতে কখন কখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গমের ফসল ফলিত; কিন্তু অতি শীঘ্রই জমির উর্ব্বরতা-শক্তি হ্রাস পাইয়া যাওয়ায় কৃষকেরা এই শস্যের উপর নির্ভর করিতে পারিত না। পরবর্ত্তী কালে নিউ ইংলণ্ড প্রদেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ঐ স্থান হইতে গমের চাষী উঠিয়া যায় এবং মধ্যবর্ত্তী উপনিবেশসমূহ হইতে ইহার আমদানি হইতে থাকে। এই প্রদেশের কোন কোন স্থানে যথেষ্ট ঘাস জন্মিত। কৃষকদের পালিত পশুগুলি গ্রীষ্মকালে মাঠে চরিয়া পুষ্টিলাভ করিত। শীতকালের আহারের

জল খাদ শুকাইয়া রাখা হইত। আলু চাষ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে এই প্রদেশের স্থানে স্থানে শালগম, পিঁয়াজ, মটর, গাজর, পশা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। আপেল ফলের ফলন যথেষ্ট ছিল। নিউ-ইংলণ্ডে এই ফলের রস পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। গ্রীষ্মকালের শীতল পানীয় এবং শীতকালের মদিরা-সংযুক্ত উষ্ণ পানীয় আপেল রস হইতে প্রস্তুত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আলুর চাষ বড় একটা দেখা যাইত না। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী কৃষকেরা এ স্থানে প্রথম আলুর চাষ আরম্ভ করে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে, বরাবর আলু খাইয়া গেলে শরীর অসুস্থ হয়, কুসংস্কার ঔপনিবেশিকদিগকে এমনই বশীভূত করিয়াছিল যে, তাহাদের বিশ্বাস ছিল, প্রতিদিন আলু খাইলে কোন লোক সাত বৎসরের বেশী জীবিত থাকিতে পারে না। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে বহুদিন আলুর চাষ প্রচলিত হইতে পারে নাই। কুসংস্কার আর্থিক উন্নতির অন্তরায়।

গো, মেষ, অশ্ব প্রভৃতি পশুর চাষের দিকে এই প্রদেশের লোকের খুব দৃষ্টি পড়িয়াছিল। প্লাইমাউথ এবং মাসাচুসেট্‌স উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পরই তথায় পশুর আমদানি করা হয়। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে গো ও অশ্ব সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে আনীত হয়। প্রথমাবস্থায় ছাগের চাষও বেশ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে উহা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে এই স্থানে তুলার আমদানি হইত। তুলা হইতে পরিবারের অভাব নিবারণের অনেক জিনিষ তাঁতে বুনিয়াই প্রস্তুত করিতেন। ইংলণ্ড কিংবা স্কটিয়া সুইডেন হইতে লেন্স নামক একপ্রকার বস্ত্র আমদানি করা হইত। উহা হইতে দড়ি, থলা, ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইত। এ কার্য্যেও আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী ঔপনিবেশিকরা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

আটলান্টিক উপকূলস্থ মধ্যবর্ত্তী উপনিবেশগুলির ভূমি ও প্রাকৃতিক অবস্থা অন্যান্য উপনিবেশ অপেক্ষা কৃষির পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল। এইসকল স্থানে গমের চাষ শীঘ্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ইহা ছাড়া, বেচিবার জন্যও অন্যান্য শস্য, শাক-সব্জী, ফলমূলাদির পক্ষেও এই স্থানের ভূমি উত্তম ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই স্থানের কৃষি-জাত দ্রব্য এতই উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল যে, ঔপনিবেশিক আমেরিকার বণিকগণের প্রসার অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। উদ্বৃত্ত জিনিষগুলিকে একমাত্র ফিলাডেল্‌ফিয়া বন্দরে স্থানান্তরিত করিবার জন্য স্থলপথে প্রায় শত গাড়ীর বড় বড় অশ্বচালিত মালগাড়ীর আবশ্যক হইত। গাড়ী-গুলিকে টানিবার জন্য চারি হইতে আটটি অশ্বের প্রয়োজন হইত। জলপথেও বহু পরিমাণ শস্য নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেল্‌ফিয়ার প্রেরিত হইত। এই স্থানের শস্যের প্রাচুর্য্য হেতু পরবর্ত্তীকালে পাটাপস্কো ব্রাণ্ডিওয়াইন এবং ডেলাওয়ার নদীর তীরে শস্যচূর্ণ করিবার জন্য বহু কল স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্থানের কৃষকেরা গৃহপালিত পশুর পালন ও সংখ্যা-বৃদ্ধি সম্বন্ধেও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে মাংস, মাখন পনির প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের এবং জুতা ও অন্যান্য চর্ম্ম-নির্ম্মিত জিনিষের সংস্থান হইত। পর্য্যাপ্ত ঘাস ও শস্য থাকায় পেনসিল্‌ভেনিয়া প্রদেশের গরু-ঘোড়াগুলি বৃহদাকারের হইত এবং ঐগুলি সহজেই বেশী দামে বিক্রী হইত। পশু-পালন কার্য্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিকরা সুদক্ষ ছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টাই ঔপনিবেশিক যুগের সুবিখ্যাত 'কনেষ্টোগা' অশ্ব প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইত।

দক্ষিণ দিকের উপনিবেশগুলিতে বিশেষভাবে ধান, নীল ও তামাক এবং সাধারণভাবে ফল-মূল, শাক-সব্জী, গম, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। ভার্জ্জিনিয়ার এবং মেরিল্যাণ্ডে তামাকের চাষই বেশী হইত। দক্ষিণ ক্যারো-লিনার ভূমি ধান ও নীলের পক্ষে উপযোগী ছিল। এ সময়ে তুলার চাষের প্রতি লোকের দৃষ্টি বড় বেশী ছিল না, কারণ তুলা পরিষ্কার করিবার উপায় জানা না থাকায় উহা নিয়ে ব্যবসা করা চলিত না। ভার্জ্জিনিয়ার ভূমি গমের পক্ষে অত্যধিক উর্ব্বরা থাকায় চারা গাছগুলি অত্যন্ত সবল ও সতেজ হইয়া উঠিত এবং ফসল কম ফলিত; কিন্তু জমিতে আগে তামাক উৎপন্ন করিয়া পরে উহা গমের চাষে ব্যবহার করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত। সূকর, গরু ও ঘোড়ার ব্যবসায় অনেক কৃষক লাভবান হইত।

তামাকের চাষের পক্ষে ভার্জ্জিনিয়ার জমির উপযোগিতা সম্বন্ধে ঔপনিবেশিকদিগের কোন সন্দেহ ছিল না,—কারণ রেড্‌ইণ্ডিয়ানগণ পূর্ব্ব হইতেই ঐ স্থানে তামাকের চাষ করিয়া আসিতেছিল। ইয়োরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, তামাকের চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, রালফ্ লেন্ এবং সার ফ্রান্সিস ড্রেক রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের উদ্ভাবিত তামাকের (ধূমপানের) সরঞ্জাম ইংলণ্ডে আনয়ন করেন। ইহার পর হইতে পদস্থ এবং সাধারণ অনেক লোকে তামাকের ধূম সেবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা জেমস্ তামাক সেবনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেও লোকের ভিতর ধূমপানের অভ্যাস ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। সুতরাং ভার্জ্জিনিয়ার এবং মেরিল্যাণ্ডের তামাকের চাষও ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। বিস্তারের অন্যান্য কারণও বিদ্যমান ছিল। উপযুক্ত ভূমির অভাব ছিল না। চাষের জন্য দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বা বেশী মূলধনের আবশ্যক হইত না। নদী-পথে বন্দরে মাল প্রেরণের সুবিধা ছিল। সর্ব্বত্র তামাকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুতরাং কর্ষিত জমির পরিমাণ ও তামাক উৎপাদনকারী কৃষকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছিল।

তামাকের চাষে ভার্জ্জিনিয়ার ঔপনিবেশিকদিগের আর্থিক ও সামাজিক জীবন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এইস্থানের তামাকের খ্যাতি ও তামাক চাষের সাফল্য ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ার ফলে ইয়োরোপ হইতে মজুর, কৃষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আমেরিকায় আসিয়া জুটিতে লাগিল। ইহাতে তামাকের চাষ আরও বাড়িয়া যাওয়ায় মজুরের অভাব একটা গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল এবং সমস্যা দূরীকরণ জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ক্রীতদাসের আমদানি হইতে লাগিল। অপর দিকে তামাক চাষের জন্য ধনশালী ব্যক্তিরা বড় বড় জমীদারি কিনিতে লাগিলেন। অনেকে ঐ কার্য্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ খরচ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। শিল্প, কল-কারখানার দিকে এই স্থানের লোকের দৃষ্টি রহিল না। ফলে ভার্জ্জিনিয়ার লোক নিত্যাবশ্যক অনেক জিনিষ-পত্রের জন্য ইংলণ্ডের ও অন্যান্য উপনিবেশগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। আবার অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, তামাক চাষের সফলতায় ভার্জ্জিনিয়াবাসীদের আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পাইল, স্বাধীন ব্যবসায়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা আসিল, তাঁহাদের মধ্যে আভিজাত্যের ও নেতৃত্ব করিবার লোকের সৃষ্টি হইল। ইংলণ্ডের চাহিদামাফিক জিনিষ উৎপাদনের দিকে বেশী মনোযোগ না দিয়া তামাকের চাষেই ভার্জ্জিনিয়াবাসী আত্মনিয়োগ করিলেন। ফলে ইংলণ্ড ও উপনিবেশ এতদুভয়ের আগেকার পার্থক্য বৃদ্ধি পাইল। এই পার্থক্য একদিন স্বাধীনতা-লাভের যুদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মানুষের অর্থলাভজনিত লোভ তাহার বিকাশের পথকে মালাভাবে মুক্ত করিয়া দেয়।

ভার্জ্জিনিয়ার ঔপনিবেশিকরা ধান ও নীলের চাষের প্রতি প্রথমে কতকটা মনোযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। দক্ষিণ কেরোলিনা নামক প্রদেশে ঐ দুই জিনিষের চাষে সুফল ফলিল। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে বা উহার কাছাকাছি কোন সময়ে টমাস স্মিথ্ ব্যাডাগাস্‌কার জাতীয় ধান নিম্ন উচ্চ ভূমিতে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল, উচ্চ ভূমি অপেক্ষা নিম্ন জলাভূমিতে ধানের চাষ ভাল হয়। উহার পর হইতে দক্ষিণ কেরোলিনাতে ধানের চাষ বাড়িতে থাকে। ধানের চাষে ইয়োরোপীয় মজুর অপেক্ষা নিগ্রোজাতীয় মজুর অধিকতর কর্ম্মঠ ছিল, এজন্য নিগ্রো ক্রীতদাসের সংখ্যা এ প্রদেশেও বাড়িতে থাকে। প্রথমে কৃষকেরা নিজেরাই দৈহিক শ্রম দ্বারা ধান হইতে চাউল বাহির ও পরিষ্কার করিতেন, পরে এ কার্য্যে অশ্ব-শক্তি বা জল-স্রোতের শক্তি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ কেরোলিনা হইতে এক লক্ষ ব্যারেলের উপর ধান রপ্তানি হইয়াছিল। নীলের চাষ এ প্রদেশে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে। উদ্ভিদ হইতে নীল প্রস্তুতের জন্য অনেক পরিশ্রম আবশ্যক, এজন্য একার্য্যেও নিগ্রো ক্রীতদাস নিযুক্ত হইত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে দুই লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী নীল ইংলণ্ডের বাজারে প্রেরিত হয়। ধান ও নীলের চাষে দক্ষিণ কেরোলিনার প্রভূত

অর্থাগম হইতে থাকে। ফলে ভার্জিনিয়ার মত উহার সামাজিক অবস্থারও দ্রুত উন্নতি হয়।

লুইজিয়ানা প্রদেশের প্রধান কৃষি-জাত দ্রব্য ছিল ধান, তামাক, নীল ও কোন কোন খাদ্য-শস্য। রেড্ এবং ইয়াজু নদীর কূলে উৎকৃষ্ট তামাক অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত। কখন কখন তামাকই এই স্থানের প্রধান রপ্তানির জিনিষ হইয়া দাঁড়াইত। নিগ্রো ক্রীতদাসদিগকে নীলের চাষে ও নীল-প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট নীল উৎপন্ন করা হইত। ফরাসীর ঔপনিবেশিকরা তুলা, নানাপ্রকার তরকারী ও ফলমূলাদি উৎপন্ন করিতেন। এই প্রদেশে তুলার চাষ নিয়া কিছুদিন পরীক্ষা চলিয়াছিল, কিন্তু তুলা পরিষ্কার করিবার প্রণালী অপরিজ্ঞাত থাকায় কৃষকেরা উহাতে লাভবান হইতে পারে নাই। লুইজিয়ানা চিনি প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযোগী ছিল; কিন্তু এদিকে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই। এই সময়ে সান্টোডমিনগো হইতে আখের চারা ও আখের চাষে অভিজ্ঞ কয়েকজন নিগ্রো জেসুইট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক লুইজিয়ানায় প্রেরিত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে একটী ছোট চিনির কল স্থাপিত হইল। কিন্তু কলের কর্ত্তাদের মূলধন এবং অভিজ্ঞতা না থাকায় বিশেষ কিছু লাভ হইল না। ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে নীলের ফসল মারা যাওয়ায় আবার লোকের দৃষ্টি চিনির উপর পড়ে। এই সময়ে, আখের রসকে যে চিনির দানায় পরিণত করা যায় তাহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইল। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই লুইজিয়ানা যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষাধিক পাউণ্ড চিনি যোগাইতেছিল। লুইজিয়ানার উত্তরাংশে কিছু কিছু সময় চাষ হইত, কিন্তু তুষ্টার ফসল খুবই ফলিত। গো-শূকর পালনের ব্যবসায় লাভ বন্ধ হইত না।

পাট-চাষীর বিক্রী-ব্যবস্থা

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, এম্, এ, সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন

আসাম বিহার ও আসাম অঞ্চলের পাট লইয়া বাংলা দেশে প্রতি বৎসর কম-বেশী ৫ কোটি মণ পাট উৎপন্ন হয়। পাট খাদ্য-কৃষি নহে, অর্থাগমের জন্যই ইহা চাষ করা হয়। কাজেই এই ৫ কোটি মণের প্রতি সের পাটই বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। অথচ দুঃখের বিষয় দেশের এই বৃহৎ পণ্য-সম্ভারের বিক্রয়-ব্যবস্থা আধুনিক কালোপযোগী ত নয়ই—বরং চাষীর দিক্ হইতে শোচনীয়। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশের চাষীর স্ব স্ব চাষ-ভূমি সাধারণতঃ বৃহৎ নহে। বাঙ্গালার কৃষক দরিদ্র ও নিঃসম্বল; কাজেই প্রত্যেক চাষীর উৎপন্ন পাট সামান্যই। আমরা অনুমান করি বাংলার এই পাঁচ কোটি মণ পাট অন্ততঃ ২০ লক্ষ বিভিন্ন চাষীর সমবেত শক্তিতে উৎপন্ন। একই দ্রব্য ২০ লক্ষ লোক উৎপাদন করিলে তাহা বাজারে পণ্যরূপে চালান যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। বাজারে টান থাকিলেই জিনিষ বিক্রী হয়—সে হিসাবে উৎপাদকের সংখ্যা-নিরপেক্ষ পাটও বিক্রী হইবে এবং হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থনৈতিক জগতে বাজার মানে হাট বা ক্রয় বিক্রয়ের স্থান নয়—হাটে পণ্যের কেনাবেচা বসাইলেই যথার্থ বিক্রী-ব্যবস্থা হইল না। ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা যখন এমন হইবে যে টান চালানের প্রভাব অব্যাহতভাবে মূল্যনির্দ্ধারণে ক্রিয়াশীল করিতে পারে, তখনই যথার্থ বাজারের সৃষ্টি হইল। বাংলার চাষীর উৎপন্ন পাট বিক্রীতে আজ তেমন সুব্যবস্থিত বাজারের নিতান্তই অভাব। উৎপাদকের সংখ্যাধিক্য ছাড়াও ইহার অন্য এক কারণ আছে। চিরকাল বাংলার কৃষক খাদ্য-কৃষিরই চাষ করিয়াছে, অর্থকরী কৃষি কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না। যেবার যখন ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে ধনিক ওলীয়ন্ত ব্রহ্মপুত্রের শাখা কাটিয়া বাংলার ক্ষেত্রে এই নূতন চাষের বান বহাইলেন, তখন বাংলার কৃষক

আকণ্ঠ ঋণে দাঁড়াইয়া এই চাষ শিখিল বটে, কিন্তু চাষী চাষীই রহিয়া গেল, ব্যবসায়ী হইল না, পাট উৎপন্ন করিতে শিখিল বটে কিন্তু পণ্য হিসাবে ইহাকে কি করিয়া বাজারে চালাইয়া সর্ব্বোচ্চ দাম পাওয়া যাইতে পারে তাহা শিখিল না। চাষীকে আজ বিক্রেতার কল-কৌশল শিখাইবার দিন আসিয়াছে।

বাংলার কৃষক-সমাজের সহিত কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা গ্রন্থ-জাত সহানুভূতি জন্মিয়াছে। অনেকেরই ধারণা পাটের কৃষকের দারিদ্র্যে কলিকাতার পাট-ব্যবসায়ী, পাট-সওদাগর ও পাটের কলওয়ালাদের সমৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর যে সরকারী কৃষি-তদন্ত হইয়া গিয়াছে তাহার রিপোর্টেও এমন স্বীকারোক্তি আছে যে, পাটের বাজারে যথার্থ ক্রেতা ব্যতীত যে সমস্ত ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংখ্যা কখনো কখনো অনাবশ্যকভাবে অধিক এবং বিক্রীব্যবস্থা কোন কোন অংশে চাষীর স্বার্থ লাভের পরিপন্থী। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী রিপোর্টে ও বে-সরকারী মহলে মৌখিক সহানুভূতি যতই থাক, বাংলার পল্লীগ্রামে কৃষকেরা কিভাবে পাট বিক্রয় করে তাহার বিশেষ বিবরণ কেহই অবগত নন। "কড়িয়া" "বেপারী" ও "আড়তদার" প্রভৃতি কয়েকটী স্থূল সংজ্ঞামাত্র অবলম্বন করিয়া তর্ক-বিতর্কে সংবাদপত্রের কলেবর ভারাক্রান্ত করা হইতেছে। গ্রামে বিক্রয় না করিয়া দূরের হাটে চাষীরা পাট বিক্রয় করে কি না, করিলে কি পরিমাণ করে, তাহাতে নৌকার খরচ বাদ দিয়া চাষীর বেশী লাভ থাকিতে পারে কি না, গ্রামে গাদা-বিক্রীর জন্য চাষীর কতটুক ক্ষতি হয়, পাটের মোকামে শ্রেণী-অনুযায়ী দাম দেওয়া হয় কি না, শ্রেণীবিভাগের অসুবিধা কি, "দাদন" প্রথা কতটুকু প্রচলিত আছে, কলিকাতার বাজারের উঠতির সঙ্গে গ্রামের কৃষক উচ্চতর মূল্য আদায় করিতে পারে কি না। চাষীর অভাবজনিত আশুবিক্রীতে কতটুকু মূল্য-হ্রাস হয়, অবিক্রীত পাটের উপর চাষীর ধারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না, পাটের বাজারের এই সমস্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রশ্ন সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত তথ্য-সংগ্রহ কিংবা অনুসন্ধিৎসা কিছুই হয় নাই।

লর্ড সিন্‌হিথগোর সভাপতিত্বে দুই বৎসর পূর্ব্বে যে কমিশন বসিয়াছিল তাঁহারা এই পাট বিক্রয়ের সম্বন্ধে যথার্থ তথ্যের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছেন। কাজেই কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অচিরে বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হউক। কিন্তু তাঁহারা উহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পাটের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যাহাতে বিধি-নিয়ন্ত্রিত সরকারী উদ্যমে হাট প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, তাহারও প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সরকারী হাট বাংলা দেশে এক নূতন জিনিষ। কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বেরার অঞ্চলে তুলার জন্য এই প্রকার অসংখ্য হাট পল্লীগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশেও এই প্রকার হাটের পত্তন হইতেছে। প্রস্তাব এই যে এই সব হাটের কর্ত্তা হইবেন একটী কমিটি—যাহাতে অধিকাংশ সভ্যই হইবেন চাষীর প্রতিনিধি। তাঁহারা যথার্থ ওজনের জন্য বৈজ্ঞানিক তুলা-দণ্ড রাখিবেন, পাটের যথার্থ শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিবেন, কলিকাতার দরের যথার্থ খবর দিবেন এবং বাজারের সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যসহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতায় একটী "কেন্দ্র পাট কমিটি" প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই কমিটি বিশেষ ভাবে পাট-উৎপাদন ও পাট শিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবেন। কিন্তু চাষীর বিক্রয়-ব্যবস্থা উন্নয়ন কল্পিতেও ইঁহারা অবহেলা করিবেন না। চাষীর পক্ষ হইতে এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উপকারিতা এই দেশে, ইহাতে পল্লীগ্রামের পাট-চাষীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হইবে। কেন্দ্র কমিটির চেষ্টা থাকিবে যাহাতে কৃষক তাহার ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত না হয়, যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে অর্থাৎ দেশ বিদেশে পাটের দাম চড়া থাকে এবং যাহাতে পাটজ শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শুধু সরকারী হাটের পত্তন ও কেন্দ্র কমিটির প্রতিষ্ঠা হইলেই পাট চাষীর বিক্রয় ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে কি না। কৃষকের দুঃখ আংশিক ভাবে দূর হইতে পারে কিন্তু আশানুরূপ হইবে না। পাট চাষীর বিক্রয়-ব্যবস্থায় গোড়ার কথা চাষীর অর্থাভাব। তাহার

এমন সঙ্গতি নাই—অন্ততঃ অনেক ক্ষেত্রেই—যে সে বাল বিক্রয়ের জন্য ভাল বাজারের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। বহু সে বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইবার পূর্ব্বেই "দাদন" খাইয়া মূল্য ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। পাটের মোড়া ঘরে তুলিবার আগেই ভাবিতেছে কতক্ষণে সে বেচিয়া নগদ টাকা হাতে পাইবে। কাজেই সমস্যা হইয়াছে কি করিয়া চাষীকে অত্যাবশ্যক বিক্রীর তাড়া হইতে বাঁচানো যায়। বিক্রী-ব্যবস্থার জন্য কল, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। নগরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের আটকানো মালের উপর ধার লইয়া পরে বিক্রয়-লব্ধ অর্থে তাহা শোধ দিয়া থাকেন। পাটের ক্রেতারাও এইরূপ লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ প্রতি বৎসর পাইয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক যদি এই ধার ক্রেতাকে না দিয়া বিক্রেতাকে দেয়, মধ্যস্থ মহাজনকে না দিয়া চাষীকে দেয়, তাহা হইলেই পাটে চাষীর শ্রমের যথার্থ মূল্য উহারাই পাইতে পারে।

কাজেই আবশ্যক প্রতি হাটে পাট-চাষীদের সমবায়-ঋণ বিক্রয় সমিতির প্রতিষ্ঠা করা। বর্ত্তমানে যে সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি আছে তাহা হইতে আমাদের প্রস্তাবিত ঋণ-বিক্রী সমিতিগুলি বিভিন্ন হইবে। বর্ত্তমান সমিতিগুলি সভ্যদের সঞ্চিত মাল বিক্রী করে মাত্র—ইহারা ধার দেয় না। কাজেই যাহাদের অর্থের আসল প্রয়োজন সমবায় বিক্রী সমিতি তাহাদের কোনও কাজে আসে না। আমাদের প্রস্তাব এইরূপ, ঋণ-বিক্রয় সমিতিগুলি সভ্যদের মাল উপযুক্ত দরে উপযুক্ত সময়ে বিক্রয় করিবে; কিন্তু যাহাতে চাষীর অর্থাভাব না হয় সেই জন্য দরকার হওয়া মাত্র সমিতি তাহাদের গুদামে পাট পাইয়া আংশিক পরিমাণে (মণকরা ৩।৪৲) যেন চাষীকে ধার দিতে পারে। এই ধারের ব্যবস্থা করিতে হইলে সমিতিগুলির হাতে অর্থ দিতে হইবে। আমাদের প্রস্তাব যে, এই সমিতিগুলির যদি কলিকাতায় একটী কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান রাখা হয় তাহা হইলে অর্থের ব্যবস্থা করা শক্ত হইবে না। কলিকাতার বড় বড় ব্যাঙ্ক পাট গচ্ছিত রাখিয়া প্রতি বৎসর বহু অর্থ ধার দেয়। সরকারের সোষকতায় চাষীর পাট বন্ধক রাখিয়া কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানকে ধার দিবার প্রস্তাবও তাহাদের সহজেই গ্রাহ্য হইতে পারে। এমন কি দরকার হইলে টাঁকশাল হইতে মাস তিনেকের জন্য পাঁচ কোটি টাকা ধারেরও ব্যবস্থা হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই প্রকার টাকা পাইলেই বাংলার প্রতি পাটের হাটে একটী ঋণ-বিক্রয় সমিতির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে।

একটা কথা। যথাযথ পাটের শ্রেণী-বিভাগ না হইলে বিভিন্ন চাষীর পাট সংমিশ্রণের এবং কাজে কাজেই ঋণ-বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় আছে। আইন দ্বারা যথাসম্ভব পাটের শ্রেণী-নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাহা না হইলেও অনেক হাটেই চাষী চলতি শ্রেণী হিসাবে তাহাদের পাট সংমিশ্রণে কোন আপত্তি করিবে না। বাংলার পাট কৃষকের শ্রমের ন্যায্য মূল্য যদি তাহাকে পাইতে হয়, বাংলার কৃষকের আর্থিক অবস্থা যদি যথার্থ উন্নত করিতে হয়, তবে এই সুবিশাল কৃষক-সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে, আমাদের প্রস্তাবিত এই ঋণ বিক্রয় সমিতি স্থাপন করিয়া।

রুশিয়ার "গস্‌প্ল্যান"

প্ল্যান ক'রে দেশের আর্থিক জীবন চালানো কি সম্ভব? বড় জোর বড় বড় ফ্যাক্টরী, বা বড় বড় ট্রাষ্ট আগে হতে প্ল্যান ক'রে সেই প্ল্যান অনুযায়ী চালানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একটা দেশের অর্থনৈতিক জীবন কোন্ দিকে কি রকমভাবে চল্‌বে, তা আগে থাকতে ঠিক ক'রে নিয়ে, সেই অনুযায়ী চালানো অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য মাঝারিশ্রেণীর ফ্যাক্টরী ব্যাঙ্ক, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি-জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কত টাকা দেওয়া হবে, তারা কি পরিমাণ উৎপাদন করবে, তাদের

উন্নতির জন্য কি কি করা দরকার, এ সমস্ত আগে থাকতে স্থির করে নিয়ে, সেই প্লান অনুযায়ী কাজ চালানো—এটা জগতে এ পর্য্যন্ত কোথাও সম্ভব বলে মনে করা হয় নি। কিন্তু আধুনিক রুশিয়া এটা সম্ভব বলে মনে করেছে এবং এ দিকে অনেকটা সফলও হয়েছে। এ বিষয়ে রুশিয়ার দুঃসাহসিকতা দেখে অবাক না হয়ে থাকা যায় না।

রুশিয়াতে একটী কমিটি আছে তার নাম "গসপ্লান।" এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সনে। বলশেভিকরা যখন প্রথম প্রবল হয়, তখন অনভ্যাসবাদ পুরাপুরি চালাবার চেষ্টা হয়। কিন্তু নানা কারণে সে চেষ্টা বিফল হয়। তখন লেনিন তাঁর "নূতন আর্থিক-নীতি" জারি করলেন। এর ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং বেসরকারী উৎপাদন ও ব্যবসা কিছু কিছু জেগে ওঠে। লেনিনের নতুন নীতি কাজে লাগাবার একটী প্রধান অঙ্গরূপেই গসপ্লানের সৃষ্টি হয়। গবর্মেণ্টের অধীন সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলা গসপ্লানের আদেশের অধীন করে দেওয়া হয়। সেই সময় হতে গসপ্লানই রুশিয়ার আর্থিক জীবন চালাচ্ছে। ১৫ বছরের একটা মোটামুটি প্রোগ্রাম এবং প্রত্যেক ৫ বছরের ও প্রত্যেক পরবর্ত্তী বছরের একটি বিস্তারিত প্রোগ্রাম স্থির করে সেই অনুযায়ী গসপ্লান রুশিয়ার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলার পরিচালনা করছে।

ষোলজন বিশেষজ্ঞ—কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ কেমিষ্ট, কেউ বনবিজ্ঞান-সেবী—গসপ্লানের মেম্বার। কমিটির মেম্বাররা রুশিয়ার মন্ত্রী-সভা—"কাউন্সিল অব দি পিপল্‌স্ কমিসারস্"—কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত এবং তাঁদেরই নিকট দায়ী। আইনের দিক্ থেকে কমিটিটি কেবল একটা পরামর্শ দেবার সভামাত্র, কিন্তু কার্য্যতঃ এটাই আর্থিক রুশিয়ার সকল বিষয়ে চরম কর্ত্তা।

মস্কো সহরে ক্রেমলিন প্রাসাদের কাছে এর একটা প্রকাণ্ড আফিস হয়েছে। ৫ শতেরও উপর লোক সেখানে খাটছে। অবিশ্রান্ত কর্ম্মপ্রবাহের আবহাওয়ায় সারা আফিসটিকে ছেয়ে আছে। পার্শিয়ানওয়ালা ছোট ছোট ঘর, টাইপরাইটিংএর অবিশ্রান্ত শব্দ, হিসাব করবার কলের আওয়াজ, ফাঁপা প্লানের ছড়াছড়ি! কর্ম্মচারীদের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব—এ সব দেখলেই বোঝা যায় যে, সমগ্র আফিসটি তার গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

গসপ্লানের কাজ করবার মত অবকাশ রুশিয়ার আছে কি? অর্থাৎ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষির কতখানি গবর্মেণ্টের হাতে আছে? এর উত্তর এই যে, রুশিয়ার আর্থিক জীবনের সমগ্রটা না হলেও, প্রায় সমগ্রটা, রুশিয়ার গবর্মেণ্টই চালাচ্ছে। কৃষিতে শতকরা ৯০ ভাগ, খুচরা দোকানবাজিতে শতকরা ৩০ ভাগ এবং ফ্যাক্টরী সাহায্যে উৎপাদনে শতকরা ১০ ভাগ ব্যক্তিগত উৎপাদক বা ব্যবসাদারের হাতে আছে; কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বাকী ভাগগুলা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃকই (কিছু কিছু সমবায় সমিতি কর্ত্তৃকও) চালিত হচ্ছে। এ ছাড়া রুশিয়ার গবর্মেণ্ট রেল ও জাহাজ চালাচ্ছে। টেলিগ্রাফ টেলিফোঁর ও বিজলী ঘরের পরিচালনা করছে এবং বাজার দর, মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং, কর্জ্জ, আমদানি রপ্তানি—এই সবই নিজের হাতে রেখেছে।

সরকারী ফ্যাক্টরীগুলা শত শত ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক চালিত হচ্ছে। ট্রাষ্টগুলা গবর্মেণ্টেরই সম্পত্তি এবং অনেকটা স্বাধীন। কেবল ট্রাষ্টগুলার ম্যানেজার নিয়োগ, উৎপন্ন মালের বাজার-দর নিরূপণ ও পুঁজি-নিয়োগ সম্বন্ধে ট্রাষ্টগুলা গবর্মেণ্ট-কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ট্রাষ্টের লাভটা অন্যদেশে অংশীদারেরা পায়, রুশিয়াতে সেটা গবর্মেণ্ট পায়।

দেখা যাচ্ছে যে, রুশিয়াতে গবর্মেণ্টের অর্থনৈতিক কারবারের তালিকাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নয়। এতেই বোঝা যায় যে, গসপ্লানের কাজ করবার অবকাশটা কতখানি এবং তার দায়িত্বের পরিমাণই বা কত।

গসপ্লানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব কম শ্রম খরচ করে দেশের উৎপাদন যতদূর সম্ভব বাড়ানো। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর দিকেই কেবল নজর দিলে চলবে না—মজুরদের দিকটাও দেখতে হবে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে মজুরদের সুখ, সুবিধা, স্বার্থ এগুলা অবহেলা করা হবে না। অর্থাৎ মজুরদের স্বাস্থ্য, নির্ব্বিঘ্নতা, শিক্ষা, অবসর, কর্ম্মস্থানের অবস্থা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে।

উক্ত উদ্দেশ্য লাভ করবার জন্যে যে সব উপায় অবলম্বন করা হবে ঠিক করা হয়েছে তাদের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ করা যাচ্ছে—(ক) যেখানে কাঁচামাল পাওয়া যায় তাহার কাছে ফ্যাক্টরী স্থাপন ; (খ) প্রতিযোগিতার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় বাড়াবার চেষ্টা—এই সবের লোপ সাধন ; (গ) যে সব শিল্প অন্যান্য পিছিয়ে আছে (যেমন লোহা ও ইস্পাত শিল্প) সেইগুলিতে বেশী পুঁজি ঢেলে তাদের উন্নত করবার চেষ্টা করা ; (ঘ) যেখানে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার তুলনায় বেশী, সেখান থেকে টাকা তুলে নেওয়া ; (ঙ) রুশিয়ার লোকের জন্যে—জুতা, কাপড়, চিনি প্রভৃতি-যে জিনিষ যত পরিমাণে দরকার, তার বেশী উৎপাদন না করা ; (চ) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শক্তির উপরই নির্ভর করা।

প্রথম হতেই গস্‌প্ল্যানকে প্রধানতঃ দুটী বিপদের সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল :—(১) প্রত্যেক শিল্প ও রুশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশ ও জেলা বেশী বেশী পুঁজির জন্যে তাগাদা করছিল, অথচ চাহিদা মিটাবার মত পুঁজি গস্‌প্ল্যানের কাছে ছিল না ; (২) দেশের আর্থিক জীবনের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে নির্ভুল সংখ্যা সংগ্রহ না থাকলে একটা বিরাট দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনকে এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র হতে নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব ; অথচ নির্ভুল সংখ্যা-সংগ্রহ রুশিয়াতে ছিল না ; সংখ্যা-তালিকার অভাবটা গস্‌প্ল্যানকে প্রথম প্রথম বেশ তীব্রভাবেই অনুভব করতে হয়েছিল।

প্রথম অভাবটা এখনও মেটে নি। এখনও রুশিয়া পুঁজির অভাব বোধ করছে। দ্বিতীয় অভাবটা অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে অনেকটা মেটাবার উপায় হয়েছে।

গস্‌প্ল্যানের বর্ত্তমান চেষ্টা হচ্ছে প্রধানতঃ দুটী :—(১) উৎপাদনকে প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের সমান করা ; (২) আর্থিক বিষয়ে রুশিয়াকে সকল দিক্ হতে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা।

প্রথম চেষ্টাটী ইতিমধ্যেই অনেকটা সফল হয়েছে। বেশীর ভাগ শিল্পেই উৎপাদন প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে। কোন কোন শিল্পে এখনও তার চেয়ে কম। মোটের ওপর, প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের উৎপাদনের হারটায় পৌঁছানো হয়েছে বলা চলে।

দ্বিতীয় বিষয়ে চেষ্টাটা বড় সহজ নয়। রুশিয়া খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল যথেষ্ট উৎপন্ন করে সত্য ; কিন্তু কারখানা-জাত মালের দিক্ থেকে রুশিয়া বড় পশ্চাৎপদ্। কারখানা-জাত মাল খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের বদলে বিদেশ থেকে সস্তায় কেনা হয়। দেশে উৎপাদন করতে গেলে খরচ পড়বে বেশী। সেইজন্যে এদিকে রুশিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছে।

কোন্ শিল্পে কতটা স্বাবলম্বী হতে হবে সেটা মোটামুটি ঠিক ক'রে নেওয়া হয়েছে। স্থির করা হয়েছে যে, লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতি এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে যা কিছু দরকার তা সবই রুশিয়ার মধ্যেই উৎপন্ন করতে হবে। রবার, তুলা, কর্ক প্রভৃতির উৎপাদনের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আবাদ এবং মোটরগাড়ী ও মোটর চালিত লাঙ্গলের কারখানা তৈরীর কথাও হচ্ছে।

১৯২৬ সনের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৩১ সনের ১লা অক্টোবর—এই ৫ বছরের মধ্যে শিল্পোৎপন্ন জিনিষের পরিমাণ শতকরা ৭৮ ভাগ, কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো হবে ঠিক করা হয়েছে। সুতরাং শিল্পজাত জিনিষের বার্ষিক বৃদ্ধি হবে শতকরা ১৫ হারে এবং কৃষিজাত জিনিষের বার্ষিক বৃদ্ধি হবে শতকরা ৬ হারে। বস্তুতঃ, ১৯২৭ সনে ঐ নির্দ্ধারিত অঙ্কগুলায় প্রায় পৌঁছানো হয়েছিল। ১৯২৭ সনে শিল্পজাত মালের বৃদ্ধি হয়েছিল শতকরা ১৩·৭ ; কৃষিজাত জিনিষের বৃদ্ধি হয়েছিল শতকরা ৮·৭। এ থেকে মনে হয় যে, গস্‌প্ল্যান নিতান্তই একটা অসম্ভব আকাশ-কুসুম ফাঁদে নি। প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা তার আছে।

১৯২৮ সনের জন্যে ১৯২৭ সনে যে প্রোগ্রামটা ঠিক করা হয়েছিল তার মোট কথাগুলা এই—(১) ১৯২৭ সনে ৯,৬০৬,০০০,০০০ ডলার দামের কৃষি ও শিল্প-জাত মাল তৈরী হয়েছিল ; ১৯২৮ সনে ১০,৮১৪,০০০,০০০ ডলার দামের মাল উৎপন্ন করা ; (২) ১৯২৮ সনে জিনিষপত্রের দাম কমাবার ব্যবস্থা ; এর ফলে মালের পরিমাণ হিসাব করলে আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন-বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩·২ হলেও, দামের দিক্ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির হার হবে

শতকরা ৬·৪ ; (৩) মজুরদের উৎপাদন-শক্তি শতকরা ১১ ভাগ বাড়ানো ; (৪) যান-বাহন শতকরা ১২ ভাগ বাড়ানো ; (৫) উৎপাদন খরচা শতকরা ৬ ভাগ কমানো (৬) মোট ২,৬৭৮,০০০,০০০ ডলার শিল্প-বাণিজ্যে ফেলা ; তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-চালিত শিল্পগুলাতে ৬০০,০০০,০০০ ডলার, যানবাহনে ৩৮৫,০০০,০০০ ডলার এবং কলকারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য ১৪৩,০০০,০০০ ডলার দেওয়া ; (৭) যে সব মজুর শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের শতকরা ৮০·৬ ভাগ গবর্ণমেণ্টের ও সমবায় সমিতিগুলার অধীনে খাটে, এদের আরও বেশী সংখ্যায় গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত করা ; (৮) কেনা-বেচার শতকরা ৭২·৬ ভাগ গবর্ণমেণ্ট ও সমবায় সমিতিগুলার অধীনে ; এটা শতকরা ৮৪·৫ ভাগে দাঁড় করানো ; (৯) ভোগ্য জিনিষের উৎপাদনের দিকে আগেকার চেয়ে কম নজর দিয়ে, উৎপাদন-সহায়ক মাল তৈরীর উপরই বেশী ক'রে জোর দেওয়া ; (১০) কর্জ্জের পরিমাণ শতকরা ২৩·২ ভাগ বাড়িয়ে মোট ৮০৫,১২৫,০০০ ডলারে দাঁড় করানো ইত্যাদি।

ব্যক্তি-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ভাল, না সমাজ-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ভাল—এ নিয়ে জগতে কুড়ি কুড়ি লেখা হয়েছে এবং অনেক বক্তৃতাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এ বিষয় নিয়ে চর্চ্চা করেছেন তাঁদের এ পর্য্যন্ত কল্পনার উপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। কারণ, জগতে এ পর্য্যন্ত সমাজ-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছিল না। রুশিয়া সেই অভাব পূরণ করেছে। রুশিয়ার চেষ্টার সফলতা বা বিফলতা জগতের ধনবিজ্ঞান-সেবীদের গবেষণার জন্য যে প্রচুর বাস্তব তথ্য যোগাবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মজুরি তত্ত্ব

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

অন্য যে সব জিনিষের কেনাবেচা হয় ও পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান যায়, তাদের মত শ্রমেরও একটা স্বাভাবিক দর ও একটা বাজার দর আছে। যে দর বজায় থাকিলে মজুরেরা,—প্রত্যেক মজুর,—জীবনধারণ ও বংশ-কয় না করিয়া বংশ-রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেই দরই হইতেছে শ্রমের স্বাভাবিক দর।

মজুরের আত্ম-পোষণের ক্ষমতা এবং মজুর-সংখ্যা অব্যাহত রাখিবার জন্য যে পরিমাণ দরকার তাহা পোষণের ক্ষমতা নির্ভর করে, মজুরি হিসাবে প্রাপ্ত মুদ্রার পরিমাণের উপর নয়, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ যে খাদ্য, "প্রয়োজনীয়" দ্রব্যাদি ও সুবিধাসমূহ তার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তার কি পরিমাণ সে ঐ মুদ্রার সাহায্যে ক্রয় করিতে পারিবে তার উপর। অতএব, মজুর ও মজুরের পরিবার পোষণ করিবার জন্য যে খাদ্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সুবিধাসমূহ দরকার হয়, তাদের দরের উপর শ্রমের স্বাভাবিক দর নির্ভর করে। খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের দরে যদি বৃদ্ধি ঘটে, শ্রমের স্বাভাবিক দর চড়িবে ; উহাদের দরে হ্রাস ঘটিলে শ্রমের স্বাভাবিক দর নামিবে।

যে সব দ্রব্য দ্বারা শ্রমের স্বাভাবিক দর নির্ণীত হয়, তার মধ্যে প্রধান দ্রব্যটির উৎপাদন-কৃচ্ছ্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ, মহার্ঘতার দিকে উহার প্রবণতা হয়। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের স্বাভাবিক দর সর্ব্বদা বাড়িতে চাহে। তাহাতে কৃষির উৎকর্ষ-সাধন, নূতন নূতন বাজারের আবিষ্কার ও তথা হইতে খাদ্য-সম্ভার আমদানির

ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের দর-বৃদ্ধির প্রবণতাটা কিছু কালের জন্য চাপা থাকিতে পারে, এমন কি ওগুলির স্বাভাবিক দর নামিয়া পর্য্যন্ত যাইতে পারে; ঠিক তেমনি তুল্য কারণে শ্রমের স্বাভাবিক দরে অনুরূপ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইবে।

ধনবল ও জনবলের উন্নতি ঘটিলে, সমস্ত দ্রব্যের—কাঁচা মাল ও শ্রম ব্যতিরেকে সমস্ত দ্রব্যের—স্বাভাবিক দর নামিয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, যদিও একদিকে এগুলি যে কাঁচা মালে তৈরি হয় তার স্বাভাবিক দর বাড়ে ও সেজন্য এগুলির প্রকৃত দাম বর্দ্ধিত হয়, তথাপি অন্যদিকে কলের উৎকর্ষসাধনে, উৎকৃষ্টতর শ্রমবিভাগে ও শ্রমসঙ্কটে, উৎপাদকদের বর্দ্ধিত কুশলতায়—বিজ্ঞান ও কলা উভয়-দিকের কুশলতায় সেই বৃদ্ধির যথেষ্ট পরিমাণে শোধ হইয়া যায়।

টানের অনুপাতে ও যোগানের ক্রিয়া অনুসারে, শ্রমের জন্য প্রকৃতই যে দর চুকাইয়া দেওয়া হয়, তাই হইল উহার বাজার-দর। শ্রম যখন দুষ্প্রাপ্য, তখন তাহা দুর্ম্মূল্য। শ্রম যখন প্রচুর তখন তাহা সস্তা। শ্রমের বাজার দর তার স্বাভাবিক দর হইতে বটই না কেন কাছাকাছি থাকে, দ্রব্যাদির ন্যায় ইহারও প্রবণতা হইতেছে স্বাভাবিক দরের সহিত মিশ খাওয়া।

শ্রমের বাজার দর স্বাভাবিক দরের উপরে থাকিলে, মজুরের অবস্থা শ্রীসম্পন্ন ও সুখময় হয়, সে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আনন্দ অধিক পরিমাণে উপভোগ করে ও ফলে সবলকায় ও বৃহৎ পরিবার পালন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। চড়া মজুরি লোকবল বৃদ্ধিকে প্রোৎসাহিত করে। তাতে মজুরের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় ও মজুরি আবার স্বাভাবিক দরে নামিয়া আসে, কখনো কখনো প্রতিক্রিয়া-বশতঃ উহার নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া যায়।

শ্রমের বাজার দর স্বাভাবিক দরের নীচে থাকিলে, মজুরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। তখন দারিদ্র্য তাহাদিগকে সেই সব স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করে, যা নাকি অভ্যাসবশতঃ একদম প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুঃখদারিদ্র্যে ইহাদের সংখ্যা কমিয়া যাওয়া চাই, নয় শ্রমের টান বাড়া চাই, যাতে তখন বাজার দর বাড়িয়া স্বাভাবিক দরের সমান হইবে ও মজুর স্বাভাবিক হারে মজুরি পাইয়া যতখানি সম্ভব অন্ততঃ ততখানি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

মজুরি স্বাভাবিক হারের সহিত তাল রাখিয়া চলে। তা সত্ত্বেও, উন্নতিশীল সমাজে মজুরির বাজার দর অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া অনবরত উহার উপরে থাকিতে পারে। পুঁজিপাটার বাড়্ ঘটিলে শ্রমের জন্য নূতন টান জন্মে। তাহা পূর্ণ হইবামাত্র পুঁজিপাটার নূতন নূতন বাড়্তিতে একই ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপে পুঁজিপাটার বৃদ্ধিটা যদি ক্রমে ক্রমে ও অনেক কাল ধরিয়া হয়, শ্রমের টান থামে না ও লোকবৃদ্ধির অবিরত সহায়তা করে।

কোন দেশের ধনের যে অংশ উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তাহাই হইল পুঁজিপাটা। ইহার মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, বস্ত্র, কাঁচা মাল, কল ইত্যাদি নিহিত রহিয়াছে। শ্রমকে সফল করিবার জন্য এগুলি দরকার হয়।

পুঁজিপাটার দাম যখন চড়িতেছে, পরিমাণও ঠিক সেই সময়ে বাড়িতে পারে। অতিরিক্ত উৎপাদন করিবার জন্য যে সময়ে আগের চেয়ে হয়ত বেশী শ্রম দরকার হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে কোন দেশের অন্ন ও বস্ত্রে একটা বাড়্ ঘটানো অসম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় পুঁজিপাটার শুধু পরিমাণ নয়, দামও বাড়িবে।

অথবা পুঁজিপাটার দাম না বাড়িলেও, এমন কি, দামটা যখন বাস্তবিক কমিয়া যাইতেছে তখনও, পুঁজিপাটা বাড়িতে পারে; শুধু যে দেশের অন্ন-বস্ত্র বাড়ান যাইতে পারে, তা নয়। অধিকন্তু বাড়্টা কলের সাহায্যে হইতে পারে, এবং ওগুলিকে উৎপাদন করিতে যে শ্রম দরকার হয় তার হারাহারি পরিমাণ বাড়াইবার কোন দরকার না হইতে পারে, এমন কি, তার কতকটা একদম কমাইয়া দিলেও চলিতে পারে। পুঁজিপাটার পরিমাণ বাড়িলে বাড়িতে পারে, কিন্তু গোটা পুঁজিপাটার অথবা কোন অংশ-বিশেষের দাম আগের চেয়ে বেশী হইবে না, বরং প্রকৃত পক্ষে কমিয়া যাইবে।

শ্রমের স্বাভাবিক দর সর্ব্বদা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য

"প্রয়োজনাদির" দরের উপর নির্ভর করে। প্রথম ক্ষেত্রে উহা চড়িবে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা একরূপ অবস্থায় থাকিবে, অথবা নামিবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে মজুরির বাজার দর চড়িবে। কারণ, যে অনুপাতে পুঁজিপাটা বাড়িবে, সেই অনুপাতে শ্রমের টান বাড়িবে; যে অনুপাতে সরঞ্জাম করিয়া দিবার কাজ থাকিবে, সেই অনুপাতে যারা সে কাজ করিবে তাদের জন্য টান হইবে।

অধিকন্তু, উভয় ক্ষেত্রে শ্রমের বাজার দর স্বাভাবিক দরের উপরে থাকিবে ও উহার প্রবণতা হইবে স্বাভাবিক দরের সহিত মিল খাইবার। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে এই সমতাটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘটিবে। মজুরের অবস্থা উন্নত হইবে, কিন্তু বেশী উন্নত হইবে না। কারণ, খাদ্য ও প্রয়োজনাদির বর্দ্ধিত দর তার ক্রীত মজুরির অনেক খানি অংশ গ্রাস করিবে। ফলে শ্রমের অন্ন যোগান অথবা লোকবলের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিবে ও বাজার দর নামিয়া শ্রমের তৎকালীন বর্দ্ধিত স্বাভাবিক দরের সমান হইবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মজুরের অবস্থা খুব বেশী রকম উন্নত হইবে। সে মুদ্রা-মজুরি বেশী বেশী পাইবে, অথচ তাকে কোন কিছুর জন্য বেশী দর দিতে হইবে না, এমন কি সে ও তার পরিবার যে দ্রব্যাদি "ভোগ" করে সেগুলির জন্য হয়ত কম কম দর দেওয়াও চলিবে। লোকবলের সংখ্যায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা খুব বড় রকমের যোগাযোগ না হয়, ততক্ষণ শ্রমের বাজার-দরের আর তৎকালীন নীচু ও হ্রাসপ্রাপ্ত স্বাভাবিক দরে নামিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

অতএব সমাজের প্রত্যেক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপাটার প্রত্যেক বাড়ের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের বাজার মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই বৃদ্ধির স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে শ্রমের স্বাভাবিক দরও বাড়িয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উপর। তা আবার শ্রমের মজুরি যে সব প্রয়োজনাদির জন্য ব্যয়িত হয় সেই সবের স্বাভাবিক দর-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিবে।

এমন মনে করিবার দরকার নাই যে, শ্রমের স্বাভাবিক দর, খাদ্য ও প্রয়োজনাদির পরিমাণেও স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয়। একই দেশে বিভিন্ন সময়ে ইহার তারতম্য ঘটে, এবং বিভিন্ন দেশে বেশ মোটা রকম তারতম্য ঘটে।[১] মানবের অভ্যাস ও আচার ব্যবহারের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। একজন ইংরেজ মজুর যদি তার মজুরির সাশ্রয়ে আলু ছাড়া আর কোন খাদ্য কিনিতে সমর্থ না হয় এবং মাটির কুঁড়ে ঘরের চেয়ে ভাল থাকিবার স্থান না পায় ত সে তার দর্শাহাকে স্বাভাবিক হারের নীচে বলিয়া ও পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিবে। অথচ যে সব দেশে "মানুষের প্রাণটা সস্তা" সেখানে প্রকৃতির এই অন্ন দাবীগুলিকে প্রায়শঃ যথেষ্ট মনে করা হয় ও মানবের অভাব সহজেই তৃপ্ত হইয়া যায়। আজ একটা ইংরেজের কুটিরে যে সব সুখসুবিধা মিলে তার অনেকগুলিকে আমাদের ইতিহাসে পূর্ব্বতন কালে বিলাসিতা বলিয়া গণনা করিতে হইত।

শিল্প দ্রব্যাদি সর্ব্বদা নামিতেছে আর কাঁচা মাল সর্ব্বদা চড়িতেছে। এইজন্য, সমাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের আপেক্ষিক দামের ভিতর অবশেষে এরূপ একটা বৈষম্যের সৃষ্টি হয় যে ধনশালী দেশসমূহে মজুর নিজের খাদ্যের খুব অল্প পরিমাণ মাত্র ত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত অভাব ভাল করিয়া মিটাইতে সমর্থ হয়।

মুদ্রার মানে নানা তারতম্য ঘটে। তাহাতে মুদ্রা-

১ "এক দেশে যে আমার ও যত্ন অপরিত্যাজ্য, অন্য দেশে তার কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে। হিন্দুস্থানের কোন মজুর পূর্ণ মাত্রায় তার কাজ করিয়া যাইতে পারে, যদিও হয়ত তার স্বাভাবিক মজুরি হিসাবে সে যে আচ্ছাদন পাইতেছে তাহা তার মজুরকে ক্ষয় হইতে রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এমন কি, এক রকম জলবায়ু-বিশিষ্ট বিভিন্ন দেশসমূহেও জীবনযাত্রার বিভিন্ন অভ্যাস প্রায়শঃ শ্রমের স্বাভাবিক দরে স্বাভাবিক কারণসমূহের দ্বারা উৎপন্ন তারতম্যের মত তারতম্য ঘটাইবে।"—পৃঃ ৬৮। শস্যের বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ক নিবন্ধ, শ্রীযুক্ত আর টরেন্স্ প্রণীত।

সমস্ত বিষয়টা তর্কের টরেন্স্ কর্ত্তৃক খুব যোগ্যতার সহিত উদাহরণসহ আলোচিত হইয়াছে।

মজুরিতে নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু মুদ্রাকে আমরা সর্ব্বকালের জন্য তুল্য-দামবিশিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। সুতরাং মনে করিয়া লইতেছি যে এখানে ঐ মুদ্রা-তারতম্যের ক্রিয়া হইতেছে না। দেখা যাইবে যে এই তারতম্য-সমূহের উপর নির্ভর না করিয়া মজুরির উঠা-নামা দুই কারণে হয় :—

প্রথম, মজুরের যোগান ও টান।

দ্বিতীয়, যে দ্রব্যাদি কিনিতে শ্রমের মজুরি ব্যয়িত হয় সেগুলার দর।

সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, পুঁজিপাটার সঞ্চয় বা শ্রম নিয়োগ করিবার উপাদ-সঞ্চয়, কম বা বেশী দ্রুতবেগে হয়। উহা সকল সময়ে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করে, সন্দেহ নাই। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি সাধারণতঃ তখনই সব চেয়ে বেশী হয়, যখন উর্ব্বরা জমির প্রাচুর্য্য ঘটে। সেই সময়ে প্রায়শঃ এরূপ দ্রুতগতিতে সঞ্চয় হয় যে, পুঁজিপাটার মত অত দ্রুতবেগে মজুরের যোগান হইতে পারে না।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনুকূল অবস্থায় পঁচিশ বছরে লোকবল দ্বিগুণিত হইতে পারে। কিন্তু ঠিক ঐ প্রকার অনুকূল অবস্থায় সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে একটা দেশের সমগ্র পুঁজিপাটা দ্বিগুণিত হইতে পারে। সেই সময়টায় মজুরির প্রবণতা হইবে বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ, তখন শ্রমের টান শ্রমের যোগানের চেয়ে বেশী জোরে বাড়িবে।

কোন কোন দেশ উৎকর্ষের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেছে। সেই সব দেশের কলা ও বিদ্যা নব নব উপনিবেশে প্রবর্ত্তিত হইলে, সম্ভবতঃ মনুষ্য-সন্তানের চেয়ে দ্রুতবেগে পুঁজিপাটার বাড়িবার প্রবণতা থাকে। আর মজুরের অনাটন যদি লোকবহুল দেশসমূহ হইতে লোক আনিয়া পূরণ করা না হয়, এই প্রবণতায় শ্রমের দর খুব বেশী বাড়িয়া যায়। যে অনুপাতে এই দেশগুলি লোকবহুল হইতে থাকে এবং ক্রমে নিকৃষ্টতর জমি আবাদের জন্য লওয়া হইতে থাকে, সেই অনুপাতে পুঁজিপাটার বাড়িবার প্রবণতা হ্রাস পায়। কারণ, লোকবলের অভাব পূরণ করিয়া যে ফসল উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা উৎপাদনের সুগমতার অনুপাতে থাকিবে, সন্দেহ নাই অর্থাৎ তাহা উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত কমসংখ্যক লোকের অনুপাতে থাকিবে। অতএব যদিও ইহা সত্য বটে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থায় উৎপাদন-শক্তি লোকবলের চেয়ে সর্ব্বদা বেশী, তথাপি এই অবস্থা দীর্ঘকাল-ব্যাপী হয় না। কারণ, জমি পরিমাণে সীমাবদ্ধ ও এক জমির সহিত অন্য জমির গুণে পার্থক্য রহিয়াছে; জমির উপর পুঁজিপাটার মাত্রা বাড়াইয়া দিলে, পর পর প্রত্যেক মাত্রার ফলে উৎপাদন কম হারে হইবে; অথচ অন্যদিকে লোক-বলের শক্তি সর্ব্বদা সমান রহিয়াছে।

বহুকাল ধরিয়া লোকের বসতি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া যে সব দেশে কাঁচা মালের যোগান হ্রাস পাইয়াছে ও ঠাসাঠাসি লোকবলের দরুণ সকল প্রকার দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে, সেখানে একপ্রকার প্রতিবিধান দরকার। আবার যে সব দেশে উর্ব্বরা জমির প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, অথচ অধি-বাসীদের অজ্ঞতা, আলস্য ও বর্ব্বরতার ফলে অভাব ও দুর্ভিক্ষের সকল প্রকার যাতনা মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে এবং লোকবল জীবনধারণের উপায়কে খর্ব্ব করিতেছে ইত্যাকার কথা বলা হয়, সেখানে সম্পূর্ণ এক আলাদা রকমের প্রতিবিধান দরকার। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কুফলের হেতু হইতেছে কুশাসন, সম্পত্তির অনিরাপত্তা এবং সকল পদ ও অবস্থার লোকের মধ্যে শিক্ষার অভাব। ইহাদের আরও সুখী হইবার পক্ষে দরকার মাত্র সুশাসিত ও সুনিশ্চিত হওয়া। তার অবশ্যম্ভাবী ফলে পুঁজি-পাটার বাড়, লোকের বাড়কে ছাড়াইয়া যাইবে। লোকবলের কোন বৃদ্ধিই যথেষ্ট বড় নয়, কারণ উৎপাদনের শক্তি এখানে আরও বড়। প্রথম ক্ষেত্রে, লোকবলকে পোষণের জন্য যে মূলধন দরকার, লোকবল তার চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতেছে। ব্যবসার প্রতি ধাপে, লোকবল বৃদ্ধির হার যদি সঙ্গে সঙ্গেই না কমিয়া যায়, দুর্দ্দশা বাড়িবে। কারণ, উৎপাদন এখানে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না।

লোকবল যখন জীবিকা খর্ব্ব করে, তখন একমাত্র প্রতিবিধান হইতেছে লোক-হ্রাস অথবা দ্রুততর পুঁজিপাটার

সঞ্চয়। ধনশালী দেশগুলিতে সমস্ত উর্ব্বরা জমি আগেই চষা হইয়া গেছে। সেখানে দ্বিতীয় প্রতিবিধান বিশেষ কার্য্যকরও নয় উল্লিখিতও নয়। কারণ ইহার চেষ্টা হইবে, ব্যাপার খুব বেশী দূর গড়াইলে, সকল শ্রেণীর লোককে সমান গরিব করিয়া দেওয়া। কিন্তু গরিব দেশে উৎপাদনের প্রচুর উপায় রহিয়াছে, অথচ অবস্থায় বহু জমি পড়িয়া আছে। সেখানে দুর্দ্দশা দূর করিবার এটাই একমাত্র নিরাপদ ও ফলদায়ক উপায়, বিশেষতঃ ইহার প্রভাবে সকল শ্রেণীর লোকের উন্নতি হইবে।

সকল দেশে মজুর-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আরাম ও আনন্দ ভোগের রুচি জন্মিবে এবং তারা স্থায়পথে থাকিয়া এই সব লাভের জন্য উদ্যম প্রকাশে উৎসাহিত হইবে, মানবের হিতৈষিগণ এরূপ ইচ্ছা পোষণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রচুর লোকবল জন্মাইবার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন[১] আর কিছু থাকিতে পারে না। যে সব দেশে মজুর-শ্রেণীর অভাব বড় ও তারা সব চেয়ে সস্তা খাদ্যদ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, সেই সব দেশের লোকদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্য-বিপর্য্যয় ভোগ করিবার ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাদের এমন কোন স্থান নাই যেখানে বিপৎকালে আশ্রয় লইবে। তারা নিরাপদ হইবার জন্য জীবনের নিম্নতর আর কোন ধাপ খুঁজিয়া লইতে পারে না। কারণ তারা আগে হইতেই এমন নীচে আছে যে আর নীচে নামিতে পারে না। তাদের জীবিকার আসল জিনিষের অনাটন ঘটিলে, "হাত-কের্ত্তা"[২] অন্নই আছে। তাদের পক্ষে স্বল্পতার অর্থ হইতেছে দুর্ভিক্ষপ্রসূত প্রায় সকল প্রকার কুফল ভোগ।

সমাজের স্বাভাবিক প্রসারের সময়ে শ্রমের মজুরি যতদূর পর্য্যন্ত টান যোগান দ্বারা নির্ণীত হয় ততদূর উহার নামিবার প্রবণতা থাকিবে। কারণ, মজুরদের যোগান সমান হারে বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু তাদের টানটা তত জোরে বাড়িবে না। উদাহরণ, যদি পুঁজিপাটা বৎসরে ২% হারে বাড়িলে মজুরি নির্ণীত হয়, তবে পুঁজিপাটা যখন মাত্র ১½% হারে সঞ্চিত হইবে তখন উহা নামিবে। যখন পুঁজিপাটা মাত্র ১% অথবা ½% হারে বাড়িবে, তখন তাহা আরও নীচে নামিয়া যাইবে ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুঁজিপাটার গতি রুদ্ধিত না হয় ততক্ষণ নামিতে থাকিবে। পুঁজিপাটা গতিহীন হইয়া দাঁড়াইলে মজুরিও ঐরূপ হইবে এবং প্রকৃত লোকবল পোষণের পক্ষে মাত্র যথেষ্ট হইবে। আমি বলিতে চাই, মজুরি যদি শুধু মজুরদের টান ও যোগান দ্বারা নির্ণীত হইত, তবে এইরূপ অবস্থায় মজুরি নামিয়া যাইত। কিন্তু এতখানি ভুলিলে চলিবে না যে, যে সব দ্রব্যের জন্য মজুরি ব্যয়িত হয় সেগুলির দর দ্বারাও মজুরি নির্ণীত হয়।

লোকবল বাড়িতে থাকিলে, এই প্রয়োজনদ্রব্য দরও অনবরত বাড়িতে থাকিবে। কারণ, এগুলি উৎপাদন করিতে আরও বেশী শ্রম দরকার হইবে। সুতরাং, যদি শ্রমের মুদ্রা-মজুরি নামে অথচ শ্রমের মজুরি যে সব দ্রব্যে ব্যয়িত হয় তার প্রত্যেকটা চড়ে, তবে মজুরের অবস্থা নিশ্চয় শোচনীয় হইবে, সে তার জীবনোপায় হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে। অতএব শ্রমের মুদ্রা-মজুরিগুলা নামিবার পরিবর্ত্তে চড়িবে। কিন্তু ওগুলা এরূপ যথেষ্ট ভাবে চড়িবে না যে, তদ্দ্বারা মজুর ঘর বাড়িবার পূর্ব্বে যতগুলি আরাম ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পারিত এখন ততগুলি কিনিতে পারিবে। যদি তার পূর্ব্বেকার বাৎসরিক মজুরি হয় ২৪ পাউণ্ড অথবা কোয়ার্টার প্রতি ৪ পাউণ্ড দরে ৬ কোয়ার্টার শস্য, শস্যের দাম চড়িয়া যখন কোয়ার্টার প্রতি ৫ পাউণ্ড হইবে সে সম্ভবতঃ ৫ কোয়ার্টারের দাম পাইবে। কিন্তু ৫ কোয়ার্টারে খরচ পড়িবে ২৫ পাউণ্ড। অতএব, মুদ্রা-মজুরির উপরেও সে কিছু পাইবে। কিন্তু এই উপরিটুকু এমন নয় যে তদ্দ্বারা সে পূর্ব্বে পরিবারের মধ্যে থাকিয়া যে পরিমাণ শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ভোগ করিয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণ আহরণ করিতে সমর্থ হইবে।

সুতরাং মজুর প্রকৃত পক্ষে নিকৃষ্ট মজুরি পাইবে।

১। সিকিউরিটি কথাটার বেশ পরিষ্কার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ না হইলে চলিবে না। "জামিন" "নিদর্শন" ইত্যাদি দ্বারা কাজ সারিতেছি। উপায় কি? অনুবাদক।

২। সাবষ্টীটিউট = হাতকের্ত্তা বলিতেছি; আর কিছু হয় কি? অনুবাদক।

তথাপি তার মজুরি বৃদ্ধির দরুণ শিল্পীর মুনাফা কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কারণ, তার মাল আর উঁচু দরে বেচা চলিবে না, অথচ সেগুলা উৎপাদন করিবার খরচ বাড়িবে। কোন্ কোন্ নিয়মে মুনাফা নিয়ন্ত্রিত হয় তা অনুসন্ধান করিবার সময় আমরা এই বিষয় লইয়া আবার আলোচনা করিব।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে কারণে খাজনা বাড়ে, ঠিক সেই কারণেও, অর্থাৎ পূর্ব্বের অনুপাতে শ্রম পরিমাণ লাগাইয়া অতিরিক্ত খাদ্য জোগাড় করায় উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতেও মজুরি বাড়ে। অতএব মুদ্রার দাম যদি অপরিবর্ত্তনশীল হয়, ধনবল ও লোকবলের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, খাজনা ও মজুরি এই উভয়ের গতি থাকিবে বাড়িবার দিকে।

কিন্তু খাজনা-বৃদ্ধি ও মজুরি-বৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্যটা হইতেছে এই। খাজনার মুদ্রা-মূল্য বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ফসলের ভাগ বর্দ্ধিত হয়; জমিদারের মুদ্রা-খাজনা শুধু বেশী হয়, এমন নয়, তার

২৪ পা. ১৪ শি.
২৫ পা. ১০ শি.
২৬ পা. ৮ শি.
২৭ পা. ৮ শি. ৬ পে. } তখন গমের দাম ছিল { ৪ পা. ৪ শি. ৮ পে.
৪ পা. ১০ শি.
৪ পা. ১৬ শি.
৫ পা. ২ শি. ১০ পে. } অথবা { ৫.৮০
৫.৬৬
৫.৫০
৫.৩৩ } কোয়ার্টারের দাম

ঠিক আগের মত, আগের চেয়ে ভাল করিয়া নয়, জীবন যাপনে সমর্থ হইবার জন্য তার এই মজুরিগুলি চাই: কারণ শস্য যখন কোয়ার্টার প্রতি ৪ পাউণ্ড, সে কোয়ার্টার প্রতি ৪ পাউণ্ড দরে, তিন কোয়ার্টার শস্যের জন্য ব্যয় করিয়াছে ১২ পাউণ্ড

অন্যান্য জিনিষের জন্য ১২ „

২৪ „

যখন গমের দর ৪ পা ৪ শি ৮ পে, তার নিজের ও পরিবারের জন্য সে যে তিন কোয়ার্টার খাইয়াছে, তার খরচা লাগিয়াছে ১২ পা ১৪ শি

অন্যান্য জিনিষের দরে পরিবর্ত্তন হইবে না ১২ পা

২৪ পা ১৪ শি

ফসলী খাজনাও বেশী হয়; সে আরও বেশী শস্য পায় এবং ঐ শস্যের প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট মাপের বদলে অন্য যে সব দ্রব্যের দাম চড়ে নাই সে সব অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যায়। তখন মজুরের ভাগ্য কম সুখকর হয়, সত্য বটে, সে মুদ্রা-মজুরি বেশী পায়, কিন্তু তার ফসলী মজুরি হ্রাস পায়। আর, শুধু তার শস্য কিনিবার ক্ষমতা নয়, তার সাধারণ অবস্থাও হীন হইয়া পড়ে। কারণ, সে দেখিতে পায় যে মজুরির বাজার-দর স্বাভাবিক দরের উপরে রক্ষা করা বেশী শক্ত। শস্যের দর ১০% বাড়িলে, মজুরি ১০% এর কম চড়ে, কিন্তু খাজনা তার চেয়ে বেশী চড়ে; মজুরের অবস্থা সাধারণতঃ খারাপ হয়। আর জমিদারের অবস্থা উন্নত হয়।

যখন গম কোয়ার্টার প্রতি ৪ পাউণ্ড করিয়া বিকাইতেছে, ধর যেন মজুরের মজুরি ছিল বৎসরে ২৪ পাউণ্ড অথবা ৬ কোয়ার্টার গমের দাম। আরও ধর যেন মজুরির আধাটা গমের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। বাকী আধাটা বা ১২ পাউণ্ড অন্যান্য জিনিষের জন্য হইয়াছে। সে পাইয়াছে—

যখন দর ৪ পা ১০ শি, তিন কোয়ার্টার, গমে খরচ লাগিয়াছে ১৩ পা ১০ শি

অন্যান্য জিনিষে ১২ পা

২৫ পা ১০ শি

যখন দর ৪ পা ১৬ শি, তিন কোয়ার্টার, গমে ১৪ পা ৮ শি

অন্যান্য জিনিষে ১২ পা

২৬ পা ৮ শি

যখন দর ৫পা ২শি ১০পে, তিন কোয়ার্টার গমে খরচ হইয়াছে ১৫পা ৮শি ৬পে

অন্যান্য জিনিষে ১২পা

২৭পা ৮শি ৬পে

যে অনুপাতে শস্য মহার্ঘ হইয়াছে সেই অনুপাতে সে

কসলী মজুরি কম পাইয়াছে, কিন্তু তার মুদ্রা-মজুরি সর্ব্বদা বাড়িয়াছে। ওদিকে বাবটা তার ঠিক আগের মতই রহিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের নির্ম্মাণে যে অনুপাতে কাঁচা মাল লাগে সেই অনুপাতে ঐ সব দ্রব্যের দর চড়ে বলিয়া তাকে কোন কোন দ্রব্যের জন্য বেশী বেশী পয়সা দিতে হইয়াছে। যদিও তার চা, চিনি, সাবান, মোমবাতি ও ঘরভাড়া হয়ত আগের চেয়ে মহার্ঘ হয় নাই, তাকে বেকন, টীন, মাখন, লিনেন, জুতা ও বস্ত্রের জন্য বেশী খরচ করিতে হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ মজুরি-বৃদ্ধি ঘটিলেও, তার অবস্থাটা তুলনায় খারাপ হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ এইরূপ বলিতে পারেন যে, দরের উপর মজুরির প্রভাব বিবেচনা কালে আমরা কল্পনা করিয়া লইয়াছি যে সোণা, অথবা যে ধাতু হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হয় তাহা সেই দেশে উৎপন্ন হইতেছে যে দেশে মজুরির উঠা-নামা ঘটিতেছে; অতএব যে সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছি সেগুলি অপ্রকৃত; কারণ, সোণা হইতেছে বিদেশজ ধাতু। কিন্তু সোণা বিদেশজাত দ্রব্য হইলেও আমার যুক্তির সত্যতা কিছুমাত্র খণ্ডিত হইবে না। কারণ ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সোণা স্বদেশে পাওয়া যাক্ বা বিদেশ হইতে আমদানি হোক্, ফলাফলগুলি শেষ অবধি, বাস্তবিক পক্ষে সোড়াতেও, একরূপ হইবে।

ধন[১] ও পুঁজিপাটার বৃদ্ধিতে শ্রমের নূতন টান জন্মায় ও ফলে দ্রব্যাদির উৎপাদন নিশ্চিতরূপে বাড়িতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় মজুরি বাড়ে। এমন কি, আগের দরেও এই অতিরিক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য, মুদ্রা,—এবং বিদেশী দ্রব্য, যাহা হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হয় ও যা শুধু আমদানি দ্বারা পাওয়া যায়,—আরও অধিক পরিমাণে দরকার হয়। যখন কোন দ্রব্য আগের চেয়ে বেশী দরকার হয়, তখন যে সব দ্রব্যের বদলে ইহা কেনা হয় তাদের তুলনায় ইহার আপেক্ষিক দাম চড়ে। যদি আরও টুপির তাগাদা হয়, টুপির দর চড়িবে ও টুপির জন্য আরও অধিক সোণা দেওয়া হইবে। যদি আরও সোণার দরকার হয়, সোণা চড়িবে ও টুপির দর নামিবে। কারণ, তখন আগের সমান সোণা কিনিতে টুপি ও অন্য সমস্ত কিনিস অধিকতর পরিমাণে আবশ্যক হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে মজুরি চড়িয়াছে অতএব দ্রব্যাদি চড়িবে বলার অর্থ একটা নিশ্চিত পরস্পর-বিরোধী মতকে স্বীকার করা। কারণ আমরা প্রথমে বলিতেছি যে, টানের ফলে সোণার আপেক্ষিক দাম চড়িবে এবং তারপর বলিতেছি যে, দর বাড়িবে বলিয়া সোণার আপেক্ষিক দাম কমিবে। এই দুইটি ফল সম্পূর্ণরূপে পরস্পর-বিরোধী। দ্রব্যাদির দর বাড়ে বলাও যা, মুদ্রার আপেক্ষিক দাম নামে বলাও তা। কারণ, দ্রব্যাদির দ্বারাই সোণার আপেক্ষিক দাম কষা হইয়া থাকে। অতএব, যদি সমস্ত দ্রব্যের দর চড়ে, ঐ সব মহার্ঘ দ্রব্য কিনিবার জন্য বিদেশের সোণা স্বদেশে আসিবে না, কিন্তু দেশের সোণা দেশের বাহিরে যাইবে ও সুবিধামত অপেক্ষাকৃত সস্তা বিদেশী দ্রব্য কিনিবার জন্য ব্যয়িত হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যে ধাতু হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তা দেশে উৎপন্ন হোক্ বা বিদেশী কোন রাজ্যে উৎপন্ন হোক্, মজুরি চড়া হইলে দ্রব্যাদির দর বাড়িবে না। মুদ্রার পরিমাণ না বাড়িলে সমস্ত দ্রব্য একই কালে চড়িতে পারে না। আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, এই অতিরিক্ত মুদ্রা দেশে পাওয়া যাইতেছে না। বিদেশ হইতেও আমদানি করা যাইতেছে না; বিদেশ হইতে অতিরিক্ত সোণা কিনিতে হইলে, দেশের দ্রব্যাদি সস্তা হওয়া চাই, মহার্ঘ নয়। সোণার আমদানি এবং যে সব স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি দিয়া সোণা কিনা হয় বা যেগুলি সোণার জন্য দেওয়া হয় সেগুলির দর বৃদ্ধি, এই দুই এক কথা নয়। কাগজী মুদ্রা[২] বহুল প্রচলনে সমস্যার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কারণ, কাগজী মুদ্রা সোণার

১। ওয়েল্থ্—ধন।—অনুবাদক।　　২। পাপুর মানি—সজ্ঞান।—অনুবাদক।

৩। মানি মুবাইতে মুদ্রা চালাইয়াছি। সুতরাং সোণার মানি—কাগজী মুদ্রা।—অনুবাদক।

হারের অনুরূপ, অথবা অনুরূপ হওয়া উচিত। সুতরাং যে সব কারণে ঐ ধাতুর দামে পরিবর্তন ঘটে, সেই সব কারণে ইহারও দামে পরিবর্তন হয়।

মজুরি বিশেষ বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলে ও প্রত্যেক সমাজের বৃহত্তম অংশের সুখ এই সব নিয়মের উপর নির্ভর করে। অন্য সমস্ত চুক্তির মত মজুরিকে বাজারের স্বাধীন ও মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিতর ফেলিয়া দিতে হইবে, শাসন-পরিষদের অনুশাসন দ্বারা কখনো চালিত করা চলিবে না।

"গরিবি আইন"[১] সমূহের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ গতি হইতেছে এই বিধানের বিপরীত মুখে। পার্লামেন্ট[২] মনে করিয়া ভাবিয়াছিল, দরিদ্রের দুরবস্থার প্রতীকার হইবে। তা হয় নাই। ধনী ও দরিদ্র উভয়ের অবস্থাই হীন হইয়াছে। গরিবদের ধনী করার পরিবর্তে, বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে এই আইনগুলি ধনীদের গরিব করিয়া তুলিবে। যতদিন বর্তমান আইনগুলি মোতায়েন থাকিবে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে ফল হইবে এইরূপ; গরিবদের পোষণার্থ মূলধনটা ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু ক্রমে ঐ মূলধন দেশের সমগ্র নিট্ রাজস্ব, অথবা সরকারী খরচ মিটাবার পর রাজস্বের যতটা অবশিষ্ট থাকিবে তার সবটা গ্রাস করিয়া ফেলিবে।[৩]

"গরিবি আইনের" অনিষ্টকর ক্ষমতা আর হ্রস্বতাবৃত নাই। কারণ, শ্রীযুক্ত মালথাসের মত যোগ্য ব্যক্তি সুচারুরূপে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। এখন দরিদ্র-হিতৈষীর ঐকান্তিক ইচ্ছা যে ঐ আইনগুলা লোপ হইয়া যাক্। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওগুলা এতকাল ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ও ওগুলার ক্রিয়ার উপরে পরিবারের অভ্যাসাদি এরূপভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের রাষ্ট্র-দেহ হইতে ওগুলাকে নিরাপদে উৎপাটন করিতে হইলে খুব বেশী রকম সাবধানতা ও দক্ষতাসহিত সে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। যারা এই আইনগুলা রদ্ করিবার বিশেষ পক্ষপাতী তারাও এ বিষয়ে একমত যে, ক্রমক্রমে যাদের উপকারের জন্য এগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাদের বর্তমান ভীষণ দুর্দশা হইতে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ওগুলার লোপ খুব আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে হওয়া উচিত।

ইহা নিঃসন্দেহে সত্য যে, যাতে নিজেদের সংখ্যা না বাড়ে ও নিজেদের ভিতর পুনঃ পুনঃ বাল্যবিবাহ ও অবিমৃষ্যকারী বিবাহ কম হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা চাই বা পার্লামেন্ট হইতে প্রচেষ্টা চাই, নহিলে গরিবের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। গরিবি আইন পদ্ধতির ক্রিয়াটা ইহার ঠিক উল্টা হইয়াছে। সংযম অনাবশ্যক হইয়াছে; যারা বিবেচনা ও পরিশ্রমের ফলে টাকা জমাইয়াছে তাদের সঞ্চয়ের কিয়দংশ অবিমৃষ্যকারীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।[৪]

১। মূলের শব্দ—গরিবি আইন।—অনুবাদক।

২। লেজিস্‌লেচারের প্রকৃত বাঙ্গালা প্রতিশব্দের জন্য আমি মাফ চাহিতেছি। এখানে ইংরেজের পার্লামেন্টকে বুঝাইবার জন্য ঐ কথা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।—অনুবাদক।

৩। শ্রীযুক্ত চুকানন্দের পক্ষানুমোদিত অংশে, অস্থায়ী দুরবস্থার বিষয় যদি উল্লিখিত হইয়া থাকে, তবে তাঁর সহিত আমি এই পর্যন্ত স্বীকার করিতে পারি যে "মজুরের অবস্থার বিশেষ পরিপন্থী হইতেছে দারিদ্র্য; ইহা বাস্তু অথবা কর্ম সংকীর্ণতা (কোয়ার্টার এখানে সংকীর্ণতা অর্থে ব্যবহার করিলাম।—অনুবাদক) হইতে জন্মে।" পরিবকে সাহায্য করিবার জন্য সকল দেশে অসংখ্য আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সমাজ দেহে এমন সব দুর্গতি রহিয়াছে যার প্রতীকার আইনে হয় না; সুতরাং আইনের ক্ষমতার সীমাটা জানা বিশেষ দরকার, যেন যা অসম্ভব তা সাধন করিতে গিয়া যে মঙ্গলসাধন আমাদের বাস্তবিক করায়ত্ত তা কস্‌কিয়া না যায়।"—চুকানন্দ, পৃঃ ৩১।

৪। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিষয়ে হাউস্ অব্ কমন্সে উত্তরোত্তর যে জ্ঞান বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তা নেহাৎ অল্প নয়। গরিবি আইন কমিটির গত রিপোর্টের সঙ্গে শ্রীযুক্ত পিটের ঐ বৎসরে লিখিত নিম্নের মন্তব্যসমূহ তুলনা করিলে তাহা স্পষ্ট হইবে। তিনি বলেন, "যেখানে যেখানে যত সন্তান বর্তমান, সে সব বাড়ানো নিন্দা ও তাচ্ছীল্য না করিয়া সন্তানোৎপাদক ও যোগ্য বিবেচনায় আমাদের সাহায্য-দান করা উচিত। ইহাতে বৃহৎ পরিবার অভিশাপ না হইয়া আশীর্বাদ স্বরূপ হইবে ও ইহাতে যারা নিজের শ্রমে নিজেদের ভরণপোষণে সমর্থ এবং যারা দেশমাতাকে কতকগুলি সন্তান উপহার দিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছে বলিয়া পোষণের জন্য দেশের সাহায্যের দাবী করে, এই দুয়ের ভিতর পরিষ্কার পার্থক্য-রেখা টানা যাইবে।"—হ্যানসার্ডের পার্লামেন্টের ইতিহাস, ৩২শ ভাগ, পৃঃ ৭১০।

অনিষ্টের প্রকৃতি প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করে। গরিবি আইনের কোট ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করিয়া, দরিদ্রদিগের মনে স্বাধীনতার মূল্য অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে এমন ভাবে শিখাইতে হইবে যেন তাহা কখনো সুযোগান্বিত অথবা আকস্মিক দানের দিকে চাহিয়া না থাকে, আপনার শ্রমের দিকে চাহে এবং বিমুখতাকারিতা ও পরিণাম-দৃষ্টি যে অনাবশ্যক ও অলাভজনক নহে তাহা বুঝে, তবেই আমরা ক্রমে ক্রমে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় উপনীত হইব।

গরিবি আইন সংশোধন প্রস্তাবের চরম উদ্দেশ্য ঐ আইনে রদ্ যদি না হয়, তবে তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনার উপযুক্ত নহে। গরিবের এবং মানবকুলের তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, যিনি বলিয়া দিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্য কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদে অথচ সব চেয়ে কম ব্যয়-প্রয়োগে সম্পন্ন হইতে পারে। যে মূলধন দ্বারা গরিবেরা পোষিত হইতেছে তাহা আলাদা কোন রকমে তুলিতে পারিলে অনিষ্ট হ্রাস পাইবে এমন নয়। যদি মূলধন পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হয়, অথবা কোন কোন আধুনিক প্রস্তাবানুযায়ী কর বসাইয়া মোটা দেশ হইতে মূলধন আদায় করা যায়, তাহাতে অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না, বরং যে দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য আমরা সমুৎসুক তাহা আরও বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানে সংগ্রহ ও প্রয়োগের যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে তাহাতে অনিষ্ট কম হইয়াছে। প্রত্যেক প্যারিশ বা পাড়া নিজ নিজ গরিবদের পালন করিবার জন্য এক একটা আলাদা মূলধন উঠায়। তাহাতে স্বার্থ ও সন্তাব্যতার দিক্ হইতে বিচার করিয়া নীচু হার রক্ষা করা সহজ হইয়াছে। মোটা দেশের দরিদ্রদের সাহায্যকল্পে একটা সাধারণ তহবিল খুলিলে তা হইত না। কোন একটা পাড়ার পক্ষে হিসাবী[১] হইয়া চাঁদা আদায় কড়ায় ও অন্ন অন্ন করিয়া খরচ করার আগ্রহ বোধ করা একান্ত স্বাভাবিক। কারণ সমগ্র টাকাটা নিজ উন্নতির জন্য ব্যয় করা চলে। অন্য শত শত পাড়ায় যদি ঐ চাঁদায় ভাগ বসাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে সেরূপ আগ্রহ কিছুতেই জন্মিতে পারে না।

গরিবি আইনগুলি কেন এখন পর্য্যন্ত দেশের সমগ্র নিট্ মূলধন গ্রাস করিয়া ফেলে নাই তার কারণ এইখানে পাওয়া যাইবে। আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে এগুলি বেশ বাঁধাবাঁধি নিয়মে প্রয়োগ করা হয় ও সেজন্য তীব্র সীড়াদায়ক হইয়া উঠে না। যদি আইন এইরূপ হয় যে, প্রত্যেক মানুষ দরকারমাত্র সাহায্য পাইবে এবং এতদূর পর্য্যন্ত যে, জীবনটাকে চলনসই গোছের আরামপ্রদ করিয়া তুলিবার জন্য যতটা দরকার ততটা পাইবে, তবে নিছক্ তত্ত্বের বলে আমরা এইরূপ আশা করিতে পারি যে গরিবি করের তুলনায় অন্য সমস্ত কর একত্রে হাল্কা হইয়া যাইবে। এইরূপ আইনের বলে ধন ও শক্তি অভাব ও দুর্ব্বলতায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িবে, ইহার প্রবর্ত্তক হইবে যে পর্য্যন্ত না সকল শ্রেণীর লোক বিশ্বজনীন দারিদ্র্যরূপ প্রেত দ্বারা আক্রান্ত হয় সে পর্য্যন্ত মাত্র বাঁচিয়া থাকার সন্ধানে জোগাড় করা ছাড়া প্রত্যেক বিষয় হইতে শ্রম-শক্তিকে বিমুখ করা, বৃদ্ধির উৎকর্ষাপকর্ষ হেতু সর্ব্বপ্রকার পার্থক্যকে মিলাইয়া ফেলা, মনকে অনবরত শারীরিক অভাবসমূহ যোগাইবার কাজে ব্যস্ত রাখা; একথা যেমন সত্য মাধ্যাকর্ষণের নিয়মও তেমনি সত্য নয়। সৌভাগ্যবশতঃ এই নিয়মগুলি ক্রমোন্নত সমৃদ্ধির কালে ক্রিয়াশীল ছিল। তখন মনুষ্য-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়মিতভাবে বাড়িয়াছে ও স্বভাবতঃ লোকবল বৃদ্ধির দরকার হইয়াছে। কিন্তু আমাদের উন্নতির গতি যদি আরো মন্দা হয়, যদি আমরা অচল অবস্থা লাভ করি,—আশা করি যে অবস্থা হইতে আমরা এখনও যথেষ্ট দূরে রহিয়াছি,—তবে তখন এই আইনগুলার অনিষ্টকর প্রকৃতি আরও উজ্জ্বল ও আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিবে; আর তখন এগুলিকে দূরীভূত করিবার পক্ষে আরও অনেক বাধা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

১। বেহিসাবীর উল্টা কথা হিসাবী। এখানে ইকনমিকাল = হিসাবী।—অনুবাদক।

গম-উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত কৃতিত্ব

১৯২৮ সনে অষ্ট্রেলিয়ায় ২৪,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে গম উৎপাদিত হইবার কথা। এই গমের ক্ষেত আয়তনে দক্ষিণ ইংলণ্ডের বিশটি কাউন্টির চেয়েও বড়। এই ২৪,০০০ বর্গমাইল জমি ছাড়া আরও বিস্তর জমি অষ্ট্রেলিয়ায় পতিত রহিয়াছে যেখানে স্বচ্ছন্দে গমের আবাদ চলিতে পারে। এই পতিত জমি অন্ততঃ তিন তিনটি বিলাতের সমান হইবে। সুতরাং গম-উৎপাদন-সমস্যা বিলাত এবং অষ্ট্রেলিয়ার নিকট দুই বিভিন্ন-রূপ ধারণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে লোক-সংখ্যা বেশী; সুতরাং ইংলণ্ডের লক্ষ্য প্রতি একর জমিতে কত বেশী গম উৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় জমির অভাব নাই, অথচ লোক-সংখ্যা কম; সেই জন্য অষ্ট্রেলিয়ান চাষীর লক্ষ্য জনপ্রতি কত বেশী গম উৎপাদন করা যাইতে পারে। সুতরাং শ্রম-লাঘবের উপায়-উদ্ভাবনই এই দ্বীপ-রাজ্যের প্রধান ধান্ধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই অষ্ট্রেলিয়ান চাষী বুঝিতে পারে, যে একজন কৃষক একটী খাত-খনন-ক্ষম লাঙ্গল চালানোর স্থানে চারিটী খাত-খনন-ক্ষম লাঙ্গলও স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারে। শেষোক্ত প্রকার লাঙ্গল চালানোর আর একটী সুবিধা এই যে, এই লাঙ্গল চালানোর সময় চাষী বসিয়া থাকিয়া লাঙ্গল চালাইতে পারে; কিন্তু প্রথম প্রকার লাঙ্গল চালানোর সময় হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। আজকাল অষ্ট্রেলিয়ান চাষী অষ্ট্রেলিয়ার নরম মাটিতে চৌদ্দটী খাত-খনন-ক্ষম লাঙ্গল চালাইতেছে; এখন একজন কৃষক একদিনে প্রায় ৪ একর জমি চাষ করিতে পারে।

চাষের পর জমিতে বিঘে দেওয়ার দরকার। অষ্ট্রেলিয়ান চাষী ছয়খানা বিঘে এক সঙ্গে চালায়। এই বিঘেগুলির সহিত ১৪টী ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং কি দিন সে প্রায় ১০০ একর জমিতে বিঘে দিতে পারে। একজন চাষীর পক্ষে ইহা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। অষ্ট্রেলিয়ান চাষী গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০ একর চিলা জমিতে বিঘে দিয়া থাকে। এই জমি চাষ করা এবং বিঘে দেওয়া ছাড়া চাষের বাদ বাকী কাজ করিবার সময়ও অষ্ট্রেলিয়ান চাষী লক্ষ্য রাখে কিসে মানুষের শক্তি কম খরচ করিয়া কাজ হাসিল করা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার এই বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে বেশী ফুটিয়া উঠে শস্য-কর্ত্তনের সময়। অষ্ট্রেলিয়ার জল হাওয়ার গুণে গাছের সতেজ এবং দণ্ডায়মান অবস্থাতেই শীষ পাকিয়া যায়। সুতরাং বিলাত এবং অন্যান্য দেশের মত শস্য কাটিয়া আটি বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয় না। শস্য মাড়িবার এক অদ্ভুত কলও অষ্ট্রেলিয়াবাসী আবিষ্কার করিয়াছে। এই কলের নাম কম্বিনেশান হার্ভেষ্টার। ইহার দ্বারা গম কাটা মাড়া এবং ঝাড়া সমস্তই এক সঙ্গে সমাধা হয়। ফসল না কাটিয়াই এই কল জমিতে লাগান হয়। এই কলের সহিত একপাল ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। কলের উপর একটী লোক বসিয়া থাকে। সে ইচ্ছা-মত কলটী নামাইয়া তুলিয়া উচ্চ নীচ সকল স্থানের শস্য কাটিয়া লয়। তুষগুলি এই কলের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া হয়। কলের পার্শ্ব-সংলগ্ন একটী হাঁকে পরিষ্কৃত গম জমা হইতে থাকে।

১৯২৭ সনে রিভারিনার (নিউ সাউথ ওয়েলসে) এক জন চাষী সকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে একদিনে ছয় হাজার বড় বড় ফাট প্রস্তুতের উপযোগী ৩০০ ব্যাগ গম কাটে। একজন লোকের পক্ষে এত বেশী গম কাটা অসম্ভব হইলেও, সচরাচর অষ্ট্রেলিয়ার একজন লোক একদিনে ১৫০ হইতে ২০০ ব্যাগ গম কাটিয়া থাকে। শ্রম লাঘবকারী নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে একজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী কৃষক কাহারও সাহায্য না লইয়া বৎসরে ২৫০।৩০০ একর গমের জমি চাষ করিতে পারে ও গম উৎপন্ন হইলে তাহা কাটিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার জলহাওয়ার এমনই গুণ যে, সারা বৎসর ষোল মাঠে লোকে কাজ করিতে পারে। এই বিচিত্র আব-

হাওয়ার সহিত মানুষের মগজের শক্তি ও পরিশ্রম একত্র মিলিত হওয়াতেই চাষবাসে এমন অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় যে সকল নয়া ঔপনিবেশিক আজ্ঞা গাড়িতে আসিবে, তাহারা যে অষ্ট্রেলিয়ার মাটীতে পা দিতে না দিতেই দু' দশ হাজার একর ভূমি এবং নানা প্রকার কৃষিকার্য্যোপযোগী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মালিক হইয়া পড়িবে, তাহা নয়। নয়া আগন্তুকের পক্ষে সাপ্তাহিক এক পাউণ্ড বা ৩০ শিলিং মাহিয়ানায় মজুরি করাই প্রশস্ত। ইহার পর আস্তে আস্তে তাহাকে শিক্ষিত প্রজাবীতে পরিণত হইতে হইবে। গায়ের রক্ত দিনরাত খাটিয়া গেলে তার বিশেষ কোন লাভ নাই, গতর খাটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মগজ খাটাইতে ও শিখিতে হইবে। মগজ খাটানোর ফল হইবে এই যে, মজুর নিজের কাজে অনেকটা উৎসাহ অনুভব করিবে।

অষ্ট্রেলিয়ার বড় বড় জমিজমার মালিকগণ নয়া মজুরের নিকট বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে। মালিকগণ দেখে কিভাবে নূতন মজুর কাজ করিতেছে। তাহারা চায় যে নূতন মজুর কাজে মন দিক এবং বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করুক। প্রথম প্রথম নূতন মজুরকে বেশী মজুরি কেহই দিবে না। কিন্তু কাজ শিখিয়া ফেলিলে তাহাদের নিজেদের আত্মবিশ্বাসও জন্মিবে, পরেও তাহাদের বিশ্বাস করিবে এবং বেশী বেশী মজুরিও তাহাদের ভাগ্যে আসিবে। কার্য্যক্ষম মজুর হওয়ার পর নয়া ঔপনিবেশিকের ভাগ্যে বর্গাদার হওয়ার সৌভাগ্য আসিবে। ভূস্বামী বিশ্বস্ত মজুরকে জমি, বীজ, সার, ঘোড়া এবং যন্ত্রপাতি সমস্তই দেয়। জমির উৎপন্ন ফসলে উভয়েরই সমান হিস্যা। বর্গাদারের ভাগ্যে বৎসরে যে কি পরিমাণ মুনাফা দাঁড়ায় তাহা হিসাব করিয়া বলা শক্ত; তবে ইহা খাঁটি সত্য যে, অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ গমের ক্ষেতের মালিকই একদিন এই বর্গাদার রূপেই জীবন আরম্ভ করিয়াছে; সুতরাং নয়া ঔপনিবেশিকের অদৃষ্টেও এই সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ার গম-উৎপাদকগণ নূতন নূতন গম উৎপন্ন করিয়া কৃষিজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। নূতন নূতন জেলায় চাষ-বাস আরম্ভ করার সময় সেই সমস্ত জেলার মাটীর যোগ্যতা, জলহাওয়ার অবস্থা সমস্তই পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ছোট-ছোট ক্ষেতে নানাজাতীয় সার প্রয়োগ করিয়া নানা শ্রেণীর গম বুনিয়া পরীক্ষা করা হয় কিরূপ গম এই স্থানীয় ক্ষেত্রে ভাল ফলিতে পারে। এই পরীক্ষার ফলাফল সমস্তই স্থানীয় কৃষকদিগকে জানান হয় এবং তাহারা সেই উপদেশানুসারে আবাদ করিতে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ান কৃষকের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা কখনও অর্দ্ধেকের বেশী জমি আবাদ করে না। পতিত জমিতে তাহারা ভেড়ার পাল চরায়। গম কাটা হইয়া গেলে পর এই ভেড়ার পাল তাহারা গমের ক্ষেতে ছাড়িয়া দেয়। ভেড়া অষ্ট্রেলিয়ান কৃষকের একটী কম সম্পদ্ নয়। প্রতি ভেড়া হইতে অষ্ট্রেলিয়ান চাষীর লাভ হয় বৎসরে ১০ শিলিং।

অষ্ট্রেলিয়ায় সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি দেখা যায় বটে, কিন্তু দুবৎসরে এত বেশী ফসল জন্মায় যে অনাবৃষ্টি-জনিত ক্ষতিতে অষ্ট্রেলিয়ান চাষীকে মোটেই কাবু করিতে পারে না। তাহারা সকলেই সমৃদ্ধিশালী। কৃষকও প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবন যাপন করে।

জার্ম্মাণির ইলেক্ট্রিক্যাল শিল্প

জার্ম্মাণির মত ইলেকট্রিক্যাল শিল্পের এত উন্নতি দুনিয়ার আর কোথাও নাই। এই মতের সমর্থনের জন্য স্বার্ণার ফন্ সিমেন্সের নাম করিলেই যথেষ্ট। গত দুই এক যুগের মধ্যে যে সকল নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জার্ম্মাণিতে। এজন্য বড় বড় কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইলেক্ট্রিক শিল্পের জন্য যাহা কিছু দরকার সমস্তই কোম্পানীগুলির দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই ব্যবসা জার্ম্মাণ কোম্পানীগুলির একরূপ একচেটিয়া ছিল। জার্ম্মাণির সমস্ত বড় বড় সহরে এবং বিদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সিমেন্স এবং এ, ই, জি কোম্পানীর ব্যবসা চলিত।

এই দুইটী কোম্পানীর মিলিত কারখানা—'অস্ত্রাম্ ওয়ার্কসে' সো ল্যাম্প তৈয়ার হয়। এই কারখানার সহিত 'আউয়ার গেজেলশাফ্ট' কোম্পানীরও যোগাযোগ আছে। ইলেক্ট্রিক্যাল শিল্পের মধ্যে সো ল্যাম্পেরই বেশী দরকার হয়। তিন তিনটী বড় বড় কোম্পানী সো ল্যাম্পের কারবারে একযোট হইয়াছে। ইহার ফলে তাহারা জার্ম্মাণির বাজার ত' দখল করিয়াছেই, দুনিয়ার বাজারেও একাধিপত্য করিবার পথ খোলসা করিয়া ফেলিয়াছে।

এই তিনটা বড় বড় কোম্পানী ছাড়া আরও কতকগুলি মাঝারি ধরণের ফার্ম্ম আছে। এই সকল ফার্ম্মে, বিদ্যুৎ তৈয়ারী ও সরবরাহের পক্ষে দরকারী হরেক রকম অস্ত্র মাল প্রস্তুত হয়। কতকগুলি ছোট ছোট কারখানাও আছে। এগুলি দেশের মধ্যে খুচরা ব্যবসা চালায়।

জার্ম্মাণির শিল্প-রাজ্যে আর একটা বস্তুর—মধ্যে মধ্যে শিল্প-দ্রব্যের প্রদর্শনী মেলা খোলা। এই সকল প্রদর্শনীতে নূতন নূতন আবিষ্কৃত কলকব্জা নূতন উদ্ভাবিত কল-কৌশল সমস্তই প্রদর্শিত হয়। ফলে যাহারা নূতন প্রণালী বা কল-কব্জা সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারা শিখিয়া লইবার অবসর পায়। লাইপৎসিগের বিশ্বমেলায় ইলেক্ট্রিক শিল্পের জন্য একটা মস্ত বাড়ী রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯১৩ সনে জার্ম্মাণিতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইত ১৯২৫ সনে তার দ্বিগুণ উৎপন্ন হয়। একমাত্র মার্কিণই এই হিসাবে জার্ম্মাণির উপরে। তবে, জনপ্রতি বিদ্যুৎ খরচের হিসাব ধরিলে আরও কয়েকটা দেশ জার্ম্মাণির উপরে যায়; নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

জার্ম্মাণি	৩২৬ কিলোওয়াট
সুইডেন	৬০৮
মার্কিণ	৭২০
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	৯৪০
ক্যানাডা	১,১২০ "

জার্ম্মাণিতে বিদ্যুতের চাহিদা-বৃদ্ধির আরো অবকাশ আছে। সেইজন্য মনে হয় যে, এ শিল্পে জার্ম্মাণির প্রচুর উন্নতি ঘটিবে।

১৯১৩ সনে গোটা দুনিয়ার ইলেক্ট্রিক শিল্পজাত মালের মূল্য দাঁড়ায় ৩,১০ কোটি রাইখ্‌স্ মার্ক। তিনটা বড় বড় দেশের ইলেক্ট্রিক শিল্পজাত মালের পরিচয় দেওয়া হইল :—

মার্কিণ	১৪০ কোটি
জার্ম্মাণি	৬৩০
বিলাত	৬০ "

এই সূত্রে একটী কথা বলা আবশ্যক। দাম দেখিয়া উৎপন্ন মালের পরিমাণ বোঝা যায় না। কারণ জিনিষের দাম সব দেশে সমান নয়। সুতরাং মালের পরিমাণের দিক্ হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণিতেই সব চেয়ে বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ তিনটী দেশের উৎপন্ন মালের তালিকা দেওয়া গেল :—

জার্ম্মাণি	প্রায় ৩৫%

মার্কিণ	প্রায় ২৯%
বিলাত	„ ১৮%

১৯২৪ সনে মোটা দুনিয়ায় উৎপন্ন ইলেক্ট্রিক শিল্পজাত দ্রব্যের মান ১,২১০ কোটি রাইখ্‌স্ মার্ক। বড় বড় দেশের অংশ :—

মার্কিণ	৬৮০ কোটি
জার্মাণি	২১০ „
বিলাত	১৪০ „

মানের কম-বেশী হিসাবে বড় বড় দেশের উৎপন্ন মালের পরিমাণ :—

মার্কিণ	প্রায় ৪৮%
জার্মাণি	২৩%
বিলাত	„ ১২%

উপরে যে সমস্ত তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে জার্মাণ ইলেক্ট্রিক শিল্পের প্রকৃত উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। রপ্তানি-মূল্য দেখিলে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ১৯১৩, ১৯২৪ ও ১৯২৬ সনের রপ্তানি-মূল্য দেওয়া হইল :—

(১ম, ২য় ও ৩য় কলামের অঙ্ক ১০ লক্ষ রাইখ্‌স্ মার্কে বুঝিতে হইবে)

দেশের নাম	১৯১৩		১৯২৪		১৯২৬	
জার্মাণি	৩৩০·৬	৪১·৬%	৩৪৬·০	২৪·৬%	৩৯০·৮	২৪·৮%
বিলাত	১৪১·৪	২২·৮ „	৩৪৬·৪	২৫·৬ „	৩৭১·৩	২৪·৪ „
ফ্রান্স	৩০·২	৪·৪ „	৭৮·৩	৫·৭ „	৮৬·৫	৫·৭ „
অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশ	৫৭·৬	৮·৫ „	২২২·৫	১৬·০ „	২৪৪·৬	১৬·১ „
ইয়োরোপের মোট	৫৭৫·৮	৮৩·৫ „	১,০১৩·৬	৭২·৯ „	১,০৯৩·২	৭৪·০ „
মার্কিণ	১১২·৪	১৬·৩ „	৩৪৩·১	২৪·৪ „	৩৯১·১	২৬·১ „
অন্য অ-ইয়োরোপীয় দেশ	১·৯	০·২ „	২৩·৮	১·৭ „	২৯·৪	১·৯ „
অ-ইয়োরোপীয় দেশের মোট	১১৪·৩	১৬·৫ „	৩৭৭·৯	২৭·১ „	৪২৪·৫	২৮·০
দুনিয়ার মোট	৬৯০·১		১,৩৯০·৫		১,৪১৭·৭	

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯১৩ সনে দুনিয়ার অর্দ্ধেক ইলেক্ট্রিক মাল একা জার্মাণিই সরবরাহ করিত, দুনিয়ার বাজারে জার্মাণি কাহারও তোয়াক্কা রাখিত না। বিলাত ও মার্কিণ তখন যথাক্রমে জার্মাণির অর্দ্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সরবরাহ করিত। ১৯২৬ সনে জার্মাণি দুনিয়ায় এক-চতুর্থাংশ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করিয়াছে। ঐ সনে জার্মাণি মার্কিণ ও বিলাতের প্রায় কাছাকাছিই রহিয়াছে।

দুনিয়ার সব দেশেই শিল্পোন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং জার্মাণির ১৯১৩ সনের অবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে কিনা সন্দেহ। তবুও বলিতে হয় যে জার্মাণির এই শিল্পের প্রসার লাভের ক্ষেত্র এখনও যথেষ্ট আছে। এর জন্য জার্মাণির পক্ষে আশু দরকার বাণিজ্য-সন্ধিগুলি নূতন করিয়া সুবিধা-জনক করা এবং অন্যান্য শুল্ক রক্ষণ-শুল্ক কমাইবার চেষ্টা করা। তাহা হইলেই জার্মাণি এই শিল্পে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

শিক্ষা-ব্যয়ের তুলনামূলক তালিকা *

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি,

দেশের নাম	দেশের আয়তন	লোক-সংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা	মোট লোক-সংখ্যার অনুপাতে নিম্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র	মোট লোক সংখ্যার অনুপাতে মধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র	মোট লোক সংখ্যার অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র	মোট লোক সংখ্যার অনুপাতে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার্থী	মোট সরকারী ব্যয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় (বাৎসরিক)	শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় (বাৎসরিক)	মাথাপিছু আয় (বাৎসরিক)
ফ্রান্স	২১২,৬৫১	৪০,৭৪৩,৮৫১		৯·৫°/০	·৪°/০	·১৩°/০	×	৫°/০	৫৶০ পাই	
জাপান	১৪৭,৬৫৭	৫৯,১০৬,৮২২		১৬·৭°/০	·৭°/০	·০৫৮°/০	১·৬°/০	৯·৬°/০	২।৩	
ইটালী	১১৯,৭১৪	৪০,৫৪৮,৬৮৩		৯·৬৭°/০	·৩৫°/০	·০৭৫°/০	২·৩°/০	৭·৬°/০	৪৲	
জার্মানি	১৮১,৭১৪	৬৩,১১৮,৭৮২		১৪·১°/০	১·১°/০	·১১%	১·২°/০	—	১৭৷৶০	
সোভিয়েট রাশিয়া	৮,১৮৬,১৪৪			৫·৩°/০	·৫°/০	·০৫°/০	৩৮°/০	৩৮°/০		
ইউনাইটেড ষ্টেটস্	২,৯৭৩,৮৯০ (১৯২৯ খৃঃ)	১১৭,১০৬,০০৩ (১৯২৬ খৃঃ)	৩৫·৫ (১৯২০ খৃঃ)	১৯·৩°/০	৩·২°/০	·৫৭°/০	·৬১°/০	—		
গ্রেট বৃটেন	৮৯,০৪১ (১৯২১ খৃঃ)	৪৭,৯১৯,৭১০ (১৯২১খৃঃ)	৭৮২ (১৯২১ খৃঃ)	১৪·৩°/০	১·৩°/০					৬০৮৲
বৃটিশ ভারত				৩·৮°/০	·০২৮%		·০২৭°/০	—		
বৃটিশ ব্রহ্মদেশ	৭৬,৮৪৩	১৩,৬২৫,৫৩৬		৪·৪°/০	·০৫°/০	·০০৩৪°/০	·০৩°/০	৪·৭%	৶৬	

* শ্রীবিমলসুধাংশু সরকার প্রণীত কুমুদাঞ্জলি, সেচাগবিদ্ধ বই হইতে সঙ্কলিত।

দুনিয়ার পাটের বাজার

ডাণ্ডীর পাটের বাজার

১৯২৯ সনের ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ডাণ্ডী সহরে পাটের বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। বাজার অত্যন্ত মন্দা। মাত্র দু'এক স্থানে খুচরা ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত দর দাম যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা কিছুই বলা যায় না। পাটের জিনিষপত্রের ক্রেতাগণের কিনিবার আগ্রহ সেরূপ দেখা যায় নাই। ইষ্টারের ছুটির জন্য লোক-জনের কেনাবেচার সেরূপ মন ছিল না। সবচেয়ে দুর্গতি মোটা ও ভারি মালের কারখানাগুলির। বিদেশ হইতে মালের অর্ডার না আসিলে কলগুলির আরও দুর্গতি হইবে।

কাঁচা পাটের বাজারও মন্দা। নূতন বা পুরাতন, কোন মালই সেরূপ বিক্রয় হয় নাই। কলিকাতার খবরে দেখা যায় যে, পাট চাষের বিরুদ্ধে জোর প্রচার কার্য্য চলা সত্ত্বেও পাট যথেষ্ট বোনা হইতেছে। তবে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য কিছু ক্ষতি হইতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে তাহা বলা অসম্ভব। দুনিয়ার পাটের বাজারে ভাটা পড়িলেও কলিকাতায় পাটের কেনাবেচা বেশ ভালই চলিতেছে।

ডাণ্ডীর কাঁচা পাটের বাজার

মার্চ্চের শেষে কলিকাতা হইতে বেশী দামে মাল আমদানি হইয়াছে। বিক্রেতাগণ দাম কমাইতে মোটেই রাজী নয়। নূতন পাট সেরূপ আমদানি হয় নাই। পয়লা নম্বর নূতন পাটের দাম ৩২ পাঃ, রাইটনিং ৩৫ পাঃ ৫ শিঃ হইতে ৩৫ পাঃ ১৫ শিঃ পর্য্যন্ত (আগষ্ট—সেপ্টেম্বর); দেশী অ্যাসর্টমেন্টের দাম উঠে ৩৩ পাঃ পর্য্যন্ত এবং এখনও সেই দামে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু মার্চ্চ—এপ্রিলে, ৩নং পাটের দাম কমিয়া গিয়া ৩২ পাঃ ১০ শিঃ দামে বিকাইতেছে। তোসা ২ নংএর দাম ৩৬ পাঃ ৫ শিঃ, অ্যাসর্টমেন্ট ৩৫ পাঃ ১৫ শিঃ, ৩নং ৩৫ পাঃ, ৪ নং ৩৩ পাঃ (মার্চ্চ—এপ্রিল)।

উৎকৃষ্ট চাকাই পাটের দাম ৩৯ পাঃ ১০ শিঃ, অর্ডিনারি (সাধারণ) চাকাই ৩৭ পাঃ ১০

লণ্ডনের পাটের বাজার

মার্চ্চের শেষে ইয়োরোপের বয়নকারিগণ একটু বেশী মাল লইয়াছে বটে, কিন্তু কেনাবেচা আশানুরূপ হয় নাই। কলকারখানাগুলি সেই ঢিমে তেতালা ভাবেই চলে। কল-কারখানাগুলির কার্য্য-বৃদ্ধি না হইলে কাঁচামালের বাজার সেরূপ চলিবে না। দামের কোন পরিবর্ত্তন নাই। ইষ্টারের ছুটির জন্যও কেনাবেচা কম হইয়াছে।

পাটের তন্তু

পাটের সুতার ব্যবসা ভাল চলিতেছে না। অর্ডার খুব কমিয়া গিয়াছে। চাহিদা কম থাকার জন্য ক্রেতাগণেরই সুবিধা হইতেছে। তবে বেলিয়ান সুতার বাজার-দর কমে নাই। লক সুতার বাজারও বেশ, দর বরং চড়িয়া যাইতেছে। অন্য শ্রেণীর তন্তুর দর নামিয়া গিয়াছে। কার্পেট বোনার সুতার দর একই রূপ আছে।

চট

ইষ্টারের বন্ধে পাটের জিনিষের বাজার একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। ৮৮ ইঞ্চি এবং ৬০ ইঞ্চি বহরের চট বেশ বিক্রয় হইয়াছে, ৪০ ইঞ্চি বহরের চট বিক্রয় করিবার জন্য অল্প মূল্যে মাল ছাড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেলিয়ানের কল সেরূপ চলিতেছে না। মোটা ক্যাম্বিসও সেরূপ প্রস্তুত হইতেছে না।

কলিকাতার বাজার

কলিকাতার বাজারের সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন নাই। দর ঠিকই আছে। অদূর ভবিষ্যতে বাজার চড়িবার সম্ভাবনা। জুলাই সেপ্টেম্বরের জাহাজ বোঝাই হওয়ার সময় ১০ আউন্স ৪০ ইঞ্চি বহরের ক্যাম্বিসের দাম ছিল ৩৩ শিঃ ১০ পেঃ, জানুয়ারি-মার্চ্চ ৩১ শিঃ ৬ পেঃ।

জার্ম্মাণির পাটের ব্যবসা

ইহার বন্ধের মধ্যে জার্ম্মাণির ভাগ্যেও পাটের বাজারে একই দশা ঘটে। জার্ম্মাণির পাট-শিল্পের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়, কারখানার মালের দাম কমই বলিতে হয়। এপ্রিলের প্রথম দুই এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

বিলাতের ধ্বংসোন্মুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণী

ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই সাধন করিতেছে। এই আত্মহত্যা যে মাত্র দু'দশ বৎসর হইতে সুরু হইয়াছে তাহা নয়—বহুদিন ধরিয়া ইহা চলিয়া আসিতেছে এবং যতদিন যাইতেছে ততই এই বিনাশ-কার্য্য অধিকতর দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এমন সমস্ত নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যাপৃত হইতেছে যাহাতে তাহাদের আত্মহত্যার পথ বেশ পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যে বিবাহ করে না বা সন্তান উৎপাদন করে না, তাহা নয়। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। গোটা বৃটিশ জাতির নিকট ইহা কম সমস্যার কথা নয়। নিজের দেশের মধ্যে তাহাদের এমন গুরুতর আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার হাত হইতে রেহাই পাওয়া নিতান্ত সোজা ব্যাপার নয়। ১৯১২ সনের আন্তর্জ্জাতিক সু-প্রজনন সমিতির বৈঠকে এ দিকে নজর দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যা তখনকার চেয়েও ঘোরতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিগত ৪০ বৎসরের তথ্যাদি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৮৮ সনে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের জন্মের হার হাজারকরা ৩১'২, ১৮৯৮ সনে ২৯'৩, ১৯০৮ সনে ২৬'৬, ১৯১৮ সনে ১৭'৭ এবং ১৯২১ সনে ১৬'৬। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ঘণ্টে কমিয়া আসিতেছে। ১৯২১ সনের বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম—হাজার করা মাত্র ৪'৬। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার অত্যধিক মাত্রায় কমিয়া যাওয়ার জন্যই ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলসে ৪০ বৎসরের মধ্যে জন্মের হার হাজার করা ৩১'২ হইতে ১৬'৬তে নামিয়া গিয়াছে।

উপরে যে তথ্য দেওয়া হইল উহা খাঁটি এবং নির্ম্মল সত্য। আর একটী অভিনব সত্য এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বেশ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। তাহা এই—সহর কিংবা পল্লী যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুবন্দোবস্তযুক্ত সেখানকার মাতাপিতার সন্তান-সংখ্যা ততই কম, আর যতই নোংরা এবং বেশী বিশ্রী সেখানে সন্তানসন্ততির সংখ্যা ততই বেশী দেখা যায়। ১৯২১ সনের সেন্সাস হইতে কয়েকটী সহরের জন্মের হারের তালিকা দেওয়া হইল—বাথ ১২'৬; ব্রিষ্টল ১৭'৬, শেফ্টেনহাম ১৩'২৮; কার্ডিফ্ ২০'১; হারবরো—১৪'৯; লিভারপুল—২০'৩; টানব্রিজ ওয়েলস—১৩'৩, নিউক্যাসল-অন-টাইন—২১'৬; হাইড—১২'১; সাউথাম্পটন—১৮'৬, সাউথ-এণ্ড—৯'৬৭; মিডলস্‌বরা—২৫'৩৫, ইত্যাদি। লণ্ডন মহানগরীর বিভিন্ন পল্লীসমূহের মধ্যে বিচার করিলেও এই একই সত্যের আভাষ পাওয়া যায়। ঐ একই সেন্সাসে লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীসমূহের জন্মের হার—চেলসি ১৩'৩; হ্যাম্পস্টেড—১৪'৩;

হ্যাম্পস্টেড—১২·৩; ওল্ডে মিন্‌ষ্টার—১১·০; ক্যাথার ওয়েল—১৬·৬। এই পাঁচটী পল্লীর জন্মের হার পড়ে ১৩·৪। এই সকল পল্লীতে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ বাস করে। কিন্তু যেসকল পল্লীতে অপেক্ষাকৃত ইতর শ্রেণীর লোক বাস করে সেখানকার ব্যাপার একেবারে উল্টা। এইরূপ পাঁচটী পল্লীর জন্মের হার :—ডেপট ফোর্ড—১৮·২; ল্যাম্‌বেথ—২৪১; শোরডিচ—২৩·১; বেথনাল গ্রীন—২০·১; সাউথওয়ার্ক—২০·২; এই পাঁচটী পল্লীর জন্মহার পড়ে—২১·৬ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী পল্লীর জন্মহার অপেক্ষা ৮·২ বেশী।

এই জন্মহার সম্বন্ধে আর একটী দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে যতই উচ্চস্তরের দিকে উঠা যায় ততই দেখা যায় বংশবৃদ্ধির হার কমিয়া যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের বংশবৃদ্ধিরও তুলনা করিয়া দেখা যাউক। স্বামীর বয়স যদি ৫৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে (ভিন্ন ভিন্ন পেশাওয়ালা) প্রতি হাজার দম্পতির সন্তান-সংখ্যার হিসাবটা এইরূপ—শিক্ষক ৯৫; নন্‌কন্‌ফর্ম্মিষ্ট মিনিষ্টার ৯৬; ইংলিশ চার্চ্চের পুরোহিত ১০১; ডাক্তার ১০৩; গ্রন্থকার এবং সম্পাদক ১০৪; পুলিস ১৫০; ডাকপিয়ন ১৫৯; গার্ডোয়ান ২০৭; দক্ষ-মজুর ৩০৯; কাউন্টারে নিযুক্ত মজুর ২০৪; খনি মজুর ২৫৮; জাহাজের মজুর ৩০৮। প্রকৃতপক্ষে দেখা যাইতেছে যে, যাহাদের বলা উচিত "আমরা বেশী ছেলে চাইনা বা আমাদের মোটেই ছেলের দরকার নাই" তাহারা এরূপ কোন কথা বলে না; এবং তাহাদের শিশু-জন্মের হার দেখিয়া মনেই হয় না যে, তাহারা এইভাবে চিন্তাও করে। আবার যদিও মজুর-শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী ছেলেমেয়ে জন্মাইতেছে, তবুও মোটা দেশের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। যাহা হউক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মহারের অথবা হ্রাসই বিশেষ চিন্তার কারণ। উচ্চশ্রেণীর মানুষ আর কয়জন? তাহাদের শুভাশুভে বড় একটা কিছু আসে যায় না, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অবস্থা সত্যই ভীতি-জনক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মহারের হ্রাসের কারণই বা কি, তাহা দেশকে কোন্ দিকেই বা লইয়া যাইতেছে তাহা আলোচনা করা যাউক।

জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয়লাভ, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসে এই সত্যের কোন লেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানব-সভ্যতা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হয়। সেইজন্য মানুষের বেলায় দেখা যায় যে, অযোগ্য যাহারা তাহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া সংসারে টিঁকিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃতির রাজ্যে কোন শ্রেণীকে টিঁকিয়া থাকিতে দেখিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় ঐ শ্রেণীর যোগ্যতা এবং জীবনী শক্তি নিশ্চয়ই বেশী। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে তাহা বলা চলেনা। ডারউইনের ক্রমোন্নতিবাদ প্রচারিত হইবার পর গাল্টন প্রমুখ এক দল পণ্ডিত মত জাহির করিয়াছেন যে, জ্ঞানবান যোগ্য মানুষ যদি বিবাহ করিতে নারাজ হয়, এবং বুদ্ধিহীন ইতর লোক যদি ক্রমাগত বিবাহ করিতে থাকে, তাহা হইলে সমাজে এই ইতর শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যোগ্য জ্ঞানী মানুষ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সন্তান ইতর শ্রেণীর লোকের সন্তানদের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়; জীবন-সংগ্রাম চালাইবার শক্তির দিক্ হইতে তাহারা অন্ততঃ সমকক্ষ ত' বটেই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহারা সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে।

বিলাতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে বাস্তবিকই আজ এই দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, এই সম্প্রদায়-ভুক্ত মানুষ কাহারা। প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় লইয়াই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত, আর এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ নিজেদের খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ লোকই, সোস্যালিষ্ট, এবং নাস্তিকদলকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ অ্যাঙ্গলিক্যান, নন্‌কন্‌ফর্ম্মিষ্ট অথবা রোমান ক্যাথলিক দলভুক্ত। অনেকেই বিবাহ করিবার দরকার হইলে ইংলিশ চার্চ্চের পাদরির নিকটও গমন করিয়া থাকে; এই-জন্য তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়; কারণ, সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করিবে এই আশাতেই চার্চ্চ তাহাদের

বিবাহ স্বীকার করে, ইহা তাহাদের জানা উচিত। কিন্তু লোক-সংখ্যা-সম্বন্ধীয় সংখ্যা-তালিকা ঘাঁটিলে দেখা যায় যে, অনেকেই এই দায়িত্ব এড়াইয়া চলিবার পক্ষপাতী। বর্ত্তমানের লোক-সংখ্যা অটুট রাখিতে হইলে প্রত্যেক দম্পতিকে অন্ততঃ চারিটি সন্তানের জনক-জননী হওয়ার দরকার; কারণ প্রত্যেকটী সন্তানের পক্ষেই বড় হইয়া জনক-জননীতে পরিণত হইবার পথে হাজার হাজার বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান। লোক-সংখ্যা বজায় রাখিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঁচটী সন্তানের দরকার হইত, এবং তাহারও পূর্ব্বে দরকার হইত ছয়টীর, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে স্বাস্থ্যাদি বজায় রাখা সম্বন্ধে অনেক সুবন্দোবস্ত হওয়ায়, লোক-সংখ্যা অটুট রাখিবার পক্ষে প্রত্যেক দম্পতির চারিটি সন্তানই যথেষ্ট। কিন্তু বিলাতে গড়ে এই ৪টী সন্তানও জন্মিতেছে না। রোমান ক্যাথলিক দম্পতিদের মধ্যে গড়ে ৪টী সন্তান দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট পরিবারে মাত্র ২টী সন্তান দেখা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে বিবাহ-প্রতি মাত্র ১·২৫ সন্তান জন্মিয়াছে। সুতরাং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, আর এই বিলোপ-সাধন যে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অন্যপক্ষে সোস্যালিজম্-বাদী মজুরকুলের এক একজনের ঘরে পাঁচ পাঁচটী সন্তান। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে এবং তাহাদের স্থান দখল করিয়া লইতেছে ইতর জনসাধারণের সন্তানগণ। এই ইতর সাধারণের আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। উহাদের ঘরে অর্থ-সমস্যা বার মাসই লাগিয়া আছে, উহাদের উপর মা ষষ্ঠীর বড়ই কৃপা। সুতরাং বিলাতের লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু যাহাদের শরীর ও মন দুই-ই সুস্থ এবং সবল তাহাদের সন্তান-সংখ্যা বাড়িতেছে না।

সন্তান-উৎপাদনের উপর এই যে বিতৃষ্ণা ইহার জন্য মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ ম্যালথাসের "জন-তত্ত্ব"ই দায়ী। "জন-তত্ত্ব" প্রবন্ধ লেখক কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার মতবাদের শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইবে। ম্যালথাসের একটী মতের উপরই লোকে যথেষ্ট জোর দিয়াছে। ম্যালথাস বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ না হও, ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করিও না"। এই মতবাদটীর যথেচ্ছ বিকৃত অর্থ করিয়া অনেকে বলে, "আমি সন্তান চাই না, বা আর বেশী সন্তান চাই না; কারণ আমি প্রতিপালনে অক্ষম।" কিন্তু বিবাহ করার পর এরূপ কথা বলা সাজে না, কারণ এই স্বীকারোক্তি দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, বক্তা তথাকথিত দারিদ্র্য সত্ত্বেও বিবাহ করিয়াছে। 'তথাকথিত দারিদ্র্য' বলারও কারণ আছে, সমাজের নিম্ন স্তরের লোকের মধ্যে সন্তান-উৎপাদনে অনিচ্ছা নিতান্ত কম এবং সমাজের উচ্চ স্তরের লোকের মধ্যেই সন্তান-উৎপাদনে অনিচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া সন্তান-উৎপাদন হ্রাস করার চেষ্টা একটী ছল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্যাপারটী আরও একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। যাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব নাই তাহাদের মধ্যেই হাজারকরা জন্মের হার অত্যন্ত কম। এইসকল মানুষ ভাল ভাল বাড়ীতে বাস করে; সকলেরই এক বা ততোঽধিক চাকর চাকরাণী আছে; ইহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই আধুনিকতম রুচি বা ফ্যাসান অনুযায়ী; ইহারা চাঁদা দিয়া পুস্তকাগারের বইও পাঠ করে। এক কথায় দেহের এবং মনের খোরাক ইহারা যথেষ্ট পরিমাণেই পাইয়া থাকে। রবিবারে ইহারা সেপরিবারে মোটরে বা বাইকে ঘুরিয়া বেড়ায়; আরাম চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ইহারা গবর্ণমেণ্টের এবং অন্যান্য জাতির নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে নিন্দা করিয়া থাকে। এক কথায় দারিদ্র্যের কশাঘাত যে কি বস্তু তাহা তাহারা ঘুণাক্ষরেও কখন টের পায় না। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া বংশে আনয়নের কোন প্রয়োজনীয়তাই তাহাদের আসিতে পারে না। অথচ এই সকল সুখের আলয়েই শিশুর ছোট ছোট পায়ের ছাপ কদাচ পড়িয়া থাকে, ভাল সাজগোজ-পরা এই সব পুরুষাধমই সন্তান-প্রতিপালনে অত্যন্ত নারাজ। সত্য কথা এই যে, বিলাস-ব্যসনে অত্যধিক আসক্তির জন্য পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীর নারীত্বের প্রকৃত বিকাশ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। সেই জন্যই নরনারী আজ সন্তান

কামনাও করে না, সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহও তাহাদের নাই। শিশুর আধ আধ বুলি এখনকার সভ্য নরনারীর কানে বেসুর বাজে। ইহা অপেক্ষা বায়স্কোপ, বেগা টেনিস খেলা তাহের নিকট প্রিয়তর। ছেলে মেয়ের চেয়ে মোটর গাড়ী তাহের প্রিয় বস্তু। কথাগুলি নিতান্ত অপ্রিয়, কিন্তু খাঁটি সত্য, ইহা সকলেই জানে। যে সকল নারী স্বামি-সঙ্গ-সুখ-অভিলাষী অথচ নানা প্রকার কলাকৌশল করিয়া নিঃসন্তান থাকিতে চায়, তাহারা যে কতদূর অন্যায় কার্য্য করিতেছে তাহা আর বলিবার নহে। আর যে স্বামী স্ত্রীর এই চাতুরী জানিতে পারিয়াও কোন কিছু বলে না, তাহাকে এক কথায় অসৎপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। বিবাহের দায়িত্ব অনেক, তাহার মধ্যে সন্তান-উৎপাদন একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং সন্তান-উৎপাদনের বিরোধী যদি মানুষের গড়া কোন আইন বা শাস্ত্রের অনুশাসন থাকে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

এখন অনেকে বলিতে পারে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য এত মাথা-ব্যথার কি দরকার? অতীতের উচ্চ শ্রেণীর লোকই ক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। এখনও কি তাহা চলিতে পারে না? শুধু সমাজ বিজ্ঞানের সাহায্যে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাইতে পারে না। সমাজ-বিজ্ঞান প্রাণ-বিজ্ঞানের একটী অংশ মাত্র, সুতরাং ইহার উত্তর 'প্রাণ-বিজ্ঞানের' ভাষায় বলিতে হইবে। মানুষের ক্রমোন্নতি চলিয়াছে পরিবর্ত্তনের পথে, আর এই পরিবর্ত্তন আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে উর্দ্ধগামীও হইতে পারে আবার নিম্নগামীও হইতে পারে, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকে চলিতে পারে আবার ক্রমশঃ অবনতির পথেও চলিতে পারে। মানব-সমাজের ইতিহাসে এই দুয়েরই নিদর্শন মিলে; এক স্তর বা শ্রেণী হইতে আর এক স্তর বা শ্রেণীতে মানুষ উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিম্নতর স্তরে নামিয়া আসার নিদর্শনও নিতান্ত কম নয়। আজ যাহারা চেয়ার টেবিলে বসিয়া ছেলে পড়াইতেছে, কলম পিষিতেছে, আদালতে বক্তৃতা দিতেছে বা ধর্ম্মযাজকের কাজ করিতেছে, তাহাদের অনেকের বাপ ঠাকুরদাদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া গতর খাটাইয়া উদরান্নের সংস্থান করিত, আমার যাঁহারা গতর খাটাইয়াই দু' মুঠোর সংস্থান করিতেছে, তাহাদের পিতা পিতামহ হয়তো তুলোকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সাদী ও সুরাবের সোনালী স্বপ্নে বিভোর থাকিত।

উত্তপ্ত কটাহে কোন তরল পদার্থ যেমন সদাসর্ব্বদা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে নামিতে থাকে, মানব সমাজেও সেইরূপ উঠা নামা দেখা যায়। দুনিয়াতে আবার উঠার চেয়ে নামা অত্যন্ত সহজ কাজ। সুতরাং নিম্ন শ্রেণী হইতে কেহ কেহ মধ্যবিত্তশ্রেণীতে উঠিলেও, মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতে অনেকে নিম্ন শ্রেণীতে নামিয়া যায় বলিয়া, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি সেরূপ সন্তানাদি না জন্মে, তাহা হইলে তাহাদের অধোগতি সুনিশ্চিত।

মানবজাতির মধ্যে ধনী, দরিদ্র, সুশিক্ষিত, অশিক্ষিত, জ্ঞানবান, অজ্ঞান, উচ্চ, নীচ ইত্যাদি শ্রেণীভেদ থাকিবেই থাকিবে। প্রাচীন গ্রীস্, রোম এবং মিসরে, কিংবা বর্ত্তমানের সুসভ্য ইয়োরোপীয় দেশসমূহে দুনিয়ার সর্ব্বত্র এবং সকল সময়েই মানবজাতির মধ্যে এই শ্রেণীভেদ রহিয়াছে। আশাবাদী অনেকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আশা পোষণ করেন বটে যে, আইন কানুন এবং শিক্ষার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য সম্প্রদায়ের ব্যবধানের প্রাচীরগুলি ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। মনুষ্যজাতি প্রায় একাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ধনবান এবং ধনহীনের মধ্যে বর্ত্তমানের এই আকাশ পাতাল প্রভেদ আর তখন থাকিবে না। মনুষ্য-সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা তখন অত্যন্ত কমিয়া যাইয়া মাত্র দুই চারিটী সমৃদ্ধিশালী শ্রেণী রহিবে। আর সত্যযুগ আসিবার শুভ মুহূর্ত্তও ক্রমে ঘনাইয়া আসিবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ভাববাদীর এই সোনার স্বপন সফল হইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। এই কল্পনা, এই আশা মরীচিকার মতই অলীক বস্তু রহিয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে দুনিয়া অধঃপাতে যাইবে তাহা নয়। সত্যতার ধারা যুগে যুগে সঞ্চারিত হইয়া মানবতাকে শ্রেয়ের ও প্রেয়ের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছে; কিন্তু এই ধারার যোগসূত্র স্থান করিবে কাহারা? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপরে এই গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের দায়িত্ব বড় কম নয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি সন্তানকামী হইয়া প্রকৃত মাতাপিতা সাজিতে পারেন, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি যথেষ্ট সন্তান-সন্ততি জন্মে তবে জগতের রক্ষা। বর্ত্তমানে আর্য্যাণী মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়—"আর্য্যাণির ভবিষ্যৎ বীর সৈন্যদলের জননী হোয়েরা; সুতরাং তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হউক যে তোমরা বীর-প্রসূ হইবে।" আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সকল স্বার্থ-সঙ্ঘাত চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, বিলাতের মেয়েদের কর্ত্তব্য ঐ আর্য্যাণী মেয়েদের কর্ত্তব্য হইতে একচুলও কম নয়। আর ভবিষ্যতে যদি কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই ঘটে, তবুও জগতের কল্যাণের জন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বংশ-বৃদ্ধির দরকার।

গ্রাম্য-কর্ম্মি-শিক্ষা বিভাগ

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গ্রাম্য-কর্ম্মি-শিক্ষা বিভাগ, প্রেম মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন

এই যে আজকাল এত সভাসমিতি, নবযুগের সূত্রপাতের প্রেরণা, ইহার ভিতর যেন প্রাণ নাই, মনে হইতেছে, সমস্তই যেন অধীন ও অসার অবস্থায় আছে। এত জোর জোর বক্তৃতা, এত জোর জোর কাগজের লেখা, তবু যেন মনে হয় ইহার ভিতর সত্যকারের প্রেরণা নাই। সমস্তই ভারতের গুটিকয়েক সহরের ভিতর সীমাবদ্ধ, সমস্তই যেন সহরের ভিতর কেন্দ্রীভূত। তাই সমস্ত আন্দোলনই প্রাণহীন অবস্থায় চলিয়াছে। বিবেচনা করিলে দেখা যায়, দেশের যেখানে প্রাণ সেখানে গিয়া আঘাত লাগে নাই। ভারতের শতকরা ৮৫ জন লোকই বাসকরে গ্রামে, পল্লীতে, যেখানে নবযুগের বাণী গিয়া পৌঁছে না, যেখানে বক্তৃতার শঙ্খধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় না। তাই আজ ভারতের এই শ্রীহীন অবস্থা।

ভারতের এই শ্রীহীনতার মূলে দেশের অর্থনৈতিক শক্তির হীনতা। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ভারতের প্রত্যেকখানা পল্লীকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে; গ্রামবাসিগণকে লইয়া যাইতে হইবে মুক্তিপথের দিকে, আর তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইবে সর্ব্বপ্রকার অধীনতার শৃঙ্খল হইতে। এই কথাটা আজ অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই ধরা পড়িয়াছে। তাই সবাই বলিতেছে, যুবকের দল গ্রামে যাও, গ্রামে গিয়া গ্রাম সংগঠন কর, গ্রামগুলিকে সংগঠন করিতে পারিলেই ভারতের অর্থনৈতিক অধীনতা দূর হইবে, সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আকাশও পরিষ্কার হইবে।" এ কথা কেবল স্বরাজী, অসহযোগী, নরমপন্থী, গরমপন্থী, সেবার, লিবারেল দলের লোক বলে না, সবাই—এমন কি গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরীওয়ালারাও এই কথা বলে। এসম্বন্ধে অনেকে ভাবে, অনেকে বড় বড় কার্য্যতালিকাও প্রস্তুত করে; কিন্তু তাহাদের এই কার্য্যতালিকা কার্য্যে পরিণত করিবার মত লোক পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কারণ কিভাবে কার্য্য-তালিকা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহা কার্য্যতালিকা-নির্ম্মাতারাই জানে না। আজ পর্য্যন্ত অনেক কার্য্যতালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়টি কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের জানা নাই।

বড় বড় কার্য্যতালিকা তৈয়ার হইতে পারে; টাকাও অনেকে দিতে রাজী হয়; কিন্তু কার্য্য করিবার লোকই পাওয়া যায় না। এই কথাটা আজকাল অনেকেই অনুভব করিতেছে। গ্রামগুলিকে সংগঠন করিতে হইলে চাই একদল নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক যুবক, যাহারা গ্রামে গিয়া গ্রামবাসিগণের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গ্রামগুলিকে সংগঠন করিয়া তুলিতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এরূপ নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক যুবকের অভাব হয় না। তাহারা গ্রামে গিয়া কাজ করিতেও রাজী হয়; কিন্তু শিক্ষার অভাবে তাহারা তেমন শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া

কাজ করিতে পারে না। অনেকে বার্থমনোরথ হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করে। অনেকে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তিকে দুর্ব্বলতা দ্বারা ঘেরিয়া রাখে।

নানাদিক্ ভেবিয়া শুনিয়া নির্ব্বাসিত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ-প্রতিষ্ঠিত প্রেম মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রেম মহাবিদ্যালয়ে এক গ্রাম্যকর্ম্মি-শিক্ষাবিভাগ খুলিয়াছে। ১লা জানুয়ারী হইতে এই ক্লাস খোলা হইয়াছে সাতটী ছাত্র লইয়া। অবশ্য এই বেকার সমস্যার দিনে এই ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিল অনেক লোকে। তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া মাত্র সাত জনকে লওয়া হইয়াছে। আরো কয়েকজন ছাত্র লওয়া হইবে।

বর্ত্তমান বৎসর অর্থাৎ আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত কাজ চালাইবার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০০৲টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। জুলাই মাসে আবার নূতন করিয়া বৎসরের জন্য টাকা মঞ্জুর হইবে। ইহা ভিন্ন এই বিভাগের জন্য ১০০০৲ টাকার পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে। বহু সাময়িক পত্রিকা সম্পাদকগণ বিনা মূল্যে দিতেছেন। শিক্ষাকালীন প্রত্যেক ছাত্রকে ১৫৲টাকা করিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে তাহার যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান হয়; আবশ্যক হইলে আরো কিছু বেশী দিবার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক ছাত্রকে বিভাগীয় যাবতীয় আইনকানুন মানিয়া এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহাদিগকে মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর অন্ততঃ দশ বৎসর বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রামে গিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহার জন্য এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে ৩০৲ হইতে ৭০৲টাকা পর্য্যন্ত তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে। যাহারা বিদ্যালয় হইতে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করিবে না; তাহাদিগকে দশ বৎসর গ্রামে কাজ করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে না; এবং তাহারা সম্ভব হইলে ৭০৲টাকার বেশীও প্রতিমাসে গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শিক্ষাকালীন ২১ বৎসর সমস্ত নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হইবে।

আড়াই বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় হেড কোয়ার্টারে থাকিয়া ক্লাসে পড়াশুনা করিতে হইবে এবং অর্দ্ধেক সময় গ্রামে গিয়া ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষা-ক্রম নিম্নলিখিত ভাবে হইবে :—

সাহিত্যিক—১। অর্থনীতি :—

(ক) অর্থনীতির সাধারণ সূত্র

(খ) ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস, বিশেষ করিয়া (১) জমির কর, (২) গৃহ শিল্প, (৩) সমবায় আন্দোলন, (৪) বেকার-সমস্যা, (৫) মজুর ও কৃষক সংগঠন।

নাগরিক শাস্ত্র :—

(ক) ভারতীয় শাসন পদ্ধতি

(খ) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

(গ) গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ

(ঘ) ভারতীয় বর্ত্তমান সমস্যা।

স্বাস্থ্য :—

(ক) স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম

(খ) শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম

(গ) শরীর তত্ত্ব (ফিজিওলজি)।

শিল্প :—

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি

(খ) লাইব্রেরী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া, চলিত লাইব্রেরী।

হাতে কলমে :—

(ক) তুলা ধুনা ও সুতাকাটা

(খ) বয়ন শিক্ষা

(গ) কৃষি

(ঘ) (১) আঘাতের প্রাথমিক সাহায্য (২) ড্রিল (৩) ভারতীয় খেলা

(ঙ) সাধারণ হিসাব রাখার নিয়ম।

ব্যবহারিক :—

(ক) সুতা কাটুনী ও তাঁতিদের সহিত সুতা কাটুনীদের হিসাব রাখা এবং তাঁতিদের হিসাব রাখা।

(খ) নানা গ্রামে গিয়া সেখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রভৃতি বিষয় অনুসন্ধান করা।

(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয় কি ভাবে চালাইতে হয়।

(ঘ) গ্রামবাসীকে রোগের প্রাথমিক সাহায্য ও ঔষধ দান।

(ঙ) গ্রামবাসিগণের কার্য্যসমূহের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ।

(চ) কৃষিক্ষেত্র ভ্রমণ।

(ছ) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করা এবং পতিত জাতিগুলিকে উদ্ধার করা।

দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে শিক্ষা চলিবে, তাহার পর যে যে বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চায় তাহাকে তাহার রুচিঅনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ের একটী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১। কৃষি

২। স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও নাগরিক স্বাস্থ্য

৩। শিক্ষা-পদ্ধতি

৪। সমবায় আন্দোলন

৫। মজুর ও কৃষক সংগঠন।

প্রত্যেক ছাত্রকে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আমরা যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি, তাহার জন্য মহাত্মা গান্ধি ও অনেক বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তি সন্তুষ্টিজ্ঞাপন করিয়াছেন। কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মুরলীকিশোর এম, এ (অক্সফোর্ড), সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ভার্গব, উকিল, এই বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল এবং সবরমতি আশ্রমের ভরতভাই আশ্রাপ খাটিতেছেন। আমরা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং যাহাদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং রুচি আছে, তাহাদের নিকট হইতে উপদেশ আশা করিতে পারি।

যাহারা এই বিভাগের উন্নতির জন্য সাহায্য করিতে চান তাঁহারা নানা ভাবে সাহায্য করিতে পারেন।

১। নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা।

২। এই বিভাগের বিশেষ বিষয়ের জন্য অধ্যাপনার দ্বারা।

৩। এই বিভাগের জন্য নানা প্রকার পুস্তক দ্বারা।

৪। ছেলেদিগকে মাসিক বৃত্তি দ্বারা।

আমরা কেবল নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ছেলেকে বৃত্তি দিয়া ছেলে গ্রহণ করিতে পারিব, কেন না, আমাদের হাতে অধিক অর্থ নাই। কাজেই দেশের এই দুর্দ্দিনে যাহাতে বহু কর্ম্মী শিক্ষিত হইয়া গ্রামে গিয়া কিছু করিতে পারে, তাহার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিগণ ছাত্রদিগকে মাসিক সাহায্য দান করিতে পারেন। তাঁহাদের সাহায্য তাঁহাদের নামে রাখা হইবে। অনেকে বৃত্তি দিয়া কর্ম্মী শিক্ষা দিয়া লইতে পারেন।

দেশের মধ্যে যে আজকাল কর্ম্মীর কত অভাব তাহা আমরা এই দুই মাসের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছি। দুইমাস হইল আমাদের শিক্ষা বিভাগ খোলা হইয়াছে, ইহার মধ্যেই নানা স্থান হইতে নানা প্রকার কর্ম্মীর জন্য আবেদন পাইয়াছি। যাহারা কর্ম্মীর জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মীর উপযুক্ত মজুরি দিতে রাজী আছেন।

যাহারা হিন্দী জানে না, তাহাদিগকে প্রেম মহা-বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে না। তাহারা নিজের খরচে বা কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে বৃত্তি লইয়া অধ্যয়ন করিতে পারে।

দক্ষিণ ওয়েলস্‌এ খনি-মজুরের জীবনধারা

দক্ষিণ ওয়েলসের কয়লার খনিতে মজুরগণ কি ভাবে জীবন যাপন করে সে বিষয়ে একটী সুন্দর বিবরণী ঐ অঞ্চলের খনি-বিষয়ক একটী পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। বিলাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর আদেশে তাহার আফিসের চিফ্ জেনারেল্ ইনস্পেক্টর স্তর আর্থার লোরি এবং ডাঃ জেমস্ শিয়ার্স ঐ প্রদেশের খনি-অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এই বিবরণী লেখেন।

বেকার অবস্থাই খনির মজুরদের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের একমাত্র কারণ কিনা, এবং সেই সমস্ত কারণ দূর করিতে কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করা দরকার, এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা করাই পরিদর্শকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উপযুক্ত তদারকের পর তাঁহারা বলেন যে, সাধারণ মৃত্যুহার তাহাদের মধ্যে এমন বেশী ছিল না যাহা হইতে তাহাদের বিশেষ স্বাস্থ্যভঙ্গের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিশুদের হাড় রোগ (রিকেট্‌স্) ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না, এবং যদিও জনসাধারণের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত বিশেষ কোন অসুখ বিসুখ দেখা যায় না, তবুও কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট শিশু ও প্রসূতিদের মধ্যে জড়তা ও রক্ত শূন্যতার খুবই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

অনুপযুক্ত খাদ্য

পরিদর্শকগণ তাহাদের নিজেদের তদারকের অভিজ্ঞতার ফলে এবং লোকমুখে যতদূর জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, যত সব বেকার মজুরদের সাধারণ খাদ্যের মধ্যে বেশীর ভাগ জিনিষ, শাদা রুটী, মাখন অথবা মার্গারিন, আলু, চিনি, চা এবং পরিমিত শুষ্ক শূকর-মাংস। খাবারের মধ্যে মাংসের পরিমাণ খুব সামান্যই দেখা যায়। মাঝে মাঝে রবিবার দেখিয়া বড় জোর এক শিলিং মূল্যের মাংস আনিয়া সমস্ত পরিবারের লোক এক সঙ্গে খাইয়া থাকে। টাট্‌কা দুধ ত মেলেই না, মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য-রক্ষা সমিতি হইতে যা একটু আধটু পাওয়া যায়। এক আলু ছাড়া টাটকা শাক্‌সব্জী বড় একটা মেলে না। আর পাস্তোপযোগী রুটী সাধারণতঃ বাহির হইতে সেঁকিয়া আনা হয়। বিবরণীতে বলা হইয়াছে, এই প্রকার খাদ্য কোন লোকের অধিক কাল পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে তেমন উপযোগী নয়, বিশেষতঃ, ছোট ছেলেদের ও সন্তান-বতী নারীর পক্ষে ত নয়ই।

স্বল্প পরিচ্ছদ

খাদ্যের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদও তাহারা উপযুক্তরূপে পায় না। কমিশনারদের মতে খাদ্যের চেয়ে এই বিষয়েই তাহাদের অভাব আগে মোচন করা দরকার। জনসাধারণের পরিধানে বেশীর ভাগ তালি দেওয়া পোষাক। ছেঁড়া বুটের ব্যবহারও বেশী দেখা যায়। যতগুলি বাড়ী তাঁহারা ঘুরিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহারা উপযুক্ত পোষাকের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর স্কুলের বালকদেরও বুট জুতার ব্যবহার খুব কমই দেখিয়াছিলেন। পরিণতবয়স্ক পুরুষদের অথবা শিশুদের ত একেবারেই বুটের ব্যবহার দেখিতে পান নাই।

স্থানীয় মজুরদের দুরবস্থার কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার কারণ এই যে, ঐ অঞ্চলে খনি-মজুরের সংখ্যা এত বেশী যে স্থানীয় খনিসমূহে এমন কি স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ও তাহাদের সবাইকে কাজ দেওয়া অসম্ভব। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতে পারে যদি সমস্ত উপরি মজুরদের অন্য দেশে কাজের জন্য চালান দেওয়া যায়। আরও বেশী টাকা খরচ করিতে হইলে এই উদ্দেশ্যেই করা দরকার।

পরিদর্শকগণ শেষে বলিয়াছেন যে, স্থানীয় যতগুলি চিন্তাশীল লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা সবাই বলেন যে, স্থানীয় মজুরদের বেকার অবস্থার

দরুণ তাহাদের নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার কুফল তাহারা যতখানি ভোগ করে, উপযুক্ত খাওয়া পরা অথবা জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব তাহাদের তত ভোগ করিতে হয় না। উপযুক্ত খাদ্য পরিচ্ছদ অপেক্ষা তাহাদের কাছে লাগানোই বেশী দরকার. স্থানীয় লোকেরা এই কথা বলিয়া থাকেন। কমিশনারগণও এ বিষয়ে একমত। কমিশনারদের প্রথম নজরেই দারিদ্র্যের অন্যান্য নিদর্শন অপেক্ষা বেকারাবস্থার দরুণ মুসড়ে পড়া ভাব এবং নিষ্ক্রীয়তার ভাব আগে চোখে পড়িয়াছিল।

সোভিয়েট রুশিয়ার কর-নীতি

সোভিয়েট রুশিয়ার বর্ত্তমান আর্থিক নীতির গোড়াতে রহিয়াছে দেশের সকল ধনসম্পদ সমানভাবে দেশবাসীর মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া। যাহাতে সমভাবে আর্থিক সুবিধা ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য রুশিয়ার স্থাবর অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

অধ্যাপক পল হেন্‌সেল পূর্ব্বে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে "পাব্লিক ফিনান্সের" (সরকারী রাজস্ব) অধ্যাপনা করিতেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতে সোভিয়েট অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি বলেন সোভিয়েট ফিনান্সের মূলনীতি ইণ্ডাষ্ট্রীয়া-লিজেসান মতবাদের দ্বারা নিয়মিত।

রুশিয়ায় কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, যন্ত্রপাতি বাড়াইতে হইবে। যে কোন প্রকারে রুশিয়াকে ইংরেজ বা মার্কিণের মত শিল্পপ্রধান করা চাই-ই চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপরই সোভিয়েটের রাজস্বনীতি নির্ভর করে। এই নীতি ব্যক্তিগত সম্পদ্ বাড়াইবার ঘোর বিরোধী। পুঁজি যেন কাহারও সিন্দুকে অথবা জমিয়া না থাকে সেদিকে সোভিয়েট সরকারের তীব্র দৃষ্টি।

রুশিয়ার করদাতাগণকে এজন্য তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীতে শ্রমিক—শিল্পকারখানার মজুর বা চাকুরে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারিগর, প্রফেশন্যাল মেন—ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, উকিল ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট, শিল্প-ধুরন্ধরদিগকে তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে, ইহাদের শ্রেণীতে পাদ্রী বা পুরোহিত-দেরও ধরা হইয়াছে।

এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাই রাজকর বেশী দেয়। ইহাদের ঘাড়েই খাজনার বোঝা বেশী চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহাদিগকে আরামপ্রিয় বা "লেজার্ড ক্লাস" বলা হয়। ইহাদের তথাকথিত আয়কে "আন্‌আর্ণ্ড ইনকাম" নামে অভিহিত করা হয়। বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশিয়ায় ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, আর দিন দিনই ইহাদের দল ছোট হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে গোটা সোভিয়েট রুশিয়ায় ৫০ লক্ষ ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিক আছে। এবং ইহাদের হাতে মোট ১০ কোটি পাউণ্ড মূলধন খাটিতেছে।

ইহাদিগের উপর উচ্চ হারে কর চাপানো হইলেও সরকার তাহার মোট রাজস্বের খুব মোটা অংশটা ইহাদের মারফতে পায় না। কারণ ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়। আর ইহারাও সুবিধা পাইলেই মজুর বা প্রথম শ্রেণীর "প্রিভি-লেজ্‌ড্ ক্লাসের" দলে ভিড়িতে খুব রাজী আছে। কিন্তু তাহাদের সে সুবিধা দেওয়া হয় না।

ট্রেড্ ইউনিয়নের সভ্য না হইলে কাহাকেও প্রিভিলেজড্ ক্লাসে (বিশেষ অধিকার-বিশিষ্ট শ্রেণীতে) প্রমোশন দেওয়া

হয় না। ট্রেড্ ইউনিয়নগুলিও নিজেদের দল ছাড়া বাহিরের অন্য লোককে সভ্য করিবার সময় ভারি সাবধান থাকে।

যাহাহউক, সোভিয়েট সরকার এই "লেজার্ড ক্লাসের" নিকট হইতে তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া জনসাধারণের উপর হইতে বেশী হারে কর লইতে বাধ্য হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হাত দিবার সময় জনসাধারণকে সরকারী খাজনা বহন করিতে হয়। কোন কিছু হস্তান্তরের সময়ও সরকারকে বিক্রীত দ্রব্যের শতকরা ৪ বা ৫ টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হয়। ইহা বাংলার নয়া প্রজাস্বত্ব আইনের জমিদারি সেলামীর অনুরূপ। অবশ্য ইহা রুশিয়ার ব্যক্তি-বিশেষের হাতে যায় না, পরন্তু সরকারী ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।

পণ্যদ্রব্য পাইকারী ও খুচরা হারে বিক্রয়ের সময় উভয় ব্যাপারেই সরকারকে উল্লিখিত হারে ট্যাক্স দিতে হয়। ইহার ফলে কোন পণ্য দ্রব্য জনসাধারণের হাতে পৌঁছিবার সময় তাহার উপর শতকরা ১২ হইতে ১৫ হারে ট্যাক্স বসিয়া যায়। এইভাবে রুশ সরকার বৎসরে ১০ কোটি পাউণ্ড রাজস্ব পায়।

সোভিয়েট জাতিভেদ

পূর্বেই বলিয়াছি সোভিয়েট রুশিয়ায় তিন শ্রেণীর লোক। প্রথম শ্রেণীর মজুরদের আদল এ দেশের ব্রাহ্মণদের সমান। এই শ্রেণীর লোক ইনকম ট্যাক্স কম দেয়। ৫০০ পাউণ্ড আয়বিশিষ্ট প্রত্যেককেই ইনকম ট্যাক্স দিতে হয়। ঐ শ্রমিক-ব্রাহ্মণরা তাহাদের আয়ের শতকরা দুইভাগেরও কম ইনকম ট্যাক্স দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক অর্থাৎ ব্যবসায়ী, কারিগর, ডাক্তার, উকিল ব্যারিষ্টার প্রভৃতিকে তাহাদের আয়ের শতকরা ৭ ভাগ ইনকম ট্যাক্স বাবদ দিতে হয়। আর কলকারখানার মালিক ও পাদ্রীদেরকে তাহাদের আয়ের শতকরা ৯ ভাগ ইনকম ট্যাক্স বাবদ দিতে হয়।

সোভিয়েট সরকার প্রতিদিন এইরূপ ইনকম ট্যাক্স বাবদ ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড প্রাপ্ত হয়। আর ইহার ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড শেষোক্ত শ্রেণীর লোক বহন করে।

সোভিয়েট সরকার কড়া আইন করিয়া রাখিয়াছে যে, কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানই শতকরা ১০ ভাগের বেশী মুনাফা করিতে পারিবে না। ইহার বেশী মুনাফা করিলে ঐ অতিরিক্ত মুনাফার জন্য সরকারকে এমন কি শতকরা ৫০ ভাগ ট্যাক্স দিতে হইবে। গত সনে এই অতিরিক্ত মুনাফা হইতে সোভিয়েট সরকার ২৪ লক্ষ পাউণ্ড ট্যাক্স পায়।

"লেজার্ড ক্লাস"কে বাড়ী-ভাড়ার উপর একটা ট্যাক্স দিতে হয়। রুশিয়ার অনেক সহরে এই শ্রেণীর লোকদিগকে তাহাদের বাসস্থানের শতকরা ৮৫ ভাগ শ্রমিকদের বাসের জন্য বা বাসগৃহ তৈয়ারীর জন্য ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

একই ধরণের বাড়ীর জন্য শ্রমিককে মাসিক ৪ পাউণ্ড ভাড়া দিতে হইলে একজন ব্যবহারাজীবকে ৬ পাউণ্ড ও একজন কলকারখানার মালিককে ১০ হইতে ১২ পাউণ্ড হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য স্কুলকলেজেও খুব বেশী হারে খরচ দিতে হয়।

রুশিয়ার কৃষকদের অবস্থা

রুশিয়ার কৃষকদের মাত্র একপ্রকার ট্যাক্স দিতে হয়। ৭৫ পাউণ্ডের উপর যাহাদের বাৎসরিক আয় তাহাদিগের উপরই ঐ ট্যাক্স বর্তে।

শতকরা ৩৫ জন কৃষকের আয় ৭৫ পাউণ্ডের কম; এজন্য ইহাদিগকে কোন কর দিতে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে এই ৩৫ জনের বাৎসরিক আয় গড়ে মাত্র ১২ পাউণ্ড।

শতকরা ২ জন কৃষকের আয় ১০০ পাউণ্ডের উপর। ইহাদের নিকট হইতে সরকার বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড রাজস্ব পায়। মোট কৃষকের সংখ্যা কিন্তু ১২ কোটি।

আমদানি পণ্য দ্রব্যের উপর ট্যাক্স

সোভিয়েট রুশিয়ায় আমদানীকৃত সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের উপরই ট্যাক্স আছে। একমাত্র আমদানীকৃত

মাদক দ্রব্য হইতেই কশ সরকার বৎসরে ১০ কোটি পাউণ্ড ট্যাক্স পায়।

রুশিয়ার মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৪০ কোটি পাউণ্ড। প্রত্যেক রুশকে গড়ে ৫৫ শিলিং করিয়া কর দিতে হয়। ইংলণ্ডের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৮৪ কোটি পাউণ্ড বা জন প্রতি ৩৮০ শিলিং বা ১৯ পাউণ্ড। গড়ে রুশিয়ার জন-প্রতি আয় মাত্র ১০ পাউণ্ড। একজন ইংরেজ সেই স্থানে গড়ে বৎসরে ৯০ পাউণ্ড আয় করে।

রুশিয়ার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কতকটা উন্নতি হইতেছে সন্দেহ নাই। জার্ম্মানি, ফ্রান্স ও ইতালীর চাইতেও রুশিয়া দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে।

ভারতে বিদেশী চাষীর আগমন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

পরিবর্ত্তনশীল জগৎ

আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি পৃথিবীর আবহাওয়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে সময়ে যে তুষার বিকাশ হইত এখন তাহা হয় না। মানুষ হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত অনেক জীবের শক্তি ও শারীরিক গঠন বদলাইয়া গিয়াছে এবং শস্যশ্যামল সহস্র সহস্র ক্ষেত্র এখন অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী যে মরণ ও পরিবর্ত্তনশীল সে বিষয়ে সকল দেশের সকল পণ্ডিত একমত।

উন্নতি ও অবনতি

এই পরিবর্ত্তনের সহিত যাঁহারা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহারা সিদ্ধ, যাঁহারা পারেন না তাঁহারা অসিদ্ধ থাকেন। ভারতের আর্য্য সভ্যতা এক সময়ে সিদ্ধ হইয়াছিল, ক্রমে এখন তাহার লোপ হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহাও স্থির যে পরিবর্ত্তনশীলতার নিয়মানুসারে ভারতের সুপ্ত বল আবার ফিরিবে। বলের সহযোগে যেমন বল বিকাশপ্রাপ্ত হয়, মানুষের বুদ্ধি ও কৌশল তেমনি প্রকৃতির সুপ্ত ক্রিয়াকে প্রকাশ করে। দুর্ব্বল ও মূর্খ লোক প্রাকৃতিক আনুকূল্য পাইলেও তাহাকে কার্য্যকর করিয়া তুলিতে পারে না। বিদ্বান, বুদ্ধি ও শক্তিশালী মানুষই সিদ্ধিলাভ করে ও দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়।

অধঃপতনের কারণ

বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূলে; আর প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই আমাদের শক্তিহীনতার কারণ। প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া শরীর ও মনকে সবল রাখা দূরের কথা, কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা (জেনেভার কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের বিরাট সভা) সম্প্রতি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে অনাহারে মৃত্যুর হাত এড়ান সম্ভব হইবে না। তাঁহারা বলেন, ভারতে খাদ্যোৎপত্তির হার যে ভাবে কমিতেছে এই ভাবে আরও ৫০ বৎসর চলিলে ভারতকে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় আহার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতি

অনেক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, ভারতের কৃষিক্ষেত্রগুলির ও ইহা এক প্রান্ত মাটিতে বহু বৎসর ধরিয়া চাষ করার ফলে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী বহু দুরাইটা ক্ষিতি ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হইয়াছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে

ও ইক্ষি অধিক কর্ষণ করিয়া নীচের মাটি উপরে আনিতে হইবে—যাহা বলদ-টানা দেশী লাঙ্গলে হওয়া সম্ভব নহে।

অনাবাদী জমির পরিমাণ

সারভে ও আদমসুমারি প্রভৃতির নথী হইতে দেখা যায়, এ দেশে প্রায় অর্দ্ধেক জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; অথচ একদিকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারিতে গ্রাম জনশূন্য হওয়া সত্ত্বেও অপরদিকে আবাদোৎপন্ন দ্রব্য খাইবার লোক বাড়িয়াছে; কিন্তু ঐ সকল জমি আবাদ করিবার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না। উপরন্তু এখানকার শস্য কতক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে; কিন্তু তাহা নেহাৎ অনাবশ্যক বলাও চলে না; কেন না তাহার বিনিময়ে অর্থ-সমাগম হয় এবং অর্থবলে জীবন-ধারণের অপরাপর বস্তু সংগ্রহ হয়—যাহা না করিলে মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের পক্ষে অনেক অন্তরায় ঘটে।

সকল উন্নতির মূল

এক চাষের বিস্তার ও উন্নতির উপর আমাদের সকল উন্নতি নির্ভর করিতেছে এবং ইহার উন্নতিসাধন করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ভাবে না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থা যে কি তাহা আমাদের চাষীদের কেন অনেক শিক্ষিত লোকেরও সম্যক বোধগম্য হয় নাই। পাশ্চাত্য জাতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী, সাহসী ও কর্ম্মপরায়ণ। সেই জন্য তাহারা সময়োপযোগী কৌশল ও যন্ত্র সাহায্যে পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে ও জাগতিক গুপ্ত শক্তিকে বুদ্ধিবলে স্বকার্য্য-সাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি অপরাপর বিষয়ে যেমন উন্নত, কৃষিকার্য্যেও তদ্রূপ—বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে চাষ করিতেছে, রাসায়নিক পদার্থে মাটিতে সার দিতেছে ও ক্ষতিকারক কীট ধ্বংস করিয়া ফসল রক্ষা করিতেছে।

ট্রাক্টারের সাফল্য

কেস ট্রাক্টার দ্বারা মার্কিণ, সুইডেন ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ-সমূহে অসীম অচল জমি আবাদে পরিণত করিয়াছে ও ফসলও অপর্য্যাপ্ত হইতেছে। ঐ সকল দেশের কৃষকেরা লেখাপড়া-জানা লোক, আমাদের দেশের মত মূর্খ চাষী নহে।

বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে আমাদের দেশেও কয়েকজন লোক কেস ট্রাক্টার সাহায্যে চাষ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বেশ উন্নতি করিয়াছেন। মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত বক্তিয়ার-পুরের খাঁ বাহাদুর অলিজল হক তন্মধ্যে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেহারে কয়েকটী মোতাদ চাষী আছেন, যাঁহাদের আবাদে অনেক টাকার চাল, ধান, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। দেখা গিয়াছে ঐ সকল চাষীর কাছে দেশী গ্রাজুয়েটরা বড় বাবু ছোট বাবু প্রভৃতি সাজিয়া কেরাণীগিরি করেন।

অনেক দেশভক্ত আছেন, যাঁহারা কাস্তে, দা, হাঁড়ি, মাটির প্রদীপ, চরকি, নৌকা, গোরুকটাদি দেখিয়া বলেন, ইহাই আমাদের খাঁটি দেশী শিল্পজাত যন্ত্র, আবার আবশ্যক বোধে আকাশে উড়ো জাহাজ দেখিয়া ও সমুদ্রের বুকে জাহাজের কথা শুনিয়া বলিয়া থাকেন, ঐ আমাদের ইন্দ্রজিতের রথ, ঐ আমাদের লক্ষ্মণ ঠাকুরের যান, যাহাতে চড়িয়া তিনি পাতালপুরে-মহিরাবণের দেশে গিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগের যন্ত্র

অল্প চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় পাশ্চাত্য দেশের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমাদের পৌরাণিক যুগে বা তৎপূর্ব্বে ঠিক ঐ আকারে না হইলেও-ভিন্ন আকারে হয়ত ছিল। নচেৎ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কেমন করিয়া আভাষ পাওয়া যায়? এ জন্য মনে হয়, আধুনিক কেস ট্রাক্টারের মত কোন বিশিষ্ট যন্ত্র আমাদের দেশে পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল, যাহার আভাষ আমরা পুরাণে দেখিতে পাই। যখন অর্জ্জুন সুভদ্রা হরণ করেন তখন শ্রীবলরাম সমগ্র হস্তিনাপুরকে হলের ফলকে উৎপাটন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ না থাকিলেও মনে হয় না যে, সে সময়ে শ্রীবলরামচন্দ্র এখনকার মত একটী লাঙ্গল লইয়া এত বড় একটা আস্ফালন করিয়াছিলেন। ট্রাক্টারের মত যন্ত্রে লাঙ্গল দেওয়া দেখিলে বলরামের কথাটী সত্যই মনে পড়ে। গত ইয়োরোপীয়

যুদ্ধে আমাদের পুরাণাদিতে বর্ণিত অনেক যন্ত্র ও অস্ত্রাদির সত্যতা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠকেরা সকলেই বুঝিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জাতি যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এ দেশে বেশ কাজে লাগিয়াছে এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য কৃষি-যন্ত্রাদি যে এদেশে এখনও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারে আসে নাই তাহার কারণ এই যে, কৃষিকার্য্য এদেশে যাহাদের হাতে ন্যস্ত তাহাদের পনের আনা তিন পাই লোক অশিক্ষিত ও গরিব। কাজেই তাহারা যন্ত্রের ব্যবহার শিখিতে পারে না, যন্ত্র খরিদের অর্থও তাহাদের জোটে না। সরকারী কৃষি বিভাগের পরিচালকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ লোক বিরল। উপরন্তু উন্নত যন্ত্রাদি দ্বারা কৃষি কার্য্য প্রবর্ত্তনের টাকাও সরকারের নাই। ফলতঃ, উন্নতিমূলক বিশেষ সহায়তা সরকারী বিভাগের দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। দেশের শিক্ষিত লোকের আজন্ম ধারণা যে কৃষিকার্য্য ইতর, মূর্খ চাষীরাই কাজ, সুতরাং লেখা পড়া শিখিয়া চাষ করিলে অধঃপতন হয়। দেশের জমিদাররা প্রজার হাল গরু বেচিয়া যথাসময় খাজনা পাইলেই সন্তুষ্ট। গৃহস্থরা ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া যেমন তেমন একটা চাকুরিতে বসাইলেই 'যী-ভাত' পাইয়া সন্তুষ্ট। যাহারা দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের সমগ্র কর্ম্মক্ষেত্রে রাজনীতির বীজ বোনা হইয়াছে, ধানের চাষ তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না। কাজেই কেচাষের জন্য মাথা ঘামান ?

বিদেশীর আগমন সম্ভাবনা

দূরে অল্প অল্প আভাষ পাওয়া যাইতেছে যে, বিদেশী চাষীর দল শীঘ্রই এদেশে আসিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে পাট, ধান ও গমের চাষ করিবে। সেই শুভ দিন আসিলে অনেক গ্র্যাজুয়েট চা বাগানের বাবুদের মত এক একটী চাকুরী পাইয়া লেখাপড়া সার্থক করিবেন। মহারাজা, রাজা ও জমিদারগণ নির্ভাবনায় খাজনা আদায় পাইবেন ও সময়ে সময়ে খেতাঙ্গ চাষীদের ভোজে ও আনন্দ উৎসবে নিমন্ত্রণ করিবেন। তাহার পর আমাদের চিরদরিদ্র কৃষকরা একটী একটী চাকরি পাইয়া কলে চড়িয়া লাঙ্গল দিবে, আর একটুও কাদা ঠেলিতে হইবে না।

সুদূর কান্তারে কতকগুলি সিংহ গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে চটকল, খনকল, বিদ্যুৎকল, ট্রাম, রেল, বাস্, সোনারখনি কলের খনি ও চা বাগান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের সর্ব্বস্ব বিদেশে যাইতেছে তাহার উপর আবার একদল আসিয়া চাষবাস জুড়িয়া দিল! এখন আমরা কি করি ?

ঐ গর্জ্জনের উত্তরে বীরপুরুষরা
বলিবেন "বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা"
নীরবে রসিক কবি উত্তর দিবেন—
"বিকসিত তামরসে অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক-ভাগ্যে কেবল চীৎকার।"
(সোনার বাংলা)

জাপানের খনিজ সম্পদ্

সন	সোনা		রূপা	
	পরিমাণ (গ্রাম্)	মূল্য (ইয়েন)	পরিমাণ (গ্রাম্)	মূল্য (ইয়েন)
	৭,৬৯৭,১৪১	১০,২০৯,০৬৮	১১১,৮৯০,২২৮	৪,৮৬২,৪০১
	[illegible],২৮৬	১০,৫৯৯,২৬২	১১০,১৭৮,৫৭৪	৫,১০০,২০৫
	৮,৪৬৩,৪০৫	[illegible]	১৪৬,১২৪,৭৪৬	৬,৮২৩,৬২৯
	৯,০৯৮,৫৫৩	১২,১৬৭,১৬১	১০৯,২৫৯,৩০১	৬,০২৩,৩০৯
	৯,৬০৬,২৫৬	১৩,১১০,৬৯৯	১৪০,৯৪৬,৮৪৮	৫,৪৫২,৮৪৪

সন	সীসা		তাম্র	
	পরিমাণ (কিলোগ্রাম)	মূল্য (ইয়েন)	পরিমাণ (কিলোগ্রাম)	মূল্য (ইয়েন)
১৯২৩	৩৯,৬৯৯,৭২২	৬৯১,৭১৩	৫৯,৩৪৫,৭১৩	৪৪,৩৪৫,৬৮২
১৯২৪	২,৯৪১,৪০৪	১৬৯,৮৬২	৬২,৫৮৩,১০৪	৪৮,৫৪১,৬৯১
১৯২৫	৩,৩০৮,৬৮৬	১,৩৭০,০০৬	৬৬,৪৮৬,৯৯৯	৫৩,৪৬৭,৯৮৬
১৯২৬	৩,৬০৯,৯০৪	১,২৩৮,৪৪০	৬৭,৩৪৫,৪৪৯	৫০,৭৬৬,৭১১
১৯২৭	৩,৩৯৩,৯৪৭	৯০৪,৭২৯	৬৬,৫৭১,২৪৯	৪৭,৮৮৮,৮৫৮

সন	পিগ লোহা		ইস্পাত	
	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (ইয়েন)	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (ইয়েন)
১৯২৩	৬১,০৭৫	৩,৫৪২,৫১০	৮১৯,৬৯৪	৯৩,৪৪৫,১১৬
১৯২৪	৫৯,৮৪১	৩,৪১০,৯৩৭	৮২৯,১১৫	৮৩,৭৪০'৬১৫
১৯২৫	৬৯,৬১১	৩,৪১০,৯৩৯	১,০১৮,২২১	৯৬,১৩০,৯৯৫
১৯২৬	৮২,১৮৩	৩,৬৯৮,১৩৫	১,২৪৪,১৭২	১০৯,৫৩৯,৯৩৬
১৯২৭	৯১,১২৬	৩,৭৩৬,১৬৬	১,৪০০,৪১৬	১১৬,০৩৩,২৮০

সন	লোহার পাইরাইটস্	
	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (ইয়েন)
	২২৬,০৬৭	২,৯৯২,২৯৭
	২২০,৪৫৬	৩,০৩০,০৭৬
	৩১২,৬২৭	৪,২১২,২৭৭
	৪১৭,৫১৩	৫,৯৩৭,৮৬১
	৫০৬,০৮৯	৭,৩৭০,৪৮১

সন	কয়লা		গন্ধক	
	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (ইয়েন)	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (ইয়েন)
	২৮,৯৪৩,৮২০	২৫৬,৯৯৪,৩৬৩	৩৭,৪১৬	১,৬৫০,৪৯৫
			৩৬,০২৩ (৩য়)	৪৪৩,৭৪০
	৩৯,১১০,৮২৬	২৪১,৬৯৪,০৪৯	৪৬,৮৭৩	২,০৫০,৭২৫
			৪১,৭০৯ (৩য়)	৬১৭,০৬৪

		২৬৬,৮২৮,৩৬৪	(ওয়)	২,০১৪,৫৪
		২৩১,০৪২,২৬৯	(ওয়)	৩২৮,৭৬৮
		৩৩,৪৩০,৬৩৯	(ওয়)	৩,৩০১,৫৫৭
				১০,৭৯৯,৬৭

সন	পেট্রোলিয়াম্ (অপরিষ্কৃত) পরিমাণ (হেক্টোলিটার)	মূল্য (ইয়েন)	অন্যান্য খনিজ দ্রব্য মূল্য (ইয়েন)	জাপানের খনিজ সম্পদের মোট মূল্য (ইয়েন)
(গ্যাস)	২,৮৬৬,০৯৫	১৮,০৪২,৪৯২		৪৪৭,০৮৩,৯৯৬
(গ্যাস)		৬৩৮,৭৯৫		
(গ্যাস)		১৬,৮০৫,৯৩০		
(গ্যাস)		৬৮৩,১৯২		
(গ্যাস)	—	১৫,৯৭১,৯১৪		৪৫২,৩৮৯,৮০৭
(গ্যাস)	২,৬১৪,৫৯০	৬৪৫,৭৯৬		
		১২,৪৬৬,৪৮৯		৪৭৬,১৩৮,৪৩৬
		৭৯১,০৮৬		

তর্ক-প্রশ্ন

ভারতীয় কয়লার খাদের মজুর

সবিনয় নিবেদন,

গত চৈত্রমাসের "আর্থিক উন্নতি"তে "আর্থিক ভারত"-বিভাগে সন্নিবিষ্ট "কয়লার খনির মজুর" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে ২টা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ১৯২৮ সনের "ভারতীয় খনি সংশোধন আইন" পড়িয়া জানিলাম যে—

(১) খাদের ভিতরকার ও উপরকার সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের দৈনিক ১২ ঘণ্টার বেশী খাটানো চলিবে না; এই নিয়ম ১৯৩০ সনের ৭ই এপ্রিল হইতে কার্য্যকর হইবে;

(২) ১৯৩০ সনের ৭ই এপ্রিল হইতে খনিগুলাতে শিফ্‌ট্ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে।

আশা করি, যাঁহারা উপরি উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই পত্রের বিষয়টীতে মনোযোগ দিবেন। ইতি

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ স্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সাহা বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

আশ্বিন—১৩৩৬ ৪র্থ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

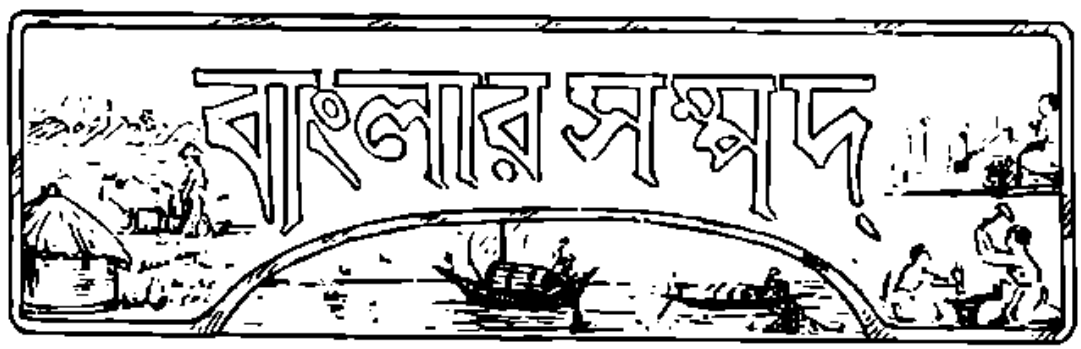

ফিল্ম-শিল্প

আধুনিক জগতে যে সব নূতন নূতন শিল্প উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে ফিল্ম-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিল্ম-শিল্পের উদ্ভব বেশী দিনের কথা নয়; অল্প কয়েক বৎসরে এই শিল্পের অদ্ভুত প্রগতি দেখিয়া অবাক্ না হইয়া থাকা যায় না।

চোখের সাম্নে ইতিহাস, উপন্যাস বা সমসাময়িক ঘটনার জীবন্ত অভিনয় দেখিয়া যে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা ফিল্ম-শিল্পের ক্রমবর্দ্ধনশীল জন-প্রিয়তা হইতে সহজেই বুঝা চলে। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ এখনও খুব উজ্জ্বল—কারণ ইহার চাহিদা যথেষ্ট।

আমেরিকায়, ক্রোড় ক্রোর টাকা ঢালিয়া বিরাট আয়োজন করিয়া সত্যই অতীব সুন্দর ফিল্ম প্রস্তুত করে। জার্ম্মাণি, বিলাত প্রভৃতি দেশেও ফিল্ম প্রস্তুত হয়।

পাশ্চাত্য দেশগুলা অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এই শিল্পেও আমাদের নাগালের বাহিরে বলিলেও হয়। এইটুকু আশার কথা যে, এই দিকে বাঙালীর মাথা অল্পে অল্পে খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলাদেশের ফিল্ম-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড্। ইহাদের টাকা অনেক; কলিকাতার প্রায় সব বায়স্কোপ গৃহগুলাই ইঁহাদের অধীন। তা ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র ইহাদের অধীনে প্রায় ৭০।৭৫টী বায়স্কোপ গৃহ আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে ফিল্ম-ব্যবসায়ে প্রধান এই প্রতিষ্ঠানেটী বাঙালী চালিত নয়, পার্শী চালিত।

বাংলাদেশে যে কয়টা খাঁটি বাঙালী ফিল্ম কোম্পানী আছে তাহাদের নাম—(১) অরোরা সিনেমা কোম্পানী, (২) ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস্; (৩) মোতি প্রোডিউসার্স; (৪) গ্রাফিক্ আর্টস্; (৫) বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্

লিমিটেড ; (৬) এডুকেশানাল্ ফিল্মস্ লিমিটেড্ ; (৭) আর্য্য ফিল্মস্ লিমিটেড্ ; (৮) অরীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশান ; (৯) ঢাকেশ্বরী ফিল্ম কোম্পানী লিমিটেড্ ।

ভারতীয় বিষয় অবলম্বনে প্রস্তুত ফিল্ম নিতান্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও, ভারতীয় দর্শকদের নিকট যে অত্যন্ত প্রিয় হয়, তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলের দুইটী ফিল্ম কোম্পানী নিতান্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ফিল্ম তৈয়ার করিয়াও যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। বাংলা ফিল্মের জন-প্রিয়তা সম্বন্ধেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বাঙালী ফিল্ম কোম্পানীগুলার তৈয়ারী ফিল্মের কাটতির যে বিশেষ সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশেষ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা না পাইয়াও বাঙালী বায়স্কোপের অভিনয়ে যে যথেষ্ট প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে উপযুক্ত চর্চ্চার সুযোগ এবং শিক্ষা পাইলে এই প্রতিভা ও কৃতিত্ব যে অনেকগুণ বাড়িতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ।

তবুও বাঙালীকে এই শিল্পে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে ; প্রথমতঃ, বাঙালীর অধীনে প্রদর্শনী-গৃহের অভাব। ফিল্ম তোলা হইবামাত্র তাহা দেখাইয়া পয়সা তুলিবার বন্দোবস্ত থাকা দরকার। কিন্তু কলিকাতায় বাঙালীর অধীন প্রদর্শনী-গৃহের অত্যন্ত অভাব বলিয়া বাঙালী কোম্পানীর তোলা ফিল্ম অনেক দিন পড়িয়া থাকে। ম্যাডান কোম্পানী দয়া না করিলে তাহা দেখানোই হয় না। দয়া করিলেও ম্যাডান কোম্পানী লাভের মোটা অংশ নিজে পকেটস্থ করেন।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলার ধনী ব্যক্তিদের এই ব্যবসায়ে যতটা উৎসাহ হইয়া টাকা খাটানো দরকার তাহা তাঁহারা করিতেছেন না। মূলধনের অভাব এই শিশু শিল্পকে যথেষ্ট ভোগাইতেছে।

ফিল্ম-ব্যবসায়ে বাঙালী যদি এখনো উৎসাহ হইয়া না লাগে, তাহা হইলে অন্যান্য অ-বাঙালী ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় ফিল্ম কোম্পানী আসিয়া বাংলার ফিল্ম-শিল্প অধিকার করিবে এবং বাঙালী কেবল তাহাদের অধীনে গোলামিই করিতে থাকিবে।

বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধি এখনও জাগিতেছে না। নানা লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা কোন কালে আদৌ জাগিবে কিনা সন্দেহ। এখনও যদি বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধি না জাগে, তাহা হইলে বাঙালীর ভবিষ্যৎ যে নিতান্ত অন্ধকারময় তাহা বোধ হয় দু'বার করিয়া বলা অনাবশ্যক।

মাছের ব্যবসাতে একচেটিয়া

কলিকাতার জন বারো ধনী মৎস্য-ব্যবসায়ী আছেন। ইঁহারা উচ্চ হারের সুদে টাকা ধার দিয়া, একদিকে ২৪ পরগণা, হাবড়া, মেদিনীপুর, খুলনা ও সুন্দরবনের জেলেদের, অপরদিকে কলিকাতার নানা বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের করতলগত করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে, ইঁহারা মাছ বেচিয়া শতকরা ৫০০।৬০০ হারে পর্য্যন্ত লাভ পাইয়া আসিতেছেন। বাঙালীর স্বাস্থ্যের জন্য মাছ অত্যন্ত আবশ্যক। ১২ জন লোককে ধনী করিবার জন্য কলিকাতার লক্ষ লক্ষ লোক স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে ইহা কতদূর সঙ্গত ? এই ১২ জনের অত্যাচার নিবারণের জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এই কয় জনের নামও আর লুকাইয়া না রাখিয়া প্রকাশিত এবং সর্ব্বত্র প্রচারিত করা কর্ত্তব্য।

শান্তিপুরের বস্ত্র-ব্যবসায়ে অসাধুতা

শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কোম্পানীর আমলে এক ইংলণ্ডেই এখান হইতে বৎসরে ১,৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র রপ্তানি হইত। পরে বিদেশীয় বণিকদের অবৈধ চেষ্টায় ও অন্যায় প্রতিযোগিতায় এবং দেশের শিক্ষিত সমাজের বিকৃত সাহেবীয়ানা মতিগতির কল্যাণে এই শিল্প একরকম লোপ পাইতে বসিয়াছিল। যাহা হউক, স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতাদের আন্দোলনে দেশের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র পরিহার ও দেশী বস্ত্র ব্যবহারের ইচ্ছা জাগিয়া উঠায় শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, কিন্তু সূত্র-নির্ম্মাণ-ব্যবসায়ের আর প্রবর্ত্তন হইল না। সেই অবধি দেশের তন্তুবায়কুলের অবস্থা বেশ সচ্ছল না হইলেও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাদিগকে বেগ পাইতে হইত না।

কিন্তু এখন আমরা যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, স্থানীয় অনকয়েক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর অসাধুতায় এই শিল্প পুনরায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং দেশের বয়ন-শিল্পীদের সম্মুখে মহা বিপদ উপস্থিত।

গত কয়েক বৎসর হইতে স্থানীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের (পাইকারদের) কেহ কেহ রামজীবনপুর, বেলেডাঙ্গা, পাঁচমাছলী, ধনেখালী, মেহেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিকৃষ্ট বস্ত্র অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া শান্তিপুরে সুতের কাজ করাইয়া ও ধোয়াইয়া বেশ মোটা লাভ করিতেছেন। অথবা কলিকাতার কোন কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অল্প মোকামের কাপড় আনিয়া শান্তিপুরের সুতের কাজ করাইয়া ও ধোয়াইয়া দিয়া অধিক পারিশ্রমিক লইতেছেন। কাজেই তাঁহারা শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্পের প্রাণ তন্তুবায়দের বস্ত্র ক্রয় করিতে বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে আর সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। সাধারণেও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে শান্তিপুরের নামে চলিত বস্ত্র পাওয়ায় খাঁটী শান্তিপুরের বস্ত্র অধিকমূল্যে লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। সেজন্য বস্ত্রবয়নশিল্পীরা যথার্থ মূল্যের অনেক অল্পে তাঁহাদের বস্ত্র মহাজনদের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন। ফলে তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হওয়ায় অনেকেই ঋণজালে জড়ীভূত হইতেছেন ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে দিন দিন ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত হইয়া কার্য্যের বাহির হইয়া পড়িতেছেন।

প্রায় দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইএর বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা অনেক উচ্চ মূল্যে শান্তিপুরের বস্ত্র লইয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী-দের লোহ সিন্দুক বেশ ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শুনিতে পাই তাঁহারাও এইভাবে প্রতারিত হইয়া শান্তিপুরের বস্ত্র ক্রয় করা একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। এবারও ব্যবসায়ীদের এইরূপ অসাধুতায় শান্তিপুরের কাপড়ের যথেষ্ট বদনাম হইয়াছে। এবং সাধারণে নকলের দৌরাত্ম্যে প্রকৃত শান্তিপুরের কাপড়কেও আর আসল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। এখনও ব্যবসায়ীরা যদি সাবধান হন তাহা হইলে তাঁহারাও রক্ষা পান, আর বস্ত্রবয়ন-শিল্পীরাও অন্নে মারা যান না। তাহা না হইলে স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হংসবধের ন্যায় অবস্থা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

আমরা এ বিষয়ে তন্তুবায়কুলের সুলতান তন্তুবায় সমবায় সমিতির সম্পাদক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ সমাজ-হিতৈষী কর্ম্মীর যত্ন ও তাঁহার ব্যাঙ্কের উপযুক্ত সাহায্য পাইলে, আমরা আশা করি, শান্তিপুরে বস্ত্রশিল্পের এই দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইতে পারে। বস্ত্রবয়ন শিল্পীরা সকলেই এক সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের সভ্য হউন এবং এই ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া তাঁহাদের বস্ত্র বিক্রয় করুন। সমবায় সমিতি ত তাঁহাদেরই জন্য। তাঁহারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য না করিলে কেহই তাঁহাদের এই পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। অপর পক্ষে, ব্যাঙ্কের পরি-চালকবর্গও বস্ত্রবয়ন-শিল্পীদের অভাব অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত মূল্যে এই সমস্ত ক্রয় করিয়া লউন। পরস্পর এইরূপ সাহায্য করিলেই তবে এই প্রাচীন বস্ত্রশিল্প আরও বহুদিন শান্তিপুরের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ও সর্ব্বসাধারণের আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে।

আমরা দেশের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বস্ত্রবয়ন-শিল্পি-সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে সচেষ্ট হইতে এবং এইরূপ ব্যবসায়ে অসাধুতা বন্ধ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিতেছি।　　(শান্তিপুর)

চরকার জন্য এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার

নিখিল ভারত স্পিনার্স এসোসিয়েসন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতের পল্লী কুটীরে ব্যবহারের জন্য উন্নত প্রণালীর চরকা প্রচার করা আবশ্যক। সে জন্য একজন লোক হস্ত অথবা পদ দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন এরূপ ক্ষুদ্রাবয়ব-বিশিষ্ট আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত চরকা যাঁহারা নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরকা-নির্ম্মাতা উক্ত সমিতি হইতে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। চরকাটীর মূল্য ন্যূনাধিক ১৫৲ টাকা হইবে এবং যন্ত্রটী অন্ততঃ ২০ বৎসর কালের জন্য স্থায়ী থাকা আবশ্যক এবং ইহা দ্বারা প্রতি আট ঘণ্টায় ১৬০০০ গজ সুতা প্রস্তুত

করিতে হইবে। এইরূপ অপেক্ষাকৃত সুলভ মজবুত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত চরকা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে কুটীর-শিল্প-জগতে যুগপ্রবর্ত্তন হইবে। সমিতির প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য এবং সময়োপযোগী বটে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে খদ্দর-প্রচারের বিশেষ সহায়তা হইবে। (চারুমিহির)

কেন্দ্রীতে প্রস্তুত খদ্দরের বিবরণী

১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (১৯২৮ সন)

	আমদানি চরকার সূতা		প্রস্তুত খদ্দর	
	ওজন	মূল্য	ওজন	তাঁতীর মজুরি
খাদি প্রতিষ্ঠান	৫৪৮৷৶০	৪২৭২৬৸৯	৩২০।২৸৵০	৭৫৪৪৷৬
অন্তর আশ্রম	৪২১।২৶০	৩২৯৮৬৷৶৩	৩৭১/৬।৵০	৯২৬০৶৩
খাদি মণ্ডল ও খদ্দর ভাণ্ডার	৮৫/৬৸৶	৬১৮৭৷৶৯		১২৩৮/৯

১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুন (১৯২৯ সন)

খাদি প্রতিষ্ঠান		৫৬০৫৪৸৶৩	৪১৫।৪৸৵০	
অন্তর আশ্রম		৩৪৪০৯।৵৩	৪১১।৵৮	
খাদি মণ্ডল ও খদ্দর ভাণ্ডার			৫৮৮৸৵	
খাদি প্রতিষ্ঠান	১২৫৯৮১৸৵			১৭৩৯৬৷৹
অন্তর আশ্রম	৮৫৬।৯।১০			১৯১৪১।৶৩
খাদি মণ্ডল ও খদ্দর ভাণ্ডার	১৫৪।২৶১০	১১১৮৮৲	১১২/১।৶	২৬০৯৵৯
সর্ব্বমোট	২২৭০৮/।/	১৭৭০৯৫৮০	১৬৪০।৬	৩৯১৭।৮৵০

উপরোক্ত বিবরণী উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব হইতে সংগৃহীত। উহা হইতে কেন্দ্রী মহকুমার অধীন স্থানে যেসব খদ্দর-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের যোগে তৈয়ারী খদ্দরের বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণী বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খদ্দরের কাটতি ক্রমেই বাড়িতেছে; কারণ কাটতি অনুযায়ীই মাল তৈয়ারী করা হয়। পূজার সময় হইতে শীতকাল পর্য্যন্তই খদ্দর বিক্রয়ের প্রধান সময়। সেই সময়ের পরও খদ্দর তৈয়ারী কমান হয় নাই, বরং বাড়ান হইয়াছে। গত বৎসর শীতকাল অপেক্ষা এইবার গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালেও খদ্দর অনেক বেশী বিক্রী হইতেছে। ইহাতে খদ্দরের ভবিষ্যৎ উত্তরোত্তরই অধিকতর আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। বিবরণীতে আমদানি সূতার ওজন ও তৈয়ারী খদ্দরের ওজনে অনেক তফাৎ দেখা যায়; তাহার কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের মোয়াখালী জেলার বাহিরে আরও খদ্দর প্রস্তুতের কেন্দ্র আছে। অতিরিক্ত সূতা ঐ সকল কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল কেন্দ্রে প্রস্তুত খদ্দরের হিসাব এখানে ধরা হয় নাই। (দেশের বাণী)

কালিম্পং কৃষিক্ষেত্র

কালিম্পংএ সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু কলোনিয়াল হোমএর অধীন যে কৃষি-গবেষণাক্ষেত্র আছে, তাহার ১৯২৭-২৮ সনের বার্ষিক বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, এই সনে এই ক্ষেত্রজাত ফলাদির বিক্রয়-লব্ধ অর্থের পরিমাণ ১২,০০০৲ টাকা, অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে ২৮৬৲ টাকা বেশী। আলোচ্য সনে সকল রকম ফসলের দাম পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও এইরূপ বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। তুটা ফসলেই সব চেয়ে বেশী লাভ দাঁড়াইয়াছে। ফল এবং শাকসব্জীতেও মন্দ লাভ হয় নাই। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে আনারসের চাহিদাও বেশ দেখা যাইতেছে। কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত প্রকার খরচপত্র বাদে ১৯২৭-২৮ সনে নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ২,৩৭৮৲ টাকা।

বাংলার সিন্‌কোনা

১৯২৭-২৮ সনে বাঙ্গালায় সিন্‌কোনার (ইহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়) চাষ হয় মোট ৪,৮৯৮ একর জমিতে। আলোচ্য বৎসরে মোট ৯,১৭,২৫৯ পাউণ্ড সিন্‌কোনার ছাল কাটা হয় এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে মোট ৬,৬৯,০০০ পাউণ্ড কাটা হয়। আলোচ্য বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্টের সিনকোনা কারখানায় মোট ১১,৪৩,৭৩২ পাউণ্ড শুক্‌নো ছাল ব্যবহৃত হয়। তাহার মধ্যে শুধু বাঙ্গালার উৎপন্নই ৮,৫৭,৯০০ পাউণ্ড। বাকীটা আসাম এবং ব্রহ্মপ্রদেশে উৎপন্ন। উক্ত বৎসরে মোট ৪৬,৪৮৬ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট প্রস্তুত হয় এবং প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ২,৭২১ টাকা। ইহার মধ্যে প্রায় ১৩,১৯৫ পাউণ্ড ভারত গবর্ণমেণ্টের এলাকায়। আলোচ্য বৎসরে সিন্‌কোনা কুইনাইন প্রায় ২০,৮৯৯ পাউণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে ৪,১৬৯ পাউণ্ড ভারত গবর্ণমেণ্টের। আলোচ্য বৎসরে কুইনাইনের কারখানায় মোট ৬৮,৩৭১ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত হয়, ইহার মধ্যে শুধু বাংলার অংশ ৫১০০০ পাউণ্ড।

বাংলায় সমবায় প্রচেষ্টা

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশেও সমবায় চেষ্টা ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। ১৯২৭-২৮ সনের বিবরণী অনুসারে আমাদের প্রদেশে সকল প্রকার সমবায় সমিতির সংখ্যা এখন আঠার হাজারের উপর। উহাদের সভ্যসংখ্যা ছয় লক্ষেরও বেশী। ১৯২৬-২৭ সনে বাংলায় ১৫ হাজারের কিছু অধিক সমবায় সমিতি ছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচলক্ষ সভ্য এগুলিতে ছিলেন। সমিতির সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত ইহাদের মূলধনের পরিমাণও বাড়িয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে এই মূলধন ছিল প্রায় সাড়ে নয় কোটী টাকা; আলোচ্য বৎসরে উহা বাড়িয়া এগার কোটী দশ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

এই আঠার হাজার সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার বা শতকরা ৮০টি কৃষি-ঋণদান সমিতি। সমবায় আন্দোলনে ঋণদান সমিতির প্রাধান্য যে কেবল বাংলায় ঘটিয়াছে তাহা নহে, ভারতের সকল প্রদেশেই সমবায় সমিতির মধ্যে অধিকাংশ এখনও ঋণদান সমিতি।

যেমন অন্য ব্যবসায়ে, সেইরূপ কৃষি-ব্যবসায়েও, সময় সময় ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ কৃষির ফসল ফলিতে দেরী হয় বলিয়া অন্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা কোন কোন দিক্ দিয়া কৃষকের ঋণের আবশ্যকতা বেশী। সহরের বড় বড় মহাজনী ব্যাঙ্ক কৃষকের অভাব মিটাইতে পারে না। জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে এই কারণে কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে কৃষি-ঋণদান সমিতির প্রাধান্য একটু বিশেষ কারণে ঘটিয়াছে। আমাদের কৃষক বহুদিন হইতে ঋণভারে প্রপীড়িত। কেহ কেহ মনে করেন এই ঋণের পরিমাণ কয়েক শত কোটী টাকা। সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতির সাহায্যে কৃষকের এই গুরু ঋণভার কমাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা কতক পরিমাণে সফলও হইয়াছে।

ঋণদান সমিতির সাহায্যে কৃষক অল্প ও নির্দ্ধারিত সুদে টাকা পান। ঋণদান সমিতির দ্বারা যে কেবল

সভ্যেরাই উপকৃত হন তাহা নহে, কোন গ্রামে এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকেরা পূর্ব্বের অপেক্ষা কম সুদে মহাজনের নিকট হইতেও টাকা পাইতে আরম্ভ করেন। সমবায় নীতির প্রভাবে একসঙ্গে কাজ করিবার শক্তি কৃষকদিগের হয় ও তাঁহারা মিতব্যয়ী হইতে শিখেন। এভাবে ঋণদান সমিতির সাহায্যে কৃষকের আর্থিক অবস্থার কিছু পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে।

কিন্তু যতটা প্রয়োজন তাহা কেবল ঋণদান সমিতির দ্বারা সম্ভবপর নহে। আমাদের কৃষকের ঋণভার তাহার সাংঘাতিক দারিদ্র্য না ঘুচিলে যাইবে না। এক সময় কেহ কেহ মনে করিতেন, ভারতের চাষীকে অত্যন্ত বেশী হারে সুদ দিতে হয় বলিয়া ও নিজে অমিতব্যয়ী বলিয়া তাহার ঋণভার এত বেশী। কিয়ৎপরিমাণে ইহা সত্য হইলেও বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভারতীয় কৃষক অন্য দেশের কৃষক অপেক্ষা বেশী অমিতব্যয়ী, একথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। আর সুদের হার বেশী বলিয়া কৃষক দরিদ্র ইহা যেমন সত্য, সে অতি দরিদ্র বলিয়াই সুদের হারও তাহার পক্ষে এত বেশী, একথাও বোধ হয় সেইরূপ সত্য।

বস্তুতঃ, কৃষকের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কৃষির উন্নতিসাধন করিয়া, নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার আয় বাড়াইতে হইবে। সমবায়নীতির সাহায্যেই ইহা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় সমবায় ছাড়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের বোধ হয় অন্য কোন পথ নাই। কৃষি ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, কৃষি সমবায় সমিতি, সেচ সমিতি প্রভৃতি কিছু কিছু পরিমাণে আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; কিন্তু এগুলির আরও বহুল বিস্তার প্রয়োজন। বয়ন প্রভৃতি নানাবিধ গৃহশিল্প, যাহা গ্রামের লোকেরা সহজে করিতে পারে, তাহার উন্নতির জন্যও সমবায়নীতির সাহায্যে আরও চেষ্টা করা দরকার। এইভাবে কৃষকের আয় বাড়িলেই তাহার ঋণভারও কমিবে।

(পল্লীবাসী)

জেলাবোর্ডগুলির কার্য্যকলাপ

কিছুদিন পূর্ব্বে বিভাগীয় কমিশনারযুক্ত বাঙ্গালার সমস্ত জিলাবোর্ড এবং লোকালবোর্ড সম্বন্ধে ১৯২৭-২৮ সনের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত রিপোর্টের পর্য্যালোচনা করিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ হইতে একটি বিবরণী প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—সর্ব্বশুদ্ধ সভ্যের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মতই রহিয়াছে। এই সংখ্যা ৮৮৩। ইহাদের মধ্যে ৬২৩ জন নির্ব্বাচিত।

লোকালবোর্ডসমূহ

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মত আলোচ্য বৎসরেও ৮২টী লোকালবোর্ড ছিল। তাহাদের মধ্যে চারটীর চেয়ারম্যান বে-সরকারী কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত। বাকী সংখ্যার মধ্যে একজন সরকার-নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান এবং আর সমস্তই নির্ব্বাচিত বে-সরকারী চেয়ারম্যান। সর্ব্বসমেত সভ্যের সংখ্যা ১০৩৯ জন; তাহাদের মধ্যে ৮৮৩জন নির্ব্বাচিত।

জিলাবোর্ডের আয়ব্যয়

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে জিলা বোর্ডের আয় ছিল ১৩৮'৭৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৪'৪৩তে উঠিয়াছে। "শিক্ষা" "সিভিল কার্য্য" ও "মেডিক্যাল" বিভাগ হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ১৪১'২ লক্ষ টাকা; আলোচ্য বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৯'২২ লক্ষে উঠিয়াছে। "মেডিক্যাল" "শিক্ষা" ও অন্য বিভাগেই ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মজুত তহবিলে আছে ৩১ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে নগদ আছে ১৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব্বের বৎসরে ইহা ছিল ৩৪'৬৮ লক্ষ টাকা।

নির্দ্ধারিত কর

জিলাবোর্ডের জন্য গড়পড়তা মাথাপিছু ১১ পয়সা করিয়া কর ধার্য্য করা হইয়াছে। খাজনার হার বিভিন্ন জিলায় বিভিন্নরূপ; এমন স্থানও আছে যেখানে মাথাপিছু মাত্র ১ আনা কর ধার্য্য করা হইয়াছে; আবার এমন স্থানও আছে যেখানে লোকপ্রতি উহা সাড়ে সাত আনা হিসাবে ঠিক করা হইয়াছে।

শিক্ষা

জিলা বোর্ডের অন্তর্গত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় বাড়িয়া ৩৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে। তাহার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন ২১·৬ লক্ষ; এতদ্ব্যতীত অন্যান্যের দান, ছাত্রের মাহিনা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্তি হইয়াছে যথাক্রমে ৪৮২১, ৪৪১৫৫ ও ২৯৪৮৬ টাকা। জিলা বোর্ড তাহাদের নিজেদের তহবিল হইতে ১২·৬ লক্ষ টাকা দিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে বোর্ডের তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছিল ১৩·৮ লক্ষ টাকা। বোর্ডসমূহের তত্ত্বাবধানে উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া ৪৩৭০৩ হইতে ৪৫৪১৬তে উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৩৪,৫৬৬টী বালকদের বিদ্যালয় এবং ১১৮৫০ বালিকা বিদ্যালয়। এই সমস্ত স্কুলে ১২৪৮৪০০ জন বালক এবং ৩০৭৮৪১ জন বালিকা পাঠ করে। পূর্ব্ব বৎসরে ১৮৪৭৩৮ জন বালক এবং ২৮০৬৬৩ জন বালিকা এই সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠ করিত।

সাধারণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগ

উপরোক্ত বিভাগসমূহের ব্যয় খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসর হইতে গভর্ণমেণ্ট গ্রাম্য স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান-সমূহে দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ। আলোচ্য বৎসরে ১২টী নূতন চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। জিলা বোর্ড পরিচালিত এরূপ যেখান হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৫২০ ও ৩৫৭। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইহা ছিল ৫০৮ ও ৩৪৬। নদীয়াতে জিলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান একটি চলন্ত স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্ণো এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই রকমের প্রদর্শনীর ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ইহা দ্বারা কাজ হয় খুব বেশী।

শিশু ও নারী মঙ্গল কার্য্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছিল। বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কয়েকটী ধাত্রী-শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং শিশু-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জলপাইগুড়ি জিলাতেই ধাত্রী শিক্ষার কাজ বিশেষভাবে চলিতেছে। চা বাগানের ম্যানেজারেরা যাহাতে বাগিচার মধ্যেই এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন তজ্জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

পূর্ত্ত বিভাগের কাজ

এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কাজের মধ্যে জল সরবরাহ এবং ড্রেণ পরিষ্কারের কাজই প্রধান। পূর্ব্বের বৎসরে এই বিভাগে ৬৪·৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা কমিয়া ৬২·৮ লক্ষে নামিয়াছে। মফঃস্বলে জিলা বোর্ডের অধীনস্থ রাস্তাঘাটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ইহার জন্য আরও অর্থব্যয় না করা হইলে ক্রমশই ইহা অবনতির পথে নামিবে।

জল-সরবরাহের কাজ

জল-সরবরাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৮·৬২ লক্ষ হইতে ৯·২৪ লক্ষে উঠিয়াছে; এই দিক্ দিয়া অনেক বোর্ডই চমৎকার কাজ করিয়াছে।

ফরিদপুরে অনেক জেলা বোর্ডই টিউব ওয়েল স্থাপন করিয়াছে। ইহা বসাইবার জন্য ৩ দফা ঘরপাতি ক্রয় করা হইয়াছে এবং অনেক মিস্ত্রিকে রীতিমত শিক্ষাদান করা হইয়াছে।

সাধারণ মন্তব্য

মোটের উপর বিভাগীয় কমিশনারদের নিকট হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, জিলা বোর্ড-সমূহের কাজ আলোচ্য বর্ষে খুব ভাল ভাবেই চলিয়াছিল।

অবশ্য কয়েকটী জিলাতে অল্প বৃষ্টিপাত এবং অজন্মার জন্য বোর্ডসমূহকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুড মেদিনীপুর জিলাবোর্ডের নীতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বোর্ডের কাজে এখনও রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে অনেক সময়ে কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, স্বরাজশাসন-শাসিত মেদিনীপুর জিলা বোর্ড অনেক প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে।

সনমানিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের ১৩৩৫ সনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব

আয়

ঢাকা জিলার কাপাসিয়া থানার অধীন সনমানিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের ১৩৩৪ সনের আয়ব্যয়ের হিসাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল, যথা :—

পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল	
খোয়াড়ের জমা	
৩৭ (ক) ধারানুযায়ী টাক্স আদায়	
৩৭ (খ) ধারানুযায়ী টাক্স আদায়	
৪৫ ধারানুযায়ী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য	
৩৩ ধারানুযায়ী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের স্কুলের বাবদ সাহায্য	
স্থানীয় সাহায্য (চাঁদা)	
৪১ ধারানুযায়ী দণ্ড	
ইউনিয়ন বেঞ্চের আয়	
ইউনিয়ন কোর্টের আয়	
বিবিধ প্রকারের আয় যথা :—	
১। চৌকিদারের পুরস্কার	৪০৲
২। সদর জারির ফিস	১১৸০
	২৭৪৯৸৶০

কর্ম্মচারীর বেতন	১৮০৲
দফাদার ও চৌকিদারের বেতন	৯০৸৶০
টাক্স আদায়ের খরচ	১০৮৲
রাস্তা নির্ম্মাণ	১৪৩৶০
রাস্তা মেরামত	২৫৲
ব্রিজের উন্নতি (পুল)	১০৸০
জল সরবরাহ (২টী পাকা ইদারা)	৪৮৪৸৶০
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পরিচালনাধীন বিষ্ণুপুর ও চর আলীনগর বোর্ডস্কুলঘরের খরচ	
ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুলের বাবদ ব্যয়	
হাওলাত শোধ	১৫৮৲
ইউনিয়ন বেঞ্চের খরচ	২০৶০
ইউনিয়ন কোর্টের খরচ	৪১৶৯
বিবিধ খরচ	১৭৪৲৬
	২৬৬৫৸৶১
উদ্বৃত্ত তহবিল	৮৫৸৶১
মোট	২৭৪৯৸৶০

(পঞ্চায়েৎ)

বাঙ্গালায় প্রসূতিমৃত্যু

বাঙ্গলা দেশের এক বৎসরের স্বাস্থ্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় মরণ-দেবতা প্রতি বৎসরই অধিকতর সংখ্যায় বাঙ্গালীর জীবন হরণ করিতেছেন। আমরা প্রসূতি মৃত্যুর হিসাব নিম্নে দিতেছি।

সন	সংখ্যা
১৯২৩	১১৮৫
১৯২৪	১৯৭২
১৯২৫	২৭১০
১৯২৬	৩২২৮
১৯২৭	৪৩৯৭

১৯২৩ সন হইতে ১৯২৮ সনের মধ্যে প্রসূতির মৃত্যুর হার সংখ্যায় ৩২১২ বাড়িয়াছে। ইহা স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তব্যের ত্রুটীর জন্য হইয়াছে কিংবা দিনদিন বাঙ্গালী প্রসূতির স্বাস্থ্যহানির জন্য হইয়াছে বলা যায় না। এই তালিকায় দেখা যায় যে, গত ৫ বৎসরে প্রসূতির মৃত্যুর হার ২৭১০৯ বাড়িয়াছে। অন্য দেশে দিন দিন প্রসূতির মৃত্যু সংখ্যা কমে, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে বাড়িয়া যাইতেছে। দেখা যায় যে প্রতি ৩০৭টী শিশু প্রসব করিতে ১টী প্রসূতি প্রাণ দিয়াছে।

কলিকাতা পুলিসের ১৯২৮ সনের রিপোর্ট

১৯২৮ সালের পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ,—১৯২৮ সালে কলিকাতায় ৯৮ জন লোক আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।

১৯২৭ সালের ২৮ জন এবং ১৯২৬ সালে ৯২ জন আত্মহত্যা করিয়াছে। ২৮ জনের মধ্যে ৮৪ জন হিন্দু, ৭ জন মুসলমান এবং ৭ জন খৃষ্টান। এই সংখ্যার মধ্যে ২৪৪ জন অহিফেন সেবনে মারা গিয়াছে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

আলোচ্য বর্ষে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ভাবে ৩৯৮ জন লোক মারা গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৪৪৬ জন মারা যায়। গত ৩ বৎসরে রাস্তায় যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯২৬		১৯২৭		১৯২৮	
	মৃত	আহত	মৃত	আহত	মৃত	আহত
ট্রাম	১৪	২১৪	১৪	১৯২	১৭	২১৪
মোটর	৪২	৪৯১	৭১	৭৭১	৫৭	১১১৭
ছ্যাকরা গাড়ী	৪	৬৮	৩	৬০		৫০
অশ্বগাড়ী	৫	৮৮	৬	১২৮		১২৫
বাড়ীর ঘোড়ার গাড়ী	২	৩৫	৮	৫৫	১	১৩৫

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু-সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু আহতের সংখ্যা ১৯২৬ সন অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিসের আওতা ৩০৮ বর্গ মাইল। এই স্থানের মোট জনসংখ্যা ১০৩,৭৭,২৬৪।

মোট পুলিস-সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ৫,৬০৭ জন (কর্ম্মচারী ও পুলিস), ইহাদের খরচা ৩৮,৮৯,৬০৪ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে সার্জ্জেণ্টদের বেতন ১৫০—২০০ হইতে ২০০—২৫০ টাকা, হেড কনেষ্টবলদের বেতন ২৫—৩৪ হইতে ৩২—৪২, কনেষ্টবলদের বেতন ১৮,১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬ ২৭, ২৮ এবং ২৯ টাকা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৬ জন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে কনেষ্টবল-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

হোটেল, মদ ও গাঁজার দোকান

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা সহরে ৯টী হোটেল, ২৮টী রেষ্টরেণ্ট, ১,২৪৯টী চায়ের ও ২৩৮ মদের দোকান, ৩,৬৮৪টি বোর্ডিং, চায়ের দোকান ও ভোজনালয়, ৩৬টী অহিফেনের দোকান ও ৫১টী গাঁজার দোকানকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

দমকল

আলোচ্য বর্ষে ৬৭১টী স্থান হইতে দমকলের ডাক আসিয়াছিল, আগুনে ও জলে মোট ৭,১৪,৮৫৯ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এতদপেক্ষা ৩,৪৭,৮৫৫ টাকা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। প্রতি অগ্নিকাণ্ডে গড়ে ১,০৬৫ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২১ জন আহত হইয়াছে ও ১৬ জন লোক মারা গিয়াছে। মোটর অ্যাম্বুলেন্স বিভাগে ১২ খানা গাড়ী, ১০ জন চালক, ২০ জন ভৃত্য আছে। আলোচ্য বর্ষে অ্যাম্বুলেন্সে ১৬,৫৩৮টী কল ছিল—গত বৎসর এতদপেক্ষা ১০টী কল কম ছিল। হাসপাতালে স্থানাভাববশতঃ বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

চিঃ সিন্দুর	৩।৵
হরিদ্রা	১২।০ বস্তা
নং হরিদ্রা	১৩।০
লঙ্কা পাটনাই	২০৷৹
লঙ্কা রাউপুর	২০৲
লঙ্কা চট্টলা	১৯৲
মরিচ কানাডুর	৬৮৷৹
মরিচ আলজি	৬৭৲
জিরা ১নং	৩৯৲
জিরা ২নং	৩৭৷৹
জিরা ৩নং	৩৪৲
ধনে	৫৷৹
সরিষা	৯৷৹
কালজিরা বাড়াই খুচরা	২০৲
মেথী ১নং বড় দানা খুচরা	৯৲
মৌরি ১নং খুচরা	২২৲
মৌরি ২ নং বাড়াই খুচরা	১৭৷০

দারুচিনি	১৫৸০	জাফরাণ ২নং	সের ৫০৲
তেজপাতা	৫৸০	জাফরাণ ৩নং	,, ৩০৲
দেশী সুপারি দারাজপুর	২০৷০	কেওড়া দানা আস্ত বস্তা	১০৷৵
জাহাজী কাটা সুপারি	১৪৷০	কেওড়া দানা সিঙ্গাপুর	৯৵
কাটা সুপারি পিনাং	১৭৷০	এরারুট আস্ত	৯৷০
কাটা সুপারি সিঙ্গাপুর	১৭৲	এরারুট সিঙ্গাপুর	৮৷০
খয়ের গুটি ১নং	২১৲	চিঃ মিছরি খুচরা	২০৲
খয়ের গুটি ২নং	১৪৷০	মিছরি কুচা	১০৷৵
খয়ের নেবু ১নং	২৯৷০	বিলিতি বালি বড়	১০৷/১০
মপাই খয়ের ২নং	২৩৲	বিলিতি ছাক্ বালি	৪৷০
এলাচি খয়ের	১২৸০	ক্রিঃ করপক্লাউয়ার পেটী	১৩৸০
বড় এলাচ ১নং খুচরা	৪২৲	মটন করপক্লাউয়ার পেটী	১৩৷০
বড় এলাচ ২নং	৩৭৲	দেশী করপক্লাউয়ার পেটী	৭৷০
ছোট এলাচ ১নং	৪৷৷০	কুইনাইন হাওয়ার্ড (সিসি)	১৷৵৫
ছোট এলাচ ২নং	৪৷০	কুইনাইন হেরিং (সিসি)	১৷৵
জোয়ান বড় দানা বাড়াই	১৩৷০	ইসপ্রিট তারপিন বোতল	৸৵
জোয়ান ছোট দানা বাড়াই	৯৷০	কাম্ফিনটি বোতল	৸০
চন্দনী	১৮৲	ক্রিঃ ঘোষের ভিলটৈল (ডজন)	৯৷৵
ত্রৈক্রী	৪৷০	জবাকুসুম (ডজন)	২৲
কাবাবচিনি	৭০৲	কেশরঞ্জন (ডজন)	৭৷৵
লবঙ্গ, জং বাজার ১নং	৮৪৲	লক্ষ্মীবিলাস (ডজন)	৯৷৷০
কিশমিশ খুচরা	২৯৲	পাতা চা ১নং (খুচরা)	৭০৲ মণ
বড় পেস্তা	২৸০	পাতা চা ২নং	৬০৲
ছোট পেস্তা	২৷০	পাতা চা ৩নং	৫০৲
কাগজী বাদাম বড় ১নং	৪৪৲	গুঁড়া চা ১নং	৬০৲
কাগজী বাদাম ছোট	৪১৲	গুঁড়া চা ২নং	৩২৲
কাচা বাদাম মণ	২৮৲	একাদি	২৮৲ মণ খুচরা
ভাজা বাদাম বড় সের	২৷৵	ষোড়শ	১৪৲
ভাজা বাদাম ছোট	১৷০	তাম্বুল	১১৲
লাল মরিচ	৫৲	পচাপাতা	৩৬৲
সাদা জিরা ১নং মণ	৭২৲	ধোনা	২২৲
সাদা জিরা ২নং ,,	২৬৲	বুচকি	৮৲
হিং	৮৲ সের	শেলক	১৬৲
গুর্জ্জি জাফরাণ	১৷৷ ভরি	এলকালাইড	২৪৲ মণ

মুনা রেজুন	১৩৸
মুনা আহাজি	৭৷৷০
শুপ্তগুল ১নং	৫০৲
চন্দনগুঁড়া	১৪৲
চন্দনকাঠ	৮০৲
লাল চন্দন	১০৲
কর্পূর ভিন্না	৪৲ সের
গঁদ	৪২৲ মণ
গালা ২নং	৬০৲
রটমস্তকি ২নং	২৮৲
গালা ১নং	৫৲ সের
রটমস্তকি ১নং	৪৷০ ,,
বড় হরীতকী	৪৷০ মণ
বহেড়া	৬৲
আমলা	৮৲
চৌরি ১নং	৯৲
হিরাকস	৪৲
পিপুল	৮৮৲ মণ
শুট	৩৪৲
লাল বচ	১৭৲
বিটলবণ	১১৲
সোনাপাতা	৯৲
সাদা শুট	৪২৲
বিড়ঙ্গ	১৮৲ মণ
নিশাদল	২৩৲
হিংড়া ১নং	৪৪৲
ঘৃতকুমারী	১৮৲
কলঙ্কা	২০৲
দেবদারু চূর্ণ	৮৲
দেবদারু কাঠ	৭৲
কটকিরি	৬৷৷ মণ
মুলঙ্গন	৪২৲
ইসবগুল	১৭৲
কস্তিলা	২৮৲

আমরা চতুর্থ গন্ধবণিক্ মহাসম্মিলনী হইতে স্বর্ণ-পদক-প্রাপ্ত ভৈষজ্য-প্রদর্শক ১১৫ নং খোরাপটী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পালের নিকট বাজার দর প্রাপ্ত হই।

(গন্ধবণিক)

নোয়াখালীতে নদী তাঙ্গার গতি

তারিখ	পুলিস লাইনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হইতে নদী যত হাত ছিল	বড় বাজারে তাজার জলের ট্যাঙ্কের দক্ষিণ হইতে যত হাত ছিল
৫ই আগষ্ট		১১২৷ হাত
৬ই		১০৪৷ ,,
৭ই		৯৬৷ ,,
৮ই		৯০ ,,
৯ই		৮০
১০ই		৭২৷ ,,
১১ই ,,		৬৬৷ ,,
১২ই ,,		৬২৷ ,,

(দেশের বাণী)

বাঙ্গালার কারাগারগুলার ১৯২৮ সনের রিপোর্ট

বঙ্গদেশের কারাগারগুলির সম্বন্ধে ১৯২৮ সনের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯২৮ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে বাংলার বিভিন্ন জেলে মোট ১০৯১৬ জন কয়েদী ছিল। এই বৎসর ২২৩৫৪ জন নূতন কয়েদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জেলে প্রবেশ করে এবং ৫৩১ জন কয়েদী অন্য প্রদেশ হইতে বদলী হইয়া বাংলার জেলে আনীত হয়। এই সব কয়েদীর মধ্যে ৪৬০ জন তাহাদের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া মুক্তি পায়, ১৪৯১১ জন তাহাদের কারাদণ্ডকাল ভোগ করিয়া এবং ৪৬৩৭ জন রেমিশন রুল অনুসারে মুক্তি লাভ করে, ৪৩৩ জন গভর্ণমেণ্টের আদেশে মুক্তি পায়, ১১৭৯ জনকে দ্বীপান্তরে পাঠান হয়, ৬ জন জেল হইতে পলায়ন করে, ৯

জনের প্রাণদণ্ড হয় এবং ১৬৬ জন জেলে বিভিন্ন রোগে মারা যায়। সুতরাং বৎসরের শেষ দিনে বাংলার সমস্ত জেলে ১১০৫৭ জন কয়েদী ছিল। গত কয়েক বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে জেলের কয়েদীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৭ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে বিভিন্ন জেলে মোট কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১০৩৯৮, কিন্তু ১৯২৮ সনে উহা ১০৯১৬ জনে দাঁড়াইয়াছে। আবার ১৯২৭ সনের শেষ দিনে ১০৯১৬ জন কয়েদী ছিল, ১৯২৮ সনে উহা ১১০৫৭ জনে দাঁড়াইয়াছে। তবে আলোচ্য বর্ষে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কিছু কম হইয়াছে। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে যথাক্রমে ২৩৯১০ ও ২২৩৫৪ জন কয়েদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জেলে প্রবেশ করে। ১৯২৮ সনে জেলে মোট যত কয়েদী ছিল উহার মধ্যে শতকরা ৫৬·২০ জন মুসলমান এবং ৩৯·৪৫ জন হিন্দু, বাকী অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য বর্ষে হিন্দু ও মুসলমান কয়েদীর হার পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা কিছু কমিয়াছে। তবে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু কয়েদীর সংখ্যা বেশী কমিয়াছে। মোট কয়েদীর মধ্যে শতকরা ৫১·৪৬ জন কৃষক। আলোচ্য বর্ষে ২৬১ জন স্ত্রীলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জেলে প্রবেশ করে এবং মোট স্ত্রী কয়েদীর সংখ্যা ৪২০। ১৯২৭ সনে স্ত্রীলোক কয়েদীর সংখ্যা ছিল ৪৮২ জন। আলোচ্য সনের ৪২০ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ৫৬১ জন হিন্দু ও ৯৩ জন মুসলমান। মুসলমান পুরুষ কয়েদীর তুলনায় হিন্দু কয়েদীর সংখ্যা অনেক কম হইলেও হিন্দু স্ত্রীলোক কয়েদী মুসলমানের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশী। দণ্ডিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাত্র ১৬ জন লেখাপড়া জানে, বাকী ৪০৪ জনের সকলেই নিরক্ষর। আলোচ্য বৎসরে জেলের কয়েদীদিগকে খাটাইয়া যে সব জিনিষ তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়া গভর্ণমেণ্ট ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৫৪ টাকা পাইয়াছেন। এই বৎসরে ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক কয়েদীর সংখ্যা মাত্র ৭৫ জন ছিল; পূর্ব্ব তিন বৎসরে এই সংখ্যা গড়পড়তায় ২০০ ছিল।

* (সোদাগরী হিতৈষী)

মহীশূর ও বঙ্গদেশ

এবার মহীশূর রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ববার হইতে এবার প্রায় চৌদ্দ লক্ষের অধিক টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের জন-সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ৬০ হাজার। মহীশূর সরকার এ বৎসরের বাজেটে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বঙ্গদেশের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গদেশের জনসংখ্যা ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৩৬ জন। ঢাকা সহর ব্যতীত বঙ্গদেশের সমস্ত স্থানই এই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত আসামেও কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয় না থাকায় আসামও শিক্ষা-ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। আসামের জনসংখ্যা ৭৬ লক্ষ ৬২ হাজার ২ শত ৩০ জন। অতএব বঙ্গদেশ ও আসামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটী ৪৩ লক্ষ ১ হাজার ৭৬৬ জন। মোটের উপর ধরিতে গেলে মহীশূর রাজ্যের কিঞ্চি-ধিক অর্দ্ধ কোটী লোকের শিক্ষার জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা দান করেন। আর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৫৫০ কোটী লোকের শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকাসাহায্য করিয়া থাকেন। লোক-সংখ্যা হিসাবে সাহায্য করিতে গেলে মহীশূর গবর্ণমেণ্ট যাহা সাহায্য করেন, সেই হিসাবে তাহার প্রায় দশ গুণ অর্থাৎ এক কোটী দশ লক্ষ টাকা সাহায্য করা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত; কিন্তু সেই স্থানে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (কাঙ্গী বান্ধব)

ঢাকার আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

ঢাকাতে আধুনিক সময়োপযোগী আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ নামক একটী আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ঢাকার বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ কার্য্যেণীর কর্তৃপক্ষগণ ইহার উদ্যোক্তা। বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে

জগতের সম্মুখে ধরিতে না পারিলে চিকিৎসাজগতে ইহার স্থান অনেক নীচেই থাকিবে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, উপযুক্তভাবে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষার অভাবেই শল্য-চিকিৎসা, চক্ষু-চিকিৎসা, ধাত্রী-বিদ্যা বা মিডওয়াইফারী প্রভৃতির আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা-গৌরব সম্পূর্ণই লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার পুর্ণ প্রতিষ্ঠা কামনা করিতেছি। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যাপনা যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত ইহাতে (১) রসশালা—কেমিকেল লেবরেটরী (২) ভৈষজ্য পরিচয়াগার (৩) অস্ত্রাগার, (৪) বিকৃত শারীর প্রদর্শনাগার (৫) ভৈষজবৃক্ষবাটিকা (৬) শরীর পরিচয়াগার (৭) গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ কলেজে ব্যবহারিক চৈষজ্য-বিদ্যা শিক্ষা করিবার আর একটী যে মহাসুযোগ রহিয়াছে ইহা বহু আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়েই নাই। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসীর পরিচালকগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরাট কারখানায় ছাত্রগণকে হাতেকলমে শিক্ষা পাইবার অনুমতি দিয়া যে সুযোগ দিয়াছেন তাহা বস্তুতই অন্যত্র দুর্লভ। আরও সুবিধার কথা এই যে, ঐ কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভারতবর্ষব্যাপী ব্রাঞ্চসমূহের ঔষধালয় ও অন্যান্য সবের জন্য ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাত্রগণের দাবী অগ্রগণ্য হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই কলেজের পরিচালনা-ভার ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ বোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন। লুপ্ত আয়ুর্ব্বেদের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার বহুবিধ চেষ্টার মধ্যে প্রতি জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা অন্যতম। সুতরাং এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ যথার্থই উজ্জ্বল।

পরিচ্ছেদ)

সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের স্থান

জগতের নানাদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভারত ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। নানা আর্থিক ব্যাপারে নিতান্ত পশ্চাৎপদ হইয়াও এবং আর্থিক জীবন নিতান্ত অবহেলা করিয়াও যে জাতি সামুদ্রিক বাণিজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে, আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হইলে সেই জাতি জগতে কোন্ স্থান অধিকার করিবে তাহা খুলিয়া বলিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

অন্নসমস্যা

এদেশের সর্ব্বপ্রকার সমস্যার চেয়ে অন্নসমস্যাই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বলিয়া ভারত এক সময়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সেই ভারতের প্রতি গৃহে আজ 'হা অন্ন হা অন্ন'। বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারত-সন্তানকে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে হয়।

ভারতের এই যে দুরবস্থা, ইহার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। একটুকু অনুধাবন করিলেই আমরা নিম্নলিখিত কারণসমূহ দেখিতে পাই :—

(ক) জন-সংখ্যার বৃদ্ধি (খ) ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তির হ্রাস (গ) খাদ্য-শস্যের অবাধ রপ্তানি (ঘ) খাদ্য-শস্যের মূল্য-বৃদ্ধি।

ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হইবার পরিবর্ত্তে কিরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার হিসাব :—

প্রতি বিঘায় উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ

১৯১০	৭ মণ ১৫ সের
১৯১৩	৮ ,, ৮ ,,
১৯১৬	৬ ,, ৩৫ ,,
১৯১৯	৬ ,, ২৫
১৯২২	৬ ,, ১০
১৯২৫	৬ ,, ৬ ,,
১৯২৯	৬ ,, ৩৫ ,,

বিশেষজ্ঞগণের অভিমতে রেল লাইনের অত্যধিক বিস্তৃতিহেতু দেশের জলনিকাশের পথসমূহ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় এক দিকে দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া দেশ কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির আবাস-স্থলে পরিণত হইয়াছে, অপর দিকে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছে।

বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা,ডাক্তার বেন্টলী বলেন,—গত ৭০ বৎসরে ভারতের যে অবনতি হইয়াছে; রেলপথ-নির্ম্মাণই যে তাহার জন্য সব চেয়ে বেশী দায়ী তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন।

রেলপথ যে শুধু আমাদের দেশের খাল, বিল শস্যক্ষেত্র মজাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে তাহা নহে। ইহা ভারতের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতে বৈদেশিকগণকে সাহায্য করিতেছে। ভারতের শস্যক্ষেত্রের দুরবস্থা সত্ত্বেও কৃষকগণের আপ্রাণ চেষ্টায় যাহা-কিছু উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছে—ক্ষুধার অন্নে মত্ত প্রভুত্বের জন্য।

ভারতের খাদ্যসামগ্রী কি পরিমাণে বিদেশে চালান হয় তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে সহজেই অনুমেয় :—

প্রতি মিনিটে	১১৮ মণ	চাউল
	৬৫ „	গম
	৫৫ „	যবস
	৫০ „	অড়হর
„	৫৫ „	বাদাম

খাদ্য শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ কতদূর কমিয়াছে এবং রপ্তানির পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাবে দৃষ্ট হইবে :—

উৎপাদন

১৯২৫ সন	১৯২৭ সন
চাউল ৩৫০৫৪০০০ টন	২৭৯১২০০০ টন
গম ১০২৩৬০০০ „	৮৯৭৩০০০ টন

রপ্তানি

চাউল ১৬৩১৮৮৭ টন	২৫৮৪৪৩৬ টন
গম ২০৬০৩০ „	২৪১৬৪৭

ইহার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাভাবে ভারত-সন্তানগণ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে না পারিয়া অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া অকালে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে।

এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, অন্নসমস্যার সমাধান করিতে হইলে, আইন করিয়া রেল কোম্পানীসমূহের আয়ের কতকাংশ শুল্কস্বরূপ আদায় করিয়া তদ্বারা দেশের হাজা মজা নদী নালা প্রভৃতি স্বাভাবিক জল নিকাশের পথ পরিষ্কার করিয়া শস্যক্ষেত্রে জলস্রোত প্রবাহিত করিবার সুবিধা করা ও অবাধ বৈদেশিক রপ্তানির পথ রুদ্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু ইংরেজ রেল কোম্পানী ও বণিকগণের ক্ষতি করিয়া ভারতের দুর্দশা দূর করিতে কি ভারত সরকারের প্রবৃত্তি হইবে?

(ময়মনসিংহ সমাচার)

বর্ষার বিলম্বে হত্যা ও আত্মহত্যা বৃদ্ধি

আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে ১৯২৭ সনে যত হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল ১৯২৮ সনে তাহার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছে। এসব হত্যার অধিকাংশই গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২৭ সনে ৬২ জন স্ত্রীলোক শিশুদের লইয়া কূপে ডুবিয়া আত্মহত্যা করে। ১৯২৮ সনে ৮৫ জন স্ত্রীলোক এইরূপভাবে আত্মহত্যা করে।

হত্যা ও আত্মহত্যার এরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিবার কারণ কি?

যুক্তপ্রদেশের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অব্ পুলিস তাঁহার ১৯২৮ সনের রিপোর্টে বলেন যে, ১৯২৮ সনের বর্ষা দেরীতে নামিয়াছিল। বর্ষার বিলম্বই হত্যা ও আত্মহত্যা বৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণতঃ না হইক প্রধানতঃ দায়ী।

বর্ষার বিলম্বে এরূপ হইবার কারণ কি? যদি এরূপ হয় যে বর্ষার বিলম্বে চাষারা ঠিক সময়ে চাষ করিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহাদের আর্থিক দুরবস্থাই তাহাদিগকে হত্যা বা আত্মহত্যাতে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহা হইলে ভারতের আর্থিক অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা সহজেই বুঝা চলে।

হায়দ্রাবাদ রেলওয়ে সম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ গভর্মেণ্ট

হায়দ্রাবাদের ষ্টেট রেলের অংশীদারদের জানানো হইয়াছে যে, হায়দ্রাবাদ গভর্মেণ্ট আগামী বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে উক্ত রেলকে গভর্মেণ্টের অধীনে আনিতে পারেন।

মাদক দ্রব্য হইতে গভর্মেণ্টের আয় ২০ কোটি টাকা

সমগ্র ভারতে মাদক দ্রব্য হইতে গভর্মেণ্টের মোট ২০ কোটী টাকা আয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে মাদকদ্রব্য হইতে মোট ২ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। আবগারী রাজস্ব বাবদে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদায় হয় মাদ্রাজে। ইহার পরিমাণ ৫ কোটী টাকার উপর। তাহার পরে বোম্বাইয়ের স্থান। ১৯২৬-২৭ সনে বোম্বাইয়ে ৪ কোটী টাকারও উপর আবগারী রাজস্ব আদায় হয়।

ভারতে তামাকের ব্যবসা

রপ্তানি-হ্রাসের আশঙ্কা

সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যত তামাকের পাতা উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ এক ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে যত তামাক উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে তাহার শতকরা ২০ ভাগ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় এক শত কোটি পাউণ্ড তামাকের পাতা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতের রপ্তানি ব্যবসা মোটেই আশা-জনক নহে। গত বৎসর ভারতবর্ষ ৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪০ লক্ষ পাউণ্ড তামাকপাতা এবং ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড সিগারেট আমদানি করিয়াছে। সিগারেট প্রস্তুত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষজাত তামাক উপযোগী নহে। পাইপে ধূমপান করিবার জন্য যে তামাক ব্যবহৃত হয় তাহাই প্রধানতঃ ভারতবর্ষের তামাকপাতা হইতে প্রস্তুত হয়। আজকাল সিগারেটের বেশী প্রচলন হওয়ায় পাইপের তামাক বা চুরুটের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে ভারতের রপ্তানি ব্যবসার বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা। সিগারেটের উপযোগী ভাল তামাক পাতা উৎপাদনের জন্য পুষার ও বাঙ্গালার বুড়িরহাটে পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে।

(বঙ্গবাসী)

গো-উন্নতি সম্বন্ধে মহীশূর সরকার

মহীশূরের গো-উন্নতি-বিষয়ে কৃষি-বিভাগ হইতে কতক-গুলি বিভিন্ন উপায় ঠাওরান হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

১। গরুকে সমস্ত প্রকার ছোঁয়াচে রোগ হইতে রক্ষা করা দরকার। এই রোগের মধ্যে রিনডার পেষ্টই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রোগের ছোঁয়াচ্য প্রবল ও সচরাচর হওয়ার দরুণ গরুর মৃত্যু-সংখ্যা মহীশূরে খুব বেশী। এই জন্যই এখানকার চাষীরা বেশী দামী বলদ চাষের জন্য রাখিতে সাহস করে না। এই ছোঁয়াচ্য কমাইবার জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। (ক) সব সময়েই প্রচুর পরিমাণে সিরাম এবং টীকা দিবার ব্যাক্সিন হাতে রাখা দরকার। তাহা হইলে সংক্রামক রোগ আরম্ভ হইতে না হইতে ইহার সাহায্যে তাহা দূর করিবার সুবিধা হয়। বেশী দামী গরুর জন্য এ উপায় অবলম্বন বিশেষ দরকার। (খ) উপরোক্ত কাজ সুচারু-রূপে পরিচালনার জন্য কতকগুলি ভেটারেনারি ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা দরকার। এবং (গ) সংক্রামক ব্যাধি-দুষ্ট স্থান হইতে যেখানে রোগের ছোঁয়াচ্য বাড়ে নাই সেখানে গরু যাহাতে যাতায়াত না করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। তা ছাড়া এই সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করিবার স্বপক্ষে জনসাধারণের সহানুভূতি যোগাড় করিতে হইবে।

২। উচ্চ শ্রেণীর ভাল ভাল বলদ প্রতি গ্রামে গ্রামে খুব বেশী পরিমাণে সরবরাহ করা দরকার। তাহাতে দেশে ভাল ভাল গরুর পয়দা হইবে। এই সমস্ত বলদ সর-বরাহের জন্য কোন বেসরকারী ব্রীডারের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। মহীশূর ষ্টেটের মধ্যে এবং বাহিরে এই বলদের চাহিদা এত বেশী যে সে সমস্ত সংকুলানের জন্য যদি কোন বেসরকারী ব্রীডারের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক টাকার ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন। ষ্টেটের অস্ত্রচিকিৎসা বিভাগ এই বলদ সরবরাহের ভার লইলে ভাল হয়; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এ বিভাগ এ বিষয়ে কোন যত্ন লইতেছেন না। এই বিভাগ ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই বলদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরবরাহের ভার না লইলে এ বিষয়ে কোন উন্নতি আশা করা যায় না। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঠিক ঠিক কাজ হইলে, প্রতিবৎসর মহীশূরে অন্ততঃ ৩০০ করিয়া বলদ এবং বলদশিশু জন্মগ্রহণ করিতে পারে। আর ইহাতে আর্থিক ক্ষতিও বিশেষ হইবে না।

৩। রাজ্যের মধ্যে ৬ মাসের উপর বয়সের সমস্ত নিয়মাতীত বাছুরকে এঁড়ে করিয়া দেওয়া দরকার। এবং ইহাদের স্থানে গরুর সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য উচ্চ শ্রেণীর বলদ আমদানি করিতে হইবে। ভাল বলদের উরসে ভাল ভাল গরু জন্মাইতে হইলে নিম্ন শ্রেণীর বলদের জনন-শক্তি এই

রূপে নষ্ট করিয়া দেওয়া দরকার। ইহাতে কাহারও মতবৈধের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

৪। গরুকে ভাল খাবার দেওয়া আর একটা বিশেষ দরকারী বিষয়। গরুর শ্রেণীগত উন্নতিসাধন করিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, যদি আমরা বাছুরকে একেবারে শিশুকাল হইতেই ভালভাবে খাবার না দেই। এই খাদ্যাভাবেই এদেশের গরু তত বাড়িতে পারে না। গরুর খাবার উপযোগী বিচালি অথবা ঘাস কম খরচায় প্রচুর পরিমাণে জন্মাইবার এবং তাহাদের গোলাজাত রাখিবার ঠিক ঠিক নিয়মগুলি এখানকার লোকদের জানা দরকার। এ বিষয়ে স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, সদরবাস সমিতি ও এইরূপ অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত যাহাতে গরুর ভাল খাদ্য জন্মাইতে ও সংগ্রহ করিতে পারে, সে বিষয়ে সাধারণকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ ও সাহায্য করা।

সুইডেন ম্যাচ কোম্পানীকে ভারতে রেজেষ্ট্রিকৃত করাইবার চেষ্টা

ভারতে সুইডেনের যে ম্যাচ কোম্পানী আছে, এই দেশেই যাহাতে তাহা রেজেষ্টারী-ভুক্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক্ সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্যবিভাগকে এক অনুরোধপত্র দিয়াছেন। বণিক্ সমিতি তাহাদের চিঠিতে জানাইয়াছেন যে, জি আই পি রেলওয়ে উক্ত কোম্পানীকে অনেক সুবিধা প্রদান করিয়াছে। তাহার পর কয়েকটী বন্দর তাহারা পাইয়াছে। সর্ব্বোপরি ম্যাচের শুল্ক যে ১৪০ টাকা গভর্ণমেণ্ট শুল্ক দেওয়া হইত তাহা সংরক্ষণ শুল্কে পরিণত হইয়াছে। সরকারের কোম্পানী আইনে বিদেশী কোম্পানীকে এদেশে রেজেষ্টারী করার যদি নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য বণিক্ সমিতি সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের আয়

গত ১৯২৮ সনে সুইডেন ম্যাচ কোম্পানী সুইডেন দেশীয় মুদ্রায় ৪৮,৯৬১,৫৭৮ মুদ্রা লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর তাহাদের ৪০,৪০৬,৬১৫ মুদ্রা লাভ হইয়াছিল। গত বৎসরের জের ৬৬৮০৮১৫ মুদ্রা সহ তাহাদের এই বৎসরের মোট প্রাপ্য ৫৫,৬৪৫,৪৬৩ মুদ্রা। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ শতকরা ১০ মুদ্রা লভ্যাংশ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(বঙ্গবাণী)

১৭০ মণ কুইনাইন বিক্রয়

গত বৎসর ডাকঘরের মারফতে ১৩৬০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৭০ মণ ওজনের কুইনাইন বিক্রয় হইয়াছে।

(শক্তি)

ওরিয়েণ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী

ওরিয়েণ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দুই এক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় অন্যান্য কোম্পানীর মধ্যে বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। গত বৎসরে ৪,৩০০,০০০ পাউণ্ডের নূতন কাজ পাওয়ায় ইহার ব্যবসা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, এ দাবীতে প্রথম ১২টী বীমা কোম্পানীর মধ্যে ইহার স্থান দেওয়া যায়। কোম্পানীর একটী বাৎসরিক সভায় সভাপতি দেখাইয়া দেন যে, দেশের যত কোম্পানী ইহার সমান অথবা বেশী কাজ যোগাইয়া অল্পদিনের মধ্যে এমনি বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ওরিয়েণ্টালকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এই কোম্পানীর তাঁবে ছোট বড় ২০টী শাখা আফিস আছে এবং ৩৫০০ জন এজেণ্ট কাজ করিতেছে। দেশী কোম্পানীর মধ্যে শুধু এই কোম্পানীই ভারতের বাহিরে অনেক কাজ যোগাড় করিতেছে। কোম্পানীর ২,৯২২ লক্ষ টাকার মোট বীমা কাজের মধ্যে প্রায় ২৩৪ লক্ষ টাকা বিদেশী লোকের জীবন বীমা।

তহবিলের টাকাবৃদ্ধি

গত বৎসরের ব্যবসায় তহবিলের ৭২ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ৮৯ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ব্যবসায় ৬২½ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে চাঁদার টাকার উপর খরচের পরিমাণ শতকরা ২০৩ টাকা।

১৯২৭ সনে এই খরচ হইয়াছিল শতকরা ২২৬ টাকা। আলোচ্য বৎসরে এই খরচ বাড়িবার কারণ এবার ব্যবসা বেশী হওয়াতে এজেন্টের কমিশন এবং ডাক্তারের ফিস বেশী দিতে হইয়াছে। তা ছাড়া কোম্পানীর বৈষয়িক তত্ত্বাবধানের দরুণও আলোচ্য বৎসরের খরচ কিছু বেশী হইয়াছে। এই সমস্ত খরচের কথা ছাড়িয়া দিলে কোম্পানীর অন্যান্য বিষয়ে পরিচালনার খরচ আলোচ্য বৎসরে অপেক্ষাকৃত কমই হইয়াছে। বীমাকারীর মৃত্যুর দরুণ অথবা পলিসি পাকিয়া যাওয়ার দরুণ আলোচ্য বৎসরে মোট দাবীর পরিমাণ ৬৫,৮৭,০০০ টাকা। ১৯২৭ সনের এইরূপ দাবীর পরিমাণের চেয়ে ইহা ৬,৮১,০০০ টাকা বেশী এবং ১৯২৬ সনের চেয়ে ৩,৮০,০০০ টাকা কম। বর্ত্তমানে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯১৪ লক্ষ টাকা।

এই কোম্পানী আলোচ্য বৎসরের বার্ষিক বিবরণীতে মৃত্যু-জনিত দাবীগুলাতে বিভিন্ন জাতির মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া একটী সুন্দর হিসাব দিয়াছেন :—

	হিন্দু	মুসলমান	ইউরোপবাসী এবং ক্রিশ্চিয়ান
হৃদ্‌পিণ্ড-ঘটিত রোগ			৭·৭
যক্ষ্মা	„		১৫·৪
পাকস্থলী	„		৫·৫
শ্বাসনলী	„	„	১৩·২
স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও বার্দ্ধক্য			

বিলাতের শিল্প-মেলায় যোগদান

ব্রহ্মপ্রদেশের কুটীর-শিল্প বিভাগ হইতে ২।১ বার বিলাতী শিল্পমেলায় যোগদান করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর পয়সা খরচ করিতে হয়। এই জন্য ইয়োরোপের যে দেশে যে বৎসর এই মেলা বসে সেই বৎসর বর্ম্মা হইতে কুটীর-শিল্পজাত প্রেরিত মাল নানান খরিদ্দারের নিকট ডেলিভারি দিবার জন্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বিলের টাকা আদায় করিবার জন্য সেখানে একটি করিয়া এজেন্সি খাড়া করিতে হয়। অন্যদিকে আবার বর্ম্মায় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সমস্ত বিদেশী অর্ডার সরবরাহ করিবার নিমিত্ত উপযোগী মাল যোগান এবং বিলাত হইতে টাকা না আসা পর্য্যন্ত গ্রামবাসীকে অর্থ-সাহায্য করা। বিলাতে সৌখিন জিনিষের পছন্দ সময় সময় বদলাইয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানকে এই পরিবর্ত্তনশীল পছন্দের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং ঐ বিলাতী শিল্প-মেলার খরিদ্দারদের সময়ানুযায়ী পছন্দসই সৌখিন জিনিষপত্র বর্ম্মাবাসীরা কতদূর করিয়া উঠিতে পারে এবং চাহিদা অনুযায়ী মালের উৎপাদনের পরিমাণ ও যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেইদিকে এই প্রতিষ্ঠানকে কড়া নজর রাখিতে হয়।

বয়ন-শিল্প

১৯২২ সনে স্যার উইলিয়াম কাথ বর্ম্মার কুটীর শিল্প বিভাগের কার্য্যের জন্য একটী নতুন খসড়া করেন। এই খসড়ায় বর্ম্মার ভিতরে তিনটি কুটীর শিল্পের প্রচলনের কথা লেখা আছে, যথা, বয়ন শিল্প, পালিশ শিল্প এবং মাটীর বাসন শিল্প। বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টও এ খসড়া গ্রহণ করিয়াছেন। বয়ন শিল্প বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বরাবরই সমান মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। বর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব জুডিসিয়াল কমিশনার শ্রীযুত এল্ এইচ্ সণ্ডার্সএর নামানুযায়ী ১৯১৯ সনে বর্ম্মায় যে সণ্ডার্স উইভিং ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হয়, ইহার পত্তনের প্রথম হইতে এযাবৎ খুব ভালভাবেই এখানে বয়ন-শিল্পের কাজ চলিতেছে। এই বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসরই গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একদল লোককে বর্ম্মার গ্রামে গ্রামে সাধারণের ভিতর বয়নকার্য্য প্রচলন ও শিক্ষার জন্য পাঠান হয়, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের খরচও খুব হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের ফিনান্সিয়াল কমিশনার এই ভ্রমণশীল দলের শিক্ষা এবং তত্ত্বাবধান-প্রণালীতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি ১৯২৯-৩০ সনের প্রাদেশিক খরচের তালিকায় এই খরচের দফা অনুমোদন করেন নাই। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বয়ন-শিল্প-বিষয়ে উপযুক্ত

কার্য্যকর প্রণালী বাহির করিতে হইলে এবিষয়ে আরও ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ দরকার।

মৃত্তিকা বাসন শিল্প

১৯২২ সনের পর হইতে এ যাবৎ বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের এ বিভাগে শ্রীযুত এল, এ, নিকোলাস মৃত্তিকা বাসন বিষয়ে পারদর্শী নিযুক্ত আছেন। এতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের এ বিভাগের শিল্পের উন্নতির দিকে তেমন নজর পড়ে নাই। এই শিল্পের উন্নতি হইলে কুটীর শিল্প অপেক্ষা কারখানা-শিল্প হিসাবে ইহা বেশী কার্য্যকর হইবে বলিয়া মনে হয়। গ্রামে গ্রামে সাধারণতঃ যে জলপাত্র অথবা রাঁধিবার জন্য যে মাটীর বাসন ব্যবহৃত হয়, তাহার উৎপাদনের খরচা কমাইবার হিসাবে কুটীর শিল্পের যে উন্নতি সাধন করা দরকার, তাহা তত্দূর প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুত নিকোলাস সম্প্রতি যে একটী বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, আকিয়াব জেলার একটী বড় গ্রামে মাটীর বাসন খুব বেশী পরিমাণেই প্রস্তুত হইতেছে, তবে সেখানে বাসন সেকিবার উপযোগী উনানের ব্যবহার ভাল রকম জানা নাই। ফলে বর্ম্মার অন্যান্য বিভাগের গ্রাম্য প্রদেশের মত ইহার কাজ শিল্প-হিসাবে এখানে ভাল চলিতেছে না। শ্রীযুত নিকোলাস্ এখানকার স্থানীয় লোকদের এবিষয়ে অনেক হাতেকলমে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন এবং এখান হইতে একটী বালককে এই শিল্প বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য ইনসীন্ সহরে লইয়া আসিয়াছেন। মিঃ নিকোলাস্ ইনসীন সহরে মৃত্তিকা বাসন শিল্প বিষয়ে একটী ছোট শিক্ষালয় খুলিয়াছেন। এখানে ২১০ জন ছাত্র আছে এবং ইহাদের প্রত্যেককে প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে এই শিল্প শিখানো হইতেছে।

পালিশ শিল্প

বর্ম্মার পালিশ স্কুল ১৯২৮ সনের ৩০শে জুন চারি বৎসরে পদার্পণ করিল। এই বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর ১০ জন করিয়া কারিগর শিখাইয়া বাহির করা হয়। এই শিল্পটী বর্ম্মার নির্দ্দিষ্ট ২৩টী স্থানের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। তবে এই স্থানের শিল্পটী একটু স্বতন্ত্র ধরণের। পালিশ বিদ্যালয়ে যে ধরণের শিল্প শিখান হয়, তাহা মান্দালয় এবং লোয়ার চিন্দুইন জেলার শিল্প হইতেও একটু বিভিন্ন। আর এই পালিশের চাহিদা পরে কতদূর বাড়িবে তাহারও কিছু নিশ্চয়তা নাই। প্রতি বৎসরই গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয় হইতে যে ১০ জন করিয়া সুনিপুণ কারিগর বাহির হইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই দেশের মধ্যে পারদর্শী লোকের অভাব মিটিয়া যাইবে। নিপুণ কারিগর এত বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া বর্ম্মার ফিনান্সিয়াল কমিশনারের আদেশ অনুসারে বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে যে ছাত্রগুলি রহিয়াছে তাহাদের তিন বৎসরের পাঠ শেষ হইয়া গেলে, আর নতুন ছাত্র না লইয়া বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিবার কথা চলিতেছে। ফিনান্সিয়াল কমিশনার বর্ত্তমান বৎসরেই একবার পাগান ভ্রমণ করিয়া আসিবেন কথা আছে, তাহার পর এই বিদ্যালয় প্রকৃতই বন্ধ করা হইবে কিনা সে বিষয়ে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সমবায় হিত সমিতি

বর্ম্মার "সমবায় হিত সমিতি"টীর লিভারপুলে যাইবার কথা শুনা যাইতেছে। ইউরোপে এবং বর্ম্মার দেশের শিল্প-প্রসূত মাল বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য একটী এজেন্সিরূপে প্রথম এই প্রতিষ্ঠানটী খাড়া করা হয়। বিলাতী শিল্প-মেলার জন্য বর্ম্মা হইতে যে সব শিল্প-জাত মাল পাঠান হইত তাহার দরুণ বিলাত হইতে সময় মত টাকা না আসাতে অনেক সময় এই প্রতিষ্ঠানকে বেগ পাইতে হইত। বেশী পরিমাণে মাল জমা করিয়া রাখিবার মত টাকা অনেক সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকিত না এবং সরবরাহকারীরা গরীব বলিয়া "হিত সমিতির" মালের টাকা খরিদ্দারের কাছ হইতে পাবার আগেই, এমন কি মালের খরিদ্দার জুটিবার আগেও, অনেক সময় দেশবাসীরা মাল প্রস্তুত করিবার আগাম টাকা চাহিত। এ জন্য হিত সমিতিটীকে গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে কর্জ্জরূপে সময় সময় টাকা লইতে হইত।

সিগারেট বিক্রী করিয়া ১৪ কোটি টাকা লাভ

ইম্পিরিয়াল টোবাকু কোম্পানী গত এক বৎসরে সিগারেট বিক্রয় করিয়া ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৪০ টাকা লাভ করিয়াছে। এটা ত শুধু লাভ, ইহার উপর আরও কত কোটি টাকা সিগারেট প্রস্তুতের মজুরীতে, ব্যবসায়ীর কমিশনে, বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে লাগিয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে হয় ত দেখা যাইত যে, তাহা লাভের অঙ্কের অন্ততঃ পাঁচ গুণ। এই সিগারেটের মোটা অংশই ভারতের বাজারে বিক্রয় হইয়াছে। হতভাগ্য দেশবাসী ধূমপানের সর্ব্বনাশা নেশায় মজিয়া নিজেরা নিঃস্ব হইয়া কিরূপ পরের পকেট বোঝাই করিতেছে ইহা তাহারই প্রমাণ।

(নীহার)

উৎপন্ন ফসলের হ্রাস

উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আমাদের দেশে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। ১৯১৭ খৃঃ হইতে ১৯২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে কোন শস্য কত হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

শস্য	১৯২৭	১৯২৬	১৯২৫	১৯১৯	১৯১৭
চাউল	২৭৯১০	২৮৬৬৮	২৮৮৬৮	২৫৮০৯	২৫৪১২
গম	৮৯১০	৮৮৬৮	৮৫৮০৯	৮১৪১২	৮২৪১৯
যব	২৫৫০				

(পল্লীবাসী)

তুমি আজ চলেছ কোন পথে ?

১৯২৮ সনে আমরা বিলাত থেকে কিনেছি—

বিলাতী কাপড়	প্রায় ৪৫ কোটি টাকার
সুতা	,, ৪
ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ	৩
সিগারেট	,, ২৮
সাবান	,, ১৪ ,,
সৌখিন জিনিষ	,, ২৫ লক্ষ টাকার
অন্যান্য জিনিষ	,, ৩০ কোটি টাকার

বিলাতকে বিক্রী করেছি—

গম	প্রায় ২½ কোটি টাকার
ধান	,, ৮৯½ লক্ষ টাকার
ডাল	৩৯৫০ ,,
গরুর খাদ্য	৭৫
জমির সার	৫ ,, ,,
নানা রকমের কাঁচা মাল	,, ৬৩½ কোটি টাকার

এক বছরে আমরা বিলাতের কাছে ৩৮½ কোটি টাকার জিনিষ বেশী কিনিয়াছি।

দেশ যে নিঃস্ব হ'য়ে যাচ্ছে। প্রতিকার কি ? বিলাতী জিনিষ কেনা ছেড়ে দাও।

(দেশবন্ধু পল্লী-সংঘের সমিতি)

ফিলিপাইন দ্বীপে কফির চাষ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে কফির চাষ বাড়াইবার জন্য উক্ত দ্বীপের কৃষিবিভাগ শীঘ্রই কফি রোপণের ব্যবস্থা করিতেছেন। দ্বীপের সর্ব্বত্র ভাল ভাল ফসলের বীজ জন্মাইবার জন্য ৫০,০০০ পেসো (স্পেন দেশীয় ডলার) খরচ করা হইবে, ঐ পয়সায় নানা স্থানে কতকগুলি চাষ-কেন্দ্র খোলা হইবে। এই সমস্ত কেন্দ্রে যে সব বীজের চাষ হইবে তাহার মধ্যে কফি একটী বড় ফসল। উপরোক্ত খবরটী আমেরিকার বাণিজ্য-প্রতিনিধি শ্রীযুত ক্লারেন্স পি হায়পার তাহার ম্যানিলার আফিসের বাণিজ্য-বিভাগের একটী বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষি এবং প্রাকৃতিক ধন-সম্পদ্ বিষয়ের সেক্রেটারি এবং আণ্ডার সেক্রেটারি, কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর এবং সহকারী ডিরেক্টর, সবাই মিলিয়া সম্প্রতি কফি চাষ বিষয়ে যে পরিদর্শন করিয়াছেন, উপরোক্ত বিবরণীটী শুদ্ধ তাহারই ফল-প্রসূত। বিবরণীতে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ফিলিপাইনের মাটী কফির চাষ হিসাবে প্রাচ্য দেশীয় জাভা এবং আরব প্রভৃতি অন্যান্য কফি-চাষপ্রধান দেশের মাটি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। ফিলিপাইনের পর্ব্বতসমূহের পাদদেশ দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে কফি জন্মাইতে পারা যাইবে আশা করা যায়।

কেনিয়ায় আকের চাষ

কেনিয়ার কৃষিবিভাগের ১৯২৮ সনের বাৎসরিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, উক্ত বৎসরে কেনিয়ায় সব চেয়ে বেশী আকের চাষ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে ৩,৬৯০ একর জমিতে বিদেশী একৃতিয়ারে এবং ৩,৬৯০ একর জমিতে ভারতবাসীর একৃতিয়ারে আকের চাষ হইতেছে। একুনে মোটের উপর ১৩,০৯৬ একর জমিতে এখানে ইক্ষুচাষ হইতেছে।

এখানে দানাওয়ালা এবং গুড়া চিনির উৎপাদন ১৯২৬-২৭ সনে ১৭৯,১৪৮ হন্দর হইতে ১৯২৭-২৮ সনে ১২৮,৯৪৩ হন্দরে নামিয়া গিয়াছে। এই চিনির রপ্তানি প্রধানতঃ টাঙ্গানিকাতে বেশী হয়। তাহাও ১৯২৭ সনের ২৫,৩২৯ হন্দর, মূল্য ৩৭,০৪২ পাউণ্ড হইতে ১৯২৮ সনে ১১,৯৪১ হন্দর, মূল্য ১৯,২৪৮ পাউণ্ডে নামিয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সনের পরিমাণ এত কমিয়া যাওয়ার কারণ, উক্ত বৎসরে অত্যধিক বৃষ্টির দরুণ আক সরবরাহ বেশী হয় নাই এবং ঐ একই কারণে আকের ভিতর "সাক্রোজ্" (আকের যে অংশ হইতে চিনি প্রস্তুত হয়) অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে আকের ব্যবসাটা আশানুরূপ জোরে চলিতেছে না। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে, এ ব্যবসা চালাইতে যেরূপ খরচ হয় তাহাতে খুব বেশী পুঁজি না হইলে এ ব্যবসা চালান কঠিন।

নাইরোবিতে এবং সমুদ্রের ধারে মোম্বাসার নিকটবর্ত্তী স্থানে দুইটী কল বসায় নতুন করিয়া ইক্ষু-রোপণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেনিয়ার এই নতুন উদ্যমের ফলে এবং উগাণ্ডার সমস্ত কলের কাজ একত্র হইলে পূর্ব্ব আফ্রিকার দেশসমূহের সমস্ত চাহিদা ফুলাইয়া যাইবে আশা করা যায়।

এখানকার দেশবাসীর ক্রয়শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়া যাওয়ায় এখানে চিনির কাটতিও অনেক বেশী

হইয়াছে। চিনির দাম রীতিমত কমাইয়া দিলে পরে এখানকার চিনির বাজার আরও ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চিনির রপ্তানি-ব্যবসার উপর নির্ভর না করিলেও শুধু দেশের মধ্যে এই প্রকারে যে চিনির কাটতি হইবে তাহাতেই আলোচ্য বৎসরের মধ্যেই এ ব্যবসা অনেক বাড়িয়া যাইবে।

সুমাত্রা দ্বীপের পামঅয়েল শিল্প

পূর্ব্ব আফ্রিকাই পামঅয়েল গাছের জন্ম-স্থান। গত দশ বৎসর ধরিয়া ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সুমাত্রা এবং আচিন দ্বীপে এই তেলের গাছের আবাদের জন্য প্রভূত চেষ্টা করা হইতেছে। এই নূতন আবাদের জন্য প্রথমতঃ একটী বেলজিয়ান রবার কোম্পানীকেই তারিফ করিতে হয়। সেই কোম্পানী ১৯১৩ সনের শেষে প্রায় ৫,০০০ একর জমিতে এই নূতন গাছ রোপণ করে। এই অগ্রগামী কোম্পানীটী অয়েলপাম গাছ আবাদ করার সমস্ত প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সফলতা লাভ করিলে পর, অন্যান্য অনেক কোম্পানী ১৯১৮ সনের এই নয়া শিল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে। ইহার পর হইতে এই আবাদ খুব জোরের সহিত এবং রীতিমত ভাবেই চলিতেছে। অনেকগুলি বড় বড় এষ্টেট্ এই কাজে লিপ্ত হইয়াছে। প্রথমে সকলের ধারণা ছিল অল্প মূলধন লইয়া আবাদ আরম্ভ করিলে কিছু লাভ দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু আজকাল নূতন কোম্পানীগুলি বেশী বেশী পুঁজি লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে। জমিতে সবচেয়ে কত বেশী ফসল পাওয়া যাইতে পারে ইহাই এই কোম্পানীগুলির লক্ষ্য। মাল চালানের খরচ যতদূর সম্ভব কমাইয়া, তেলের উৎপাদন যাহাতে খুব বেশী এবং ক্রমাগত পাওয়া যায় এরূপ করিতে হইলে, চারাগাছগুলি সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে, ক্ষেতের সর্ব্বত্র ছোট ছোট রেলপথ দিয়া ছাইয়া ফেলিতে হইবে এবং তেল নিষ্কাশনের জন্য উৎকৃষ্ট যন্ত্র বসাইতে হইবে। এই সমস্ত কাজের জন্য বেশী রকম পুঁজির দরকার। তেলের কোম্পানীগুলিও পুঁজি বিষয়ে আদৌ কৃপণতা দেখায় নাই। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কেবলমাত্র সুমাত্রার পূর্ব্বউপকূলে এবং আচিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশেই ইহার আবাদ চলিতে পারে। বৃষ্টির অবস্থার জন্য অন্যান্য অংশে এই আবাদ চালান সুবিধাজনক নয়। সুতরাং এই ব্যবসা পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জের আর্থিক জীবনে যে একটা বিরাট ওলটপালটের সৃষ্টি করিবে তাহা মনে হয় না। জমি, আবহাওয়া এবং মাল চালানের সুবিধা ইত্যাদি ধরিতে গেলে সুমাত্রার পূর্ব্ব উপকূল এবং দক্ষিণ আচিনই এই নয়া আবাদের পক্ষে একমাত্র স্থান বলিয়া মনে হয়। তবে সুমাত্রার দক্ষিণ ভাগেও যে এই আবাদ চলিতে পারিবে না তাহা বলা যায় না।

এই পাম গাছ পূর্ব্বসুমাত্রার এত সুন্দর ফলিতেছে যে, গাছ পাঁচ বছরের হইলে স্বচ্ছন্দে তেল-নিষ্কাশনের জন্য ফ্যাক্টরী বসান চলিতে পারে। অধিকাংশ এষ্টেটেই অনেক লম্বা রেলের রেলপথ আছে। কুলিরা এই সমস্ত রেলপথের সাহায্যে জমি হইতে ফ্যাক্টরীতে ফল লইয়া আসে। কুলি-দিগের অধিকাংশই জাভা দ্বীপবাসী। জাভানিজ কুলিদের পেছনে সদাসর্ব্বদা লাগিয়া থাকার দরকার হয় না। কি কুলি একদিনে ৬০ হইতে ৭০ বোঝা পর্য্যন্ত ফল কাটিয়া ফ্যাক্টরীতে আনিয়া হাজির করিতে পারে। সপ্তাহের ৭ দিন ধরিয়াই কাজ হয়, এবং মাসে মাত্র দুই দিন ছুটি। সস্তা অথচ কার্য্যদক্ষ কুলির জন্য পয়সা খরচ করিয়া বেশী সংখ্যক ইউরোপীয় পরিদর্শক রাখিতে হয় না। গাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে তেল পাওয়া যাইতেছে। এইসব সুবিধার জন্য অনেকগুলি কার্ম্ম হইতে ইতিমধ্যেই উৎকৃষ্ট তেল জাহাজ বোঝাই হইয়া ইউরোপে রপ্তানি হইতেছে। তেলের দাম মণ প্রতি ২১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মাত্র।

নূতন ধরণের ফ্যাক্টরী স্থাপন

প্রথম প্রথম কতকগুলি প্রাচীন ধরণের ফ্যাক্টরী খোলা হয়। এই সমস্ত ফ্যাক্টরীর যন্ত্রপাতিও ছিল নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের। তেল উৎপাদনের হার দাঁড়াইত মাঝারি রকমের এবং এই তেলে চর্ব্বি জাতীয় অ্যাসিড্ থাকিত খুব বেশী। মাত্র ৪।৬ বৎসর হইতে নূতন ধরণের ফ্যাক্টরী আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সমস্ত নয়া ফ্যাক্টরী চালাইতে

খরচ পড়ে বেশী বটে, কিন্তু তেল পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে। নয়া ফ্যাক্টরী কিরূপে চালিত হয়, তাহার পরিচয় দেওয়া হইল।

তৈল-উৎপাদনের প্রণালী

ফলসকল ফ্যাক্টরীতে আনার পর বাষ্পের সাহায্যে শুকাইয়া লওয়া হয়। তারপর খোসা ছাড়াইয়া লওয়া হয়। যে সব ফলের খোসা উঠে না সেগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং ভাল ফলগুলি প্রেসে দেওয়া হয়। প্রথমতঃ বাষ্পের সাহায্যে ফলগুলি ভাঙাইয়া লওয়া হয়, এবং উত্তপ্ত ফলগুলি ক্রুশ রিভল্‌ভিং মেশিনের সাহায্যে পিষিয়া লওয়া হয়। পিষ্ট পদার্থগুলি অতঃপর ডেপাল্পারে (depulper) ফেলা হয়। এখানে শাঁস এবং আঁটিগুলি পৃথক করা হয়। ইহার পর শাঁসগুলি ২নং প্রেসে দেওয়া হয়। এই ২নং প্রেসে অতি অল্প মাত্রায় তেল বহির্গত হয়। অনেক সময় ২নং প্রেসে না দিয়া একেবারে নিষ্কাশন-যন্ত্রে শাঁস ফেলা হয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত তেল নিষ্কাশিত হইয়া যায়। অতঃপর তেল ট্যাঙ্ক বোঝাই করিয়া রাখা হয় এবং কেবল মাত্র জাহাজ বোঝাই করিবার সময় ইহা পরিষ্কৃত করা হয়।

প্যাক করা ও জাহাজে পাঠানোর নানা সমস্যা

কি করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে তেল প্যাক করা যায় আর কি ভাবেই বা ভাল জাহাজে চালান দেওয়া যাইতে পারে এ সমস্যার এখনও সম্যক্ মীমাংসা হয় নাই। অনেক রকম পাত্র ব্যবহার করা হইয়াছে। ১৮০ হইতে ৬০০ লিটার তেল ধরে এই রকম কাঠের পিপা, ইস্পাতের ড্রাম, কেরোসিনের টিন ইত্যাদি কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই; কিন্তু ১৮০ লিটার তেল ধরে এইরূপ পিপাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া আপাততঃ দেখা যাইতেছে। ছোট কথা প্যাক করিতে খরচ পড়ে খুব বেশী। রাস্তায় পিপা ছিদ্র হইয়া অনেক সময়ে তেল পড়িয়া যায়।

যেবার প্রথম তেল চালান যায় সেবার জাহাজের খোলেই তেল পাঠান হয়, কিন্তু বোঝাই করা খুব সময়-সাপেক্ষ হয়, কারণ ঘণ্টায় মাত্র প্রায় ১২ টনের মত তেল বোঝাই করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬ সনের পর হইতে ৫০০ টনের ট্যাঙ্ক করিয়া তেল বোঝাই করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বড় বড় জাহাজে এই উপায়ে ঘণ্টায় ৬০।৭০ টন করিয়া তেল তোলা যাইতে পারে। এষ্টেট হইতে ট্রেণে ছোট ছোট ট্যাঙ্ক করিয়া তেল আনা হয়, পরে বন্দরে পাম্পের সাহায্যে বড় ট্যাঙ্কে ভর্ত্তি করিয়া জাহাজে তোলা হয়।

সমুদ্র-পথে ইষ্ট-ইণ্ডিজ-জাত তেলের অসুবিধা

আফ্রিকান তেলকে সমুদ্র পথে সেরূপ গরম সহ্য করিতে হয় না বলিয়া তেল নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইষ্ট-ইণ্ডিজ-জাত তেলের কিন্তু এ সুবিধা নাই, কিন্তু তবুও তেল এত ভাল যে গরম লাগিলেও ইহা বিকৃত হইয়া যায় না। প্রথমবার সমুদ্র-পথে অনেক তেল, পিপা ছিদ্র হইয়া যাওয়ায় অল্প নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এখন যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করায় অল্প তেল আর সেরূপ নষ্ট হইতে পারে না। আফ্রিকার তেলের চেয়ে এই তেলের জাহাজ-ভাড়া লাগে বেশী। কিন্তু সে পার্থক্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

আবাদের পরিমাণ, উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়িতেছে

১৯১৮ সনে সুমাত্রা এবং আচিন দ্বীপে ১০,০০০ একর জমিতে পাম-অয়েলের চাষ হয়; কিন্তু ১৯২৭ সনে আবাদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৬,০০০ একর। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে পাম অয়েল শিল্প কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং পাম-অয়েলের আবাদই বা কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলেই বোঝা যাইবে।

এই তালিকাটী সম্পূর্ণ নয়, বিশেষতঃ ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ কলমের সংখ্যাসকল। আমষ্টার্ডাম ট্রেড্ অ্যাসোসিয়েশানের কেত্রগুলির উল্লেখ করা নাই। ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সনে এই জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক এষ্টেট দেখা যাইতেছে।

বৎসর	যে সকল ক্ষেত্র হইতে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা	আমাদের পরিমাণ (মোট একর)	মোট উৎপাদন	পাম অয়েল রপ্তানি (১০০০ টন)
১৯২২	৬২			
১৯২৩	৫৮			
১৯২৪	৫৯			
১৯২৫	৬১		২৪,০০০	
১৯২৬	৫২		২৭,১০০	
১৯২৭	৫৪		৩৯,৫৭২	

কোন্ দেশ পাম অয়েল কেনে

১৯১৯ সনে পাম অয়েল মাত্র ৫৭৮ টন রপ্তানি হয়, কিন্তু ১৯২৭ সনে রপ্তানি হয় ২১,৬০০ টন। গত তিন বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলিতে এই তেলের রপ্তানি হইয়াছে।

দেশের নাম	১৯২৫ টন	১৯২৬ টন	১৯২৭ টন	১৯২৮ টন
মার্কিণ	২,৩৮৪	৪,৪৮৪	৯১১২	১০,৪৬৮
হল্যাণ্ড	১,৫২৬	৩,৯১৮	৮,০৩৩	৪,১১১
বিলাত	১,২৮৬	২,০৬৮	৩,৬২৩	২,২৪৩
জার্মাণি	১,০৪৫	১,০৪৭	১১৪	১,২০০
জাপান	২৭১	১০২	১০১	২১৪
অন্যান্য দেশ	১৮৪	৩৬৪	৬৩২	৪৪৩
মোট	৭,০৭৬	১৩,২৮৩	২১,৬১৬	১৮,৬৯৯

এই রপ্তানি-তালিকা দেখিয়া জানা যাইতেছে যে, মার্কিণ দেশে রপ্তানির বহর ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। হল্যাণ্ড ও বিলাতে রপ্তানির পরিমাণও বাড়িয়াছে। হল্যাণ্ডের তেল সাধারণতঃ জার্মাণিতেই যায়। উপরের এই তালিকা দেখিয়া আরও মনে হইতেছে যে, এই তেলের উৎপাদন ও রপ্তানি কয়েক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। ১৯৩১ সনে ৩০,০০০ হইতে ৪০,০০০ টন পর্য্যন্ত রপ্তানি করা যাইবে বলিয়া আন্দাজ করা হইয়াছে। দুনিয়ার মোট উৎপাদন যেখানে ১৯০,০০০ টন সেখানে ৩০,০০০ কি ৪০,০০০ টন মালকে দুনিয়ার মোট উৎপাদনের একটী মোটা অংশ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদ্

ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকায় খনিজ সম্পদের মধ্যে সোনা এবং হীরকের নীচেই কয়লার স্থান। কয়লা রপ্তানির বহর বছর বছর বাড়িয়াই যাইতেছে। ১৯১৫ সনে কয়লা রপ্তানি হয় ৮,০০০,০০০ পাঃ মূল্যের; কিন্তু ১৯২৭ সনের রপ্তানির মূল্য ১৩,০০০,০০০ পাঃ। ইউনিয়ন এবং নাটালের নানাস্থানে প্রায় ২৯টী কোলিয়ারি আছে। খনিগুলির গড় দূরত্ব ডার্কাণ বন্দর হইতে ২৪০ মাইল। ইষ্টরাণ্ড নামক খনিতে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়, সোনা এবং কয়লা পাশাপাশি অবস্থিত। সোনা উৎপাদন গবর্ণমেণ্টের খাস

কার্য্য এবং কয়লা তোলা হয় কোম্পানীর তাঁবে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় টিন এবং তামার খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের টিন-নির্ম্মিত দ্রব্য দেখিয়া ট্রান্সভালে টিন আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই, এই টিনের জিনিষ কাহারা তৈয়ার করিয়াছিল। অ্যাস্বেস্টাস রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদ্ যে কতদূর বৃদ্ধি পাইবে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। যানবাহন এবং রাস্তার সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে খনিজ সম্পদ্ ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ধাতু এবং খনির আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। ভূতত্ত্ব-বিষয়ক অনুসন্ধানের কার্য্য যতই না কেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদিত হউক এই দেশে এখনও খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে অনেক বড় বড় আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা আছে।

রুশিয়ায় চীনের চা

মাঞ্চুরিয়াতে বর্ত্তমানে যে গোলমালের খবর পাওয়া গিয়াছে তাহার ফলে রুশিয়ায় চীনের চায়ের বিক্রী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে রুশিয়ায় চীনের চা কত বিক্রী হইয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল।

কাল পাতা চা		
সবুজ চা		
গুঁড়া চা—		
কাল গুঁড়া চা	৮,৫০০,০০০	১২,৫০০,০০০
সবুজ পাতা	১০,০০০,০০০	১০,০০০,০০০
	৩৭,৭৫০,০০০	৪২,৭৫০,০০০

জার্ম্মাণির যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ শিল্প

মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প জার্ম্মাণির একটী প্রধান শিল্প। জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ারগণ কেবল যে নূতন নূতন যন্ত্র-কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নয়, কার্ম্মাণ কারখানায় তৈরি কলকব্জা গোটা দুনিয়ায় রপ্তানি হয়। কতকগুলি মেশিন আবার এমন যা জার্ম্মাণি ছাড়া আর কোথাও তৈরি হয় না।

এই শিল্পে জার্ম্মাণির প্রায় ৭৫০,০০০ লোকের অন্ন-সংস্থান হইতেছে। এই শিল্পের বাজার সব সময়েই প্রায় সমান থাকে। সেইজন্য মজুরগণকে বসিয়া থাকিতে হয় না। বিদেশ হইতে মালের অর্ডারও আসে যথেষ্ট। শতকরা ২৪।৩০ ভাগ মাল বিদেশে রপ্তানি হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বের চেয়ে রপ্তানির এই অঙ্ক কিছু উপরে।

জার্ম্মাণ মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যগুলিতে সব রকম কলই তৈয়ার হইয়া থাকে। মাল এত বেশী উৎপন্ন হয় যে, রপ্তানির পরিমাণ নিতান্ত কম হয় না। নিম্নের তালিকায় জার্ম্মাণি হইতে যন্ত্রপাতি রপ্তানির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৯২৭ সনে জার্ম্মাণি হইতে যন্ত্রপাতি রপ্তানি

	মোট রপ্তানি (রাইখ্‌স মার্ক)	আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী (রাইখ্‌স মার্ক)
বয়নের কল		১২১,৪২৪,০০০
মেশিন টুল		১২৩,০১২,০০০
প্রাকৃতিক শক্তি-চালিত		
এঞ্জিন	১১৭,৬১৮,০০০	৯০,৩৮০,০০০
কাগজের কল ইত্যাদি	৭৩,১৭০,০০০	৬৭,৩৮১,০০০
কলের লাঙ্গল ইত্যাদি	৬০,৩৫৭,০০০	২০,৭৪৬,০০০
ভারী জিনিষ তুলিবার		
কল, তুলাদণ্ড ইত্যাদি	৪২,৪০৮,০০০	৪০,৭০২,০০০
রেলের এঞ্জিন	৩৪,৬৯৯,০০০	৩৪,৩৮১,০০০
কেমিকাল শিল্প ও খাদ্য		
প্রস্তুতের কল	২৭,৪৪৩,০০০	২৬,২৭০,০০০
খনিতে ব্যবহৃত কল	২০,১৬১,০০০	১৭,৭৪১,০০০
অন্যান্য প্রকার কল	২১৯,৮৪৮,০০০	১৭২,৪০৮,০০০

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, বয়নের কলই জার্ম্মাণি হইতে রপ্তানি হয় সব চেয়ে বেশী। যুদ্ধ সত্ত্বেও জার্ম্মাণি এই কলের বাজারে বিলাতের নীচেই তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে। ১৯১৩ সনের অবস্থা অবশ্য জার্ম্মাণির এখনও ফিরিয়া আসে নাই। তবে প্রায় সেই অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। ১৯২৭ সনের কাগজ তৈয়ারের কলের রপ্তানি ১৯১৩ সনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সেলিনের বাজারে জার্ম্মাণির স্থান এখনও বিলাতের উপরে। দুনিয়ার কলের বাজারে জার্ম্মাণি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জার্ম্মাণির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়।

বিলাতের কৃষি-সাহায্যে রেল কোম্পানী

সারা বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের নানা স্থানে কৃষি-সংক্রান্ত বাগান সংক্রান্ত এবং জীবজন্তু বিষয়ের প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র হইতে নানা স্থানে মাল চালান দিবার জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীতে কর্তৃপক্ষরা উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত প্রদর্শনীকারকদের জীব-জন্তু অথবা কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি কোথায় কি পরিমাণ চালান দিতে হইবে সে বিষয়ে খবরাখবর দেন।

গত ৯ই জুলাই হইতে ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত বিলাতের ছারোগেট্ সহরে একটী রয়াল এগ্রিকাল্‌চারাল সো (কৃষি-প্রদর্শনী) হইয়া গিয়াছে। এই মেলা প্রতি বৎসরই বিলাতে খোলা হয়। এই প্রদর্শনী সফলতার সহিত গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রতি বৎসরই খুব চেষ্টা করা হয়। ইহার মাল স্থানান্তরে পাঠাইবার জন্য স্থানীয় রেল ছাড়া আরও নানা স্থান হইতে অতিরিক্ত রেলগাড়ী আনিয়া মাল-সরবরাহের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। এই বৎসর ছারোগেটের হারবেক্ ষ্টেশনে জীবজন্তু উঠানামা করিবার জন্য একটী বিশেষ ভাবের প্লাটফরম (ডক) প্রস্তুত হয়। এই প্লাটফরম তক্তা দিয়া প্রস্তুত, দু' ধারে কাঠের বেড়া দেওয়া থাকে, যাহাতে জন্তুগুলি গাড়ী হইতে বরাবর প্রদর্শনী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইতে পারে অথবা প্রদর্শনী হইতে বরাবর গাড়ীতে উঠিয়া আসিতে পারে। এই ডকের পাশ দিয়া আর একটা সমান ডক তৈয়ারী হয়। যে সব জন্তুর দরকার হয় না, তাহাদের শেষোক্ত ডক দিয়া নামাইয়া দেওয়া হয়।

দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হইবে মনে করিয়া ছারোগেটে অনেক নতুন ব্যবস্থা হয়। ষ্টেশনে বেশী আলোর ব্যবস্থা করা হয়, সমস্ত প্রতীক্ষাগারে, রিফ্রেশমেণ্ট রুমে এবং আফিসে নতুন আলোর ব্যবস্থা করা হয়। জীবজন্তু, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রদর্শনীর জিনিষপত্র প্রদর্শনীতে ঢুকাইবার সময় তাহাদের উপর সাধারণ ভাবের একটা গুঁড়া আবার করা হয়। তবে, সে সমস্ত বিক্রী হইয়া গেলে, মাল গাড়ীতে অর্দ্ধেক ভাড়ায় তাহাদের পাঠাইবার জায়গায় চালান করিয়া দেওয়া হয়, এবং এসব মালের দায়িত্ব মালিকের থাকে। এই বিশেষ ভাড়ায় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট যাত্রীদের স্থানান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মালপত্র অবশ্য আরও কম ভাড়ায় রেলে স্থানান্তরিত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। জীবজন্তু রেলে পাঠাইবার কালে, যে লোককে ঐ সমস্ত জীব-জন্তুর তত্ত্বাবধায়করূপে একই গাড়ীতে পাঠান হয়, তাহার রেল ভাড়া লাগে না। প্রদর্শনীর জীবজন্তুদের সাধারণতঃ খাওয়াইবার জন্য অনেক সময় প্রদর্শনীর বাহির হইতে লইয়া যাইতে হয়, সুতরাং ঐ কার্য্যে নিযুক্ত কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোকদেরও রেল কোম্পানী বিনা মাশুলে পশুদের সহিত যাতায়াত করিবার অনুমতি দেন।

এই সমস্ত সুযোগ সুবিধায় প্রদর্শনীর কার্য্য খুব সুশৃঙ্খলার সহিত চলে এবং ইহাতে দেশের কৃষিরও অনেক উন্নতি দেখা গিয়াছে।

দুনিয়ার কৃষি

বুকারেষ্টে চতুর্দ্দশ আন্তর্জ্জাতিক কৃষি কংগ্রেসের ফলে দুনিয়ার কৃষি বিষয়ে একটা সূচী-সংখ্যা নিরূপণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক কৃষি কমিশন ইহার সদস্যদের দ্বারা এবং গবর্ণমেণ্ট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এ বিষয়ে একটা তদন্ত করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই কমিশন রোম

কংগ্রেস এবং জেনেভার অর্থনৈতিক সভার দ্বনা এই প্রকার আরও একটী তদন্ত করেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে খাঁটি এবং বিশদ সূচী সংখ্যা নিরূপণের জন্য অনেক সময় এবং অর্থ ব্যয় করা হয়। এই তদন্তের ফলে যাহা জানা গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ (১৯১০—১৪ সনের সহিত তুলনায় ১৯২৭-২৮ সনের সংখ্যা) :—

কৃষি গোলার পাইকারী মূল্য	
সর্ব্বপ্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের পাইকারী মূল্য	
চাষীদের দ্বারা ক্রীত শস্যের মূল্য	
আড়ৎ জমির উপর খাজনা (১৯১৪ সনের সহিত ১৯২৬ সনের তুলনায়)	২৫৩
গোলার মজুরদের মাহিয়ানা	১৭৯

দুনিয়ার সর্ব্ববিধ কার্য্যের মধ্যে কৃষি আজও বেশী ভাগ লোকের অন্ন-সংস্থানের উপায়। গ্রামবাসীদের ক্রয়-শক্তি যথাসম্ভব কমিয়া যাওয়ায় দরুণই দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজকাল কৃষি-বিষয়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। ইন্টার্ন্যাশানাল ইকনমিক কন্‌ফারেন্স দুই বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাপার ঠিক ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছেন। গত মে মাসে জেনেভায় উক্ত কমিটীর একটী সভাতে লীগ্ অব্ নেশান্‌স্‌এর অর্থ-নৈতিক বিভাগকে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া যাহাতে ইহার উন্নতি-সাধন হয় তাহার সমস্ত উপায় ঠাওরাইতে বলিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কার্য্যতালিকার মধ্যেও এবিষয়ের আলোচনা একটা খুব বড় বিষয় ছিল।

"দি লণ্ডন অ্যাণ্ড ল্যাঙ্কাশিয়ার"

"দি লণ্ডন অ্যাণ্ড ল্যাঙ্কাশিয়ার" নামক বীমা কোম্পানীর মত আর কোন বীমা কোম্পানীই গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে এই বীমা প্রতিষ্ঠান বেশ শিকড় গাড়িয়া ফেলিয়াছে। বোম্বাই ও কলিকাতা এই দুই সহরে ইহার শাখা কার্য্যালয় অবস্থিত। তা'ছাড়া অনেক বীমা কোম্পানীর এজেন্সি গ্রহণ করিয়াও বীমা কোম্পানীটী ব্যবসা চালাইতেছে। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের ভিতর ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিং আছেন। কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয়ে ভারতের স্বার্থাদি বিষয়ে বোধ হয় কর্ত্তাদের একটু আধটু নেকনজর সময়ে সময়ে পড়ে। এই কোম্পানী জীবন-বীমা বাদে আর সকল প্রকার বীমাঘটিত কারবারই চালাইয়া থাকে। জীবন বীমা সম্বন্ধে এই কোম্পানী "দি ল ইউনিয়ন অ্যাণ্ড রক" নামক বীমা কোম্পানীর দেখাশুনার অধিকারী। "দি ল ইউনিয়ন অ্যাণ্ড রক" কোম্পানী এমন দুইটী জীবন বীমা করিয়াছে যাহার মোট দাম ৫ লাখ পাউণ্ড।

১৯২৮ সনে অগ্নি, দৈব-দুর্ঘটনা, এবং জাহাজ সম্বন্ধীয় বীমা ব্যবসায়ে প্রিমিয়াম লাভ দাঁড়ায় ৭,৩৮০,৫২২ পাঃ, অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে ১৭৮,০০০ পাঃ বেশী। অগ্নি বীমায় লাভ দাঁড়াইয়াছে সমস্ত লাভের প্রায় অর্দ্ধেক। ১৯২৮ সনে অগ্নি বীমায় লাভ হইয়াছে ৪০৫,৬১৯ পাঃ; ১৯২৭ সনে লাভ দাঁড়াইয়াছিল ৪২৯,১১০ পাঃ। অগ্নি-ঘটিত ক্ষতিপূরণের জন্য কোম্পানীকে মোট লাভের ৪৪% দিয়াও ঐরূপ লাভ দাঁড়াইয়াছে। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে অগ্নি-বীমা-বিভাগ হইতে ৮ লাখ পাউণ্ড লাভ করা নিতান্ত সোজা ব্যাপার নয়। জাহাজ-বীমা বিভাগে এতদিন ধরিয়া কেবলমাত্র লোকসানই হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ১৯২৮ সনে এই বিভাগেও ১২·৭% লাভ হইয়াছে। সামুদ্রিক বীমার প্রিমিয়াম হইতেও ৮% লাভ হইয়াছে। দৈব দুর্ঘটনা বিভাগে ৭৮,০০০ পাউণ্ড বেশী করিয়া মোট ২,৪০৭,১৩০ পাঃ খাটান হয়, লাভ দাঁড়ায় ১২৫,২৭৭ পাঃ, কিন্তু ইহার মধ্যে ১০০০০০ মজুত তহবিলে রাখা হইয়াছে।

১৯২৯ সনের আরম্ভে বিলাতের আবহাওয়ার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয় অগ্নি-বীমা কোম্পানী বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। ১৯২৯ সনের প্রথম ৪ মাসের মধ্যে ১৯২৮ সনের প্রথম ৪ মাসের তুলনায় বিলাতে প্রায় দ্বিগুণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে।

তবে এই বীমা কোম্পানীর বিদেশে কারবার বেশ ভালই চলিতেছে। কেবলমাত্র নিউজিল্যাণ্ডের অবস্থা শোচনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। বোম্বাই-সহরের শাখা

কার্য্যালয়টী যেরূপ কাজ করিতেছে তাহাতে মনে হয় ভারতে এই কোম্পানীর কারবার নিতান্ত মন্দ চলিবে না।

বৃটিশ গায়নার চিনি-শিল্প

বৃটিশ গায়নার কৃষি বিভাগের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, উক্ত উপনিবেশে ১৯২৮ সনে মোট ৫৭,৬২৫ একর জমিতে ইক্ষুচাষ হয় এবং ১৯২৭ সনে ৫৯,২৭১ একর জমিতে ঐ চাষ হয়। একর প্রতি গড়ে ২ টনের উপর চিনি উৎপাদন হয়। ১৯২৮ সনে মোট ৫৩,৪৮৯ একর জমিতে আখে ১১৬,৪৮৪ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯১৫ সনের পরে এত বেশী চিনি আর হয় নাই। ১৯২৮ সনে ইক্ষুচিনি রপ্তানির পরিমাণ ১১৪,৬৮৭ টন, ১৯২৭ সনে ৫৩,২৩০ একর জমিতে ১১৪,৬০২ টন চিনি পাওয়া যায় এবং ১৯২৮ সনের রপ্তানির পরিমাণ ১০৯,৬১৬ টন। ১৯২৮ সনে ২,৮৭৩,৪৬৮ গ্যালন ঝোলা গুড় বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এই পরিমাণ ১৯৫,০১১ গ্যালন বেশী।

১৮৭৯ সন হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত বৃটিশ গায়নাতে প্রতি বৎসরে কত একর জমিতে আকের চাষ হইয়াছে, কত বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং গত ছয় বৎসর ধরিয়া ইহার মূল্য কত হইয়াছিল তাহার একটা তালিকা নীচে দেখান গেল। এই তালিকা হইতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে, নিকটবর্ত্তী বৎসরসমূহে চাষের জমির পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে অথচ আকের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সমান রহিয়াছে।

বৎসর	চাষের জমির পরিমাণ (একর)	কত টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে	মূল্য (ডলার)
	৮১,২৭০		
	৮০,৭২০		
	৭৯,৬৩০		
	৭০,৬৪০	১০১,৬২০	
	৭৪,১৭০	১০৬,২৬০	
	৭৫,৫৮০	১১০,৮৩০	
	৭২,৬৪০	৯৪,৮২০	
	৭৬,৬১২	১০৬,২৮০	
	৬৫,০২০	৮২,৭৮২	
	৫৭,৮১৪	৮৩,১৬৬	১০,২৫৭,৪৫০
	৬৭,১৯০	৮৫,৬২৬	৮,৪৮২,২০০
	৫৭,৫০০	৯৭,১২৮	৬,৭৮৫,৭৪০
	৫৮,৫৮৯	৮৪,৬৫৯	৬,০৫০,২৫৭
	৫৯,২৭১	১০৯,৬১৬	৮,৭৮৭,৫৮৫
	৫৭,৬২৫	১১৪,৫৮৭	৮,১২৪,৬৬৬

মার্কিণ সরকারের ২০ কোটি ডলার বাঁচিয়াছে

সম্প্রতি আমেরিকান সরকারের আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে। অর্থসচিব মিঃ মেলন অনুমান করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের সমস্ত খরচা দিয়া ১৬ কোটি ডলার উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২০ কোটি ডলার (প্রায় ৬০ কোটি টাকা) উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। (বার্ত্তাবহ)

১। দেশী

১৯২৮-২৯ সনে বোম্বাইয়ের পোর্ট ট্রাস্ট

১৯২৮-২৯ সনের আয়—২ কোটি ৮৬ লাখ ৮ হাজার টাকা
„ ব্যয়—২ কোটি ৭৮ „ ৯৫ হাজার টাকা

রেভিনিউ রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা হইয়াছে—৫ লাখ ৯৫ হাজার

মোট মাল আসা যাওয়া করিয়াছে—৬৭ লাখ ৭ হাজার টন

আমদানি—শতকরা ৫০·৩ এবং রপ্তানি ৪৯·৭।

১৯২৪-২৫ সন হইতে ঋণ করিয়া টাকা তুলিয়া বন্দরের উন্নতি করা বন্ধ আছে। ১৯২৪-২৫ সনের আগে ঋণ করিয়া যে টাকা তোলা হইয়াছিল সেই টাকা হইতে আলেক্‌জান্দ্রা ডকে ঢুকিবার পথ আরও গভীর করা হইয়াছে (ব্যয় ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা) এবং প্রিন্সেস্ ও ভিক্টোরিয়া ডকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটী খাল (কেসন্) গাড়া হইয়াছে (ব্যয় ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা) ১৯২৯-৩০ সন ধরিলে ৫ বৎসর ধরিয়া ঋণ তুলিয়া উন্নতি-সাধন বন্ধ আছে। যে পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি না হয় সে পর্য্যন্ত আর ঋণ তোলা হইবে না।

বোম্বাইয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত মাল চলাচল করে তাহার উপর যে কর আদায় করা হয়, বোম্বাই কর্পোরেশান তাহা বাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। পোর্ট ট্রাষ্ট ইহার বিরোধী। তাঁহারা ভয় করিতেছেন যে, ইহার ফলে বোম্বাই হইতে মাল অন্য বন্দরে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

ভারতীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য পোর্ট ট্রাষ্টের চেষ্টা নিম্নরূপ :—(১) ডাফরিন জাহাজে যাহারা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের (যদি তাহারা কোন অনুমোদিত জাহাজ কোম্পানীতে চাকরী যোগাড় করিতে পারে) মধ্যে ২ জনকে ৩ বৎসরের জন্য ১০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। পাইলট সার্ভিসে কাজ খালি হইলে তাহাদের আবেদন লওয়া চলিবে; (২) পোর্ট ট্রাষ্টের ভারতীয় জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে ২ জনকে বিলাতের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে পোর্ট ট্রাষ্টের খরচায় শিক্ষার্থ পাঠানো হইবে; (৩) পোর্ট ট্রাষ্টের কারখানায় কাজ করিবার জন্য অ্যাপ্রেন্টিস লওয়া হইবে; ইহাদের মধ্যে জন কয়েককে পোর্ট ট্রাষ্টের খরচায় বিলাত পাঠানো হইবে।

যুক্তপ্রদেশের বেকার-সমস্যা

যুক্তপ্রদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহা দূর করিবার উপায় ঠাওরাইবার জন্য একটী কমিটি গঠন করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায়গুলি ঠাওরাইয়াছেন :—

(১) পরীক্ষামূলকভাবে যুক্তপ্রদেশের নিম্নলিখিত কয়টী সহরে একটী করিয়া "এম্প্লয়মেণ্ট বিউরো" (চাকুরী অনুসন্ধানী কার্য্যালয়) গড়িয়া তোলা দরকার—লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর এবং আগ্রা।

(২) প্রত্যেক বিউরোতে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন করিয়া চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী থাকিয়া মোট ৭ জনের বেশী কর্ম্মচারী থাকিতে পারিবে না। এই বিউরোর উদ্দেশ্য থাকিবে :—

(ক) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেসব ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা (ম্যাট্রিকুলেশন) এবং ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিবে তাহাদের একটী তালিকা রাখা।

(খ) এই সমস্ত ছাত্রের পক্ষে কি কি চাকরী জোগাড় হইতে পারে তাহা ঠিক করা।

(গ) যে সমস্ত চাকরী-দাতাগণ এই বিদ্যার কর্ম্মচারী খোঁজেন তাহাদের সহিত এই ছাত্রদের পরিচয় করিয়া দেওয়া।

(ঘ) ছাত্রদের বাপ-মাদের অথবা শিক্ষকদের, কি উপায়ে ছেলের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। এবং যে সব ছাত্র বিদ্যালয় ছাড়িয়া বাহির হয় তাহাদের চাকরী খোঁজা দরকার কিংবা আরও উচ্চ শিক্ষা দরকার সে বিষয়ে তাহাদের উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া।

(ঙ) প্রতি বৎসর একটী করিয়া কার্য্য-বিবরণী বাহির করা। ইহাতে থাকিবে :—

(অ) বৎসরে কত সংখ্যক ছাত্রের জন্য বিউরো চাকরী খুঁজিয়া দিতে পারিয়াছে।

(আ) কত সংখ্যক ছাত্র তাহাদের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও চাকরী পায় নাই।

(ই) কতগুলি চাকরীর জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই।

(ঈ) ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বর্ত্তমানের কি কি উপায় কার্য্যকর হইতেছে না।

(উ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে চাকরী না জোটার কোন কারণ দেখিলে তাহার বিবরণ।

(ঊ) বিউরোর কার্য্যকারিতার উন্নতি হিসাবে কোন উপায় সমীচীন হইলে তাহা।

তাঁহারা আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রতি মাসে প্রত্যেক বিউরোকে গবর্ণমেণ্ট ২০০ টাকা সাহায্য করিবেন। এই সাহায্যের টাকা হইতে বিউরোর ভাড়া কেরাণীর মাইনে, বিবিধ খরচ, সেক্রেটারীর জন্য মাসে ৫০ টাকা করিয়া একটা তাতার খরচ চলিবে। এই সাহায্য প্রথম তিন বৎসরের জন্য চলিবে। এইরূপ চারিটি বিউরোর বাৎসরিক খরচ মোট ৯,৬০০ টাকা হইবে। প্রত্যেক বিউরোকে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একখানি করিয়া আদেশপত্র দিতে হইবে। এই সমস্ত বিউরোর প্রত্যেককে সমস্ত ইউনিভার্সিটির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। ইউনিভার্সিটিকে নিজ নিজ বিউরো খুলিবার পরামর্শ দিবার আগে পূর্ব্ব বিউরোর কার্য্য কেমন চলিতেছে তাহা দেখিতে হইবে।

ইকনমিক্যাল ডেভলপমেণ্ট এসোসিয়েশন

গত ১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার সময় ২০৬।১৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটী সভায় ইকনমিক্যাল ডেভলপমেণ্ট এসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া নামে একটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘের একটী সাময়িক কমিটি গঠন হইয়াছে। সভাপতি, তিনজন সহকারী সভাপতি ও সাধারণ সেক্রেটারীকে লইয়া একটী সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এসোসিয়েশনের নিয়মাবলী তৈয়ারী করিবেন। যথা—(১) একখানা কাগজ বাহির করা (২) একটি প্র্যাকটিক্যাল কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত করা (৩) একটি কমার্শিয়াল লাইব্রেরী খোলা। উপরোক্ত কমিটির একজিকিউটিভ মেম্বরগণ প্রত্যেক জেলা হইতে ৫ জন করিয়া মেম্বর তাঁহাদের কমিটিতে লইবেন এবং নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিবেন। (১) জেলা ও গ্রাম্য কমিটি স্থাপন করা (২) ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস খুলিয়া ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি শিল্প ও বেকারদিগকে আর্থিক সাহায্যের দ্বারা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করা। যে কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে ১৪নং রুম, ২০৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্রীযাদি বাজার কলিকাতা এই ঠিকানায় লিখিয়া পাঠাইবেন।

সারের উপাদানের উপর রেলের মাশুল

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কালিকাট বাণিজ্য সভা রেলওয়ে রেট্স্ অ্যাডভাইসরি কমিটির নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছে যে, সম্প্রতি সার চালান সম্বন্ধে যে রেল-মাশুল হ্রাসের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ কোন ফলই প্রসব করিবে না, যদি না সার তৈয়ারের উপকরণসমূহ সম্পর্কে রেল মাশুল হ্রাস করা হয়। সুতরাং হাড় ও চুন সার উৎপাদনের অন্ততঃ এই দুইটী উপকরণ বস্তু

যাহাতে অন্ন মাশুলে আনা যাইতে পারা যায়, রেল কোম্পানীগুলিকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য বাণিজ্য সভা হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। কেবল মাত্র ঐ দুই বস্তু যখন সার তৈয়ারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং ঐ সার দেশের মধ্যেই বিক্রীত হইবে তখনই রেল কর্তৃপক্ষ মাশুল হ্রাস করিবেন, অন্যথায় নহে। কিন্তু যে দুই রেলপথে এই সকল উপকরণ চালান দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথ বাণিজ্য সভার কথানুযায়ী রেল মাশুল কমাইতে রাজী হইয়াছেন। মাদ্রাজ ও সাদার্ণ মারহাঠা রেলওয়ে বাণিজ্য সভার কথায় আদৌ কর্ণপাত করেন নাই।

মাদ্রাজ ও সাদার্ণ মারহাঠা রেলওয়ে তাঁহাদের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, হাড় এবং চুন ছাড়া আরও অনেক মিনিষ আছে যাহা সারের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং হাড় ও চুন সার তৈয়ার ভিন্ন অন্যান্য কাজেও লাগে, সুতরাং রেল কর্তৃপক্ষ সব সময়ে ঠিক করিতে পারেন না যে, এই সকল দ্রব্য সারের জন্য ব্যবহৃত হইবে কি অন্য কোন কাজে লাগিবে। আর রেল কর্তৃপক্ষের তাহা স্থির করিবার জন্য মাথা-ব্যথাই বা কি? আর এই সমস্ত নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপরও নয়। তা'ছাড়া রেল মাশুলের হারও এমন কিছু হাতী ঘোড়া নয় যাহা বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সুতরাং রেল কর্তৃপক্ষ বাণিজ্য-সভার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না।

ধন-বিজ্ঞানের স্থান পঞ্চম

গত বৎসর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে জন-সাধারণ কর্তৃক মোট ২১,৯৯৪টী বই অধ্যয়ন করা হয়। ইহার মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ে কতগুলা বই পড়া হইয়াছিল, তাহার হিসাব :—

সাহিত্য—৪,২৮৯
ইতিহাস—২,১১৩
ধর্ম্ম-সংক্রান্ত—১৮১৬
জীবন-বৃত্তান্ত—১২৮৭
ধনবিজ্ঞান—১২২২
শাসন-সংক্রান্ত—১১২৩
দর্শন—১১০৭
আইন—৯০৮
চিকিৎসা-বিদ্যা সংক্রান্ত—৬২৮
শিক্ষা-বিষয়ক—৫১৭
কৃষি-বিষয়ক—৪৫৭
বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়—৪১০

দেখা যাইতেছে যে জন-প্রিয়তার দিক্ হইতে ধন-বিজ্ঞানের স্থান পঞ্চম।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে মোট ২ লাখ বই আছে। গত বছর কেনা হইয়াছে ২১,১১৫। এতগুলা গ্রন্থের মধ্যে ২১,৯৯৪টী লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়া হইয়াছিল এবং ৫,৬৫১ বাড়ীতে ধার করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

তুলার বীজ আমদানিতে বাধা

তুলার বীজকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দোষ এবং রোগমুক্ত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্তাপ ইত্যাদির সাহায্য লইতে হয়। ইংরাজীতে এই শোধন প্রক্রিয়াকে "ফিউমিগেশান" বলে। বিদেশ হইতে ভারতে তুলার বীজ আমদানি করিতে গেলে এই ফিউমিগেশান প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হইবে। সম্প্রতি এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র আটটি বন্দরে বীজ আমদানি করিতে পারা যাইবে। কলিকাতা এই আটটী বন্দরের মধ্যে একটী। দি সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া কটন কমিটি আবার নূতন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র একটী বন্দরেই তুলার বীজ আমদানি হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ নূতন স্বরূপের এক সাংঘাতিক তুলার মড়ক বিদেশে দেখা দিয়াছে। ভারতের তুলার ক্ষেতে যাহাতে এই মড়ক না দেখা দেয় সেই জন্য এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্য। এই কমিটি আরও বলেন যে, ব্যবসার জন্য তুলার বীজ আমদানি করিতে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। কারণ ভারতের ক্ষেতের জন্য সামান্য তুলার বীজের দরকার। ভারত গবর্মেণ্ট কমিটির এই কথায় কর্ণপাত করিয়াছেন।

সম্প্রতি তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বোম্বাই বন্দরে তুলার বীজ আমদানি করিতে দেওয়া হইবে; এই বীজ কেবলমাত্র পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই আনিতে দেওয়া হইবে, বীজ আমদানি করিতে পারিবেন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী এবং একবারে মাত্র এক হন্দর বীজ আমদানি হইতে পারিবে, তাহাও রীতিমত ফিউমিগেশান হওয়ার পর।

বার্ম্মার ধান-চালের ব্যবসার উন্নতির উপায়

এখন বার্ম্মার ধান-চালের ব্যবসা সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান চলিতেছে। 'বার্ম্মা-ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স' অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কমিটির নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিতেছেন যে:—(১) ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত প্রত্যেক ১০০ ঝুড়ি ধানের দর গড়ে ১৩৫৲ ছিল। এখন তাহা ১৮৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে; বার্ম্মার চালের এখন নানা প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে। এখন এরূপ দর বাড়ানো ঠিক হয় নাই; (২) টাকার বিনিময়-হার ১৮ পেনি ঠিক হওয়াতে, ১৬ পেনি হারে ব্যবসায়ীরা রপ্তানি-করা চাল হইতে যত লাভ করিত এখন তাহার শতকরা ১২½ ভাগ কম লাভ করিতেছে; (৩) রপ্তানি চালের উপর শুল্ক রদ করিয়া দেওয়া উচিত, না হয় ঐ শুল্কের আয়ের অর্দ্ধেকটা ধান-চাষের উন্নতির জন্য বার্ম্মা গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া উচিত; (৪) নানা শ্রেণীর বীজ যাহাতে একসঙ্গে মিশিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত; (৫) ভারত এবং শ্যামদেশ হইতে যে সব গরুর গাড়ুর বার্ম্মায় আসিয়া থাকে, তাহাদের রোগ যাহাতে বার্ম্মার গরু-বাছুরের মধ্যে সংক্রামিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত; (৬) গরু পুষিবার খরচ এবং জমুর খাটিবার খরচ বাড়ার জন্য লাভের ধান বাড়িয়া গিয়াছে, বার্ম্মার মধ্যেই যাহাতে সার প্রস্তুত হয় তাহার চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের করা দরকার; (৭) যেসব ঝুড়িতে ধান চালান করা হইয়া থাকে, সেগুলা নানা সাইজের; যাহাতে একই সাইজের ঝুড়ি বার্ম্মার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহার চেষ্টা করা বিশেষ দরকার।

সমবায় সম্মিলনীর সভাপতিরূপে মহীশূরের দেওয়ান

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজের সমবায় সমিতিগুলার ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত মির্জ্জা ইস্মাইল সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ভালভাবে চালাইতে পারিলে সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে ভারতের দরিদ্রদের নৈতিক ও ঐহিক জীবনের অনেকটা উন্নতি করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন যে, এই সম্মিলনীগুলাতে কেবল ভবিষ্যতের প্ল্যান তৈরী করিলেই চলিবে না, অতীতের প্রস্তাবগুলা কতদূর কাজে লাগানো হইয়াছে তাহাও খুঁটিয়া দেখা দরকার।

মাদ্রাজে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট, কিছু দিন হইতে শিল্প-শিক্ষা-দানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে ১৯২৪ সনে একটী কমিটী বসান হয়। কমিটিতে স্থির হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অন্ততঃ তিনটী শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপনের দরকার। একটী পশ্চিমোপকূলে, একটী উত্তর সার্কারে এবং আর একটী নবাধিকৃত জেলাগুলিতে। এই জন্য বেল্লারি, ম্যাঙ্গালোর এবং কালিকাট, এই তিনটী সহর মনোনীত হইয়াছে। শিল্প-শিক্ষালয়গুলি আবার দুই শ্রেণীর; প্রথমতঃ, কারখানার মধ্যেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, যেমন মাদ্রাজের ট্রেড্‌স স্কুল; দ্বিতীয়তঃ, কারখানা-সমন্বিত খাঁটি শিল্প-শিক্ষালয়, যেমন মাদুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। এই শেষোক্ত শিক্ষালয়ে ছাত্রদলকে রীতিমত ছাত্র সাজিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয়। ম্যাঙ্গালোরে এবং ম্যাঙ্গালোরের আশেপাশে অনেক কল-কারখানা আছে; সুতরাং এখানে ট্রেড্‌স স্কুল স্থাপনই সুবিধাজনক; কিন্তু কালিকাটে এবং বেল্লারিতে রীতিমত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলস্থাপন করা আবশ্যক।

ম্যাঙ্গালোরের বিদ্যালয়

প্রথমতঃ ম্যাঙ্গালোরে আংশিক শিক্ষালয় স্থাপন করা হইবে। এখানে কাঠের কাজ এবং এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। মোটর এঞ্জিনিয়ারিংও শিক্ষা হইবে। ক্রমে অন্যান্য বিদ্যাও শিখান হইবে। ম্যাঙ্গালোরে কমনওয়েল্থ ট্রাষ্ট এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপে এবং আরও কয়েকটী কার্খে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এইগুলির বিলোপসাধন কখনই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নয়। বে-সরকারী শিক্ষালয়গুলির কার্য্যকলাপ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়ার দরকার এবং এই জন্য সরকারী সাহায্যাদিও দেওয়া হইবে। কার্খ-চালিত শিক্ষালয়গুলিতে যেরূপ পুঁথিগত বিদ্যা শিখাইবার কোনই ব্যবস্থা নাই, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার্থিগণকে সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যই এই ব্যবস্থা করিতেছেন।

শিক্ষানবিশির সময় ও শিক্ষার বিষয়

ম্যাঙ্গালোরের ক্যাষ্টরী এবং ওয়ার্কসপগুলির শিক্ষা-নবিশগণের মেকানিক্স কোর্স পাঁচ বৎসরের জন্য করা হইয়াছে। মোটর মেকানিজম এবং ড্রাইভিং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সময় দুই বৎসর; কাঠের কাজ শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষার সময় দুই বৎসর। মেকানিক্স্ কোর্সে শিক্ষার্থীকে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা সময় কলিত যন্ত্র-বিজ্ঞান, গণিত (কারখানার উপযোগী) এবং মেশিন দুইং ইত্যাদি শিখিতে হইবে। পাঠ্যতালিকা, মাদ্রাজ ট্রেড্স স্কুলের প্রিন্সাপুর ব্র্যাঞ্চের অনুরূপ। মোটর ড্রাইভারগণকেও সপ্তাহে ছয় বা তদোধিক ঘণ্টা কাল ক্লাসে এবং হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। কেবলমাত্র যাহারা মোটর গ্যারেজে কাজ করে বা মোটর ড্রাইভিং সম্বন্ধে কিছু জানে তাহা-দিগকেই ভর্ত্তি করা হইবে। কাঠের কাজ শিক্ষার্থিগণকে এইরূপ সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা বা তদোধিক সময় হাতে কলমে কাজ শিখিতে হইবে বা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে। ম্যাঙ্গালোরের মিলে এবং ওয়ার্কসপে যে সমস্ত মিস্ত্রি কাঠের কাজ করে তাহাদের শিক্ষা-দানের জন্যই কোর্স খোলা হইতেছে।

কালিকাট ও বেল্লারির বিদ্যালয়

কালিকাট বিদ্যালয়ে ক্যাবিনেট তৈয়ারি, কামারের কাজ, এবং মোটর ড্রাইভারের কাজ শিখান হইবে এবং ছাত্রগণকে রীতিমত দিনমান ধরিয়া স্কুলে থাকিতে হইবে। ক্যাবিনেট তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে মাদুরা, গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনষ্টিটিউটএর পাঠ্য-তালিকা অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কামারের কাজ শিখান সম্বন্ধে সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে প্রকাশিত পাঠ্য-তালিকার অনুসরণ করা হইবে। ক্যাবিনেট্ তৈয়ারী, এবং কামারের কাজ শিখিবার সময় ধরা হইয়াছে পাঁচ বৎসর, এবং মোটর কোর্স ছয় মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত। কামারের বিদ্যা এবং ক্যাবিনেট্ প্রস্তুত বিদ্যা সম্বন্ধে বেল্লারি বিদ্যালয়টি কালিকাটেরই মত হইবে; তবে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ম্যাঙ্গালোর ট্রেড্স্ স্কুলের শিক্ষার্থিগণের নিকট বেতন লওয়া হইবে না; কিন্তু কালিকাট বিদ্যালয়ে মোটর কোর্সের জন্য কি ছাত্রকে মাসিক ১২৲ টাকা বেতন দিতে হইবে। মাদুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনষ্টিটিউটে ছাত্রগণকে যেভাবে বৃত্তি দেওয়া হয় কালিকাট এবং বেল্লারি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেও সেইভাবে দেওয়া হইবে।

শিক্ষানবিশ চাই

কালিকাট এবং বেল্লারিতে মাদ্রাজ সরকার শীঘ্রই শিক্ষালয় স্থাপন করিতে চান। এই জন্য রীতিমত ব্যবসা বাণিজ্যের উপযোগী ওয়ার্কসপ ইত্যাদি স্থাপিত হইবে। শিক্ষার্থিগণকে এই সমস্ত ওয়ার্কসপে কাজ করিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সংলগ্ন পাঠ গৃহে যাইয়া পড়াশুনাও করিতে হইবে। নিকটে যে সমস্ত ছোট খাটো বেসরকারী ওয়ার্কসপ আছে, তাহা হইতেও শিক্ষার্থী লওয়া হইবে এবং তাহাদের সুবিধা অনুসারে পাঠের সময় নির্দ্দেশ করা হইবে।

"সাক্কার-স্কীমের" বোঝা বোম্বাইয়ের বহা সম্ভব নয়

সিন্ধু প্রদেশে "সাক্কার ব্যারেজ স্কীম" নামে যে খাল প্রণালীর সৃষ্টি চলিতেছে তাহার জন্য মোট ২৪ কোটি টাকা ধার করিতে হইবে (এখন স্থির হইয়াছে যে, খরচটা ২০ কোটি টাকার বেশী উঠিতে দেওয়া হইবে না)। এই মোটা টাকার সুদের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। খালগুলা হইতে সুদের টাকাটা তুলিতে স্কীম সম্পূর্ণ হইবার পর অন্ততঃ দশ বৎসর লাগিবে। ততদিন পর্য্যন্ত এই সুদের বোঝা বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে বহিতে হইবে। তার এম্ দি বিশেষরায়া এবং শ্রীযুক্ত নবাবালি নওয়াজ জাঙ বাহাদুর বলিতেছেন যে, বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের দেনার বোঝার অনেকটা অংশ ভারত গভর্ণমেণ্টের লওয়া উচিত। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই বোঝাটা লইলে খালের আয়ের ও খানিকটা অংশ ভারত গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া চলিবে।

২। বিদেশী

জন্ম-নিরোধ বিরোধী মুসোলিনী

আধুনিক ইতালির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা মুসোলিনী জন্ম-নিরোধ প্রথার একান্ত বিরোধী। ইহার মত এই, প্রত্যেক নারীর যত বেশী সম্ভব সন্তানের জন্ম দেওয়া কর্ত্তব্য। সন্তান পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক নারীরই আছে। এই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-সাধনে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ম্যালথাস একশত বৎসরেরও পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন বটে যে, খাদ্য যে হারে বাড়ে, লোক-সংখ্যা, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হারে বাড়ে। কিন্তু আধুনিক জগতে দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য উৎপাদন না করিলেও, কেবল ধন উৎপাদন করিলেই তাহার পরিবর্ত্তে খাদ্য আহরণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং ম্যালথাসের তত্ত্ব আর মানুষকে ভয় দেখাইতে পারে না। অবশ্য, দরিদ্র মজুরদের যথেচ্ছাচার সন্তান বাড়ানো যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু আধুনিক কালের মজুরদের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয় নাই কি? মজুররা ভাল করিয়া খাইতে পরিতে এবং আরামে থাকিতে পাইয়াও সন্তান পুষিবার দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিলে অন্যায় হয় না কি? সন্তানবতী নারীর এবং শিশুদের যাহাতে বিশেষ যত্ন লওয়া হয় সে বিষয়ে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা করা উচিত। ইতালির গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে খুবই সচেষ্ট। ইতালির উচ্চতম রাজ-কর্ম্মচারীরাও সন্তানবতী নারী এবং শিশুদের যত্ন লইতে বিশেষরূপে বাধ্য। ইতালিতে অবিবাহিতদের উপর যে কর স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে বার্ষিক ৫ কোটি লিরার আয় হয়। এই টাকাটার সমস্তটাই নারী ও শিশুর কল্যাণার্থে ব্যয় করা হয়। এ ছাড়া, সংসারে পোষ্যের সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য ইতালিতে কোন্ কোন্ পরিবার বেশী কষ্ট পাইতেছে, সে বিষয়ে ইতালির গভর্ণমেণ্ট বিশেষ খোঁজ রাখে এবং টাকা ধার দিয়া সেই সব পরিবারকে আর্থিক সঙ্কট হইতে মুক্ত করে।

বিলাত ভারতের নিকট আরও বেশী চাল কিনিবে না কেন?

সম্প্রতি বিলাতে ভারতের হাই কমিশনার স্যর অতুল চ্যাটার্জ্জি বিলাতের সংবাদপত্রগুলার এক প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, আজকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়াইবার জন্য নানা চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু এ বিষয়ের উদ্যোক্তাগণ এ সম্বন্ধে ভারতের স্থানটা কত বড় তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যান। বিলাতের নানা মালের প্রধান খরিদ্দার যে ভারতবর্ষ, বহুজন ইংরেজ ব্যবসাদার সে খবর রাখেন? এ বিষয়ে ভারতকে ঠেলিয়া রাখিবার আর একটী উদাহরণ এই যে, ভারতে জগতের অর্দ্ধেক চাল উৎপন্ন হয়, অথচ বিলাত তাহার প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ভারত হইতে কিনে এবং এই অংশটাও ক্রমে কমিতেছে। এরূপ হইবার কারণ

কি? প্রথম—অজ্ঞতা, ভারতে যে এত চাল উৎপন্ন হয় তাহার খবর অনেকেই রাখেন না; দ্বিতীয়—বিলাতের গৃহিণীরা অন্য দেশের খুব পালিশ করা বাহ্য চাকচিক্য-যুক্ত চাল দেখিয়া মুগ্ধ হন, ভারতীয় চাল দেখিতে সুন্দর না হইলেও কাজে যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ তাহা তাঁহারা ভাবিয়াও দেখেন না।"

মদ্য-পান নিবারণ সম্বন্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-পতি

হেন্‌রি ফোর্ড জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-পতি বলিয়া খ্যাত। তাঁহার ফ্যাক্টরীগুলায় প্রস্তুত ১০ লাখ মোটর গাড়ী এ পর্য্যন্ত তিনি বেচিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গত তিন বৎসর ধরিয়া যে মদ্যপান-নিবারণ প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে তিনি 'পিক্‌টোরিয়াল রিভিউ' নামক পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তাঁহার নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মদ্যপান-নিবারণী আইন উঠাইয়া লইলে সপ্তাহে মোট ২ লাখ গ্যালন পর্য্যন্ত চলিতে পারে এরূপ মোটর গাড়ী প্রস্তুত অসম্ভব। কারণ, মদ্যাসক্ত লোকের মাথা পরিষ্কার থাকে না। এরূপ লোকের দ্বারা নিখুঁত কাজ হওয়া অসম্ভব। তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি ২ লাখ লোককে মাহিয়ানা দিয়া খাটাই। তাহারা তাহাদের মাহিয়ানা কেবল মদের দোকানে নষ্ট করিবে তাহা আমি চাহি না। যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৯৯ জন লোক মদ্যপান নিবারণের পক্ষপাতী, কেবল শতকরা ১ জন (ইঁহারা হয় অত্যন্ত ধনী, না হয় অত্যন্ত গরীব ও লক্ষ্মীছাড়া) লোকই কেবল মদ্যপান-নিবারণের বিপক্ষে।"

বৃটিশ এম্‌পায়ার ফিল্ম

বিলাতী গবর্ণমেণ্টের উপনিবেশসমূহের ভারপ্রাপ্ত সচিব (দি কলোনিয়াল সেক্রেটারী) ফিল্ম-শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে এবং উহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য গত এপ্রিল মাসে একটী কমিটি গঠন করেন। বর্ত্তমানে ফিল্ম-শিল্প যে একটী লাভের ব্যবসায়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিবেন স্থির করেন :—

(১) জন-শিক্ষার বাহনরূপে সিনেমাগুলির ব্যবহার করা যাইতে পারে কিনা; (২) রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক এই উভয়বিধ কারণে বিলাতী ফিল্মের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা।

বাণিজ্য-জাহাজ সম্বন্ধীয় আইন-কানুনের পরিবর্ত্তন

১৯২৬ সনের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে বিলাতের ডোমিনিয়নগুলা বিলাতেরই সমকক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ডোমিনিয়নগুলার রাষ্ট্রীয় পদ-মর্য্যাদা এইরূপে ঘোষিত হইবার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বাণিজ্য-জাহাজ সম্বন্ধীয় আইন-কানুনগুলা উক্ত পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া পিটিয়া লইবার আবশ্যকতাও অনুভূত হয়। এইজন্য একটী কন্‌ফারেন্স আহূত হইবে। ভারতকেও এই কন্‌ফারেন্সে ডোমিনিয়নদেরই সমকক্ষ হিসাবে স্থান দেওয়া হইবে। অ্যাটর্ণি জেনারেল, সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্ ফর্ ডোমিনিয়নস্ এবং বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট বিলাতের প্রতিনিধিরূপে, ডোমিনিয়নগুলার মন্ত্রিগণ ডোমিনিয়নদের প্রতিনিধিরূপে এবং স্যর মহম্মদ হবিবুল্লা ও স্যর এডোয়ার্ড শামিয়ার ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবেন।

ভাল খাইবার পরিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়াও

গত ৯ই অক্টোবর তারিখে বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে কমনওয়েল্থ্ অব্ ইণ্ডিয়া লীগের একটী সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীযুক্ত পার্শেল বলেন যে, "উদরের সমস্যা"ই ভারতের আর্থিক উন্নতির পথে প্রধান বাধা—মজুরদের জীবনযাত্রার প্রণালীটা উন্নত না হইলে, অর্থাৎ মজুরদের ভালভাবে খাইবার পরিবার ও থাকিবার তীব্র ইচ্ছা মনে জাগ্রত না হইলে, ভারতকে আর্থিক হিসাবে উন্নত করা সম্ভবপর নয়। তিনি আরও বলেন যে, বিলাতী বা ভারতীয় কোন প্রকার নেতাই মজুরদের অবস্থা ভাল করিতে পারিবে না। সুনিয়ন্ত্রিত মজুর-সঙ্ঘের স্থাপনই মজুরদের অবস্থা ভাল করিবার একমাত্র উপায়।

আমেরিকার টেক্সাস্ কর্পোরেশানের ডিবেঞ্চার-বিক্রয়

আধুনিক যৌথ ব্যবসাসমূহ সেয়ার বেচিয়া টাকা তুলিয়া থাকে। যাহারা সেয়ার কেনে তাহারা ব্যবসার অংশীদাররূপে পরিগণিত হয়। যদি ব্যবসা লাভবান হয়, তাহা হইলে ব্যবসার সমস্ত খরচা মিটাইয়া তাহারা বাকী লাভটা ভোগ করিবার অধিকারী হয়। যদি ব্যবসাতে লোকসান হয়, লোকসানের ঝুঁকিটা তাহাদেরই আগে বহিতে হয়।

ডিবেঞ্চার বিক্রী করিয়াও আধুনিক যৌথ ব্যবসায় টাকা তোলা হইয়া থাকে। যাহারা ডিবেঞ্চার ক্রয় করে তাহারা ব্যবসার উত্তমর্ণ বলিয়া গণ্য হয়। ব্যবসার লাভ লোকসানের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না; তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে নিয়মিতভাবে টাকা পাইয়া থাকে।

আমেরিকার টেক্সাস্ কর্পোরেশান নামে একটী ব্যবসায়ী কোম্পানী আছে। এই কর্পোরেশান অনেকগুলি ছোট ছোট কোম্পানী লইয়া গঠিত। এই কর্পোরেশান তেলের ব্যবসায় লিপ্ত। ইহার অধীনে জমিজমার পরিমাণ (কেনা অথবা ইজারা লওয়া) ২৭ লক্ষ ২৮ হাজার একর। ইহার অধীনে ১৯টী সমুদ্রগামী প্রকাণ্ড তৈলবাহী জাহাজ আছে। তা'ছাড়া জগতের প্রধান প্রধান সকল দেশেই ইহার তেল ও তেল বেচিবার বন্দোবস্ত আছে। ইহার কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য সম্প্রতি অনেক টাকার দরকার হইয়াছে। সেইজন্য এই কর্পোরেশান ১০ কোটি ডলারের ডিবেঞ্চার বেচিবেন স্থির করিয়াছেন। যাহারা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে, তাহাদের বার্ষিক ৫% হারে টাকা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক ১০০ ডলার দামের ডিবেঞ্চারের জন্য পুরা ১০০ ডলার দিবার দরকার নাই, ৯৮৫ ডলার দিলেই চলিবে। ১৯৪৩ সনের ১লা অক্টোবর তারিখে ডিবেঞ্চার-ধারিগণ আসল টাকা ফেরত পাইবার দাবী করিতে পারিবেন।

ডিবেঞ্চারধারীদের আরও একটা সুবিধা আছে। ইচ্ছা করিলে ডিবেঞ্চার বদলাইয়া তাঁহারা সাধারণ সেয়ারও লইতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহারা উত্তমর্ণ হইতে অংশীদার-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সামান্য আয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন না, বিপজ্জনক হইলেও বেশী আয়ের প্রতি লোভ যাঁহাদের বেশী, তাঁহাদের পক্ষে এই সুবিধাটী কম নয়।

ডিবেঞ্চারকে কি হারে সেয়ারে বদলানো চলিবে তাহাও বলা হইয়াছে। ১৯৩০ সনের ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত সেয়ার প্রতি ৭০ ডলার হিসাবে, ১৯৩৯ সনের ১লা অক্টোবরের পরে হইলে সেয়ারপ্রতি ১২৫ ডলার হিসাবে এবং এই দুই তারিখের মধ্যে হইলে ৭০ এবং ১২৫ ডলারের মাঝামাঝি নানা দরে বদলানো চলিবে।

ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্ক আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম। কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা আছে। সম্প্রতি কলিকাতার ঐ শাখা ব্যাঙ্ক নিউ ইয়র্কের প্রধান আফিস হইতে যে 'তার' পাইয়াছেন, তাহা হইতেই এই ডিবেঞ্চার-বিক্রয়ের কথা জানিতে পারা গিয়াছে।

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর বার্ষিক সভা

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর বার্ষিক সভায় সার এরিক্ গেডিস্ বক্তৃতা দিবার সময় বলেন যে, ভারতীয় পথে যাত্রীর ও মালের যতটা বৃদ্ধির আশা করা হইয়াছিল, প্রকৃত-পক্ষে ততটা বৃদ্ধি হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, করাচি হইতে দিল্লী হইয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থায়ী এরোপ্লেন সার্ভিস্ স্থাপনের জন্য যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এরোপ্লেন চালাইবার জন্য বিলাতের ও অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্টের সহিত চিঠি লেখালেখি চলিতেছে, তিনি একথাও উল্লেখ করেন।

উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পারিবারিক ক্ষতি

ভারতের সাধারণতঃ একজন উপার্জ্জনক্ষম গৃহস্থকে স্কন্ধে তিন হইতে চারিটী লোক্য প্রতিপালন করিতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর পর পরিবারের জন্য কোন অর্থই রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয় না।

আমেরিকার মেট্রোপলিটান লাইফ ইনশিওরান্স কোম্পানী সম্প্রতি ঐ দেশের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তাহার পারিবারিক ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ঐ বীমা কোম্পানীর ১৯২৮ সনের রিপোর্টে প্রকাশ যে, প্রতি বৎসর আমেরিকার উপার্জ্জনক্ষম লোকের মৃত্যুর ফলে ৪ লক্ষ বিধবা ও ১৬ বছরের নিম্নতন বয়সের ২ লক্ষ বালকবালিকা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ৩৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতেই ক্ষতির অঙ্কটা খুব বেশী হয়; কারণ ইহারা সাধারণতঃ গড়ে প্রত্যেকে ২·৭ জন করিয়া শিশু-সন্তান রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে। এইসকল শিশু এক দিকে তো কোন কাজ করিয়া সংসারের আয় বাড়াইতে পারে না, অন্য দিকে ইহাদের লালনপালনের জন্য বিধবাকে যথেষ্ট খরচ করিতে হয়। ২৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের লোকেরা মৃত্যুর সময় সাধারণতঃ প্রত্যেকে গড়ে ১·১ জন করিয়া পোষ্য রাখিয়া যায়; এবং ২৫ বৎসরের কম বয়স্ক লোকেরা ঐ ধরণের ১·৩ অপোগণ্ড পোষ্য রাখিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। মেট্রোপলিটান জীবন বীমা কোম্পানীর অধীনে বীমাকারী ব্যক্তিগণের রিপোর্ট হইতে এই সকল তথ্য সংগৃহীত হইলেও মোটের উপর আমেরিকার অবস্থা এইরূপই।

শতকরা ৭০ জন পিতা ৩৫ হইতে ৪৪ বৎসরের মধ্যে মারা যায় এবং ইহারা প্রত্যেকে ১৬ বৎসরের কম বয়সের ২ বা ততোধিক পোষ্য রাখিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ½ ভাগ ৩ হইতে ৪টী সন্তান রাখিয়া মারা যায়। শতকরা ৬০ জন পিতা ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে এবং প্রত্যেকে ২ বা ততোধিক সন্তান রাখিয়া যায়। এবং প্রায় ½ ভাগ পিতা ২৫ বৎসরের কম বয়সে মারা যায় ও ঐরূপ পোষ্য রাখিয়া যায়।

২৫ ও ৪৪ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক ১০ জনের ৬ জন টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, হৃদরোগ বা অন্য দুর্ঘটনার জন্য মারা যায়। এই সকল কারণে যথাক্রমে শতকরা ২২·৭, ১২·৬, ১১·৫ ও ১৪·২ জন লোক মারা যায়।

ব্যালফোর কমিটির রিপোর্ট

বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে ব্যালফোর কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার শেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাহাদের ছয় ভলিউমে প্রকাশিত প্রকাণ্ড রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই শেষ রিপোর্ট ৩০০ পৃষ্ঠায় কেবল এই কয়টী বিষয় সম্বন্ধে অভিমত দিয়াছে,—বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ করিবার পন্থা, মাল-উৎপাদনের বিভিন্ন উপায়, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার উপায় এবং এই শেষোক্ত বিষয়ে ব্রিটিশ শুল্কনীতি।

যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বেকার এবং যুদ্ধের সময়ের ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিলাতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে। এই বাণিজ্যের উপরই বিলাতের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কাজেই কি করিলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারা যায় তাহার উপায়-নির্দ্ধারণই ব্যবসায়ের উন্নতির প্রথম সোপান। কমিটির রিপোর্টে এই বিষয়েই আলোচনা করা হইয়াছে। কমিটির মতে উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উচ্চ শিক্ষার প্রচার দ্বারা উন্নতির ইচ্ছা জাগাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে কেন উন্নতি হয় না। কমিটির মতে ব্যাঙ্কের দোষে বা লোকের সহানুভূতির অভাবের জন্যই যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় তাহা নহে। কতকগুলি ব্যবসা বরাবর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে সেই জন্য ব্যাঙ্কে উপযুক্তরূপ জামীন দিতে পারিতেছে না, অথবা আশানুরূপ মূলধন তুলিতে পারিতেছে না। অতএব দুই তিনটী ব্যবসায় একত্র মিশিয়াই হউক অথবা যে কোন উপায়েই মূলধন বাড়াইতেই হইবে। একবার তরসা করিয়া নামিলে পরের কাজগুলি অনায়াসে হইয়া যাইবে। কমিটির মতে আর একটী উন্নতির অন্তরায় হইতেছে ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সহানুভূতির অভাব। কমিটি বলেন যে, শ্রমিকদিগকে যৌথ কারবারের অংশীদাররূপে বিশ্বাস করিলে তবে ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উন্নতি হইবে। কারবারের মালিক, ম্যানেজার, মজুর সকলকেই ব্যবসায়ের অবস্থানুযায়ী আপনা-

দিগকে পরিবর্ত্তনশীল করিতে হইবে। যৌথ কারবারের প্রত্যেককেই নিজের সাধ্যমত শ্রম করিতে হইবে, তবেই ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। অতএব শ্রমিকদিগের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মাহিয়ানাও বাড়াইতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড্ ইউনিয়নগুলার কার্য্য-বিবরণী

যুক্তরাষ্ট্রের "বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিষ্টিক্স" হইতে বর্ত্তমান সময়ের বিপুল মজুর-আন্দোলন সম্বন্ধে সকল বিষয় ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া একটী সুন্দর বিবরণী বাহির করা হইয়াছে।

মজুরদের মাহিয়ানা, কার্য্যের ঘণ্টা এবং সর্ত্ত ছাড়া আরও যেসব বিষয়ে মজুর আন্দোলন হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সে সব বিষয় এই বিবরণীতে বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। অর্থনীতির দিকে পুরা লক্ষ্য রাখিয়া এই আন্দোলন কি ভাবে গোড়া হইতে বাড়িয়া উঠিতেছে, বিবরণীতে তাহার নিম্নলিখিতরূপ খসড়া দেওয়া হইয়াছে :—

মজুরদের প্রথমে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলেই, তাহার পর তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেওয়া যায়। এবং তাহার পর ক্রমে সেই সমস্ত সুখ সুবিধা কাজে লাগাইবার উপায় ঠাওরাইতে হয়। সুখ সুবিধার মধ্যে ধরা যাইতে পারে :—

মজুর সমিতির সভ্যেরা যাহাতে সহজে টাকা ধার পাইতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রের ভিতর স্থানে স্থানে মজুর ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস স্থাপন করা, বাড়ী তৈয়ারী ও কর্জ্জ বিষয়ের সঙ্ঘ-স্থাপন, আইন বিষয়ে সাহায্য বিভাগ খোলা, গৃহদ্রব্য সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য, বিদেশ হইতে মাল খরিদে সহায়তা, সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি মজুর হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন। সমিতি মজুরদের জন্য আরও কতকগুলি পন্থা অনুসরণ করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে ধরা যাইতে পারে—রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্ত প্রকার বীমা বিভাগ খোলা, মজুরের স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি খোলা, ইহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং মজুরদের উপযুক্ত বিশ্রাম উপভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। দেশের শিল্পের অবস্থায় কিছু কিছু মন্দা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত মজুর সমিতিকে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য বেশ লড়ালড়ি করিতে হয়। সুতরাং এই অবস্থায় পড়িয়াও যাহাতে সমিতির পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কঠিন না হয়, সেজন্য সমিতির মাতব্বরদের নানা রকম উপায় ঠাওরাইবার জন্য সময় খুব বেশী থাকা দরকার। সমিতির কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের শিল্পেরও যাহাতে কল্যাণ-সাধন হয়, সে সমস্ত বিষয়েও তাঁহাদের মাথা ঘামান দরকার। ১৯২৭ সনের বসন্তকালে সুচালিত মজুরদের তত্ত্বাবধানে যে একটী বেকার-সমস্যা-বিষয়ক সভা ডাকা হয়, তাহাতে মজুরদের একজন প্রতিনিধি বলেন যে, সমিতি যে শুধু সমিতি-পরিচালনায় ব্যস্ত থাকিবে সেদিন চলিয়া গিয়াছে। আজকাল সমিতি-গুলার কার্য্যাবলী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে, তাহার কর্ম্মচারীরা সময় করিয়া সমিতির অর্থ-নৈতিক এবং শিল্প-বিষয়ক কল্যাণের জন্য রীতিমত মাথা ঘামাইতে পারেন। বেকার-সমস্যা দূরীকরণ এই কল্যাণ-চিন্তার একটী অঙ্গ।

সমিতিগুলার এই আধুনিক চেষ্টা রাষ্ট্রের উন্নতির পক্ষে খুব সুফলপ্রদ সন্দেহ নাই, তবে বর্ত্তমান সময়ে এমন কতকগুলা সমিতিও আছে যাহারা মজুরদের মাহিয়ানা, কাজের ঘণ্টা এবং সর্ত্ত বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা, ধর্ম্মঘটের এবং কাজবন্ধের বাবদ মজুরদের ভাতা সংগ্রহ এবং কারখানার কাজে মৃত্যুজনিত ভাতা সংগ্রহ বাদে সমিতির উন্নতি-কল্পে অন্যান্য চেষ্টাকে তত প্রয়োজনীয় মনে করে না। কিন্তু সমিতির কার্য্যকলাপ ক্রমশঃ যতই বিস্তৃতিলাভ করিবে, ইহাদের সভ্যদের পক্ষে ততই মঙ্গল আশা করা যাইতে পারিবে।

সমিতিগুলা মজুরদের সুবিধার জন্য অনেক কাজ করিয়াছেন। ধর্ম্মঘট এবং কাজ বন্ধ রাখিবার ফলে যে সমস্ত মজুর ভাতা পাইবার যোগ্য, তাহাদের তালিকা প্রথমে করা হয় এবং তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের পরেই মৃত্যু-জনিত ক্ষতি বেশীর ভাগই পূরণ করা হয়। রোগ এবং অসামর্থ্যজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও তাহাদের খসড়ায় আছে। সমিতিগুলা অন্যান্য

বিষয়ে সুখ-সুবিধার জন্য যাহা করিয়াছেন, সে বিষয়ে বিবরণীতে নিম্নরূপ লেখা আছে :—

কতকগুলা সমিতিতে সভ্যদের মৃত্যুর পর তাহাদের পরিবারদের জন্য কিছু ভাতা দিবার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন সমিতির সভ্যেরা কেহ কঠিন রোগে ভুগিলে তাহাদের কিছু কিছু নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করেন, অথবা তাহাদের স্বাস্থ্যাগারে রাখিয়া খরচ দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সমিতি হয় নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করেন, না হয় তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা নিয়মিত অথবা সময়মত সমস্ত স্বাস্থ্যাগারকে কিছু কিছু চাঁদা দেন এবং তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত থাকে যে, দরকার হইলে তাঁহাদের সভ্যদের সেই স্বাস্থ্যাগারে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার কোন কোন সমিতি কতকগুলা শিল্প-জনিত বিশিষ্ট অসামর্থ্যের দরুণ সভ্যদের ভাতা দিয়া থাকেন। যে সমস্ত সমিতির উক্ত প্রকারের কোন বাঁধাবাঁধি ভাতার ব্যবস্থা নাই, তাহাদেরও এক একটী করিয়া সাহায্য-তহবিল থাকে, তাহা হইতে নিতান্ত অর্থ-কষ্টের সময় সাহায্য পাইবার যোগ্য সভ্যদের বিশিষ্ট ঘটনা দেখিয়া অর্থসাহায্য করা হয়। জাতীয় সমিতিগুলা হইতে সভ্যদের এই সমস্ত সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে স্থানীয় সমিতিগুলাও তাহাদের কিছু কিছু সাহায্য করেন। কোন কোন সমিতির তত্ত্বাবধানে সভ্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বৎসর-ব্যাপী বাৎসরিক ভাতার (এন্থইটী) ব্যবস্থা করা হয়। যে সমস্ত সভ্য, বার্দ্ধক্য, রোগ অথবা অসামর্থ্যের দরুণ কাজ করিতে অক্ষম তাহাদের এই তহবিল হইতে সাহায্য করা হয়। কোন কোন বড় গোছের জাতীয় সমিতি বৃদ্ধ সভ্যদের জন্য একটী সাধারণ বাসঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অবসরপ্রাপ্ত সভ্যদের, নির্দ্দিষ্ট ভাতা অথবা এই বাসগৃহে বাস, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়। এই প্রকারের ব্যবস্থা বড় বড় অর্থশালী সমিতি গুলার দ্বারাই সম্ভব। দিন দিন এই সাহায্যের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায়, কালে ইহা এত বেশী হইয়া দাঁড়ায় যে, খুব বড় এবং অর্থসম্পন্ন সমিতি না হইলে বেশী দিন এই সাহায্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, মাত্র ৭৩টী জাতীয় সমিতি হইতে ১৯২৭ সনে সভ্যদের মোট প্রায় ২৫,০০০,০০০ ডলার উপরোক্ত প্রকারের সাহায্য দেওয়া হয়। এ ছাড়া ৩,০০০,০০০ ডলারের বেশী বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়া হইয়াছে, প্রায় ৫০০,০০০ ডলার বৃদ্ধ সভ্যদের বাসস্থানের দরুণ ব্যয় হইয়াছে। ইহা ছাড়া বেকার সভ্যদের জন্য স্থানীয় সমিতি-গুলা যে কত সাহায্য করিয়াছেন তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত সাহায্য-সংখ্যা একত্র করিলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সমিতিগুলা মজুর সভ্যদের সাহায্যের জন্য কিরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছেন তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

নিউ ইয়র্ক লেবার বিউরোর ইতিহাস

১৮৮৩ সনের মে মাসে নিউ ইয়র্কে বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্স নামক প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের জন্য এক আইন পাশ করা হয়। এই বিউরো মাত্র দুইজন লোক ও তাহাদের বার্ষিক বেতন বাবদ ৩৭ শত ডলার ও অন্যান্য খরচের জন্য তিন হাজার ডলার লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে এই লেবার বিউরোর কর্ম্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ১৯২৮ সনের ৩০শে জুনের হিসাবে দেখা যায়, বর্ত্তমানে এই লেবার দপ্তরের অধীনে ১ হাজার ৩৬ জন কর্ম্মচারী খাটিতেছে ও শ্রম-বিষয়ক তথ্য-সংগ্রহের কাজে কমসে কম ২৫ লক্ষ ডলার খরচ করা হইতেছে।

ইহার হেড্ আফিস নিউইয়র্ক সহরে; কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য নিউ ইর্কে, বাফেলো, রচেষ্টার, সিরাকিউজ ও আলবানি নামক স্থানে ইহার ৫টি কেন্দ্র আছে। ২ লক্ষ কার্য্য ও ৩০ লক্ষ শ্রমিক লইয়া ইহার কারবার।

শ্রম-বিষয়ক আইনকানুন প্রবর্ত্তন করা ও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করাই এই লেবার বিউরোর প্রধান কাজ। ইহার তদন্ত-বিভাগের হাতে শ্রম আইন প্রবর্ত্তনের ভার দেওয়া হইয়াছে। লেবার ইনস্পেক্টারদের প্রবর্ত্তিত আইন কানুন অমান্য করিলে আইন-লঙ্ঘনকারী কার্য্যের উপর সরকারী লেবার বিউরোর আফিস হইতে সরকারী

হুকুম জারি করা হয়। সন সনে ঐ ধরণের তিন লক্ষ নোটিশ জারি করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ দুই উপায়ে সরকারী শ্রম-আইন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয়। (১) প্রথমতঃ, লেবার ইনস্পেক্টারগণ বিভিন্ন কার্খ অনুসন্ধান করিয়া আইন-লঙ্ঘনকারী কার্খের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন ও তাহাকে নোটিশ দেন। (২) পরে আদালতের আশ্রয়ে উক্ত কার্খকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য অর্থদণ্ড করা হয় ও শ্রম আইন মান্য করিতে বাধ্য করা হয়।

সন সনে আদালতে ৪০৪৪টি কার্খের বিরুদ্ধে শ্রম আইন অমান্য করার জন্য নালিশ রুজু করা হয় ও আদালত হইতে ইহাদিগকে ৩৩,২০১ ডলার জরিমানা করা হয়। এই সকল কার্খের কৃত অপরাধের অর্দ্ধেকই স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্পর্কিত আইন অমান্য করণ।

ক্ষতিপূরণ আইন

শিল্প কারখানায় দৈব দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার নিমিত্ত লেবার দপ্তরের অধীনে এক স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। ঐ বিভাগ কর্ত্তৃক (১) কারখানার মালিক, শ্রমিক ও ডাক্তারের নিকট হইতে দুর্ঘটনার বিবরণী সংগৃহীত হয়। (২) ঐ সকল বিবরণী পরীক্ষা করিয়া কোন শিল্প বোর্ড বা পঞ্চায়েতের মীমাংসার জন্য ঐ বিভাগ কর্ত্তৃক একটা রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। (৩) পঞ্চায়েৎ বা শিল্প বোর্ডের অধিবেশনের আয়োজন করা ও সংশ্লিষ্ট পার্টিদিগকে নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণের মীমাংসা জ্ঞাপন করা হয়। এবং (৪) দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯২৭ সনের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসর শিল্প-কারখানার মালিকগণ ৫১৮,২৯৭টী দুর্ঘটনার রিপোর্ট দিয়াছিলেন এবং ইহাদের সকলগুলিতেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ঐ সনে ৪১৪,১২৮টি মোকদ্দমার শুনানী হয় ও ১৮৭,৩৬৮টি মোকদ্দমায় ডিক্রি বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ঐ সনে ৫০ হাজার ডাক্তারী পরীক্ষা হয়। ঐ সনে ৯৮,১৮৪ জন শ্রমিক এক সপ্তাহ বা ততোধিক কালের জন্য কার্খে অক্ষম হইয়া পড়ে ও তাহাদের ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

ভারতে ব্যাঙ্ক প্রসার

[কলীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির অন্যতম সদস্য ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের অবৈতনিক সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম,এ; পি-এইচ্,ডি মহাশয়ের সহিত লেখকের ব্যাঙ্ক বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হইল। —শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

প্রঃ—আপনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির কখনো ঠিক সমাধান হবে না, যতদিন না এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়, আর হাজার হাজার ব্যাঙ্ক দেশটাকে ছেয়ে ফেলে। প্রথমটার তাৎপর্য্য না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উপর আপনি এত জোর দিচ্ছেন কেন?

উঃ—ওটাই ত দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড। ওকে আশ্রয় করেই যে দেশের কৃষি-বাণিজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠবে। দেশমাত্রেরই জীবনী-শক্তির কেন্দ্র হচ্ছে তার কৃষি এবং শিল্প। একটা দেশের লোক কি খাবে, কি পরবে তা নির্ভর করে তার ধনদৌলতের উপর,—আর 'ধনদৌলত' কথাটা হচ্ছে দেশের কৃষি এবং বিবিধ শিল্পজাত যে পণ্য তারই নামান্তর। বিদেশী আমদানি মাল আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু সেটাও ত অমনি আসে না। তার জন্যও আমরা একেবারে সমান দাম কষে আমাদের দেশী মাল রপ্তানি করে থাকি। তাহ'লে একথা নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, একটা দেশের কৃষি-শিল্পই সেই দেশবাসীর জীবনযাত্রার ধারা নির্দ্দেশ করে দেয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, বর্ত্তমান জগতে এই কৃষি শিল্প বা বল সব কিছুর অবস্থা নির্ভর করে দেশের আর্থিক বলের উপর। সে জন্যই ত হাজার হাজার ব্যাঙ্ক চাই।

প্রঃ—আপনার কথায় কেমন একটু খট্কা লাগ্‌ছে। আমি ত দেখুন চাষবাসের ধারও ধারি নে, আর ক্যাইয়ী চালানো ত আমার পক্ষে স্বপ্ন দেখা বল্লেই চলে, তবু ত মনে হয় 'বেশ আছি'।

উঃ—কিন্তু তবু ওই যেন থাকাটা দেশের কৃষি শিল্পের অবস্থা বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ নয় জেনো।

প্রঃ—সেটা না হয় বুঝলাম—আমি একটা ব্যবসা-সঙ্ঘের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আছি বলে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের চাকুরী যারা করছেন তাঁদের বেলায় আপনার যুক্তি খাটে কি করে?

উঃ—কেন? সেখানেই বা গোল বাধবে কেন? গভর্ণমেণ্ট যে টাকা খরচ করে সেটাও ত ভুঁইফোড় হয়ে আসে না। সেটাও আদায় করে নিতে হয় এই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য থেকেই। গভর্ণমেণ্টের আয়ের ব্যবস্থাগুলি একটু বিশ্লেষণ করলেই তা বুঝতে আর মুস্কিল হবে না। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দেখ্‌বে যে দেশের সবারই খোরপোষ যোগাচ্ছে ওই কৃষি, শিল্প আর বাণিজ্য।

প্রঃ—আচ্ছা তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বলতে আপনি যেন প্রথম দু'টার ওপরেই একটু বেশী জোর দিচ্ছেন মনে হয়।

উঃ—যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত হবে কাকে নিয়ে? আগে কৃষি এবং শিল্প পণ্য উৎপাদন করবে তবেই না যান্ত্রিকরণ হবে?

প্রঃ—তাও বটে। কিন্তু দেশের কৃষি শিল্প তার অর্থ-বলের উপর নির্ভর করে একথা আপনি বলছেন কেন? এ সবের জন্য মাটী চাই—মাল মসলা চাই—মজুর চাই। শুধু টাকার জোরেই ত কৃষি-শিল্প গড়ে তোলা যায় না।

উঃ—তা ঠিক, কিন্তু নির্ভরশীলতার দিক্ থেকেই যাচাই করতে গেলে দেখবে যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতি সব চাইতে বেশী নির্ভর করছে ওই টাকার ওপরেই—যাকে তোমরা বল "মূলধন সমস্যা"। আমাদের দেশের মাটীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অনেক স্থলেই হ্রাস পেয়েছে। এর জন্যেই উন্নতি করবার দরকারও হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু তার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা তুমি করতে যাবে, দেখবে তা এই টাকা-কড়িরই ব্যাপার। জলসেচন বল, আর আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহারই বল সবই নির্ভর করছে ওই টাকাপয়সার ওপর। আর মজুর সম্বন্ধে দেখবে যে, এখন দেশের মজুর-সমস্যার চাইতেও বড় সমস্যা হচ্ছে মূলধন। মূলধনের যোগাড় হলে ও কল কারখানা গ'ড়ে তুললে মজুরের অভাব থাকবে বলে মনে হয় না। তাই ত বলছিলাম যে, দেশের কৃষি কিংবা শিল্পের অবস্থা এখন নির্ভর করছে তার আর্থিক বলের ওপর।

প্রঃ—কিন্তু সে জন্য অনেক ব্যাঙ্ক চাই কেন?

উঃ—এরাই ত সেই অর্থ-বলকে কেন্দ্রীভূত করে তাকে কার্য্যকর করে তুলবে।

প্রঃ—কেন, এরা ত আর নূতন করে টাকা তৈরী করে না? আপনার, আমার, আর পাঁচ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েই ত এরা কারবার করে। এ ত ঠিক হাতফেরানো গোছেরই কাজ হ'ল।

উঃ—ঠিক তা নয়, এ থেকে যে একটা বিশেষ শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাপারটা একটা প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছি। স্বল্পতোয়া নির্ব্বরিণীর পৃথক শক্তি নাম্মাত্র। কিন্তু তারই কয়েকটা মিলে যখন একটা বিস্তীর্ণ বেগবতী নদীর সৃষ্টি হয়, তখন তার একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে, শুধু বিস্তৃতির দিক্ থেকেই নয়, শক্তির দিক্ দিয়েও,—তাতে বড় বড় ষ্টীমার জাহাজ পর্য্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দেখেছ ত?

প্রঃ—নদীর বেলায় সেটা বোঝা যায় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক কেমন করে এমনি ধরণের শক্তি সৃষ্টি করে?

উঃ—ওই ঠিক একই ভাবে। তোমার কাছে যখন একটা টাকা থাকে, তখন তার কতখানি কিম্বৎ থাকে তুমি মনে কর? কিন্তু সেই টাকাটাই তুমি যদি ব্যাঙ্কে জমা করে দেও, আর তোমারি মত দেশের এক কোটি লোক তাই করে, তখন তারই কেরা-মতিতে দু'দশটা চটকল, কটন মিল চালানো সম্ভব হতে পারে। ব্যাঙ্ক না হলে এ শক্তি যোগাবে কে?

প্রঃ—কেন, ব্যাঙ্ক এই সব ফাটকী মিলকে টাকা ধার দেয় বলে? তাতে ব্যাঙ্ক না থাকলেই বা কি? কোন একজন লোকেরই যদি অনেক টাকা থাকে তবে সে ত পাঁচ জনের কাছ থেকে জমা না নিয়েও ধার দিতে পারে।

উঃ—তা পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গোটা দেশের কৃষি-শিল্পের টাকা যোগাতে পারে এমন অনেক লোক থাকা সম্ভব নয়।

প্রঃ—কিন্তু আমাদের দেশে ত অনেক মহাজন রয়েছেন, যাঁদের টাকা-খাটানোই হচ্ছে পেশা। ধার দেওয়াই যদি ব্যাঙ্কের বড় কাজ হয়, তবে ত এই মহাজনদের দেখে বলতে হয় যে, আমাদের দেশে বিস্তর ব্যাঙ্ক রয়েছে।

উঃ—না, এইখানে তোমার চিন্তার মধ্যে মস্ত একটা গোল রয়ে গেছে। সাবেক আমলের কথা ছেড়ে দাও, বর্ত্তমানে আমরা ব্যাঙ্কিং বলতে যা বুঝি সেটা ঠিক দেশী কারবারের সামিল নয় জেনো। আগে যে প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ টাকাপয়সা লেনদেন করত

তাকেই বলা হ'ত ব্যাঙ্ক। এখন আর এই সাবেক পরিচয় দেওয়া চলে না। সেজন্যই ইংরেজীতে একটা নূতন শব্দ ব্যবহার হচ্ছে, তার নাম হল 'ক্রেডিট্'। ইংরাজীতে ব্যাঙ্ককে বলা হয় টাকা পয়সা লেনদেনকারী এবং ক্রেডিট উৎপাদক প্রতিষ্ঠান। এই ক্রেডিট্ উৎপাদনই হচ্ছে আধুনিক ব্যাঙ্কিংএর বিশেষত্ব। এটা নেই বলেই মহাজনদের ঠিক ব্যাঙ্ক বলা চলে না।

প্রঃ—কিন্তু এই ক্রেডিট্ জিনিষটা কি তা তো ঠিক বোঝা গেল না।

উঃ—এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস বা আস্থা। ব্যবসা জগতে এখন এ শব্দটাকে যেমন করে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে একে টাকা পয়সারই সামিল করে নেওয়া যেতে পারে। টাকা পয়সার মত এও জিনিষপত্র কেনা বেচার সহায়তা করে থাকে।

প্রঃ—বিশ্বাস জিনিষটা তো অমূর্ত্ত বস্তু বলে জানি, ওটাকে টাকাপয়সার মত ভাবি কি করে?

উঃ—হাঁ, বিশ্বাস জিনিষটা অমূর্ত্ত বটে, কিন্তু যেমন করে এর সহায়তায় জিনিষ কেনাবেচা চলে সেটা একেবারে অলৌকিক ব্যাপার কিছু নয়। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই কতকগুলি নিদর্শনপত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তারই বিনিময়ে জিনিষ কেনাবেচা চলে। কিন্তু যেটা নিদর্শন তা নিদর্শনই; আসল জিনিষ, যার বলে দ্রব্যবিনিময় সম্ভব হচ্ছে, তা কিন্তু ওই বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—কিন্তু ব্যাঙ্কের ওই নিদর্শন-পত্রগুলি লোকে নেবে কেন?

উঃ—ঠিক যে জন্য দোকানী তোমার কাছে জিনিষ বেচে পাঁচ দশ একশ' টাকার নোট নিতে রাজী হয়। সেখানে যে ওই নোটের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের এমন প্রতিশ্রুতি লেখা আছে যে, কোন ট্রেজারীতে নিয়ে গেলেই নোটের বদলে টাকা দিয়ে দেবে। তাই না নোটগুলিকে আমরা টাকারই সমান মনে করি? কিন্তু আসলে নোটগুলি চলছে ত ঠিক বিশ্বাসের ওপর ভর করেই। ওটা ত একটা নিদর্শন-পত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—তা'হলে এই দাঁড়াল যে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট-উৎপাদক প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক হতে হলে তাকে নোট ছাপাতে হবে—তাই ত?

উঃ—তা' কেন? নোট ক্রেডিট্ বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল বটে—কিন্তু তাই বলে বিশ্বাসের যে আর কোন রকম নিদর্শন থাকতে পারে না,—এমন কথা বলা হয় নি। নোটের কথা বলেছি শুধু দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই। যে সব ব্যাঙ্ক নোট ছাপায় তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই বিশ্বাস-মূলক কারবারের ব্যবস্থা অন্য রকম। তাদের নিদর্শনপত্রও অন্যরূপ।

প্রঃ—একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কি?

উঃ—মনে কর আমি একটা ব্যাঙ্কের কাছে কয়েকদিনের খরচ চালাবার জন্য হাজার টাকা ধার চাইতে গেলাম। সে আমাকে শুধু এক হাজার টাকা দিতে পারে কিংবা তুমি যা ভাবছো হাজার টাকার একখানা নোটও দিতে পারে, যাতে লেখা থাকবে যে, ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে দাবী করলেই ব্যাঙ্ক তার নোটের বদলে টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা ব্যবস্থা হতে পারে। ধর সেই ব্যাঙ্কই আমাকে একখানা চেকবই দিয়ে বল্লে "আপনি এই চেকবইটা নিন, জিনিষ কেনাকাটার জন্যই ত ধার নেওয়া। তা আপনি হাজার টাকা পর্য্যন্ত যখনখুসী চেক লিখে পাওনাদারদের দিয়ে আপনার কাজ চালিয়ে নেবেন, তারা আপনার চেক নিয়ে টাকা দাবী করতে এলেই আমরা তা দিতে বাধ্য থাকব"। এই যদি হয়, তবে নোটের বদলে চেক দিয়েও ত আমার কাজ সমানই চলতে পারে।

প্রঃ—তা বটে, কিন্তু ছুটো এক হ'ল কি করে?

উঃ—ছুটোর মূলেই রয়েছে ওই বিশ্বাস। তফাৎ যা মনে হচ্ছে সেটা ওই নিদর্শনপত্রের ব্যবস্থায়। একটা নোট—আর একটা চেক। এর পর দেখবে

যে হুণ্ডী, বিল এগুলিও বিশ্বাসমূলক নিদর্শনপত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—সে কেমন করে হবে? নোট চেক দিয়ে না হয় যখন তখন জিনিষ কেনা সম্ভব হতে পারে, তাই বলে হুণ্ডী বিল দিয়ে ত আর তেমন করা সম্ভব নয়।

উঃ—তোমার ওই বাইরের সামান্য একটু প্রভেদই বেশী করে চোখে পড়ছে। একটু বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা কর, দেখবে সবগুলির মূলেই রয়েছে ওই বিশ্বাস, আর সবগুলির কাজও হচ্ছে এক, অর্থাৎ দ্রব্যবিনিময় ব্যাপারটাকে সহজ এবং সুসাধ্য করে দেওয়া। এই দ্রব্যবিনিময়ের একটা বিশেষ রূপকেই আমরা নাম দিয়ে থাকি ব্যবসা এবং বাণিজ্য—যা থেকে এই হুণ্ডী কিংবা বিলের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা এও বোঝা গেল। কিন্তু ব্যাঙ্কের আর হুণ্ডীর মধ্যে বিশ্বাসের যোগাযোগ কোথায়?

উঃ—কেন, এর আগাগোড়াই ত বিশ্বাসের ব্যাপার। ব্যবসাদার যখন ব্যাঙ্কের কাছে হুণ্ডী ভাঙাতে যায় তখন ব্যাঙ্ক টাকা দেয় কেন?—তার উপর বিশ্বাস আছে বলেই না? তা না'হলে হুণ্ডীটা যে একেবারে বুজরুকী নয় তার ভরসা কি আছে?

প্রঃ—এও বুঝলাম। কিন্তু এই ক্রেডিট্ উৎপাদন করার জন্য ব্যাঙ্ক এমন কি সুবিধা করে দেয়, যা অন্যথা সম্ভব হতে পারে না?

উঃ—টাকাকড়ি দিয়ে মানুষের যা সুবিধা হয়েছে, ক্রেডিটেও ঠিক তাই হচ্ছে। য়ুরোপ আমেরিকায় আজকাল নগদ টাকার জোরে যে পরিমাণ ব্যবসা শিল্প চলছে তার অনেক বেশী চালাচ্ছে এই ক্রেডিট। দেশের অর্থবল বাড়াবার পক্ষে এ রকম চমৎকার ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। তুমি একটু আগে বলছিলে যে, ব্যাঙ্কের কাজ হচ্ছে শুধু দেশের টাকা হাতফেরানো গোছের একটা কিছু। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ যে শুধু টাকা জমা নিয়ে তাই ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ নয়। ব্যাঙ্ক ক্রেডিট দিয়ে দেশের ধনশক্তির আয়তন বাড়িয়ে দেয় ও দেশের শিল্প-বাণিজ্যে তার ব্যবহার করে তাকে কার্য্যকরী ক'রে তোলে।

প্রঃ—তবে আর নগদ টাকাকড়ির বিশেষত্ব কি রইল,—ইচ্ছামত ক্রেডিটে লেনদেন করলেই ত চলতে পারে?

উঃ—ঠিক তা নয়, ক্রেডিটে যে পরিমাণ লেনদেন চলে তার মূলে কিন্তু রয়েছে নগদ টাকাকড়ির ব্যাপার। ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে যে সব ক্রেডিট্ বা বিশ্বাসমূলক নিদর্শনপত্রের ব্যবহার দেখতে পাবে, তা যতবারই হাতফের হোক, তার মধ্যে এ প্রতিশ্রুতি কিন্তু আছেই যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে দাবী করলেই তার বিনিময়ে নগদ টাকা পাওয়া যাবে; তাই না এসব নিদর্শনপত্রের চল বজায় আছে।

প্রঃ—তাই যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে নগদ টাকা মজুত রাখতে হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই।

প্রঃ—তবে আর ক্রেডিট সৃষ্টি করে ব্যাঙ্ক নূতন কি সুবিধা করে দিয়েছে? যে কাজটা নগদ টাকায় চলতে পারত সেটাকে সোজাভাবে না চালিয়ে একটু বাঁকা করে চালানো হচ্ছে—অর্থাৎ কিনা নগদ টাকা ব্যবহার না করে, সেটাকেই মজুত রেখে তার বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে কতকগুলি নিদর্শন-পত্র—তা সে নোটই হোক আর চেকই হোক্। এতে দেশের আর্থিক বল পুষ্ট হয় কি করে?

উঃ—কেমন করে পুষ্ট হয় জানো? ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ টাকা মজুত রাখে, তার অনেক বেশী পরিমাণ টাকার কাজ ক্রেডিটে চালিয়ে নেয়—একেবারে তিন চার গুণ পর্য্যন্ত।

প্রঃ—সেটা সম্ভব হয় কি করে?

উঃ—ব্যাঙ্ক তার অভিজ্ঞতার ফলে ঠিক করে বুঝে নেয় যে ঠিক কি পরিমাণ টাকা রাখলে সে তার প্রতিদিনকার নিদর্শনপত্রের দাবী মিটাতে পারবে। সেই পরিমাণ টাকা মজুত রেখেই সে কাজ চালিয়ে নেয়। এতে যে তার খুব দায়িত্ব কিংবা বিপত্তি ঘাড়ে তুলে

নিতে হয় তাও নয়। আর এক দিন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

প্রঃ—আচ্ছা এ না হয় বোঝা গেল যে ব্যাঙ্ক দেশের ধন-শক্তিকে পুষ্ট করে দেয়। কিন্তু আপনি বলছিলেন যে ব্যাঙ্ক দেশের ধনশক্তিকে কার্য্যকরী ক'রে তোলে, তার মানে কি?

উঃ—তার মানে অতি সোজা। দেশের পাঁচজনের কাছে যে টাকাটা অমনি পড়ে থাকে, ব্যাঙ্কে সেটা জমা দিয়ে দিলে ব্যাঙ্ক সেই টাকাই দেশের কৃষি শিল্প পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ধার দিয়ে দেশের কৃষিশিল্পের সমৃদ্ধিতায় খাটাতে পারে। এতে দেশের ধন-সৌলতের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে, অথচ কোন পক্ষেরই লোকসান নেই। যে টাকা জমা রাখে সেও কিছু সুদ পায়, জমা টাকা একটু বেশী সুদে ধার দেবার জন্য ব্যাঙ্কেরও কিছু লাভ থাকে। আর যারা টাকা ধার নেয় তারাও কৃষি শিল্পে খাটিয়ে সুদের দাবী মিটিয়েও উদ্বৃত্ত লাভ অর্জ্জন করে থাকে।

প্রঃ—তবে ত দেখছি ব্যাঙ্ক দিয়ে অনেক সুবিধা হতে পারে। তাই বুঝি আপনি বলছিলেন যে, ব্যাঙ্ক দিয়ে দেশটাকে ছেয়ে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে। কেন, আমাদের দেশে কি যথেষ্ট ব্যাঙ্ক নেই?

উঃ—যথেষ্ট কি বলছ? একেবারে মুষ্টিমেয় বললেই বরং ঠিক বলা হয়। আমি কিছু দিন আগের কথা বলছি শোন—তাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় গোটা ভারতবর্ষে মাত্র ৫৯৬টা ব্যাঙ্ক ছিল,—অথচ এই সবই অন্ত পাঁচটা দেশের ব্যাঙ্কের কর্ম্ম দেখ। তখন যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সমষ্টি সংখ্যা ছিল ১১,৯৭৬, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩০,০০০, জাপানে ৭,৪৬৫, ক্যানাডায় ৪,৮৮৩।

প্রঃ—শুধু ব্যাঙ্কের সংখ্যা দেখলেই চলবে কেন? লোক-সংখ্যার অনুপাতে এক এক দেশে কটা করে ব্যাঙ্ক আছে তাও ত যাচাই করে দেখা দরকার।

উঃ—তাতেও ভারতবর্ষের হীনাবস্থাই প্রমাণিত হবে। ওই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেই যেখানে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৮৫, যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ২৪৬, জাপানে ১২ আর ক্যানাডায় ৪৪৮, সেখানে এই ভারতবর্ষে ওই প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্যই গড়ে মাত্র ২টা ব্যাঙ্ক ছিল।

প্রঃ—আচ্ছা ব্যাঙ্কের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা ঠিক ধারণা করে নেবার জন্য বর্গমাইল হিসাবে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের সংখ্যাটা হিসাব করে দেখলে হয় না?

উঃ—বেশ তাই দেখ না, তাতেও বড় সুবিধা মনে হবে না। এই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথাই আবার বলছি। তখন ভারতবর্ষে প্রতি ২,৭০০ বর্গমাইলে মাত্র ১টা ব্যাঙ্ক ছিল, ওই সীমানার মধ্যেই তখন যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৬২, যুক্তরাষ্ট্রে ২০, জাপানে ৮০, ক্যানাডায় ৩৮।

প্রঃ—কিন্তু এদের মূলধনের পরিমাণ কেমন ছিল?

উঃ—যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কগুলির মূলধনের সমষ্টি পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ২৯৬ কোটি, জাপানে ২০১ কোটি, ক্যানাডায় ৪০½ কোটি—আর ভারত-বর্ষে মাত্র ১৫ কোটি;—অবশ্য ভারতবর্ষের বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বাদ দিয়ে।

প্রঃ—ডিপজিট জমার টাকা হয়েছিল কত?

উঃ—যুক্তরাজ্যে হয়েছিল ৩,৭৬৪ কোটি টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ১৫,৫৫৮ কোটি, জাপানে ১,৮৫১½ কোটি, ক্যানাডায় ৬৮৭ কোটি—আর ভারতবর্ষে ১৩১½ কোটি (এও অবশ্য এদেশের এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ডিপজিট বাদ দিয়ে)।

প্রঃ—এ যে সবই কোটি কোটি টাকার ব্যাপার!

উঃ—সে জন্যই এর তাৎপর্য্যটা ঠিক সমঝে নেওয়া কঠিন মনে হচ্ছে। তবু হিসাবটা একটু তলিয়ে দেখলেই তা মানে একেবারে সহজ হয়ে যাবে। আচ্ছা আমিই একটু পাল্টে বলছি। এই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে গড়পড়তা হিসাবে প্রত্যেক লোক ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে ৯০০ টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে

জন প্রতি জমা হয়েছিল ১,৩০৫ টাকা, জাপানে ২১০ টাকা, কানাডায় ১৫০ টাকা—আর ভারতবর্ষে মাত্র ৬৯ টাকা।

প্রঃ—এ সবই ত আপনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের কথা বল্‌লেন?

উঃ—হাঁ, তারপর থেকে এ পর্য্যন্ত সব দেশেরই ব্যাঙ্কের সংখ্যা সামান্য কিছু বদলে গেছে ঠিক, কিন্তু তুলনা-মূলকভাবে অবস্থা প্রায় এক রকমই র'য়ে গেছে।

প্রঃ—তাহ'লে, ব্যাঙ্কের প্রসারে ভারতবর্ষ যে অনেকখানি পিছু হটে রয়েছে দেখছি। এদেশে তা হলে এখন ব্যাঙ্কে প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা দরকার হ'য়ে পড়েছে।

উঃ—এটা বুঝেছ দেখে সুখী হ'লাম। কিন্তু এই মূল কথাটাই যতদিন না আর পাঁচজন বুঝতে পাচ্ছে ততদিন এ দেশের আর্থিক উন্নতি করা দুঃসাধ্যই থেকে যাবে। গভর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণের তরফ থেকে ব্যাঙ্কপ্রসারের জন্য এখনই যথাসাধ্য চেষ্টা করা দরকার। সুখের বিষয়, এরূপ সম্প্রতি কতক-গুলি প্রাদেশিক ও সেই সঙ্গে একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে গভর্ণমেণ্ট বিস্তৃতভাবে দেশীয় ব্যাঙ্কপ্রসার সম্বন্ধে তদন্ত করবার আয়োজন করেছেন। এর ফলে একটা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটবে এমন আশা করা যেতে পারে।

"দি আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ" (জুন, ১৯২৯)

স্বল্পস্থায়ী কর্জ্জসমস্যা : কনেক্‌টিকাটের অভিজ্ঞতা

এককালে সুদ দেওয়া বা লওয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত ছিল। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ যখন সুদ সম্বন্ধে তাদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া দিল, তখনও অল্প আয়বিশিষ্ট লোকদের কর্জ্জ-সমস্যা সহজ হইয়া যায় নাই। অসময়ে ধার পাইবার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিল আমাদের দেশের মহাজনরা। আমেরিকাতেও এই শ্রেণীর লোকের অভাব-মোচনের জন্য দেখা দিল "লোন শার্ক" বা অর্থ-পিশাচ।

আমাদের দেশের মহাজনরা যেরূপ খুব উঁচু হারে সুদ লইয়া থাকে, আমেরিকার অর্থপিশাচেরাও তদ্রূপ করে। সুতরাং গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অল্প সময়ের জন্য যাতে কম সুদে টাকা ধার পায় তার জন্য আমাদের মত আমেরিকান্‌দেরও মাথা ঘামাইতে হইতেছে। সেখানে একবার যে অর্থপিশাচের হাতে পড়িয়াছে, তার আর উদ্ধার পাওয়া কঠিন। এমন দেখা গিয়াছে যে, অধমর্ণ যত টাকা প্রথমে কর্জ্জ লইয়াছিল তার বহুগুণ টাকা শোধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তার ধার শোধ হয় নাই। এই অবস্থার প্রতীকার-কল্পে আমেরিকা কি করিতেছে এই সময়ে আমাদের তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কাজে লাগিতে পারে। এই দিকে ব্যাঙ্কিং ওয়ত্ত সমিতির দৃষ্টিও আকর্ষণ করা যাইতেছে।

যুগপৎ ক্ষুদ্র ঋণ আইন

যুক্তরাষ্ট্রে ছোট ছোট অধমর্ণদের সহানুভূতিসূচক আন্দোলন অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ তাদের মঙ্গলজনক কিছু সাধিত হইয়াছে। ১৯১০ সনে রাসেল সেজ্ ফাউণ্ডেশন তার 'প্রতীকার ঋণ বিভাগে'র সাহায্যে ছোট ঋণ সম্বন্ধে পঠনপাঠন আরম্ভ করেন। অর্থপিশাচের সাহায্য-ব্যতিরেকে কি করিয়া অভাবগ্রস্ত অধমর্ণের সাহায্য করা যায়, এই ছিল উদ্দেশ্য। এই পঠন-পাঠনের ফলে ইউনিফর্ম স্মল লোনস আক্ট বা যুগপৎ ক্ষুদ্র ঋণ আইনের খসড়া ১৯১৬ সনে তৈরী হয়। অল্প-স্বল্প পরিবর্ত্তনের পর উহা ১৮টি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া আরও ৮টি রাষ্ট্রে অনুরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলিতে সুদের উচ্চতম হার ছিল, অথবা উত্তমর্ণকে একটা ফী ধরিয়া দিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের বেশী রাষ্ট্র কমবেশী এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রাসেল সেজ্ ফাউণ্ডেশনের 'প্রতীকার ঋণ বিভাগে'র অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লিণ্ড এম্ হেণ্ডারসনের মতে ২৪টি রাষ্ট্র ফাউণ্ডেশন প্রণীত আইন গ্রহণ করিয়াছে এবং এই বৎসরের মধ্যে আর ১০।১১টি রাষ্ট্র ইহা বা এতদনুরূপ কোন আইন গ্রহণ করিবে কি না বিবেচনা করিবে।

১৯১৯ সনে কনেক্‌টিকাটের ব্যবস্থা পরিষদে এই আইন গৃহীত হইয়াছে। তারপর ১০ বৎসর গত হইয়াছে। এই দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা যাইবে আইনের উদ্দেশ্য কতটা সফল হইয়াছে। বিশেষভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিরও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মিলিবে : আইন কেন পাশ করা হয়? এই আইনের বলে অর্থ-পিশাচকে কেন ছাড়া করা সম্ভবপর হইয়াছে কি? ইহা অভাবগ্রস্ত অধমর্ণদের সাহায্য

করিয়াছে কি? উহার আর কোন পরিবর্ত্তন বা সংস্কার দরকার আছে কি? থাকিলে কি ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে? কনেক্‌টিকাটের অভিজ্ঞতা হইতে উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পাওয়া সম্ভব কি না?

আইনের সার মর্ম্ম

১৯১৯ সনে যে আইন খাড়া করা হইয়াছিল, তাতে ছিল,—যে কোন ব্যক্তি বা কর্পোরেশন ছোট ছোট ঋণ দেওয়ার ব্যবসা করিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করিতে হইবে ও ১০০ ডলার ফী দিতে হইবে। প্রতি অফিসের জন্য এই ফীই যথেষ্ট নয়, হাজার ডলার করিয়া এক একটা বণ্ডও সই করিতে হয়। আইন অমান্য করিলে এই ফী ও বণ্ড বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। একের অধিক বণ্ড দেওয়া না দেওয়া কমিশনারের ইচ্ছাধীন ছিল। লোন কোম্পানীকে অন্ততঃ দুই বৎসর ধরিয়া কমিশনার বা তাঁর এজেন্টদিগকে খাতাপত্র বা হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য রাখিতে হইত। আইনের ত্রয়োদশ পল্লব অনুসারে ৩০০ ডলারের বেশী কাহাকেও ধার দেওয়া হইবে না এবং সুদের হার হইবে মাসে শতকরা ৩½ ডলার অথবা বৎসরে শতকরা ৪২ ডলার। এইরূপ কোম্পানী হইতে যে ধার লইবে তাকে ইংরেজী ভাষায় লিখিত একটি বর্ণনাপত্র দেওয়া হইবে, তাতে ঋণের পরিমাণ ও সর্ত্তের কথা লিখিত থাকিবে। উত্তমর্ণ কোম্পানী ঋণ-গ্রহীতার মজুরির ১০% এর বেশী মাসে কাটিয়া লইতে পারিবে না, আর উহা কাটিয়া লইতে হইলে অধমর্ণকে দিয়া ঋণ দিবার কালে লিখাইয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ, গরু বাছুর, ঘর গৃহস্থালীর আসবাব অথবা মজুরি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

আইন সংস্কারের প্রচেষ্টা

কনেক্‌টিকাটের আইনটাকে রদ্ করিবার বা পরিশোধিত করিবার অনেক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্কার দুটি মাত্র গৃহীত হইয়াছে।

(১) ব্যক্তির পরিবর্ত্তে একটা কমিশনের হাতে লাইসেন্স দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ১৯২৩ সনের সংশোধনের পর হইতে। কমিশন মানে ব্যাঙ্ক কমিশনার, রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রের কনট্রোলার। কমিশনের হাতে লাইসেন্স দেওয়ার ভার দেওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, কমিশন তার বিচারবুদ্ধি খাটাইবে। কাজের বেলায় কিন্তু কমিশন অনেকটা কলের মত কাজ করে। তবে কমিশনের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার একটা ফল এই হইয়াছে যে, দরখাস্তকারীরা আগের চেয়ে বেশী তৎপরতার সহিত ব্যাঙ্ক কমিশনারের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে।

(২) ১৯২৭ সনে আর একটি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তদনুসারে অধমর্ণ ইচ্ছা করিলে যে কোন দিন তার সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিতে পারিবে, সম্পূর্ণ সময়ের জন্য তাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। অবশ্য যতদিন পর্য্যন্ত সে ঋণটা রাখিয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত সময়ের সুদটাও তাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। এই নিয়মটা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু অধিকাংশ অধমর্ণ এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকায় ইহার সুযোগ লইতে পারিত না।

১৯২৫ সনে ব্যবস্থা পরিষদ সুদের হার ৩% ঠিক করিয়া এক আইন পাশ করিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণর তাঁর ভিটো বা অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তা নাকচ করিয়া দেন।

আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম যখন ক্ষুদ্র ঋণ সম্বন্ধে আইনের কথা উঠে, কনেক্‌টিকাটের ব্যবস্থা-পরিষদের সমস্ত সভ্য তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। এই বিরুদ্ধতা কি করিয়া সপক্ষতায় পরিণত হইল তা ব্যাঙ্কিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জন এন্ ক্রুসএর কথায় বলা যাউক—

যখন বিলটা সুরু করা হইয়াছিল, কমিটির প্রত্যেক সভ্য ইহার বিরুদ্ধে ছিল। কালে ক্রমে সেন্ট ডাইরেক্টদের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অন্য অনেক রাষ্ট্র ইহা গ্রহণ করায়, কমিটির সভ্যেরা একে একে নিজ মত পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ১০ জন লোক তাদের মন পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রকৃস স্বয়ং আবার নিজ মত পরিহার করিয়া ১৯২৫ সনে ইহা রদ্ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কাউন্সেশনের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত উইলবর্থ কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বলেন—

আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে জানি যে, ছোট ছোট ঋণ প্রয়োজন হয়। এমন সময় আসে যখন পীড়িত হইয়া পড়ায় হউক বা অন্য কারণে মানুষের ছোট ঋণের দরকার হয়। তখন কনেক্‌টিকাটের মত শুধে লোকের দয়াপ্রার্থী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তার অভাব মোচনের জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

হিলবর্থ বলেন ছোট ঋণ-সমস্যা সমাধানের উপায় দুইল ৩টি, যথা,—

সরকারী নির্দ্দেশে যে উচ্চতম সীমা আছে তার উপরে যে সব ঋণের সুদের হার সেগুলি রদ্ করিয়া দেওয়া।

ঐরূপ হারে সুদ লইবার অনুমতি দিয়ে উচ্চতর সুনাফার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া।

যে হারে সুদ লইলে ছোট ছোট লোন কোম্পানীগুলিতে খাটান টাকা হইতে সুনাফা উঠিতে পারে সেই সুদ বাহাল রাখা।

বিভিন্ন হিতসাধন-সমিতিগুলি প্রথমতঃ এই আইনের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু তারা যখন তলাইয়া বুঝিল যে, অর্থ-পিশাচেরূপ অমঙ্গলের চেয়ে এই আইন-প্রসূত অমঙ্গল অনেক কম, তখন তারা কমিটির সম্মুখে এই আইন সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

ছোট ঋণের সীমা ৩০০ ডলার পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিবার দুই হেতু আছে। প্রথমতঃ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলার গায়ে হাত না পড়ে এদিকে দৃষ্টি ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ছোট ঋণের ব্যবসায় ঝুঁকি ও ঝুঁকি অনেক বেশী।

কনেক্‌টিকাটে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি

১৯২৩ সনের আগে পর্য্যন্ত ছোট ঋণ দেওয়া নেওয়ার ব্যবসা কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তা ব্যাঙ্ক কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় না। বিভিন্ন স্থান হইতে যেটুকু জানা যায় তাহা দুইল এই :—১৯২১ সনে এই আইন অনুযায়ী ব্যবসা করিতেছিল ৮ টি "চেন" কোম্পানী। হার্টফোর্ড, নিউ হেভেন, ব্রিজপোর্ট ও ওয়াটার বারি, প্রত্যেক স্থানে দুই করিয়া প্রতিষ্ঠান ছিল। কোম্পানী-গুলি আইনভঙ্গ করে নাই। প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ গড়ে ৭০ হইতে ৭৫ ডলার ছিল। ১৯২৩ সনে রাষ্ট্রের ৩৪টী ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান (তন্মধ্যে ২০টিকে সেই বৎসর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে) ৬১,৪৮৪টী ঋণ বাবদ মোট ১০ লক্ষ ডলার ঋণ দিয়াছে।

১৯২৩ সন হইতে রীতিমত হিসাব রাখা সুরু হইয়াছে। সে সময়ে লাইসেন্স-প্রাপ্ত ৪৭টী কোম্পানীর মোট পুঁজি ছিল ১৪,৭১,৪০৪·৬১ ডলার, আর এগুলি ধার দিয়াছিল ২২,৪০,৮০৯·৪০ ডলার। ১৯২৭ সনে ২৩টি লাইসেন্স-প্রাপ্ত কোম্পানী ২৭,০০,৭১৭ ডলার মোট পুঁজি সহ ৪৮,৪৩,৫১১·৭৮ ডলার ঋণ দিয়াছিল। ১৯২৮ সনে এই সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ১২৮·৩৫, ২৭,০৫৬·০ ডলার ও ৫৯,৪২,২২৯·৬৯ ডলার ছিল।

ম্যাসাচুসেট্‌স্ শতকরা মাসিক ৩ ডলার নীতি অনুসরণ করে। সেখানে ১৯২৮ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৩০, পুঁজির পরিমাণ ১,৭৬,১৪, ১৪০·৬৬ ডলার। গোটা বছরে এই কোম্পানীগুলি ২,০৫,৩৮৩টী ঋণ বাবদ ১,৯৭,১৬,৭০৫·২৪ ডলার দিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ম্যাসাচুসেট্‌সে সুদের নিম্ন হার বজায় রাখিয়া কিছু বেশী লাইসেন্স-প্রাপ্ত কোম্পানী কনেক্‌টিকাট কোম্পানীগুলির তিন গুণ ঋণ দান করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কোম্পানীগুলির অবস্থান

১৯২১ সনে ৪টী স্থানের প্রত্যেকটীতে ২টি করিয়া কোম্পানী ছিল, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। ১৯২৮ সনের ১২৮টী কোম্পানীর মধ্যে ৪৩টি নিউ হেভেনে ও মাত্র ৯টি হার্টফোর্ডে। নিউ বৃটেন ৮০,০০০ শিল্প ব্যবসায়ীর বাসস্থল হইলেও সেখানে মাত্র ৪টী কোম্পানী আছে। এইরূপ বিসদৃশ অবস্থানের অর্থ দুই প্রকারে করা যাইতে পারে—হয় কোন কোন জায়গায় অনর্থক কোম্পানী বাড়ান হইয়াছে, নয়ত সুদের হার চড়া বলিয়া কোন কোন স্থানে এইরূপ কোম্পানী প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

লোকে কেন ঋণ লয় ?

এই সব লোন কোম্পানী হইতে লোকেরা বহু বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া থাকে। পীড়া বা মৃত্যুর বাবদ খরচ, কাঠ ও কাপড় কিনিয়া পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, অটোমবিল ক্রয়, ঋণ ও ঋণ শোধ, ভ্রমণ ও ছুটী, নূতন করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ ইত্যাদি ব্যপদেশে লোকে ঋণ লইয়া থাকে।

আইনের ফল

আইনের ফলে অর্থপিশাচদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তা ঠিক ভাবে বলা সহজ নয়। কারণ, তাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য সংগৃহীত হয় না। ১৯১৯ সনে শ্রীযুক্ত হিলবর্ণ সাক্ষ্য দেন যে, নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের অর্থ পিশাচেরা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ষ্টট বলেন যে, প্রকাশ্যতার ফলে উহারা আর ব্যবসা করিতে পারিতেছে না। শ্রীযুক্ত হেণ্ডারসনের মত কিন্তু এই যে, নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রে ১৯২৫ সনে ২½% মাসিক সুদের হার নীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু লোন কোম্পানীগুলি ১৯১৫ সনের চেয়ে ১৯২৮ সনে কম ব্যবসা করিতে পাইতেছে। নিউ ইয়র্কের এটর্নি জেনারেল বলেন, অর্থ পিশাচরা সুদ বাবদ বৎসরে ২½ কোটী ডলার উপার্জ্জন করিতেছে। হেণ্ডারসন আরও বলেন যে, শতকরা মাসিক ৩ ডলার সুদের ফলে মিশৌরির ছোট ঋণ কোম্পানীগুলির ব্যবসা মরিয়া যাইতেছে।

কনেক্‌টিকাট সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে অর্থ-পিশাচেরা যত প্রবল ছিল ও যত ব্যবসা করিত এখন আর তত নাই ও পারে না। ম্যারিল্যাণ্ড সম্বন্ধেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য।

সুদের চড়া হার

মাসে শতকরা ৩½ ডলার সুদের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে শিল্প-ব্যাঙ্কগুলির মত লোন কোম্পানীগুলি নিজেদের আমানত· ধার দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে না, সাধারণতঃ নিজেদের পুঁজি ভাঙ্গিয়াই ধার দিয়া থাকে। কিন্তু ১৯২৭ সনে ব্যাঙ্ক কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি যে, কোম্পানীগুলি ১০,৮৩,২৭৮,৫৪ ডলার ধার করিয়াছিল, ১৯২৮ সনে ১২,৭৩,৭২২,৯৬ ডলার ধার লইয়া কাজ চালাইয়াছিল। লোন কোম্পানীগুলির ৩½% সুদ লইবার পক্ষে অন্য এক যুক্তি এই যে, জামিন রাখিয়াকে ছোট ছোট ঋণ দিবার ব্যবসায় খরচ অনেক, ক্ষতিও অনেক। লোন কোম্পানীগুলিতে খাটান পুঁজি হইতে গড়ে কি হারে আদায় হয় ব্যাঙ্ক কমিশনার সে বিষয়ে কোন তথ্য প্রকাশ করেন না বলিয়া এই যুক্তির সারবত্তা বিচার করা কঠিন। রাসেল সেজ্‌ ফাউণ্ডেশন ও লোন কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিগণ চড়া হার রক্ষার পক্ষে জোর দিয়া থাকেন। কিন্তু ১৯২৫ সনের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, নিউ জারসী, পেন্‌সিলভেনিয়া, ও ইলিনয় এই কয়টি স্থানের ছোট লোন কোম্পানীগুলির নিট্ ক্ষতি গড়ে ১%ও চেয়েও কম। ব্যাঙ্ক কমিশনার বিনে ১৯২৭ সনে দেখান যে, কনেক্‌টিকাটে ক্ষতির পরিমাণ ৪%হইতে ৫%ও মধ্যে ছিল এবং কোম্পানী-গুলির নিট্ আয় প্রায় ৭%। ১৯২৩ সনে দি ইকুইটেবল নামক চেন কোম্পানী লাগান পুঁজি হইতে ১২%, নিট্ লাভ পাইয়াছিল। বেনিফিসিয়েন্স নামক অন্য একটি চেন কোম্পানীর নিট্ মুনাফার পরিমাণ ছিল ২৩%।

লোন কোম্পানীগুলি বলে, যে সব কোম্পানীর মাসিক সুদের হার শতকরা ৩½ ডলারের কম, তাদের অবস্থা যে খারাপ তাহা অন্যান্য রাষ্ট্রের দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে। ম্যাসাচুসেট্‌সে কিন্তু ৩% সুদ হওয়া সত্ত্বেও ছোট লোন কোম্পানীগুলির ব্যবসা বেশ জোরসে চলিয়াছিল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মত, কনেক্‌টিকাটের চেন কোম্পানী-গুলির আয় ছোট ছোট স্বাধীন স্থানীয় কোম্পানীসমূহের আয়ের চেয়ে অনেক বেশী। সেইজন্য এক যুক্তি এই দেওয়া হয় যে, সুদের হার কমাইয়া দিলে চেন কোম্পানী গুলির হাতে সহজ আক্রমণটা দিয়া পড়িবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি অধমর্ণদিগকে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে ?

ছোট লোন কোম্পানীগুলি দেশের অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-কল্পে অবতীর্ণ হয়। সাধারণতঃ যে হারে সুদ লইতে দেওয়া হয়, তার উচ্চ হারে সুদ লইবার লাইসেন্স ইহারা পায়। সুতরাং এই কোম্পানীগুলি ধার দিয়া যে

সুনাফা উপার্জ্জন করে তার একটা ঠিক বিবরণ বাহির হওয়া অত্যন্ত দরকার। ইহারা সমাজে থাকিয়া অধিক সুখ সুবিধা ভোগ করিবে, অথচ নিজেদের কার্য্যকলাপের কোন হিসাব দিবে না, এমন হইতে পারে না। ছোট ছোট অধমর্ণরা সত্য সত্য উপকৃত হয় কি না তা বিশেষ-ভাবে জানা দরকার।

অন্য এক দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সুদের উঁচু হার বশতঃ লোন কোম্পানীগুলির অধিকতর দায়িত্ব ও ঝুঁকি লইবার লোভ জন্মে। অর্থাৎ এত বেশী লাভের আশা না থাকিলে লোন কোম্পানীগুলি আরও ধীরতা ও বিবেচনার সহিত কাজ চালাইতে পারে। একটা শহরে একের অধিক লোন অফিস্ থাকিলেও সুদের হার বাড়িবার সম্ভাবনা হয়। মিড্‌লটাউনের লোকের সংখ্যা ২০,০০০, কিন্তু লাইসেন্স-প্রাপ্ত কোম্পানী আছে ৪টা। ১৯২৭ সনে এই ৪টী কোম্পানী যথাক্রমে ঋণ দিয়াছিল ২১,৫২৮,৮৩ ডলার; ১২,৪৪৪,১৬ ডলার; ৪,৯১২ ডলার ও ৫৮,৫৭৮,২০ ডলার। ১৯২৮ সনে এই ঋণ এইরূপ দাঁড়ায়: ৪৫,৪৭,৪৭৭ ডলার, ২৩,২৪৯·০৯ ডলার, ৬,০১৭·০০ ডলার, ৭৪,৩০৪,৭৪ ডলার। ইহার উপর আবার এই স্থানে এক ষ্টক্ প্ল্যান ব্যাঙ্ক আছে। লোক-সংখ্যার অনুপাতে নিরপেক্ষভাবে লোন কোম্পানীর সংখ্যা যে কমান উচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিম্ন-ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্ত হইতে সুদের হার কিরূপ হওয়া উচিত তা আন্দাজ করা যায়। ব্রিজপোর্টের আমেরিকান্ ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ট্রাষ্ট কোম্পানীতে ৬% সুদ আগেই কাটিয়া রাখা হয় এবং ঋণগ্রহীতা ২৫ সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণশোধ করিতে সমর্থ হয়। তাহাতে এই ব্যাঙ্ক প্রায় ১% অতিরিক্ত ও একটু বাঁধা খরচ আদায় করিয়া লইত। এখন আর লয় না। ৬% সুদের অর্থ বৎসরে ১২% ১০% সুদ। অথচ এই ব্যাঙ্কেরও ক্ষতির সম্ভাবনা কম নয়। নিউ ইয়র্কের ছাপানান্ন লিটি ব্যাঙ্ক হাজার ডলার অবধি ঋণ দিতে পারে। ঋণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৬% সুদ কাটিয়া লওয়া হয়। এখানে এই একটা নূতন নিয়ম আছে যে, অধমর্ণ তার সাপ্তাহিক আমানত দিলে চক্রবৃদ্ধি হারে ৩% সুদ পাইবে।

কনেক্‌টিকাটের নবতর প্রণালী

ক্রাউলিন প্ল্যান কনেক্‌টিকাটের এক চেন কোম্পানী। নিউ হেভেন, আনসোনিয়া, হার্টফোর্ড ও ব্রিজপোর্টে অফিস খুলিয়া ইহা মুলধন ক্ষুদ্র ঋণ আইন অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে। অন্যান্য কোম্পানীর মত ইহার বন্ধক গ্রহণাদি, মাসিক মজুরির ১০% ইত্যাদি। ঋণের প্রথম মাসে ১৯% হারে সুদ দিতে হয়, অন্যান্য মাসে ১,৮% হারে দিতে হয়। যদি পীড়া বা বেকার অবস্থা ব্যতীত অন্য কারণে ঋণশোধ হইবার সময়ের তিন দিন পরেও অধমর্ণ তা শোধ করিতে না পারে, তবে যত দিন পর্য্যন্ত শোধ না হয় ততদিনের যে টাকা বাকী থাকে তজ্জন্য ১% অধিক সুদ দিতে হয়। যদি ৩০ দিনের বেশী ঋণ অপরিশোধিত থাকে ত সমস্ত আসল টাকাটাই দিতে হইবে। একমাত্র এই কোম্পানী তার বিজ্ঞাপনে সুদের হার সম্বন্ধে সব কথা ছাপাইয়া থাকে। তদনুসারে দেখা যাইবে যে, অধমর্ণ ১০০ ডলার ঋণে ১৭·৮০ ডলার, ২০০ ডলার ঋণে ৩৫·৪০ ডলার ও ৩০০ ডলার ঋণে ৫৩·৩০ ডলার বাঁচাইতে সমর্থ হয়। সম্প্রতি হার্টফোর্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশান তাদের মাসিক সুদের হার কমাইয়া ২½% করিয়াছে। ৬৮টি সহরে ইহার অফিস আছে। এই কোম্পানী ধার দিয়াছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার এবং কিছুদিন আগে বোষ্টনের লি হিগিনসন কোম্পানীর সাহায্যে ৭০ লক্ষ ডলারের নূতন পুঁজি বেচিয়াছে। অতএব কম সুদের বিরুদ্ধে যুক্তগুলি টেঁকসই নয়।

আইনজাত কয়েকটি কুফল

ফিলাডেলফিয়ার শ্রীযুক্ত উইলিয়াম হার্ণ নিউইয়র্ক টাইম্‌সের ১৩ জানুয়ারী, ১৯২৯ সংখ্যায় দেখাইয়াছেন যে, লোন কোম্পানীগুলি মাত্র ১%র অর্দ্ধেক ক্ষতি ভোগ করিয়া থাকে। তিনি বলেন এই আইনের ফলে কত লোক যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। ১৯২৮ সনে অনেক সমালোচনার পর কনেক্‌টিকাটের ব্যবস্থা পরিষদ সুদের হার ৩% ঠিক করিয়া দিয়াছিল, তা আগেই

বলা হইয়াছে। সেই সময়ে শিল্প ব্যবসায় সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর এ ওয়েল্স বলেন যে, মজুরদের পক্ষে এই আইনের ফল বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। হার্টফোর্ড রবার কারখানার প্রেসিডেন্ট হুইটলি বলেন যে, একবার কোন লোক এই আইনের কবলে পড়িলে আর তার উদ্ধারের উপায় থাকে না। তার অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হইতে থাকে। আইনের পক্ষপাতীরা বলিয়া থাকেন যে, ইহার ফলে মিতব্যয়িতা দেখা দেয়, লোকে ঋণ শোধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া নিজের খাওয়া ছোট করে। কিন্তু এরূপ নয়। অধমর্ণের প্রতি বিশ্বাস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ৩০০ ডলার পর্য্যন্ত ঋণ দিবার রীতি আছে। তাতে কি তার মিতব্যয়িতা উৎসাহ পাইতে পারে? রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় না লোন কোম্পানীগুলির কোন্ কোন্ 'গাহেক' স্থায়ী। কনেক্‌টিকাটের ব্যবসা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ৬০% অধমর্ণ বরাবর অধমর্ণ থাকিয়া যায়। অন্ততঃ ৫০% যে এইরূপ অবস্থায় তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ এই যে, আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

লোন কোম্পানীগুলি যে ধরণের বিজ্ঞাপন বাহির করে তা আপত্তিজনক। মিড্‌লটাউন পার্সনাল ফিন্যান্স কোম্পানীর এক বিজ্ঞাপনের নমুনা।

বড়দিনের চেকের সেই মাস আসিয়াছে—মিতব্যয়িতার ফল। স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি এই সময় প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ গাহেকদের পাঠাইয়া থাকে। আশা করি আপনাকেও তারা পাঠাইয়াছেন; কিন্তু আপনার যদি আরও কিছু বেশী অর্থের দরকার হয়, আমাদের ১০০ ডলারের অথবা বেশী পরিমাণের চেক আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

এই কি মিতব্যয়িতার পরিচয়?

বাঙ্গালা ও কনেক্‌টিকাট

কোথায় কনেক্‌টিকাট আর কোথায় বাঙ্গালা দেশ! বাঙ্গালা দেশে প্রায় ৮০০ লোন কোম্পানী পরিচালিত হইতেছে। সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য বা আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সুদ ও অন্যান্য সর্ত্ত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কনেক্‌টিকাটের লোন কোম্পানীর সহিত বাঙ্গালার লোন কোম্পানীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে লোন কোম্পানী লইয়া কোন প্রকার পৃথক্ আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। যে সব কোম্পানীর পুঁজি ১ লাখ টাকার উপর শুধু সেইগুলি জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর বিবরণীতে স্থান পায়, যদিও ১ লাখ টাকার কম পুঁজিওয়ালা এই ধরণের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা কম নহে। আমাদের বিবেচনায় লোন কোম্পানী ও লোন অফিসগুলির জন্য ভিন্ন ও স্পষ্ট আইন ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হওয়া দরকার। এক্ষণে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সাধারণভাবে সংখ্যা, আমানত ইত্যাদির যে হিসাব প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয় তাহা যথেষ্ট নহে। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক, জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং লোন কোম্পানী ও লোন অফিসগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত ও বিশদ অঙ্ক ও তথ্যতালিকা প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। বস্তুতঃ, লোন অফিস ও লোন কোম্পানীগুলির বিবরণী প্রকাশ করিবার ভার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহা ব্যাঙ্ক-বিবরণীর দ্বিতীয় ভাগরূপে প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইবে। প্রথম ভাগে অন্যান্য সমস্ত ব্যাঙ্কের তথ্য সঙ্কলিত হইবে ও ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালী-মত শুধু ব্যাঙ্কের নাম, সংখ্যা, আমানত পুঁজি, রিজার্ভ, ঋণদান সম্বন্ধে তথ্য ও অঙ্ক সঙ্কলন যথেষ্ট নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। আমরা আইন দ্বারা উচ্চতম সুদের হার বাঁধিয়া দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু তার আগে দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কি কি হারে সুদ আদায় করে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। লোন কোম্পানী ও লোন আফিসগুলিকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। কোন কোন শ্রেণীর লোক কোন কোন ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হয় এবং কি কি বাবদে কত টাকা ঋণ লয়, প্রত্যেক ব্যাঙ্কে সে বিষয়ে ঠিক (যতদূর সম্ভব)

হিসাব দাখিল করিতে বাধ্য করা কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্কসমূহ যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তার যাচাই হওয়াও দরকার। তারপর কোন স্থানে লোক-অনুপাতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী বা কম কি না তাও বুঝিবার সময় আসিয়াছে। স্থানীয় ব্যাঙ্ক সমূহের কোনটার কতখানি আমানত স্থানীয়, আর কতখানি বাহির হইতে আসিয়াছে তদ্বিষয়ে পরিষ্কার একটা হিসাব নিকাশ অবিলম্বে হওয়া দরকার।

ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে দুইটা বড় কথা জানা চাই। প্রথমতঃ, কি কি কারণে বিভিন্ন লোন কোম্পানী ও লোন আফিসগুলির উদ্ভব হইয়াছে? দ্বিতীয়তঃ, কোন জনপদের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এবং পরে কিরূপ হইয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব হইতে বুঝা যাইবে ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত ব্যাঙ্কের সম্পর্কটা আমাদের দেশে কিরূপ। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য উৎসাহিত করা হইতেছে, না ব্যবসা বাণিজ্যের টানে ব্যাঙ্ক আপনা হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ব্যাঙ্ক কেন আলোচনার একটা বড় অধ্যায় সন্দেহ নাই।

স্বল্পস্থায়ী কর্জ্জ-সমস্যা আমাদের দেশে কনেক্টিকাটের চেয়ে কম তীব্র নয়। সুদখোর মহাজনের কবল হইতে চাষী ও অল্পবিত্ত নাগরিককে রক্ষা করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তা সকলেই অবগত আছেন। আমাদের দেশে কো-অপারেটিভ্, ক্রেডিট্ সোসাইটিগুলির উদ্ভব হইয়াছে এই গণ্ডগোল দূর করিবার জন্য। আমেরিকায় সেই কাজ করিতেছে লোন কোম্পানীগুলি। আমাদের লোন কোম্পানী ও লোন আফিসগুলিও যে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছে তার একটা নিরপেক্ষ হিসাব পাইলে কাজ চলিত।

শ্রীসুধাকান্ত দে

ম্যানেজিং এজেন্ট-কর্তৃক যৌথ-ব্যবসা চালানোর নানা গলদ

ভারতবর্ষে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীগুলি সাধারণতঃ ম্যানেজিং এজেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যান্য দেশে কিন্তু সাধারণতঃ বোর্ড অব্ ডিরেক্টারস্ এর হাতেই কোম্পানী পরিচালনের ভার অর্পিত থাকে। পূর্ব্বে হয়তো এই এজেন্সি দ্বারা কোম্পানী পরিচালনের ব্যবস্থা সুবিধা-জনকই ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থার জন্য কতকগুলি লোক অংশীদারগণের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিতেছে।

ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। বইখানির নাম 'নেসেসিটি অব ডিরেক্টারস্ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অব ম্যানেজিং এজেন্টস্', (অর্থাৎ ম্যানেজিং এজেন্ট-প্রভাব-মুক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা), লেখক শ্রীযুত নারায়ণদাস বাজোরিয়া, বি-এ, ১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লেখক ম্যানেজিং এজেন্সির নিম্নলিখিত দোষগুলি বাহির করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ম্যানেজিং এজেন্ট একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, যথা, ১০ হইতে ৩০ বৎসরের জন্য, নিযুক্ত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমে যোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত ম্যানেজিং এজেন্সির হাতেই পরিচালন ভার দেওয়া হয়। কিন্তু শেষে নিতান্ত অমনোযোগী বা অপদার্থ ব্যক্তিগণের হাতে ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালনের ভার পড়িলেও উহার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় থাকে না।

ম্যানেজিং এজেন্সির দ্বিতীয় দোষ কাঁচা মাল কিনিবার সময় কোম্পানীর স্বার্থ বলিদান করিয়া উহারা নিজেদের স্বার্থসাধন করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, ম্যানেজিং এজেন্সির ম্যানেজার অসাধু হইলে, কোম্পানীর হইয়া তৃতীয় পক্ষের সহিত ক্রয় বিক্রয়ের সময় কোম্পানীর সর্ব্বনাশ করিয়া নিজে লাভবান হইতে পারে।

অনেক সময় ম্যানেজিং এজেন্টগণ কোম্পানীর আয় হইতে অংশীদারগণকে উচিত মত লভ্যাংশ না দিয়া, কোম্পানীর উন্নতিবিধান অজুহাতে লাভের টাকা অন্যান্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যবসায় হয়তো মোটেই লাভের ব্যবসায় নয়, হয়তো এই সমস্ত ব্যবসায়ে ৩% হইতে ৪% এর বেশী লাভ হওয়ার আশা নাই। তবু তাহারা এইরূপ ভাবে লাভের টাকা আট-কাইয়া রাখে। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যত বেশী টাকা কড়ি বা সম্পত্তি তাঁহাদের তাঁবে আসিতে পারে তাহা করা।

উল্লিখিত দোষগুলি নেহাৎ পুঁথিগত নয়। লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই দোষগুলি জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ম্যানেজিং কার্য্যগুলির ঘাড়েও এই অপবাদ নিঃসন্দেহে চাপান যাইতে পারে; এবং এই অব্যবস্থার উদাহরণও দেখান যাইতে পারে।

ম্যানেজিং এজেন্টগণ ইচ্ছামত ডিভিডেণ্ড্ বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিয়া শেয়ারের দাম বাড়াইয়া বা কমাইয়া, কিরূপে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া হইল। একটী জুট মিলের যথেষ্ট লাভ হইত; হঠাৎ ম্যানেজিং এজেন্ট সেই মিলের লভ্যাংশের হার খুব কমাইয়া দিল। ফলে এই মিলের শেয়ারের দাম যেখানে ১২০০৲ টাকা ছিল, সেখানে দাম একেবারের ৪০০।৫০০৲ টাকা দাঁড়াইল। শেয়ার-হোল্ডারগণ সর্ব্বনাশ

হইতে ভাবিয়া শেয়ার বিক্রয় করিতে লাগিল, এবং এই সুযোগে স্বয়ং ম্যানেজিং এজেন্ট শেয়ার ক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় ৫০০০ শেয়ার ম্যানেজিং এজেন্টের কুক্ষিগত হইল। এই শেয়ারগুলির প্রকৃত মূল্য ৬০ লাখ টাকার উপর, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্ট মাত্র ২০।২৫ লাখ টাকায় এইগুলি ক্রয় করিল এবং ফলে জনসাধারণের ৪০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিল।

আর এক উপায়ে ম্যানেজিং এজেন্টগণ অংশীদারগণের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। অসদভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা হিসাবপত্র প্রকাশ করিতে অথবা দেরী করিয়া থাকে। অনেক সময় এক বৎসর ছেড় বৎসর পরে ইহারা হিসাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কখনও কখনও মিথ্যা হিসাবপত্রও বাহির করিয়া থাকে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ অনেক বেতন দিয়া কর্ম্মচারী পুষিয়া ও কোম্পানীর অর্থ অযথা ব্যয় করিয়া থাকে এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণের প্রিয় কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর অর্থ লুটিয়া খাইবারও অনেক সুবিধা পাইয়া থাকে।

এই তো হইল ম্যানেজিং এজেন্টের দোষের কথা, কিন্তু এইগুলি শোধরাইবার উপায় কি? লেখক সে সম্বন্ধেও মাথা ঘামাইয়াছেন। লেখকের মতে, বর্ত্তমান অবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্টগণ অসাধুতা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। আর প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলে কয়জনই বা লোভ সামলাইতে পারে? সুতরাং অবশ্যই কোম্পানী সম্বন্ধীয় আইনকানুনের এমন সংশোধন হওয়া উচিত যাহাতে ম্যানেজিং এজেন্টগণ আদৌ ফাঁকি দিবার সুযোগ না পায়। সাধারণতঃ, ডিরেক্টরগণ ম্যানেজিং এজেন্টগণের দ্বারা মনোনীত হয়; কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টগণের মনোনীত লোক ডিরেক্টার হইলে কোনই ফল হইতে পারে না। আবার সাধারণ সভায় অভিযোগের সময় কোন কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে আদৌ তাহার উত্তর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দরকার। আর যে সমস্ত আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে মাত্র তাহার সংশোধন দ্বারা যে সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে তাহা নয়। আরও এমন নূতন নূতন আইন কানুন করার দরকার, যাহার ফলে, কতকগুলি গলগ্রহ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এইরূপে আর অযথা শোষণ করিয়া লইতে না পারে।

পল্লীসংস্কার ও সংগঠন

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস, মহাশয় প্রণীত "পল্লীসংস্কার ও সংগঠন" পুস্তকখানি (প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, লিঃ, কলিকাতা; মূল্য ।০ আনা মাত্র) নূতন প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার ১৯২৪ সালে কলিকাতার মিকানো ক্লাবে ইংরাজীতে 'ভিলেজ রিঅর্গানিজেশান' বিষয়ক যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ইহা তাহার অনুবাদ। কিন্তু পুরাতন হইলেও পুস্তকখানির ভাল প্রচার হইয়াছে মনে হয় না। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

গ্রামের কাজের জন্য সঙ্ঘ বা সমিতি প্রয়োজন। এইরূপ সঙ্ঘ বা সমিতিকে গ্রন্থকার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) গ্রাম্য শাসন-যন্ত্র;

(২) পল্লীবাসিগণের স্বেচ্ছায় গঠিত সমিতি;

(৩) আইনের বিশেষ বিধান অনুসারে গঠিত এমন সকল সমিতি যাহার সভ্যগণ স্বেচ্ছায় সমিতির নিয়মানুসারে কাজ করেন।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত; পল্লী সমিতি প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ; সমবায় সমিতিগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থকার বলেন, "উক্ত তিন প্রকারের সমিতি পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিলেই পল্লীবাসিগণের সম্পূর্ণ উপকার সাধিত হইবে।"

নানা কারণে ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি পল্লী-শাসনযন্ত্রকে অনেকে পছন্দ করেন না। কিন্তু পল্লী-স্বায়ত্তশাসনের কোন-রূপ ব্যবস্থা ছাড়া গ্রামের ও দেশের উন্নতি যে অসম্ভব শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, "বঙ্গদেশের জনসাধারণ বা তাহার কোন সম্প্রদায় যদি ইউনিয়ন বোর্ড বিষয়ক বর্ত্তমান ব্যবস্থার অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান ব্যবস্থার দোষ সংশোধন করিয়া অনতিবিলম্বে আমাদের অবস্থার উপযোগি উৎকৃষ্টতর

ব্যবস্থায় আবিষ্কার করুন। কিন্তু আমাদের পল্লীবাসিগণকে ও সমগ্র জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য কোন না কোন ব্যবস্থা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার সমিতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার কেবল অন্য দেশের নহে, কিন্তু বাংলা হইতেও উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ সকলের সাহায্যেও অনেকটা পরিমাণে গ্রামের উন্নতি করা যায়। ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার জলসরবরাহ সমিতি ও ঋণগ্রহণ, কৃষি, প্রভৃতি সমবায় সমিতির চেষ্টায় গ্রামের প্রভূত উপকার হইয়াছে। 'বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতি', কোদালি সমিতি,' 'হিতসাধন মণ্ডলী' প্রভৃতি সম্পূর্ণ বে-সরকারী সমিতির যত্নেও গ্রামের উন্নতি হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনও এ বিষয়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিতেছে। সরকারের অল্প সাহায্যে বা বিনা সাহায্যেও গ্রামের জন্য যে আমরা অনেক কাজ করিতে পারি, এসকল সমিতি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে কৃষি ও গ্রামের শিল্পের উন্নতির জন্যও আমাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। এই কাজে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাংলার শিক্ষিত যুবকগণকে আহ্বান করিয়াছেন। এ আহ্বান কয়জনকে স্পর্শ করিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা ছাড়া কৃষির উন্নতি ও শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উৎকর্ষ যে সম্ভব নহে, এ কথা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারি। (পল্লী-স্বরাজ)

মার্কিণ অধ্যাপকদের মাহিয়ানার হার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপকদের মাহিয়ানার হার তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বজায় রাখিবার ও তাঁহাদের অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা, সে সম্বন্ধে একটী অনুসন্ধান চালানো হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপকদের একটী সঙ্ঘ আছে। এই সঙ্ঘের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়স্থ শাখা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটির রিপোর্ট গ্রন্থাকারে গত বৎসর (১৯২৮) বাহির হইয়াছিল। রিপোর্টটীর নাম—"ইন্‌কাম্‌স্ অ্যাণ্ড লিভিং কষ্টস্ অব্ এ ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি।" ইয়াণ্ডেল হেণ্ডার্সন ও মরিস্ আর্ ডেভি সম্পাদনের ভার লইয়াছিলেন। রিপোর্টটীর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+১৭০। দাম ২ ডলার। নিউ হ্যাভেনস্থ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস উহার প্রকাশক।

একজন অধ্যাপক ২৫ বৎসর যদি অধ্যাপনা করেন এবং একজন উঁচুদরের অধ্যাপক বলিয়া যদি গণ্য হন, তাহা হইলে তাঁহার কিরূপ আয় হওয়া উচিত? কমিটি বলেন যে, তাঁহার এরূপ আয় হওয়া উচিত যে অন্ততঃ নিম্নলিখিত অভাবগুলা মিটানো সম্ভব হইতে পারে:—(১) বসতী কামরা-ওয়ালা বাড়ীর অধিকারী হওয়া, (২) সকল সময়ে একজন চাকর এবং কখন কখন একজন অতিরিক্ত চাকর রাখা, (৩) ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ানো এবং কোন বিশেষ পেশার যোগ্য শিক্ষা দেওয়া, এবং (৪) একটী মোটর রাখা। এইরূপ অভাব মিটাইতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রের জিনিষ-পত্রের দাম ধরিলে বার্ষিক অন্ততঃ ১৫।১৬ হাজার ডলার আয় হওয়া দরকার।

প্রথমতঃ, অধ্যাপকদের অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক-দের সমান স্তরের অন্যান্য পেশার লোকদের জীবনযাত্রার প্রণালী বিবেচনা করিয়া উক্ত অঙ্কটা স্থির করা হইয়াছে।

একজন পাকা অধ্যাপকের মাহিয়ানা অন্ততঃ কত হওয়া দরকার তাহা না হয় জানা গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অধ্যাপকগণ কত মাহিয়ানা পাইয়া থাকেন?

কমিটি বলেন যে, খুব উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপকরাও উল্লিখিত 'নিম্নতম' অভাবগুলা মিটাইতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। নানাদিকে খরচ হ্রাস করিয়া কোন রকমে ঐ অভাবগুলা তাঁহারা মিটাইয়া থাকেন।

পাকা অধ্যাপকদের অবস্থা না হয় এইরূপ; ছোকরা অধ্যাপকদের অবস্থাটা কিরূপ? কমিটি বলেন যে, যে সব অভাব মিটাইবার কথা বলা হইয়াছে সেগুলা মিটাইবার জন্য যত টাকার দরকার ছোকরা অধ্যাপকদের আয় তাহার এক-তৃতীয়াংশও নয়।

সাধারণতঃ, অধ্যাপকদের আর্থিক অবস্থা যে ভাল নয় তাহার আর এক বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের শতকরা মাত্র ৯ জন কেবল অধ্যাপক-হিসাবে পাওয়া মাহিয়ানাতে সংসার চালাইতে পারেন। বাকী

সকলকেই অতিরিক্ত আয়ের জন্য নানা কাজে লিপ্ত হইতে হয়।

শুধু যে অতিরিক্ত কাজে হাত দিতে হয় তাহা নয়, ইহার উপর আর একটী গলদ আছে। অতিরিক্ত কাজে হাত দিয়াও অধিকাংশ অধ্যাপকই তাঁহাদের অভাব মিটাইবার মত আয় করিতে পারেন না।

ইঁহাদের এরূপ আর্থিক অবস্থার ফল যে বিষময় তাহা কমিটি ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, অথচ সেই দেশেরই অধ্যাপকরা নিরন্তর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে থাকিবেন, তাঁহাদের স্ত্রীদের নানা শারীরিক শ্রমের কাজে লাগিতে বাধ্য করিবেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে পারিবেন না, নিজেরাও একান্তমনে নিজ কাজ করিবার সুযোগ পাইবেন না, ইহা যে জাতির পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন।

মার্কিণ ব্যাঙ্কিং কি বিলাতী ব্যাঙ্কিংএর পন্থানুসরণ করিবে ?

বিলাতের ও আমেরিকার ব্যাঙ্কিং-প্রণালীর মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। বিলাতে ১৩টী বড় ব্যাঙ্ক আছে। ইহাদের মধ্যে ৫টী "বাঘা" ব্যাঙ্ক। এই কয়টী ব্যাঙ্কের ৮ হাজার শাখা বিলাতময় ছড়ানো আছে। প্রথমে ব্যাঙ্কগুলা ছোট ছোট স্বাধীন ব্যাঙ্ক রূপেই দেখা দিয়াছিল। পরে এই ছোট ব্যাঙ্কগুলা বড় ব্যাঙ্কের কুক্ষিগত হইয়া শাখা-ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। মাত্র ১৩টী ব্যাঙ্কের ৮ হাজার শাখা-ব্যাঙ্ক। ইহা নিতান্ত সোজা কথা নয়।

আমেরিকায় কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে শাখা-ব্যাঙ্কের রেওয়াজ তত নাই। সেখানে হাজার হাজার ব্যাঙ্ক আছে সত্য, কিন্তু ইহারা স্ব স্ব প্রধান, ছোট ছোট এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সম্প্রতি একজন মার্কিণ (এল্ এ হার্) বিলাতের শাখা ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানার নাম—"ব্র্যাঞ্চ ব্যাঙ্কিং ইন্ ইংল্যাণ্ড" (পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস, ফিলাডেল্‌ফিয়া ; ১৭+১৩৯ পৃষ্ঠা ; ২০১০ ডলার ; ১৯২৯)।

গ্রন্থকারের প্রধান বক্তব্য এই—"আমেরিকায় ১৯১৯ সন হইতে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল মারিতেছে, ইহার কারণ আমেরিকা শাখা ব্যাঙ্কিংএর মর্ম্ম এখনও বুঝে নাই। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন ব্যাঙ্ক অপেক্ষা নানা শাখাযুক্ত একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে ব্যাঙ্কিং অপেক্ষাকৃত নিরাপদে চলিতে পারে, ব্যাঙ্কিংএর খরচও কমিয়া যায়। আমেরিকা শাখা ব্যাঙ্কিংএর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে নানা আপত্তি তুলিয়া থাকে বটে ; কিন্তু গুলা নিতান্তই অসার। আর, শাখা ব্যাঙ্কিংএর কদর যে আমেরিকা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। কারণ, আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলা ইতিমধ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গ্রন্থটীর অধ্যায়গুলার আলোচ্য বিষয় নিম্নে জানানো যাইতেছে। "বিলাতে ব্যাঙ্কিংএর ক্রমিক উন্নতি" সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায় লেখা হইয়াছে। "বিলাতের টাকার বাজার" দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় ; ইহাতে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ড, ক্লিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশান, বাঙ্কিপত ব্যাঙ্ক, যৌথ ব্যাঙ্ক, উপনিবেশগুলার ব্যাঙ্ক ও নানা বিদেশী ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সেপ্‌টিং হাউস, হুণ্ডির দালাল, ইত্যাদির পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝানো হইয়াছে। ১৮২৬ সন হইতে এ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কগুলা কিরূপে একের পর এক করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে তাহার বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে ; ৫টী "বাঘা" ব্যাঙ্কের বংশ-পরিচয়ও এই অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ৫টী "বাঘা" ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান গঠন কিরূপ তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শাখা সমন্বিত ব্যাঙ্ক কিরূপে চালাইতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রন্থকার তাঁহার চরম সিদ্ধান্তটীর উল্লেখ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তটী এই—"আমেরিকা বিলাতের পন্থানুসরণ করুক।" সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

গ্রন্থটীতে অনেক কাজের কথা আছে। যাঁহারা হাতেকলমে ব্যাঙ্কের কাজ করেন, এই গ্রন্থটী তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

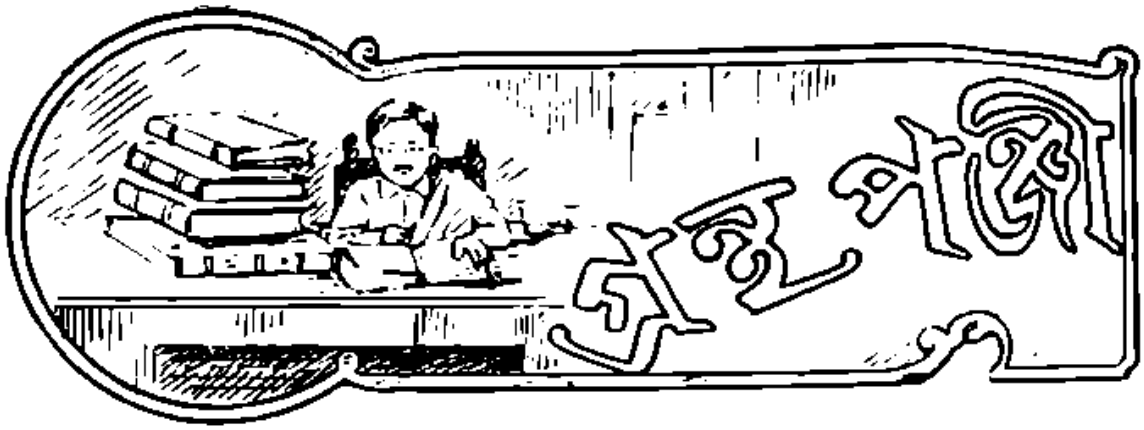

১। প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব্ ইকনমিক্‌স্ (অর্থ শাস্ত্রের মূল নীতি), এফ্ বি কাহ্বার ও এ এইচ্ হ্যানসেন। বষ্টন। ১৯২৮। পৃঃ ১০+৭২৬। ৩ ডলার।

২। কনটেমপোরারি ইকনমিক থট (সমসাময়িক আর্থিক চিন্তার ধারা), পি টি হোমান। নিউ ইয়র্ক; হার্পার। ১৯২৮। পৃঃ ৪৭১। ৮½ ডলার।

৩। গ্রেটবৃটেন ফ্রম অ্যাডাম্ স্মিথ টু প্রেজেন্ট ডে (অ্যাডাম স্মিথের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত গ্রেট বৃটেনের বিকাশের ধারা), পি আর কে। নিউ ইয়র্ক লংম্যানস্ গ্রীন। ১৯২৮। পৃঃ ১২+৪৫৮। ৩·৭৫ ডলার।

৪। "আগ্রাপলিটিক" (চাষ আবাদের অর্থ-কথা), ফ্রেডারিক্ আরেবো। বার্লিন; পল মারে। ১৯২৮। পৃঃ ৯+৬১৯। ২৩ রেন্টমার্ক।

৫। "হুইট্ ষ্টাডিজ্" (গম আলোচনা)। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্ণিয়া: খাদ্য গবেষণাগার। ১৯২৭, ১৯২৮। পৃঃ ১-৩৯০। ইহাতে চতুর্থ ভাগের নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। (১) দুনিয়ার গম শস্যের অবস্থা, ১৯২৬-২৭। (২) ১৮৭৯ সন হইতে আমেরিকায় গম পেষার ও ময়দা বা আটা বিলাইবার ব্যবস্থার সংখ্যাতত্ত্ব। (৩) গম শস্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা, আগষ্ট, নবেম্বর, ১৯২৭। (৪) ১৮৯৬ সন হইতে আমেরিকান্ গমের বিলিবন্দোবস্ত, বৎসর-শেষের পুঁজির পরিবর্ত্তনের কথা। (৫) গমের সহিত রাইয়ের সম্বন্ধ। (৬) গমের অবস্থা পর্য্যালোচনা, ডিসেম্বর ১৯২৭ মার্চ্চ ১৯২৮। (৭) গম উৎপাদনের উৎকর্ষের ম্যাপকাটি। (৮) গম ও আটার বিগত ইয়োরোপীয় বাণিজ্য। (৯) গমের অবস্থা-পর্য্যালোচনা, এপ্রিল-জুলাই, ১৯২৮।

৬। "ইকনমিক ফরেন পলিসি অব্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ (যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক পররাষ্ট্রনীতি), বি এইচ্ উইলিয়াম্‌স। নিউ ইয়র্ক: ম্যাকগ্র হল। ১৯২৯। পৃঃ ১১+৪২৬। ৪ ডলার।

৭। "গভেরেজ ইন্ প্র্যাক্‌টিস্ অ্যাণ্ড থিওরি" (ব্যবহার ও তত্ত্বের দিক্ হইতে মজুরি), ডে ডব্লিউ এফ রো। লণ্ডন কটলেজ। ১৯২৮। পৃঃ ১০+২৭৭। ১২ শি ৬ পে।

৮। "ট্রেড্ ইউনিয়ানিজ্‌ম টুডে" (আজকালকার মজুরসঙ্ঘ), এ সি হোন্‌স। নিউ ইয়র্ক: লংম্যান্‌স গ্রীন। ১৯২৮। পৃঃ ৬+৯০। ৭৫ সেণ্ট।

৯। "ব্র্যাঞ্চ ব্যাঙ্কিং ইন্ ইংলাণ্ড" (ইংলাণ্ডে শাখা ব্যাঙ্কিং), এস এ হার। ফিলাডেলফিয়া পেন্‌সেলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। ১৯২৯। পৃঃ ১৭+১০৯। ২·৫০ ডলার।

১০। "এ ষ্টাডি অব্ ইন্টারেষ্ট রেট্‌স্" (সুদের হার সম্বন্ধে গবেষণা), ক্যারিল ফক। লণ্ডন, পি এস কিং। ১৯২৯। পৃঃ ১০+২৫২। ১২ শি ৬ পে।

১১। "কষ্ট্ অব্ দি গবর্ণমেণ্ট ইন্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্", ১৯১৫-২৬। ন্যাশনাল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল কনফারেন্স বোর্ডের গবেষকগণ কর্ত্তৃক প্রণীত। নিউ ইয়র্ক। ১৯২৭। পৃঃ ১৯+২৯৪। ৩·৫০ ডলার।

১২। "দি মর্ডার্ণ কেস্ ফর্ সোশ্যালিজ্‌ম্" (সমাজ তন্ত্রের পক্ষে একেলে যুক্তি)—এ ডাব্লিউ হাম্‌ফ্রি; অ্যালেন্ অ্যাণ্ড আন্‌উইন; পৃঃ ২৭২ ১২ শি ৬ পে; ১৯২৮।

১৩। "দি হিউম্যান্ ফ্যাক্টর ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড পলিটিক্স" (শিল্প ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষের স্থান)—অ্যালফ্রেড্ হক্; পি এস্ কিং অ্যাণ্ড সন, লণ্ডন, পৃঃ ১১+২১১। ৮ শি ৬ পে।

ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ ; এফ, আর, ইকন্, এস (লণ্ডন)

য়ুরোপ ও আমেরিকার উন্নত জাতিগুলির তুলনায় ভারতবাসীর গড় আয় অত্যন্ত কম। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁদের অনেকেই বাঁর বাঁর সংসারের খাইখরচ করে কিছু বাঁচাতে পারেন না। অনেক সংসারই ঋণের দায়ে ডুবে থাকে। তা হলেও কোনো কোনো সংসারে যে লাল কাবারে কিছু কিছু জমা না হয় তা নয়। প্রত্যেক সংসারের এই সামান্য সঞ্চয় একত্র করলে এক একটা পল্লীগ্রামের বা ছোট ছোট সহরের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ নেহাৎ কম হয় না। কিন্তু এখন এই সঞ্চিত টাকাটা কি ভাবে খাটে ?

যদি পল্লীগ্রামে কেউ সামান্য কিছুও জমাতে পারে, তা হ'লেও উহা নিরাপদে রেখে সকল প্রকার লাভজনক উপায়ে খাটাবার সুব্যবস্থা নাই। পল্লীগ্রামে (১) কেহ কেহ সঞ্চিত টাকা ঘরেই ফেলে রাখেন, (২) কেহ কেহ উহা জমি জমাতে ফেলেন অথবা সুদে লাগান, (৩) কেহ কেহ কো-অপারেটিভ সোসাইটী অথবা লোন অফিসে জমা রাখেন, (৪) অনেকে আবার ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখেন অথবা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনে থাকেন।

যাঁরা টাকা ঘরে ফেলে রাখেন তাঁদের নিজেদেরও কিছু লাভ হয় না এবং দেশেরও কোন উপকার হয় না।

যাঁরা গ্রামে সুদে টাকা লাগান তাঁরা সকলেই বলে থাকেন "সুদ তো দূরের কথা আসল আদায় করাই ঝক্‌মারী। উহাতে মেহনৎ ও ঝক্‌ঝির যন্ত্রণা এবং আসল মারা যাবার যেরূপ ভয়, তাতে বেশী সুদের লোভ থাকলেও ঐ রূপে টাকা লাগাতে আর মন সরে না।" গরীব গৃহস্থ চায় একটা নিরাপদ লাভজনক ব্যবস্থা, যাতে ঝুঁকি বা ঝক্‌মারী কম। এই জন্যই গরীবের মধ্যে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানতকারীর সংখ্যা বেশ বেড়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ প্রথম খোলা হয় ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে। প্রথম থেকেই এই ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রথম বৎসরেই আমানতকারীর সংখ্যা হয়েছিল ৩৯,১২১ এবং আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ টাকা। সুদ হয়েছিল ৪৯,০০০৲ টাকা। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত এই ৪৭ বৎসরের ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব খতিয়ান করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ব্যাঙ্কের সংখ্যা, আমানতকারীর সংখ্যা এবং আমানতী টাকার পরিমাণ দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে।

সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের হিসাব

	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আমানতকারীর সংখ্যা	লাল কাবারে ব্যাঙ্কের হাতে জমা টাকার পরিমাণ
১৮৮২-৮৩	৪,২৩৮	৩৯,১২১	২১,৯৬,৭৯৬
১৮৯২-৯৩	৬,৪০৮	৪,২০,৯৮৭	৭,৮১,৮৭,৯২৭
১৯০২-০৩	৭,০৭৪	৯,২২,৩৪৩	১১,৪২,১৪,৫৩৪
১৯১২-১৩	৯,৪৮০	১৫,৬৬,৮৬০	২০,৬১,১৪,৫০২
১৯২২-২৩	১০,৭৩০	২০,৪৪,৫০২	২৩,১৯,০০,০০০

তা হ'লে দেখুন সমগ্র ভারতবর্ষে ২০ লক্ষ লোকের সঞ্চয় ২৩ কোটি টাকা ডাক ঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে থাকে। ব্রহ্মদেশ ও আসামের হিসাবটাও একবার খতিয়ে দেখা যাক্।

১৯১৯-২০		৪,১৬,৭৮৮	৪,৬৫,৭৬,২৫১
১৯২০-২১			
১৯২১-২২	২,৭৭৭	৫,৫২,৯২৭	৫,৫৮,৪৮,৫২৮
১৯২২-২৩	২,৫৪৮	৫,৭৬,৪২০	৬,১০,৯৫,৭০০
১৯২৩-২৪	২,৫৮৯	৬,১৩,৭৪৪	৬,৫৯,৫৭,০৬৬
১৯২৪-২৫	২,৬৩৪	৬,৫১,১৩৫	৭,০১,২৬,২১২

বাংলা ও আসামের হিসাব থেকেও দেখা যাইতেছে যে, ৬ লক্ষ লোকের ৭ কোটী টাকা ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে আছে। ইহা ছাড়া বঙ্গ-আসাম প্রদেশে লোকে ক্যাস সার্টিফিকেট কিনে ডাক ঘরের কাছে মেয়াদী আমানত রেখেছে—

১৯১৯-২০ সনে	২১,৮১,৫০১৲
১৯২১-২২	১১,৪৪,৭৪২৲
১৯২২-২৩	১৯,৮৯,১৪৩৲
১৯২৩-২৪	১,৪৬,৭৪,২০০৲
১৯২৪-২৫ ,,	১,২৩,১১,৬১৩৲

গরীবের সঞ্চিত অর্থের এই যে কতকটা খোঁজ পাওয়া গেল এর মোট পরিমাণ একেবারে হেলা করবার নয়। পল্লীগ্রামে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে যদি এই টাকাটা এক করতে পারা যায় এবং তা সতর্ক ভাবে ব্যাঙ্কের নীতি অনুসারে খাটানো যায়, তবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুবিধা হয় এবং গরীব আমানতকারীদিগেরও লাভ হয়। এইসকল ব্যাঙ্ক আমানত লওয়া এবং ধার দেওয়া ছাড়াও বড় বড় সহর হতে পল্লীগ্রামে আমদানি মালের ও পল্লীগ্রাম হ'তে রপ্তানি মালের দাম শোধ দিবার ভার নিতে পারে। বর্ত্তমানে একাজের কতকটা হয় ডাক ঘরের ইন্‌সিওর ও ভিঃ পিঃ চিঠির সাহায্যে। হুণ্ডিও চলে, নগদ দাম দেওয়া তো আছেই। এসব ব্যাঙ্কের দৌলতে পল্লীগ্রামের লোকেরা চেকের সঙ্গে ক্রমশঃ সুপরিচিত এবং তার ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে পারেন। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে লিখতে ও পড়তে জানা লোকের সংখ্যাও বাড়া দরকার। মোট কথা, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার যতগুলা সুবিধা তা সবই ভোগ করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক নামধারী মামুলী লোন আফিস খুললে চলবে না।

আপাততঃ আমাদের দেশের নিরক্ষরজনবহুল পল্লী গ্রামে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার সুবিধা আছে অনেক। যাঁরা ব্যাঙ্কের রহস্য বোঝেন তাঁরা জানেন যে, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপরই উহার ভিত্তি। ব্যাঙ্কের কাজ বিশ্লেষণ করলে উহার ভাজে ভাজে পাওয়া যাবে কেবল বিশ্বাস।

আমরা যতই উঁচু গলায় নিজেদের উন্নত, ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী বলে বর্ণনা করি না কেন, বর্ত্তমান কালে সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির ভিত্তি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সামাজিক পসার (ক্রেডিট)—আমাদের যথেষ্ট আছে বলে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি কি? নিরক্ষরতাও ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এমন অবস্থায় পাড়াগাঁয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার কাজটা খুব সহজ নয়।

এই সব অসুবিধা এড়িয়ে আর এক উপায়ে পল্লীবাসী-দিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় এনে ফেলা যায়। তা ডাকঘরের সাহায্যে। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রথা সৃষ্টি করে দিয়ে সুদূর পল্লীর গরীবের মনেও ব্যাঙ্কের বীজ বপন করা হয়েছে। তারপর ক্যাস সার্টিফিকেটের চলন হওয়াতে পল্লীবাসীরা মেয়াদী আমানতের আওতায়ও এসেছেন। এখন আমাদের দেশের ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের আইনটা সংশোধন করে নিলেই পাড়াগাঁয়ে খুব কম খরচে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হ'তে পারে। লোকেরও আপন ভাইয়ের উপর যে বিশ্বাস, তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস আছে ডাকঘরের উপর। সুতরাং জমীন আছে ঠিক। এখন প্রশ্ন এই—ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের আইনটা কিভাবে সংশোধন করলে পল্লীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনা যায়?

আমার মনে হয় মোটামুটি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে। (১) ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে এই যে ৭ কোটী টাকা জমা আছে, এর পেছনে

গভর্ণমেণ্ট কোন রিজার্ভ ফাণ্ড রাখেন নাই। এই টাকা কখনো কখনো বিনিময় হার রক্ষার জন্য কাউন্সিল বিলের দায় মিটাতে ব্যয় হয়। এই টাকার কিছু অংশ অন্য সময়ের জন্য সুদে খাটানো উচিত।

(২) ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ বর্ত্তমান হারের চেয়ে কিছু বেশী করা উচিত। এই প্রস্তাবে আপত্তি করে কেহ হয়তো বলবেন যে, আমানতকারীদের দাবি মেটাবার জন্য সর্ব্বদাই যথেষ্ট টাকা হাতে রাখতে হয়। অন্যত্র বেশী টাকা খাটাতে না পারলে বেশী সুদ দেওয়া যাবে কি করে? কিন্তু এ আপত্তি টেঁকসই নয়। হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সারা বছর আমানতকারীদের টাকার টান মিটিয়েও ১৯২২-২৩ সনে সমগ্র ভারতে ২৩,১৯,০০,০০০৲ এবং বাংলা ও আসাম প্রদেশে ৬,১০,৪৫,৭০৮৲ টাকা সরকারের হাতে ছিল। এই টাকার কতক অংশ দেশের ভিতরে অন্য সময়ের জন্য খাটানো যায় না কি? জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের চেয়ে বেশী। নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের সুদের হার দেখলেই কতকটা ধারণা হবে :—

ব্যাঙ্ক বা লোন আফিসের নাম	সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের হার
১। দি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ (চট্টগ্রাম)	৫%
২। দি চিটাগঙ্গ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫%
৩। দি ইণ্ডো-বার্মা ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ (চট্টগ্রাম)	৫%
৪। চিটাগঙ্গ লোন কোং লিঃ	৫%
৫। চৌমুহনি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (চৌমুহনি জিঃ নোয়াখালী)	৪৸৹%
৬। ময়মনসিংহ সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ	৪%
৭। দি বেঙ্গল ডুয়ার্স ব্যাঙ্ক লিঃ (জলপাইগুড়ি)	৩ এবং ৩½%
দি ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল্ ব্যাঙ্ক লিঃ (ময়মনসিংহ)	৪%,
দি বেঙ্গল অভিদারা এবং ব্যাঙ্কিং কোং লিঃ (ঢাকা)	৫%,
১০। লক্ষ্মে ব্যাঙ্ক লিঃ (কলিকাতা)	৪%,

দিনাজপুর ও রংপুরের লোন আফিসগুলি সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতের উপরে সাধারণতঃ ৩½ হইতে ৩½%, সুদ দেয়। এ থেকে দেখা যায় যে, অন্ততঃ বাংলাদেশে সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতের গড় সুদ ডাকঘরের চেয়ে বেশী। অবশ্য ঝুঁকি যেখানে বেশী, সুদও সেখানে চড়া। কিন্তু তাহলেও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা ৩৲ টাকা রাখার পক্ষে কোনো তথ্যই সায় দেয় না।

কয়েক বৎসর আগে টাকার বাজারে পরিবর্ত্তনের দরুণ গভর্ণমেণ্ট নানা খাতের সুদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ পূর্ব্বের মতই ছিল।

(৩) এখন সপ্তাহে (সোমবার হইতে শনিবার) একদিন মাত্র টাকা উঠান যায়। এই ধারাটা সংশোধন করে সপ্তাহে একাধিকবার টাকা তুলবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। লণ্ডনে প্রতিদিন একবার টাকা তোলা যায়।

(৪) য়ুরোপ আমেরিকার মতো চেকের সাহায্যে আমানত ও টাকা উঠাবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। ইংলণ্ডের ডাকঘরে বিশেষ ব্যাঙ্কের নামে ক্রস্ড্ চেক্ অথবা লিমিটেড্ কোম্পানীর নামে চেক্ দিলে গ্রাহ্য হয় না। বাংলাদেশেও লয়েড ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডো-বার্মা ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক (চট্টগ্রাম) আমানতকারীকে সেভিংস ব্যাঙ্ক হতে চেকের সাহায্যে টাকা তুলবার ক্ষমতা দিয়েছে। আপাততঃ পুরা টাকার কমে চেক্ কাটা চলবে না, এইরূপ আইন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরূপ ও ৬নং পরিবর্ত্তনের সহিত চেকের চলন হলে ছোট সহরের ও গ্রামের সওদাগরদিগের সুবিধা হবে।

(৫) আপনার নামে যদি ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে তা হলে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে অন্য যাদের হিসাব আছে তাদের যে কেউকে যে কোন ডাকঘরে আপনার নামে আপনার হিসাবে টাকা জমা দিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৬) বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পোষ্ট আফিসে হিসাব থাকে, সেই আফিস ছাড়া অন্যত্র টাকা তোলা যায় না। এই নিয়মটা সংশোধন করে যে কোন ডাকঘর থেকে টাকা তুলবার হুকুম থাকা উচিত।

ইংলণ্ডের সেভিংস ব্যাঙ্ক আইন এই হিসাবে সংশোধন হয়েছে। এ সব সুবিধা না থাকায় অল্প মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়। লোক টাকা টেঁকে করে তাদের হোটেলে, আড়তে বা নৌকায় রাত কাটাতে হয়। অনেক জায়গায় দেখেছি সওদাগর মোহর-করা টাকার থলে রাত্রে আড়তদারের কাছে রেখে দেয়। কিন্তু সেটাও নিরাপদ নয়। কারণ আড়তগুলি কোনো বিশেষ আইনের অধীন এখনো হয় নি। এই অসুবিধার হাত এড়াবার জন্য কিরূপ বে-আইনী কাজের আশ্রয় নিতে হচ্ছে তার দু' একটা নমুনা বলছি। এখনকার সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে এক নামে একটার বেশী হিসাব থাকতে পারে না। কিছুদিন আগে ধারওয়ারে একটা লোক ধরা পড়েছিল, যে ৮০টা সেভিংস ব্যাঙ্কে একাউণ্ট তার বিভিন্ন কল্পিত নাবালক আত্মীয়ের নামে খুলেছিল। তাতে মোট ব্যালান্স ছিল ৩০,০০০৲ টাকা। বড় ব্যাঙ্কের চেক্ পাকাপোক্তে চলে না। মফঃস্বলে ব্যাঙ্ক নাই যে দরকার মতো টাকা তুলে কাজ চালাবে। কাজেই লোক্ টাকা সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতে হয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যই সে নানা জায়গায় ডাকঘরে ৮০টা হিসাব খুলেছিল। যখন যেখানে দরকার স্থানীয় ডাকঘর থেকে টাকা তুলে নিত। এই লোকটা ছিল দালাল। বিজাপুরে একটা লোক ৪৩টা হিসাব খুলে কাজ চালাচ্ছিল। সুরাটে একজন ৩০টা এবং কারোয়ারে একটা লোক ১৯টা হিসাব খুলেছিল। বাংলাদেশেও যে এরূপ উদাহরণ না আছে তা নয়। তবে এত বেশীসংখ্যক হিসাব খুলেছে বলে এখনো কেউ ধরা পড়ে নি। বাংলাদেশে একটা সুবিধা আছে। গঞ্জে বা বন্দরে গিয়ে অল্প টাকার ঠেকা হলে পুরাণো ব্যবসায়ীকে আড়তদারগণই বিনা জামিনে বা বন্ধকে কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে টাকা ধার দেয়। কিন্তু নূতন ব্যবসায়ীর অসুবিধা আছে। তাকে হয়তো আড়তদার বিশ্বাসের উপর টাকা দেয় না। মাল চালান দেওয়ার পর রেলের বা জাহাজের রসিদের উপর টাকা দেওয়াও মফঃস্বলের লোন আফিসগুলার রেওয়াজ নয়। কাজেই গদিতে লিখে বা টেলিগ্রাম করে ডাকঘরের ইন্সিওর চিঠির সাহায্যে টাকা আনিয়ে তবে কাজ চালাতে হয়। ততদিনে হয়তো বাজার-দরের উঠানামা হয়ে গেছে। এ সব হ'তে কতটা আঁচ পাওয়া যায় যে, আমাদের ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের আইনের সংস্কার কোন্ লাইনে হলে ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে।

(৭) পাশ বই আমানতকারীর মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমানেও এরূপ আইন আছে বটে, কিন্তু কাজের বেলায় কেউ তাহা মানে না।

(৮) হোম সেভিংস্ বাঙ্ক ডাকঘরে চালান উচিত। ইংলণ্ডের ডাকঘরে এ ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশেও কো-অপারেটিভ সোসাইটী ও কোনো কোনো অফেট ব্যাঙ্কে এর ব্যবস্থা হয়েছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলি আমানত নেয় ধার দেয়; কিন্তু এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে নি। লোন আফিসগুলি সব রকম কাজই সুরু করেছে। কো-অপারেটিভ সোসাইটীও যদি টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, তা'হলে সেভিংস ব্যাঙ্ক, ভি: পি: চিঠি ও ইন্সিওর চিঠি থেকে ডাক ঘরের আয় ক্রমশঃ কম হবে বলে মনে হয়। সংখ্যাধিক্যেও কো-অপারেটিভ সোসাইটী আগে আছে :—

(১) বঙ্গদেশে লোন আফিসের সংখ্যা ৭৯৯ (১৯২৮ খৃঃ)

(২) ঐ কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সংখ্যা
১৫,৪৩৯ (১৯২৬-২৭ খৃঃ)

(৩) বঙ্গদেশ ও আসামে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৬৩৪ (১৯২৪-২৫ খৃঃ)

কৃষি কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় বাংলার কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর জে, এম, মিত্র বলিয়াছিলেন "আমি আশা করি ভবিষ্যতে ডাকঘর আর আমানত পাবে না, সব আমানতই কো-অপারেটিভ সোসাইটীতে আসবে।"

কিছুকাল আগে ব্যারিংটন্ স্মিথ কমিটিও সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, বিভাগীয় অসুবিধা সত্ত্বেও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর সংস্কারের চেষ্টা হওয়া উচিত। এখন যখন ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি কাজ সুরু করেছে, চিন্তাশীল

ব্যক্তিমাত্রকেই একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি যে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর এই পরিবর্ত্তন দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতির একটা কত দৃঢ় ভিত্তি গাড়া যেতে পারে।

কাপড়ের কলের মজুরদের জীবন-যাত্রার পরিচয়

তুলা এবং কাপড়ের কল বোম্বাই প্রদেশের প্রধান শিল্প-সম্পদ্। সুতরাং এই সমস্ত কলে নিযুক্ত মজুরগণ কি ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলে মোটা বোম্বাই প্রদেশের মজুর-কুলের জীবনযাত্রার অনেকটা ধারণা করা যাইবে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি যথেষ্ট করা হইয়াছে। ১৯২৫ সনে শোলাপুর সহরের মজুরগণের পারিবারিক আয়ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। কাজ আরম্ভ করা হয় ১,১৫০টী পরিবার লইয়া, ইহার মধ্যে ৭৮টী পরিবারের আয়ব্যয়ের ঠিক বিবরণ না পাওয়ার জন্য শেষ পর্য্যন্ত ১,০৫৫টী পরিবারের আয় ব্যয় লইয়া অনুসন্ধানাদি করা হয়। আলোচ্য মজুর পরিবারগুলির মধ্যে শোলাপুরের মজুর পরিবার ৯০২টী এবং বাকী ১৫৩টী পরিবার প্রকৃতপক্ষে ডোম বা বেদে জাতীয় অপরাধ-প্রবণ নীচ জাতীয়দের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

বুঝিবার সুবিধার জন্য এই অনুসন্ধান বিবরণীটী দুই অংশে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, শোলাপুর-নিবাসী মজুর পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, ১৫৩টী নীচ জাতীয় পরিবার সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

শোলাপুর-নিবাসী মজুর

শোলাপুরের ৯৫০টী মজুর পরিবারের মধ্যে শতকরা ৬১·১টী পরিবারের মাসিক আয় ২০ হইতে ৫০ টাকার মধ্যে; শতকরা ৮·৩টী পরিবারের আয় ২০ টাকারও নীচে; শতকরা ১১টীর ৫০ হইতে ৬০ টাকার মধ্যে; এবং শতকরা ১১·৬টীর আয় ৬০ হইতে ৯০ টাকা। এই সমস্ত পরিবারের শতকরা ৮০·৭টী হিন্দু এবং ১৯·১টী মুসলমান; শতকরা ৬০টী শোলাপুর বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম-নিবাসী; এবং শতকরা ৩২টীর উপর দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদবাসী।

মজুর পরিবার

এই সকল মজুর পরিবারে গড়ে ৪·৬ জন করিয়া লোক। ইহার মধ্যে ৪·৫৭ জন সকল সময়ে বাড়ীতেই থাকে এবং ·১১ বিদেশবাসী। বাড়ীতে থাকে ৪·৫৭ জনের মধ্যে প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ১·৬০, প্রাপ্ত-বয়স্কা নারী ১·৫৪ এবং চৌদ্দ বছরের চেয়ে কম বয়সের ছেলে মেয়ে ১·৪৩। এই পরিবারগুলি দুই জাতীয়। স্বামী স্ত্রী গঠিত পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪৩·৭৯টী এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার ৫৬·২১টী। স্বামী স্ত্রী গঠিত অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিবারের মধ্যে ৫৯·৮% কেবলমাত্র স্বামীর রোজগারের উপর নির্ভর করে, এবং ২৬·৫% পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই রোজগারের উপর। শতকরা ৯·৭টী পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেও মা-বাপের সাহায্য করে এবং শতকরা ৪টী পরিবারে চৌদ্দ বছরের নিম্ন বয়স্ক ছেলেমেয়েও রোজগার করিতে বাধ্য হয়। একান্নভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ১৭·১৮টী পরিবারে গৃহস্বামীই একমাত্র রোজগেরে; ১০·০৯টীতে কর্ত্তা ও গিন্নী উভয়েই খাটে এবং বাদবাকী পরিবারগুলিতে সকলেই খাটে।

স্বামী স্ত্রী গঠিত পরিবারের ২৪%, অর্থাৎ ৯১টী পরিবারে কেবলমাত্র স্বামী এবং স্ত্রী বর্ত্তমান; ১০২টী পরিবারে (অর্থাৎ ২৬·৯%) স্বামী, স্ত্রী এবং একটী ছেলে; ৯৩টী পরিবারে (২৪·৮%) স্বামী, স্ত্রী এবং দুইটী ছেলে; ৪৫টী

পরিবারে (১১·৯%) স্বামী স্ত্রী এবং ৩টী ছেলে ; ৩০টী পরিবারে (৭৯%) স্বামী, স্ত্রী এবং ৪টী ছেলে এবং ৩% পরিবারে স্বামী, স্ত্রী এবং ৪টীর বেশী ছেলে বর্ত্তমান। এই সমস্ত মজুর পরিবার কেবলমাত্র গৃহস্বামীর রোজগারের উপরেই নির্ভর করেনা। প্রত্যেক পরিবারের ৪·৫৭ জন লোকের মধ্যে ১·৯৬ জন রোজগার করে এবং ২·৬১ জন বসিয়া খায়। প্রত্যেক ১০০ পরিবারে ১৪৯ জন পুরুষ, ৪২ জন নারী এবং ৫ জন ছেলে রোজগার করে। সাধারণতঃ প্রত্যেক পরিবারে একজন কিংবা দুইজন রোজগার করে। কিন্তু দু'একটী পরিবারে ৭ জন পর্য্যন্ত রোজগেরে দৃষ্ট হয়।

মজুর-পরিবারের আয়

মজুরদের আয়ের মধ্যে কোনরূপ সমতা দেখা যায় না। এক পরিবারের মধ্যেও রোজগেরে মানুষের রোজগার-ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কেহ কেহ মাসে ৬ টাকারও কম উপায় করে, আবার কেহ কেহ মাসে ৮৪ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করে। প্রতি পুরুষ মজুরের উপার্জ্জনের পরিমাণ সাধারণতঃ ১৫ হইতে ২১ টাকার মধ্যে এবং নারী মজুরের ৬ টাকা হইতে ১২ টাকা।

পারিবারিক আয়-ব্যয়

প্রত্যেক মজুর পরিবারে কি কি খাতে শতকরা কি পরিমাণে ব্যয় করা হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কি কি খাতে খরচ করা হয়	এক একটী খাতে আয়ের শতকরা কি পরিমাণ ব্যয় হয়
খাদ্য-দ্রব্য	৪৯·২৫
কাঠ কয়লা ও আলো	৯·৬০
কাপড়চোপড়	১১·৮৬
বিছানা ও আসবাবপত্র	১·০০
ঘর ভাড়া	৬·২৭
বিবিধ	২২·০২
	১০০·০০

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, অর্দ্ধেক ব্যয় শুধু খাদ্য-দ্রব্য সংস্থানের জন্য। ইহার পর বিবিধ বিষয়ে খরচ। মোট খরচের তুলনায় এই খাতে একটু বেশী মাত্রায় খরচ হয় বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইহার মধ্যে ঋণ শোধ রাহা খরচ ইত্যাদি বিশেষ দরকারী কাজের ব্যয়ও ধরা হইয়াছে।

বসত বাটী

বোম্বাই এবং আহ্‌মদাবাদের তুলনায় শোলাপুর মজুর বস্তীর অবস্থা ঢের ভাল। এই সহরে ঘর বাড়ী আদৌ ঘেঁসাঘেঁসিভাবে অবস্থিত নয়। সহর বাড়াইবার মত চারিদিকে জমিও আছে বিস্তর। শোলাপুরের মিল-গুলি হইতে মজুরদের বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে শতকরা ১২ জন মজুর মালিকদিগের দেওয়া বাড়ীতেই বাস করে। এখানকার কুলিরা ২টী ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে বাস করে ; কিন্তু বোম্বাই এবং আহ্‌মদাবাদের কুলিদের ভাগ্যে মাত্র একটী করিয়া ঘর। শোলাপুরে আবার ঘর-ভাড়াও এই দুই সহরের তুলনায় সস্তা। শোলাপুরবাসী শতকরা ৬৫টী কুলি পরিবার মালিক ৩ টাকার কম ঘর ভাড়া দেয় ; শতকরা ২৩টী পরিবারের ঘর-ভাড়া ৩।৪ টাকা, এবং বাদবাকী পরিবারগুলিকে ঘর ভাড়া দিতে হয় ৪ টাকার উপর। এই সমস্ত ঘরের প্রত্যেকটী ঘর গড়ে ৯২ বর্গফুট, এবং এক একটী কুলির হিস্তায় পড়ে ৩৯ বর্গফুট। বোম্বাই সহরে কুলি-গৃহের মাপ ১০৪ বর্গফুট বটে, কিন্তু প্রত্যেক কুলির হিস্তায় পড়ে মাত্র ২৪·৭ বর্গফুট।

শোলাপুর-নিবাসী কুলিদের সাধারণ অবস্থা

বোম্বাই আহ্‌মদাবাদের কুলিদের চেয়ে শোলাপুরের কুলির চেহারা মোটাসোটা বেশী, তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও বেশী। ইহার কারণ শোলাপুরের আবহাওয়া ভাল ; বাস-গৃহের অবস্থা ভাল, শোলাপুরের কুলিদের মধ্যে পান দোষ কম এবং শারীরিক উন্নতিবিধানের পক্ষে শোলা-পুরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভাল।

বোম্বাই প্রদেশের কুলিগণ ছেলেমেয়েকে আফিং খাওয়াইয়া থাকে। সোলাপুরে এই অভ্যাস আবার বোম্বাই সহরের চেয়ে বেশী। ১৫ দিনের শিশুকে অহিফেন খাওয়ান হয় এবং ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ খাওয়ান চলিতে থাকে। এই প্রদেশের মজুরকুল আবার ঋণ করিতে পটু। সোলাপুরে কুলির শতকরা ৬০ জন ঋণগ্রস্ত।

২। অপরাধ-প্রবণ নীচ জাতীয় মজুর

অপরাধ-প্রবণ নীচ জাতির জন্য সোলাপুরে দুইটী উপনিবেশ আছে। প্রথমটী কল্যাণপুর সেটেলমেণ্ট এবং দ্বিতীয়টী উমেদপুর সেটেলমেণ্ট। ১৯২০ সনে এই দুইটী উপনিবেশে যথাক্রমে ১,৭২০ জন এবং ২,১৬৪ জন লোক বাস করিত। কল্যাণপুর সেটেলমেণ্ট নিবাসী পরিবারগুলি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। যে ১৫৩টী পরিবার লইয়া পারিবারিক বাজেট স্থির করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় অধিকাংশ পরিবারেরই আয় পড়ে মাসিক ৪০ টাকার নীচে। শতকরা ১৯টী পরিবারের মাত্র আয় ৪০ টাকা বা তার উপর; কিন্তু কাপড়ের কলের অন্যান্য মজুর-পরিবারের আয় পড়ে ৪৩১ টাকা। এই সেটেলমেণ্টে মজুর-পরিবারে ৪·৯০ জন করিয়া লোক। ইহার মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ১·৫২ জন, ১·৫৭ জন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক এবং ১·৮১ জন ছেলেমেয়ে। এইসকল পরিবারের একটী লোকও বিদেশবাসী নয়। পরিবারস্থ ৪·৯০ জন লোকের মধ্যে খাটুনে ১·৯৩ জন এবং বসে খাকা ২·৯৭ জন।

পারিবারিক আয়ব্যয়

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মাসিক মজুরি পড়ে ১৫ হইতে ২১ টাকা পর্য্যন্ত এবং স্ত্রী-মজুরের ৬ হইতে ৯ টাকা মাত্র। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে সেটেলমেণ্ট পরিবারগুলি কিরূপ খরচপত্র করে তাহা বুঝা যাইবে :—

কি কি খাতে খরচ হয়	এক একটী খাতে আয়ের শতকরা কতটা খরচ হয়
খাদ্যদ্রব্য	৫৩·২৭
কাঠ কয়লা আলো	১০·২৬
কাপড় চোপড়	১১·৩০
বিছানা ও আসবাব	১·০৩
ঘর-ভাড়া	২·৩৬
বিবিধ	২১·০৮
	১০০·০০

সেটেলমেণ্টনিবাসী নীচ জাতীয় মজুরদের আহার্য্য দ্রব্য নিতান্ত সাদাসিধা; রকমারি কিছু আদৌ নাই। প্রধান খাদ্যদ্রব্য 'জোয়ার'। খরচের অর্দ্ধেক যায় খাওয়ার জিনিষ কিনিতে, এবং ইহার অর্দ্ধেক দিয়া মাত্র "জোয়ার" কিনা হয়। জোয়ারের পরেই ছাগমাংসের স্থান; ইহার জন্য ব্যয়িত হয় মাসিক মোট খরচের ৭·১১%। এই সমস্ত পরিবারে চা আদৌ ব্যবহৃত হয় না, এবং দুধ, চিনি ও ঘী ইত্যাদিও খুব কমই ইহারা কিনে।

বসত বাটী

সেটেলমেণ্ট কর্ত্তারা এই সব ছোট লোকদের সবাইকে ঘর-বাড়ী যোগাড় করিয়া দেন না। কতকগুলি ব্যারাক জাতীয় 'চল' নামধেয় বসতবাটী এই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ছোটলোকেরা নিজেই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লয়। জমির খাজনা নামমাত্র, এক খণ্ড জমির খাজনা ৭ হইতে ১০ আনা মাত্র।

পানাসক্তি

এই ক্রিমিনাল সেটেলমেণ্টবাসীরা অত্যন্ত মদ্যপায়ী। শতকরা ৮৮টী পরিবার পয়সা খরচ করিয়া মদ খায়। ইহাদের ধারও যথেষ্ট; শতকরা প্রায় ৮০টী পরিবার ঋণ-জালে জড়িত।

সিংহলের কৃষি

চা

১৯২৮ সনে সিংহল দ্বীপ হইতে ২৩৪,৮১০,১৬১ পাউণ্ড ওজনের কালো চা ও ১,৮২৮,৬১৮ পাউণ্ড ওজনের সবুজ চা রপ্তানি হয়। ১৯২৭ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে কালো চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সবুজ চায়ের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। বিদেশে সিংহল চায়ের চাহিদা সমানভাবেই ছিল, যদিও বড় কিছু কমিয়া যায়। মোটের উপর সিংহলের চা-শিল্প এখনও একটী লাভজনক ব্যবসারূপেই আছে। ভাল সিংহলী চায়ের আদর এবং কাটতি দুইই ইউরো-আমেরিকার বাজারে বাড়িতেছে। ১৯২৮ সনে নূতন নূতন কয়েকটী চা-বাগিচাও হইয়াছে। চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধির ইহাও একটী কারণ। মোট কথা সিংহল দ্বীপে চা-চাষের জন্য খুব যত্ন করা হয় এবং প্রাকৃতিক অবস্থাও চা-চাষের অনুকূলে। চা-গাছের শিকড়ের এক প্রকার ব্যাধি আছে; এই ব্যাধির জন্য এবং অন্যান্য রোগের জন্য চায়ের কতদূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ১৯২৮ সনে জলবায়ুর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। সিংহলের চা-শিল্পে অনেক নূতনত্ব বিধান করা হইয়াছে। এইজন্য দেশ-বিদেশের চা-করগণ সিংহল দ্বীপের চা-শিল্প দেখিবার জন্য আসিয়া থাকে।

চা-গাছের নার্সারি

চায়ের গাছে জমির পুষ্টিকর পদার্থ ক্ষয় করিয়া ফেলে; জমির এই ক্ষয়রোগ (সয়েল ইরোসান) যাহাতে নিবারিত হইতে পারে এমন উপায় এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সবুজ সার প্রয়োগেও বিশেষ ফল হয় নাই। এই ক্ষয় নিবারণের জন্য অনেক সময় চায়ের জমিতে এক প্রকার গাছ লাগান হয়; এই গাছ জমির উন্নতি বিধান করে সত্য, কিন্তু এই গাছের ঝোপে ঝাপে আড্ডা পাড়িয়া থাকে। চা-গাছ জন্ম করিয়া ছাঁটিয়া ফেলার ব্যবস্থা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ছোট ছোট চা-বাগিচার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত চা-বাগিচার চারা সরবরাহ করার জন্যই সিংহলে যথা প্রদেশে চা-গাছের নার্সারিগুলির জন্ম হইয়াছে। সরকার হইতে এই নার্সারিগুলির কার্য্যকলাপের উপর যথেষ্ট নজর রাখা হয়; কারণ নার্সারিগুলি হইতে নানা জাতীয় চা-বাগিচার রোগ বাগিচাগুলিতে চালান হইয়া থাকে। এই জন্য আইনকানুনও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নার্সারি-গুলি সরকার কর্ত্তৃক ৫টী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর নার্সারি দ্বীপের সর্ব্বত্র চারা চালান দিতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিতে চারা চালান দেয়, তৃতীয় শ্রেণী রেজেনিউ ডিষ্ট্রীক্টগুলিতে, চতুর্থ শ্রেণী চিফ্ হেড্ ম্যানের ডিভিসনে চারা চালান দিতে পারে। কিন্তু ৫ম শ্রেণীর নার্সারিগুলি হইতে আদৌ চারা চালান দিতে দেওয়া হয় না। ১৯২৮ সন হইতে আবার চারা চালান দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট পারমিট বা লাইসেন্স লইতে হয়। চা-গাছের রোগের বীজ যাহাতে দ্বীপময় ছড়াইয়া না পড়ে, এই অজুহাতেই এত কড়াকড়ি করা হইতেছে। ১৯২৭ সনের চেয়ে ১৯২৮ সনে লাইসেন্স এবং চারা চালান দুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৯ সনে পারমিটের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০১৮টী এবং চারা চালান যায় ৮,৩৭৩,৯৭৮টী। আলোচ্য সনে ২৫২,০০০টী চারার জন্য ২৮ খানি পারমিটের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

চা গাছের নানাপ্রকার রোগ নিবারণের জন্য চা-গবেষণা-ভবনের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ্ অনেক চেষ্টা করিতে-ছেন। এইসব রোগ নিবারণ এবং ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও এই সরকারী বিভাগ হইতে করা হইতেছে।

রবার

১৯২৮ সনে সিংহল হইতে ৬২,৩৭৪ টন রবার রপ্তানি হইয়াছে। মূল্য ৮০,১১৫,০৬২ টাকা। ১৯২৭ সনে রপ্তানি হয় ৬০,১২৮ টন, মূল্য ১২৯,১৫৭,৬৪০ টাকা।

ষ্যাটেক্স রপ্তানি হয় ৬৮৩ গ্যালন, দাম ১,৫৫৯ টাকা। বৎসরের প্রথম দশ মাস ধরিয়া রেক্টীফাইড স্পীরিট যাহাল ছিল, এই দশ মাসে ৬০% মাল রপ্তানি হইয়াছে। এপ্রিল মাসে স্থির হয় যে, অক্টোবর মাস হইতে রেক্টীফাইড বাতিল হইবে। সকলেই ভয় করিয়াছিল, রেক্টীফাইড বাতিল হইলে অতিরিক্ত মাত্রায় মাল চালান যাইয়া লণ্ডনের রবারের বাজারে ভীষণ দুর্যোগ দেখা দিবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোন দুর্যোগ দেখা দেয় নাই। ১৯২৮ সনের ১ম ১০ মাসে ১৯২৭ সনের তুলনায় মাল অত্যন্ত কম রপ্তানি হয়, অথচ আমেরিকা এবং ইউরোপের বাজারে রবারের টান বাড়িতে থাকে। লণ্ডনে মালের দাম ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং 'রেক্টীফাইড' তুলিয়া দেওয়ার পর রবারের দাম হঠাৎ কমিয়া গিয়া কোনরূপ দুর্যোগ উপস্থিত হয় নাই।

১৯২৮ সনে রবার রেক্টীফাইড কাণ্ড হইতে রবার-চারার নার্সারি খোলার জন্য অনেক টাকা খরচ করা হয়। এই অর্থ দ্বারা পেরাডেনিয়া, পাসপলা, কাস্তি প্রভৃতি স্থানে নার্সারি খুলিয়া নানা জাতীয় রবার বৃক্ষ লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। ইহা ছাড়া সিংহল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী রবার-গবেষণা-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রবার গাছের নানাপ্রকার রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে গবেষণা করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯২৮ সনে এই সমিতির চাঁদা-দাতার সংখ্যা ছিল ২২ জন, ১৯২৭ সনে ২১৪ জন। চাঁদা-দাতাগণের দেয় অর্থের পরিমাণ ৩৪,৫২৭·৫৩ টাকা, সিংহল গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ৬৭,৫০০৲ টাকা এবং রবার ক্ষেত্রের মালিকগণের সমিতি হইতে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ২,০০০ পাঃ। এই রবার গবেষণাগারে রবারের স্থিতি-স্থাপকতা সম্বন্ধে গবেষণা করা হইতেছে। এইজন্য রবার গুদামে রাখার সময় প্রয়োজনানুযায়ী তাপে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে একেবারে গাছ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রবার পাওয়া যাইতে পারে এমন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও গবেষণা চলিতেছে।

সমাজ-বীমা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

বার্দ্ধক্য-পেন্‌শন

বিলাতে ১৯০৮ সনে বার্দ্ধক্য-পেনশন আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে, যে সকল মানুষ অন্ততঃ দশ বৎসর কাল বিলাতী প্রজাভাবে বাস করিয়াছে, কিংবা যে সমস্ত বিলাতী প্রজা ৫০ বৎসর পার হওয়ার পর অন্ততঃ ১২ বৎসর বিলাতে বসবাস করিতেছে, আর যাহাদের আয় একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চেয়ে কম, তাহারা বার্দ্ধক্য-পেন্‌শনের-অধিকারী। মহাযুদ্ধের সময় পেন্‌শনের হার স্থির করা হয় ৫ হইতে ১০ শিঃ পর্য্যন্ত। আয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হয় ৪৯ পাঃ ১৭ শি, ৬ পেঃ পর্য্যন্ত। পেনশন্ প্রাপ্ত ব্যক্তির আয় অনুসারে পেন্‌শনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। পেন্‌শনের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ১ শিঃ।

১৯২৮ সনের চাঁদাযুক্ত পেন্‌শন ব্যবস্থায় বীমাকারী, ৬৫ হইতে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ নরনারীগণকে এবং ঐ বয়সের বীমাকারী পুরুষের স্ত্রীকেও সপ্তাহে ১০ শিঃ করিয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

৭০এর উর্দ্ধবয়স্ক নরনারীর পেনশনের উপায় করা হয় কর আদায় করিয়া। সমাজ বীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই পেন্‌শন্ ব্যবস্থাগুলি বুঝিয়া লেখার

দরকার। কারণ কর-আদায়ের উপর এইগুলি নির্ভর করে। মানুষ এই কর যোগায় বুড়া বয়সে তাহাদের সংস্থান হইবে বলিয়া। যে আয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে সে সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি আছে। কারণ ইহাতে মিতব্যয়িতার জন্য মানুষকে শাস্তিভোগ করিতে হয়। পেন্‌সনের বরাদ্দ পাছে কম হয় এই ভয়ে মানুষ সমর্থ থাকার সময় কিছু সঞ্চয় করিতে চাহিবে না। ১৯১৯ সনে ডিপার্টমেণ্টাল কমিটি "নির্দ্দিষ্ট আয়ের পরিমাণ" তুলিয়া দিবার জন্য মত প্রকাশ করেন। ৭০ বৎসর পার হইলে সকলকে পেন্‌শন দিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা করিতে চান। কিন্তু এপর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করা হয় নাই।

কতকগুলি সমালোচকের মত এই যে, নির্দ্দিষ্ট আয়ের বাঁধাবাঁধি তুলিয়া দিয়া ৬৫ বৎসর পার হওয়ার পর সকল লোকেরই পেন্‌শন হওয়া উচিত। অধিকাংশ লোক ৬৫ বৎসর বয়স হওয়ার পূর্ব্বেই অশক্ত হইয়া পড়ে। তাহারা একাধিক কারণে চাঁদাযুক্ত পেন্‌শন বীমার সুবিধায় বঞ্চিত হয়। চাঁদাযুক্ত বীমার সাহায্যের বরাদ্দ মাত্র সপ্তাহে ১০ শিঃ। এই অর্থে কাহারও খরচপত্রের সঙ্কুলান হইতে পারে না। সুতরাং বৃদ্ধগণকে অনেক সময় দরিদ্র আইন বা বেসরকারী বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়।

১৯১৯ সনে গণনা করিয়া দেখা যায়, ৭০ বৎসর হইতে ৬৫ বৎসরে কমাইলে পেন্‌শন-ভোগীদিগের সংখ্যা ৯২০,০০০ হইতে ১৫,০০,০০০ জনে গিয়া দাঁড়াইবে। আবার যদি নির্দ্দিষ্ট আয়ের বাঁধাবাঁধি তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১,৫৭৭,০০০ জন হইতে ২,৬৯২,০০০ জনে দাঁড়াইবে। সাপ্তাহিক সাহায্যের বরাদ্দ যদি ১০ শিঃ ধরা হয়, তাহা হইলে প্রথম ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়িয়া ২৩,৪০০,০০০ পাঃ হইতে ৩৭,৯০০,০০০ পাঃএ দাঁড়াইবে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৪১,০০০,০০০ পাঃ হইতে ৭০,০০০,০০০ পাঃএ দাঁড়াইবে।

এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে অতিরিক্ত কর দিতে হইবে ইহা যথার্থ, কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত পক্ষে অধিক আর্থিক ক্ষতি সহিতে হইবে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। দরিদ্র আইনের উপর নির্ভরকারী লোকের সংখ্যা ইহাতে কমিয়া যাইবে, সুতরাং দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে যে কর দিতে হয় তাহার পরিমাণও কমিয়া আসিবে। "ওয়ার্ক হাউস" নিবাসী ৬৫ বৎসর হইতে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধের সংখ্যা কমিয়া আসিবে। আর এই জন্য নিতান্ত কম অর্থ বাঁচিয়া যাইবে না। কারণ প্রত্যেক বৃদ্ধের জন্য সপ্তাহে ১পাঃ ১৫শিঃ ৬পেঃ খরচ করা হয়। আর্থিক লাভক্ষতির দিক্ হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এই উপায়ে সুবিধাই হইবে। কারণ দারিদ্র্য নিবারণের জন্য যে করভার প্রজাকে বহন করিতে হয়, তাহার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং তাহা যে পরিমাণ কমিবে, তাহার চেয়ে অনেক কম অর্থই পেন্‌শন বিল খাতে তাহাদিগকে জমা দিতে হইবে। জনের কল্যাণ সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

অনাথ ও বিধবার পেন্‌শন্

১৯২৫ সনে বিলাতে বিধবা রমণী ও অনাথ বালক-বালিকাগণের জন্য পেন্‌শন খোলা হয়। এই নূতন ব্যবস্থাবিধানের জন্য চাঁদা তোলা হয় এবং ইহা বাধ্যতামূলক। জাতীয় স্বাস্থ্য বীমার সহিত এক সঙ্গে ইহার কার্য্য পরিচালিত হয়।

১৯২৬ সনের ৪ঠা জানুয়ারি হইতে ইহার জন্য চাঁদা আদায় হইতেছে। পুরুষের জন্য চাঁদা আদায় হয় ৯পেঃ (ইহার মধ্যে মালিকদের ৪½ পেঃ এবং শ্রমিক ৪½ পেঃ) এবং নারীর জন্য ৪½ পেঃ (মালিকদের ২½ পেঃ এবং নারী শ্রমিক ২ পেঃ)। এই চাঁদা আদায়ের জন্য বেকার বীমা ও জাতীয় স্বাস্থ্য বীমার চাঁদার পরিমাণ কিছু হ্রাস করা হইয়াছে। সুতরাং বাধ্যতামূলক বীমাগুলির জন্য যে সকল চাঁদা আদায় হয়, এই নূতন বীমার জন্য তাহার মোট পরিমাণ জন প্রতি সপ্তাহে মাত্র ২ পেঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সাহায্যের পরিমাণ বীমাকারী পুরুষের বিধবা স্ত্রীর পক্ষে সপ্তাহে ১০ শিঃ। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদিগকেও সাহায্য করা হয়। সাহায্যের পরিমাণ জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্য সপ্তাহে ৫ শিঃ এবং অন্যান্য সন্তানের জন্য ৩ শিঃ। বিধবা নারীর যত দিন পর্য্যন্ত না ৭০ বৎসর বয়স হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত সে বিবাহ না করে, ততদিন

পর্য্যন্ত তাহাকে সাহায্য দেওয়া হয়। মাতার পুনর্ব্বিবাহের জন্য সন্তানগণ কিন্তু সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় না। বীমা-কারী ব্যক্তির অনাথ সন্তানের জন্যও সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ অনাথ সন্তানকে সপ্তাহে ৭ শিঃ ৬ পেঃ করিয়া সাহায্য করা হয়। এবং যদি অনাথ সন্তান স্কুলে পড়ে, তাহা হইলে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাহায্য করা হয়।

এই নূতন নূতন পেন্‌শন যোজনাবিধাগুলি সম্বন্ধে নানা-দিক্ হইতে আপত্তি উঠিয়াছে। এক দল বিরুদ্ধবাদী বলিতেছে, শিল্পের উপর গুরু ব্যয়ভার চাপান হইতেছে। বর্ত্তমানে শিল্পগুলির পক্ষে এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভবপর নয়। একটী একক শিল্পের পক্ষে হয়তো এই ব্যয়-ভার অসহনীয় হইতে পারে; কিন্তু সাপ্তাহিক মজুরির মাথায় এই অতিরিক্ত ছ'চার পেনি বর্দ্ধনের বিষয় নয়। শিল্পক্ষেত্রে এজন্য সেরূপ কোন অসুবিধা না ঘটিবারই কথা। আর একটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে, দারিদ্র্য-কর এই জন্য কমিয়া যাইবে।

আর এক দল সমালোচকের মত এই, বীমা ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত নিশ্চয়ই তবে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা ঠিক নয়। কর আদায়ের উপর এই ব্যয়ভার বহন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে দায়িত্ব সমাজের সকলের ঘাড়ে সমান ভাবে পড়িবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সমগ্র অধিবাসীর মাত্র শতকরা ৭০ জন লোককে এই ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। অনেক নারী শ্রমিক যাহারা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকেও চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু এই দায়িত্ব কেবলমাত্র কোন বিশেষ চাঁদা-দানকারী দলের তরফ থেকে বিচার করিলে চলিবে না। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, চাঁদা আদায় করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে বীমা যোজনাবিধা অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে চালান যাইতে পারে।

যেরূপ চাঁদা আদায় হয় সেই তুলনায় সাহায্য দেওয়া হয় অত্যন্ত অল্প, এই বলিয়া আর একটী আপত্তিও উঠিয়াছে। বিধবা ও অনাথ বালকবালিকাকে সপ্তাহে মাত্র ১০ শিঃ করিয়া সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইহাতে প্রাণাচ্ছাদনের সঙ্কুলান হওয়াই মুস্কিল। সুতরাং ইহাদিগকে অনেক সময়ে "দরিদ্র আইনের" সাহায্য লইতে হয়। তা ছাড়া সাহায্য-প্রাপ্ত বিধবা নারী পেট চালানোর জন্য অনেক সময় অল্প মজুরিতে কার্য্য করিতেও রাজী হয়। ফলে মজুরির হার নামিয়া গিয়া যাহারা সাহায্য পায় না তাহাদের অসুবিধা ঘটায়। এই জন্য যুবতী বিধবা রমণীগণকে সাহায্য দিবার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। বিধবা রমণী গতর খাটাইবে না এই সর্ত্তে তাহাদিগকে পেন্‌শন সুবিধা বা সরকারী সাহায্য ভোগ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা করিবার আগে বর্ত্তমান পেন্‌শনের হার চড়াইয়া দিতে হইবে।

এই সমস্ত বা অন্যান্য নানা প্রকার দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, এই ব্যবস্থায় জাতির অগ্রগতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এবং নিঃসন্দেহে এরূপ আশা করা যায় যে, অবস্থা ভাল হইলে পেন্‌শন ব্যবস্থাগুলি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া পড়িবে।

কবর-বীমা

কবর বীমার দেয় চাঁদার পরিমাণ যদিও অত্যল্প, তবুও বৎসর বৎসর এই তহবিল হইতে অকাতরে অর্থব্যয় করা হইতেছে। ১৯২২ সনে কেবলমাত্র বেকার-বীমার নীচেই এর স্থান ছিল। ঐ বৎসর নানা জাতীয় সমাজ বীমার মোট ব্যয় ১৫৮,৫০০,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে এই কবর-বীমা তহবিল হইতে ব্যয় করা হইয়াছিল ৩৫,০০০,০০০ পাঃ। কার্য্যতঃ বে-সরকারী কোম্পানীগুলির দ্বারা এই বীমা-কার্য্য পরিচালিত হয়। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে সরকারী জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানও আছে। রাষ্ট্র পোষ্ট আফিসের দ্বারা এই বীমার পলিসিগুলি বাহির করে, কিন্তু লোকে এ সম্বন্ধে তত্তদূর জানে না, সুতরাং ইহার সুবিধা ভোগ করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। অন্যান্য বান্ধব সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির দ্বারাও কবর বীমা সাধিত হইয়া থাকে, অনেকগুলি সমিতির আর্থিক অবস্থা এরূপ ভাল নয় যে, হাজার হাজার শ্রমিককে বীমাভুক্ত করিয়া লইতে পারে।

এই বীমার অধিকাংশই বে-সরকারী কোম্পানীগুলির হাতে। প্রধান প্রধান আটটী কোম্পানী বৎসরে প্রায়

তিন কোটি পাঃ চাঁদা তুলিয়া থাকে। কার্য্যপরিচালনায় অত্যধিক ব্যয় হয়। প্রিমিয়াম লাভের প্রায় শতকরা ৩০।৪০ ভাগ এই জন্য খরচ হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর আগে অবস্থা আরও খারাপ ছিল। বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীগুলির মধ্যে যেরূপ তুমুল প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে ব্যয় অত্যধিক হইবারই কথা। সুতরাং অনেকে এই বীমার শাসন-কার্য্য রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিবার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিতেছে। রাষ্ট্র যখন বৃদ্ধগণকে পেন্‌শন দিবার ব্যবস্থা নিজের হাতে লইয়াছে তখন কবর-বীমাও নিজের হাতে লওয়া উচিত। প্রথমে যখন স্বাস্থ্য-বীমা বিল উত্থাপন করা হয়, তখন কবর বীমাও উহার মধ্যে ঢুকান হইয়াছিল, কিন্তু প্রবল বীমা কোম্পানীগুলি বিপক্ষতাচরণ করায় উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

সমাজ-বীমার একতা-সম্পাদন

সমাজ-বীমার একতা-সম্পাদন বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কাহারও কাহারও মতে ভিন্ন ভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা আনয়ন করিলেই যথেষ্ট। যাহাতে একই কাজ দুই দুইবার অথথা সাধিত না হয় সেদিকে নজর রাখার দরকার। বীমা কোম্পানীগুলি যা করিতেছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করার দরকার নাই। রাষ্ট্র কেবল ঐগুলির দেখাশুনা করিবে। অন্য দলের মত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একতা সম্পাদন অসম্ভব। ইহাদের মতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার স্থানে একটীমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে হইবে। শেষোক্ত দলের যুক্তিবাদগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখা যাক। প্রথমতঃ, যে-সরকারী প্রচেষ্টা যেখানে গুণে ও পরিমাণে নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ে, কার্য্য পরিচালনও যখন যে-সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা আশানুরূপ হয় না, তখন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কবর-বীমা ও শ্রমজীবিগণের ক্ষতিপূরণ বীমায় যে-সরকারী কোম্পানীগুলি কাজের সব অন্দোবস্ত করিতে পারিতেছে না। সুতরাং এ দুইটীর ভার রাষ্ট্রের লওয়া উচিত। একই কাজ রাষ্ট্র ও অন্যান্য কোম্পানীর হাতে থাকিলে নানারূপ অসুবিধাও ঘটিয়া থাকে। আবার বীমা প্রতিষ্ঠান যত বড় হইবে কাজের অন্দোবস্ত তত ভাল হইবে, আর্থিক ক্ষতি তত কম হইবে, হিসাবপত্রে ভুলের সম্ভাবনা তত কম হইবে এবং মোট মুনাফা ও সাহায্যের পরিমাণ স্থির করার পক্ষেও তত সুবিধা হইবে।

সরকারী একচেটিয়া অধিকার বনাম সরকারী প্রতিযোগিতা

একতা সম্পাদনের পথে বিঘ্ন রহিয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া এই সমস্ত দূর করিতে পারা যায় না তাহা নয়। যে সমস্ত বেসরকারী কোম্পানী এতদিন বীমা ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছে তাহাদের স্বার্থ লইয়া প্রথম বাধা উপস্থিত। বড় বড় কোম্পানী ও বান্ধব সমিতিগুলির পার্লামেণ্টে যে প্রভাব আছে তাহা দূর করিলেই যে লেঠা চুকিয়া গেল তাহা নয়। আরও অনেক কিছু বুঝিবার দরকার। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করিয়া হাজার হাজার লোক উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি উঠাইয়া দিলে এই সমস্ত লোক বেকার হইয়া পড়িবে। একটীমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান খাড়া করিলে এই সমস্ত কর্ম্মচ্যুত মানুষকে কাজে নিযুক্ত করা যাইবে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি কিছু করিবার উপায় নাই। কিন্তু তবুও বলিতে হয় বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অত্যন্ত বেশী। রাষ্ট্রের হাতে আসিলে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির চাকুরিয়াগণের সংখ্যা-হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। আর একটী অন্তরায় এই যে, যদি সমস্ত ভার সরকারই গ্রহণ করে, তাহা হইলে বেসরকারী কোম্পানীগুলির কিরূপে ক্ষতিপূরণ করা হইবে।

বর্ত্তমানে বীমা জগতে রাষ্ট্র যদি বেসরকারী কোম্পানীগুলির প্রতিযোগিরূপে দাঁড়ায়। এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতে পারে। অবশ্য লক্ষ্য থাকিবে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীগুলির রক্ষা করা। বীমা বস্তুর জাতীয়তা সম্পাদন রেলওয়ের জাতীয়তা সম্পাদন হইতে বিভিন্ন। কারণ ষ্টেট রেলপথ চালাইতে হইলে, রেলপথগুলি

হস্তগত করিতে হইবে। কারণ ঐগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বীমা-ব্যাপারে সেরূপ মোটা পুঁজির দরকার নাই। অন্যান্য কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পলিসি বাহির করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত সম্ভবপর। একচেটিয়া অধিকার করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইলে রাষ্ট্রকে আর ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। কোম্পানীগুলি খরচপত্র কমাইয়া অধিকতর সুবিধা-দানের দিকে মনোযোগী হইবে।

রাষ্ট্র যদি এই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া ক্রমশঃ বীমা কোম্পানীগুলি উঠাইয়া দিতে উদ্যত হয়, তবে বেকার সমস্যাও উপস্থিত হইবে না। বৎসর বৎসর অল্প পরিমাণ লোক বেকার হইলে অন্যান্য কাজে ঢুকিয়া যাইতে পারিবে। বহুদিন পর্য্যন্ত সময় দেওয়ার ফলে, অনেক কর্ম্মচারী ততদিন মরিয়াও যাইবে বা পেন্‌শন লইতে পারিবে। আবার বীমা ব্যবসায়ে যে সমস্ত অর্থ খাটিতেছে সে সমস্তও আস্তে আস্তে অন্যান্য ব্যবসাতে নিয়োজিত হইবার অবসর পাইবে।

বীমাক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র একচেটিয়া অধিকারের প্রথা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকে গোটা বীমা ব্যবসাই হস্তগত করিতে হইবে। কারণ অল্প কোম্পানী যদি বেশী সাহায্যদানে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে লোকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক পাতাইবে না। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে বীমাজগতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন না করিয়া আর পাঁচটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিরূপে দাঁড়ান উচিত।

ভারতীয় শ্রমিক কমিশন

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল

ভারতীয় শ্রমিকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পন্থা নির্ণয় করিবার জন্য বিগত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে এক রয়াল কমিশনের নিয়োগবার্ত্তা ঘোষিত হয়। আজ কয়েক সপ্তাহ হইল এই কমিশনের মেম্বরগণ একত্র হইয়া যথারীতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইঁহাদের অনুসন্ধান ব্যাপার চলিতেছে। উক্ত কমিশন কি পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিবেন কি কি বিষয়ে ইঁহাদের অনুসন্ধান চলিতেছে সে সম্বন্ধে মোটামুটি খবর দেওয়া গেল। এসম্বন্ধে এখন হইতেই যথেষ্ট আলোচনা হওয়া উচিত।

শ্রমিক কমিশন তাঁহাদের অনুসন্ধান-কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহা বিবিধ সঙ্ঘ এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রচারিত করিয়াছেন। এইসকল সঙ্ঘ এবং প্রতিষ্ঠান সেই তালিকা অনুসারে তথ্য-সংগ্রহ করিয়া কমিশনের নিকট জবাব পাঠাইতেছে। উক্ত তালিকায় মোট ১৪৬টি বিষয় সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে ও তাহা ১৮টি পৃথক ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে এই ভাগগুলির নাম দেওয়া হইল।

১। মজুর-সংগ্রহ
২। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মি-সংবাদ
৩। মজুরের বাস-ব্যবস্থা
৪। শ্রমিকের স্বাস্থ্যরক্ষা
৫। শ্রমিকের হিতকল্পে বিবিধ অনুষ্ঠান
৬। শিক্ষা
৭। আপদ নিবারণ ব্যবস্থা
৮। শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা
৯। মোট খাটিবার সময়

১০। স্ত্রী-মজুর ও শিশু নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ প্রশ্ন
১১। সমুদ্রগামী জাহাজ ও আভ্যন্তরীণ ষ্টীমার কোম্পানীর শ্রমিক সম্বন্ধে প্রশ্ন
১২। মজুরী-তথ্য
১৩। শ্রমিকের পটুতা
১৪। ব্যবসায়ী সঙ্ঘ
১৫। শিল্পানুষ্ঠানে সংঘর্ষ
১৬। শ্রমিক ও নিয়োগ-কর্ত্তার সম্বন্ধ নিয়ামক আইন
১৭। শ্রম-সুখকরীয় বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
১৮। শ্রম সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা

উপরের ভাগগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রমিক কমিশন যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মূল উদ্দেশ্য তথ্য-সংগ্রহ করা ব্যতীত আর কিছু নহে। তথ্যের দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গেলে বিভিন্ন শিল্পে নানাবিধ বৈষম্য দেখা যাইবে এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলির আরও কি উন্নতি করা বাঞ্ছনীয় এবং সুসাধ্য হইতে পারে তাহাও অনুমান করা যাইবে। অনেক কাল হইতেই এই সকল বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অনুসন্ধান চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্যাক্টরী আইনগুলির নাম করা যাইতে পারে। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে গবর্ণমেণ্ট যে সকল মজুর কমিটি এবং কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের শ্রমের ফলেই এই সকল ফ্যাক্টরী-আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে প্রথম ফ্যাক্টরী কমিশন নিযুক্ত হয় এবং তাহার ৬ বৎসর পরেই ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন পাশ হইয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে আরও একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল, তারপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এক ভারতীয় ফ্যাক্টরী কমিটি নিযুক্ত হয়। ইহার ফলেই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় পরিবর্দ্ধিত আকারে ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয়। ইহার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যে ভারতীয় ফ্যাক্টরী লেবার কমিটি নিযুক্ত হয় তাহার ফলেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পরিবর্দ্ধিত ফ্যাক্টরী আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর শিল্প-বিশেষের শ্রমিক-সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কার ও ব্যবস্থা অনুমোদন করিবার জন্যও মধ্যে মধ্যে কয়েকটী কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের আসাম লেবার ইন্‌কোয়ারী কমিটি, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কোল মিন্‌স্ কমিটি ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের দি মেন্‌স্ ইন্‌কোয়ারী কমিটির নাম করা যাইতে পারে। শ্রমিক-সংঘর্ষের কারণ-নির্দ্দেশ ও নিবারণ-ব্যবস্থার জন্যও বাংলায় ১৯২১ এবং বোম্বাই প্রদেশে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দুইটী বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও কেহ কেহ শ্রমিক বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মিঃ টি, মেলনি, মিঃ ডি, এফ্, কুর্জেন এবং মিস জি, ব্রাওটনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রমিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান ভারতবর্ষে নূতন নহে। ভারতবর্ষেই ইহার জন্য ইতিপূর্ব্বে অনেক গবেষণা হইয়াছে। তা'ছাড়া মহাযুদ্ধের পরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হইবার পর এই বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার জন্যই বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ওয়ার্কমেনস্ কম্পেন্‌সেশন্ অ্যাক্ট (১৯২৩) ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট (১৯২৬) ট্রেড ডিসপিউট্‌স অ্যাক্ট (১৯২৮) প্রভৃতি আইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে শ্রমিক সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ ব্যাপারে বর্ত্তমান কমিশনকে পূর্ব্বতন কমিশন এবং কমিটি প্রভৃতির অনুসন্ধান-ফল যথেষ্ট সহায়তা করিবে। তথ্যের দিক্ দিয়া কোন প্রস্তাব করা এই আলোচনার বিষয় নহে। তা'ছাড়া কোন প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় যাবতীয় শিল্প বিষয়ে বিস্তৃতভাবে তথ্যালোচনা করাও সম্ভব নহে; কেবল বর্ত্তমান শিল্প এবং শ্রমিক সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুইটী মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতেছে মাত্র।

১। বর্ত্তমানে শ্রম এবং শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি আংশিক ভাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই শাসনাধীন রহিয়াছে। এই প্রকার বিভক্ত শাসন মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সর্ব্বদা বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকবর্গের বর্ত্তমান অবস্থা বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। যদি তাহাই করিতে হয়, তবে ইহার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে

মজুর সম্প্রদায়ের এবং ব্যবসায়িবর্গের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার ব্যবস্থা থাকা উচিত; কারণ এরূপ না করিলে বিভিন্ন প্রদেশের মজুর এবং শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়গুলি কখনই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবে না, কিংবা তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হইবে না। কারণ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের বৈষম্যগুলি লক্ষ্য রাখিয়া চলা কিংবা তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা সহজ হইতে পারে না। এইজন্য শিল্প এবং মজুর সংক্রান্ত শাসন ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতেই অনেক পরিমাণে ন্যস্ত রাখা দরকার; কেবল সমতা রক্ষা করিবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে রাখিলেই চলিতে পারে। বর্ত্তমান শ্রমিক কমিশনের এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৪। কয়েক বৎসর যাবৎ মজুরদিগের উন্নতিকল্পে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে নিয়োগ-কর্ত্তাদের দায়িত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অজ্ঞ মজুর সম্প্রদায় আপনাদের হিতকল্পে গঠিত কোন প্রকার অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার আংশিক ভাবেও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। এইজন্য এইসকল অনুষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়োগকর্ত্তাদের উপরই চাপিয়া থাকে। ফলে শিল্পের মালিকসম্প্রদায়ও আইন এড়াইয়া চলিতে বদ্ধপরিকর হয়। শ্রমিকের প্রকৃত উন্নতি সামান্যই কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায়। এই সকল কারণে "নিয়তম মজুরী", "দৈনিক কার্য্যকাল", "শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ" ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না; শিল্পের মালিকেরা কতদূর পর্য্যন্ত তাহা মানিয়া চলিবে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া ক্রমাগত এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া চলা কার্য্যকর হইতে পারে না। কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে মজুর-সঙ্ঘ আরও বিস্তৃতভাবে গড়িয়া উঠিলে ও তাহা আরও শক্তিমান হইলে, উহারাই নিয়োগ-কর্ত্তাদের আইন মানাইতে বাধ্য করিতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দেশে শ্রমিক আন্দোলন যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে শ্রমিকসঙ্ঘগুলির যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করিতে এখনও বিলম্ব আছে। ভারতবর্ষের মত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্যই, এবং ইহাদের অবস্থাও (অসম চা বাগান এবং পাট-কল বাদে) খুব ভাল নহে। তারপর এদেশের মজুর-সম্প্রদায় যেরূপ অজ্ঞ, তাহাতে ইহাদের কোন আদর্শমূলক আন্দোলনের রীতিনীতি অবস্থানির্ব্বিশেষে মানিয়া চলা কঠিন। শুধু বেকার এবং অনাহার হইতেই আত্মরক্ষা করিবার জন্য অনেক মজুর ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগ-কর্ত্তাদের সহিত গোপন চুক্তি করিতে বাধ্য হইবে, কিংবা যে স্থলে কোন মজুর-সঙ্ঘ নাই সেখানে শিল্পমালিকদিগের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আপত্তি জ্ঞাপন করিতে চাহিবে না। এজন্য শুধু যে মজুরসঙ্ঘগুলিকেই শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে তাহাই নহে, এই সঙ্গে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। শ্রমিকদিগের উন্নতিকল্পে যে সকল ব্যবস্থা করা হইবে, তাহার নিয়ন্ত্রণের ভার আংশিকভাবে এই সকল সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আইন এড়াইয়া আর কোনপ্রকার গোপনচুক্তি করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। নতুবা প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পমালিকই আপন আপন ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং তাহাতে আইন ব্যবস্থারও যথার্থ কোন মূল্য থাকিবে না। ইয়োরোপ আমেরিকা ফরাসী প্রভৃতি দেশে শিল্পমালিক মাত্রেরই সঙ্ঘভুক্ত হইতে হয় এবং সঙ্ঘের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। ভারতবর্ষে এরূপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা বর্ত্তমান শ্রমিক কমিশনকে তাহাও দেখিতে হইবে।

কৃষি-ব্যাঙ্কিং

বর্ত্তমানে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির ক্রিয়াকাণ্ড চলিতেছে। এই কমিটি নিশ্চয়ই কৃষি ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধেও অনেক কিছু করণীয় ব্যাপারের উল্লেখ করিতে ভুলিবে না। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত এদেশে কৃষি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কেহই বড় একটা মাথা ঘামায় নাই। যদিও বা এ বিষয়ে কিছু করা হইয়া থাকে তাহাও গৌণভাবে। সমবায় ঋণদান আন্দোলন (কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ মুভ্‌মেণ্ট) সম্পর্কে কৃষি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা যা একটু আধটু হইয়াছে। তবে বাঙ্গালা দেশে সমবায় ঋণদান সমিতি সম্বন্ধে বেশী কাজ করা হইয়াছে। ১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির মূলধন দাঁড়ায় ৩৮৭ কোটি টাকা। প্রায় ৩৮২,০০০ জন কৃষক এই সমিতি-গুলির সম্পর্কে আসে।

ঋণদানের রীতি

১৯২৮ সনে কৃষক প্রতি ঋণদানের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০০ টাকা। কৃষকগণ যে ঋণ লইয়াছে তাহার মধ্যে কি পরিমাণ কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়াছে, আর কি পরিমাণই বা সামাজিক দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ব্যয় করিয়াছে তাহা স্থির করা মুস্কিল। তবে ইহা ঠিক যে, সমস্ত টাকা কৃষক কখনই কৃষিকার্য্যের খাতে ব্যয় করে নাই; আর যদিও বা করিয়া থাকে ধরিয়া লওয়া হয়, তবু এই এক শ' টাকা কৃষিকার্য্যের উন্নতি-বিধানের জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙ্গালাদেশের কৃষি-কার্য্যের প্রকৃত অভাব দূর করা এই গ্রাম্য সমিতিগুলির দ্বারা হইবে না।

কৃষকগণ কিরূপ আর্থিক সুবিধা পায়

বর্ত্তমানে এক একজন কৃষকের জমির পরিমাণ বেশী নয় (গড়ে ৩ বিঘার কিছু উপরে), সুতরাং একজন কৃষকের পক্ষে কৃষির উন্নতি-বিধান করিতে হইলে অতি অল্প টাকারই দরকার। কিন্তু এই সামান্য টাকা কর্জ্জ দানের ক্ষমতাও সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির নাই। প্রতি কৃষকের ঘাড়ে যে গুরু ঋণভার রহিয়াছে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন উপায়ই তাহার নাই। তবে এই টুকু যা লাভ, যে সমিতিগুলি অল্প সুদে টাকা ধার দেয়। সুতরাং সমবায় সমিতিগুলি চাষীর আয় বাড়াইতেও পারিতেছে না দেশের কৃষি-সম্পদ্-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনরূপ সহায়তা করিতেও পারিতেছে না।

চাষী সম্পদের অনধিকারী; ইহাদের মঙ্গলবিধান করিতে গেলে মাল বিক্রয় যাহাতে উপযুক্তরূপে ঘটিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার দরকার সকলের আগে। বাংলায় ধান আর পাট প্রধান কৃষিপণ্য; কিন্তু এই দুই জিন্স্ বিক্রয় করিবার যেরূপ বর্ত্তমান রীতি আছে, তাহার সংশোধনের জন্য আদৌ কিছু করা হইতেছে না।

কৃষির উন্নতি-বিধানের জন্য, প্রাথমিক উপায়স্বরূপ ক্রয় বিক্রয় নীতির আমূল সংশোধনের দরকার। লিনলিথগো কমিশন এ-সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা ব্যবহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের কৃষকদের পক্ষে ও সব নিয়ম খাটে না। কারণ এদেশী চাষীদের কৃষিজাত বা জেয়ারি-জাত চিজের পরিমাণ অত্যন্ত কম। এই সামান্য মাল লইয়া সুবিধাদরের জন্য অপেক্ষা করা তাহাদের পোষায় না। অনেক সময়ে অভাবের তাড়নায় তাহারা যে কোন দরে মাল বেচিতে বাধ্য হয়। কোথায়, কখন এবং কিভাবে বেচিলে সুবিধা হইবে এ সম্বন্ধে খোঁজ খবরও তাহারা বড় একটা রাখে না, আর রাখার উপায়ও তাহাদের নাই। সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ার জন্য এবং আর্থিক সহায়তার অভাবে তাহাদিগকে অত্যন্ত নিঃসহায় অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। কৃষকদের এই দারুণ অবস্থা দূর করিতে হইলে বর্ত্তমানের মাল ক্রয় বিক্রয় নীতি দূর করিয়া তৎস্থানে সমবায় বিক্রয়নীতি কায়েম

করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় কৃষকগণ উপযুক্ত মূল্য তো পাইবেই, অধিকন্তু মালের দামেরও দ্বিতীকরণ সাধিত হইবে।

দ্বিতীকরণে লাভ

কৃষিমঙ্গল-বিধানের জন্য এই মালের দামের দ্বিতীকরণ ব্যাপারটীও ভাল করিয়া বুঝিবার দরকার। দল বাঁধিয়া বিক্রয়ের ফলে ঘর কন্যাকদির সুবিধা হয়। ইহাতে বিক্রয়ের খরচও কম পড়ে। এই সমবায় বিক্রয়ের ফলে পরগাছা শ্রেণীর দালাল বা ফড়িয়ানামধারী জীবগণ পরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইবার সুবিধা আর পাইবে না; চাষাদের হাতেও বেশ দু'পয়সা আসিবে। বর্ত্তমানে দেশে কোন কোন স্থানে সমবায় বিক্রয় সমিতি দু'টো চার'টে আছে বোধ হয়; কিন্তু তাহাদের দিয়া তেমন কাজ হইতেছে না। এইগুলির সংশোধন এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে পারিলে আসল কৃষি-মঙ্গল সাধিত হইবে। এই সমিতিগুলি প্রকৃতরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলে বর্ত্তমানের কেনাবেচার নীতিতে কৃষকগণের যেরূপ অর্থাগম হইতেছে তাহা হইতে অধিকতর পরিমাণে অর্থাগমের সম্ভাবনা।

ব্যাঙ্ক-সুবিধাদানের আবশ্যকতা

সমবায় ক্রয়বিক্রয়নীতি কায়েম করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দরকার প্রকৃত ব্যাঙ্ক-সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা। বঙ্গদেশে এই ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃষকগণকে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণদানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। এই সমবায় সমিতি গুলির শুধু বাজারে সুবিধামত মাল বিক্রয় করিলে চলিবে না; আসল কথা এই সমিতিগুলিকে মালের দাম অগ্রিম দাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সুবিধামত মাল বিক্রয় করিয়া পরে কর্জ্জ এবং জিনিষের দামে কাটাকাটি করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমানে ব্যবসাদারগণ যেভাবে মালপত্র কেনাবেচা করিয়া থাকে তাহার চেয়ে এই ব্যবস্থায় কৃষকদের অর্থাগম হইবে অনেক বেশী।

নয়া যুগপত্তনে রেল ও ষ্টীমারের স্থান

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

দুনিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতি মোটামুটি তিনটী যুগ বা অধ্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জাতীয়তার-যুগ। মান্ধাতার আমলে মানুষের অর্থনৈতিক কারবার আপন আপন পল্লী বা সহরের আশেপাশেই আবদ্ধ থাকিত; অন্য দেশের বা অন্য অঞ্চলের তখন কেহই বড় একটা ধার ধারিত না। এই যুগের পরবর্ত্তী যুগে নূতন নূতন মহাদেশ এবং দ্বীপ ইত্যাদির আবিষ্কারের পর, মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড অনেক বিস্তৃতিলাভ করে; কিন্তু এ যুগও দেখিতে গেলে জাতীয়তারই যুগ, তবে একটু বড় ধরণের। প্রকৃত পক্ষে অর্থনৈতিক প্রগতির তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয় ষ্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কারের পর। মানুষ যখন বাষ্প-শক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিল, বিশেষ করিয়া যখন যান-বাহন-জগতে বাষ্পশক্তি কায়েম করিতে পারিল, তখন দুনিয়ায় এক নয়া যুগের সূচনা হইল। বাস্তবিক, আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে ষ্টীম-এঞ্জিন-চালিত জাহাজ ও রেলগাড়ী দ্বারা। এই নয়া যুগে ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে জাতীয়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমে আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন সুরু হইতে থাকে। দুনিয়া ব্যাপিয়া, মানুষ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল, বিতরণ করিতে লাগিল—কেবলমাত্র একটী দেশের জন্য নয়, গোটা দুনিয়ার জন্য। এখন আর একটী দেশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে থাকিবার উপায় নাই, আরও পাঁচটা দেশের সঙ্গে তাকে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া থাকিতে হইতেছে। আবার এই পণ্য দ্রব্যের সংস্থান করিবার জন্য, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থের সংস্থান করিবার জন্য জগতের

রাষ্ট্রনিচয়ের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতাও এই নব্য যুগের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব।

রেল এবং জাহাজ, দেখিতে গেলে, এই নব্য-অর্থনৈতিক যুগের সূচনা করিয়াছে নিম্নলিখিত কয়েকটী সুবিধার দ্বারা, যথা, দ্রুত গতিতে মাল চালান দিবার উপায়-বিধান, নিরাপদে এবং ঠিক সময়মত মালপত্র পৌঁছিয়া দিবার ব্যবস্থা, অপেক্ষাকৃত সস্তায় চালান দিবার সুবিধা, এবং মোটা বা ভারি জিনিষপত্র দূর পথে চালান দিবার ব্যবস্থা। রেল এবং জাহাজের কল্যাণে দুনিয়ার অনেক জাতি শক্তিশালী হইবার সুবিধা পাইয়াছে। আধুনিক গ্রেটবৃটেনের উন্নতির মূল কারণ রেল এবং জাহাজ। কিন্তু জার্ম্মাণি রুশিয়া এবং মার্কিণ, এই তিনটী দেশ কেবলমাত্র রেলপথের কল্যাণেই শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিয়াছে। এইতো হইল মাত্র বাষ্পশক্তিবিশিষ্ট নব্যযুগের একটা মোটামুটী আভাষ; কিন্তু কি কি বিষয়ে নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে তাহারও আলোচনা করার দরকার।

বাণিজ্য-পরিধির বিস্তৃতিসাধনে রেলপথের সহায়তা

রেলপথ দ্বারা অন্তর্ব্বাণিজ্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এবং এই অন্তর্ব্বাণিজ্যের কল্যাণে জনমানবহীন মরু কান্তার সম্পদশালী ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে যখন সমুদ্র পার হইয়া মানুষ নানাদেশ আবিষ্কার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল, তখন উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দুই একটী নগর বা জনপদমাত্রই ছিল। কিন্তু রেলপথ বসাইবার পর সুদূর অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানসমূহও মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হইয়া যাইতে লাগিল। এই উপায়ে উত্তর আমেরিকা এতদূর সম্পদশালী হইয়া পড়িয়াছে; এবং আফ্রিকা লইয়া শক্তিপুঞ্জের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। আবার রেলপথবৃদ্ধির দ্বারাই এশিয়া ইউরোপের ভোগভূমিতে পরিণত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সাইবিরিয়ার রেলপথ এবং ট্রান্স-ককেশিয়ান রেলপথ নির্ম্মাণের ফলে রুশরাষ্ট্র উত্তর এশিয়ার খুঁটা গাড়িয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের রেলপথগুলি নির্ম্মিত হওয়ার জন্য ভারতে ইংরাজের ব্যবসা বাণিজ্য অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং বাগদাদে রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ার জন্য ইংরেজের পক্ষে মধ্য-প্রাচ্যের তৈল-খনিসমূহ দখল করিয়া লইবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

রেলপথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব

এশিয়া বা আফ্রিকার পক্ষে রেলপথগুলি যেমন এশিয়াবাসী এবং আফ্রিকানগণের গোলামি সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে, অন্য পক্ষে ইউরোপে এবং আমেরিকার রেলপথগুলি কিন্তু ঐ দুই মহাদেশে বিলাতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়া তুলিয়াছে। রেলপথের কল্যাণেই জার্ম্মাণপথ একটী শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হইবার সুবিধা পাইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের ফলে জার্ম্মাণি ভূমধ্য সাগরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে এবং লৌহশিল্পে প্রায় অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৭০—১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে বৎসরে গড়ে লোহালকড় উৎপন্ন হইত মাত্র ১,৮০০,০০০ টন এবং বিলাতে ৬,৪০০,০০০ টন, কিন্তু ১৯০৫—১৯০৮ সনে, প্রতি বৎসর গড়ে জার্ম্মাণিতে লোহালকড় উৎপাদনের হার দাঁড়ায়—১১,৮০০,০০০ টন, এবং বিলাতের উৎপাদনের হার দাঁড়ায় ৯,৮০০,০০০ টন। ১৮৭০ সন হইতে ১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে ইস্পাত তৈয়ার হইয়াছিল গড়ে কি বছর মাত্র ৩০০,০০০ টন; কিন্তু ১৯০৫ সন হইতে ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত উৎপাদনের হার দাঁড়ায় কি বছর ১০,৯০০,০০০ টন। দুনিয়ার ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশহিসাবে মার্কিণের নীচেই তখন জার্ম্মাণির স্থান ছিল। মার্কিণ এবং রুশিয়াও জার্ম্মাণির মত কেবলমাত্র রেলপথের কল্যাণেই, শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবার সুবিধা পাইয়াছে।

জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেও রেলপথ কম কাজ করে নাই। রেলপথ দুনিয়ায় নব্য নব্য রাষ্ট্র-শক্তি সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; ঐ সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক রাষ্ট্রসঙ্ঘও গড়িয়া তুলিয়াছে এই রেলপথ। রুশিয়ার সহিত দক্ষিণ জার্ম্মাণির মিলন রেলপথ দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের

অবসানে দক্ষিণ এবং উত্তর ষ্টেটগুলির প্রকৃত পক্ষে সংযোগ স্থাপিত হয় রেলপথ প্রসারের দ্বারা। এই একই উপায়ে 'ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা' নামধেয় নয়া বিলাতী উপনিবেশ রাজ্যও জন্মলাভ করিয়াছে, এবং ভ্যাঙ্কুবারের সহিত কুইবেক নগরীর সংযোগ স্থাপিত হইয়া কানাডা দেশটী দানা বাঁধিয়া একটী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। রেলপথগুলি দেশকে গড়িয়া তুলে সত্য বটে; কিন্তু একটী বা দুইটী মাত্র লাইনের কর্ম্ম ইহা নয়, দেশকে একেবারে জালের মত রেলপথদ্বারা ছাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; তবে ত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে পারিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রেলপথের দ্বারা জার্ম্মানি একটী বিরাট শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। জার্ম্মানির লৌহশিল্প এবং বয়ন-শিল্প, বিলাতের পক্ষে ক্রমে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে। মার্কিণ দেশই এইভাবে কৃষি সম্পদে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিলাতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭০ সনে বিলাতকে বাধ্য হইয়া অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। তখন হইতে বিলাত খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে থাকে এবং তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতকে চড়া দরে উন্নত ধরণের শিল্পজাত দ্রব্য, কয়লা, জাহাজ এবং আর্থিক সাহায্যাদি করিতে হয়। সস্তা এবং মাঝারি ধরণের শিল্প-দ্রব্য আর বিলাতে উৎপন্ন না হইয়া জার্ম্মানি এবং মার্কিণ মুলুকেই ঐরূপ জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে। বিলাত যে এতদিন ধরিয়া দুনিয়ার কারখানা-গৃহরূপে বিরাজ করিতেছিল, তাহা ঘুচিয়া যায়। এই ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিলাত দুনিয়ার মালবাহী দেশে পরিণত হইয়া পড়ে এবং জাহাজ-নির্ম্মাণে অত্যধিক মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়।

জাহাজের মালিক হিসাবে বিলাত অদ্বিতীয়

পূর্ব্বে জাহাজের মালিক দেশ হিসাবে মার্কিণের স্থান বিলাতেরও উর্দ্ধে ছিল। কিন্তু লোহা এবং ইস্পাতের জাহাজ নির্ম্মাণের রেওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বিলাতই দুনিয়ার সেরা জাহাজী দেশে পরিণত হইয়া থাকে। এই নূতন ধরণের জাহাজ-নির্ম্মাণের সময় মার্কিণ আবার সর্ব্বনাশকর গৃহ-যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, এই সুযোগে বিলাত নিজের কাজ হাসিল করিয়া লয়। তা ছাড়া জাহাজ-শিল্পের সহিত বিলাতের পরিচয় অনেক কাল হইতে। সুতরাং ইংরাজের এ বিদ্যা আমেরিকানের চেয়ে যথা ছিল বেশী। বিলাতে জাহাজী এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং নয়া নয়া আবিষ্কারের ফলে জাহাজী শিল্প-জগতে বিলাত বাস্তবিকই যুগান্তর আনয়ন করে।

১৯১২ সন পর্য্যন্ত বিলাতী জাহাজ দুনিয়ার অর্দ্ধেক মাল-পত্র বহন করিয়াছে; এবং ইউরোপীয়ান মহাসমরের ৫৫ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুনিয়ার নব-গঠিত জাহাজগুলির দুই-তৃতীয়াংশ ইংরাজের দেশেই নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জাহাজের কল্যাণেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের গঠনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। রুশিয়া এবং মার্কিণ মুলুকেই আপন আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; বিলাত কিন্তু দ্রুতগামী জাহাজের কল্যাণে দুনিয়াব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং মার্কিণ এবং রুশিয়ার নিকট রেল পথের যে মূল্য, বিলাতের নিকট জাহাজ তেমনি মূল্যবান পদার্থ।

রেলপথ এবং জাহাজের কল্যাণে নব নব রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তুমুল ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইয়াছে। শিল্প-প্রধান দেশগুলির পক্ষে প্রধান সমস্যা কাঁচা মাল সংগ্রহ করা; এই কাঁচামাল সংস্থানের জন্য দুনিয়ার উপনিবেশগুলি দখল করা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংঘাতিক প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হইয়াছে; এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের দিকে জাতিনিচয়ের ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে দুনিয়ায় সর্ব্বনাশকর সাম্রাজ্য-বাদের জন্ম সম্ভব হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপান্তর

বাণিজ্যগত সাম্রাজ্যবাদের ফলে আবার এক নূতন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার সূত্রপাত হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমানে

জগতের অবস্থা এমন যে, একই ধরণের মাল-উৎপাদনের ব্যবসার প্রতিষ্ঠানগুলি বেপরোয়া প্রতিযোগিতা চালাইতে পারে না। তাই তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিরাট বিরাট আন্তর্জাতিক শিল্প-ব্যবসার প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছে। দ্রুতগামী যানবাহনের জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারিয়াছে; এবং এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতাও অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা এখনও ততদূর সাফল্য লাভ করে নাই। রেলপথ এবং বন্দরগুলি যথারীতি রাষ্ট্রের হাতে আসিলে এবং যানবাহন পরিচালন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হইলে এই সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরাট শিল্প-ব্যবসা যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে।

লেন-দেন কারবারের পরিবর্ত্তন

রেল-ষ্টীমারের কল্যাণে কেবল যে পণ্যদ্রব্যের বা বাণিজ্য-পরিধিরই বিস্তৃতি বা রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা নয়, দুনিয়ার আর্থিক কারবারের চেহারাও সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। আর্থিক লেনদেন দেশ বা জাতির গণ্ডী ছাড়াইয়া একেবারে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

রেল-জাহাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নানা দিক্ হইতে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

যথা—প্রথমতঃ, সরকারী তহবিল হইতে; দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের উদ্বৃত্ত বা সঞ্চিত অর্থ হইতে। এই জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন কর স্থাপনও করিতে হইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের জন্য রাষ্ট্র অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, আবার কোন কোন রেলপথ সরকারের আয়ের স্থলও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপের অনেক দেশেই রেলপথ-নির্ম্মাতা স্বয়ং রাষ্ট্র। রুশ গবর্ণমেণ্ট রেলপথ-নির্ম্মাণের জন্য বিদেশ হইতে অজস্র ঋণগ্রহণ করিয়াছে এবং সুদ পরিশোধ করিবার জন্য রুশিয়াকে দেশজাত শস্য বিদেশে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। আর্জ্জেণ্টাইন রিপাব্লিক ক্যানাডা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও বিলাত এবং অন্যান্য দেশ, রেলপথ বিস্তারের জন্য যথেষ্ট পুঁজি ঢালিয়াছে; পুঁজি-দাতা দেশগুলি এই জন্য কখনও কখনও কর্জ্জদান করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার রেল কোম্পানীও গঠন করিয়াছে। দুনিয়ার আর্থিক লেনদেন এইভাবে জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া একেবারে আন্তর্জ্জাতিকতার কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে, মোটের উপর দুনিয়ার আর্থিক লেনদেনের কারবারে বিলাতই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং রেলপথ ও জাহাজ পরিচালন ব্যবসায়ে বিলাত সব চেয়ে বেশী পুঁজি ঢালিয়াছে। ক্যানাডা এবং উপনিবেশ হইতে রেলপথের বাবদ বিলাত লাভ পায় কি সন, ৭,৮০০,০০০ পাঃ, ভারতবর্ষীয় রেলপথ হইতে ৪,৮০০,০০০ পাঃ; আর্জ্জেণ্টিনা, ব্রাজিল উরুগোয়ে, মেকসিকো, চিলি এবং অন্যান্য দেশের রেলপথ হইতে বিলাতের আয় প্রায় ২৬,০০০,০০০পাঃ। এই সমস্ত রেলপথ হইতে বিলাতের মোট আয় ৮২,৭৭৭,০০০ পাঃ। এই রেলপথগুলি চালাইতে বিলাত হইতে মোট ১,৭০০,০০০,০০০ পাঃ পুঁজি ঢালা হইয়াছে। রেলপথের জন্য বিলাতের বাহিরেই এত পুঁজি দাদন করা হইয়াছে; আদত বিলাতে ১৯১২ সনে রেলপথগুলিতে মোট ১৩,৩৪০ লক্ষ পাঃ পুঁজি খাটিতেছিল। মার্কিণরাজ্যের রেলপথে পুঁজির পরিমাণ ১১৪,৯১০ লক্ষ ডলার; প্রুশিয়ান-হেসিয়ান রেলপথে ৪০৭০ লক্ষ পাঃ; বাভেরিয়ান রেলপথে ৭৭০ লক্ষ পাঃ; ইউরোপীয় রুশিয়ার ৩৩১০ পাঃ এবং এশিয়াটিক রুশিয়ার ৪৮০ লক্ষ পাঃ। রেলপথে এই বিরাট পুঁজি খাটানোর জন্য দুনিয়ায় এক নয়া আর্থিক যুগের সূচনা হইয়াছে। রেলপথের সাহায্যেই দুনিয়ার সর্ব্বত্র পুঁজি ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। রেলপথ-নির্ম্মাণের জন্য পুঁজি ত' লাগিয়াছেই; আবার কাঁচামাল এবং খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও উৎপাদন-বিষয়েও পুঁজি খাটানোর সুযোগ ঘটিয়াছে। এই নয়া যুগের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এক দেশে কাঁচা মাল উৎপন্ন হইতেছে, এক দেশে তাহা কারখানাজাত হইতেছে, অন্য দেশে হয় তো ইহার চালকবর্গের কার্য্যালয় অবস্থিত, আবার হয় তো আর একটা দেশের লোক ইহার অধিকাংশ শেয়ারের মালিক।

যাহাতে পণ্য দ্রব্যের দুনিয়াব্যাপী চলাচলের সুবিধা হয়, সেই জন্য 'ক্রেডিট্' জিনিষটার পরিসর যথেষ্ট মাত্রায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই জন্য ব্যাঙ্কিং, এক্সচেঞ্জ, ডিস্কাউন্ট্ আণ্ড আক্সেপ্টিং হাউস, ইত্যাদি আরও নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবসাবাণিজ্যের আন্তর্জ্জাতিকতা সম্পাদিত হইবার সুযোগ মিলিয়াছে। মোট কথা, যান-বাহনের এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন কারবার, লোকজন ও পণ্য দ্রব্য সমস্তই আন্তর্জ্জাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিকতা এখনও সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। এখনও দুনিয়া জুড়িয়া জাতীয়তারই জয়-জয়কার। আপন আপন জাতীয় সুখ সুবিধা এবং স্বার্থ-সম্পাদনেই সকলে ব্যস্ত। এই জন্য দুনিয়া ব্যাপিয়া, জাতিনিচয় এবং শক্তিনিচয়ের দারুণ প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। এই মারাত্মক জাতীয়তা বিলুপ্ত না হইলে দুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইবে না; এবং এই সর্ব্বতোমুখী আন্তর্জ্জাতিকতা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না।

বাণিজ্য-বিপ্লবের ফলে নয়া সমাজের আবির্ভাব

রেলপথের জন্য কেবল বাণিজ্য-জগতে রাষ্ট্র-জগতে বা আর্থিক জগতেই যুগান্তর আসিয়াছে তাহা নয়, রেল গাড়ীর ফলে ধরাধামে নয়া নয়া সমাজের আবির্ভাবও সম্ভবপর হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। ইউরোপের মানুষ যথেচ্ছ চলাফেরা করিবার অধিকার পায়। বাষ্পশক্তির কল্যাণে নূতন নূতন কারখানা এবং সহর, কয়লা, লোহা প্রভৃতির খনির নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় গঠিত হইয়া উঠিতে থাকে। লোক ক্রমে সহরমুখো হইতে থাকে। রেল ষ্টীমারে কাজ করিবার জন্য নয়া মজুর-শ্রেণীও দেখা দেয়। এই কলকারখানা-বৃদ্ধির জন্য এবং লোক সহরমুখো হওয়ার জন্য কৃষির উন্নতিও কম বাধিত হয় নাই। সহরের লোকের অভাব-পূরণের জন্য নানাজাতীয় কৃষিজাত দ্রব্য সহরে চালান দিয়া লোকে দু'পয়সার সংস্থান করিতে থাকে।

রেলষ্টীমার দ্বারা চালান দেওয়ার সুবিধা ঘটাতে মৎস্যের ব্যবসাটীও বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। বরফের সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী দেশেও মৎস্য চালান দিতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং পূর্ব্বে যেখানে জেলেরা ছোট ছোট নৌকায় মাছ ধরিয়া আনিয়া স্থানীয় হাট বাজারে বিক্রয় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, এখন সেখানে বড় বড় মৎস্য-ব্যবসায়ী কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে এবং বড় বড় 'ট্রলার' জাহাজে মৎস্য ধৃত হইয়া কোল্ড ষ্টোরেজে দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হইতেছে।

রেল ষ্টীমারের সহায়তায় দুর্ভিক্ষ ব্যাপারটাও ক্রমে ব্যাপার হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কৃষিই আর এখন মানুষের একমাত্র উপজীবিকা নয়। নানা স্থানে কাজের সংস্থান হওয়ায় বেকার কৃষিজীবিগণ কাজ পাইয়া থাকে এবং দুনিয়ার এক স্থানে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে আর এক স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করা অপেক্ষাকৃত কম আয়াসসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

নারী জাতির জীবন-পদ্ধতিতে যন্ত্রের প্রভাব

নারীজাতির জীবনেও এই সমস্ত স্বয়ং-চালিত যান-বাহন প্রভূত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। পূর্ব্বে নারীকে কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইত; কৃষিক্ষেত্রে আর সেরূপ কাজের দরকার না থাকায়, অনেক নারী সহরে কর্ম্মের সন্ধানে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। নারী একবার সহরমুখো হইলে আর পাড়াগাঁয়ে ফিরিতে নারাজ। কারণ গৃহস্থালীর কাজের জন্য সহরে যেরূপ সুবিধা, পাড়াগাঁয়ে তাহার কণামাত্রও নাই। মেয়েরা সহরে আসিলে তাহাদের স্বামীদিগকেও আর পাড়াগাঁয়ে ফিরিতে দিতে চায় না।

পূর্ব্বে গৃহস্থালীতে খাদ্যদ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য অনেক নারীর দরকার হইত; কিন্তু এখন বিস্কুট, রুটি, কেক্ ইত্যাদি নানাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য কলে প্রস্তুত হইতেছে, দূরবর্ত্তী দেশগুলি হইতেও খাদ্যদ্রব্যাদি আনীত হইতেছে; সুতরাং আহার্য্য প্রস্তুত কার্য্য হইতে অনেক নারী খালাস

পাইয়া অন্যান্য শারীরিক শ্রমের কাজে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে।

ছোট ছোট দোকানদারগণের সর্ব্বনাশ-সাধন

কলকারখানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপন, ক্যাটালগ্ ইত্যাদির সাহায্যে জিনিষ বিক্রয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এমন কি পোষ্টাফিসের সাহায্যে মানুষ ঘরে বসিয়াই জিনিষ পত্রাদি পাইতেছে। বিলাত, মার্কিণ এবং জার্ম্মাণিতে, এই পোষ্টাফিসের সহায়তায় জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ যথেষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং এই বড় বড় দোকানগুলির এইরূপ পসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট দোকানদারগণের একেবারে ভাতে মরিবার উপক্রম হইয়াছে।

ঔপনিবেশিক সমস্যা

যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এবং কতকগুলি দেশে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন কার্য্য যথেষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই ঔপনিবেশিকগণ নানাবর্ণের এবং নানা দেশের হওয়ায় সমস্যা স্থানে স্থানে জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মার্কিণ সাধারণতঃ বিলাত, জার্ম্মাণি এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অধিবাসিগণকে পছন্দ করিয়া থাকে; কারণ ইহাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি সাধারণ আমেরিকাবাসীর চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়; কিন্তু মুস্কিল ঘটিয়াছে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের মানুষকে লইয়া। ইহাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি অত্যন্ত নিম্ন। পূর্ব্বে ইতালীগণ আর্জ্জেন্টিনাদেশেই বেশী গমন করিত, কিন্তু জার্ম্মাণি শিল্প-বহুল দেশে পরিণত হওয়ার পর জার্ম্মাণির মানুষ দেশে কলকারখানার কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ ইউরোপীয়ানগণই এখন দলে দলে মার্কিণ রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতেছে। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর মানুষ এবং রুশিয়ানগণ আমেরিকা-যাত্রার সময় জার্ম্মাণির ভিতর দিয়াই গমন করিয়া থাকে। এই সমস্ত লোককে চালান দিয়া দু' পয়সার সংস্থান করিবার জন্যই ট্রান্স-আটলান্টিক জার্ম্মাণ শিপিংএর জন্ম হয়।

ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে বিলাত দুনিয়ায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উপনিবেশগুলি লইয়া বিলাত মহাসমস্যায় পড়িয়াছে। এত শস্তা মানুষ বিলাতে নাই, যাহাদিগকে দিয়া এই সকল বিরাট বিরাট উপনিবেশগুলির কুক্ষি পূর্ণ হইতে পারে। ভারত, চীন এবং জাপান হইতে দলে দলে লোক বিলাতের এই উপনিবেশগুলিতে আস্তানা করিতে ব্যস্ত। কতকগুলি রাজ্যের (অ্যামেকা, মরিসস্, বৃটিশ গিনি ইত্যাদি) নেকনজর হইয়াছে বটে, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় উপনিবেশ রাজ্যগুলি রক্ত আঁখি দেখাইয়া গরিব এশিয়াবাসীকে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিতেছে। অদূরভবিষ্যতে, এশিয়াবাসীর নিকৃষ্ট জীবন-যাত্রার সংস্পর্শে আসিলে ধলার উৎকৃষ্ট জীবনযাত্রার আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে।

১০৭ নং বেনুপাড়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেসে, শ্রীমধুসূদন সিংহ, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আর্থিক উন্নতি

মাঘ—১৩৩৬ | ৪র্থ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতা' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

বাংলার মফঃস্বল সহর আরামবাগ

হুগলী জেলার নানা মহকুমার মধ্যে আরামবাগ অন্যতম। এই মহকুমার প্রধান সহরের নাম আরামবাগ। সহরটী খুবই ছোট। লোক-সংখ্যা ১৯১১ সনের গণনায় সমগ্রে ১৭ হাজার ছিল, এখন ১০ হাজার দাঁড়াইয়াছে। লোক-সংখ্যা কমিবার প্রধান কারণ ম্যালেরিয়ার উপদ্রব। ম্যালেরিয়ার জন্য এই সহর বিখ্যাত। ম্যালেরিয়া হইবার কারণও যথেষ্ট আছে। সহরটী ছোট, কিন্তু ইহার মধ্যে ছোট ছোট পচা ডোবা যে কতগুলা আছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সহরটী দেখিতে নিতান্তই কদর্য্য। সর্ব্বত্রই অপরিচ্ছন্নতা বিরাজমান। ইহার পশ্চিম ধার দিয়া দামোদরের শাখা দারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। এই নদীর ধার এবং যে স্থানে সরকারী বাড়ীগুলা (ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, ডেপুটির বাড়ী, মুন্সেফদের বাড়ী ইত্যাদি) অবস্থিত কেবল এই দুইটী স্থানই একটু মনে আনন্দ দিতে পারে। শীতকালে সহরের শ্রেষ্ঠ স্থানেও মশার উপদ্রব যথেষ্ট। বেশীরভাগ বাড়ীই মাটীর দেওয়াল ও খড়ের চাল-ওয়ালা। একতলা পাকাবাড়ী কতকগুলা আছে। ৩।৪টী দোতলা বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সহরে একটী মিউনিসিপ্যালিটি আছে। ইহার আয় শুনিতে পাই বছরে ১০।১২ হাজার টাকা। অথচ ইহার অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ একটী ঔষধালয় ও ডিস্পেনসারী, রাস্তার স্থানে স্থানে কেরোসিন তেলের আলো ও ৭।৮টী নলকূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সহরের মধ্য দিয়া একটী মাত্র প্রধান রাস্তা গিয়াছে। ইহা চাঁপাডাঙ্গা হইতে আরামবাগ আসিয়া, আরামবাগের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া খণ্ডঘোষ গিয়াছে। এই রাস্তাটী সকল সময়েই ধূলায় এত আচ্ছন্ন থাকে যে, ইহাতে বেড়াইয়া ভ্রমণ-সুখ অনুভব করিবার এতটুকু মাত্র সম্ভাবনা নাই। জিনিষপত্রের দর কলিকাতার চেয়ে সস্তা নয় বরং বেশী। প্রধান জিনিষপত্রের মধ্যে কপি, আলু, দুধ ও ডিমই

কেবল একটু সস্তা। মুর্গী ও হাঁসের ডিম ৩।৪ পয়সায় এক জোড়া পাওয়া যায়। আলুর সের ৬ পয়সা থেকে ২ আনা। দুধ টাকায় ৫।৬ সের। সহরের কাছাকাছি ৮।১০টা চালের কল আছে (মহকুমার মধ্যে ৩০।৪০টা)। সহরে পৌঁছানো একটী বিরাট সমস্যার কথা। কলিকাতা হইতে আসিতে হইলে মার্টিন কোম্পানীর রেলে চড়িয়া চাঁপাডাঙ্গায় আসিতে হয়। চাঁপাডাঙ্গা হাওড়া হইতে ৩১ মাইল। এই ৩১ মাইল আসিতে ৩ ঘণ্টা লাগে। চাঁপাডাঙ্গা পৌঁছিয়া দামোদর পার হইতে হয়। শীতকালে দামোদরে জল কম থাকে। সুতরাং হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। এ পারে আসিয়া গরুর গাড়ী বা পাল্কীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। চাঁপাডাঙ্গা হইতে আরামবাগ ১৪ মাইল পথ। এই ১৪ মাইল পথ গরুর গাড়ীতে আসিতে ৭ ঘণ্টা ও পাল্কিতে আসিতে ৩।৪ ঘণ্টা লাগে। এই পথটা যে কতদূর দুরূহ তাহা বর্ণনা করা যায় না। পথটাকে আদৌ পথ বলা চলে কিনা সে বিষয়ে বেশ প্রশ্ন করা চলে। গরুর গাড়ী চড়িয়া আসিলে অনেক সময়ে মনে হইবে যে গাড়ীটা বুঝি উল্টাইয়াই পড়িল। পাল্কীওলার এত কষ্ট হয় যে, যাহার হৃদয়ে একটু মায়া দয়া ও গায়ে একটু শক্তি আছে তিনি গাড়ী চড়া অপেক্ষা হাঁটিয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় মনে করিবেন। বছরের এই সময়েও এই পথে (দামোদর ছাড়া) দামোদরের ২টা বড় শাখা নদী (মুণ্ডেশ্বরী ও সোনপুরের নদী) নৌকা করিয়া পার হইতে হয়। তা ছাড়া কতগুলা খাল ডোবা গাড়ী বা পাল্কী করিয়া পার হইতে হয় তাহার সংখ্যা নাই। আরামবাগ ও চাঁপাডাঙ্গার প্রায় মাঝামাঝি মায়াপুর নামে একটী জায়গা আছে। এইখানে ছোট খাটো একটা বাজার ও গোটা কয়েক বাস করবার মত ঘর দেখা যায়। চাঁপাডাঙ্গা থেকে মায়াপুর পর্য্যন্ত রাস্তা বড় খারাপ, মায়াপুর থেকে আরামবাগ পর্য্যন্ত রাস্তাটা তত খারাপ নয়। চাঁপাডাঙ্গা থেকে আরামবাগ যাবার রাস্তা বর্ষায় একেবারে ডুবিয়া যায়। তখন কলিকাতায় যাইতে হয় নৌকাতে ত্রীমারে, সেখান থেকে ত্রীমারে কোলাঘাট এবং কোলাঘাট থেকে বি এন্ রেলের ট্রেনে হাওড়া। আরামবাগ থেকে সহজেই পৌঁছাবার আর একটা রাস্তা আছে—সেটা এই সহরকে বর্দ্ধমানের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল।

সরকারী বাড়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলা ছাড়া সভ্যতা-জ্ঞাপক যে সব প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তাহার মধ্যে সাধারণ পাঠাগার, একটা ছোট হাই স্কুল (১৫০।২০০ ছাত্র), একটা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (মহকুমায় ২৭টী সমবায় সমিতি আছে) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমগ্র সহরে মাত্র ২।৩ খানা ইংরেজী খবরের কাগজ আসে। কলিকাতা হইতে ৪৫ মাইল মধ্যে সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে এত বেশী বিচ্ছিন্ন এরূপ একটা সহর যে থাকিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে লেখক কখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

কলিকাতায় হোটেল, মদ ও গাঁজার দোকান

কলিকাতা সহরে ১টী হোটেল, ২৮টী রেষ্টরেণ্ট, ১,২৪৯টী চায়ের ও ২০৮টী মদের দোকান, ৩,৬৮৪টী বোর্ডিং চায়ের দোকান ও ভোজনালয়, ৩৬টী অহিফেনের দোকান ও ৪১টী গাঁজার দোকানকে ১৯২৮-২৯ সনে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। (বসুমতী)

দুগ্ধ-সমস্যা

খাঁটি গো-দুগ্ধের জন্য পাবনা জেলায় যে প্রসিদ্ধি ছিল গত কয়েক বৎসর হইল তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে। যে দুগ্ধ পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বেও এখানে চার পয়সা কি ছয় পয়সা সের দরে বিক্রয় হইত, এখন তাহা পাঁচ আনা ছয় আনা হইতে আট আনা দশ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইতেছে।

(সুরাজ)

বাংলার বাজারে ভেজাল তেল ও ঘী

পাবনা জিলার পুকুরপাড় হইতে অনেক সাবধানতা জানাইয়াছেন যেহি যেহি রোগে এতগুলি ধ্বংস হইয়া গেল। ঘোরাঘোলা বাজারের মহাজনগণ ভেজাল তেল, ঘৃত, ঘোয়াইট অয়েল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি ও বিক্রয় করিতেছে। কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি নাই।

দিনাজপুরের তেল-ব্যবসায়ী গৌরীশঙ্কর আগরওয়ালার ১৪ শত টাকা মূল্যের ১৪০ টিন সরিষার তৈল হেলথ অফিসার পরীক্ষা করিয়া ভেজাল বলিয়া প্রকাশ করেন, তারপর আদালতে বিচার হয়। বিচারে ঐ তেল মিউনিসিপালিটীকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে বলা হয়।

(পঞ্চায়েৎ)

কায়স্থ ব্যাঙ্ক

খুলনা কায়স্থ ব্যাঙ্ক তাহার প্রাসাদোপম নব-নির্ম্মিত অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে। নূতন গৃহে আসিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য যে খুব বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(খুলনাবাসী)

ছবরাজপুর কাংস পিত্তল সমবায় সমিতি

গত ১৩।১২।২৯ তারিখে বর্দ্ধমান ছবরাজপুরের কাংস পিত্তল সমবায় সমিতির একটী বিশেষ সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। এই শিল্প সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য, যাহাতে কাংস পিত্তলের ব্যবসায়িগণ মহাজনের খপ্পরে পতিত না হইয়া সমবায় নীতিতে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সাচ্চা পয়ায় কারবার করিয়া দেশীয় কাংস পিত্তল শিল্পের উন্নতি আধুনিক মতে সম্পাদন করিতে পারেন। যে সব অফিসিয়াল এবং নন্-অফিসিয়াল মহাশয়গণের একান্ত চেষ্টায় এবং সহযোগিতায় এই সমিতি হইয়াছে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে স্বদেশ-হিতৈষী।

(বীরভূমবাসী)

সুলতানপুরের শিল্প-শিক্ষালয়

এই বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে। তাহা যে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান যুগোপযোগী ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন। চট্টগ্রাম, যশোহর, হাবড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহ হইতে এমন কি, বকসার, পাটনা এবং সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রেরা এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে।

বর্ত্তমান বর্ষের কৃষি, তাঁত, ছুতার, কামার ও দাবান প্রস্তুত করণ বিভাগ ছাড়া সমবায় শিক্ষা, ছাতা প্রস্তুত ও রেশম চাষ বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং চামড়া প্রস্তুত করণ, পিত্তল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত বিভাগ শীঘ্রই খোলা হইবে।

কারখানা-পরিচালনক্ষম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে পাসসার্টিফিকেট সহ উত্তীর্ণ একজন দক্ষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও একজন সহকারী বয়ন-শিক্ষকের নিয়োগদ্বারা শিল্প-বিভাগের শিক্ষার ব্যবস্থা আরও সুন্দর করা হইয়াছে।

এ বৎসর সতরজন ১০জন হিসাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ বৎসর এই স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে একজন রঙ্গপুর রেশম বয়ন বিদ্যালয়ে ও একজন শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ জেলা বোর্ড হইতে মাসিক ১৫৲ পনর টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষা, চরিত্র, নীতি, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই উন্নতিলাভ করিবার ব্যবস্থা আছে। বীরভূম জেলার কৃষি-বিভাগীয় কর্ম্মচারী এবং পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয় এবং বিশ্বভারতীর কৃষির পরিচালক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া ছাত্রদিগকে কৃষি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

স্কুলের বেতনের হার অন্যান্য স্কুলের তায়। তবে বোর্ডিংএর খরচ মাসে গড়ে ৬৲ ছয় টাকার অধিক নহে। ইহা ছাড়া জলখাবার, তৈল ইত্যাদিতে কিছু খরচ আছে। মোট কথা ১২৲।১৩৲ টাকাতেই এখানকার সমস্ত খরচ সঙ্কুলান হইতে পারে। মুসলমান বোর্ডিংএর খরচ আরও কম—মাসে পাঁচ টাকা।

এখন বিদ্যালয়ে কেবল শিল্প-শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করা হয়। যাহারা উচ্চ ইংরাজী স্কুলে না পড়িয়া কেবল শিল্প শিক্ষালাভ করিতে চাহে, তাহাদের পাঁচজনকে তিন টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্প-শিক্ষার্থিগণকে স্কুলে বেতন দিতে হয় না।

ভর্ত্তির জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। বিদ্যালয় সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে

হইলে স্বয়ং সুলতানপুরে আসা কিংবা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পত্র লেখা আবশ্যক।

(বীরভূম-বার্ত্তা)

যশোহরে চিরুণীর কারখানা

যশোহরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় আর একটী চিরুণীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারখানা হইতে প্রত্যহ ১৫শত চিরুণী তৈয়ার হইবে।

(বঙ্গবন্ধু)

মফঃস্বলে দুর্ভিক্ষ ও অর্থাভাব

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মেঘনার তীরবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে অর্থাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ঐ অঞ্চলে আউশ ধান জন্মে নাই, আমন ধান নষ্ট হইয়াছে, পাটের দাম কমিয়া গিয়াছে, মহাজনগণের হাতে টাকা নাই, কর্জ্জ পাওয়া যায় না। জনসাধারণ মহা বিপন্ন হইয়াছে, খাদ্যদ্রব্য নাই, গবাদি পশুর ঘাস নাই। সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না।

(ঢাকা প্রকাশ)

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় ভীষণ মূর্ত্তিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে একলক্ষ ও পরে দেড় লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ মঞ্জুর দিয়াছেন। কিন্তু যেরূপ ব্যাপকভাবে ও ভীষণাকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহাতে উহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এই দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাঁচাইতে হইলে বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

(নীহার)

বাংলার কুটীর-শিল্প

সম্প্রতি কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ কালে সভাপতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এ, টি, ওয়েষ্টন এক বক্তৃতায় শিল্পোন্নতি-প্রসঙ্গে কয়েকটী কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "টাকার অভাবে বাংলার কুটীর-শিল্পের উন্নতি বন্ধ হয় নাই—শিক্ষিত লোকের অভাবই উহার একমাত্র কারণ। অনেক লোক বলিয়া থাকেন, আজকাল যে সব ইংরাজ সরকারী চাকুরী করিতে আসে, তাহারা দেশের উন্নতির দিকে মনোযোগী হয় না—আমার মতে এ কথা সত্য নহে, আমি জানি এদেশে এখনও অনেক ইংরাজ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রাণপণ শ্রম করিতেছেন। আমি জানি ভারতের শিক্ষিত লোকগণ শিল্পের উন্নতি-বিধানে মন দেন না। সকলেই কাগজ-কলমে কাজ করিতে চান, কিন্তু মাথা খাটাইয়া নূতন কোন শিল্প-বাণিজ্যে মন দেন না। লোকে বলে সরকার বাঙ্গালার শিল্পোন্নতির জন্য চেষ্টা করে না। উহা সত্য নহে। আমি সার্কেল অফিসার ও জেলা বোর্ডের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা বলেন যে, শিক্ষিত লোকেরা কোনরূপ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। টাকার অভাবের কথাও সত্য নহে। বাংলায় অনেক লোকের টাকা আছে। মানুষ চেষ্টা করিলে সেই টাকা আদায় করিয়া শিল্পোন্নতিতে খাটাইতে পারে। এদেশের লোক চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কোন কাজ করে না বা কোন কাজের কথা চিন্তা করে না। তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে তাহাদের দ্বারা দেশের অনেক উন্নতি করান যায়।"

(পঞ্চায়েৎ)

পল্লীর অবস্থা

পল্লী সংস্কারের চেষ্টা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। এই বিষয়ে বক্তাগণ অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন, সংবাদ পত্রে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে এবং অধিবেশনের সময়ে যুবকগণ নিজ নিজ পল্লীতে লোকদের সুশিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু কাজ আদৌ অগ্রসর হয় নাই। দোষ কি নেতাদের? পল্লীবাসীর কি কিছু কর্ত্তব্য নাই? পল্লীর লোকে কাজ না করিলে নেতাগণ উপদেশ দিয়া

কি করিবেন? চরকার বাণী পল্লীর প্রতি গৃহে প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু কয়জন চরকা কাটিতেছেন? পরিধেয় বস্ত্র নাই, তথাপি চরকা কাটিয়া কাপড়ের যোগাড় করিব না, এ কেমন কথা? ছেলেরা দুধ না পাইয়া মিনিটে চারিটা করিয়া মরিতেছে আর পুরুষ, রমণী নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িতেছে; কিন্তু গ্রামবাসী কোথাও যত্নপূর্ব্বক গাভী প্রতিপালন করিতেছে কিংবা দুধ পাইবার জন্য গোশালা স্থাপন করিতেছে কি? বাঁচিবার অপেক্ষা মরিবার চেষ্টাই অধিক। আজকাল ভাল লাঙ্গল সার বীজ সহ মরিচ রোপিলে চাষের উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিন্তু কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি ও কৃষক গ্রামে মিলিত হইয়া যত্ন করিতেছে? ভাল রাস্তা নাই, গ্রামের লোকে মনে করিলে সহজেই পথের উন্নতি করিতে পারেন। দেহের পুকুরের মাটী দিয়া ইট প্রস্তুত করিলে রাস্তার ইট হয় এবং দেহের সুবিধা হয়। জমিদারকে কি গ্রামের লোককে ধরিলে খানখামারের গাছ ইট পোড়াইবার জন্য পাওয়া যায় না এমন নহে। গ্রামের লোকে একমত হইয়া চেষ্টা করিলে রাস্তায় মাটী দেওয়া হয় এবং গাড়ীতে ইট লইয়া গিয়া পাকা রাস্তাও তৈয়ার করা যায়। কিন্তু তাহারা চাহিয়া আছেন ইউনিয়ন বোর্ডের ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দিকে। গ্রামে পানীয় জল নাই, গ্রামের লোকে সাধ্যমত চাঁদা করিয়া অনায়াসেই ইন্দারা নলকূপ প্রস্তুত করিয়া জলকষ্ট নিবারণ করিতে পারেন; কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি কৈ? কলেরায় মরিবেন, তথাপি এমন জনহিতকর কার্য্যে হাত দিবেন না, ইহার তুল্য দুঃখ কি আছে? গ্রামে বহু লোক নির্ব্বংশ হওয়ায় ভিটা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল স্থান পরিষ্কারপূর্ব্বক কলাগাছ ফলগাছ শাকসব্জী তরকারী প্রভৃতি লাগাইলে কত উপকার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার দমনও হয়। কিন্তু সে বিষয়ে চেষ্টা নাই, গভর্ণমেণ্ট করিয়া দিলে তবে হইবে। অবশ্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ও সাহায্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু যদি তাহা না মিলে তবে কি পল্লীবাসী স্বেচ্ছায় রোগে ভুগিয়া মরিবে? এমন কত কর্ত্তব্যের কথা বলা যায়। কিন্তু পল্লীবাসী নিশ্চিন্ত—কিছু হইবার উপায় নাই।

পল্লীসকল কত অপরিষ্কার—প্রতি বাড়ীর চারিদিকে ময়লা। বর্ষাকালের কাদায় গরু মানুষ অথৈ হয়, তারা নির্ব্বিবাদে সহ্য হইতে পারে। কলেরা, ম্যালেরিয়া বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধি চেষ্টা দ্বারা দমন করা যায়, কিন্তু মরিব তথাপি সে দিকে চেষ্টা করিব না। গাভী, বৎসর দশ বিক্রয় করিয়া দেওয়ায় চায়ের গরু পাওয়া যায় না, দুধ যে হইবে তাহারও উপায় নষ্ট হইয়াছে। ইতর-ভদ্র সকলেই অলস, উদ্যমশূন্য। অনেক অলস ব্যক্তি গাঁজা বসে চরস তাল পাশা লইয়া দিন কাটায়। কথার মধ্যে মামলা মোকর্দ্দমার কথা, পরনিন্দা পরচর্চ্চা, কাহাকে কি প্রকারে ধ্বংস করিব—এই কথা। গ্রামে যাহার অবস্থা ভাল সে বিলাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সম্পত্তি প্রায় বিক্রয়ে, আছে কেবল উচ্চহারে সুদযুক্ত দেনা। তবে ভগবান ইহাদিগকে সুমতি প্রদান করিবেন? (পল্লীবাসী)

পল্লীগ্রামে জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা

কিছুদিন পূর্ব্বে স্যর প্রকাশ মিত্র যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন কতিপয় সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রত্যেক জেলা বোর্ডকে ঋণ দান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল সর্ত্ত আপত্তিজনক বলিয়া অধিকাংশ জেলা বোর্ডই উক্ত ঋণ গ্রহণ করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট পুনরায় জেলা বোর্ডকে কম সুদে ঋণ ও টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পুকুর ও কূপের জন্য ২৫ বৎসর মেয়াদে এবং টিউব ওয়েলের জন্য ১০ বৎসর মেয়াদে ঋণ দিতে পারেন। যেখানে পুকুর ইত্যাদি খনন করা হইবে সেখানের লোকের খরচের তৃতীয়াংশ দিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। পুকুর ইত্যাদি খনন করিবার কর্ত্তৃত্ব-ভার ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহাদের হাতে টাকা দেওয়া হইবে না। গভর্ণমেণ্ট জেলা বোর্ডসমূহকে এই নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

(পল্লীমঙ্গল)

নূতন ষ্টীমার কোম্পানী

চট্টগ্রামের "সুনীতি" সংবাদ দিতেছেন যে, চট্টগ্রামে

আর একটা নূতন ষ্টীমার কোম্পানীর আবির্ভাব হইতেছে এবং তাহা "চরকাথার্কা" হইবে। ভারতের নৌ-বাণিজ্যের হিসাবে ইহা ততই বলিতে হইবে। যেহেতু ভারতের তথা বাঙ্গালার নৌ-শক্তি যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ততই দেশের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলের কোন কারণ দেখিতেছি না। কিন্তু যদি বঙ্গবর্ষ্মা ষ্টীম নেভিগেশনের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া কোন নূতন কোম্পানীর উদ্ভব হইবার প্রচেষ্টা হয়, তবে কখনও তাহা সাফল্য-মণ্ডিত হইবে না। বঙ্গবর্ষ্মা নেভিগেশন কোম্পানীর ক্রমোন্নতি ও তাহার উদ্যোক্তাগণের ত্যাগ ও স্বদেশ-সেবা দেশবাসীর অন্তরে প্রস্তর-রেখাবৎ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। বর্ষ্মা নেভিগেশন কোম্পানীর আবশ্যকতা দেশের লোক হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছে এবং তাহার স্থায়িত্বের জন্য সকলেই আন্তরিক চেষ্টা করিতেছে। অতএব যতই নূতন নূতন কোম্পানী গঠিত হউক না কেন, তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। দেশের নৌশক্তি-বৃদ্ধিতে কাহারও অনিচ্ছা নাই।

(নোযাত্রালীহিতৈষী)

দি নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ্ টাউন ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে একটী কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ১০৲। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ মোহন চক্রবর্ত্তী অর্গেনাইজার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত এম, এ চেয়ারম্যান, মৌঃ আব্দুল গফুর বি,এল ভেপুটি চেয়ারম্যান, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ সম্পাদক ও মৌঃ হাবিবুদ্দিন বি, এল সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জে বাস করেন বা চাকুরী করেন, তাঁহারাই উক্ত ব্যাঙ্কের মেম্বর হইতে পারেন এবং প্রত্যেক মেম্বরই টাকা কর্জ্জ নিতে পারেন। এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে যে কোন ব্যবসায়ী কলিকাতা কিংবা অন্য যে কোন স্থানের সঙ্গে টাকা আদান প্রদানের বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্কের অপর একটী বিশেষত্ব এই যে, বিশেষ আমানত হিসাবে একটী আমানতের হিসাব খোলা হইয়াছে; ইহাতে প্রতি মাসে ৫৲১০৲ করিয়া জমা দিলে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর পরে প্রচুর লাভ সহ উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হয়। যেমন মাসিক ৫৲ হিসাবে ৫ বৎসরে ৩০০৲টাকা জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১২০৲, ১৫ বৎসর পরে ১২৪০৲, ২০ বৎসর পরে ১৬৮০৲ টাকা ফেরত দেওয়া হয়। কোন আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক ১৲ ২৲ ৫৲ ৭৲ ১০৲ ২০৲ ইত্যাদি যে কোন সংখ্যক টাকা আমানত করিতে পারেন। তখন প্রাপ্য টাকা উপরোক্ত হিসাবানুযায়ী কম বেশী হইবে মাত্র। এই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত সকল বিষয় প্রস্পেক্টাসে অথবা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জ্ঞাতব্য।

(পল্লীবন্ধু)

পাটের সংবাদ

বিগত জুলাই হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে কলিকাতায় যে পরিমাণ পাট আমদানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

		ষ্টীমারে	রেলে	নৌকায়	মোট
জুলাই	{	৯১৭৪০৯ মণ	৮৯২০৩২	৭৫৪৭	১৮১৬৯৮৮
	{	৭৬২৪৯৩ ঃ	৯৪১৬০৫ ঃ		১৭১৫০৮৪ ঃ
আগষ্ট	{	২০১০৮২৯ মণ			৫৪২০৭২৩
	{	১৮১০১০১ ঃ			৪৭০৪০৫ ঃ

মাস		রাস্তায়	রেলে	নৌকায়	মোট
সেপ্টেম্বর	{	৩৭২১৪৪৯ মণ	৩৭৫৫১০৫	১৬১২৪০	৭৬০৭৭৭৩
	{	৪২৭৬০৭৭ ×	৩৭৫৮৮৬১ ×	১৫৬০০৯ ×	৮১৭০৯৪৭ ×
অক্টোবর	{	৩৮৯৬৪৭ মণ		৩৩৫১৪২	
	{	৪৫৪১৯২৫ ×	৪৩৮৮০৪৫ ×	৩৮৭৬০ ×	
	{	২০৩৬১৮৫ মণ	৩২৭৩৪৮৯	৩৪১০০	
	{	১৭৬৮৪৪৪ ×		৩৭০৪৭২ ×	৬৬৫৯৩২৬ ×

(উপরের তালিকার × চিহ্নিত সংখ্যাগুলি ১৯২৮ সনের)

পশুপক্ষীর ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

শ্রীকৈলাসচন্দ্র আকুলী বহু পশু-পক্ষীর ব্যবসায়ে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বাঘ, হস্তী গণ্ডার, চিতাবাঘ, হরিণ, বানর, বিভিন্ন সর্প, নানা রকমের পক্ষী বিক্রয় করেন। ইহার জন্য আলমবাজারে একটী সুবৃহৎ উদ্যানে চিড়িয়াখানা আছে। আমেরিকা ও ইয়োরোপের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় এই বহু পশু-পক্ষী চালান যায়। এই পরিবারের উদ্যম প্রশংসনীয়; কিছু দিন পূর্ব্বে এই পরিবারের কয়েক জন এই ব্যবসায় জন্য ইয়োরোপে গিয়াছিলেন।

ভ্রমণশীল স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

লোক-শিক্ষার জন্য বছর বছর মেলার সময়ে "শিশু প্রদর্শনী" নাম দিয়া এই "স্বাস্থ্য প্রদর্শনী" খোলা হয়। সহস্রের হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ সে প্রদর্শনী দর্শন করিয়া উপকৃত হন। কোন্ উপায়ে লোক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন এবং দীর্ঘায়ু হইতে পারে—অতি সহজ ভাষায় বক্তৃতা দিয়া এবং নানারূপ ছবি প্রতিকৃতি দেখাইয়া তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার—সন্ধ্যার সময় বায়োস্কোপ (আলোক-চিত্র) সাহায্যে বিষয়গুলি আরও ভাল রূপে বুঝান হইয়া থাকে।

এবার ব্যবস্থা হইয়াছে যে এ প্রদর্শনী আর সহরে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে না, মফঃস্বলের বড় বড় গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সমস্ত দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিবে। সে সমস্ত দেখিতে শুনিতে কাহারই কোন পয়সা লাগিবে না। এই শীত ঋতুতে ৪৪ গ্রামে এই প্রদর্শনী ভ্রমণ করিবে।

(মাসিক সমাচার)

বঙ্গদেশের কয়লা

বঙ্গীয় কোল কোম্পানীর বার্ষিক অধিবেশনে সম্প্রতি মিঃ জে, সাইম যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কয়লার ব্যবসায়ীদিগের ও জনসাধারণেরও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। তাঁহার মতে বঙ্গীয় কয়লা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে; যে সকল খাতে প্রথমশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যাইত, তাহাদের অনেকগুলি খাতেরই কয়লা ফুরাইয়া যাইতেছে। বিদেশী কয়লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় কয়লা বাজারে ক্রমশঃ অচল হইতে করিতেছে। মিঃ সাইম রেলওয়ে বোর্ডকে কয়লার ভাড়া কমাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, বিশেষতঃ যেখানে কয়লার খনি হইতে সরাসরি ডকে কয়লা চালান দেওয়া হইবে সেখানে কয়লার মালিকগণ যে অনুপাতে মূল্য হ্রাস করিবেন, বোর্ডকেও সেই অনুপাতে ভাড়া হ্রাস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আইনের সাহায্যে ইংলণ্ডের কয়লা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও এইরূপ প্রচলন বাঞ্ছনীয়।　　(শান্তিবার্ত্তা)

কয়লার উপর ট্যাক্স

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বিহার গবর্ণমেণ্ট "সফ্‌ট

কোক্" জাতীয় কয়লার উপর প্রতি টনে দুই আনা হিসাবে ট্যাক্স বসাইতে অনুমতি দিয়াছেন। সফ্‌ট কোক্ সাধারণতঃ গৃহস্থদিগের রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এই ট্যাক্সটী পরোক্ষভাবে গৃহস্থগণকে বহন করিতে হইবে। ট্যাক্সের পরিমাণ অতি অল্প অর্থাৎ প্রতি টনে দুই আনা হইলেও, প্রতি মণে এক পাই অপেক্ষাও অল্প হয়, সুতরাং এজন্য ব্যথিত বা দরিদ্র গৃহস্থদিগের কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, অসাধু কয়লা-ব্যবসায়ীরা এই নূতন ট্যাক্সের নাম করিয়া হয়ত প্রতি মণে এক পয়সা, এক আনা, এমন কি দুই আনা পর্য্যন্ত মূল্য বাড়াইয়া দিবে। সমরের কর বৃদ্ধির সময়ে অসাধু দোকানদারগণ এই উপায়ে দরিদ্রের রক্ত-শোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

রেঙ্গুনে মুড়ির প্রচলন

চাকা জিলার উয়ারী নিবাসী জনৈক দুঃস্থ বাঙ্গালী বিধবা তাঁহার আত্মীয়ের সহিত রেঙ্গুনে যাইয়া মুড়ি বিক্রয় করিয়া এক বৎসরে প্রায় ৪০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী অনেকে ব্রহ্মদেশের অন্যান্য সহরে মুড়ির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। তথাকার লোকেরা এই নূতন জিনিষ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

(মেদিনীপুরহিতৈষী)

চা'র দর

(২৩শে নীলাম ১৮।১৯ নবেম্বর, ১৯১৯)

বাগান	হত বাক্স	গড় দর	পূর্ব্ব সনের ঐ দিনের গড় দর
আমবাড়ী	১৯৮		
আনন্দপুর	৬২		
ইষ্টার্ণ	১১২		৸/১১
কয়লাক্যাণী	৬০		
কমলা	৭৯		
ঐ			
ঐ			
কোহিনুর	১২০	৵৯	
কাঠালগুড়ি	১৬০	৷৶৮	
খয়েরবাড়ী	১৪৬	৷৹	
গোপালপুর	১৮১	৷/৬	
গুয়াহাংবোয়া	৮৪	৷৷	৸১১ ৬৬
চাবুক্তি	১৩৫	৷৷৹	৬/৩
চাঁদমণি	৬৬	৷৶৫	৷৷৶১১
ঐ	৬	৷৷	
বাগিয়াবোয়া	১১৭	৷৷৹	
চৈবাড়ী	৭২	৷৶৪	
ঐ	১৬	৷৶৪	
ডুয়ার্স ইউনিয়ন	১২৯	৷৷২০	
জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স	১১২	৷৶১	
দুর্গাপুর	১০০	৷/১১	
দেবপাড়া	১৯৯	৷৷	
নকশালবাড়ী	৯৬	৷৶১০	
নর্থ্‌ব্রুক বেঙ্গল	৮৭	৵১০	
নর্থ ইষ্টার্ণ	৫২	৷২	
পলাশবাড়ী	১৭২	৷৷২	
বাতাবাড়ী	৪৮	৷৷৹	
আজুনাল :—			
(ঝাকড়পাড়া)	৪১	৷৷৪	৷৷৶৭
(মুখনাই)	৭৩	৷৶১১	
মেরিভিউ	৪১	৷৷৹	
মালহাটী	২৮	৷৶৮	
রহিমাবাদ	১০৮	৷৷৫০	৸/১
লক্ষ্মী	১২৪	৷৶৭	৷৷৶৫০
শিকারপুর	১১২	৷৷১৩	৷৶৪
সারদা	২১৭	৷৷৬	
	১২	৷৷৹	
	১০৮	৷৷৬	
	১৬৪	৷৷৷	
সালিজাণী	৪৩	৷৶১	৷৹৶৮
সুকনা	১৫৩	৷৷৩০	৯৶২

সৈয়দাবাদ	৬২	।৶		
হোসেনাবাদ	৯৭	৸৩	৸৪	৸৹

(*ডাকঘর সহ গড়ঘর খুঁজিতে হইবে)

(ক্রিশ্রোতা)

একটী চালের কল পরিদর্শন

আরামবাগ সহরের পশ্চিম ধার দিয়া দামোদরের শাখা ধারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। শীতকালে নদী প্রায় শুষ্ক। নদী পার হইবার জন্য বাঁখারি বুনিয়া সরু পুল প্রস্তুত করা হইয়াছে। পুল পার হইয়া ওপারের একটী চালের কল দেখিতে গেলাম। আরামবাগ সহরের কাছাকাছি ৮।১০টী চালের কল আছে। ইহা তাহাদের অন্যতম। চালের কলের সরঞ্জাম দেখিলাম প্রধানতঃ তিনটী। প্রথমতঃ হইতেছে দুইটী বিরাট চোঙ্গা। উপরের দিকে ইহারা মোটা, নীচের দিকে সরু হইয়া আসিয়াছে। ধান ভিজাইবার জন্য দুইটী বিরাট চৌবাচ্চা আছে। ধান ভিজানো হইলে, ঐ চোঙ্গা দুইটীর তলার দিক্ বন্ধ করিয়া উপরে ধান ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর, উপরের মুখও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। চোঙ্গা দুইটীর ভিতর বাষ্প বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য নল আছে। চোঙ্গা ধানে ভর্ত্তি করা হইলে ও চোঙ্গার মুখ বন্ধ করা হইলে পর, নলের চাবি ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। তখন চোঙ্গার ভিতর বাষ্প প্রবেশ করিতে থাকে। ইহার ফলে ৫ মিনিটের মধ্যে চোঙ্গার সমস্ত ধান সিদ্ধ হইয়া যায়। তলাকার ঢাকুনির পাশ দিয়া যে দু'একটা ধান বাহির হইতে থাকে তাহা টিপিয়া দেখা হয় যে ধান ঠিক সিদ্ধ হইয়াছে কি না। সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে ইহা স্থির হইলে পর, তলার মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন সমস্ত সিদ্ধ ধান তলায় রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া যায়। প্রত্যেকটী চোঙ্গায় শুনিলাম ৫ মিনিটে ৫০ মণ ধান সিদ্ধ হইতে পারে।

ইহার পর সিদ্ধ ধানকে একটী কলের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কলটা অনেকটা বাজার চল্‌তি আটার কলের মতই দেখিতে। এক দিকে ধান ঢালা হইলে, আর এক দিকে ধানের খোসা ছাড়ানো হইয়া চাল হইয়া বাহির হইতে থাকে। চালে পরিণত করিবার জন্য একই ধানকে দুইবার করিয়া ঐ কলে চালিবার প্রয়োজন হয়। ধানকে চালে পরিণত করিবার জন্য এইরূপ দুইটী কল পাশাপাশি রহিয়াছে। প্রত্যেকটীর সহিত একটী করিয়া প্রকাণ্ড চামড়ার বেল্ট জড়ানো। এই বেল্টটী ঘুরে স্থাপিত একটী প্রকাণ্ড লোহার ডাণ্ডার সহিত জড়ানো। লোহার ডাণ্ডাটী ঘুরিতেছে বলিয়া বেল্ট দুইটী ঘুরিতেছে, আবার বেল্ট দুইটী ঘুরিতেছে বলিয়া ধানের খোসা ছাড়াইবার কল দুইটীও চলিতেছে। আর ঐ ডাণ্ডাটী ঘুরিতেছে কিসের জোরে? পাশের ঘরে একটী ষ্টীম এঞ্জিন রহিয়াছে। সেই এঞ্জিনে বাষ্প প্রস্তুত হইতেছে এবং সেই বাষ্পীয় শক্তিই এঞ্জিনের একদিক্‌কার একটী চাকাকে ঘুরাইতেছে। এই চাকার সহিত উপরিউক্ত সুদীর্ঘ ডাণ্ডাটী বেল্টের সাহায্যে জড়িত। এইরূপে এঞ্জিনটী ডাণ্ডাটীকে ঘুরাইয়া চালের কল দুইটীকে চালাইতেছে।

এঞ্জিনটীর দাম শুনিলাম ৭।৮ হাজার টাকা। ইহা চালাইবার খরচ দৈনিক প্রায় ৭।৮ টাকা। আর ধানের খোসা ছাড়াইবার কল দুইটীর প্রত্যেকটীর দাম ৫ শত টাকা। শেষোক্ত প্রত্যেকটী কলে প্রত্যহ ১০০ মণ ধান ছাড়ানো চলে শুনিলাম।

চালের কল দুইটী চালাইবার জন্য ১৫৲।২০৲ টাকা মাহিনা দিয়া দুইজন লোক রাখা আবশ্যক হয়। এঞ্জিন চালাইবার জন্য ৩০৲।৩৫৲ টাকা মাহিনা দিয়া একজন লোক রাখিতে হয়। ধান সিদ্ধ করিবার চোঙ্গায় সাধারণতঃ দুইজন স্ত্রীমজুর রাখা হয়। ইহাদের দৈনিক মজুরির হার ৷৷৹ আনা।

শুনিলাম শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাসে কলের কাজ সাধারণতঃ বন্ধ থাকে। অন্য সময়ে কাজ পুরাদমে চলে। কলওয়ালা নিজে ধান কিনিয়া চালে পরিণত করিয়া থাকেন। অনেক চালের ব্যবসায়ীরও ধান লইয়া আসিয়া চাল করিয়া লইয়া যায়। তা ছাড়া, সাধারণ লোকেও অল্প পরিমাণ ধান আনিয়া চাল করিয়া লয়। ১৶ মণ ধানকে চাল করার জন্য চার আনা পারিশ্রমিক লওয়া হয়।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

ভারতের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য (১৯২৮-২৯)

	মার্চ্চ ১৯২৯	১৯২৮-২৯
	টাকা	টাকা
আমদানি	২১,১৭,৮০,৩৪৬	২৪৩,২৪,১১,২০০
রপ্তানি	৩৪,৩৬,০৪,৪৪৫	৩৩০,১২,৭৫,১৬৫
মোট	৫৬,৫৩,৮৪,১৯১	৫৮৩,৩৬,২৪,৯৬৫

১৯২৮-২৯ সনে ভারতবাসীর মাথাপিছু রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ১০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি মাসে ১৩ আনা ৩৬ পাই। আলোচ্য সনে প্রত্যেক ভারতবাসী বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিয়াছে ৭ টাকা ১০ আনা ৬ পাই, অর্থাৎ মাসে ১০ আনা ২·৫ পাই। সুতরাং আমাদের পক্ষে মাথাপিছু বৎসরে ২ টাকা ৫ আনা ৬ পাই অর্থাৎ মাসিক ৩ আনা ১৪ পাই স্থিত হইতেছে। ভারতবাসীর মাথাপিছু মোট বার্ষিক আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ ১৭ টাকা ১০ আনা ৬ পাই।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিলাতের সহিতই ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম। বিলাতের সহিত ভারতের ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে যে ব্যবসা চলিয়াছে তাহার মূল্য ২১,৭২,১০,৪১৮ টাকা এবং গোটা ১৯২৮-২৯ সনের ব্যবসার মূল্য ২৪২,৯৮,০৪,৪০১ টাকা। ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৪৪% কারবার চলে এক বিলাতের সঙ্গে। ভারত বিলাতের নিকট হইতে গত মার্চ্চ মাসে ১২,৭০,৯০,৪৪৮ টাকা মূল্যের এবং গোটা ১৯২৮-২৯ সনে ১৩৭,০৬,৬১,৩৭৪ টাকা মূল্যের মাল খরিদ করিয়াছে। কিন্তু বিক্রয় করিয়াছে যথাক্রমে ৯,০১,৯৯,২৭০ ও ১১৫,৯১,৪২,৫৫৭ টাকা মূল্যের মাল। শতকরা হিসাবে এই সমস্ত মাপজোকের পরিচয় দেওয়া হইল :—

	বৃটিশ সাম্রাজ্য		অন্যান্য দেশ	
	মার্চ্চ ১৯২৯	১৯২৮-২৯	মার্চ্চ ১৯২৯	১৯২৮-২৯
আমদানি	৫৮·৯%	৫৪%	৪১·১%	৪৬%
রপ্তানি	২৯%	৩৫·১%	৭১%	৬৫·৯%

এই সমস্ত মাপজোক দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, বিলাতই ভারতের বাজারে প্রধান বিক্রেতা; কিন্তু ভারতীয় মালের খরিদ্দার হিসাবে দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করে। আমাদের স্বদেশ-বাসিগণের এই অবস্থাটা ভাল করিয়া সমঝিবার দরকার। দুনিয়ার ব্যবসাবাণিজ্যের হালচাল বুঝিবার মত মনোভাব শীঘ্রই আমাদের মধ্যে আসা উচিত।

আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই ধরিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিতই ভারত সব চেয়ে বেশী ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এই বাণিজ্যের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	মার্চ্চ ১৯২৯	১৯২৮-২৯
	টাকা	টাকা
আমদানি	৯,৮১,৪১,৮৬৮	১১৩,২০,৮১,৯২৫
রপ্তানি	৪,৮৩,৬৯,৮১২	৬৯,৮৬,৮২,০৪২

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলাত হইতে আমরা যে পরিমাণ মাল আমদানি করি ঠিক সেই পরিমাণে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে রপ্তানি করি। বিলাত ভারতের আমদানি এবং রপ্তানির যথাক্রমে ৪৪·৭% এবং ২১·২% অংশের মালিক। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলাতের পর ভারতের আমদানি এবং রপ্তানি উভয় প্রকার বাণিজ্যক্ষেত্রে সিংহল, স্ট্রেট

সেটেল্‌মেণ্ট (সেমুয়ান সহিত), কেনিয়া উপনিবেশ, ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্থান। অষ্ট্রেলিয়ার স্থান সর্ব্বোচ্চে, এবং সিংহলের স্থান প্রায় তাহার কাছাকাছি। অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে মাল আমদানি ক্রমশই বাড়িতেছে। আমদানিকারক দেশ হিসাবে ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্টের স্থান তৃতীয়। অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল এবং ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্ট এই তিনটী বড় ব্যবসায়ী দেশ। নিম্নে এই সমস্ত দেশের ব্যবসার পরিচয় দেওয়া হইল :—

	মার্চ্চ ১৯২৯	১৯২৮-২৯
আমদানি	টাকা	টাকা
অষ্ট্রেলিয়া	১,৬৪,৯১,৮৬৭	৮,৪০,৬০,৭৪০
ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্ট	৫২,৩৭,৮৮৭	৪,১১,৫৯,১২৯
ক্যানাডা	২০,৯২,৮১৪	৩,০১,৭০,৯৯৪
কেনিয়া কলোনি	২০,৯৮,৯২১	২,৩৮,৫০,৪৯৮
সিংহল	১২,০০,৮৩১	২,১০,৫৫,০০৫
রপ্তানি	টাকা	টাকা
সিংহল	১,৩০,৪৯,৮৩৭	১৩,৭৭,০৪,৩২৪
ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্টস্	৮৮,৩৯,২০১	৭,৮২,৮১,০৪৩
অষ্ট্রেলিয়া	৩১,৫৩,৩৫৭	৭,৩৭,৬২,৩৩১
ক্যানাডা	১৮,৩৭,৫২২	২,৪৩,৭৭,৩০৮
কেনিয়া কলনি	১০,২১,৩৫০	১,০৬,৩২,০৩৭

রপ্তানি-বাণিজ্য সম্বন্ধে ক্যানাডা এবং কেনিয়া কলোনির কাছাকাছি আরও অনেকগুলি দেশের নাম করা যাইতে পারে, যথা :—

	মার্চ্চ ১৯২৯
	টাকা
ইউনিয়ন অব্	
সাউথ আফ্রিকা	৩১,১৫,৭৪৮
হংকং	১৫,১৬,১৭৭
এডেন ও অধীন	
রাজ্যসমূহ	২৫,২৬,৩০৮
মরিশাস্	২০,৩১,৬৯১

এতক্ষণ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি সম্বন্ধে বলা হইল। এখন অন্যান্য দেশগুলি সম্বন্ধে বিচার করা যাক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের ৪৩% এবং রপ্তানি বাণিজ্যের ৩৪·৯% দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে। ভারতের বাজার দখল করার ব্যাপার লইয়া জাপানের সহিত মার্কিণের তুমুল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তবে জাপান এখনও মার্কিণের উপরে; কিন্তু কতদিন ধরিয়া যে এই অবস্থা জাপান বজায় রাখিতে পারিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। জার্ম্মাণি এবং জার্ম্মাণিও নিতান্ত পশ্চাতে নয়। ভারতের বাজারে এই দেশগুলি প্রথম শ্রেণীর দেশ বলিয়া ধরিতে হইবে; ইহারা সকলে মিলিয়া প্রায় ৬০।৭০ কোটি টাকার কারবার চালাইতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বেলজিয়াম এবং ইতালি সকলের উপরে; এই শ্রেণীর মোট কারবারের পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর কারবারের অর্দ্ধেকেরও কম। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্, চীন (হংকং বর্জ্জিত) এবং পারস্যের স্থান। ইহাদের ব্যবসার পরিমাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্দ্ধেক। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলির সহিত মোট আমদানি বাণিজ্যের মূল্য নীচে দেওয়া হইল :—

	মার্চ্চ ১৯২৯	১৯২৮—২৯
প্রথম শ্রেণী	টাকা	টাকা
জাপান	১,৭৮,৮১,৯০৩	১৭,৪১,০৬,৩৬০
মার্কিণ	১,৩১,১৬,৭২৫	১৭,৩৬,২৮,১১১
জার্ম্মা	১,১৯,৪৯,৯৬৪	১৬,৬৪,৮৪,০৬০
জার্ম্মাপি	১১,৫২,৬২৭	১৫,৮৫,৬৬,২০৩
দ্বিতীয় শ্রেণী	টাকা	টাকা
ইতালি	৪৪,৩১,৩২৮	৭,৩৯,১৪,৩৪৬
বেলজিয়াম	৫৪,০৪,৫০৬	৭,১৮,৮৫,৯৮৭
তৃতীয় শ্রেণী	টাকা	টাকা
ফ্রান্স	৩৬,৫৭,৩৪৫	৪,৭৯,১২,৫৫০
নেদারল্যাণ্ডস্	৪৭,১৪,৯১৮	৪,১৫,৯৮,৭১৭
চীন	৩৩,১৭,৪৪২	৪,৩৪,৮৫,২৬০
পারস্য	৩৮,২৩,৪৪৩	৩,৮২,৩৬,৫০০

এই সম্পর্কে একটী জিনিষ নজর করিবার যোগ্য। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলির মিলিত রপ্তানির পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর একটী একক দেশেরও সমান নয়।

আমাদের রপ্তানি পণ্যের বাজার যাচাই করার সম্পর্কেও ঐ দেশগুলিকে ঐরূপে শ্রেণীভেদ করিয়া দেখিতে হইবে :—

	মার্চ ১৯২৯	১৯২৮-২৯
প্রথম শ্রেণী	টাকা	টাকা
মার্কিণ	৩,২১,৫০,০০০	৩৯,০৩,২২,৯১২
জাপান	৪,৮০,৬৪,৪৯৮	৩৪,৪১,৬২,৪১২
জার্মানি	৩,২৪,১৬,১২৫	৩১,৪২,৯১,৮৪২
দ্বিতীয় শ্রেণী		
ফ্রান্স	১,৩৭,০৩,৯৫৪	১৭,৩৩,২৬,৪১৭
ইতালি	১,৩৭,৪৪,৫৫৫	১৪,১০,৭৮,০৪৯
বেলজিয়াম	১,৪৯,৯১,৬৬৮	১৩,৩০,১৪,৩০৯
তৃতীয় শ্রেণী		
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭,৫৬,২৪০	
চীন	১,৭৭,০৯,৮৮৪	
নেদারল্যাণ্ডস্	৮২,০১,৮৯৭	
চতুর্থ শ্রেণী		
মিসর	২২,৬৭,৫১৬	৪,৮০,২৮,২৩২
স্পেন	২৯,৬০,৯৩৭	৩,৯০,৬৮,৯৪০
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	২৮,৭৮,৮৮০	৩,৮১,০৪,০৮৭
বেলজিয়ো ও আঙ্গা	১০,৯০,৯২২	৩,৭৪,৮০,১৮৯
আরব	২৮,৪২,৪৪৯	২,২০,২০,২৬৫

আমদানি এবং রপ্তানি এই উভয় প্রকার বাণিজ্য একত্রে ধরিলে দেখা যায়, বিলাতের পর মার্কিণ, জাপান, এবং জার্মানিই ভারতের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এখন হইতে এই কয়টা দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল্‌চাল সমধিতে চেষ্টা করিলে আমাদেরই পক্ষে মঙ্গল।

সমগ্র ব্যবসা (আমদানি ও রপ্তানি) হিসাবে ঐ তিনটি বড় বড় রাষ্ট্রের পরই ইতালির স্থান। ভারতের সহিত ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতালির উপনিবেশগুলি প্রতি বৎসর ৪০ হাজার টাকার উপর ভারতীয় মাল ব্যবহার করিতেছে। ইতালির উপনিবেশগুলির আর্থিক উন্নতি সম্যক সাধিত হইলে ইতালি শীঘ্রই পঞ্চম নম্বরের রাষ্ট্রে পরিণত হইবে দেখা যাইতেছে। সেই জন্য ভবিষ্যতে ইতালির সহিত ভারতের বাণিজ্য বাড়িবার খুবই সম্ভাবনা।

বস্ত্রশিল্পে জাপান ও ইতালির প্রতিযোগিতা

কলিকাতা বন্দরের কার্পাস শিল্পজাতের আমদানি সম্বন্ধে কালেক্টর যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে এ দেশবাসীর ভাবিবার কথা আছে। এতকাল পর্য্যন্ত ল্যাঙ্কাশিয়ারই ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্রশিল্পই ভারতের বস্ত্রশিল্পকে প্রতিযোগিতায় ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে জাপান এবং ইতালিও ভারতের কাপড়ের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেশীয় বস্ত্রশিল্প বিশেষ ভাবে দেশীয় মিলের বস্ত্রজাত জাপানের সাথে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। ৪ বৎসর পূর্ব্বে জাপানী কাপড় ভারতের বাজারে প্রথম আমদানি হয়। আর ইহারই মধ্যে জাপান আমদানি বস্ত্রজাতের শতকরা ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়াছে। গত তিন বৎসর জাপান সার্টিং বা জামার কাপড়ও ভারতের বাজারে খুব বেশী পরিমাণে বিক্রী করিতেছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্প এই উভয় ক্ষেত্রেই জাপানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ছাপিন কাপড় চেক কাপড় প্রভৃতিতেও জাপান এবং ইতালি উভয়েই ভারতের বাজার ক্রত দখল করিতেছে। এই জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। (ভারতবর্ষ)

ভারতীয় আমদানি রপ্তানি শুল্কের আয় ব্যয়

১৯২৮-২৯ সনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরে যে আমদানি রপ্তানি শুল্ক আদায় হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ ৫০,১৫,৭৩,৭২৮৲। উক্ত বৎসরে যে আদায়ী শুল্ক ফেরৎ দিতে হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৮৭,৭২,৯২৪৲; খরচের মোট পরিমাণ ৯১,৫৮,৪২৩৲। পূর্ব্বতন চারি বৎসরের আদায়ের সম্বন্ধে একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	আয়	ফেরৎ	ব্যয়
১৯২৫-২৫	৪৯,১০,৮৭,৮২৩	৩,৩৫,৫৬,৩০৭	৭৭,১২,২৯০
১৯২৫-২৬	৪৮,৮১,৯৩,৪৪৫	১,০৩,৯৮,৩৯৬	৮১,৭৭,০৩২
১৯২৬-২৭	৪৮,৩০,৪৩,৭৬৯	৯২,৪৩,০৪৮	৮১,২৭,২২৪
১৯২৭-২৮	৪৮,২১,৪১,৮৭২	২৬,২৭,০২২	৮৩,৮১,৫৪৪

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে চিনির উপর ধার্য্য আমদানি-শুল্ক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আস্তার চিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হইবার জন্য তাহার আমদানির পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে আলোচ্য বৎসরে চিনি আমদানি বাবদ আমদানি শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। তারপর সিগারেট এবং খনিজ তৈলের আমদানিও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেজন্য আমদানী শুল্কের পরিমাণ প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে।

অন্য দিকে কলকব্জা, বিমানপোত, গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী, বিভিন্ন খনিজ ধাতু প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষের উপর শুল্কের আদায় কমিয়া গিয়াছে। এই শুল্ক-হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। রপ্তানি-বাণিজ্যে পাটের উপর ধার্য্য রপ্তানিশুল্কের আদায় প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে জীবনবীমার প্রসার

ভারতবর্ষে জীবনবীমা কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটী দেশী কোম্পানীর কারবারের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

১৯২৯ সন

	পূর্ব্বাপর সম্পাদিত বীমার মোট পরিমাণ	বর্ত্তমান বৎসরে সম্পাদিত বীমা	বর্ত্তমান বৎসরের আয়	জমার টাকা
এশিয়ান	১,০০,৪৮,৩১০৲	৩১,২৯,৭৫০৲	৫,৮৬,৪৬৯৲	১২,৫০,১১২৲
ভারত	৫,১৫,৭২,৩৮৭৲	১,৫০,১৮,৫৪২৲	২৭,৭৩,৫৭৪৲	৯৬,৯১,৫৬৬৲
বম্বে মিউচুয়াল	৬১,৯১,৮৮৭৲	১৮,৫৯,০০০৲	৩,৬৮,৬৮০৲	১১,৫৩,৮৪৮৲
বম্বে লাইফ	১,৫৮,৯৬,০২৯৲	৪২,৬২,০০০৲	৭,০৮,৫২৯৲	২১,৫২,৪৩২৲
কো-অপারেটিভ এসিওরেন্স	৩১,২২,৫৫৩৲	৪,১৯,৫০০৲	১,৮৬,০৭৩৲	৭,৪৩,০৬৫৲
ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট	২৮,৩৬,৮৩৩৲	১০,৪০,০০০৲	১,৬৭,০৩২৲	২,৯৫,৫৪৯৲
এম্পায়ার	৯,৪১,৭২,৭৫৩৲	১,২৭,০০,০০০৲	৫৯,৫৯,৮৪২৲	৩,২৮,৪১,২৭৯৲
জেনারেল	১,৬৯,৬৬,৪৫৭৲	৬০,০০,০০০৲	৯,২৯,৪৪৯৲	২০,১১,১১৫৲
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ	৩,৭০,০০,০০০৲	১,০১,১১,০০০৲	১৪,৭৮,০০০৲	৭৫,০০,০০০৲
হিন্দু মিউচুয়াল	২১,৪০,৪৫৭৲	৩,৫৮,২৫০৲	১,২০,১৭০৲	৪,০০,৯৬২৲
ইণ্ডিয়ান লাইফ	১,৬০,৫২,০০৪৲	৯,১৫,৫০০৲	৮,৪৯,৬৪১৲	৫৩,৯৪,৬২৬৲
আই অ্যাণ্ড প্রভেন্সিয়াল	১,১৫,৫৪,৭০৮৲	৩৬,১৯,০০০৲	৭,০৩,০২৬৲	১৯,০৫,৭০২৲
ইণ্ডিয়া এক্যুইটেব্‌ল	৫৪,৩১,৭৫২৲	১২,৩৩,৫০০৲	৩,১২,২৭৬৲	১১,৫১,০০৪৲
লক্ষ্মী	১,৬৬,১৮,৬২০৲	৬৬,২৭,৩৫০৲	৮,২৫,১৬৬৲	৯,৩২,৮৭৯৲
ন্যাশনাল	৫,১৮,০৫,০২৭৲	১,০০,৩৪,৪০০৲	৩১,৬৯,০০০৲	১,৩৫,০০,০০০৲
এন্ ইণ্ডিয়ান	১,২৫,৯৬৫৫৪৲	২৩,৭১,৫০০৲	৮,৮৯,০২৯৲	২৯,৮৭,৪৪৯৲
ওরিয়েণ্টাল	৩১,৬৭,৫৯৪৫৬৲	৫৮৫,৫২,২০১৲	১,৮৪,৪৩,১১৭৲	৮,৭৩,২৫,১৯৩৲

	পূর্ব্বাপর সম্পাদিত বীমার মোট পরিমাণ	বর্ত্তমান বৎসরে সম্পাদিত বীমা	বর্ত্তমান বৎসরের আয়	
পিপলস্	২৭,৫৭,৭৫০৲	১১,৩৮,৫০০৲	২৮,৪৭৲	৭০৭৲
ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া	১,২৪,৩১,৬৭৯৲	৩০,৬৫,৫০০৲	৭,৮২,৯০২৲	৫৯,৪৭,৯৬১৲
ভারিউ, ইণ্ডিয়া	১,০০,৮০,৪৭৪৲	২২,৩১,৭৫৲	৬,১৭,১১৮৲	১৮,৫৭,৬৩৯৲
যেনিথ	৫৭,১৪,৫৩৲	২৫,৪৬,৫০০৲	৩,১২,১৮০৲	৫,৬৮,০৯১৲

ভারতবর্ষের নৌ-বাহিত বহির্ব্বাণিজ্য

ডিসেম্বর, ১৯২৯

বিগত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের আমদানি রপ্তানি উভয়ই পূর্ব্ব মাসের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। কেবল আপেক্ষিক রপ্তানি (অর্থাৎ আমদানি মালের রপ্তানি) কিছু বাড়িয়াছে। বে-সরকারী আমদানি মালের মূল্য নবেম্বর মাসে হইয়াছিল ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ডিসেম্বরে এই প্রকার আমদানির মূল্য ১৭ কোটি ৩ লক্ষে নামিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় কাঁচা এবং তৈয়ারী মালের রপ্তানি-মূল্য নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ২০ কোটি ৩৭ লক্ষ হইয়াছে; কিন্তু আপেক্ষিক রপ্তানি মালের সমষ্টি-মূল্য পূর্ব্ব মাস অপেক্ষা ১৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ডিসেম্বরে ৭০ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হ্রাসবৃদ্ধির তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি তালিকা উদ্ধৃত করা হইল।

	ডিসেম্বর ১৯২৯ (লক্ষ টাকা)	নবেম্বর ১৯২৯ (লক্ষ টাকা)	হ্রাসবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)	শতকরা হিসাব
আমদানি	১৭,০৩	২২,৫০	−৫,৪৭	−২৪·৩%
রপ্তানি	২০,৩৭	২৬,৮০	−৩,৪৩	−১২·৮%
আপেক্ষিক রপ্তানি	৭০	৫৪	+১৯	+৩৫·২%

	ডিসেম্বর ১৯২৯ (লক্ষ টাকা)	ডিসেম্বর ১৯২৮ (লক্ষ টাকা)	হ্রাসবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)	শতকরা হিসাব
আমদানি	১৭,০৩	১৮,৫০	−১,৪৭	−৭·৯%
রপ্তানি	২০,৩৭	২৬,১৮	−২,৮১	−১০·৭%
আপেক্ষিক রপ্তানি	৭০	৭৭	−৪	−৫·২%

	এপ্রিল—ডিসেম্বর (১৯২৯) ৯ মাসের হিসাব (লক্ষ টাকা)	এপ্রিল—ডিসেম্বর (১৯২৮) ৯ মাসের হিসাব (লক্ষ টাকা)	হ্রাসবৃদ্ধি
আমদানি	১,৭৯,৬৮	১,৮৪,৩৭	
রপ্তানি	২,৩২,৫১	২,৪১,০৯	
আপেক্ষিক রপ্তানি	৫,৬৪	৬,১০	

[বৃদ্ধি চিহ্ন + , হ্রাস চিহ্ন −]

বেসরকারী নগদ অর্থ অথবা মূল্যবান ধাতুর নিট আমদানি (অর্থাৎ রপ্তানির অতিরিক্ত) মূল্য হইয়াছিল নবেম্বরে ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা, এবং ডিসেম্বরে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ এই দুই বৎসরে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসে যে পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ এবং রৌপ্য আমদানি এবং রপ্তানি করা হইয়াছে নিম্নে সে সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

	১৯২৯ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর (লক্ষ টাকা)	১৯২৮ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর (লক্ষ টাকা)	হ্রাসবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)
স্বর্ণ আমদানি	১০,৭৬	১৪,১৩	
স্বর্ণ রপ্তানি	১	২	
রৌপ্য আমদানি	৮,৫৮	১২,৯৭	
রৌপ্য রপ্তানি	১,২০	২,১২	

ভারতীয় রেলের আয়

১৯২৯-৩০ (এপ্রিল পর্য্যন্ত) এই বৎসরে হর্ত্তমান হিসাবে ভারতীয় রেলের বিগত ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে পরিমাণ আয় হইয়াছে তাহা পূর্ব্বতন বৎসরের উক্তকাল পর্য্যন্ত আদায়ী টাকার সহিত তুলনা করিয়া নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল। ইহা হইতেই ভারতীয় রেলের আয়ের গতি নিরূপণ করিতে হইবে।

আয়ের হিসাব

রেলওয়ে	১৯২৯ সনের ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত আদায় (লক্ষ টাকা)	১৯৩০ সনের ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত আদায় (লক্ষ টাকা)	হ্রাসবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)
ও, বি রেলওয়ে	১৫৮	১৫৪	— ৪
বি, এন ,,	৬৮৯	৬৯১	+ ২২
বি, বি, অ্যাণ্ড সি, আই রেলওয়ে	৮৭১	৮৫৬	
বর্ম্মা	৩৫৬	৩৪০	
ই, বি	৫৪১	৫১৭	
ই, আই ,,	১,৫২৫	১,৪৬৬	
জি, আই, পি ,,	১,১১৬	১,০৭৬	
এম্ অ্যাণ্ড এস্ এম্ ,,	৬৬৯		
এম, ডাব্লিউ ,,	১,১৮৮		
এস, আই ,,	৪০৯		

[বৃদ্ধি চিহ্ন + ; হ্রাস চিহ্ন —]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা

(১৯২৯, অক্টোবর)

(ওয়াশিংটন বাণিজ্য-বিভাগের বিবরণী)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শিল্পগুলিতে উৎপাদন এবং খরচের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলা হইতেছে। এ জন্য কাহার হাতে বা কোন স্থানে মাল জমিয়া উঠিয়া শ্রমিকের দুর্দশা বাড়াইতে পারে নাই। ইহার ফলে আলোচ্য সময়ে মার্কিণ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল ভাবে চলিয়াছে। আলোচ্য মাসের শেষভাগে ষ্টক এক্সচেঞ্জের বাজারে দারুণ ক্ষতি দেখা যায়। কিন্তু এই জন্য শিল্প-বাণিজ্যে তেমন কোন দুর্য্যোগ উপস্থিত হয় নাই। বিজলী সরবরাহের বহর দেখিয়া বোঝা যায় যে, কল কারখানার কাজ বাড়িয়াই চলিতেছে। গত বর্ষের এই মাসের তুলনায় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের তুলনায় আলোচ্য মাসে কাজের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী। তবে মোটর শিল্পের অবস্থা কিছু মন্দা, কারণ গুদামে যথেষ্ট মাল পড়িয়া রহিয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় আলোচ্য মাসে মজুরদের কাজের সংস্থান হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বেতনের হারও বাড়িয়াছে গত বৎসরের তুলনায় ১০%। বাজারে জিনিষ-পত্রের দাম আদৌ চড়ে নাই। গম চালানের রেল মাশুল যদিও কমিয়াছে, অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধে মাশুল বাড়িয়া যাওয়ায় এই ক্ষতির পূরণ হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সময়ে সিক্কার হার লইয়া কোনই অসুবিধা উপস্থিত হয় নাই। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিস্কাউন্টের হার ৫% কমাইয়া দিয়াছে। ২৫ অক্টোবর তারিখে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বাজারে বিষম দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে হঠাৎ নবাব হওয়ার খেয়াল জাগিয়া কোন ব্যবসায়ী নূতন কোন প্রচেষ্টায় হাত না দেয় সেই জন্য নিউইয়র্ক ব্যাঙ্ক সিক্কার বাজারের স্থিতীকরণ সম্বন্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

স্বয়ং চালিত যানের উৎপাদন কমিয়াছে

আলোচ্য মাসে মার্কিণ দেশে স্বয়ং চালিত যানের তৈরী কমিয়াছে। মোটর গাড়ীর উৎপাদনই কমিয়াছে, কিন্তু মোটর ট্রাক্ উৎপাদন কমে নাই। কতকগুলি কারখানার মালিক কিছু দিনের জন্য কাজ একেবারে বন্ধ রাখিয়াছে। কারণ এদের ষ্টকে মাল জমিয়াছে বিস্তর। মালের ষ্টক যাহাতে কমে সেজন্য সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিতেছে।

সেপ্টেম্বর মাসে ৪১৫,৩০০ খানি মোটর গাড়ী তৈরী হয়। ইহার মধ্যে ১৪,৩৯৪,০০০ ষ্টার্লিং মূল্যের ২০,৯১০ খানি গাড়ী বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই মাসে মোটর ট্রাক রপ্তানি ১২,৯৮০ খানি মূল্য ৭,০০৪,০০০ ষ্টার্লিং। এই সময়ে মোট অ্যাকসেসরি চালান যায় ৯১২,০০০ ষ্টার্লিং মূল্যের। আলোচ্য মাসে ক্যানাডা হইতে মোটর গাড়ী ও মোটর ট্রাক্ রপ্তানি হইয়াছে যথাক্রমে ৪,৯৭০ ও ১,৬৯০ খানি, এবং এই সকলের মোট দাম ৩,২৬০,০০০ ষ্টার্লিং।

লোহা-লক্কড়

মার্কিণ দেশের লৌহ-শিল্পের অবস্থা বেশ ভাল এবং ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল। লৌহ-জাত দ্রব্য উৎপাদনের হার অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং গত নয় মাসে যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। ১৯২৯ সনের এই

নয় মাসের লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদন ১৯২৮ সনের মোট উৎপাদনের চেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই ১৮% বেশী। মোটর শিল্পের জন্য লোহা-লক্কড়ের চাহিদা কমিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যান্য শিল্পের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে মাল তুলের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়াছে এবং দামও ঠিক রহিয়াছে। সাধারণতঃ যে হারে কাজ হয় তাহার প্রায় ৮১% কাজ কল-কারখানাগুলিতে হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ষ্টীল কর্পোরেশন ১৯২৯ সনের ১লা অক্টোবর তারিখে মাসের অর্ডার পায় প্রায় ৩,৯১৮,০০০ টন, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ২৫৩,০০০ টন বেশী। মেশিন এবং হার্ডওয়্যারের কারখানাগুলি অত্যন্ত বেশী লোহা খরিদ করিতেছে। পূর্ব্ব সনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষের নয় মাসে মেশিন ইত্যাদির রপ্তানির বহর বাড়িয়াছে প্রায় ২০%।

তুলা

তুলার বাজার বেশ স্থির, অবস্থার উন্নতি প্রকাশ পাইতেছে। সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন দেশের মধ্যেই ৫৪৬,০০০ বেল তুলা বিক্রী হইয়াছে; এবং ইহার পরিমাণও মোট ৪,০০০,০০০ বেল। এই সময়ের মধ্যে তুলা আমদানি হইয়াছে ২৪,০০০ বেল এবং রপ্তানি হইয়াছে ৭২৬,০০০ বেল। ইউরোপ এবং জাপানে তুলা রপ্তানি বাড়িয়াছে। ফসলের অবস্থাও বেশ ভাল। অনাবৃষ্টি কাটিয়া গিয়াছে।

কাপড়ের বাজার বেশ ভাল। কাপড়ের মিলওয়ালা এবং ব্যবসায়িগণ বাজারের অবস্থা বুঝিয়া মাল উৎপাদন করায় অবস্থা ভালোর দিকে চলিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে কাপড়ের মিলগুলিতে ৩০,০৩০,০০০টা মাকু চলিয়াছে, আগষ্ট মাসে চলিয়াছিল ৩০,২৩৭,০০০টা।

গম

১৯২৯ সনের ১লা আগষ্ট তারিখে মোটা মার্কিন দেশে গম উৎপাদনের পরিমাণ ৭৯১,৮০০,০০০ বুশেল। এই পরিমাণ পূর্ব্ব সনের চেয়ে ১২% কম, পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ সনের গড়ের চেয়ে ২৮% কম। দুনিয়ার ২৯টী গম-উৎপাদনকারী দেশের গম-উৎপাদনও কমিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। গোটা-দুনিয়ার গম-উৎপাদন-হ্রাসের জন্য গমের বাজারে মূল্য-বৃদ্ধি দেখা দিয়াছে, এবং চাহিদাও বাড়িয়াছে অত্যন্ত বেশী।

মার্কিণের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৯ সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিণের মোট রপ্তানি	৪৩২,০০৪,০০০ ষ্টার্লিং
১৯২৯ সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিণের মোট আমদানি	৩৫১,০০০,০০০ „
রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী	৮১,০০০,০০০ „

ভারতের সহিত বাণিজ্য

১৯২৯ সেপ্টেম্বরে ভারত হইতে মার্কিণে আমদানি	
১৯২৯ সেপ্টেম্বরে মার্কিণ হইতে ভারতে রপ্তানি	৫,৯০০,০০০ „
আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী	২,৯০০,০০০ „

১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিণ ভারতে যে সমস্ত মাল রপ্তানি করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া হইল :—

তুলা	১,০০০ পাউণ্ড
এনিলাইন্ (রং) ...	৪০,০০০ „
কেরোসিন	১১৪,০০০ গ্যালন
লুব্রিকেটিং তেল	৩০,০০০ „
রূপা	১,৪২০,০০০ আউন্স
মেশিন	৬৮০,০০০ ষ্টার্লিং
ইলেক্‌ট্রিক্ দ্রব্য	২৬০,০০০
লোহা-লক্কড়	১,০০০ „
হার্ডওয়্যার	৭,০০০
বেল্টিং	৪০,০০০ „

খাদ্য দ্রব্য	১,১৭০,০০০	ষ্টার্লিং
বয়নজাত দ্রব্য	৩৯০,০০০	„
রং	৪০,০০০	„
তামাক	১৪০,০০০	„
মোটর	১,১৯০	খানি
মোটর ট্রাক্	৯৩০	„
মোটর (ক্যানেডিয়ান)	১৮০	„
মোটর ট্রাক্ „	৩১৪	„
টায়ার	৮৮	„
টিউব	৫,৮৫০	„
কেসিং	৭,১৯০	„

ভারত হইতে মার্কিণে যে সমস্ত দ্রব্য যায় তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী :—

তুলা
ছাগলের চামড়া
চা
রেড়ীর বীজ
মাইকা „
শণ „
ম্যাঙ্গানিজ ৭,০০০ টন
পাট ২,০০০ টন

বৃটিশ সাম্রাজ্যের কৃষি ও বাণিজ্যে উন্নতির আশা

ডিউক অব্ ইয়র্ক একটী সাদ্ধ্য ভোজে বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ ফেয়ার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন।

বিলাতের মত অন্যান্য দেশেও গত বৎসর হইতে ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। জগতের সমস্ত দেশে, বিশেষতঃ ইয়োরোপে ফসল খুব ভালই হইয়াছে। ফলে বিলাতের বাহিরের সমস্ত বড় বড় কৃষি-বাজারেরই ক্রয়শক্তি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আরও একটা খুব ভাল লক্ষণ এই যে, আগেকার মত আজকাল এক্সচেঞ্জ উঠা-নামা করে না। ফলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ বাড়িয়া উঠিবে এরূপ আশা করা যায়। এই ব্যাপার এবং আরও কতকগুলি অনুকূল লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায় যে, ১৯২৮ সনে বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য যেরূপ বাড়িয়া উঠিবে বিগত মহাযুদ্ধের পর তেমনটী আর কখনও বাড়ে নাই।

কেহ কেহ হয় ত ভাবিতে পারেন যে, অনেকদিন-ব্যাপী ব্যবসা মন্দার ফলে দুনিয়ার বাজারে বিলাত নিজ আধিপত্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। অবস্থা বরং বিপরীতই হইয়াছে। বাজারে যখন প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে ব্যবসায় টিকিয়া থাকা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও দুনিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বিলাতের পণ্যই বাজারে বেশী কাটিয়াছে একথাটা খুব সত্য।

ব্যবসা বাড়িয়া উঠিবার মত একটী লক্ষণও দেখা যায়। সাম্রাজ্যিক ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলার অনেকটা মতের মিল দেখা যায়। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশের লোকেরই আজকাল লক্ষ্য হইয়াছে যে, কি করিয়া সাম্রাজ্যের সহিত ব্যবসার উন্নতি হয় ও কি করিয়া সাম্রাজ্যের যোগাযোগ আরও সুবিধাজনক হয়। সাম্রাজ্যিক ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার জন্য সাম্রাজ্যবাসীদের এইরূপ সহানুভূতি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যের কৃষি ও বাণিজ্য উভয়ই অচিরে খুব বাড়িয়া উঠিবে। তা ছাড়া, কৃষি-বাণিজ্যের খাতিরে একদেশ হইতে অন্য দেশে লোক চালান দিলে সে দেশের কৃষি বাণিজ্য খুব বাড়িয়া উঠিবে। আর একটী ফল হইবে এই যে, বেকারগুলার কাজ জুটিবে। এই কারণে যে দেশ হইতে লোক রপ্তানি করা হইবে সেই দেশেরও যথেষ্ট উপকার হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি

১৯২৮ সনে দক্ষিণ আফ্রিকায় যত মাল আমদানি হইয়াছে সেরূপ পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। ১৯২৯ সনের আমদানি আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। উত্তর রোডেশিয়া একরূপ তাম্রপূর্ণ বলিলেই হয়। ইতি মধ্যেই সেখানে কতকগুলি বড় বড় তামার খনিতে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সমস্ত খনির জন্য অনেক প্ল্যান্ট, কলকব্জা ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষপত্র দরকার হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই সমৃদ্ধির জন্য নাগরপারের যেসবগুলি হইতে ষষ্ঠে মাসের অর্ডার আসিবে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে যেরূপ কৃষিসম্পদ্ এই দেশে দেখা দিয়াছে এমন আর কোন দিন এই দেশের ভাগ্যে ঘটে নাই। তুলা, চিনি, ফল এবং নানাবিধ শস্য এতই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে যে, ১৯২৭ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত এই এক বৎসরের মধ্যে এই দেশ হইতে ৬০ লাখ পাউণ্ড বেশী মূল্যের মাল চালান গিয়াছে। ১৯২৮ সনে ভেড়ার লোমের দাম বাড়িয়া যায়; তবু এই সনে পূর্ব্ববর্ত্তী সন অপেক্ষা ২০ লাখ পাউণ্ড বেশী মূল্যের ভেড়ার লোম রপ্তানি হইয়াছে। এই সমস্ত সমৃদ্ধির ফলে কৃষক-পরিবারগুলি অনেক খরচ পত্র করিতেছে; তাহারা নানা জাতীয় বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিতেছে, যাহা তাহাদের ক্ষমতায় কখনও কুলায় নাই। অশ্ব কিংবা বলদবাহিত যানবাহনে আর তাদের রুচি নাই; পূর্ব্বে যে কালেভদ্রে পুরাতন মোটর গাড়ী ইত্যাদি কিনিত তাহাতেও তাহাদের আর মন উঠিতেছে না; তাহারা একেবারে উৎকৃষ্ট ধরণের নূতন মোটর গাড়ী কিনিয়া সখ মিটাইতেছে। ইহারা এখন মোটর ট্রাক, ট্রাক্টর, এবং তেলের এঞ্জিন কিনিতেছে; অনেকের ঘরে বিজলীবাতিও জ্বলিতেছে। চাষার মেয়েরা এখন একেবারে ল্যাশানের রাণী হইয়া পড়িয়াছে; সকলেই দামী দামী পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইতেছে। এই সমস্ত সৌখীন জিনিষপত্র কিনাও এখন তাদের পক্ষে সহজ, কারণ যখন তখন মোটর হাঁকাইয়া তাহারা সহরে যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু তাহারা বছরের মধ্যে এক আধ বারও সহরমুখো হইত কি না সন্দেহ, তাহাও আবার কৃষি-প্রদর্শনী ইত্যাদি কোনরূপ উপলক্ষ্যে ভিন্ন নহে।

বঙ্গীয় নদী-সংস্কার কমিটি

বাঙ্গালা সরকার বঙ্গদেশের জলপথ সম্বন্ধে আলোচনা ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য বিশেষজ্ঞের এক কমিটি গঠিত করিয়াছেন। উক্ত কমিটী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিবেন।

১। চাষের জমিতে জল প্রদান, জলপথ উন্মুক্ত রাখা, মরা নদীর সংস্কার, বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া, ও সঞ্চিত জলের নিষ্কাশন।

২। বাঙ্গালা দেশের জলপথের ব্যবস্থা করিবার জন্য সেচ বিভাগ হইতে পৃথক কোন বিভাগ স্থাপন করা উচিত কিনা এই কমিটী তাহার বিচার করিবেন।

৩। বঙ্গদেশীয় জলপথ কমিটি স্থাপিত হইলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী এবং তাহার শাখাগুলিকে উন্মুক্ত রাখিবার কাজের সুবিধার জন্য এই বোর্ডে বিহার উড়িষ্যা ও আসামের প্রতিনিধি লওয়া হইবে কিনা তাহাও এই কমিটী নির্দ্ধারণ করিবেন।

৪। অর্থ সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ।

কলিকাতায় এই কমিটির প্রধান কার্য্যালয় হইবে। জানুয়ারী মাস হইতেই ইহার কাজ আরম্ভ হইবার কথা।

রেল-যাত্রীর সুবিধা

ই, আই, এবং ই, বি রেলওয়ে কোম্পানীর নূতন নিয়ম অনুযায়ী যাত্রীরা বিনা মাশুলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য লইয়া যাইবার সুবিধা পাইয়াছেন। পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ১৫ সের, মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা ২০ সের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ৩০ সের দ্রব্য বিনা মাশুলে লইয়া যাইতে পারিতেন। নূতন নিয়মানুসারে বিগত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ঐ তিন শ্রেণীর যাত্রীরা পূর্ব্বাপেক্ষা দশ সের অধিক দ্রব্য অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী এক মণ, মধ্যম শ্রেণী যাত্রী ৩০ সের এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ২৫ সের বিনা ভাড়ায় লইয়া যাইবার সুবিধা পাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে এই সুবিধা দেওয়া হয় নাই অর্থাৎ তাঁহারা পূর্ব্বেও যেরূপ দেড় মণ দ্রব্য বিনা ভাড়ায় সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন, এখনও সেইরূপ দেড় মণই লইয়া যাইতে পারিবেন।

কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন

সর্ব্বসাধারণ অবগত আছেন যে, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে কুলাউড়ায় রিলিফ কমিটি সমূহের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীহট্ট জিলার কৃষি এবং শিল্পের স্থায়ী উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বন্যার আক্রমণে ফসল নষ্ট হইয়া যে অভাব অনটন হয় তাহার কথঞ্চিৎ উপশম করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটী গঠিত হয়। উক্ত কমিটী শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থার অনুসন্ধান করিতেছেন।

সহরবাসী এবং বিশেষভাবে গ্রামবাসী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধানক্রমে এই প্রশ্নাবলীর উত্তরে নিজ অথবা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শিল্পের অবস্থা কমিটীকে জানান তবে বিশেষ উপকার হয়। আমরা আশা করি জিলার বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক মহানুভব ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধানক্রমে স্থানীয় শিল্পের অবস্থা আমাদিগকে জানাইবেন। ৩০শে জানুয়ারী মধ্যে উত্তর পাওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের নামে উত্তর পাঠাইতে হইবে। সিলেট হোম ইনডাষ্ট্রিজ্ এসোসিয়েশন নামে কুটীর শিল্পের উন্নতিকল্পে একটি স্থায়ী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। শিল্পিগণকে পরামর্শ দান ও

অবস্থাবিশেষে অর্থসাহায্য করিয়া শিল্পের উন্নতি সাধন এ সমিতির উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ উক্ত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সমিতি আশা করেন শ্রীহট্ট জিলার কুটীর-শিল্পের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সমিতির সভ্য হইয়া নানা ভাবে সাহায্য করিবেন। বাৎসরিক চাঁদা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রশ্নাবলী

অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১ মাস মধ্যে অত্র কারম পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন। প্রত্যেক প্রকার শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক কাগজে লিখিবেন।

থানা—সার্কেল নম্বর—পরগণা—গ্রাম—ডাকঘর—

সাধারণ অনুসন্ধান

১। উপরের লিখিত স্থানে কোন প্রকার কুটীর-শিল্পের উৎপাদন হয় কি?

২। কি কি শিল্প উৎপাদিত হয় তাহার নাম লিখিবেন।

৩। পূর্ব্বে ঐ শিল্পের কি অবস্থা ছিল?

৪। বর্ত্তমানে উহা কি অবস্থায় আছে?

৫। অবনতি হইলে কি কারণে হইয়াছে?

৬। উন্নতি হইলে কি কারণে ও কি ভাবে হইয়াছে?

৭। কতজন লোক (পুরুষ ও স্ত্রী) ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছে? শিল্প হইতে তাহাদের দৈনিক বা মাসিক বা বাৎসরিক আয় জনপ্রতি গড়ে কত?

৮। তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য কোন সন্ধান আছে কি?

৯। ঐ শিল্পীরা কোথা হইতে কি ভাবে মূলধন যোগাড় করে?

১০। টাকা কর্জ্জ আনিলে সুদ কত?

১১। শিল্পনিপুণ শিল্পিগণ দ্বারা কার্য্য পরিচালিত হইতেছে কিনা, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য বাড়াইবার কোন উপায় অবলম্বন করা হইতে পারে কি না এবং তাহারা ঐ কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে ইচ্ছুক কি না?

১২। কাহার দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিলে তাহারা কি ভাবে দাদন দেয়?

১৩। কি সুদে দাদন দেওয়া হয়? কি কি সর্ত্তে দাদন দেওয়া হয়? প্রস্তুত মাল দাদনকারীর নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে, না করিলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ সর্ত্ত থাকে কি? যে দরে মূল্য স্থির হয় তাহা বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম কি না? টাকা প্রতি কত আনা কম? এই সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য হইয়া শিল্পিগণ জিনিষের প্রকৃত মূল্য হইতে বঞ্চিত হয় কি না? ঐ সকল মহাজনগণের হাত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইলে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন? তাহার কাটতি আরও কোনও প্রকারে হইতে পারে কি না? যদি হয় তাহা হইলে মূল্যের তারতম্য কিছু ঘটে কি না?

১৪। বর্ত্তমান শিল্পীরা ঐ শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে ইচ্ছুক কি না?

১৫। তাহারা কি ভাবে (ক) মূলধন (খ) কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং (গ) জিনিষ বিক্রয় করার জন্য সুযোগ ও সুবিধা পায় এবং ঐ কাঁচা মাল বাজার-দর অপেক্ষা টাকা প্রতি কত আনা কম কি বেশী মূল্যে সংগ্রহ করা হয়?

১৬। এক সঙ্গে বহু টাকার কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া যদি বিনা লাভে সরবরাহ করা হয়, তবে শিল্পিগণ লাভবান হইবে কি না এবং শিল্পের উন্নতি হইবে কি না?

১৭। তাহাদের প্রস্তুত জিনিষ কি ভাবে কোথায় বিক্রী হয়? মধ্যবর্ত্তীরা টাকা প্রতি কত আনা মুনাফা রাখে?

১৮। ধনী এবং স্বচ্ছলাবস্থাপন্ন কয়েকজন শিল্পীর নাম শিল্পের বিষয় সহ লিখিবেন।

লুপ্ত শিল্প

১৯। কোনও প্রকার শিল্প, যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং বর্ত্তমানে লুপ্ত, তাহার নাম দিবেন।

২০। কি কারণে কত বৎসর যাবৎ লুপ্ত হইয়াছে?

২১। বর্ত্তমানে ঐ লুপ্ত শিল্প উদ্ধার করিবার কোন উপায় থাকিলে তাহাও লিখিবেন।

আনুষঙ্গিক শিল্প

২২। কৃষকের বৎসরে কোনো কোনো সময়ে একান্ত অবসর থাকে কি না?

২৩। এ অবসর সময়ে তাহারা কোন প্রকার শিল্পের কার্য্য গ্রহণ করে কি না?

২৪। যদি গ্রহণ করে, তবে কি প্রকার শিল্প কার্য্য গ্রহণ করে এবং তাহাতে কি ভাবে আয় হয়?

২৫। মূলধন, কাঁচা মাল এবং অভিজ্ঞদিগের উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিলে তাহারা আরও উৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিবে কি?

২৬। যদি অবসর সময়ে তাহারা কোন প্রকার শিল্প-কার্য্য না করে তবে উৎসাহ দিলে কোন প্রকার শিল্প গ্রহণ করিবে কি না?

নূতন শিল্প

২৭। যে কোন নূতন শিল্প কার্য্যে যে কোন লোককে নিযুক্ত করা যায় কি? এই সম্বন্ধে কোন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন সম্ভবপর কি না?

২৮। যদি সম্ভবপর হয়, কি কি শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে?

২৯। নূতন শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্য কোন সাহায্য করার প্রয়োজন আছে কি না? যদি থাকে কিরূপ সাহায্য করার প্রয়োজন?

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সমস্যা

৩০। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারদিগের কোনও শিল্প কার্য্যে লাগান যাইতে পারা যায় কি না এবং পারিলে কি কাজে লাগান যাইতে পারে এবং তজ্জন্য ইহাদিগকে কিরূপ সাহায্য করা আবশ্যক?

হাতিয়ার

৩১। কি প্রকার হাতিয়ার শিল্পীরা বর্ত্তমানে ব্যবহার করিয়া থাকে? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে কি? উহাতে তাহাদের সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হইতে পারে কি না? যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া শিল্পিগণ লাভবান হইবে কি না? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ার পাইতে হইলে কোন কোন শিল্পীর হয়ত কিছু মূলধনের প্রয়োজন হইতে পারে; তাহা কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ারের জন্য কত অধিক মূলধন আবশ্যক এবং ঐ হাতিয়ার দ্বারা কত অধিক আয় হইতে পারে?

শ্রীহট্ট জিলায় নিম্নলিখিত কুটীর-শিল্পের প্রচলন বিশেষ ভাবে হইতে পারে।

(১) চর্ম্মশিল্প (২) (ক) নারিকেলের ছোবড়াদ্বারা নানারকম জিনিষ তৈয়ার (খ) পাট দ্বারা দড়ি ও ছালা প্রস্তুত (৩) লাক্ষার চাষ ও গালা প্রস্তুত (৪) শঙ্খ-শিল্প (৫) মোতাম তৈয়ার (৬) সাবান তৈয়ার (৭) ধান ভানার ছোট ছোট কল ও ধাতা স্থাপন (৮) ঘানি এবং অন্যান্য প্রেস (৯) ছাতার বাঁট তৈয়ার (৯) তামা কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ার, পিতলের মোহর তৈয়ার (১০) (ক) হুকা ও নলিচা তৈয়ার (খ) হুকার তলসী (১১) সূতা কাটা ও কাপড় বোনা (১২) মাটীর বাসন তৈয়ার (১৩) (ক) বার্ণিশ (খ) কাঠের কাজ—খেলনা, কুরশি ও গাছা (১৪) পাটী, চাটাই, ঝাড়া ও কুশাসন তৈয়ার (১৫) (ক) পোকার চাষ (খ) পোকা হইতে সূতা কাটা (গ) রেশম ও এণ্ডির কাপড় তৈয়ার (১৬) লৌহ দ্বারা নানারকম জিনিষ তৈয়ার (১৭) কম্বল, সতরঞ্চি, বালাপোষ তৈয়ার (১৮) বস্ত্রের কাজ (১৯) টিনের জিনিষপত্রাদি তৈয়ার (২০) মাছ ধরিবার জাল তৈয়ার (২১) নানাপ্রকার রেশমী রংয়ের কাজ ও ছাপের কাজ (২২) লোহার কাজ (দা, ছুরি, কাঁচি ক্ষুর, কোদাল, ও খাঁতি তৈয়ার) (২৩) বাঁশের ও বেতের কাজ (২৪) তালা চাবি তৈয়ার (২৫) গালাদ্বারা খেলনা ও চুড়ী প্রস্তুত (২৬) কাঁচা শুকনা মৎস্যের ব্যবসা, মাছের তৈল গাছের সার (২৭) মোরা গেন্ডি ও কন্দর্টার তৈয়ার (সূতা ও উল দ্বারা) (২৮) পাখা প্রস্তুত (২৯) পশু, পক্ষী ও মৌমাছি পালন (৩০) দুগ্ধ দ্বারা নানাবিধ জিনিষ

তৈয়ার ; আচার চাটনী ইত্যাদি তৈয়ার (৩১) স্লেট ও স্লেট পেন্সিল, শিল পাটা ইত্যাদি তৈয়ার (৩২) কলমের হোল্ডেল ও নিব তৈয়ার। (৩৩) হাতীর দাঁতের কাজ (৩৪) দিয়াশলাই তৈয়ার (৩৫) রবার ষ্ট্যাম্প (৩৬) লাঠি তৈয়ার (৩৭) মাঠি, বালি এ্যাসিট তৈয়ার (৩৮) পাটী তৈয়ার।

ভারতের সম্পদ্ বৃদ্ধির মোসাবিদা

কেম্বল চেম্বার অব্ কমার্স নামক ইয়োরোপীয় বণিকসভা কর্তৃক প্রচারিত মোসাবিদার মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

তথাকথিত বর্জ্জন ও বহিস্কার-নীতি

ভারতবর্ষে আজকাল অনেক মাথাওয়ালা লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা রাজনীতি চর্চ্চা করেন তাঁহারা মনে ভাবেন এবং লোক সমক্ষে প্রচারও করিয়া থাকেন যে, বিদেশী পুঁজিই ভারতের অনর্থের মূল। বিদেশী পুঁজি-পতিগণের শোষণ হইতে ভারত ভূমিকে রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা রক্ষা নাই। অতএব ভবিষ্যতে বিদেশী পুঁজি তো গ্রহণ করা হইবেই না, উপরন্তু এখন যে সমস্ত বিদেশী পুঁজি এদেশে খাটিতেছে সে সমস্তও ভারত হইতে বহিস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ব্যবস্থা পরিষদে "হাজির উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল" লইয়া যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, তাহাও এই মনোভাব হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এই মনোভাবের প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে যে, বিদেশী বা বিলাতী পুঁজি বর্জ্জন করা বর্ত্তমানে ভারতের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। দেশী এবং বিদেশী এই উভয় প্রকার পুঁজির সম্মিলন এবং সহযোগিতার উপরেই ভারতের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

অনেকের ধারণা, বিলাতের পুঁজিপতিরা ভারতের বড় বড় এবং লাভজনক শিল্প ব্যবসাগুলি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং দেশী পুঁজির পক্ষে ভারতভূমিতে কোনই স্থান নাই। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। সত্য বটে, বিলাতের পুঁজিওয়ালারা এদেশের অনেক লাভজনক শিল্প ব্যবসা হস্তগত করিয়া লইয়াছে, কিন্তু ভারতের পুঁজিওয়ালাগণের পক্ষে এখনও অনেক বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আর সমস্ত ব্যাপার তলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, বস্তুতঃ ভারতের পক্ষে আর নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা না করাই শ্রেয়। উপস্থিত যেগুলি বর্ত্তমান সেইগুলিরই সংস্কার সাধন দরকার। বর্ত্তমান শিল্প-প্রচেষ্টাগুলিকে আধুনিকতম প্রণালীতে চালিয়া সাজা এবং ঐ সকলের বিস্তার সাধনের উপরেই এখনকার মত ভারতের পরম মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ভারতের উপকূল হইতে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে তাড়াইয়া লাভ কি? জলপথের যানগুলি না হয় আপাততঃ বিদেশীদের হাতেই রহিল। দেশের মধ্যে রেল পথ বিমান পথ ইত্যাদির জন্য এবং অন্যান্য যান-বাহনের ব্যবস্থার জন্যও তো প্রভূত অর্থের দরকার। দেশের মধ্যে উপযুক্ত রূপ যানবাহনের ব্যবস্থা কায়েম করার মত পুঁজিও ভারতবাসীর নাই। প্রমাণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে, রেলপথের বিস্তার-সাধনের জন্য ১৯২৮-২৯ সনেও ভারতকে বিলাত হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিলটী আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। অষ্ট্রেলিয়া এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যে শিক্ষা-লাভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া সাবধান হওয়া উচিত।

আর একটী কথা। বিদেশী পুঁজি ভারতের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। ভারতের অবস্থা এখন এত সমৃদ্ধ নয় যে, অনায়াসে দেশী পুঁজি দ্বারাই সমস্ত অভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে। বিদেশী পুঁজি দেশ থেকে বিতাড়িত করিলে ফল যে কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন ; কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে একটা বিরাট ওলট পালট সৃষ্টি হইয়া দেশবাসীর কষ্ট হইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও অবনত হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুঃখ কষ্ট এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা নিতান্ত দুই একদিনে বিদূরিত হইবে না।

শিল্পোন্নতির গোড়ার কথা

১৯১৩-১৪ সনে জগতের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। ভারতের আমদানি ১৯২৭-২৮

সনে প্রায় যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এই সনের রপ্তানি বাণিজ্য ১৯১৩-১৪ সনের রপ্তানি বাণিজ্যকেও হারাইয়া দিয়াছে। ১৮২৪-২৫ সনের রপ্তানি বাণিজ্য কিন্তু ১৯২১-২৮ সনের চেয়েও বেশী। চীন জাপানের সর্ব্বত্র যখন গোলযোগ, ইয়োরোপের শিল্পের উন্নতি যখন এরূপ ঢিমে তেতালায় চলিতেছে, বিলাতের মালিক এবং মজুরের কল যখন শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তখন ভারতের পক্ষে এই ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি নিতান্ত কম কথা নয়। কিন্তু এই সামান্য উন্নতিতে সন্তুষ্ট হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আরও অগ্রসর হইতে হইবে। কয়লা এবং তুলার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। এই দুই দিককে বাঁচাইতে হইলে অনেক কাঠ খড় পোড়াইবার দরকার। এই দুই শিল্পের অবনতির জন্য দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, অন্যান্য কয়েকটী শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য তাহার অনেকটা পূরণ হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ দিয়াশলাই এবং সিমেন্ট শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশী পরিচালক গণের উপর লোকের আস্থা লুপ্ত হওয়ার জন্য ভারতের পুঁজিওয়ালারা কাজ সেরূপ আগাইতে পারিতেছে না।

ভারতের উন্নতি বিধান করিতে হইলে, ভারত-সন্তানের অন্নের সংস্থান করিতে হইলে শিল্পের প্রসার একান্ত প্রয়োজনীয়। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ফিস্ক্যাল কমিশনও এই কথা বলিয়াছেন। ভারতের শিশু শিল্পগুলিকে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ নীতিও অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংরক্ষণ নীতি দ্বারা তেমন কিছু ফললাভ হয় নাই; কারণ ভারতের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে নাই। এই মতবাদটী যে নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা কয়েক বৎসরের মধ্যে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী এবং সমবায় সমিতি-গুলিতে পুঁজি সরবরাহের তারতম্য দেখিলেই টের পাওয়া যাইবে :—

বৃটিশ ভারতে রেজেষ্টারীকৃত এবং চলতি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর পরিচয়

বৎসর	সংখ্যা	আদায়ী মূলধন
১৯১৭-১৮	২,৫৯৭	৯৮,৬০,৫৪,০৬৭৲
১৯১৮-১৯	২,৭১৩	১,০৬,০৮,৭৫,৮৬০৲
১৯১৯-২০	৩,৫০০	১,১৯,৪৬,৩৪,৮৩৪৲
১৯২০-২১	৪,২৮৩	১,৪৮,৩১,০৩,৭৯৫৲
১৯২১-২২	৪,৭৮১	২,২২,৮৩,১৬,০৩২৲
১৯২২-২৩	৪,৭৮৫	২,৪৯,৮৫,৪০,৪৫০৲
১৯২৩-২৪	৪,৮২০	২,৫৪,৫৫,০৩,৪০৪৲
১৯২৪-২৫	৪,৮২২	২,৬৬,৫০,২৬,৫৬৮৲
১৯২৫-২৬	৪,৯২৬	৩,৬৭,৭৯,১১,০৪১৲
১৯২৬-২৭	৫,১৫৬	২,৬৭,০৯,৩৯,৫৯৫৲

বৃটিশ ভারতের সমবায় সমিতিসমূহের পরিচয়

বৎসর	সমিতির সংখ্যা	মেম্বরের সংখ্যা	মেম্বর এবং অন্যান্য সমিতিকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ
	২৪,৩৯৩	১,০৪৮,২৯০	৬,১১,৪১,১৯৯৲
	২৯,৮০০	১,২০৪,৯০০	৮,৬৩,৬৭,৮১০৲
	৩৭,২৫৪	১,৫২০,৩৭৬	১২,১১,৪০,১১১৲
	৪৩,৩৬৬	১,৭৫৬,২২৫	১৪,৯৪,০৪,৬২০৲
	৪৭,৮৭০	১,৯৮৩,৫৩৪	১৬,১৪,৪৯,৭১০৲
	৫১,৬৮৭	২,১২১,৩৬০	১৮,৭৮,৪৫,৭১৮৲
	৫৬,৫৫৫	২,৩৩০,৭৮৯	২১,২৮,৪৯,৬৩২৲
	৬২,৮৯৪	২,৫৯৪,৯৮৭	২৭,৭৬,১৮,৯০৪৲
	৬৯,০১৮	২,৮৭৭,৫৫০	৩৪,৩৭,৩৯,৭৯২৲
	৭৪,৩৭১	৩,১৯৫,৪৭৮	৩৮,২৬,৫০,৪৯৭৲

উপরের এই দুই তালিকা দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছে যে, ১৯১৭ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে যৌথ কোম্পানীগুলিতে খাটান পুঁজি বাড়িয়াছে কম সে কম ১৭০ কোটি টাকা, কিন্তু সমবায় সমিতিগুলিতে টাকা বাড়িয়াছে ৩০ কোটির কিছু উপর। একটীতে অনেক বেশী আর একটীতে অন্ততঃ কম এইরূপ না হইয়া যদি এই দুই খাতে সমান ভাবে টাকা খাটান হইত তাহা হইলে দেশের পক্ষে আর্থিক লাভের পরিমাণ নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইত।

ভারতবাসীর ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা আবশ্যক

ভারতের শিল্পগুলি বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ নীতি চালান একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি এবং শিল্প এই দুই বস্তুর উন্নতি ঠিক সমান তালে চলা চাই। ভারতের জনসাধারণের প্রধান অবলম্বন কৃষির উন্নতি না হইলে শিল্পোন্নতিতে কি ফল হইবে? কৃষিজাত দ্রব্য বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়িবে, এবং লোকে শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং ভারতের উন্নতি-কামী নেতাগণের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে মাথা খেলান উচিত। নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু প্রথমতঃ এখন যেগুলি বর্ত্তমান আছে সেগুলির সুব্যবস্থা করার দিকেই ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক। দেশের স্থায়ী উন্নতি বিধান করিতে হইলে সব দিকে লক্ষ্য রাখা চাই।

শিল্পোন্নতি হইতেছে না কেন? কৃষি এবং শিল্পের পরস্পর সাপেক্ষতা

ইণ্ডিয়ান ফিস্ক্যাল কমিশনের মতে বিলাত এবং ভারত এই দুই দেশের মধ্যে স্বার্থ লইয়া কোনরূপ অনৈক্য থাকিতে পারে না। একের আর্থিক উন্নতির সহিত অপরের আর্থিক উন্নতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ভারত শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইলে বিলাতের, আপাততঃ ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। কারণ কোন দেশে প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত শিল্পের উদ্ভব হয় বিলাতে সে সমস্ত শিল্প এখন একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইয়োরো-আমেরিকার অনেক দেশ এইরূপ শিল্পপ্রধান হইয়াছে তাহাতে বরং বিলাতের লাভই হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত দেশের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাওয়াতে উৎকৃষ্ট বিলাতী মালের খরিদ্দারই বাড়িয়াছে। ভারত যদি একটী শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হয় তাহা হইলে বিলাতের সম্পদ্ বাড়িয়া যাইবে।

এই কমিশন এবং ভারতের শিল্প-ধুরন্ধর ও রাজ-নীতিবিদ্ সকলেই একটী মস্ত বিষয় আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। ভারতবাসীর ক্রয়শক্তি বাড়াইবার জন্য যে কৃষির উন্নতি-বিধান সর্ব্বাগ্রে দরকার এই সহজ এবং সরল সত্যটী সকলেরই দৃষ্টিপথ এড়াইয়া গিয়াছে। ভারতের শিল্প-উন্নতির জন্য কেবলমাত্র সংরক্ষণ-নীতি জোরসে চালাইলেই চলিবে না। শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার পুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নতুবা লাভের বেলায় অষ্টরম্ভার সম্ভাবনা।

ভারতের বাজারে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য সেরূপ কাটিতেছে না

ভারতবাসীর ক্রয়শক্তি যে নিতান্ত কম, ইহা একদম কথার কথা নয়। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ভারতের বাজারে কিরূপ কাটিতেছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বেশ পরিষ্কাররূপে ব্যাপারটী বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যের মধ্যে চা, পাট এবং পাটজাত দ্রব্য হইতেই যা দু' পয়সা লাভ পাওয়া যায়; কিন্তু এই দুই চিজের প্রধান খরিদ্দার অ-ভারতবাসী। অন্য পক্ষে কয়লা এবং তূলা বা তূলাজাত দ্রব্যের প্রধান খরিদ্দার ভারতবাসী, কিন্তু এই দুই শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। কাহারও কাহারও মতে এই দুই চিজ প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে উদ্ভূত হইতেছে, কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা। দেশবাসীর পক্ষে যতখানি এই দুই চিজ ক্রয় করার দরকার তার চেয়ে অনেক কমই এই দুই চিজ উদ্ভূত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতকে যদি উঠিতে হয়, তবে মান্ধাতার আমলের কৃষিকার্য্যে আর চলিবে

না। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য্য চালাইয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। আজ ভারতের মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট মানুষগুলির সর্ব্বাগ্রে এই সত্যটী হজম করা দরকার যে, কৃষি-ক্ষেত্রের লাভ কমার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিবে, মজুরের পরিমাণও সেই সঙ্গে কমিতে বাধ্য।

দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই চাষী

জেনেভা সহরে ওয়ার্ল্ড্ ইকনমিক কনফারেন্স বা নিখিল জগৎ অর্থনৈতিক সমিতিতে কৃষি সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ভারতের পক্ষে বেশ খাটে। এই অর্থনৈতিক সমিতির মতে দুনিয়ার অধিকাংশ শ্রমজীবীই চাষবাসের উপর নির্ভর করে এবং জগতের ব্যবসাবাণিজ্য কৃষিজাত দ্রব্যের সহিত শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময় ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্য ঠিক এই ধরণের বিনিময় ব্যাপার। এই সমিতির আর একটী মতবাদ এই যে, শিল্পের উন্নতির একটী শেষ সীমা আছে; যেখানে আসিয়া পৌঁছিলে আর অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। অনেকগুলি কারণে এইরূপ শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। কৃষিজাত খাদ্য দ্রব্যের এবং কাঁচা মালের পরিমাণ এই সমস্ত কারণের অন্যতম। ভারতবর্ষের কয়েকটী শিল্প এইরূপ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য এই সকলের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, একটীর অবনতি হইলে অপর দুইটী অবনত হইতে বাধ্য। দুনিয়ার অনেক স্থানের কৃষককুল উপযুক্তরূপ পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষকগণের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাওয়ায় কল-কারখানার কাজও মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে। আবার কল-কারখানায় কাঁচা মালের টান কম পড়ায় কৃষকগণের কৃষিজাত দ্রব্য বেচিবার পক্ষেও সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। মোট কথা কৃষকগণকে দোহন করিতে যাইয়া কলকারখানার মালিকগণও মুস্কিলে পড়িয়াছেন। কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে সমতা রাখিবার আশু প্রয়োজন, নতুবা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় গোটা মানবজাতির দুঃখ-দৈন্য বাড়িয়া যাইবে। চাষবাসের কাজে বিজ্ঞানের সাহায্য দরকার হইয়া পড়িয়াছে। গোটা দুনিয়ার কৃষি-সম্পদ্ বাড়াইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষককুল উচিত মূল্য পাইয়া যাহাতে তাহাদের জীবনযাত্রা উন্নততর প্রণালীতে চালাইতে পারে সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। দুনিয়ার মানব সমাজ যেন এই সত্যটি ভাল করিয়া সমঝিতে পারে। তাহারা যেন মনে না করে, চাষবাসের জন্য তেমন মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য পরিচালনের সুবিধা

ভারতের কৃষকের সম্মুখে আজ তিনটী অসুবিধা বর্ত্তমান। প্রথমতঃ, জমির পরিমাণ কমিবার জন্যই হউক বা জমিতে ফসল কম উৎপন্ন হওয়ার জন্যই হউক, তাহার সঙ্গতি কমিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গো-মহিষের অভাবে সুবিধা-মত জমি-কর্ষণ হইতেছে না। তৃতীয়তঃ, কৃষিকার্য্যে অনেক লোকের ভিড় জমিয়াছে। কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানের সহায়তা লইলে এই সমস্ত আপদ চুকিয়া যাইবে। কারণ, বৈজ্ঞানিক সার দেওয়ার ব্যবস্থাদি করিলে ফসল বেশী উৎপন্ন হইবে। বৈজ্ঞানিক হাল হাতিয়ার প্রবর্ত্তিত হইলে গো-মহিষেরও সেরূপ দরকার হইবে না, কৃষিমজুরের সংখ্যাও কমিবে। এইরূপে কৃষিকার্য্যের খরচ কমিয়া গেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশী ফসল উৎপন্ন হইতে থাকিলে কৃষকের সম্পদ্ বাড়িবে, ভারতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যও বেশী বেশী বিক্রয় হইতে থাকিবে। কাজে ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতীয় কৃষকই ভারতীয় দ্রব্যের প্রধান খরিদ্দার।

ভারতীয় কৃষকের ক্রয়শক্তি কমিয়াছে

যুদ্ধের আগে ভারতবাসী যেমন কাপড়চোপড় কিনিত, এখন আর তেমন কিনিতে পারিতেছে না। যুদ্ধের আগে ভারতবাসী মাথা পিছু ১৮ গজ কাপড় কিনিত, কিন্তু এখন কিনিতেছে মাত্র ১০ গজ। ভারতবর্ষে যত কাপড়চোপড়ের দরকার হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশ দেশের তাঁতে প্রস্তুত হয়, এক-তৃতীয়াংশ স্বদেশী মিলগুলি সরবরাহ করে এবং বাকী

এক-তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আসে। মোট ভারতবাসীর সংখ্যা ৩২ কোটী ধরিলে প্রায় ১০ কোটী মানুষের কাপড়ের সংস্থান দেশী কলগুলির দ্বারা হইতে পারে। সুতরাং কাপড়ের উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বসাইয়া লাভ কি হইবে? যাহাই কেন করা হউক না, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের দ্বারাই ভারতের কাপড়ের অভাব দূর হইবে না। কাপড়ের পর অন্যান্য যে সমস্ত জিনিষ বেশী মাত্রায় আমদানি হয় সে সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। আমদানি বাণিজ্যের এই সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের মধ্যে কাপড়ের নীচেই ধাতু পদার্থের স্থান, তাহার পর কলকব্জা, চিনি, তেল এবং যানবাহন ইত্যাদির স্থান। এই সমস্ত দ্রব্য আমদানি বাণিজ্যের যথাক্রমে ১১·৩৭%, ৬·৫৮%, ৫·১৭%, ৪·৪৪% এবং ৩·০৮% অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত জিনিষপত্র বাদে অন্য যে সমস্ত বিদেশী পণ্য ভারতে আমদানি হয় তাহার চাহিদা ভারতে এতই কম যে মাত্র স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া সে সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা যায় না। অন্য পক্ষে, যে সমস্ত জিনিষ এদেশে বেশ কাটে, সেইরূপ কয়েকটী জিনিষের কারখানা বেশ চলিতেছে। দিয়াশলাই শিল্পের এত দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, আশা করা যায় দু'এক বৎসরের মধ্যে বিদেশী দিয়াশলাই ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইবে। সিমেন্ট শিল্পের অবস্থাও বেশ ভাল। ১৯২৭ সনে ভারতে যত সিমেন্ট ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার ৮৭% ভারতীয় মাল।

কৃষকের ক্রয়শক্তি বাড়ানো আবশ্যক

মোটের উপর দেখা যাইতেছে, কৃষকের ক্রয়শক্তি বাড়াইবার প্রয়োজন। এই জন্য তিনটী উপায় অবলম্বনের দরকার। (১) ফসল উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। ফসল বাড়াইবার জন্য প্রয়োজন হইলে পয়ঃপ্রণালী খনন করিতে এবং উচ্চাঙ্গের বীজ, বৈজ্ঞানিক সার, বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার ইত্যাদি সমস্তই সরবরাহ করিতে হইবে। (২) কৃষিকার্য্যের খরচা কমাইতে হইবে; এজন্য ঋণের সুদের হার কমাইবার দরকার। (৩) কৃষকের মোট মুনাফা বাড়াইবার প্রয়োজন। এ জন্য ফসল-বিক্রয়ের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং দালাল, ফড়িয়া প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী জীবগুলির উপার্জ্জনের হার কমাইতে হইবে। কৃষকদিগকে যে পরিমাণে এই ত্রিবিধ সাহায্য করা যাইবে, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও সেই পরিমাণে বাড়িবে।

এই ত্রিবিধ উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতেও অনেক কিছু করা আবশ্যক। সমবায় বিভাগ, কৃষি বিভাগ, সমবায় বিভাগ, এই তিনটী বিভাগ হইতেই কার্য্য আরম্ভ হওয়ার দরকার। ভারতের আর্থিক উন্নতি কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য এই তিনটির উপরেই নির্ভর করিলেও কৃষির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষারও বহুল প্রচলন আবশ্যক। শিক্ষা না পাইলে লোকের মনে উচ্চ প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে না এবং কেহ আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য রীতিমত খাটিবেও না। ভারতীয় জনসাধারণের মন হইতে স্বল্পে সন্তুষ্টির ভাব দূর করিতে হইবে। ভারতের রাস্তা, সড়ক ইত্যাদির অবস্থাও শোচনীয়। রাস্তার অভাবে মালপত্র ক্রয়বিক্রয়ের জন্যও কৃষকদিগকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ভারতের মত জনবহুল দেশে শিল্পজাত জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রী হওয়ার দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ কিছুই হয় না। এমন কি এশিয়ার অন্যান্য দেশও ভারত অপেক্ষা এ বিষয়ে উন্নত। কেবলমাত্র চীন এবিষয়ে ভারতের সমকক্ষ। নীচের তালিকাটি দেখিলেই ব্যাপারটি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে :—

বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু-ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ

দেশের নাম	বৎসর	আমদানি (ডলার)	রপ্তানি (ডলার)
সিংহল	১৯২৭	২৮·৮	৩৪·০
চীন	১৯২৬	১·৯	১·৫
ভারতবর্ষ (বৃটিশ)	১৯২৭	২·৯	৩·৬
ইণ্ডো-চায়না	১৯২৬	৪·৭	৬·৩
ইরাক	১৯২৪-২৬	১২·৩	৫·৮

দেশের নাম	বৎসর	আমদানি (ডলার)	রপ্তানি (ডলার)
জাপান (মূল)	১৯২৭	১৬·৭	১৪·৬
বৃটিশ মালয় (ক)	১৯২৭	১৭২·০	১৭৯·০
ডাচ্ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	১৯২৬	৬·৪	
প্যালেষ্টাইন	১৯২৬	৩৩·৬	
পারস্য	১৯২৬-২৭	৭·৬	
ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ	১৯২৭	৯·৭	১৩·০
শ্যাম	১৯২৬-২৭	৮·৫	১০·৪
সিরিয়া	১৯২৭	১৬৮	৭·২
তুরস্ক	১৯২৬	৯·০	৭·২

ভারতের মাটী অনুর্ব্বর নয়। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অতি অল্পমাত্রাতেই ব্যবহৃত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে ভারতের এই হীন অবস্থা কাটিয়া যাইবে।

ভারতে বিদেশী খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি

লণ্ডনস্থ ভারতীয় ষ্টেড্ কমিশনারের বৈবাষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ১৯২৬ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত দুই বৎসরের হিসাবপত্র আছে। উহা পাঠে দেখা যায় যে, ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার কারণ গ্রীষ্মপ্রধান এবং আধা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হিসাবে কতকগুলি জিনিষপত্র উৎপাদন সম্বন্ধে ভারতের যে একচেটিয়া অধিকার ছিল, এখন আর তাহা নাই। আফ্রিকা, এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূভাগে চাষবাস আরম্ভ হওয়ায়, এবং এমন কি ইয়োরোপের দক্ষিণ সীমানায় সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশসমূহেও গ্রীষ্ম-মণ্ডলের উপযোগী নানারূপ ফসল উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতের এই একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নানারূপ পদার্থ (সিন্থেটিক দ্রব্য) আবিষ্কৃত হইয়া প্রাকৃতিক জিনিষের স্থান অধিকার করায় অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা তো এই দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং, এখন ভারত যদি দুনিয়ার বাজারে তাহার আসন রক্ষা করিতে চায় বা প্রতিপত্তি আরও বাড়াইতে চায়, তাহা হইলে ভারতকে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইবে, কৃষিকার্য্যে আধুনিক কায়দা এবং যন্ত্রপাতি কায়েম করিতে হইবে, সস্তায় মাল চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উৎপাদনের খরচ কমাইতে হইবে এবং সাগর পারের বাজারগুলি কি চায় না চায় তাহা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ অবস্থা ভারতীয় চাষীদের গোচরীভূত করিতে হইবে।

যুদ্ধের পরে ইয়োরোপে চারিত্র, ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্পের গতি কোন মুখে চলিতে সুরু করিয়াছে তৎসম্বন্ধেও অনেক তথ্য এই বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যের প্রধান খরিদ্দার কৃষিজীবী; এই কৃষকদের ক্রয়-শক্তির লাঘব হইবার জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক মজুর বেকার হইয়াছে; আবার মজুরের দল বেকার হওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের টান আরও কমিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা মালের চাহিদাও কমিয়াছে। এই কাঁচামাল আবার কৃষকগণই উৎপন্ন করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্ব অপেক্ষাও ইয়োরো-আমেরিকার বেকার-সমস্যার অবস্থা কঠিনতর দাঁড়াইয়াছে। তবে রাষ্ট্র হইতে নানাপ্রকার সাহায্য ও আইনকানুন ইত্যাদির ব্যবস্থা হওয়ায় শ্রমিকদের দুর্দ্দশার অনেকটা লাঘব হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপার এখনও গুরুতর। যুদ্ধের আগের তুলনায় লোকের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, অথচ জীবনযাত্রার প্রণালী উচ্চতর হওয়ায় খরচের বহর বাড়িয়া চলিয়াছে।

ইয়োরোপের তো এই অবস্থা। ভারতের অবস্থাও শোচনীয়। ভারতের পক্ষে প্রথম করণীয় কাজ অন্ততঃ দেশবাসীর প্রয়োজন-মাফিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। ভারতবাসীর অন্নকষ্ট দূর করিতে হইলে এমন পরিমাণ জমিতে শুধু খাদ্য শস্য উৎপাদন করার দরকার যাহাতে সাধারণতঃ দেশবাসীর অভাব মোচনের পর কিছু শস্য বিদেশেও প্রেরিত হইতে পারে। এইরূপ

উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয়ের সুবিধা এই যে, দুর্বৎসরে ভারতবাসীকে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' বলিয়া মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে না। কিন্তু ভারতে এই ভাবে শস্য উৎপন্ন হইতেছে কি? বড়ই দুঃখের বিষয় আজ ভারতকে বিদেশ হইতে খাদ্য শস্য আমদানি করিতে হইতেছে। অবশ্য শিল্পপ্রধান দেশের পক্ষে রেওয়াজই এই, আর তাহার পক্ষে ইহা শোভাও পায়। কিন্তু ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে সেরূপ বিক্রী হয় না বলিলেই চলে; আর অদূর ভবিষ্যতে এ অবস্থার পরিবর্তনও হইবে না। সুতরাং ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে খাদ্য শস্য আহরণ ভারতের ঘোর আর্থিক অবনতির পরিচায়ক। এই অবস্থার পরিবর্তনসাধনের জন্য অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা করার দরকার। ভারতের গম শস্য সম্বন্ধে ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ প্ল্যাণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীর ডিরেক্টার, মিঃ অ্যালবার্ট হাউয়ার্ড, সি আই ই সম্প্রতি লিখিয়াছেন :—

এমন দিন আসিবে যেদিন ভারত হইতে এক ছটাক গমও বিদেশে রপ্তানি হইবে না, এবং পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ গম আমদানিকারক দেশে পরিণত হইয়া যাইবে। এখন সিদ্ধান্ত এই যে, ভারত কি গম সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে অথবা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভের মত আবার একটী বড় গম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হইবে? ইহার উত্তরে "না" বলিবার মত কিছু নাই। ভারতবর্ষে এখন যে সমস্ত জমি আবাদ হয় তাহা আকারে অত্যন্ত ছোট। মাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া চাষ আবাদ করা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমিতেই ভাল চলে। কিন্তু জমি ছোট হইলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষের দরকার। ভারতে এখন এই জিনিষটীর অত্যন্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক আবাদ সম্বন্ধে অনেক স্থানে পরীক্ষা-কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। গবেষণার আর প্রয়োজন নাই। দরকার এখন এই নিয়মে চাষ আবাদ সুরু করা। এই ভাবে চাষ করিলে ভারতে দ্বিগুণ গম উৎপন্ন হইবে। গমের ক্ষেতের আয়তন-বৃদ্ধির উপরেই এদেশের আর্থিক সম্পদের বনিয়াদ নিহিত রহিয়াছে। ভারতের অর্দ্ধেক জমি এইরূপে গমের ক্ষেতে পরিণত হইলে ভারত দুনিয়ার একটী বড় রুটির ভাণ্ডারে পরিণত হইবে। গম রপ্তানির মরা গাঙ্গে আবার বান ডাকিবে। ভারত অক্লেশে ২৫ লাখ টন গম রপ্তানি করিয়া ম্যানিটবার সমকক্ষ হইয়া পড়িবে।

চিনি আগে ভারত হইতে রপ্তানি হইত, এখন কিন্তু এই চিজ আমদানি জিনিষের তালিকায় বেশ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। গম-রপ্তানির বাণিজ্য মরণোন্মুখ; চাউল রপ্তানির পরিমাণও কমিয়াছে। দুনিয়ার বাজারে ভারতীয় চাউলের অনেক শত্রু আসিয়া জুটিয়াছে। প্রাচ্যে শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীন এবং ইয়োরোপে স্পেন ও ইটালি ভারতের প্রবল প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি ফরাসী ইন্দোচীন এবং শ্যামের চাউল ভারতীয় বাজারেই ব্রহ্মার চাউলকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিতেছে। ১৯১৩-১৪ সনে ব্রহ্মা হইতে ২,৪২০,০০০ টন চাউল রপ্তানি হয়, ১৯২৪-২৬ সনে ২,৫৪৯,০০০ টন; কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে মাত্র ২,১৪২,০০০ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯২৭-২৮ সনে ৯২ লক্ষ টাকার ৬৮,৯৫৪ টন চাউল আমদানি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে চাউল মোটেই আমদানি হয় নাই বলিলে চলে। ভারতীয় চাউল বিদেশের বাজারে বাছাই না করার দোষেও অনেক সময় উচিত মূল্যে বঞ্চিত হইতে হয়। ভারতে অজন্মা দেখা দিলে ব্রহ্মা হইতে চাউল আনয়ন করা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ব্রহ্মার চাউলের ব্যবসা যদি দুর্ভিক্ষাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কি ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৯২৭-২৮ সনে ভারত হইতে মাত্র ৩০০,০০০ টন গম রপ্তানি হইয়াছে, অথচ ১৯২৪-২৫ সনে রপ্তানি হইয়াছিল ১,১১২,০০০ টন এবং ১৯১৩-১৪ সনে ১,২০২,০০০ টন। আরও দুঃখের বিষয় গত বৎসর ভারতকে সুদূর ক্যানাডা হইতেও গম আমদানি করিতে হইয়াছে।

পল্লী অর্থনীতি ও স্বায়ত্তশাসন

বিগত শাসন-সংস্কারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কায়েম হইয়াছে। ভারতের জনসাধারণকে দায়িত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট নাগরিক ভাবে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে এই নয়া সোসাবিধা বেশ কার্য্যকরই হইবে। শুধু লেখা পড়া জানা লোকের

রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেই চলিবে না। ভারতের আপামর জনসাধারণের পক্ষে এই শিক্ষা লাভের দরকার। পঞ্চায়েৎ, তিলেজ ইউনিয়ন এবং লোকাল বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভারতের নরনারীর পক্ষে রাজনৈতিক-জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ মিলিবে।

কাজতো আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু লাভ কি কিছু হইয়াছে? পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী কর্ম্মচারিগণ চালাইতেন। এজন্য তাহাদের বেতন কিছু লাগিত না। কিন্তু এখন বেসরকারী মানুষ এই সমস্ত কাজে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের পারিশ্রমিক বাবদ অতিরিক্ত খরচ পত্র হইতেছে। প্রথমতঃ, এই সমস্ত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নূতন কার্য্যে যোগদানের সময় বহুত উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া আসিয়াছিলেন, কত নয়া নয়া মোলাবিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদের সোনার স্বপন-সৌধ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট তো আবেদন করার উপায় নাই, কারণ প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের রাজকোষেই টানাটানি। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিয়া ফললাভ হয় নাই। দেশের লোকের আর্থিক উন্নতি না হইলে এ সমস্ত কাজ কিছুই হইবে না।

ভারতবর্ষে এখনও পাড়াগাঁয়ের সংখ্যা বেশী। কিন্তু এই সমস্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির দোষ এই যে, এইগুলি সহরের উন্নতির জন্যই যা কিছু করিয়া থাকে, পাড়াগাঁয়ের জন্য সেরূপ মাথা ঘামায় না। অথচ পাড়াগাঁয়ের উন্নতিবিধান অতি অল্প খরচে হইতে পারে। আসল কথা হইতেছে এই যে, এই সমস্ত পল্লীঅঞ্চলের সম্পদ না বাড়াইতে পারিলে পাড়াগাঁয়ের প্রতিষ্ঠানগুলি কোন কাজই করিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির এদিকে মনোনিবেশ আবশ্যক। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের লাভও যথেষ্ট। লোকের অবস্থার উন্নতি হইলে তাহারা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনানুষ্ঠানগুলিতে রীতিমত কর যোগাইতে পারিবে এবং গভর্ণমেণ্টকেও অতিরিক্ত কর যোগাইতে সমর্থ হইবে।

৫০০,০০০ প্রাইমারী স্কুল

কিন্তু লোকের অবস্থার উন্নতিবিধান করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ততঃ অক্ষর পরিচয়টা দরকার। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে অজ্ঞান-তিমিরের কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইলে চাই অবিলম্বে ৫০০,০০০ প্রাথমিক স্কুল। প্রাপ্তবয়স্কদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার দরকার। এজন্য সরকারী কৃষি বিভাগের চেষ্টা দরকার। কৃষি বিভাগটি অন্য কোন বিভাগ হইতে খাটো নয়। অন্যান্য বিভাগের সহিত এই বিভাগের সম্বন্ধ প্রতি পদেই প্রয়োজনীয়। দেখিতে গেলে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ও কৃষি এই তিনটী বিভাগ একই সূত্রে গ্রথিত মণির মত। বর্ত্তমানে সরকারী বেসরকারী সমস্ত প্রচেষ্টাই যে বিফল হইয়া যাইতেছে তাহার কারণ সবদিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা হইতেছে না। বিংশ শতাব্দীর উপযোগী শাসন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কখনই দশম শতাব্দীর উপযুক্ত অর্থ-নৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তিয়া থাকিতে পারে না।

রাস্তা-ঘাটের অবস্থা ভাল করা চাই

অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইলে ভারতের জাতীয় সম্পদ্ এবং সঞ্চিত অর্থের মোটা অংশ রাস্তাঘাটের উন্নতি-সাধনের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। এজন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় গভর্ণমেণ্টকে দেশের রাজস্ব জামিন রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে রেলপথ একরূপ আছে, এবং বড় বড় বন্দর বা সহরে যাওয়ার জন্য কতকগুলি পাকা এবং সেতু-বিশিষ্ট বড় বড় সড়ক আছে বটে, কিন্তু সুদূর পল্লীঅঞ্চলে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত রাস্তা বা সড়ক আছে সেগুলির সংখ্যা যেমন অল্প অবস্থাও তেমনি খারাপ। ভাল ভাল সড়কের দ্বারা ভারতবর্ষের পাড়াগাঁগুলির সহিত বড় বড় সহর এবং বন্দরের যোগাযোগ সাধন করিতে না পারিলে পাড়াগেঁয়ে মানুষ ফসল বিক্রয় করিয়া তেমন লাভবান হইতে পারিবে না।

ভাল রাস্তা-সড়কের সহিত উন্নত জীবন-যাত্রার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

জীবন-যাত্রার প্রণালী উচ্চ করিতে হইলে শিক্ষার যেমন দরকার ভাল রাস্তা-সড়কেরও তেমনি দরকার। কৃষক-গণের জমির উৎপাদনও যেমন বাড়াইতে হইবে সঙ্গে সঙ্গে মাল চালান দেওয়ারও উপযুক্ত রূপ ব্যবস্থা থাকার দরকার। রাস্তা ঘাট ভাল থাকিলে কৃষকগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মাল বিক্রয় করিবার সুবিধা পাইতে পারে। ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা থাকে। কৃষকগণ অবস্থা বুঝিয়া এই সুযোগ লইতে পারিলে তাহাদের দু' পয়সা লাভ হইবার কথা। এজন্য বড় বড় বাজারেই যাহাতে মাল চালান দেওয়া যাইতে পারে এইরূপ ভাল রাস্তা থাকার দরকার। আবার রাস্তা খারাপ থাকিলে গাড়ীর ভাড়া ইত্যাদি বেশী লাগিয়া যায়। এই সমস্ত অতিরিক্ত খরচের ফলভোগও কৃষককে করিতে হয়।

বর্ত্তমানে ভারতে ৩০,০০০ মাইল রেলপথ আছে, কিন্তু সড়ক সেই স্থানে মাত্র ৫১,০০০ মাইল। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে, রাস্তা বা সড়ক আরও বাড়াইবার প্রয়োজন। মোটর গাড়ীর প্রাদুর্ভাব হইতে থাকিলে রাস্তা এবং সড়ক বাড়িবে বলিয়া মনে হয়।

সড়কের প্রয়োজন কেন ?

ভারতের মঙ্গলের জন্য সড়ক বাড়াবার একান্ত প্রয়োজন। ভাল সড়কের সংখ্যা বাড়িলে (১) কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার সুবিধা হইবে। (২) মোটর চলাচল বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লীঅঞ্চলের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবে। (৩) রাস্তা এবং সড়ক রেলপথ বিস্তারের সহায়তা করিবে। সড়ক-সমস্যা এ জাতির পক্ষে এতই গুরুতর যে, মাত্র স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান বা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার সমাধান সম্ভবপর নয়; আর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তহবিলের এমন জোর নাই যে তদ্দ্বারা এই অভাব দূর হইতে পারে। সেজন্য এখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এই দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক।

সড়ক নির্ম্মাণের অর্থের সংস্থানের জন্য "রোড কমিটি" মোটর স্পিরিটের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে আমদানির হিসাব হইতে দেখা যায় যে, এইরূপে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা উঠিতে পারে। কিন্তু শুধু এই টাকায় ভারতের সড়ক-সমস্যা বিদূরিত হইতে পারে না। তবে কমিটির প্রস্তাব মাত্র প্রাথমিক উপায়-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

বিলাতে সড়ক নির্ম্মাণে ৬ কোটি পাউণ্ড ব্যয়

ভারতের পক্ষে সড়কের খাতে কি পরিমাণ ব্যয় করা দরকার তাহা বিলাতের খরচ দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। গত সনে বিলাতে এই জন্য ৬ কোটি পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। সরকারী রাজস্ব হইতেই মোটা অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯২০-২১ সনে সরকারী তহবিল হইতে সড়ক নির্ম্মাণের জন্য ৩৮,৭৪৯,০৭৪ পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছিল এবং ১৯২৫-২৬ সনে ব্যয় করা হয় ৪৭,৬৩,৯৪৫ পাউণ্ড। বিলাতে মোটর গাড়ীর মালিকদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। ১৯২৭-২৮ সনে মোটরওয়ালাদের প্রদত্ত করের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০,৭০০,০০০ পাউণ্ড। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিলাতের সড়ক নির্ম্মাণ খরচের দুই-তৃতীয়াংশ দেশবাসীর প্রদত্ত কর হইতেই সঙ্কুলান করা হইয়াছে। বিলাতের ভাল ভাল সড়ক বিলাতের আর্থিক সম্পদের জন্যই নির্ম্মিত হইতে পারিতেছে। ভারতে কিন্তু ব্যাপার একেবারে উল্টা। এদেশে আর্থিক সম্পদ আসিবে ভাল সড়কের ফলে।

১৯২৭-২৮ সনের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, এই সনে মোটর চলাচলের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু এইরূপ হারে চলাচল বাড়িয়া চলিবে কি না চিন্তার বিষয়। এখনও অনেক মোটর চলাচলের দরকার। রেলপথ যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে দেশের চলাচলের পূর্ণ সুবিধা হইতে অনেক ঘুস কাটিয়া যাইবে। সুতরাং মোটরের চলাচল খুব বাড়াইবার দরকার

এবং এই জন্য সড়কও অনেক তৈয়ী করিতে হইবে। দেশে এইরূপ সড়ক যত নির্ম্মিত হইবে দেশের সমৃদ্ধিও তত বাড়িবে।

ভারতীয় চিনি শিল্প

শিল্প কমিশনের মতে, ভারতের চিনি-শিল্প আধুনিক কায়দায় চালাইতে হইলে কারখানা নির্ম্মাণের জন্যই ৩০ কোটী টাকা খরচ করার দরকার। ১৯২০ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ৭৫ কোটী টাকার বিদেশী চিনি ক্রয় করিয়াছে। এ জন্য সরকারকে দোষ দেওয়া যায় না। সরকার টারিফ শুল্ক বসাইতে কম করেন নাই। টারিফ দ্বারা যা হইবার দরকার তা করা হইয়াছে। এখন চাই এই শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজির সংস্থান।

দেশের কৃষককুল যে উন্নত যন্ত্রপাতির মর্ম্ম বুঝিতে পারে না তাহা নয়, কিন্তু এই সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনিবার টাকা কোথায় পায়? ভাল দেখিয়া বীজ বুনিলে শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ বেশী ফল পাওয়া যাইতে পারে। ভাল আকের চাষ করিতে পারিলে আরও বেশী উৎপন্ন হইতে পারে।

ভারতবর্ষে উপস্থিত ২৫০০০০০ টন গুড় উৎপন্ন হইতেছে। ১৪০ টাকা টন ধরিলে এই গুড়ের দাম ৩৫০০০০০০ টাকা দাঁড়ায়। গুড় প্রস্তুত না করিয়া যদি চিনি প্রস্তুত করা হইত তাহা হইলে এই ২০ লক্ষ একর জমিতে ২,২৫০,০০০ টন চিনি এবং ৮২০,০০০ টন ঝোলা গুড় উৎপন্ন হইত। ১ টন চিনির দাম ৩০০ টাকা ধরিলে মোট চিনির দাম দাঁড়াইত ৬৭,৫০,০০,০০০ টাকা; ১ টন ঝোলা গুড়ের দাম ২৮ টাকা হইলে মোট ঝোলা গুড়ের দাম হইত ২,২০,৬০,০০০ টাকা। উভয়ের মূল্য একত্রে হইত ৬৯,৭০,৬০,০০০ টাকা, অর্থাৎ গুড়ের দামের চেয়ে ৩৪·৮ কোটী টাকা বেশী। দুনিয়ার অন্য কোন দেশ হইলে এই আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিত না। ভারতবর্ষে এখন মাত্র ৪০টী চিনির কুঠি আছে এবং এই সমস্ত কুঠিতে প্রতি বৎসর ১০০,০০০ টনের বেশী চিনি উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে ভারতে কি সন ৮০০,০০০ টনেরও বেশী বিদেশী চিনি আমদানি হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে এখনও অনেক চিনির কারখানার প্রয়োজন আছে।

অগ্রগামী জাভা

এই সম্পর্কে জাভা দ্বীপের চিনি-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। জাভা দ্বীপে ৪৫০,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় এবং প্রতি সন ২,৩০০,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতে সেই স্থানে ২৫ লক্ষ একর জমিতে চিনির আবাদ করিলেও কি দেশের অভাব দূর হইতে পারে না? তবে এক পক্ষে জাভার একটী সুবিধা আছে, চিনির কলের আশেপাশেই বিস্তর আকের ক্ষেত। কিন্তু প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্য লইয়াই জাভার চিনি শিল্প এতদূর উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে।

ভারতের চিনি-শিল্পের নিজের দোষেই উহার গলা-লাভ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সরকারী টারিফের ক্ষমতা নাই ইহার গতি রোধ করে। তবে উপযুক্ত পরিমাণে পুঁজি ঢালিতে পারিলে এবং বিশেষ বিচক্ষণতা ও উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। ভারতীয় বাণিজ্য নৌবহর গঠনরূপ অনিশ্চিত প্রচেষ্টায় পুঁজি না ঢালিয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্পে পুঁজি সরবরাহ করা অধিকতর আবশ্যক এবং ইহাতে লাভের সম্ভাবনাও অধিক।

সেচকার্য্যের অত্যাবশ্যকতা

ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে ভারতীয় কিম্ব্যাল কমিশন হদিস বাতলাইয়াছেন যে, শিল্পকার্য্যের প্রসার ঘটিলে চাষের ক্ষেত হইতে এ ভিড় কমিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে কৃষকের সম্পদ বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। কিন্তু হাজার শিল্প কার্য্যের প্রসার ঘটুক অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের কবল হইতে চাষাদের বাঁচাইবার কোনই উপায় নাই। সেচকার্য্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য পরিচালনই দুর্ভিক্ষ দমনের একমাত্র উপায়। শিল্পকার্য্যের প্রসার মাত্র গৌণ উপায় স্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

কৃষি কমিশনে প্রকাশ, ১৯২৫-২৬ সনে শস্যশালী জমির ১১·৮% গবর্ণমেণ্টের পয়ঃপ্রণালীদ্বারা সেচিত হইয়াছে। এই সমস্ত সেচিত ভূভাগে উৎপন্ন ফসলের মূল্য সেচকার্য্যের মোট ব্যয়ের প্রায় দেড় গুণ দাঁড়াইয়াছিল। কোন কোন খালে হয়তো সেরূপ সুবিধা নাও হইতে পারে; তবু এইরূপ খালের যথেষ্ট প্রয়োজন। ১৯৩৩-৩৪ সনে লাটলেজের খাল সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে চির-দিনের জন্য সেচ দেওয়া চলিবে এবং আরও ৩০ লক্ষ একর জমির অবস্থা সংশোধিত হইবে। পাঞ্জাবের নদীগুলির জল ধরিয়া রাখার ব্যবস্থাও নাকি করা হইবে। কমিশনের মতে, সম্পূর্ণ বারিপাতের মাত্র ৬% এই সমস্ত খাল দ্বারা ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার ৬ গুণ জল নদীগুলি অকূল সমুদ্রগর্ভে লইয়া যাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। মাদ্রাজে ১০·৪ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাবেরী-মেট্টুর যোজনাবিদ্যা কার্য্যে পরিণত হইলে এই সমস্ত জমির সুবিধা তো হইবেই, উপরন্তু এক-ফসলে ২২১,০০০ একর জমি এবং দো-ফসলে ৯০,০০০ একর জমিতেও সেচ দেওয়ার সুবিধা হইবে। আরো অনেক প্রদেশে পয়ঃপ্রণালী খননের জন্য সরকারী যোজনাবিদ্যা করা হইয়াছে। বাংলা দেশেও এই বস্তুর যথেষ্ট দরকার আছে। বাংলার নদীগুলির বর্ত্তমান অবস্থানুসারে পয়ঃ-প্রণালী খননের হয়তো আরও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য বাংলা দেশে রীতিমত সরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠনের দরকার। তবে এখন যদি এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না শোনা যায় তবে বুঝিতে হইবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের তহবিলের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়।

কৃষক ও মিলের মজুর

অনেকে ভাবিয়া থাকেন সংরক্ষণ-শুল্ক বসাইলেই ভারতের শিল্পগুলির অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপারটী তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আরও অনেক কারণে ভারতে শিল্প-প্রচেষ্টা আশানুসারে ফলবতী হইতে পারিতেছে না।

গোটা ১৯২৭-২৮ সন এবং ১৯২৮ সনের প্রথম ছয় মাস ধরিয়া বোম্বাই সহরে যে কুলিধ্রিষ্ট ঘটিল, তাহার জন্য বোম্বাই মিলগুলির উৎপাদন-শক্তি যথেষ্ট কমিয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলের মিলের কর্ত্তারা মনে ভাবেন যে, এই ফাঁকে বিদেশী কলওয়ালা ভারতে যথেষ্ট মাল চালাইয়া ফেলিবে। এই আশঙ্কায় তাঁহারা সংরক্ষণ শুল্কের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রকৃত মীমাংসা মালিক এবং শ্রমিক এতদুভয়ের সহযোগিতার উপরেই নির্ভর করে। মাল-উৎপাদনের খরচ কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা শুধু সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিলে দেশ-বাসীরই অসুবিধা হইবে; কারণ তাহাদিগকে চড়া দরে মাল কিনিতে হইবে।

এই সম্পর্কে মজুরদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। শিল্পের অগ্রগতির একটী বিশেষ স্তর আছে। এই বিশেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিলে সমস্ত মজুরের, বিশেষ করিয়া আনাড়ি মজুরের বেতন বৃদ্ধি করা চলে না। অথচ জীবন-যাত্রার প্রণালী উচ্চ করিবার জন্য মজুরের বেতনবৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মজুরকে তাহার কার্য্যদক্ষতা বাড়াইয়া বেশী মজুরি আদায় করিতে হয়। ভারতের শিল্পগুলির অবস্থা ঠিক এই স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময়ে দুনিয়ার প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে ভারতীয় শিল্পগুলির পক্ষে মালিক এবং মজুরের পরস্পর সহযোগিতা আবশ্যক। মালিকের পক্ষে, উৎপাদনের খরচ কমানো দরকার। অন্য পক্ষে, মজুর তাহার কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইয়া বেশী পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিবে।

ভারতের কারখানাগুলির যন্ত্রপাতি নিতান্ত সেকেলে ধরণের। শ্রমলাঘবকারী আধুনিক যন্ত্রপাতি না বসাইলে ভারতীয় শিল্পগুলির দুর্দ্দশা দূর হইবে না। আধুনিক যন্ত্রপাতি কায়েম করিতে গেলে মজুরের সংখ্যা কমিতে বাধ্য। কিন্তু যেগুলি থাকিবে তাহারা শিক্ষিত এবং নিপুণ হওয়া চাই। কাজে কাজেই ইহারা বেশী বেতন পাইবে। ভারতীয় কারখানাগুলি এই পরিবর্ত্তন ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না।

কিন্তু আর একদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। ইহা

সত্য যে, উৎপাদনের খরচ কমানো আবশ্যক এবং মজুরদের বেতন বাড়ানোও আবশ্যক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদেরও অবস্থার উন্নতি সাধনের দরকার। ভারতীয় ক্রেতাদের অধিকাংশই কৃষক। সুতরাং কৃষকদের ফসল উৎপাদনের হার বাড়াইতে হইবে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে, তাহারা শিল্প দ্রব্য বেশী বেশী পরিমাণে কিনিতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে কারখানার কাজ বাড়িয়া যাইবে এবং আরও নূতন নূতন কারখানা কায়েম করার প্রয়োজন হইবে। এবং যে সমস্ত কুলি বেকার হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের কাজ জুটিয়া যাওয়ায় বেকার-সমস্যা দূরীভূত হইবে।

সুতরাং যে প্রবল শিল্প-সমস্যা ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে তাহার প্রকৃত সমাধানের জন্য দুইটি উপায় এক সঙ্গেই অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, কারখানার খরচ কমাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকের আয় বাড়াইতে হইবে। যুদ্ধের পরে জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত চড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আয় না বাড়িলে কৃষকেরা কোথা হইতে জিনিষপত্র খরিদ করিবে?

বিলাতী পুঁজি ভারতের শত্রু নহে

ভারতবর্ষে কমিটি ও কমিশন যথেষ্ট বসিয়াছে, তাহারা হদিসও বাতলাইয়াছে বিস্তর। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, এই সমস্ত হদিস অনুযায়ী কাজ হইয়াছে কমই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কি দেশের দুর্ভাগ্য?

অনেকে বলেন, যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ভারতভূমিতে সোনা ফলান যায়। এর জন্য যে পুঁজির দরকার, তার জন্য বিদেশীর নিকট হাত পাতিবার দরকার নাই, ভারত একাই সমস্ত সরবরাহ করিতে পারে। ভারতের লোকের ধনদৌলত নিতান্ত কম নাই, কিন্তু ভারতবাসীর টাকা খাটাইবার সৎ সাহস নাই। তাহারা অন্যের টাকা বাহির করিতে বড় একটা চায় না। ভারতবর্ষের মধ্যেই পুঁজির যোগাড় হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে, সরকারী ঋণের পরিমাণ-বৃদ্ধি। এই সরকারী ঋণ ১৯৫ কোটী টাকা হইতে ৩৫৮ কোটী টাকায় পৌঁছিয়াছে। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১৯১৩-১৪ সন হইতে ১৯২৩-২৪ সনের মধ্যে ৮০ কোটী হইতে ২৫৪ কোটী টাকায় পৌঁছিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই সময়ের ভিতর মোট ৩৮৭ কোটী টাকা বাড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ১৯১৩ সন হইতে আলোচ্য সময় পর্য্যন্ত ভারতে মোট ৪৮২ কোটী টাকার সোনা রূপা আমদানি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবাসী এখনও অনেক টাকা না খাটাইয়া জমাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবাসীর ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ে ব্যয় করার ধাত শীঘ্র বদলাইবার কোন আশা নাই, পুঁজির এই অপচয় শীঘ্র এদেশে নিবারিত হইবার নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট ঋণ এবং কোম্পানীর মূলধন বাবদ ভারতে গড়ে বৎসরে মাত্র ৩৮ কোটী টাকার সংস্থান হইয়াছে। এই সমস্ত পুঁজি রেলপথ, জলপ্রণালী, বিমান, সড়ক, পোর্ট ট্রাষ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য নানা প্রকার ব্যবসায়ী কোম্পানীতে নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত একটা প্রকাণ্ড দেশের পক্ষে এই পুঁজি নিতান্ত সামান্য বলিতে হইবে। তবে উপায়? বিলাতী পুঁজি ছাড়া উপায় নাই। বিলাতী পুঁজিতে ভীতি যাইবার ভয় নাই। ভারতের এই অতি বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বিলাতী উভয় পুঁজিরই যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। ইহাতে কাহারও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। বিলাতী পুঁজি সংক্রান্ত বিরুদ্ধ মনোভাব কুসংস্কার-প্রসূত মাত্র। দেশী এবং বিলাতী উভয় প্রকার পুঁজির সমন্বয় ও সহযোগিতার উপরেই ভারতের প্রকৃত এবং একমাত্র আর্থিক মঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক-বৈচিত্র্য

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

[ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহিত আমার ব্যাঙ্ক-বিষয়ক কথোপকথনের সারমর্ম্ম।—শ্রীমিহেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রঃ—আপনি আর একদিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতেই কি সে দেশের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়েছে ?

উঃ—না, সেদিন শুধু "ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কিং সিষ্টেমের" কথাই বিশেষ করে বলেছি। এই সিষ্টেমের অন্তর্ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে কমার্শিয়াল অর্থাৎ বাণিজ্য-পোষক ব্যাঙ্ক বলা যেতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যপোষক ব্যাঙ্ক ছাড়া আরও যে সব ব্যাঙ্ক রয়েছে, তাদের কথা কিছুই বলা হয়নি। আর ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেমের অন্তর্ভুক্ত ন্যাশানাল ব্যাঙ্কগুলিই যে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক তাও নয়।

প্রঃ—এ ছাড়া আর যে সব কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক রয়েছে সেগুলি কি রকম ব্যাঙ্ক ?

উঃ—আর একদিন প্রসঙ্গক্রমে যে সব "ষ্টেট" অর্থাৎ প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কথা বলেছি সেগুলিও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। এ ছাড়া আরও এক রকম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক আছে, তাদের বলা হয় "প্রাইভেট ব্যাঙ্ক"।

প্রঃ—এ সব ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব কি ?

উঃ—এরা কেউ যৌথ প্রতিষ্ঠান নয়। ব্যক্তিগত অর্থের উপর কিংবা দু'চার জন অংশীদার জুটিয়ে এসব ব্যাঙ্কের কারবার চলে।

প্রঃ—আর কোন তফাৎ নেই কি ?

উঃ—না, তবে আগে আরও একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল এই যে, এসব ব্যাঙ্কের জন্য কোন ষ্টেটেই বিশেষ কোন আইন কানুন ছিল না। ইদানীং এদের সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কোন ষ্টেটে এমন আইন করা হয়েছে যে, "প্রাইভেট" ব্যাঙ্কগুলি "ব্যাঙ্ক" নাম ব্যবহার করতে পারবে না। দু'একটা ষ্টেটে এদের ন্যূনতম মূলধন রাখবার জন্যও ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া এমনও ষ্টেট আছে যেখানে এদের ব্যাঙ্কিং কারবার চালাতেই দেওয়া হয় না।

প্রঃ—যে সব প্রাইভেট ব্যাঙ্ক রয়েছে তারা কি কাজ করে ?

উঃ—এদের কারবারের মধ্যে দুটো ব্যাপার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমতঃ, এরা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় সহর-গুলিতে ব্যাঙ্ক দালালের কাজ করে, তারপর মফঃস্বলে যে সব ছোট ছোট জায়গা একটা ষ্টেট কিংবা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল নয়, সে সব জায়গায় এরা খাঁটি ব্যাঙ্কের কাজও চালিয়ে থাকে।

প্রঃ—বড় বড় সহরে এরা যে ব্যাঙ্ক দালালি করে, সেজন্য এদের কি কাজ করতে হয় ?

উঃ—যেমন ধর, সিকিউরিটি কেনা বেচা,—কি বিদেশী কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘের জন্য আমেরিকা থেকে কর্জ্জ নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া, এই ধরণের কাজ করতে হয়।

প্রঃ—আর কি কাজ এরা করে থাকে ?

উঃ—ইদানীং কোন কোন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক দেশের শিল্প-বিস্তারের দিকেও মন দিয়েছে। তার জন্য এরা

রেল বা অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ নানা রকম বাজার চল স্বীকারপত্রও কিনতে আরম্ভ করেছে। এদের সাহায্য পেয়েই নানারকম শিল্প কারখানা এখন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে।

প্রঃ—এসব ব্যাঙ্কের কাছে বিল ভাঙ্গানো চলে না?

উঃ—না, তা'ছাড়া এরা আমানতেও টাকা গচ্ছিত রাখতে চায় না। সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে এদের এ বিষয়েও একটা পার্থক্য রয়েছে।

প্রঃ—বুঝেছি, আচ্ছা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া আর যে সব ব্যাঙ্ক রয়েছে বলছিলেন, এবার তাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—বলছি, কিন্তু এদের মধ্যেও নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ রয়েছে যে।—যেমন ধর,"সেভিংস্ ব্যাঙ্ক" "ট্রাষ্ট্ কোম্পানী" "ইনভেষ্টমেণ্ট হাউস" "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক",—আরও কত কি। কাজেই বুঝতে পারছ যে এদের সম্বন্ধেও অনেক কথা জানবার আছে।

প্রঃ—তবে বোধ হয় আলাদা করেই এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা ভাল, নয় কি?

উঃ—হাঁ, তাই করছি, শোন। যুক্তরাষ্ট্রের "সেভিংস ব্যাঙ্ক' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই এদের মধ্যে দুটো মূল শ্রেণীবিভাগ চোখে পড়বে। এদের মধ্যে কতকগুলি ব্যাঙ্ক সাধারণ যৌথপ্রতিষ্ঠানের মতই অংশ মূলধনের উপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের বলা হয় "ষ্টক কোম্পানী"। এছাড়া আরও কতকগুলি সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে যাদের কোন মূলধন নেই। এদের লাভ যা হয়, তা আমানতকারীরাই পেয়ে থাকে। এই ব্যাঙ্কগুলিকে বলা হয় "মিউচুয়াল কোম্পানী"। ষ্টক কোম্পানীর অংশীদারবর্গ রীতিমত "ডিভিডেণ্ড" পেয়ে থাকে।

প্রঃ—এসব ব্যাঙ্কের লেনদেন সম্বন্ধে কিছু জানবার আছে কি?

উঃ—যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। সেখানকার কুলি-মজুরদের টাকাই বিশেষ করে এসব ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত থাকে।

প্রঃ—এদের কাছে যে টাকা গচ্ছিত থাকে তা এরা খাটায় কি করে?

উঃ—বন্ধকী দলিল কিংবা অন্য কোনরকম ভাল সিকিউরিটি জামিন পেলে এরা টাকা ধার দেয়।

প্রঃ—আচ্ছা, টাকা গচ্ছিত রাখবার বিষয়ে সেভিংস ব্যাঙ্কগুলি কোন রকম পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেয় না কি?

উঃ—হাঁ, প্রায় সব ব্যাঙ্কেই, বিশেষ করে মিউচুয়াল কোম্পানীগুলিতে এমনি ব্যবস্থা আছে যে, ১ হাজার কি ৫ হাজার ডলার, এমনি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত টাকা গচ্ছিত নেওয়া হবে না।

প্রঃ—এক ডলারের মূল্য কত?

উঃ—সে প্রায় পৌনে তিন টাকা হবে।

প্রঃ—কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কি সেভিংস ব্যাঙ্কের জন্য পৃথক হিসেব খুলতে পারে না?

উঃ—কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি এভাবে টাকা গচ্ছিত রাখতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে কোন আইন করা হয় নি। কাজেই ব্যাপারটা একটু গোলমালের মধ্যেই ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আইনে এ বিষয়টার একটা মীমাংসা করা হয়েছে। তাতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলিও সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসেব খুলে টাকা আমানত নিতে পারবে, তবে এ রকম আমানতের জন্য তাদের শতকরা তিন ডলার হিসেবে রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা মজুদ রাখা চাই।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর "পোষ্টাল সেভিংস" এর কথা এখনও বলা হয় নি।

প্রঃ—তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—এ সম্বন্ধে পরিচালনের ভার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতেই রেখেছে। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে।

প্রঃ—পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে কারা?

উঃ—আমেরিকায় যে সব বিদেশী লোক অবস্থান করছে তারাই এতে বেশী টাকা রাখে।

প্রঃ—এত গেল সেভিংস ব্যাঙ্কের ব্যাপার।—তারপর "ট্রাষ্ট" কোম্পানীগুলির কাজ চলছে কি করে?

উঃ—গোড়ায় এরা ব্যাঙ্ক খাঁটি "ট্রাষ্টি"র কাজই করত অর্থাৎ কারও সম্পত্তির তদ্বির করা কি কোন নাবালকের সম্পত্তি দেখা শোনা করা এই ধরণের কাজেই এরা মন দিত। কিন্তু আজকাল এরা ব্যাঙ্কিং-এর কাজেও হাত দিয়েছে। এখন এরা সেভিংস ব্যাঙ্কের মত আমানতে টাকা গচ্ছিত রাখে,—আর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মত এদের কাছে বিল ভাঙ্গানো না গেলেও এরা বিল কিনে থাকে।

প্রঃ—এদের টাকা ধার দেওয়ার মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—কোন কোন বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে বৈ কি! এরা স্থাবর সম্পত্তি জামিন রেখে টাকা কর্জ্জ দেয়, এমন কি দেনার বা বণ্ডের উপরও এরা ধার দিয়ে থাকে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু ঠিক এই ধরণের কর্জ্জ দেয় না।

প্রঃ—কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আগে যা বলেছেন তা ছাড়া আর কিছু জানবার আছে কি?

উঃ—পূর্ব্বেই বলেছি যে ন্যাশনাল এবং ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলি তাদের কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে একই শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্ক। তফাৎ এই যে, ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের এবং ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর একটা পার্থক্য রয়েছে এই যে, ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলি নোট বের করে না।

প্রঃ—কেন, তাদের কি নোট বের করবার ক্ষমতা নেই?

উঃ—আছে, তবে এদের নোট বের করতে হলেই শতকরা ১০ ভাগ হিসেবে ট্যাক্স দেবার নিয়ম। এত বেশী ট্যাক্স বসানোর ফলে এরা নোট বের করা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

প্রঃ—তা হ'লে যে কোন ব্যাঙ্ক তার খুসীমত ন্যাশনাল কিংবা ষ্টেট ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ আরম্ভ করতে পারে?

উঃ—তা পারে বটে, কিন্তু সে ঠিক কোনটা করবে তা কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—যেমন ধর, কোন ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে তার মূলধন অন্ততঃ ৫০ হাজার ডলার হওয়া চাই। কিন্তু ১০ হাজার ডলার মূলধন হ'লেই একটা ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এখন একটা ব্যাঙ্ক কোন শ্রেণীভুক্ত হ'তে চাইবে তা তার মূলধনের জোরের উপর নির্ভর করবে। আর শুধু মূলধনই নয়, রিজার্ভ ফণ্ড সম্বন্ধেও ষ্টেটব্যাঙ্কের একটু সুবিধা আছে। কোন কোন ষ্টেটে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ে কম রিজার্ভফণ্ড রেখেও ব্যাঙ্কের কারবার চলতে পারে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর 'বণ্ড হাউস' এবং "ইনভেষ্টমেণ্ট" ব্যাঙ্কের কথা বলছি, শোন। এরা যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ শিল্পের জন্য অর্থসংগ্রহ ক'রে তাদের সহায়তা করছে।

প্রঃ—কেমন ক'রে?

উঃ—কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের টাকার প্রয়োজন হ'লে কর্জ্জ-স্বীকারমূলক প্রতিজ্ঞাপত্র ছাড়তে আরম্ভ করে। এই সব প্রতিজ্ঞাপত্র বা বণ্ড বাজারে বিক্রী করবার ভার কোন না কোন বণ্ড হাউস নিয়ে থাকে। বণ্ড হাউসগুলি এ রকম বণ্ড বা সিকিউরিটি কিনে নেবার চুক্তি করবার আগেই তাদের এঞ্জিনীয়ার, একাউণ্টাণ্ট এটর্ণি সবাইকে দিয়ে প্রতিষ্ঠান-বিশেষের আর্থিক অবস্থা ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব খবর জেনে নেয়। এরা সবাই সম্মতি দিলে বণ্ড হাউস একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বণ্ড কিনে নেবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়,—উদ্দেশ্য বাজারে সেগুলি একটু বেশী দামে বিক্রী করা।

প্রঃ—তা হলে বণ্ড হাউসই সব বণ্ড কিনে রাখে?

উঃ—বলছি শোন, স্থায়িভাবে এ রকম বণ্ড কিনে রাখা

কোন বণ্ড হাউসের পক্ষেই সম্ভব নয়। এত টাকাও তার থাকা সম্ভব নয়, তা ছাড়া এ রকম দায়িত্বই বা সে নিতে যাবে কেন?

প্রঃ—তা হ'লে সে কি করে?

উঃ—চুক্তি করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কতকগুলি ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নেয় যে, তারা চুক্তি-মাফিক দামের সামান্য কিছু বেশী দিয়ে সমস্ত বণ্ডের একটা অংশ কিনে নিতে বাধ্য থাকবে। সত্যি কথাই যে এসব ব্যাঙ্কের বণ্ড কিনতে হয়, তা নয়। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত জনসাধারণই সব বণ্ড কিনে নেয়। তবু, যতক্ষণ না সব বণ্ড বিক্রী হচ্ছে, ততক্ষণ বণ্ড হাউস এ রকম করে তার দায়ের বিপত্তি একটু লাঘব করে রাখে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলি এ রকম অংশ পরিমাণ বণ্ড কেনবার দায় স্বীকার করে কেন?

উঃ—শুধু শুধু কি আর তারা এ রকম করতে চায়? কেবল এই দায়টুকু স্বীকার করবার জন্যই তারা প্রায় শতকরা ১ ডলার কমিশন পায়।

প্রঃ—"বণ্ড হাউসের" এতে কি লাভ থাকে?

উঃ—বণ্ড হাউস বিবিধ ব্যাঙ্ক, ট্রাষ্ট কোম্পানী এবং ইনভেষ্টমেণ্ট হাউসের সহায়তায় বাজারে বণ্ডগুলি বিক্রী করিয়ে নেয়। তার জন্য এদের কমপক্ষে শতকরা ১½ ডলার থেকে উর্দ্ধ সংখ্যায় ১০ ডলার পর্য্যন্ত কমিশন দেওয়া হয়। এই কমিশন দেবার পর ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের মধ্যে যে প্রভেদ থাকে তাই বণ্ড হাউসের লাভ, সে বড় কম নয়। তবে এ রকম বণ্ড বেচবার জন্য যথেষ্ট খরচও হ'য়ে থাকে। নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে, নানাস্থানে এজেণ্ট পাঠিয়ে এসব বণ্ড বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করতে হয়। বণ্ড ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা চাই ত!

প্রঃ—কিন্তু এদের চালে পড়ে বণ্ড ক্রেতাদের যাতে লোকসান না হয়, তার জন্য কোন আইন নেই কি?

উঃ—অনেককাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনই আইন করা হয় নি। তবে এ জন্য সব ক্ষেত্রেই যে বণ্ডক্রেতার লোকসানের ভয় আছে, তা নয়। বিশেষতঃ, রেল কোম্পানীগুলি এবং একাধিক প্রদেশ বিস্তৃত যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাদের বণ্ড বের করা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এমন সমস্ত কড়া বন্দোবস্ত রয়েছে, যাতে সবাই নির্ভয়ে তাদের বণ্ড কিনতে ভরসা পায়। এদের চাইতে ছোট যে সব ব্যবসা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে তাদের বণ্ড কেনবার মধ্যেই একটু আশঙ্কা থাকে। তার জন্যও কোন কোন ষ্টেটে বিশেষ কতকগুলি আইন করা হয়েছে, তাদের বলা হয় "ব্লু স্কাই ল"। এক রকম "ব্লু স্কাই" আইন আছে যাতে কোন প্রতিষ্ঠান বণ্ড বের করতে চাইলেই সাধারণের হিতের জন্য তার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এক বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করতে হয়। "পেনিসিলভেনিয়া" ষ্টেটে এমনও আইন আছে যাতে প্রতিষ্ঠান-বিশেষ এবং বণ্ড-বিক্রেতা উভয়েই গভর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ক বিভাগে উপস্থিত হয়ে সকল প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে। সেখান থেকে অনুমতি না পেলে বণ্ড বিক্রী করবার উপায় নেই।

প্রঃ—তবে আর বণ্ড বিক্রয় সম্বন্ধে আইন নেই বলছিলেন কেন?

উঃ—বলছিলাম এইজন্য যে, এ সম্বন্ধে সব ষ্টেটেই এক রকম ব্যবস্থা করা হয় নি। অনেক ষ্টেটে এখনও কোন রকম কড়াকড় আইন নেই বল্লেই চলে। তার ফলে সুবিধা-মত স্থানাস্তরিত করে বণ্ড বিক্রয় করা হয়ে থাকে। তারপর যে সব ষ্টেটে এ বিষয়ে আইন আছে তাও খুব অল্প দিন হল কায়েম করা হয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রেই এসব আইন খুব ব্যাপক ভাবে করা হয় নি।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এবার আর একরকম ব্যাঙ্কের কথা বলছি শোন, তার নাম "মরিস প্লান ব্যাঙ্ক"।

প্রঃ—এ রকম অদ্ভুত নাম এল কোত্থেকে?—এ সব ব্যাঙ্কের কাজই বা কি?

উঃ—বলছি। এ পর্য্যন্ত যে সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছ তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন রকমে দেশের ব্যবসা কিম্বা শিল্পের সহায়তা করছে। সেভিংস ব্যাঙ্কগুলিতে যে দরিদ্র গৃহস্থ বা মজুরদেরই টাকা গচ্ছিত থাকে সে কথাও বলেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সাধারণ লোক যুক্তরাষ্ট্রে কি করে কর্জ্জ পায় সে সম্বন্ধে এখনও কিছু বলি নি। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় এদের প্রয়োজনের ওপর তেমন নজর দেওয়া হয় নি। এরা চিরকাল সুদখোর মহাজনদের দয়ার উপরই নির্ভর করে এসেছে। এরা মহাজন যে সুদ আদায় করে তা ব্যাঙ্কের সুদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। আর তাও কি এরা অমনি কর্জ্জ পেত? আসবাবপত্র, গহনা, মাইনে, যা হোক একটা কিছু বাঁধা দেওয়া চাই, তবেই কেবল এদের কাছ থেকে ধার মেলে।

প্রঃ—কেন, এদের জন্য পৃথক কোন রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হয় নি?

উঃ—সম্প্রতি এদের জন্য কতকগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কোন কোন ধর্ম্ম-সঙ্ঘ বা সাধারণ হিত-সঙ্ঘ নিজ নিজ দেশবাসীদের বিনা সুদে বা সামান্য সুদ নিয়ে টাকা ধার দিচ্ছে। কোন কোন ফ্যাক্টরীতে মুনিবরা মজুরদের ধার দেবার জন্যই একটা পৃথক ফণ্ডে কিছু কিছু টাকা রেখে দেন। এ ছাড়া এখন মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সমিতিও গড়ে উঠছে। কোন কোন জায়গায় সমবায় ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এরা কেউই খুব শক্তিমান হ'য়ে উঠতে পারে নি,—আর এদের কাজের বহরও খুব বিস্তৃত নয়। সাধারণ গৃহস্থ বা মজুর সম্প্রদায়কে বন্ধক না নিয়ে সামান্য পরিমাণ টাকা ধার দেবার জন্য এ পর্য্যন্ত যত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে "অরিস প্ল্যান ব্যাঙ্ক" এর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রঃ—এ সব ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কি জানবার আছে সে সম্বন্ধে সব খুলে বলুন।

উঃ—১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলবার্ট জে অরিস নামে একজন বিচক্ষণ লোক ইয়োরোপের বিবিধ শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তার ওপর নির্ভর করে ও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বৈশিষ্ট্যের দিকে চোখ রেখে তিনিই প্রথম এ রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সে জন্য ব্যাঙ্কগুলির নামই হয়েছে "অরিস প্ল্যান ব্যাঙ্ক"। এই ব্যাঙ্কগুলি দেশের কি রকম হিতসাধন করছে তা এই থেকেই বুঝতে পারবে যে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেই এদের সংখ্যা দেড়শ' অতিক্রম করে গিয়েছিল। প্রতি বৎসরই এ ধরণের নূতন নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কগুলি কি ভাবে টাকা কর্জ্জ দেয়?

উঃ—অল্প বেতন যারা পায়, তারা যদি চরিত্রহীন না হয়, তা' হলে তাদের এসব ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ টাকা ধার নেয় তা অতি সামান্য এবং তার জন্য কোন বন্ধকও দাবী করা হয় না। বুঝতেই পাচ্ছ যে, বড় বড় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাছে এ রকম সর্ত্তে এবং এত সামান্য টাকার জন্য কর্জ্জ পাওয়া সম্ভব নয়। "অরিস প্ল্যান ব্যাঙ্ক" এসেই এদের বাঁচিয়েছে।

প্রঃ—কেন, "অরিস প্ল্যান ব্যাঙ্ক" কি এদের অমনি টাকা ধার দেয়?

উঃ—না, ঠিক তা নয়; তবে কর্জ্জ নেবার সময় ধারগ্রহণকারী যদি তার সমান অবস্থার দু'জন লোককে দিয়ে তার ধারখাতে দায় স্বীকার করিয়ে নিতে পারে, তা' হলেই যথেষ্ট। আরও একটু ব্যাপার আছে, তাও বিস্তারিত বলছি। ধারগ্রহণকারী যদি ৫০ ডলার ধার নেয় তবে কি সপ্তাহে তাকে ১ ডলার করে পরিশোধ করতে হয়। ৫০ ডলারের বেশী ধার নিলেও তাকে ঠিক এই হারে বরাবর কর্জ্জের টাকা শোধ দিতে হয়। ধারের টাকার ওপর শতকরা ৬ ডলার সুদ ধরা হয় এবং সুদটা ধার দেবার সময়ই আগাম কেটে নেওয়া হয়। ধার দেবার জন্য এসব ব্যাঙ্ক আমানতের টাকা গচ্ছিত

রাখে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ মরিসের চেষ্টায়ই নিউইয়র্কে "দি ইনডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করপোরেশন" নামক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের যাবতীয় "মরিস প্ল্যান ব্যাঙ্কে"র মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করা। স্থানীয় ভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে এই ব্যাঙ্কটীর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তারা প্রয়োজনমত এই ব্যাঙ্কের কাছে কেনা বিল ভাঙ্গিয়ে নিতে পারে।

প্রঃ—কিন্তু এই করপোরেশনেরই যদি টাকার প্রয়োজন হয়?

উঃ—তা' হলে আবার সেই স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির মারফতেই যন্ত্র বিক্রী করে এই করপোরেশন টাকা সংগ্রহ করে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর এই করপোরেশন আরও এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করেছে যাতে সাধারণের পক্ষে এখন লাইফ ইনশিওর অর্থাৎ জীবনবীমার প্রিমিয়াম দেওয়া অনায়াসসাধ্য হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—তবে ত দেখছি এই করপোরেশন এক সঙ্গে অনেক রকম ভাবে লোকের উপকার করছে।

উঃ—নিশ্চয়ই, আর ইদানীং এই "মরিস প্ল্যানে"র কেরামতিতে যে একটা ব্যাপার চলেছে তাতে আরও অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—কিছুদিন হ'ল একটা নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার নাম "মরিস প্ল্যান হোম করপোরেশন"। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ লোকের পক্ষে তার বসতবাটী কিনে নেওয়ার সহায়তা করা। এই করপোরেশনের কাছে প্রথম বন্ধক দিলে কোন বাড়ীর ধার্য্য মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ অবধি ধার দেওয়া হয়। তারপর নির্দ্দিষ্ট হারে সামান্য সুদ আর হকার হকার আসল টাকাটা শোধ করে দিলেই হ'ল। যাদের বেশী পুঁজি টাকা নেই তাদের পক্ষে ঘরবাড়ী কেনা, এ রকম ব্যবস্থা না থাকলে, সহজ হতে পারে কি?

প্রঃ—কিন্তু আসল টাকাটা পরিশোধ করবার আগেই যদি হাওলাতকারী মরে যায়, তা হলে ত বাড়ীটা করপোরেশনের হাতে গিয়েই পড়বে?

উঃ—না, তার জন্যও একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাওলাতকারীকে কর্জ্জ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দিয়ে বন্ধকী দেনার সমান টাকার একটা লাইফ ইনশিওর করিয়ে নেওয়া হয়। দেনা শোধবার আগেই যদি তার মৃত্যু হয় তবে ইনশিওরের টাকা থেকেই দেনার টাকা মিটিয়ে নেওয়া হয়। তাতে হাওলাতকারীর ওয়ারিশ দায়মুক্ত ভাবেই বাড়ীর স্বত্ব পেয়ে থাকে।

প্রঃ—এরকম সর্ত্তে ধার দেওয়া সম্বন্ধে কি কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেওয়া নেই?

উঃ—হাঁ, কোন একজন লোককে এর জন্য উর্দ্ধ সংখ্যায় ১০ হাজার ডলার অবধি ধার দেওয়া হয়, তার বেশী নয়। এই প্রসঙ্গে আরও দু' একটা কথা বলা দরকার মনে হচ্ছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যাঙ্কটী স্বল্প পরিমাণ কর্জ্জ দেবার জন্য একটা বিশেষ বিভাগ খুলেছে। এই বিভাগ খোলা হয়েছে অনেকটা "মরিস প্ল্যান" অনুসারেই। এই ব্যাঙ্কের আদর্শ মেনে যদি আর পাঁচটা ব্যাঙ্ক এমনি ভাবে বিনা বন্ধকে সাধারণ লোককে টাকা কর্জ্জ দেয়, তা হলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কিং সিষ্টেমে এক মস্ত অভাব ঘুচে যাবে।

—তারপর আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকসঙ্ঘগুলিও সমবায় প্রণালীতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করছে। এদের বলা হয় "লেবার ব্যাঙ্ক"। এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে।

প্রঃ—আচ্ছা, এ পর্য্যন্ত কৃষি সহায়ক ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ত কিছু বল্লেন না?

উঃ—এবার সে সম্বন্ধেই কিছু বলব। এ বিষয়ে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই এক আইন পাশ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে কৃষক-সম্প্রদায় জমি বন্ধক দিয়ে কর্জ্জ নিতে পারে, তার সুবিধা করে দেওয়া। এর

অন্ত দু'রকম কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এক রকম ব্যাঙ্ক ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পোষিত হচ্ছে, আর এক রকম ব্যাঙ্ক সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান মাত্র। দু'রকম ব্যাঙ্কই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত এক কমিশনের শাসনাধীন রয়েছে। এই কমিশনের নাম "ফেডারেল ফার্ম লোন বোর্ড"।

প্রঃ—এই বোর্ডের মেম্বর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারির সেক্রেটারী এই বোর্ডের স্থায়ী মেম্বর। এ ছাড়া আরও ৬ জন মেম্বর আছেন, তাঁরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক ৬ বৎসরের জন্ত নির্ব্বাচিত হয়ে থাকেন। এই বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদবী হল "ফার্ম লোন কমিশনর"।

প্রঃ—এ রকম ফেডারেল ব্যাঙ্ক কতগুলি আছে, আর এদের মূলধনই বা আসে কোত্থেকে?

উঃ—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আইনে যুক্তরাষ্ট্রকে ১২টা ডিষ্ট্রীক্ট বা ভাগে বিভক্ত করে তার প্রত্যেকটায় ১টা করে "ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর একদিন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রসঙ্গে যে "ডিষ্ট্রীক্ট"এর কথা বলেছি সেগুলির সঙ্গে "ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক ডিষ্ট্রীক্ট"এর বিস্তৃতি এবং সীমানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্ট ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মূলধন অন্ততঃ ৭লক্ষ ৫০ হাজার ডলার হওয়া চাই। ডিষ্ট্রীক্টের সীমানার মধ্যে সব ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কেরই শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা করবার অধিকার আছে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলির মূলধন যোগায় কে?

উঃ—গোড়ায় সর্ব্বসাধারণকে এদের "ষ্টক" কেনবার ক্ষমতা দিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, যে পরিমাণ ষ্টক অবিক্রীত থেকে যাবে তা যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টই কিনে নেবে। এ রকম ব্যবস্থা করবার ফলে গোড়ায় অবশ্য গভর্ণমেণ্টকেই প্রায় সব টাকা যোগাতে হয়েছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন ১২টা ব্যাঙ্কই কাজ করতে সুরু করেছিল, তখন এদের মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ ডলার,—তার মধ্যে ১ লক্ষ ৭ হাজার ডলার বাদে বাকীটা সবই ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট দিয়েছিল।

প্রঃ—তবে ত দেখছি যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টই স্থায়ী ভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসা খুলে বসেছে।

উঃ—ঠিক তা নয়,—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আইনে এ ব্যবস্থাও করা হয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক-সম্প্রদায়ের কর্জ্জ সমিতিগুলি ক্রমশঃ এই ফেডারেল ব্যাঙ্কগুলির মূলধন যোগাতে থাকবে। যখন এই সমিতিগুলির সংগৃহীত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার অতিক্রম করে যাবে তখন উদ্বৃত্ত পরিমাণ টাকা দিয়ে, গভর্ণমেণ্ট এবং সর্ব্বসাধারণ গোড়ায় যে মূলধন যুগিয়েছে, তাই পরিশোধ করা হতে থাকবে। এমনি ব্যবস্থা করবার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই গভর্ণমেণ্টের অনেক টাকা শোধ করা হয়ে গেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তার পরিমাণ ৯০ লক্ষ থেকে মাত্র ১০ লক্ষ ডলারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রঃ—ফেডারেল ব্যাঙ্কগুলির দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করছে কে?

উঃ—প্রত্যেক ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের জন্ত একটি পৃথক পরিচালক সমিতি আছে। তার মেম্বর-সংখ্যা ৭। এর মধ্যে তিনজন ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্ভুক্ত কৃষক-কর্জ্জ-সমিতিগুলির দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে। তাদের পদবী হল "লোকাল ডাইরেক্টর"। আর তিনজন মেম্বর ফেডারেল ফার্ম লোন বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত হন, তাদের বলা হয় "ডিষ্ট্রীক্ট ডাইরেক্টর"। এরা সকলেই তিন বৎসরের জন্ত নিযুক্ত হয়ে থাকে।

প্রঃ—কৃষক-কর্জ্জ-সমিতিগুলি কি রকম প্রতিষ্ঠান?

উঃ—সে সব পরে বলছি।—এখন এই ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলছি, শোন। এই ব্যাঙ্কগুলি প্রথম বন্ধক চুক্তিতে আবাদী জমির উপর ১ শত ডলার থেকে ২৫ হাজার ডলার পর্য্যন্ত কর্জ্জ দেয়। কিন্তু কর্জ্জের টাকা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে খরচ করা চাই।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—যেমন ধর আবাদী জমি কেনা, কি কৃষি যন্ত্রপাতি,

মাটীর সার অথবা গো-মেষ ক্রয়, কি কার্য্য-গৃহ নির্ম্মাণ, চাষ বা ভূমির উন্নতি সাধন,—এমনি সব কারণ থাকলেই এই ব্যাঙ্কগুলি ধার দিয়ে থাকে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—কি পরিমাণ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হবে সে সম্বন্ধেও একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেওয়া আছে। বন্ধকী জমির ধার্য্য মূল্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্তই ধার দেওয়া হয়, তার বেশী নয়।

প্রঃ—টাকাটা কত দিন পরে পরিশোধ করতে হয়?

উঃ—সেটা চুক্তিমত ৫ থেকে ৪০ বৎসরের মধ্যে শোধ করলেই চলে।

প্রঃ—সব টাকাই কি এক সঙ্গে ফিরিয়ে দেবার নিয়ম?

উঃ—না, বৎসরে দু'দফায় কিছু কিছু দিয়ে কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এক এক দফায় কত দেওয়া হবে তা কর্জ্জের স্থিতিকালের উপর নির্ভর করে। মোট কথা, প্রতি দফায় দেয় টাকার পরিমাণ এমনি ভাবে নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয় যে, কি বারেই সুদের সঙ্গে আসল টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিশোধ হতে থাকে। তাতে যেমন দিন যেতে থাকে, সুদের টাকাও তেমনি ক্রমশঃ কমে যায়। তবে কর্জ্জ নেবার ৫ বৎসর পরে হাওলাতকারী ইচ্ছা করলে এক দফায়ই তার সম্পূর্ণ বাকী টাকা শোধ করতে পারে বটে।

প্রঃ—এবার কৃষক-কর্জ্জ-সমিতি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—পূর্ব্বে যে ডিষ্ট্রীক্ট কেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কথা বলেছি তাদের লেনদেন চলে ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্ভুক্ত কৃষক-কর্জ্জ-সমিতির সঙ্গে। মাত্র দশজন কৃষিভূমির মালিক একত্র হয়ে ইচ্ছা করলেই এ রকম একটা সমিতি গঠন করতে পারে, তবে তাদের সম্পত্তি আইনতঃ বন্ধক দেবার যোগ্য হওয়া চাই,—আর তারা এক সঙ্গে যে টাকা ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কাছে কর্জ্জ চাইবে, তারও পরিমাণ কম পক্ষে ২০ হাজার ডলার হওয়া দরকার।

প্রঃ—এ ছাড়া আর কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই কি?

উঃ—উল্লেখযোগ্য একটা নিয়ম রয়েছে এই যে, সমিতির কোন মেম্বর যে পরিমাণ টাকা ধার নেবে, তার শতকরা ৫ ডলার দিয়ে তাকে সমিতির মূলধন সূচক "ষ্টক" কিনতে হয়। প্রত্যেক সমিতি আবার তার নিজের মূলধন থেকে শতকরা ৫ ডলার দিয়ে,—সে যে ফেডারেল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নেবে—তার মূলধন-সূচক "ষ্টক" কিনতে বাধ্য থাকে। কার্য্যতঃ তা'হলে দেখছ যে, পরোক্ষভাবে হাওলাত-কারীই ক্রমশঃ ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলির মূলধন যোগাচ্ছে। প্রত্যেক হাওলাতকারী তার সমিতির কাছে নিজ "ষ্টকের" বিশুদ্ধ মূল্যের জন্য দায়ী থাকে।

প্রঃ—এ ত মন্দ ব্যবস্থা নয়! আচ্ছা, যুক্তরাষ্ট্রে এ রকম সমিতি খুব বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি?

উঃ—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এ রকম সমিতির মোট সংখ্যা হয়েছিল ৪,৬৯৪। প্রায় প্রত্যেক কাউন্টি (অর্থাৎ জেলা) তেই গড়ে একটি করে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সবগুলি সমিতির মেম্বর-সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার।

প্রঃ—ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলি তাদের ষ্টক বিক্রী করে যে টাকা সংগ্রহ করে, তাই কি তাদের একমাত্র মূলধন,—না তাদের মূলধন যোগাবার আরও পথ আছে?

উঃ—ষ্টক বিক্রী করে এরা যে টাকা পায় তাতে এদের কারবার চালানো সম্ভব নয়। তাই এরা বণ্ড বা প্রতিজ্ঞাপত্র বের করেও টাকা সংগ্রহ করে। এদের কাছে যে সমস্ত সম্পত্তি জামিন দেওয়া হয় তারই ওপর ভর করে এই বণ্ড বের করা হয়। কোন সম্পত্তি প্রথম এদের কাছে বন্ধক দিলে ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক ৫০ হাজার ডলার পর্য্যন্ত ধার দিতে পারে, সে কথা আগেই বলেছি। এই পরিমাণ টাকা ধার দেবার পর সেই ব্যাঙ্কই ৫০ হাজার ডলার মূল্যের বণ্ড বের করে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকাটা সংগ্রহ করে নিতে পারে। তারপর টাকাটা আবার অন্য কোন সম্পত্তির প্রথম

বন্ধক চুক্তিতে ধার দিয়ে নূতন বণ্ড বের করবার ব্যবস্থা করতে পারে। এমনি করে এই ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের নিজেদের আদায়ী মূলধনের বিশ গুণ পর্য্যন্ত মূল্যের বণ্ড বের করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ—এ সব বণ্ডের উপর শতকরা কত সুদ দেওয়া হয়?

উঃ—তা টাকার বাজারের টান-যোগানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলি যে কর্জ্জ দেয় তার জন্য তারা নিজেদের বণ্ডের উপর ধার্য্য সুদের চেয়ে শতকরা মাত্র ১ ডলার বেশী আদায় করতে পারে। তাও উর্দ্ধ সংখ্যায় শতকরা ৬ ডলার পর্য্যন্তই সুদ আদায় করতে দেওয়া হয়, তার বেশী নয়।

প্রঃ—এত গেল ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ব্যাপার। তারপর আপনি বলছিলেন যে, আরও এক রকম কৃষি-ব্যাঙ্ক আছে, যারা সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠানের মত কারবার করছে। এই ব্যাঙ্কগুলির কোন বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান হলেও এই ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজের অংশ-মূলধনের উপর এরা গড়ে উঠেছে বলেই এদের সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। এবিষয়েও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মূলধন বাবদ এরা টাকা পায় না বটে, কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলিও গভর্ণমেণ্টের তাঁবে রয়েছে। ফেডারেল ফার্ম লোন বোর্ড সর্ব্বদা এদের কাজ পরিদর্শন করছে।

প্রঃ—এ রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে কোন আইন আছে কি?

উঃ—হাঁ, মূলধন কমপক্ষে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার থাকলেই এ রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কারবার খোলবার আগেই নির্দ্ধারিত মূলধনের অর্দ্ধেক টাকা আদায় হওয়া চাই। শুধু তাই নয়, রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা রাখবার জন্যও এদের সম্বন্ধে কড়াকড় নিয়ম আছে। যতদিন না এদের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা নিজ নিজ মূলধনের শতকরা বিশ ভাগের সমান হয়ে দাঁড়ায় ততদিন এরা বাৎসরিক মুনাফার কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ তাদ রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখতে বাধ্য থাকে।

প্রঃ—কিন্তু রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা যদি কখন মূলধনের শতকরা বিশ ভাগের সমান হয়ে যায়?

উঃ—সে ক্ষেত্রে মুনাফা থেকে শতকরা মাত্র ৫ ডলার রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রঃ—এই যৌথ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানবার আছে কি?

উঃ—সে অনেকটা ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মতই। এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্কই কৃষক-সম্প্রদায়কে তাদের জমি বন্ধক রেখে একই নিয়মে দীর্ঘ দিনের জন্য টাকা ধার দিচ্ছে। কর্জ্জের টাকা আদায় করবার ব্যবস্থাও উভয় ক্ষেত্রে একই রকম।

প্রঃ—যৌথ ব্যাঙ্কগুলিও কি বছরে বছরে টাকা আদায় করে?

উঃ—হাঁ, তা ছাড়া এরাও বণ্ড বের করে নিজেদের মূলধন বাড়িয়ে থাকে।

প্রঃ—তা'হলে ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক এবং যৌথ কৃষি ব্যাঙ্কের মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই বলতে হবে?—তাই যদি হয়, তবে পাশাপাশি দুই পৃথক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক থাকবার কারণ কি?

উঃ—এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মধ্যে কিছু কিছু তফাৎ আছে বৈ কি! আগে যা বলেছি তা থেকেই বুঝে থাকবে যে ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলি সমবায়-প্রণালীতে কাজ করছে। হাওলাতকারী কৃষকসমিতির মূলধন যোগাচ্ছে, আর ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মূলধন যোগাচ্ছে এই কৃষক-সমিতিগুলি। কিন্তু কৃষি-ব্যাঙ্কগুলি প্রকৃতই যৌথ প্রতিষ্ঠান। তারপর দেখেছ যে, ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে হাওলাতকারীর সোজাসুজি কোন সম্পর্ক নেই। এই ব্যাঙ্ক যে টাকা ধার দেয় তা কৃষক-সমিতির মারফৎ হাওলাতকারীর হাতে গিয়ে পৌছায়। তা ছাড়া কৃষক সমিতি গঠন করতে গেলেই অন্ততঃ দশজন লোক একত্র হওয়া চাই। তাতে ধার চাইতে গেলেই ব্যাপারটা জানাজানি

হয়ে যায়। কিন্তু যৌথ কৃষি-ব্যাঙ্কের মধ্যে এতসব গণ্ডগোল নেই,—সোজাসুজি হাওলাতকারীর সঙ্গেই এদের কারবার চলে। এ ছাড়াও এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মধ্যে অন্য প্রকার পার্থক্য আছে।

প্রঃ—আর কি প্রভেদ আছে, তাও বলুন।

উঃ—প্রথমতঃ একটা পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কোন কৃষিব্যাঙ্ক, সে যে 'ষ্টেটে' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেবল সেখানেই কিংবা বড় জোর নিকটতম আর একটা ষ্টেটে তার কারবার চালাতে পারে; কিন্তু একটা ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কারবারের গণ্ডী এর চাইতে অনেক বড়। আগেই বলেছি যে, এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে কতকগুলি ডিষ্ট্রীক্ট বা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই এক একটা ডিষ্ট্রীক্টের সীমানা দু'চারটা ষ্টেটের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। কাজেই দেখছ যে, এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কারবারের গণ্ডী সমান নয়। তারপর, কোন ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক একজন মাত্র লোককে উর্দ্ধ সংখ্যায় ২৫ হাজার ডলার পর্য্যন্ত ধার দিতে পারে, তার বেশী নয়; কিন্তু একটা যৌথ কৃষি-ব্যাঙ্কের একজন লোককেই ৫০ হাজার ডলার পর্য্যন্ত ধার দেবার ক্ষমতা আছে। বণ্ড বের করবার ব্যাপারেও এদের মধ্যে একটু তফাৎ হয়েছে এই যে, কৃষি ব্যাঙ্কগুলি তাদের মূলধনের পনের গুণ মূল্যের বণ্ড বের করতে পারে, কিন্তু ফেডারেল ব্যাঙ্ক তার মূলধনের দশ গুণ পর্য্যন্ত বণ্ড বের করে থাকে।

প্রঃ—বুঝেছি, আচ্ছা বলুন—ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক কিংবা যৌথ কৃষিব্যাঙ্ক যাই বলুন, এরা উভয়েই ত বন্ধকী কারবার চালাচ্ছে, আর এরা কর্জ্জও দেয় দীর্ঘ কালের জন্য। কিন্তু কৃষক-সম্প্রদায়ের বীজ এবং যন্ত্রপাতি কেনা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজন মেটাবার জন্য অল্প দিন স্থায়ী হাওলাতের দরকারও ত হয়ে থাকে। তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই কি?

উঃ—হাঁ, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের এক আইনে এর জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার আগে অবশ্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলিই এসব কাজের জন্য কর্জ্জ দিত। এখন এ সবই যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এক শ্রেণীর নাম "ফেডারেল ইণ্টারমিডিয়েট ক্রেডিট ব্যাঙ্ক",—এর মূলধন যোগায় যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী, আর এক শ্রেণীর নাম "জাতীয় অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন", এদের মূলধন জনসাধারণের চাঁদা থেকেই আদায় হয়।

প্রঃ—যুক্তরাষ্ট্রে এখন কটা "ইণ্টারমিডিয়েট" ব্যাঙ্ক আছে,—তাদের মূলধনের পরিমাণই বা কত?

উঃ—ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মত এদেরও সমষ্টি-সংখ্যা বার। ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করে এদের একই স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফেডারেল ফার্ম লোন বোর্ড এদেরও কাজ পরিদর্শন করে থাকে। গোড়ায় মতলব ছিল যে, প্রত্যেক "ইণ্টারমিডিয়েট" ব্যাঙ্ককে তার মূলধন বাবদ ট্রেজারী থেকে ৫০ লক্ষ ডলার দেওয়া হবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এদের প্রত্যেককে মাত্র ২০ লক্ষ ডলার দেওয়া হয়েছে,—বাকী টাকা টেজারীতে মজুদ রাখা হয়েছে।

প্রঃ—এ সব ব্যাঙ্কের যে মুনাফা হয় তা নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্ট নিয়ে থাকে?

উঃ—সে সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মুনাফার অর্দ্ধেক গভর্ণমেণ্ট নেবে, আর অর্দ্ধেক রিজার্ভ ফণ্ডে মজুদ থাকবে। এমনি করে রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা যখন মূলধনের সমান হয়ে দাঁড়াবে তখন মুনাফার শতকরা দশ ডলার থাকবে রিজার্ভ ফণ্ডে, আর বাকী সমস্তই গভর্ণমেণ্ট আদায় করে নেবে।

প্রঃ—ইণ্টারমিডিয়েট ব্যাঙ্কগুলি কি পদ্ধতিতে কারবার করছে?

উঃ—যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় সমিতি, কৃষিজ পণ্য-বিক্রেতা-সমিতি কিংবা সেখানকার গো-মেষ-ক্রয়-সহায়ক লোন কোম্পানীগুলি নিজ নিজ বাজার-চল প্রতিজ্ঞা-মূলক নিদর্শনপত্র এ সব ইণ্টারমিডিয়েট ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙ্গিয়ে নিতে পারে। গুদাম রসিদ কিংবা জাহাজী চালান রসিদ পেলে এরা সোজাসুজিভাবেই সমবায় কৃষক সমিতি কিংবা সমবায় গো-মেষ-বিক্রয়

সমিতিগুলিকেও টাকা ধার দেয়। তারপর নির্দ্ধারিত আমিন রেখে এরা পাঁচ বৎসরের অনধিককালস্থায়ী ডিবেঞ্চারও বের করে থাকে। এমনি করেও এরা নিজ নিজ মূলধনের দশ গুণ পর্য্যন্ত টাকা সংগ্রহ করছে।

প্রঃ—তা হলে এই ব্যাঙ্কগুলি কৃষি-বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই কাজ চালাচ্ছে বলতে হবে, কারণ যত সমিতি এবং সঙ্ঘের সঙ্গেই এদের কারবার চলছে?

উঃ—বস্তুতঃ তাই।

প্রঃ—এদের জন্য আর কি বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে?

উঃ—একটা বিশেষ সুবিধা আছে এই যে, এদের কাছে যে সব বাজার-চল সিকিউরিটি আসে, তা এরা দরকার হ'লে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙ্গিয়ে নিতে পারে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কগুলিকে ট্রেজারী থেকেই যদি টাকা দেওয়া চলে, তবে আর এরা ডিবেঞ্চার বের করে কেন?

উঃ—ডিবেঞ্চার বের করবার ফলে মূলধন বাবদ অনেক টাকা জন-সাধারণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। স্থায়ী ভাবে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের উপর নির্ভর করে কোন ব্যাঙ্ক খুব শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে না। যখন কোন নূতন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা বে-সরকারী চেষ্টায় সম্ভব হয় না, তখনই কেবল গবর্ণমেণ্ট তার রাজস্ব থেকে অর্থসাহায্য দিয়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে থাকে। তাও দেশের কল্যাণের জন্যই। কিন্তু, সে যাই হো'ক তার মূলধন যদি সর্ব্ব সাধারণের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হয়, তবে সরকারী সাহায্য যত কমিয়ে আনা যায় ততই ভাল। ইণ্টারমিডিয়েট ব্যাঙ্কগুলি যে ডিবেঞ্চার বের করে তারও কারণ এই।

প্রঃ—বুঝেছি।—তারপর "ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন"গুলির কাজ চলছে কি ভাবে?

উঃ—পূর্ব্বেই বলেছি যে, এরা সকলেই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। এরা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কোন রকম অর্থ-সাহায্য পায় না। কারবার আরম্ভ করবার আগেই এদের অন্ততঃ ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার মূলধন থাকা চাই। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলির মত এরাও সেখানকার করেন্সি কনট্রোলারের শাসনাধীন রয়েছে।

প্রঃ—এসব কর্পোরেশনের কাজ পরিচালন করে কে?

উঃ—প্রত্যেক কর্পোরেশনের জন্য একটী পরিচালক সমিতি রয়েছে, তার মেম্বর-সংখ্যা পাঁচ।

প্রঃ—টাকাকড়ি কর্জ্জ দেবার ব্যাপারে ইণ্টারমিডিয়েট ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে এদের কোন প্রভেদ রয়েছে কি?

উঃ—এরা সোজাসুজি হাওলাতকারীদের সঙ্গে কারবার করে থাকে।—ইণ্টারমিডিয়েট ব্যাঙ্কগুলির কারবার চলে সব লোন কোম্পানী কিংবা বিবিধ সমবায় সমিতির সঙ্গে, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি।

প্রঃ—কর্পোরেশনগুলিকে ডিবেঞ্চার বের করবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি?

উঃ—হাঁ, এরাও নিজেদের মূলধনের দুশ গুণ পর্য্যন্ত ডিবেঞ্চার বের করতে পারে, তবে সে ডিবেঞ্চার তিন বৎসরের বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে না।

প্রঃ—এদের আর কি বিশেষত্ব আছে?

উঃ—এরা যে ডিষ্ট্রীক্টের সীমানার মধ্যে অবস্থিত রয়েছে সেখানকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এরা নিজ নিজ মূলধনের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বণ্ড কিনে গচ্ছিত রাখতে বাধ্য থাকে। তা ছাড়াও এদের নিজ নিজ দেনার সমষ্টি পরিমাণের শতকরা ৭½ ডলার হিসেবে আলাদা করে টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয়।

প্রঃ—যুক্তরাষ্ট্রে তা'হলে কৃষি-সহায়ক এই ছয় শ্রেণীরই ব্যাঙ্ক রয়েছে?

উঃ—হাঁ, তবে এই প্রসঙ্গে আর এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কথাও উল্লেখ করা দরকার। তার নাম হচ্ছে "রিডিস্কাউণ্ট কর্পোরেশন"। এও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আইনের সৃষ্টি। এদের মূলধন কমপক্ষে ১০ লক্ষ ডলার হওয়া চাই। "অ্যাগ্রিকালচারল কর্পোরেশনের" কাছে যে সব কৃষি-সংক্রান্ত বিল বা সিকিউরিটি ভাঙ্গিয়ে নেওয়া হয়, তা দরকার হলে রিডিস্কাউণ্ট কর্পোরেশনের কাছে আবার "রিডিস্কাউণ্ট" করা অর্থাৎ দ্বিতীয় বার ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে জন্য বিলের সঙ্গে শুধু রসিদ কি চালান রসিদ একটা কিছু থাকা চাই, আর বিলগুলিও ৯ মাসের অনধিককাল স্থায়ী হওয়া দরকার। ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচারল কর্পোরেশনগুলি তাদের মূলধনের এক-পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত রিডিস্কাউণ্ট কর্পোরেশনের ষ্টক কেনবার জন্য খরচ করতে পারে। এমনি ব্যবস্থার ফলে রিডিস্কাউণ্ট কর্পোরেশনও একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করছে বুঝতে হবে।

"দি ইণ্ডিয়ান কমার্স অ্যাণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রি"

অক্টোবর ও নবেম্বর, ১৯২৯

(১) উৎপাদন ও লোক-বলের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়। লেখক বলিতেছেন যে, অতি-উৎপাদন ও লোকবলের অতি-বৃদ্ধি উভয়ই একসঙ্গে ঘটিতে পারে এবং তজ্জন্য বেকার-সমস্যা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। অতি-উৎপাদন অর্থে কল ও কলে তৈরী দ্রব্যের অতি উৎপাদন বুঝিতে হইবে, অন্যান্য দ্রব্যের অতি উৎপাদন নহে।

(২) অক্‌সেট্‌ মুদ্রাঙ্কণ পদ্ধতি।

(৩) মোটর কেস : সভ্যদের কয়েকটি পরীক্ষা।

(৪) দুনিয়ার তামা এবং টীন। চা-উৎপাদন। কফি প্রেরণ। চিনির যোগান ও খাদন। "কাঁচা মাল" অধ্যায়ের এই কয়টি প্রবন্ধ বহু মূল্যবান্ তথ্যে পূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশী তামা উৎপাদিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৮ সনে জগতের ৪০% অংশ তামা উৎপাদন করিয়াছিল। বাকী ৬০% নিম্নলিখিত দেশগুলি উৎপাদন করে : পেরু ও চিলি (একত্রে ১৮%), ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, ক্যানাডা মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়া। যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদন করিয়াছিল ১০৯ লাখ টন (প্রতি টন = ২,০০০ পাউণ্ড)। ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশ যৎকিঞ্চিৎ উৎপাদন করে।

টীন উৎপাদনে মালয় সবার সেরা। জগতের কোন্ দেশ কতখানি টীন উৎপাদন করে তার তালিকা এই :—

মালয়	৩৬.৭৫%
বলিভিয়া	২২.৭৯%
ডাচ্‌ ইণ্ডিজ	১৭.৯৪%
শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ	৫.৭০%
নাইজেরিয়া	৫.১২%
চীন	৩.৭%
অষ্ট্রেলিয়া	২.১%
কর্ণওয়াল	১.৪%
বেলজিয়ান কঙ্গো ...	১.১%
দক্ষিণ আফ্রিকা	.৭%
অন্যান্য	১.১%

মালয় দেশ ১৯২৮ সনে ৬৪,৫০০ টন উৎপাদন করিয়াছিল (১ টন = ২,২৪০ পাউণ্ড), ব্রহ্মদেশ ৭০,৯৬০ হন্দর উৎপাদন করে। টীন-খাদক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্ব্বোচ্চে, ৭৯,০০০ টন ব্যবহারে লাগিয়াছিল।

সীসার উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ : যুক্তরাষ্ট্র ৫৭৬ টন মেক্সিকো ২২০ টন, অষ্ট্রেলিয়া ১৪৬ টন, কানাডা ১৪৭ টন, স্পেন ও টিউনিস্ ৯৪ টন, ব্রহ্মদেশ ৭৯ টন, ইতালি ২১ টন রোডেসিয়া ৪ টন। মোট ১,০০১ টন (১ টন = ২,২৪০ পাউণ্ড)। যুদ্ধ বাধিতেছে সীসা উৎপাদনে ব্রহ্মদেশের স্থান বেশ গৌরবজনক।

১৯২৭ সনে ভিন্ন ভিন্ন দেশ নিম্নলিখিত হারে চা-উৎপাদন করিয়াছিল।

দেশ	কোটী টন
ভারতবর্ষ	৩৮.৯২
সিংহল	২২.৭১
যবদ্বীপ	১২.৬৭
চীন	৮.০
জাপান	২.৩২
কর্ম্মোসা	২.২৪
সুমাত্রা	১.৭৬
মোট	৮৯.১৪

চিনির যোগান ও খাদন প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ৪½ কোটী ইংরেজ ১৮½ লাখ টন চিনি খায়, আর ১২ কোটী আমেরিকান ৬০ লাখ টন চিনি খায়।

(৫) ইতালি ও ভারতবর্ষ। যুক্তরাজ্যকে বাদ দিলে আমদানি রপ্তানির দিক্ হইতে ইয়োরোপের ইজ্জৎ অনেক কমিয়া যায়। লেখক বলেন যে, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য বাড়ান দরকার।

১৯১৭-১৮ সনে যুক্তরাজ্য বাদে ইয়োরোপ হইতে আমদানি আসিয়াছিল ৭½ কোটী টাকার উপর। ১৯২৬-২৭ সনে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ৪৭½ কোটী টাকার উপর। ইতালির আমদানির ঐ দুই বৎসরে মাল যথাক্রমে পৌনে দুই কোটী ও ৬ কোটী টাকার উপর। ইয়োরোপে আমরা পূর্ব্বোক্ত দুই বৎসর রপ্তানি পাঠাইয়াছিলাম প্রায় ২০ কোটী ও ৬৭ কোটী টাকার উপর। ইতালির রপ্তানির পরিমাণ ৮½ কোটী ও ১১½ কোটী টাকার উপর। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বেকালে ইয়োরোপীয় আমদানি ৩ গুণ ও রপ্তানি ৩½ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সেকালে ইতালির আমদানি ও রপ্তানি মাত্র ৩½ গুণ ও ৪০%। সাদা কথায় ইতালি ঘটিয়া গিয়াছে। আমদানি ও রপ্তানি উভয় দিক্ হইতেই বোম্বাইয়ের সহিত ইতালির সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ।

(৬) ফিন্‌ল্যাণ্ডের টাকা খাটানোর কেরামতি।

(৭) ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতি ও প্রসার।

(৮) আমাদের রেলসমূহ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে: ১০ বৎসরে রেলওয়ের প্রসার; ভারতীয় রেলওয়েসমূহের পুঁজি, আয় ও খরচ; তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী; মাল বহন। এই প্রবন্ধে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর গড়ে ৬০ কোটী লোক ভ্রমণ করে। তন্মধ্যে প্রায় ৫৮ কোটী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী; অন্য দিকে ১৯২৬-২৭ সনে মোট ৩৮ কোটী টাকার মধ্যে প্রায় ৩০½ কোটী টাকা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কল্যাণে রেলওয়েসমূহ যে উন্নতিলাভ করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৯) সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আছে জার্ম্মাণি ও ভারতের মৈত্রী-বৃদ্ধির উপায়। কোন মুসলমের পত্র; তোকিয়োতে বিশ্ব-এঞ্জিনিয়ারিং কংগ্রেস।

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্"

দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্

বিগত ৭ই নবেম্বর দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্বোধন উপলক্ষে বড়লাট বলেন—"এই ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পৃথিবীর মধ্যে না হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সাফল্য ভারতের গর্ব্বের বিষয়। যাঁহারা এই ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা-কল্পে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের আর্থিক জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাস্তবিক গবেষণা ব্যতীত উন্নতি সম্ভবপর নহে। সুতরাং বনবিভাগে যে গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের আর্থিক জীবনে নব যুগের উদয় হইবে। বিশেষতঃ, যে সমস্ত বনবিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ বিপদের মুখে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণতার জলন্ত দৃষ্টান্ত লোক-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠান হইতে কার্য্য-সম্পাদনের জন্য বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

"বন-বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের তিন কোটী টাকা আয় হয়। ১৯০৬ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার উপর বেশ মোটা লাভ পাওয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই বনবিভাগ হইতে কেবলমাত্র যে গ্রাম ও দূরবর্ত্তী জনপদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে, পরন্তু বাণিজ্যক্ষেত্রেরও প্রভূত উন্নতি হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় বনবিভাগের বৃক্ষ হইতে এরোপ্লেনের দণ্ড, কামানবাহী দণ্ড বন্দুকের কুঁদা ও রেলপথের 'স্লীপার' নির্ম্মিত হইতেছে। আর ঐ সমস্ত প্রস্তুতের মূলে এই গবেষণা-মন্দিরের চেষ্টা বর্ত্তমান। এই গবেষণা-মন্দিরের সাহায্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃক্ষকে রক্ষা করিয়া আধুনিক উপায়ে 'স্লীপার' নির্ম্মাণকরতঃ রেলকর্ত্তৃপক্ষ বহু লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছে। ঐ কার্য্যের জন্য

বর্ত্তমানে পাঞ্জাবে ও আসামে বিস্তৃতভাবে চেষ্টা চলিতেছে। ইছাপুর গান্ ফ্যাক্টরি ওয়ালনাট্ বৃক্ষকে আধুনিক প্রক্রিয়ায় শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা বন্দুকের কুঁদা নির্ম্মাণ করিয়া বার্ষিক ১০,০০০ পাউণ্ড খরচ কমাইয়াছে। ই আই রেলওয়ের লিলুয়া ওয়ার্কশপে ষ্টীমার প্রস্তুতের কাঠ শুষ্ক করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জব্বলপুর গানক্যারেজ ফ্যাক্টরীতেও ঐরূপ কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাও এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার অমৃতময় ফল।

"বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুতের জন্য লণ্ডনে দুইটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ঐ দুইটি কোম্পানী ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের বিপুল বাঁশের ঝাড়কে কাজে লাগাইবে। তাহাতেও ভারতের যে বহু অনর্থক নষ্ট হইতেছিল তাহা হইতে প্রভূত আয় হইবে। ঐ কার্য্যে দুই কোম্পানীরই মত প্রস্তুতাভিজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন।

"বর্ত্তমানে ভারতে দেশস্থ বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিয়াসলাই প্রস্তুতের প্রস্তাব চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং যে সমস্ত বৃক্ষ হইতে দিয়াসলাই প্রস্তুতের উপযোগী কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ভারতের সমস্ত বন-বিভাগ পরীক্ষা করা হইবে।

"উল্লিখিত উপায় ব্যতীত আরও অনেক প্রকারে ভারতের বনজ সম্পদ্ কাজে লাগান যাইতে পারে, যেমন ঘাস হইতে তার্পিণ তৈল প্রস্তুত। অন্যান্য বৃক্ষলতা হইতে ঔষধ প্রস্তুত প্রভৃতিরও গবেষণা এই ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত।

"পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববিভাগে উপযুক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া দেশীয় কার্য্যের উন্নতিবিধানে সমর্থ হয়, সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য আছে। তবে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ব্যতীত কোন লোক মাত্র ভারতবাসী বলিয়া টেক্‌নিক্যাল বিভাগে কাজ পাইবে না। সর্ব্বত্র গুণের সমাদর করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

"দি আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ"

জুন, ১৯২৯

(১) ক্ষুদ্র ঋণ সমস্যা; কনেক্‌টিকাট অভিজ্ঞতা।
(২) সুইট্‌সারল্যাণ্ডে বর্ষাযান।
(৩) লণ্ডন ইক এক্সচেঞ্জের ইতিহাস।
(৪) আয় সম্বন্ধে আর্ভিং ফিসারের মতামত।
(৫) ১৯১৮ সন হইতে রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়।

১। "কন্‌টেম্পোরারি ইকনমিক থট" (সমসাময়িক আর্থিক চিন্তার ধারা)। পি টি হোম্যান্‌। হার্পার, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৮। ১০+৪৭৫ পৃষ্ঠা। ২·৫০ ডলার।

এই কেতাবে নিম্নলিখিত পাঁচ ব্যক্তির আর্থিক মতামত লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে; (১) জন্‌ বেট্‌স্‌ ক্লার্ক। (২) থরষ্টাইন ভেব্‌লেন। (৩) আলফ্রেড্‌ মার্শাল, (৪) জন এ হব্‌সন ও (৫) ওয়েস্‌লি সি মিচেল। শেষকালে একটি অধ্যায় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে। মার্শাল ব্যতীত অন্য ৪ জন অর্থশাস্ত্রীর নাম আমাদের ধনবিজ্ঞানবিষয়ের কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা সন্দেহ। অথচ গ্রন্থকার এই ৫ জনকে এক একটি মস্ত দিক্‌পাল বলিয়া বিবেচনা করেন এবং প্রত্যেকের কেতাব-সমূহ বাজারে সহজ প্রাপ্য হইলেও তিনি পরিশ্রম ও যত্ন-পূর্ব্বক মতামতগুলির বিশ্লেষণ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আমাদের দেশের ধনবিজ্ঞানসেবীরা এই পুস্তক ঘাঁটিলে অনেক উপকৃত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

২। "লাকৃসেস্‌ অন্‌ ইরিগেশন প্রজেক্টস্‌" (সেচ প্রণালীকে কিরূপে ফলদায়ক করা যায়)। জে এ হিল্‌ড্রেথ। হিলি। নিউ ইয়র্ক। ১৯২৮। পৃঃ ৫+১৫০। ১·৭৫ ডলার।

আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সেচের কাজে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। এই কেতাবে সেচ্‌ সম্বন্ধে বহুদিক্‌ হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে সেচের জন্য টাকা খরচ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। খারাপ জমির উপর জল সেচিয়া তার উন্নতি সাধন করার ভার সরকারকেই লইতে হইবে।

এই কেতাবে যুক্তরাষ্ট্রের সেচ-প্রণালীর ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, সেচ্‌কে ফলপ্রদ করিতে হইলে দরকার যথেষ্ট জলের যোগান, ভাল জমি, যথোচিত জলবায়ু। কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতা, সমবায়, মানুষের উচ্চ নীতিজ্ঞান প্রভৃতিও অনুকূল থাকা চাই। অন্যদিকে চাষের বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রভূত পুঁজি, গ্রাম্যজীবনের প্রতি মমতা কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

৩। "মার্কেটিং অ্যাণ্ড আড্‌ভার্টাইজিং অ্যাজ ইকনমিক অ্যাপ্রাইসাল" (বাজারে মাল ফেলা ও বিজ্ঞাপনের প্রচার। আর্থিক দরনির্ণয়)। এফ্‌ এল ডগ্যান। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, প্রিন্সটন। পৃঃ ১৪+৫২১। ৫ ডলার।

বাজারে মাল ফেলা বিশেষ ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। এই খরচ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। তার কি প্রতীকার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা এই কেতাবে আছে। মোট খরচের অনেকখানি বিজ্ঞাপন বাবদ যায়। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন-তত্ত্ব বুঝিতে দুই পরিচ্ছেদ দিয়াছেন। বাজারে মাল ফেলিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারশক্তি, দ্রব্যের বৈচিত্র্য-বিধান, ষ্টাইল ও ফ্যাশান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, বিক্রয় করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা—এই সবগুলির যথেষ্ট চর্চ্চা করা দরকার। বিজ্ঞাপনের খরচ যেন তেন প্রকারেণ করাইলেই বাজারে জিনিষ সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয় না বা বেশী লাভ হয় না। সে সম্বন্ধীয় বিদ্যাটাকে কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিতে হইলে বর্ত্তমান কেতাবের মত কেতাব ঘাঁটাঘাঁটির দরকার আছে।

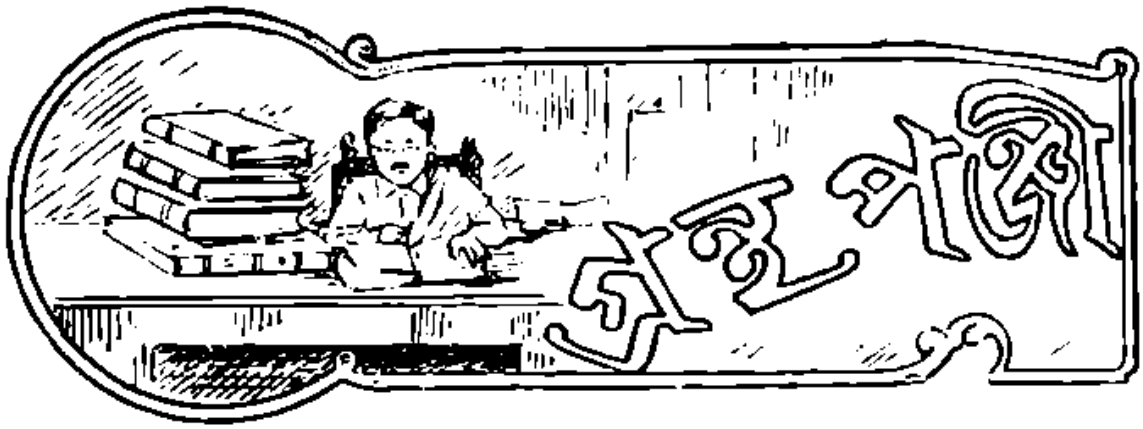

১। "অ্যান্থ্রেল সাইক্লোপিডিয়া অব্ ইনসিওরেন্স ইন্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স, ১৯২৮" (যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৮ সনের বীমার বাৎসরিক অভিধান)। দি রিড্ ম্যাকে, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৮। পৃঃ ৬০০। ৩ ডলার।

২। "মিড্লটাউন: এ ষ্টাডি ইন্ কন্টেম্পোরারি আমেরিকান কালচার" (মিড্লটাউন: সমসাময়িক আমেরিকার সভ্যতার আলোচনা)। এস লিণ্ড ও হেলেন মেরল লিণ্ড। হারকার্ট প্রেস, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। পৃঃ ১০+৫৫০। ৫ ডলার।

৩। "ইমিগ্রেশন অ্যাণ্ড রেস্ অ্যাটিটিউড্স্" (উপনিবেশ ও জাতির মনোভাব)। ই এস্ বোগার্ডাস। নিউ ইয়র্ক। ১৯২৮। পৃঃ ২৭৯। ১.৮০ ডলার।

৪। "লেবার ম্যানেজমেণ্ট" (মজুর শাসন)। দি এস্ ওয়াট্কিন্স। শ, শিকাগো। ১৯২৮। পৃঃ ১৫+৭২৬। ৫ ডলার।

৫। "কর্পোরেশন প্রফিট্স: এ ষ্টাডি অব্ রেয়ার সাইজ্, ভেরিয়েশন, ইউস্ অ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন ইন এ সিরিজ্ অব্ এপলপারিটি" (কর্পোরেশন মুনাফা: উন্নতি কালে তাদের আকার, তারতম্য, উপযোগিতা ও বণ্টন সম্বন্ধে পঠন পাঠন)। এস্ এইচ্ নোন। হার্পার, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। পৃঃ ৯+৩৬৫। ৩.৫০ ডলার।

৬। "ট্রেড্ অব্ দি ইণ্ডিয়ান ওসেন" (ভারত সাগরের বাণিজ্য)। লংম্যান অ্যাণ্ড গ্রীন, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। পৃঃ ১৬+২৫। ৩ ডলার।

৭। "এলিমেণ্টস্ অব্ রুর্যাল সোসিঅলোজি" (গ্রাম্য সমাজতত্ত্বের গোড়ার কথা)। এন্ এল্ সিম্স। ক্রেল্, নিউ ইয়র্ক। পৃঃ ৬৯৮। ৩.৫ ডলার।

৮। "চিল্ড্রেন ইন্ এগ্রিকালচার" (চাষবাসে নিযুক্ত বালকবালিকা) এল সি ম্যাকগ্রিল। ওয়াশিংটন। ১৯১৯। পৃঃ ৫+৮১। ২৫ সেণ্ট।

৯। "ট্রু ক্রপস: এ পার্মানেণ্ট এগ্রিকালচার" (বৃক্ষ-শস্য: একটী স্থায়ী কৃষি)। জে রাসেল স্মিথ। হারকার্ট প্রেস, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। পৃঃ ১২+৩৩৩। ৪ ডলার।

১০। সাবার্ব মিল হিস্ট্রি: এ ষ্টাডি অব্ সোশ্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক ফোর্সেস ইন সাউথ মিল ভিলেজেস্ (দক্ষিণ কারখানা স্থানসমূহ: কারখানা গ্রামসমূহের সামাজিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ। হয়েড্ ম্যাকডোনাল্ড। ল বিলম্যান, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৮।

বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের সুবিধা

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সকল সভ্য দেশেই মানুষের পক্ষে অশনের পরই বসনের প্রয়োজন। সেই জন্য যে দেশ অশনের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী সে দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে দেশ বসনের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী সে দেশেরও তেমনই দুর্ভাগ্য। আর সেই জন্যই বস্ত্রশিল্পকে অর্থনৈতিক হিসাবে দেশের ও জাতির মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। যতদিন এ দেশের বস্ত্রশিল্প সমুন্নত ছিল, ততদিন এ দেশের মেরুদণ্ডও সবল ছিল। কিন্তু আজ সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত না করিলে সেই শিল্পের পুনরুন্নতি-সাধন সম্ভব হইতে পারে না।

এই কার্য্যে বোম্বাই ভারতে অগ্রণী হইয়াছে। কিন্তু আজও বিলাত ও জাপান হইতে বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র ভারতে আমদানি হয়। অথচ এই দুই দেশের কোনটিতেই তুলা উৎপন্ন হয় না; উভয় দেশকেই বিদেশ হইতে তুলা লইয়া যাইতে হয়।

ভারতবর্ষে লোকপ্রতি ব্যবহৃত কাপড়ের পরিমাণ লোকের আর্থিক অবস্থার অর্থাৎ কিনিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ১৯০০ সন হইতে ১৯২৪ সন এই ২৫ বৎসরের গড় হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, লোক প্রতি ৮৮০ গজ হইতে ১৬·২৮ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। গড়ে ধরিলে বলা যাইতে পারে, এ দেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে ১২·৫ গজ কাপড় ব্যবহার করে। বাঙ্গালার ৫ কোটি লোক প্রত্যেকে ১২·৫ গজ কাপড় কিনিলে বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর ৬২·৫ কোটি গজ কাপড় বিক্রী হয়। কাপড়ের দাম যদি প্রতিগজ ৪ আনা ধরা যায়, তবে এই কাপড়ের জন্য বঙ্গদেশকে বৎসরে প্রায় ১৫·৬২ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই টাকা আমরা বাঙ্গালায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালাতেই রাখিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হইতেছে না। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর কাপড়ের কল বর্ত্তমানে ৩টি মাত্র। সেগুলিতে উৎপন্ন কাপড়ের বার্ষিক মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বঙ্গলক্ষ্মী	২৮	লক্ষ টাকা।
চাকেশ্বরী	১১	"
মোহিনী	১৩	"

অর্থাৎ বাঙ্গালার লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালার জন্য প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় ১৫·৬২ কোটি টাকার কাপড়ের মধ্যে মাত্র প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার কাপড় বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর কলে প্রস্তুত হয়।

ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, বস্ত্র-বিনিময়ে বৎসর বৎসর যে কোটি কোটি টাকা বঙ্গদেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাতেই বঙ্গদেশ পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে—বাঙ্গালার দারিদ্র্য-সমস্যা-বৃদ্ধির তাহা অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ এই কারণ দূর করা অসম্ভব নহে, পরন্তু সহজসাধ্য। পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশেই এত বস্ত্র উৎপন্ন হইত যে, দেশের লোকের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াও বিদেশে বস্ত্র রপ্তানি করিয়া বাঙ্গালার তন্তুবায় ও ব্যবসায়ী সমবায় এক সঙ্গে নানা শ্রেণীর লোক তাহাতে অর্জ্জন করিতে পারিত। এই বাঙ্গালার মসলিন এক দিন রোমের সম্রাট্‌গণের অঙ্গ আবৃত করিত এবং বিদেশে এ দেশের বস্ত্রের বিশেষ আদর ছিল। ১৫৭৭ সনেও মালদহ হইতে শেখ ভিক নামক এক ব্যবসায়ী-ও আরও মালদাহী কাপড় পারস্য উপসাগরের পথে কুশিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিলেন। আজ আজ বঙ্গদেশের কোন না কোন জিলায় দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট লাগিয়াই আছে; আর সকল জিলাতেই লোক দারিদ্র্যহেতু পুষ্টিকর আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দারিদ্র্য-সঞ্জাত নানা রোগে কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। সে কালে বাঙ্গালা "স্বর্ণপ্রসূ" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তখন

বাঙ্গালার যন্ত্রশিল্প ও তাহার কৃষিকার্য্যাদির সমন্বয়ে লোক সমৃদ্ধ হইত। আজ বাঙ্গালার সেই সমৃদ্ধ অবস্থা স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। বাঙ্গালী আজ নিরন্ন—বৃত্তির অভাবে দীন—"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ"।

কিসে এই অবস্থার প্রতীকার করা যায়? প্রতিকারোপায় চিন্তা করিলে বুঝা যায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায় হইতে পারে না। আর এই সব শিল্পের মধ্যে যন্ত্রশিল্প সর্ব্বপ্রধান। কারণ এই শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতাও বাঙ্গালাই মিলিবে। অন্যান্য শিল্পে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ভিন্ন প্রদেশে ও দেশে যাইতে হয়। যে পাট বাঙ্গালার নিজস্ব তাহাও বিদেশে বিক্রীত হয়, স্বদেশে যে প্রদেশে কলসা পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন পাবুরিয়া ও বিদেশে বিক্রী হয় এবং সেই সব স্থানে বিক্রয়ের অন্যতার কলসার ব্যবসা আজ শ্রীহীন। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের পণ্যের ক্রেতা স্বদেশেই মিলিবে। বোম্বাই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিয়া কত লাভবান হইয়াছে তাহা বাঙ্গালার দরিদ্র অধিবাসীদিগের সহিত বোম্বাইয়ের অধিবাসীদিগের অবস্থার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে বৎসরে ১৪·২৬ কোটি টাকার কাপড় আমদানি বন্ধ করিয়া সেই টাকা ঘরে রাখিতে পারে। তাহাতে বাঙ্গালা আবার "সোনার বাঙ্গালা" হইতে পারে, বাঙ্গালী আবার সবল সুস্থ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে ভারতে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে।

ভারতীয় যন্ত্রশিল্পের অভ্যুদয়ের পর হইতে ১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড়েরই একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল বলা যায়। তাহার পর বোম্বাইয়ে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ সনে বোম্বাইয়ে মোট ৩৭টি কল ছিল। সেই সময় হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের ও ভারতের অন্যান্য স্থানের কাপড়ের কলের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একটা মোটামুটী হিসাব দিলে মোট উন্নতির পরিমাণ পরিমাপ করা যাইতে পারে। এই হিসাব দেখিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বদেশে বাঙ্গালীর কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩টীর অধিক নহে, এবং সেজন্য বাঙ্গালীর লজ্জিত হওয়া উচিত।

	বোম্বাই সহরে	ভারতের অন্যত্র
সন	কল	কল
১৮৮৩	৩৭	৩১
১৮৮৮	৫০	৪৯
১৮৯৩	৫৬	৬৭
১৮৯৮	৭৪	৯০
১৯০৩	৭৭	১০৬
১৯০৮	৭৯	১৪৪
১৯১৩	৮১	১৫৯
১৯১৮	৮৪	১৬৫
১৯২৩	৭৯	১৯৫

ইহার পর কয় বৎসরে কলে তাঁত ও টেকোর সংখ্যা কিরূপ ছিল দেখা যাউক :—

সন	বোম্বাইয়ে		ভারতের অন্যত্র	
	তাঁত	টেকো	তাঁত	টেকো
১৮৮৩	১১,৯৮৫	১,১১০,৮৬৬	৪,১৭৭	৭,২৮,০৪৫
১৯০০	২১,২৭৪	২,৪১৩,০৮৪	১৮,০৮৫	২০,৩৪,২৯৬
১৯১৫	৪২,৬৬৯	৩,৭৪৫,৯১৯	৪৪,৯০৪	৩৬,০১,৫০০
১৯২৫	৭০,৭৫৩	৩,৩৭৮,০৬৫	৭৭,৮৫৯	৪৭,১৫,৪০৬

ভারতবর্ষে কল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম প্রথম উৎপন্ন সুতার ৪ আনা মাত্র দেশীয় কলে কাপড় বুনিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। আর ৪ আনা হাতের তাঁতের জন্য বিক্রী হইত। অবশিষ্ট ৮ আনা অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ চীন, আফ্রিকা, পারস্য, মিসর প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দেও উৎপন্ন সুতার প্রায় অর্দ্ধাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। কেন না, তখন এদেশে দেশীয় কলের কাপড়ের তত কাটতি হয় নাই। সেই বৎসর দেশীয় কলে প্রস্তুত ২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে ১১ কোটি ২০ লক্ষ গজ বিদেশে বিক্রী হইয়াছিল।

তাহার পর হইতে ভারতে দেশীয় কলের কাপড়ের আদর বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে বিদেশী কাপড়ের আমদানি কমিতেছে এবং দেশীয় কলের কাপড় বিদেশী কাপড়ের স্থান অধিকার করিয়া দেশের টাকা

দেশে রাখিবার কাজে সাহায্য করিতেছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাবে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

বিভিন্ন কাপড়	১৯০০ খৃষ্টাব্দে	১৯২৪ খৃষ্টাব্দে
দেশী কলের	শত করা ১ ভাগ	শত করা ৪২ ভাগ
তাঁতের কাপড়	„ „ ২৭ ভাগ	২৮ ভাগ
বিদেশী কাপড়	„ „ ৭৪ „	৩০ ভাগ

তবেই দেখা যাইতেছে, ২৫ বৎসরে দেশী কলের কাপড়ের ব্যবহার যেমন প্রায় ৫ গুণ বাড়িয়াছে বিদেশী কাপড়ের আমদানি তেমনই অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে।

ইহাতে দেশের কত উপকার হইয়াছে, ধনরক্ষার কত সাহায্য হইয়াছে সহজেই তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। এই কার্য্য প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। যখন আমরা মনে করি বিদেশ হইতে আমাদের প্রয়োজনের শতকরা ৩০ ভাগের জন্য যে কাপড় আমদানি হয়, তাহারই মূল্য ৬৪ কোটি টাকা, তখন বুঝিতে পারা যায়, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই ২৫ বৎসরে কত কোটি টাকা এদেশ হইতে চলিয়া যাইত। সেই টাকা দেশে থাকায় দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আজ আর ভারতবর্ষকে বিদেশে কাপড় বা সুতা বিক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। ভারতের ৩২ কোটি লোক দেশী কাপড় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক; তাহাদের প্রয়োজন মিটানই দেশী কলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই সময় বাঙ্গালা কি করিতেছে? বাঙ্গালা এই সুযোগের সুবিধা লইতে পারে নাই। কেন না, বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বলিতে ৩টী মাত্র কল আছে এবং সেই ৩টীতে যে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহার বার্ষিক মূল্য ৫২ লক্ষ টাকার অধিক নহে।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে বাঙ্গালার জন্য বৎসরে ৬২·৫ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। যদি প্রতি কলের জন্য ৪০টী টেকো থাকে, তবে প্রতি তাঁতে দৈনিক ৫০ গজ কাপড় প্রস্তুত করা যায়। সেই হিসাব ধরিলে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টেকো ও ৩৯ হাজার তাঁত হইলে বাঙ্গালার আবশ্যক কাপড় সরবরাহ করা যায়। অবশ্য কিছু কাপড় হাতের তাঁতে উৎপন্ন হয়। হাতের তাঁতের কাপড়ে যেরূপ নক্সা পাড় ও কমনীয়তা সম্ভব—কলের কাপড়ে তাহা সম্ভব নহে। সেই জন্যই হাতের তাঁত বিলুপ্ত হয় নাই। তবে টেকোর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৬০ হাজারই হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর কল কয়টীতে কেবল ৩ হাজার ৮ শত ৪০ খানি তাঁত ও ৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শত ৪৮টী টেকো চলিতেছে। সুতরাং ৫ শত তাঁত ও ২০ হাজার টেকো লইয়া যদি একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে প্রভূত লাভ অনিবার্য্য।

বর্ত্তমানে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বোম্বাইয়ে কল প্রতিষ্ঠার সময় তাহার অভাবই ছিল। এই বাঙ্গালায় পরিকল্পিত ও প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের কলগুলিকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। অথচ আজ বাঙ্গালাই যন্ত্রশিল্পে অন্যান্য প্রদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে! দিল্লীতে প্রথম্নীর উদ্বোধন-কালে লর্ড কার্জ্জন যথার্থই বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় যান যেমন গো-যানের স্থান অধিকার করিয়াছে, কলকারখানা তেমনই কুটীর-শিল্পের স্থান অধিকার করিবেই। পৃথিবীর সব দেশে যাহা হইয়াছে বাঙ্গালায় তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কাজেই বাঙ্গালায়ও চরকা এবং তাঁতের দ্বারা বিদেশী যন্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। আমরা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে যত বিলম্ব করিব, ততই দরিদ্র হইয়া পড়িব; কারণ ততদিন বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা বাঙ্গালা হইতে বাহির হইয়া যাইবে। আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষে ১৯২২ সনে ৪৯টী, ১৯২৩ সনে ৪১টী, ১৯২৪ সনে ৪৭টী ও ১৯২৫ সনে ৪০টী নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, যখন ভারতের আর সকল প্রদেশ যন্ত্রশিল্পের দ্বারা লাভবান হইবার চেষ্টা করিয়াছে, কেবল বাঙ্গালাই তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে—বাঙ্গালাই তাহার দারিদ্র্য-বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে—বাঙ্গালী অবসের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

বাঙ্গালায় কাপড়ের কাজ কিরূপে চলিবে, তাহা বিবেচনা করিলে কলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইবে।

বোম্বাইয়ের কলগুলি প্রথমে প্রধানতঃ সুতা প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন দেশী কলের কাপড়ের তেমন আদর ছিল না—কাটতি সামান্য ছিল। এ দেশে উৎপন্ন বস্ত্রের উপর যে শুল্ক ছিল, তাহাও ১৯২৩ সনের পূর্ব্বে প্রত্যাহৃত হয় নাই। সে জন্যও বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন বঙ্গলক্ষ্মী চাকেশ্বরী ও মোহিনী মিলের কাপড়ের আদর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালী বাঙ্গালার কলে বাঙ্গালীর প্রস্তুত কাপড় পাইলে অন্য কাপড় কিনিতে চাহে না। আমদানি কাপড়ের উপর এখন শতকরা ১১ টাকা হিসাবে শুল্কও দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করিতেছে।

কাপড়ের কলের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে সর্ব্বপ্রধান ব্যয় তুলার। সেকালে বঙ্গদেশে তুলা উৎপন্ন হইত। যে সুতায় ঢাকাই মসলিনের মত বস্ত্র বয়ন করা হইত সে সুতার তুলাও বাঙ্গালার। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সুতরাং যতদিন আবার বাঙ্গালায় তুলার চাষ বিস্তৃতভাবে না হইবে, ততদিন বাঙ্গালাকে অন্য স্থান হইতে তুলা আমদানি করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার যে বিশেষ অসুবিধা আছে তাহাও নহে। কারণ বিলাতে বা জাপানে তুলা জন্মে না; বোম্বাইয়ের কলওয়ালা-দিগকেও প্রয়োজনানুসারে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, আফ্রিকা, মার্কিণ প্রভৃতি স্থান ও দেশ হইতে তুলা কিনিতে হয়।

খাতের দিকে তুলার পর অন্যান্য বাবদে খরচ :—

(১) কয়লা বা বিদ্যুৎ,
(২) কলকারখানার জন্য আবশ্যক নানা দ্রব্য,
(৩) কলকব্জার সংস্কার ও সংরক্ষণ,
(৪) পারিশ্রমিক,
(৫) ট্যাক্স,
(৬) কর্ম্মচারীদিগের বেতন,
(৭) বীমা,
(৮) কারখানা-বাড়ীর সংস্কার,
(৯) বিবিধ।

এতদ্ভিন্ন কেবল ম্যানেজিং এজেন্টস বা সেক্রেটারীকে প্রায় অর্থ ধরিতে হয়। প্রস্তাবিত কলের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টস মাসিক ন্যূনকল্পে এক হাজার টাকা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর শতকরা ৩ টাকা কমিশন মাত্র লইয়া কাজ করিবেন। বাঙ্গালার কোন কোন মিলের এজেন্টরা শতকরা ৪।৫ টাকা এবং আমেদাবাদের অধিকাংশ মিলের এজেন্টরা ৩½ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকেন।

কয়লা বা বিদ্যুতের জন্য ব্যয় বাঙ্গালায় কম। বোম্বাই ও আমেদাবাদে কয়লার রেলভাড়া ও পথে নষ্ট কয়লার পরিমাণ অধিক। তাহার হিসাব এইরূপ :—

	বোম্বাইয়ে (১টন কয়লা)	বাঙ্গালায় (১টন কয়লা)
খনি হইতে কয়লার মূল্য	৫৲ টাকা	৫৲ টাকা
রেলভাড়া	১২৲ ”	৩৲
নষ্ট কয়লার দাম	১·৭ ”	·৮
	মোট ১৮·৭ টাকা	মোট ৮·৮ টাকা

অর্থাৎ বাঙ্গালায় কয়লার দাম বোম্বাই বা আমেদাবাদের তুলনায় অর্দ্ধেক। বোম্বাইয়ে প্রতিদিন প্রতি তাঁতের খরচ ৪৫০ পাই ও টেকো. প্রতি খরচ ৮·৩০ পাই; আর মোট খরচ প্রতি তাঁতে ৫১৪ পাই। বোম্বাইয়ে কয়লার খরচ দৈনিক ১৪৩৮০ পাই ধরিতে হয়। বাঙ্গালায় এই খরচ মাত্র ৭১·৯০ পাই।

বোম্বাইয়ে কলগুলি সহরের মধ্যে অবস্থিত থাকায় তাহাদের স্থানীয় টেক্সের পরিমাণও অধিক হয়। কিন্তু অন্যান্য ব্যয় উভয় প্রদেশে সমান ধরিলেও বাঙ্গালায় বস্ত্রোৎপাদনের ব্যয় মোট শতকরা ১০৲ টাকা কম হইবে। আর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় কাপড় আনিতে যে ভাড়া পড়ে তাহাও লাগিবে না।

আমরা দেখিতে পাই, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের ৫০টি কাপড়ের কলে নিম্নলিখিতরূপ লাভের অংশ বণ্টন করা হইয়াছে :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে	শতকরা ৬০ টাকা
১৯২২ ”	” ” ৩১ ”
১৯২৩ ”	১২৷০ টাকা

(এই বৎসর আমেদাবাদের কলে ধর্ম্মঘট হয়)

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে　　শতকরা ১২৷৷০ টাকা
১৯২৫ "　　" " ১৪৷৷০ "

অর্থাৎ ৪ বৎসর আমেদাবাদের কলের অংশীদাররা গড়ে শতকরা ২৬ টাকা হিসাবে লাভ পাইয়াছেন।

এই কয়বৎসরে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের অংশীদাররা নিম্নলিখিতরূপ লাভ পাইয়াছেন :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে　　শতকরা ৩৫ টাকা
১৯২২ "　　" " ৩০ "
১৯২৩
১৯২৪
১৯২৫　　১০ "

শেষ ২ বৎসর যে লাভের হার কম হইয়াছিল, তাহার কারণ, মিলের পরিচালকরা বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া মিলের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কলগুলির হিসাব-নিকাশে দেখা যায়—১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৪২টি কল সমন্বিত ৩৪টি কোম্পানী শতকরা ৪০ টাকা হিসাবে, ১৪টি কল সমন্বিত ১০টি কোম্পানী শতকরা ১শত টাকা হিসাবে ও ৬২টি কল শতকরা ২ শত টাকা হিসাবে লাভের অংশ বণ্টন করিয়াছেন।

এই সময় বোম্বাইয়ে শ্রমিক-চাঞ্চল্যে কলের ক্ষতি হয়—সময় সময় কল বন্ধ রাখিতে হয়। তথাপি ৪৪টি কলের গড় হিসাবে অংশীদাররা শতকরা ১৪ টাকার অধিক লাভ পাইয়াছেন। শেষ ২ বৎসর যেসকল কারণে বোম্বাইয়ের কলে লাভ কম হইয়াছিল, নিম্নে সেসকলের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি,
(২) চড়া হিসাবে স্থানীয় টেক্স প্রদান,
(৩) কয়লার ও জলের মূল্যবৃদ্ধি,
(৪) আমেদাবাদ প্রভৃতি তুলার চাষের স্থানের নিকটবর্ত্তী কলের প্রতিযোগিতা,
(৫) জাপানের অসম প্রতিযোগিতা,
(৬) যে সময় পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইতেছিল সেই সময় টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স হওয়া,
(৭) অন্যায়রূপে মূলধন বৃদ্ধি।

এখনও বোম্বাইয়ে শ্রমিক-চাঞ্চল্যের অবসান হয় নাই, সুতরাং পরবর্ত্তী কালের লাভের হিসাব দেখিয়া বস্ত্র-শিল্পের প্রকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা বিচার করিলে তাহা সঙ্গত হইবে না।

সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত টারিফ বোর্ড বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন—সকল ব্যবসায়ই উন্নতি ও অবনতির জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের অবনত অবস্থাও স্থায়ী নহে এবং শীঘ্রই তাহার অবসান হইবে। বোর্ড মত প্রকাশ করেন, বস্ত্রশিল্পের অবস্থা যে কেবল বোম্বাইয়েই অবনতি-জ্ঞাপক তাহার কারণ, বোম্বাইয়ে শ্রমিক-চাঞ্চল্য অন্যান্য কেন্দ্র অপেক্ষা তীব্র হইয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের কলগুলির অবস্থা মন্দ ছিল না এবং ৪০টি কলের গড় ধরিলে বৎসরে সাড়ে ১২ টাকা হইতে সাড়ে ১৪ টাকা হিসাবে লাভও বণ্টন করা হইয়াছে।

একদিকে এই মত, আর একদিকে ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সমিতির সভাপতি সার আর্থেষ্ট টমসনের স্পষ্ট উক্তি। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের ও জাপানের কলগুলির প্রতিযোগিতাই বিলাতের কাপড়ের কলসমূহকে বিশেষ ভাবে ভোগ করিতে হইয়াছে। বিলাতের বস্ত্রশিল্পের যে সব সুবিধা নাই, এই দুই দেশের শিল্পের সে সব সুবিধা আছে। পণ্যের উপকরণ (তুলা) তাহাদিগের নিকটে; তাহাদিগের দেশের শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিক অল্প; তাহাদিগের উৎপন্ন মালের ক্রেতারা নিকটে অবস্থিত। তাহাদিগের এই সব সুবিধা বিলাতের পক্ষে প্রতিযোগিতায় সাফল্য-লাভের অন্তরায় হয়; আবার আর্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে লোক স্বল্পমূল্যের পণ্যের পক্ষপাতী হইয়াছে।

এদেশে উৎপন্ন পণ্য এই দেশেই বিক্রীত হওয়ায় যে কত সুবিধা হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রেতারা কিরূপ মালের আদর করিবে, তাহা জানিতে বিলম্ব হয় না। আর মাল দূর হইতে আনিবার ব্যয়ও থাকে না। কেবল বিলাত কেন, জাপান—এমন কি

বোম্বাই ও আমেদাবাদকেও বাঙ্গালায় মাল পাঠাইয়া বিক্রয় করিতে হয়। বাঙ্গালার কলে উৎপন্ন বস্ত্র সহজেই সে সকলের স্থান অধিকার করিতে পারে।

এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বাঙ্গালায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে কাপড়ের মূল্য হ্রাস হয় এবং অংশীদারেরা বিশেষরূপে লাভবান হইতে পারেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালায় যখন তুলা উৎপন্ন হয় না, তখন বাঙ্গালায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে লাভ হইবে না। এ কথা ভিত্তিহীন। কারণ, বিলাতে বা জাপানেও তুলা উৎপন্ন হয় না। সে সকল দেশের কলের জন্য ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে তুলা লইয়া যাইতে হয়। অথচ সে সব দেশের কলেও লাভ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, কাপড়ের কলের কাজ সম্বন্ধে শিক্ষা করা যায় না এবং বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সে কাজে শিক্ষিত লোক নাই। এই উক্তিও তুল্যরূপে ভিত্তিহীন। বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর বিশ্বাস আছে। যে বাঙ্গালা জ্ঞানে বিজ্ঞানে নূতন আলোক বিস্তার করিয়াছে, সেই বাঙ্গালায় যে কাপড়ের কলের কাজ শিখিবার উপযুক্ত লোক মিলে না, ইহা বিশ্বাস নহে। বাঙ্গালীরা লক্ষ্মী ও মোহিনী মিল পরিচালনা করিতেছেন। আমেদাবাদের কোন কোন কলেও বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার আছেন। কেশোরাম কটন মিলের এঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ম্যানেজার বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় কাপড়ের কলে যে প্রভূত লাভ অনিবার্য্য, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। এ কথা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, ব্যবসাবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরিচালিত করিলে বাঙ্গালার কাপড়ের কলে বোম্বাইয়ের ও আমেদাবাদের কল অপেক্ষা অধিক লাভ অবশ্যম্ভাবী। তাহার কারণঃ—

(১) বাঙ্গালার আর্দ্রতা বোম্বাই ও আমেদাবাদে নাই। সেইজন্য বোম্বাইয়ে ও আমেদাবাদে বৎসরের অনেক সময় কলের ঘরে বাতাসে কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতা সঞ্চার করিতে হয়। বাঙ্গালার জলবায়ু বয়ন-শিল্পের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক।

(২) রেলভাড়ার অল্পতাহেতু বোম্বাই ও আমেদাবাদ অপেক্ষা বাঙ্গালায় কয়লা সুলভ। সেইজন্য বাঙ্গালার কলে কয়লার বাবদে খরচ কমিয়া যায়।

(৩) বাঙ্গালার বস্ত্র বাঙ্গালাতেই বিক্রয় হইয়া যাইবে। বোম্বাই বা আমেদাবাদ হইতে যে কাপড় বিক্রয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, রেলভাড়ায় তাহার বিক্রয়-মূল্য বাড়িয়া যায়।

(৪) আমেদাবাদের কলের জন্য বোম্বাই হইতে এবং বোম্বাইয়ের কলের জন্য তুলার উৎপাদন-স্থান হইতে তুলা আমদানি করিতে হয়। উভয়ক্ষেত্রেই রেলভাড়া পড়ে। বাঙ্গালা সে বিষয়ে আমেদাবাদ বা বোম্বাই অপেক্ষা অসুবিধা ভোগ করে না।

(৫) শিল্প কমিশনে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার শ্রমিক আমেদাবাদের ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক অপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতার শ্রমিকের মজুরি অল্প।

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে অগ্রসর হয়। দেশ যদি দারিদ্র্যের পঙ্কে পতিত থাকে, তবে রাজনৈতিক অধিকার কে সম্ভোগ করিবে? আজ বাঙ্গালার যে দুর্দ্দশা তাহার মূল কারণ দারিদ্র্য। শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত সে দুর্দ্দশা দূর করা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা দেখাইয়াছি, বঙ্গদেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে কলের অংশীদারেরা যেমন লাভবান হইবেন,—সমগ্র দেশ তেমনই লাভবান হইবে। দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে কাপড় পাইবে এবং অনেক টাকা দেশেই রক্ষিত হইবে। সেই অর্থে দেশে অন্যান্য শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নতি হয় নাই। যদি আমরা বর্ত্তমান সময়েও সুযোগ ত্যাগ করি, তবে আমাদিগকে আবার হতাশ হইয়া দীর্ঘকালের জন্য দুঃখভোগ করিতে হইবে। যাহারা লজ্জা-নিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষী, তাহারা কিরূপে স্বরাজ লাভের আশা করিতে পারে? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

পক্ষে অগ্রণী হইয়া দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার ফলে কেবল যে বঙ্গদেশেই বঙ্গদেশের জন্য আবশ্যক বস্ত্র উৎপন্ন করা যাইবে তাহা নহে, পরন্তু বাঙ্গালায় আবার তুলার চাষ হইবে এবং তাহাতে কৃষক-কুলের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত লম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তদুপরি অন্নাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ লোককে ব্যথিত করিতেছে। দেশের শিক্ষিত যুবকদিগের মুখ বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অভাবের ফলে অসন্তোষ উদ্ভূত হইয়া সমগ্র সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করিতেছে।

আজ বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র শিক্ষিত যুবক চাকরীর অভাবে অন্নার্জ্জনের পথ না পাইয়া অমূল্য মানবজীবন অসার ও ভারমাত্র বিবেচনা করিতেছে, এবং সে ভার ত্যাগ করিতেও অগ্রসর হইতেছে। আমাদিগের পক্ষে সেনা-বিভাগের দুর্গদ্বার রুদ্ধ, আমাদিগের নৌবহর নাই, সরকারী চাকরীর সংখ্যা অল্প। কেবল আমরা আমাদিগের চেষ্টায় শিল্প-ব্যবসায়ের পথে অগ্রসর হইতে পারি। সে পথ আমরা কেন ত্যাগ করিব? কেন আমাদিগের লজ্জা নিবারণের ভার অন্য দেশের বা অন্য প্রদেশের উপর দিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিব? একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙ্গালার বস্ত্র-সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে, শত শত শিক্ষিত যুবক ও সহস্র সহস্র শ্রমিক কাজ পাইবে, বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ টাকা বাঙ্গালায় থাকিবে। দেশের নেতৃগণ, দেশের কল্যাণকামীরা কি এই সুযোগ ত্যাগ করিবেন?

৫ শত তাঁতের ও ১৮ হাজার টেকোর একটি কল প্রতিষ্ঠা করিতে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন। তাঁত ও টেকোর সংখ্যা কম করিলে কল পরিচালনব্যয় প্রায় সমান হয় বলিয়া লাভ কম হয়। ৫ শত তাঁতের ও ১৮ হাজার টেকোর কলের আয়ব্যয় এইরূপ হইবে :—

মূলধন (ব্যয়)

জমি ও কারখানা	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
১৮ হাজার টেকো ও সরঞ্জাম	৪ লক্ষ টাকা
৫ শত তাঁত ও সরঞ্জাম	২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
এঞ্জিন, বয়লার প্রভৃতি	৩ লক্ষ টাকা
চালাইবার খরচ	১১ লক্ষ টাকা
	মোট ২৫ লক্ষ টাকা

বার্ষিক আয়

সরু ও মাঝারি সুতার জন্য

৫ শত তাঁতে	১৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা
মোটা সুতার তাঁতে	২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
	মোট ২২ লক্ষ ১১ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা

বার্ষিক ব্যয়

তুলা	৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯ শত ৩৬ টাকা
সুতা প্রস্তুত বিভাগে	২ লক্ষ ৮১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা
বয়ন বিভাগে	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
	মোট ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার ১ শত ৮৬ টাকা
মোট লাভ (বার্ষিক)	৬ লক্ষ ২০ হাজার ৫ শত ৬৪ টাকা

শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে বাড়ীর ও ৫ টাকা হিসাবে কলের ঘাটতি খাতে বাদ দিলে এবং মজুত তহবিল রাখিলেও বার্ষিক লাভের অংশ হিসাবে অনায়াসেই শতকরা ২০ টাকা দেওয়া যাইবে, আশা করা যায়।

আমরা দেখাইয়াছি, বঙ্গলক্ষ্মী এবং আহমেদাবাদের ও বোম্বাইয়ের কলগুলি অনেক উচ্চ হারে লাভ করিতে পারিয়াছে। কাজেই সম্ভাবিত লাভের বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট্ পরিশ্রমের তুলনায় অতি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করিতে ও কাজের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাহাতে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার অংশতঃ সমাধান হয়, যাহাতে দেশে বহু লোক কাজ পায়, যাহাতে নবোদ্যমে আরও শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কৃত হয় সেই সকল কারণে বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে অন্ততঃ আর একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা

করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। অন্ন সুদের কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া বা বন্ধকী ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া মামলা কিনিয়া অতিরিক্ত হওয়া অপেক্ষা এই কার্য্যে যে কত অধিক লাভ আছে আমরা বিশদরূপে দেখাইয়াছি। এখন ধনী, মধ্যবিত্ত, জমীদার, ব্যবসায়ী সকলে যে যাহার সাধ্যানুসারে এই কার্য্যে সহায় হইয়া দেশের উপকার ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের লাভের উপায় করুন। মফঃস্বলের যে সকল ব্যাঙ্ক বা লোন আফিস—কলিকাতার যে সকল জীবনবীমা কোম্পানী সঞ্চিত অর্থ খাটাইয়া লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রণী হউন। দেশ আজ নিঃস্ব। তাহাকে সমৃদ্ধ করিবার উপায় সম্মুখে রহিয়াছে। সেই উপায় অবলম্বন করিলে দেশের ও আপনার উপকার অনিবার্য্য। দেশের এই আহ্বান যেন ব্যর্থ না হয়।

কারখানা-শিল্প বনাম কুটীর-শিল্প

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য প্রচুর পরিমাণে থাকলেও, মস্তিষ্কশালী নেতা এবং বুদ্ধিমান ও কষ্টসহিষ্ণু মজুরের অভাব না থাকলেও ভারত আজ জগতের দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম। গুটি-কয়েক সহর বাদ দিলে এই দেশ এখনও লক্ষ লক্ষ সেকেলে ও প্রাণহীন গ্রামের সমষ্টিমাত্র। ভারতের শতকরা ৭২ জন কৃষিজীবী, শতকরা মাত্র ১১ জন শিল্পজীবী। কৃষির জন্য যত লোক দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক নিযুক্ত থাকার দরুণ তারা ক'রে খেতে পায় না। ভারতীয়ের গড়ে জীবনের আশা হচ্ছে মাত্র ২৩।২৩ বছর। অন্য দেশে বেশীর ভাগ লোক মরে বার্দ্ধক্যে, এখানে বেশীর ভাগ মরে শৈশবে, না হয় পরিণত বয়সে—বার্দ্ধক্য অবধি কম লোকই পৌঁছায়। শতকরা ৭০ হতে ৮৪ ভাগ লোক যে সমস্ত কারণে মরে, তা নিবারণ করা সম্ভব, অথচ টাকা নেই ব'লে নিবারণ করা সম্ভব হয় না। শতকরা ৮৪ ভাগ ভারতীয়ের জীবনী শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। আমাদের দেশের সকলেই প্রায় একমত যে শিল্পোন্নতির সাহায্যে ধনবৃদ্ধি না হ'লে এই দুরবস্থার প্রতীকার হবে না। কিন্তু শিল্পোন্নতির মানে কি কুটীর-শিল্পের উন্নতি, না, কারখানা শিল্পের উন্নতি? আমাদের মতে কুটীর-শিল্পের যতই উন্নতি করা হোক্ না কেন, কারখানা-শিল্পকে প্রাণের সঙ্গে সাদরে বরণ ক'রে না নিলে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতীকারের জন্য যে আর্থিক উন্নতির দরকার, তা কখনও সম্ভব হবে না। অনেকেই কিন্তু কুটীর-শিল্পকেই বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের পক্ষের যুক্তি আলোচনা ক'রে কারখানা-শিল্পের সাহায্যে ভারত কতদূর উন্নত হ'তে পারে তাই দেখাবো।

কুটীর-শিল্পের পক্ষে কয়েকটী যুক্তি

যাঁরা কুটীর-শিল্পের পক্ষপাতী, তাঁদের যুক্তিগুলা প্রধানতঃ এইরূপ :—

(১) ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতের সভ্যতা প্রধানতঃ গ্রাম্য সভ্যতা, ভারতের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেতে পারে এমন ধরণের শিল্পই এদেশে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ভারতের ইতিহাস ও আবহাওয়া কৃষি আর কুটীর-শিল্পের সম্মিলনে যে আর্থিক প্রণালী গড়েছে সেই আর্থিক প্রণালীকে ধ্বংস হতে দেওয়া উচিত নয়, তা'হলে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে। এই যুক্তির উত্তরে এই কথা বলা চলে যে, কুটীর-শিল্প ভারতীয় সভ্যতারই একচেটে আবিষ্কার নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব হওয়ার পূর্ব্বে ভারতীয় ধরণের কুটীর-শিল্প জগতের সর্ব্বত্রই ছিল। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও তখন ভারতের মতই চরকায় সূতা কাটতো, হাতের তাঁতে কাপড় বুনতো, সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে জুতা তৈরী করতো, ছোট ছোট ঘরে কামারেরা লোহা পিটে

সাধারণ ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র গড়্‌তো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ বিলাতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অক্লান্ত চেষ্টা আর উদ্যমের ফলে ক্রমে ক্রমে নানারকম যন্ত্রের উদ্ভাবন হলো, প্রাকৃতিক শক্তিকে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কাজে লাগিয়ে বিপুল পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হলো,—নানাকারণে ভারত পুনিয়ে ছিল বলেই ভারতবর্ষে ঐ সমস্তের উদ্ভব হ'লো না। তারপর ফ্রান্স, জার্ম্মানি, আমেরিকা, এমন কি প্রাচ্যের জাত-থেকো জাপানও ঐ শিল্প-বিপ্লবকে বরণ ক'রে নিয়ে একদা পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কাজেই কেবল ভারতীয় মাথা থেকে কারখানা-শিল্প বেরোয়নি ব'লেই কুটীর-শিল্প ভারতীয় সভ্যতারই জিনিষ আর কারখানা-শিল্প পাশ্চাত্য সভ্যতারই যোগ্য এই কথা বললে, ঐতিহাসিক অযোগ্যতারই পরিচয় দেওয়া হবে। কুটীর-শিল্পই হোক্ আর কারখানা-শিল্পই হোক্, শিল্প সকল সময়ই একটা ধনোৎপাদনের প্রণালী মাত্র, কোন শিল্পের উপরই প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ব'লে বিশেষ কোন ছাপ মারা নেই। ভারতীয় সভ্যতার যদিই বা কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, উৎপাদনের প্রণালী বদ্‌লালে, প্রাচীন প্রণালী ত্যাগ ক'রে অধিকতর উন্নত প্রণালী অবলম্বন করলেই যে সে সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে একথা মনে করবারও কোন কারণ নেই।

(২) পাশ্চাত্য আর্থিক প্রণালী এরূপ কদর্য্য যে, সেখানকার অনকয়েক লোক অত্যন্ত ধনী হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক নিতান্ত দরিদ্র ব'লে ধনীদের ক্রীতদাসের মত খাটছে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন আর্থিক প্রণালীতে অনকয়েক লোকের ধনী হবার সম্ভাবনা ছিল না। যাতে আর্থিক সাম্য বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা কেবল ভারতীয় আর্থিক প্রণালীতেই আছে।

এই ধরণের যুক্তি আমাদের মুখে সাজে না। ধন বিষয়ে বিষম অসাম্য পাশ্চাত্য দেশে থাকতে পারে, কিন্তু ভারতের মত দরিদ্রও ত তথায় নেই, ভারতের মত এত অধিকসংখ্যক লোক না খেতে পেয়ে বা একবেলা খেতে পেয়ে ত সেখানে কাটায় না, দুর্ভিক্ষ ত কোন পাশ্চাত্য দেশে হয় ব'লে শোনাই যায় না, না খেতে পেয়ে এত অধিক-সংখ্যক লোক হাজারে হাজারে লাখে লাখে মরছে, এ কথা কোন পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে ত শুনতে পাওয়া যায় না। যতই কেন আমরা পাশ্চাত্য আর্থিক প্রণালীর নিন্দা করি না, তাদের দরিদ্রতমেরাও আমাদের দরিদ্রদের চেয়ে অনেক ভাল খেতে পরতে পেয়ে থাকে। এই ব্যাপার কি ক'রে সম্ভব হ'ল সেই কথাটাই বেশী করে ভাবা দরকার। আর্থিক সাম্য কথাটা শুনতে ভাল বটে, কিন্তু আমাদের দেশে তেমন বিপুল ধনৈশ্বর্য্যই বা কোথায় যে "আর্থিক সাম্য" "আর্থিক সাম্য" ক'রে পাগল হ'তে হবে। পাশ্চাত্যেরা তাদের দেশে ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য দেখে তার উপায়ের জন্য মাথা ঘামাচ্ছে, আমরাও যখন ঐ অবস্থায় আস্‌বো তখন ঐ বিষয়ে চিন্তা করবো। তখন আমরা ভেবে দেখতে পারবো, ভারতীয় আর্থিক প্রণালীতে আর্থিক সাম্য বজায় রাখবার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা, আর তা আধুনিক কলকারখানার যুগে কোন কাজে লাগতে পারে কি না। এখন আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত—কি ক'রে ধনী আর দরিদ্রের পার্থক্য দূর করা যায় তা নয়, কিন্তু কি করে জাতীয় ধনের পরিমাণ বাড়ানো যায়। ভারতের অবস্থা এখন এত শোচনীয় যে, যদি অনকতক লোক ধনীই হয়, তাতে কিছুই আসে যায় না, যদি তার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি করতে পারা যায়।

(৩) কারখানা-শিল্পে মজুরদের সাধারণতঃ কোন কর্তৃত্ব থাকে না, কারখানা-শাসনের ব্যাপারে তাদের কোন হাতই নেই, তারা কেবল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কাজ কলের মত ক'রে যেতেই অভ্যস্ত। কিন্তু কুটীর-শিল্পী সাধারণতঃ স্বাধীন, সে নিজেই ঘরামশলা কেনে, নিজেই একা বা পরিবারবর্গ ও সহকারীদের সাহায্য নিয়ে তার ছোট খাটো যন্ত্রপাতি দিয়ে জিনিষ তৈরী করে, তারপর নিজেই জিনিষ বাজারে পাঠায় বা মহাজনের কাছে বিক্রী করে; লাভলোক-সানের সমস্ত ঝুঁকি তারই থাকে; সে একাই কারখানা-পরিচালক ও মজুর দুয়েরই দায়িত্ব বহন করে।

কারখানার মজুরের তুলনায় কুটীর-শিল্পী অনেকটা স্বাধীন বটে; কিন্তু কুটীর-শিল্পীর স্বাধীনতা-সম্বন্ধীয় এই

যুক্তিটার উপর খুব বেশী জোর দেওয়া চলে না। আজকাল ইয়োরামেরিকার মজুরেরা কারখানার ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব আরো কায়েম করতে চেষ্টা করছে এবং অনেক জায়গায় কৃতকার্যও হয়েছে।

অপর দিকে, আমাদের দেশে স্বাধীন কুটীর-শিল্পীরা অনেক জায়গায় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না দেখে মধ্যবিত্তদের দ্বারা ছোট ছোট ফ্যাক্টরী খুলে কুটীর-শিল্পীগুলাকে বাঁচিয়ে রাখবার কথাও হয়েছে (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনের রিপোর্ট—পৃষ্ঠা ১৬৪)। ছোট ছোট ফ্যাক্টরী যদি করা হয়, তা'হলে বড় ফ্যাক্টরীর মজুরদের সঙ্গে ছোট ফ্যাক্টরীর মজুরদের কোন বিশেষ পার্থক্য থাকবেনা। স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা ছোট ফ্যাক্টরীর পরিচালকদেরই থাকবে, তাদের অধীনস্থ মজুরদের থাকবে না। ছোট ফ্যাক্টরীর মজুরদের মনিবের সংস্পর্শে আসা অপেক্ষাকৃত সহজ—এইটুকু মাত্র সুবিধা থাকতে পারে।

(৪) কুটীর-শিল্পের পক্ষে একথাও বলা হ'য়ে থাকে যে, কুটীর-শিল্পীরা হাতের কাজে নিজেদের সৌন্দর্য্যবোধকে ফুটিয়ে তোল্‌বার সুযোগ পায়। ফলে একই সঙ্গে যে সব জিনিষ তৈরী হয়, সেগুলার পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে একটুও পার্থক্য থাকে না, মজুরেরা নিজেদের সৌন্দর্য্যবোধ নিজেদের কাজে ফুটিয়ে তোল্‌বার বা প্রয়োগ করবার সুযোগও পায় না। কিন্তু হাতে তৈরী জিনিষগুলার প্রত্যেকটাকে অন্যগুলা হ'তে পৃথক ধরণে সৃষ্টি করা ও নিজ কল্পনা অনুযায়ী বৈচিত্র্যে পূর্ণ করা সম্ভব। সুতরাং শিল্পকলার দিক্ হতে কুটীর-শিল্পের স্থান অতি উচ্চে।

এ কথার প্রতিবাদ করাই চলে না। এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, শিল্পীরা যত বেশী যন্ত্রপাতি আর প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেবে (আজকাল বাঁচবার জন্য কুটীর-শিল্পীরা তা করতে বাধ্যও হচ্ছে) অর্থাৎ হাতের কাজের অবকাশ যত ক'মে আসবে, ততই কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য দেখাবার সুযোগ কমে যাবে। আর একটা কথাও এই সঙ্গে বলা চলে যে, নিছক সৌন্দর্য্যবোধের তৃপ্তির জন্য জিনিষপত্র ক্রয় করে এরূপ লোকের সংখ্যা সকলদেশেই অতি অল্প। সাধারণতঃ, সকল দেশেই, বিশেষ ক'রে আমাদের মত দরিদ্রের দেশে, লোকে সস্তায় যে কোনই জিনিষই খুঁজে থাকে। মানুষের সৌন্দর্য্যের পিপাসা তৃপ্ত করতে পারে ব'লে কুটীর-শিল্পীরা বেঁচে থাকা অসম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু যে সব জিনিষ সৌন্দর্য্যবোধকেই পরিতৃপ্ত করে, তাদের চাহিদা যত বেশীই হোকনা কেন, কেবল ঐ রকমের জিনিষ তৈরী করার জন্য কুটীর-শিল্পের সাহায্যে দেশব্যাপী আর্থিক উন্নতি সাধন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। শিল্পকলার খাতিরে কুটীর-শিল্প বাঁচবার, এমন কি খাতির যত্নও পাবারও অধিকার পেতে পারে, কিন্তু ওরই খাতিরে দেশের শিল্পোন্নতির সকল প্রকার প্রচেষ্টা কুটীর-শিল্পের দিকেই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হবে, এমন অধিকার কিছুতেই দাবী করতে পারে না।

(৫) আধুনিক আর্থিক পরিবর্ত্তনগুলা অনেকদিন থেকেই ভারতে আরম্ভ হলেও, ভারতের কতকগুলা কুটীর-শিল্পের একেবারে লোপ হলেও, এবং কতকগুলার অবস্থা প্রায় লোপ হবার মত হলেও, অনেকগুলা এখনও বেঁচে আছে। হাতে-বোনা কাপড় ভারতের কাপড়ের বাজারে এখনও বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে—সমস্ত ভারতে যত কাপড়ের দরকার হয়, তার ৩ ভাগের ১ ভাগ বেশী তাঁতেই বোনা হয়। দর্জ্জী, মুচি, কামার, কুমোর, পিতলের বাসন প্রস্তুতকারী, বেণুশিল্পী, তাঁতরা প্রভৃতি অসংখ্য কুটীরশিল্পী ভারতে এখনও আছে। চাষের পর এত অধিকসংখ্যক লোক আর কোন কাজে লিপ্ত নেই। কারখানার মজুরদের (১৫ লক্ষ) চেয়ে কুটীর-শিল্পীদের সংখ্যা (বেশ কোটী) এখনও অনেক বেশী। ছোট ও মাঝারি সহরগুলার বেশীর ভাগ লোকই এখনও কোন না কোন কুটীর-শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন ক'রে থাকে। এইসকল কথা ভেবে অনেকে ব'লে থাকেন যে, কুটীর-শিল্পের যোঝবার শক্তি ত বড় সামান্য নয়, মিলফ্যাক্টরীর এত আক্রমণেও ত' এরা বিলুপ্ত হয় নি, বরং কোন কোন জায়গায় আধুনিক যন্ত্রপাতি বা নতুন ধরণের কারখানায় প্রস্তুত মালমশলার সাহায্য নিয়ে ত' বেশ উন্নতি করছে। কুটীরশিল্পের জীবনীশক্তি যখন এত বেশী, তখন তাদের মতে এই অবক্ষ-প্রায়

কুটীর-শিল্পকেই জাতির এই দুর্দিনে আমাদের প্রধান অবলম্বন ব'লে গ্রহণ করা উচিত।

এই যুক্তির উত্তর অতি সোজা। কুটীর-শিল্পীর সংখ্যার আধিক্য দেখেই তাদের উচিত নয় যে, কুটীরশিল্পের জীবনী-শক্তি অত্যন্ত বেশী। কারখানাশিল্প ভারতের গুটিকয়েক নগরেই কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এখনও দেশ ছেয়ে ফেলতে পারে নি। সেই জন্য, কুটীর-শিল্পীর প্রয়োজনীয়তাও ভারতের কৃষিপ্রধান আর্থিক প্রণালীতে এখনও খুব বেশী রয়েছে ব'লেই, তারা বেঁচে আছে। কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ কুটীরশিল্পী অন্য দেশে যেমন কারখানার মজুরে পরিণত হয়েছে, এখানেও যে তাই হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, সুতরাং তখন আর এই সংখ্যার আধিক্য থাকবে না। এই সঙ্গে একটি লক্ষ্য করা দরকার যে, তাদের সংখ্যার বিপুলতা মানে এই নয় যে, তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই উন্নত। তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক সমৃদ্ধিসম্পন্ন হ'তে পারে, কিন্তু এদের বেশীর ভাগেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ফিস্‌ক্যাল কমিশন তাঁদের রিপোর্টের ১৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, "এদের জীবন আর্থিক জীবনের নিম্নতম স্তরে," এদের মধ্যে অনেকেই মহাজনদের কাছে ঋণে আবদ্ধ, এদের বাড়ীর মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজে অবহেলা ক'রেও উপার্জ্জন বাড়াবার জন্য পুরুষদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়, এদের ছেলেদেরও অল্প বয়স থেকে পৈতৃক ব্যবসাতে ঢুকতে বাধ্য করা হয়, তাদের কোনরকম শিক্ষার বন্দোবস্ত হয় না। কাজেই কুটীরশিল্পীর সংখ্যা দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। বিলাতী কাপড় আর বেশী মিলের কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে তাঁতের কাপড় এত বেশী ব্যবহৃত হয়, কুটীরশিল্পের জীবনীশক্তিই তার একমাত্র কারণ নয়, তার জন্য অনেক কারণও আছে :—(ক) ভারতের কাপড় এত অধিক পরিমাণে দরকার যে, মিলগুলা তত কাপড় যোগাতে পারে না (আরও, বেশী কাপড়ের মিল হ'লে হাতে-বোনা কাপড়ের পরিমাণ কমবার সম্ভাবনা); (খ) ভারতের নানা সামাজিক আচারের জন্য নানা ধরণের কাপড়ের আবশ্যক হয়, প্রত্যেকটীর চাহিদা এত অল্প যে কারখানার সাহায্যে তা উৎপাদন করলে লাভ থাকে না; (গ) তাঁতীরা তাদের জাতব্যবসা সহজে ছাড়তে নারাজ; (ঘ) ফ্যাক্টরীতে বেশী রোজগারের লোভ থাকলেও বাড়ী ছেড়ে দূরে যেতে চায় না বলেই তাঁতীরা এখনও নিজেদের ব্যবসা নিয়ে প'ড়ে আছে। এই কটা কথা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনের রিপোর্টের ১০ পৃষ্ঠায় এবং ওয়াদিয়া ও মোদী প্রণীত "ওয়েলথ্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থের ৪১০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

(৬) কুটীরশিল্পের পক্ষপাতীরা দেখিয়ে থাকেন যে, ইয়োরোপে ত অত কলকারখানা, কিন্তু সেখানে ত কুটীর-শিল্প একেবারে মরে নি, বরং বেশ মোটা সংখ্যার লোকই ইয়োরোপের আধুনিক দেশগুলাতেও কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে।

ইয়োরোপের নানাদেশের কুটীর-শিল্পীর সংখ্যার কোন তুলনা না করলে উহা বেশী মনে হতে পারে, কিন্তু ইয়োরোপের দক্ষিণ ও পূর্বের পশ্চাৎপদ দেশগুলার কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে যে, কারখানার মজুরদের সংখ্যার তুলনায় কুটীর-শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম (জার্ম্মাণিতে ১৯২৫ সনে ২৮ লক্ষ কুটীরশিল্পী ছিল—সমস্ত মজুরের সংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ মাত্র)। তা ছাড়া পরিমাণ-হিসাবে কুটীরশিল্পীদের দ্বারা যন্ত্রোৎপাদন কারখানার মজুরদের তুলনায় ঢের কম একথাও ভুললে চলবে না। ইয়োরোপের মত কারখানা-বহুল দেশেও যে কুটীরশিল্প এখনও একটা স্থান অধিকার ক'রে আছে, তার কয়েকটী বিশেষ কারণও আছে :—(ক) কলকারখানার সাহায্যে একই মাপের ও একই ধরণের জিনিষ প্রস্তুত হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় খাদকদের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করবার প্রয়োজন হয়; সুতরাং খাদকদের সখ বা প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিষগুলাকে পরিবর্ত্তিত করবার জন্য এক শ্রেণীর কারিগরেরও (ফিনিশার, ফিটার প্রভৃতি) আবশ্যক হয়। (খ) বড় বড় কলকারখানা যেখানেই আছে, সেখানেই তার আশে পাশে যেরামতি কাজের জন্য বা বড় বড় কারখানার নিত্য আবশ্যক ছোট খাটো জিনিষ-বিশেষ তৈরী করবার জন্য ছোট খাটো ফ্যাক্টরীও সঙ্গে ওঠে। (গ) সৌন্দর্য্যবোধের পরিতৃপ্তির জন্য সূক্ষ্মকার্য্য-করা

কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিষেরও একটা সীমাবদ্ধ চাহিদা সকল দেশের মত ইয়োরোপেও আছে। সুতরাং এই বড় বড় কলকারখানার যুগেও কুটীরশিল্প যে ইয়োরোপের আধুনিকতম দেশগুলা হতে লুপ্ত হয় নি, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, এবং তারা একেবারে যে কখনও লোপ পাবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কুটীর-শিল্পের উন্নতির নতুন উপায়

কলকারখানার যুগ জগতে প্রথম যখন আরম্ভ হয়, তখন ধনবিজ্ঞানবিদ্‌রা ভেবেছিলেন যে, কুটীরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা জগতে একেবারেই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু পরে দেখা গেল এবং এখনও দেখা যাচ্ছে যে, কারখানা-শিল্পের একাধিপত্য স্থাপন হয়ে উঠ্‌লো না। বরং কারখানা-শিল্পের যুগ আরম্ভ হবার পর এমন কতকগুলি উপায়ের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের সাহায্যে কুটীরশিল্পের বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। সেগুলা হচ্ছে :—(১) বড় বড় কলকারখানা থেকে এখন কতকগুলি ছোট ছোট কল তৈরী হচ্ছে (যেমন সেলাইয়ের কল, বোনবার কল, আখমাড়া কল, সমপেষা কল প্রভৃতি) যাদের সাহায্যে অল্প আয়াসে অধিক উপার্জ্জন করা যেতে পারে; যদি বড় বড় কলকারখানা হতে এরা উৎপন্ন না হ'ত, তা হলে এই কলগুলা এত অল্প খরচে ও এত নিখুঁত ভাবে তৈরী করা সম্ভব হ'ত না; এইখানে কারখানা-শিল্পই কুটীর-শিল্পকে নতুন ভাবে বাঁচতে সাহায্য করছে। (২) কল-কারখানা প্রথম চালানো হয়,—বাষ্পের সাহায্যে; বাষ্পকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ছোট ছোট কেন্দ্রে ছড়িয়ে দিতে খরচ বড় বেশী পড়ে, একই স্থানে কল-কারখানা সব কেন্দ্রীভূত করা হয়, খরচ তত কম পড়ে, সুতরাং বাষ্পের যুগে বড় বড় কলকারখানাই গ'ড়ে উঠ্‌লো। কিন্তু এখন, কুটীরশিল্পীদের যে ছোট ছোট ফ্যাক্টরীগুলা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে থাকে—তাদের প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেবার সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। একটা সহরে যদি গ্যাসওয়ার্কস্ থাকে, তা'হলে সহরের যেখানে ইচ্ছা গ্যাসের সাহায্যে ছোট ছোট কল চালান যেতে পারে। ইন্টার্ন্যাল কম্বাস্‌চান্ এঞ্জিনের সাহায্যেও ছোট ছোট কল চালানো যেতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তিকেও এখন বহু দূরে দূরে অবস্থিত ছোট ছোট ফ্যাক্টরী-গুলাতে পাঠান যেতে পারে, তাতে খরচও বেশী পড়ে না। সুতরাং কারখানা-শিল্প যেমন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগাচ্ছে, তেমনি কুটীর-শিল্পীরাও যাতে নিজেদের কাজে প্রাকৃতিক শক্তিকে লাগাতে পারে এমন উপায়েরও সৃষ্টি হয়েছে। (৩) বড় বড় কারবারেরই বড় বড় কল-কারখানা চালানো সম্ভব; কারবার বড় হলেই মাল-মশলা সুবিধা দরে কিন্‌তে পাওয়া যায়, তৈরী জিনিষ বিক্রির সময়ও অনেকটা ইচ্ছামত দর হাঁকতে পারা যায়, দূর দেশে যেখানে যেমন চাহিদা, সেখানে মাল পাঠানোরও সুবিধা আছে; কারণ দেশের আর বিদেশের সকল বাজার সম্বন্ধেই খবর রাখবার জন্য খরচ করবার টাকাও তাদের আছে। কিন্তু কুটীর-শিল্পীরা অনেক ব্যবসাদারের হাত দিয়ে আসা মালমশলা আনে ব'লে দামের সঙ্গে কড়িয়াদের লাভের পয়সাও যোগাতে বাধ্য হয়। তারা প্রকৃত ক্রেতাদের সংস্পর্শে আস্‌তে পারে না ব'লে এবং মহাজনদের কাছে ঋণী থাকার জন্য তাদেরই কাছে জিনিষ বেচ্‌তে বাধ্য হয় ব'লে, অল্প দর নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সমবায় প্রণালীর উদ্ভব হবার পর থেকে এই সকল অসুবিধা দূর হয়েছে। সমবেতভাবে মাল-মশলা কিন্‌বার জন্য আর জিনিষ বেচবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপিত হলে, কেনা বিষয়ে কুটীর-শিল্পীরা এখন একটা বড় কারবারের অনেক সুবিধাই ভোগ করতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কুটীর-শিল্প একেবারে বিলুপ্ত হয়ে এমন কোন সম্ভাবনা নাই। বরং কয়েকটা নূতন সুবিধার সৃষ্টি হওয়াতে তারা যে নূতন মূর্ত্তিতে তাদের কার্যক্ষেত্র পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসারিত করতে পারবে, তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঐ সকল সুবিধার সুযোগ নিয়ে এবং শিক্ষার প্রচলন ক'রে আমাদের দেশের কুটীর শিল্পীদের যে অনেকটা উন্নত করতে পারা যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুটীর-শিল্পীদের অবস্থা উন্নত হলে তাদের অধিকতর পরিমাণে ধনসৃষ্টি হবে, জাতীয় ধনের পরিমাণ যে আরও

যাবে তা সত্য ; কিন্তু উন্নততম অবস্থাতেও কুটীর-শিল্পের ধনোৎপাদন-ক্ষমতা কারখানা-শিল্পের চেয়ে অনেক কম হবেই প্রধানতঃ সকল চেষ্টা কুটীর-শিল্পের দিকে প্রয়োগ করলে দারুণ ভুল করা হবে।

কারখানা-শিল্প বিস্তারের ফল সর্ব্বতোমুখী উন্নতি

এ পর্য্যন্ত কুটীর-শিল্প থেকে ভারতের লাভলোকসান সুবিধা-অসুবিধার কথা, আধুনিক আর্থিক জীবনে কুটীর-শিল্পের স্থানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা বিচার ক'রে দেখবো, কারখানা-শিল্প থেকে কি কি সুবিধা লাভ করতে পারা যায়, কি কি অসুবিধা অথবা কুফলই বা ভোগ করবার সম্ভাবনা আছে।

ফিস্‌ক্যাল কমিশন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে কারখানাশিল্পের উপকার সম্বন্ধে যে কয়টা কথা বলেছিলেন তার সার মর্ম্ম দেওয়া গেল—

(১) দেশে কারখানা-শিল্পের প্রসার হলে, লোক গয়না কিনে বা জমিয়ে রেখে যে টাকা কোন কাজে লাগায় না, সেই টাকা লাভের লোভে ক্রমে বাজারে বেরিয়ে আসবে। নানা শিল্প কারবারে লাভ পাবার আশা থাকলে লোকে তাদের লুকানো টাকার পুঁজি যে বার ক'রে খাটে, তার নানা দৃষ্টান্ত এখন চারিদিকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই যে টাকা অলস হ'য়ে থাকায় দরুণ জাতির কোন কাজেই লাগ্‌ছিল না, সেই টাকা জাতির আর্থিক উন্নতিতে নিযুক্ত হবার সুযোগ পাবে। বলা যেতে পারে যে, কুটীর-শিল্পেও ত লোকে টাকা খাটাতে প্রলুব্ধ হ'তে পারে ; কিন্তু কারখানা-শিল্পে লোক টাকা খাটাতে যত প্রলুব্ধ হবে, কুটীরশিল্পে টাকা খাটাতে তত প্রলুব্ধ হবে না ; কারণ কারখানা-শিল্পে লাভের আশা বেশী ; তার উপর কারখানা-শিল্পে খাটালে টাকা যখন ইচ্ছা সেয়ার বেচে তুলে নিয়ে অন্য দিকে খাটানো যেতে পারে, কিন্তু কুটীর-শিল্পে খাটানো টাকা চট ক'রে তুলে নেবার উপায় নেই। অধিকন্তু কারখানা-শিল্পের লাভ থেকে যে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হবে, সেটা শিল্পোন্নতির জন্য আবার প্রয়োগ করা হবে এ সম্ভাবনাও আছে, সুতরাং কারখানা-শিল্প কেবল অধিক মূলধনকেই আকর্ষণ করবে তা নয়, নতুন মূলধনের সৃষ্টিও করবে। কারখানা-শিল্পের বহুল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মূলধনও এনে দেশের আর্থিক উন্নতি আরও দ্রুত করা সম্ভব হবে, কিন্তু কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য বৈদেশিক মূলধন আবশ্যক হবে কি না সন্দেহ, আর আবশ্যক হলেও বিদেশ থেকে ঐ জন্য মূলধন পাওয়া যাবে কিনা, তাও সন্দেহের বিষয়।

(২) এ দেশে কৃষি-ক্ষেত্রে যত লোক দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক নিযুক্ত আছে। ২১ কোটী চাষার অধিকাংশই কৃষি কার্য্যের জন্য বিশেষ কোন কাজে লাগে না। একটা কাজে যত লোকের দরকার, তার চেয়ে বেশী লোক থাকা মানেই শ্রমশক্তির অপচয়। শ্রমশক্তির এই যে বিপুল অপচয় দেশে চল্‌ছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কারখানা-শিল্প। এত লোকের কাজ কি কুটীর-শিল্পের দেওয়া সম্ভব? কুটীর-শিল্পকে যতই উন্নত করা যাক্ না কেন, যারা এখনও কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে, বড় জোর তাদের অবস্থা ভাল করা যেতে পারে, কিন্তু কৃষিতে অনাবশ্যক শ্রমিকদলের সকলকেই কুটীর-শিল্পে লাগানো সম্ভব নয়। কারখানার সাহায্যে আজকাল অসংখ্য প্রকারের জিনিষ তৈরী হয়। অসংখ্য প্রকারের জিনিষ তৈরীর জন্য অসংখ্য কারখানা খাড়া হলেই কেবল এই বিপুল শ্রমিকদলের কাজ যোগান সম্ভব হতে পারে। অবশ্য শ্রমিকদের কারখানায় নিযুক্ত হবার দুটি বড় বাধা আছে :— প্রথম—শিল্পকেন্দ্রগুলাতে উপযুক্ত বাড়ীঘরের অভাব, দ্বিতীয়—চাষী মজুরের স্বগৃহের উপর একান্ত মায়া। শিক্ষা-বিস্তার ও মজুরদের শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বাধাটী ক্রমে ক্রমে অপসারিত হবে। আধুনিক আর্থিক জীবনের স্রোত ভারতের অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বাধাটী ক্রমে নগণ্য হয়ে দাঁড়াবে।

(৩) মজুরেরা সাধারণতঃ কৃষক বা কুটীর-শিল্পীর চেয়ে অধিক উপার্জ্জন করে থাকে। কারখানা-শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে ধনোৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে মজুরদের মজুরির হার আরও বাড়বে। মজুর ছাড়া কারখানা-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলেরও আয় বাড়বে। সুতরাং দেশের

একটা মোটা ভাগ লোক এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ধনী হ'য়ে পড়বে। কারখানার মজুরেরা বেশী রোজগার করলে পল্লীগ্রামগুলা তার ভাগ কিছু কিছু পাবে, কারণ এ দেশের যে সব লোক সহরে কাজ করতে আসে, তারা অনেক সময়েই তাদের পরিবারের সকলকে বা অনেককে গ্রামের বাড়ীতেই রেখে আসে এবং রোজগারের একটা ভাগ তাদের পাঠিয়েও থাকে। কারখানার মজুরদের মাইনে বাড়লে চাষের কাজ হতে অনেকে কারখানার মজুরিগিরি করতে আসবে, চাষের কাজে মজুরের সংখ্যা কমলে তাদের মজুরির হার বাড়বে। এই রকম দুদিক্ থেকে পল্লীগ্রাম উপকৃত হবে।

(৪) ১৮৮০ সনের দুর্ভিক্ষ কমিশন বলেছিলেন যে, ভারতে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় এর নিবারণ করার একটি উপায় হচ্ছে কাজের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ক'রে কৃষিতে যে অতিরিক্তসংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে, তাদের নানা নতুন কাজে লাগানো। কারখানা-শিল্প যত বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের সৃষ্টি করবে তা করা কুটীর-শিল্পের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া কারখানার মজুরদের আর কিছু কিছু পল্লীগ্রামে যাওয়ার জন্য, আর কল-কারখানার মজুরদের মজুরির হার বাড়ার ফলে চাষী মজুরদেরও মজুরির হার বাড়ার জন্য পল্লীগ্রামের লোকেরা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুঝবার নিমিত্ত আরও শক্তি-সঞ্চয় করতে পারবে। এ দু'দিক্ দিয়ে কারখানা-শিল্প দুর্ভিক্ষ সমস্যার অনেকটা সমাধান করতে সাহায্য করবে। তবে ঠিক দুর্ভিক্ষের সময় কারখানা-শিল্প বিশেষ কাজে লাগ্‌বেনা। দুর্ভিক্ষের সময় লোকে অন্য সব জিনিষপত্রের চেয়ে খাদ্যের দিকেই তাদের ক্রয়শক্তি বেশী প্রয়োগ করবে, জিনিষপত্রের চাহিদা কমার জন্যে কারখানাগুলায় কাজও কমে যাবে; অপরদিকে কারখানায় কাজ কম থাকার জন্যে আর কারখানার কাজে দক্ষতা না থাকার জন্যে, দুর্ভিক্ষের জন্যে যারা কাজ হারায়েছে তাদের তখনি কারখানার কাজে নেওয়া সম্ভব হবে না; কুটীর-শিল্পগুলাও দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় অচল হয় বলে কোন কাজে লাগবে না। কাজেই ঠিক দুর্ভিক্ষের সময় কুটীর-শিল্প বা কারখানা-শিল্প কোনটাই বিশেষ কাজে লাগবেনা বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবারণে কারখানা-শিল্প কুটীর-শিল্পের চেয়ে বেশী কাজে লাগবে।

(৫) ভারতের পরিধি, লোক-সংখ্যা ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের তুলনায় ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলার ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্ম্মাণি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের আয়ের কাছে নিতান্তই অল্প। অথচ দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্যে অজস্র অর্থব্যয় এখন দরকার। কেবল কারখানা-শিল্পের সাহায্যেই দেশকে ধনী করা—যা একান্ত দরকার—সম্ভব; কুটীর শিল্পের দ্বারা তা সম্ভব নয়। একই পরিমাণ টাকা কুটীরশিল্পে খাটালে যত লাভ হবে, কারখানা শিল্পে খাটালে সাধারণতঃ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী লাভ হবে। কারণ মানুষ যত কল-কারখানার সাহায্য নেয় ততই ধনোৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। যে যুক্তি দিয়ে কুটীর-শিল্পকে উন্নততর কলকব্জা ব্যবহার করতে বলা হয়, সেই যুক্তিই খুব বড় বড় কলকারখানার সাহায্য নেবার পক্ষেও প্রয়োগ করা যেতে পারে—ধনোৎপাদন বাড়বে ব'লে যদি ছোট কলের সাহায্য নিতে হয়, তা হলে ধনোৎপাদন খুব বেশী বাড়াবার জন্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের সাহায্যই বা নেব না কেন? কয়েকটা কুটীর-শিল্পে বেশী আয় হতে পারে, কিন্তু এইসকল কুটীর-শিল্পে যে সমস্ত মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হয় তার চাহিদা অত্যন্ত কম বলেই এইসকল কুটীর-শিল্পে বেশী টাকা খাটানো চলে না।

(৬) দেশের লোক কেবল কৃষি ও কুটীর-শিল্পে লেগে থাকলে যত রকমে মাথা খাটাবে, কৃষি ও কুটীর-শিল্পের সঙ্গে কারখানা-শিল্পের বহুল বিস্তার হলে তার চেয়ে অনেক বেশী দিকে মাথা খেলাবার সুযোগের সৃষ্টি হবে। এতে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে এক-ঘেয়েমি এসেছে, তার লোপ হবে, জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হওয়ার জন্যে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হবে, উচ্চ শিক্ষার ধরণ বদলাবার দরকার হবে এবং শিক্ষিতেরা অধিকতর "বস্তুনিষ্ঠ" ও "কাজের লোক" হ'য়ে উঠবে।

উপরোক্ত কথাগুলা ফিস্‌ক্যাল কমিশনের রিপোর্টে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত সুবিধার কথাও বিবেচনার যোগ্য। এটি অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার তাঁর নানা গ্রন্থ ও বক্তৃতায় একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন:—

(৭) পাশ্চাত্য দেশে শিল্প-বিপ্লব হবার পর কারখানা-

শিল্পের হর্ত্তা কর্ত্তা হিসাবে যে ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখা দিল তারাই প্রধানতঃ ইয়োরোপের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্বও হয়েছিল। আধুনিক গণ-তন্ত্রের আন্দোলন বড় বড় কল-কারখানা ও বড় বড় সহর সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস দেখলে মনে হয় যে, সহরে সভ্যতা ও কারখানা-সভ্যতা না থাকলে আধুনিক স্বরাজ আন্দোলনের সৃষ্টি ও সাফল্য অসম্ভব; কলকারখানার মজুররা যত শীঘ্র নতুন নতুন চিন্তা ও আদর্শ গ্রহণ করতে পারে, চাষীরা তা পারে না, কারখানার মজুররা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কথাগুলা লেখাপড়া না জানলেও যত শীঘ্র বোঝে, চাষীরা সেরূপ বোঝে না। এই সব কারণে স্বরাজ সাধনার দিক্ থেকেও কারখানা-শিল্পের একটা বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

কারখানা-শিল্পের বিরুদ্ধে কয়েকটা আপত্তি

কারখানা-শিল্পের বিস্তার হতে অনেকে যে সব কুফলের আশঙ্কা ক'রে থাকেন, তার আলোচনা এইবার করা যাক্।

(১) এমন আশঙ্কা করা হয়ে থাকে যে, বেশী লোক কারখানায় যোগ দিলে চাষার সংখ্যা কমে যাবে, তাতে ধন-বৃদ্ধির জন্য একদিকে খাদ্যের চাহিদা বাড়্‌বে অথচ অপর দিকে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ কমবে। কিন্তু এমন কোন আশঙ্কা নেই—কারণ দেশের লোক-সংখ্যার শতকরা ১ভাগেরও কম এখন কারখানা-শিল্পে লিপ্ত, কারখানা-শিল্পের খুব দ্রুত বিস্তার হলেও লোকসংখ্যার খুব একটা মোটা ভাগ কারখানা-শিল্পে নিযুক্ত হতে অনেক দেরী। আর, কারখানা-শিল্পে দেশের অধিকাংশ লোক লিপ্ত হলেই যে খাদ্যের পরিমাণ কমে যাবে, তা বলা যায় না; কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করলে অল্প লোকেই বেশী পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপন্ন করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কারখানা-শিল্প ও কৃষি দু'য়েতেই সমান কৃতিত্ব দেখানো যদি সম্ভব হয়, ভারতের পক্ষেও তা অসম্ভব না হ'তে পারে। (২) বড় বড় সহর গড়ে উঠলে সেই সব সহরের শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির জন্য এবং পল্লীগ্রামের শান্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যত খরচ পড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ পড়বে, এই আপত্তিও করা হ'য়ে থাকে—কিন্তু বেশী খরচ করবার জন্য উপযুক্ত ধনসম্পদ্‌ও কারখানা-শিল্প হতেই পাওয়া যাবে। (৩) পাশ্চাত্য বেকার-সমস্যা এদেশে দেখা দেবে এই ভয়ও করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ত' বেকারের দল আছে, আর তাদের সংখ্যা বিলাতের ১০।১১ লক্ষ বা আমেরিকার ৫০।৫৫ লক্ষের চেয়ে বেশী হইবে বলেই মনে হয়। বেকারের সংখ্যা লক্ষ্য করা হয় না বলেই আমাদের দেশেও বেকার-সমস্যা যে কতদূর প্রবল তা বুঝতে পারা যায় না। সঙ্ঘবদ্ধ কারখানার মজুরেরা বেকার হলে দেশের শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা বেশী, কৃষিপ্রধান দেশের বিচ্ছিন্ন-শক্তি বেকারেরা কাহারও মনে কোন ভীতির সঞ্চার করে না; সুতরাং বেশী কলকারখানা স্থাপিত হলে বেকার-সমস্যা যদি নতুন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তাতে বেকার-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আসবে, আর দেশ ধনী হলে বেকার-সমস্যা সমাধান করবার জন্য আবশ্যক মত টাকারও অভাব হবে না। (৪) আর একটী আপত্তি উঠেছে এই যে, কারখানা-শিল্পের বেশী বিস্তার হলে ইয়োরামেরিকার ধনিকদের মত ভারতও জগতের সর্ব্বত্র বাজার খুঁজতে বেরুবে; দেশের ধনিকরা দেশে বেশী দরে মাল বেচে, বিদেশে উৎপাদনের খরচার চেয়েও কম দরে মাল বেচ্‌তে পারে এ ভয়ও করা হয়। এই দুটী কথার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপের ব্যবসায়ীদের মত এদেশের শিল্পপতিদের বাজারের জন্যে দেশে দেশে ঘুরতে হবে না (যদিও কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানির বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী)। ভারতেই যত বড় বাজার আছে, কাজেই বাজারের জন্যে অন্য জাতির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হবার বা সমস্ত মাল কাটাবার জন্যে সস্তায় বিদেশে মাল বেচ্‌বার সম্ভাবনা কম। (৫) বড় বড় কারখানা খোলা ও চালানো সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা ওস্তাদ, আমাদের তেমন টাকা বা শিক্ষা বা মাথা কোথায় যে আমরা তাদের সঙ্গে রেষারেষি করতে পারবো?—এই ধরণের কথা নিতান্ত কাপুরুষের মুখে শোভা পায়। ভারতে কারখানা-শিল্প স্থাপনের সকল প্রকারের

সুবিধা আছে। যদি কারখানা-শিল্প হতেই জাতির মঙ্গল হবে বুঝি, তাহলে যে কটি সাময়িক বাধা বা অসুবিধা আছে (যেমন উপযুক্ত শিল্প-নেতার অভাব) সেগুলাকে নিজেদের প্রাণান্ত চেষ্টায় সরাতে হবে। (৬) অনেকে বলেন, কারখানা-শিল্পের সাহায্যে পুঁজিপতি বা মজুরদের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু চাষাদের উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই, বরং কুটীর-শিল্প থেকে চাষাদের লাভ বেশী, কারণ তারা বৎসরের যে সময়টা বেকার অবস্থায় কাটায় সে সময়টা কুটীর-শিল্পের চর্চ্চা ক'রে বেশী রোজগার-করতে পারে। এর উত্তরে আমরা বলব যে, কারখানা-শিল্পের বিস্তার হলেও চাষারা নানাদিকে উপকৃত হবেই—তা আগেই দেখানো হয়েছে। আর চাষে এখন আর অল্প বলেই আলস্যের সময় কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ চলতে থাকলে এবং কৃষিকার্য্য হতেই চাষাদের যথেষ্ট আয় হলে কুটীর-শিল্পের এই ধরণের প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমতে বাধ্য।

বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ

কারখানা-শিল্পের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি তোলা হ'য়ে থাকে সেগুলা যে বিশেষ যুক্তিসঙ্গত নয় তা আমরা দেখ্‌লুম। এ সব আপত্তি আমাদের মনে এত বড় হ'য়ে দেখা দেবার কারণ, আমাদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেই বিশ্বাসের একান্ত অভাব। কারখানা-শিল্প ভারতকে জগতের একটা শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবে কিনা, এর যোগ্যতা-বিষয়ে এই সন্দেহ আমাদের মনে অত্যন্ত বদ্ধমূল বলেই আমরা আমাদের অযোগ্যতা কতকগুলা অসার আপত্তি দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে চাই। যদি বুঝি এই দিকে চেষ্টা না করলে দেশের মঙ্গল অসম্ভব, অথচ এই দিকেই আমাদের যোগ্যতার একান্ত অভাব, তাহলে প্রাণপণে এই যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সচেষ্ট হতে হবে। যে সকল দেশ আজ কারখানা-শিল্পে জগতের মধ্যে প্রধান, তারাও ত একসময়ে আমাদের মতই কৃষি আর কুটীর শিল্পেই লেগে ছিল, আর সেই সময় কৃষি আর কুটীর শিল্পে ভারত সকল দেশের চেয়ে এগিয়েই ছিল। এখন জগতে কারখানা-শিল্প ব'লে একটা নূতন জিনিষের আবির্ভাব হয়েছে, যার সাহায্যে অন্য দেশগুলা অতি ক্ষুদ্র হলেও প্রধানতঃ টাকার জোরে সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করছে। এখনও এই কারখানা-শিল্পকে বিনা দ্বিধায় অবলম্বন না করলে কৃষি আর কুটীর-শিল্পের যত উন্নতিই আমরা করিনা কেন, আমরা কখনই জগতের অন্যান্য ধনী দেশগুলার সমকক্ষ হতে পারবো না। অবশ্য এ পথে অনেক বাধা আছে। কিন্তু প্রধান বাধা যেটা ছিল—আমাদের শাসকদের এ বিষয়ে দারুণ অনিচ্ছা— সেটা অনেকটা সরে গেছে। আমাদের শাসকরাও বুঝেছেন যে, ভারত কারখানা-শিল্পে প্রধান না হলে সামরিক হিসাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে থাকবে, যুদ্ধের সময় বিলাত হতে ভারতের সংস্রব ছিন্ন হলে আবশ্যকীয় সামরিক দ্রব্যগুলা—যা বড় বড় এঞ্জিনিয়ারী ও রাসায়নিক কারখানা না হলে তৈরী করা অসম্ভব—তা ভারত যোগাতে পারবেনা। ভারত ক্রমাগত দরিদ্র হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে তাঁদের জিনিষ ভারতে আর তেমন বিকাচ্ছে না, সুতরাং তাঁদের স্বার্থের জন্যেই কারখানা-শিল্পের সাহায্যে ভারতকে অধিকতর ধনী করা আবশ্যক, তাও তাঁরা বুঝেছেন। তা ছাড়া, ভারতে কারখানা-শিল্প না থাকলে বিলাতের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভারতের বাজার দখল করতে পারে (যেমন জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে করেছিল)—এটাও ইংরেজের স্বার্থের অনুকূল নয়। এই সব কারণে ইংরেজ ভারতকে কারখানা-শিল্পে প্রবল করতে ইচ্ছুক হয়েছে এবং এদিকে কিছু কিছু চেষ্টাও করছে। বলা যেতে পারে যে, ভারতে কারখানা-শিল্প প্রবল হলে ইংরেজেরই ত স্বার্থহানির সম্ভাবনা, কারণ, ভারত তখন বিলাতী জিনিষ আরও কম কিন্‌বে। সুতরাং এ বিষয়ে ইংরেজের চেষ্টা কখনই আন্তরিক হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু কারখানা-শিল্পে ভারত উন্নত হতে চেষ্টা করলে বিলাতের আর ভারতের স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত নাও হতে পারে—একথাও আমাদের শাসকগণ ভেবে দেখেছেন। বড় বড় মিল কারখানার যন্ত্রপাতি কারখানা-শিল্পের বিস্তারের প্রথম অবস্থাতেই এ দেশে তৈরী করা সম্ভব হবে না, কাজেই যন্ত্রপাতি ভারতের বাহির হতেই

আন্‌তে হবে। এই সমস্তের অর্ডার যোগাড় করতে পারলে বয়পাতি তৈরীর কারবারগুলা চল্‌বে ভাল, এ কথা ইংরেজ বেশ ভাল বোঝে। তা ছাড়া কারখানা-শিল্পে বিলাত আর ভারতের মধ্যে একটা প্রশস্ত ব্যবধান দাঁড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়—খুব সম্ভব বিলাত জটিল জিনিষগুলা তৈরী কর্‌বে, আর ভারত অপেক্ষাকৃত সোজা জিনিষগুলাই তৈরী করবে। কাজেই পরাধীন বলে যে শাসকদের কাছে আমরা বিশেষ বাধা পাব তা নয়। কিন্তু বেশী বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের দেশেরই লোকের কাছ থেকে—কারণ তাঁরা এখনও প্রধানতঃ কুটীর-শিল্পকেই একটা মিথ্যা মোহে আঁকড়ে থাকতে চান। আর যা সব বাধা আছে, তা এই বাধার কাছে তুচ্ছ। কুটীরশিল্পের উন্নতি হোক্ তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই, বরং সমূহ লাভই আছে। কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা এখনও যেন কারখানা-শিল্পের সত্বর ও ব্যাপক বিস্তারে আর কুটীর শিল্পের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণের ঝোঁকেই প্রযুক্ত হয়। এ বিষয়ে এখনও যদি আমাদের চেষ্টার শৈথিল্য হয়, তবে ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থিক গগন যে এখনও অনেক দিন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাক্‌বে, একথা খুব জোরেই বলা যেতে পারে।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক

শ্রীসুশীল রঞ্জন বিশ্বাস, এম্‌. এ

(১)

বর্ত্তমান সভ্যতার একটি বিশেষত্বই হইল নানা বিষয়ে বিভিন্ন দেশের পরস্পরের সহিত সহযোগিতা সংস্থাপন। রাজনীতিই হউক আর অর্থনীতিই হউক, আধুনিক যুগে কোনও বিষয়েই কোনও জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যান্য জাতির সহিত সহযোগিতা করিতে হইতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ (লীগ অব্‌ নেশনস্‌) আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কার্য্যালয়, লীগ এগেনষ্ট ইম্পিরিয়ালিজম্‌; প্যান এশিয়াটিক কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার ফল। এই সহযোগিতার আধুনিকতম নিদর্শন আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা।

১৯২০ সনে জেনোয়া কনফারেন্সে একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়; এবং এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য কনফারেন্স ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলণ্ডকে অনুরোধ করেন। বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও বেশী সহযোগিতা থাকিলে নানা দেশের অনেক সমস্যা অধিকতর সুচারুরূপে মীমাংসা হইতে পারিত এবং আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন অধিকতর সহজভাবে সম্পন্ন হইতে পারিত। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই জেনোয়া কনফারেন্স পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের এই নির্দ্দেশ সত্ত্বেও এ যাবৎ এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই করা হয় নাই এবং শুধুমাত্র বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে সহযোগিতা সংস্থাপন এবং আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য হইলে বোধ হয় আমাদিগকে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইত। যুদ্ধোত্তরসমস্যা বর্ত্তমান আকার ধারণ না করিলে এবং তাহার মীমাংসার জন্য একটী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হইলে এত শীঘ্র আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু যে কারণেই এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হউক না কেন, ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং তাহাদের পরস্পরের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকার অসম্ভাব্যতা আছে তা অস্বীকার করার উপায় নাই।

(২)

১৯২৪ সনে "ডস কমিটী" যুদ্ধঋণ সমস্যার যে মীমাংসা করিয়াছিলেন পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাহাতে অনেক গলদ দেখা গিয়াছিল। প্রথমতঃ ডস প্লান অনুযায়ী জার্ম্মাণি প্রতিবৎসর ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি পূর্ব্বতন শত্রুবর্গকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া আসিতেছে; কিন্তু ভবিষ্যতে আরও কতদিন তাহাকে এইরূপে তাহার পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে "ডস কমিটী" তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই।

এই ব্যবস্থার অস্থায্যতা উপলব্ধি করিয়া প্রায় বৎসরাধিক হইল উত্তমর্ণ জাতিগণ এবং জার্ম্মাণি এই দেনা শোধ করার শ্রেষ্ঠ উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, বেলজিয়াম জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেক দেশ হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি সংগঠিত হয়। এই কমিটি তাহাদের অন্যতম সদস্য আওয়েন ডি ইয়ংকে (যুক্তরাষ্ট্র) তাঁহাদের সভাপতি মনোনীত করিয়াছিলেন বলিয়া এই কমিটিকে ইয়ং কমিটি এবং ইঁহাদের রিপোর্টকে ইয়ং রিপোর্ট বলা হয়।

যুদ্ধঋণ সম্বন্ধে ভাল ধারণা করিতে হইলে জানা দরকার যে, জার্ম্মাণিকে যেমন ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতির ঋণশোধ করিতে হইতেছে, শেষোক্ত দেশগুলিকেও সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রের ঋণশোধ করিতে হইতেছে; কিন্তু এই বিশাল পরিমাণ টাকা একদেশ হইতে আর একদেশে এবং সেই দেশ হইতে অন্য আর এক দেশে পাঠাইতে হইলে সব সময়ে মুদ্রা-বিনিময়-হারের সমতা (প্যারিটি অব্ এক্সচেঞ্জ) রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব নহে। এই ব্যাপারের গুরুত্ব ডস কমিটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ অনুসারে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট যখনই ঋণ পরিশোধের জন্য বিনিময়-হারের সমতা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা হইবে তখনই সাময়িক ভাবে ঋণ পরিশোধ বন্ধ করার ক্ষমতা "ট্রান্সফার কমিটি" নামে একটি স্থায়ী কমিটিকে দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থায় উত্তমর্ণ জাতিগণ খুব সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মত হইতে পারেন নাই এবং পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলেও বিষয়ে তাঁহাদের অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ইয়ং কমিটির নিয়োগের জন্য ইঁহাদের এই অসন্তোষও অনেকাংশে দায়ী।

(৩)

ইয়ং কমিটি প্রথমেই তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে নিক্ষেপ করিলেন। জার্ম্মাণি কত টাকা দিতে সমর্থ এবং সেই টাকা কতদিন ধরিয়া তাহাকে দিতে হইবে, কমিটির তদন্তের ইহাই প্রথম বিষয় হইলেও, কমিটি গোড়াতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, এই বৃহৎ পরিমাণ টাকার লেনদেন ডস কমিটির নির্দ্দেশানুযায়ী নিযুক্ত ট্রান্সফার কমিটির ন্যায় একটী তৃতীয় পক্ষ ব্যতীত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ট্রান্সফার কমিটির অসাফল্যের কথা স্মরণ করিয়া ইয়ং কমিটি অনেক গবেষণা ও আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা এই কোটী কোটী টাকার লেনদেনের ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-বিনিময়-হারের সমতা রক্ষা করিয়াও চালাইতে পারিবে। তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে, যদি পূর্ব্বতন ট্রান্সফার কমিটির ন্যায় এই নূতন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য কেবলমাত্র যুদ্ধঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়াই সমাধা হয় এবং ইহাকে অন্য কোন ক্ষমতা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারাও বিশেষ সুফলের আশা করা যাইবে না। সুতরাং তাঁহারা এই নূতন প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃতপক্ষেই ব্যাঙ্কের ন্যায় সকল ক্ষমতা দেওয়ার সমর্থন করিয়াছেন। একই দেশের মধ্যে যখন টাকাপয়সার লেনদেন ব্যাঙ্ক ছাড়া সুচারুরূপে সম্ভব হয় না, তখন আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন ব্যাঙ্কছাড়া সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়—কমিটির এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হওয়ার বিশেষ কিছুই নাই। জার্ম্মাণি তাহার উত্তমর্ণ জাতিদিগকে কি পরিমাণ টাকা কতদিন পর্য্যন্ত দিবে, এই সম্বন্ধে ইয়ং কমিটির মীমাংসা সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই, কিছুদিন পূর্ব্বে হেগ্ সহরে যে রিপারেশন কনফারেন্স হইয়া গেল, তাহাতে এই বিষয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যে কনফারেন্স হইতেছে তাহাতেও একটী

সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইয়ং কমিটির সিদ্ধান্তে কনফারেন্স কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা আজ পর্য্যন্ত কোথাও অস্বীকৃত হয় নাই। *

(৪)

ওঙ্গ কমিটির অনুমোদনানুসারে সেই সময়ে আর একটী ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা জার্ম্মাণির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের গঠন সম্বন্ধে আমূল পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের প্রধান বিশেষত্ব হইল এই যে, ব্যাঙ্কের পরিচালনা-বিষয়ে বিদেশী জাতিদের অধিকার প্রধান। নূতন ব্যবস্থানুসারে ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী ৫টী বিভিন্ন সমিতি বা ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, (১) সাধারণ সভা, (২) পরিচালক সমিতি, (৩) কমিশনার, (৪) অংশীদারগণের সাধারণ সভা এবং (৫) অংশীদারগণের কেন্দ্রীয় সমিতি। সাধারণ সভার ১৪ জন সভ্যের মধ্যে সাত জন জার্ম্মাণ এবং সাত জন বিদেশী। ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, আমেরিকা, হল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ড দেশ হইতে একজন করিয়া সভ্য রিপারেশন কমিশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের অন্যান্য এই সাধারণ সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহার নির্ব্বাচনে সভার অন্ততঃ নয় জন সভ্যের (তন্মধ্যে অন্ততঃ ছয় জন জার্ম্মাণ সভ্যের) সম্মতি থাকা আবশ্যক। অবশ্য পরিচালক সমিতির গঠনে সাধারণ সভার বিদেশী সভ্যের কোনও অধিকার নাই। প্রতি মাসে একবার করিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করা এবং অধিকাংশের মতানুযায়ী কার্য্য করার অধিকার সভার আছে। আরও একটী বিষয়ে বিদেশী প্রভাব স্বীকার করা হইয়াছিল; নোট সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষমতা সাধারণ সভার বিদেশী সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এক বিদেশী সভ্যের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাঁহাকেই কমিশনার বলা হয়। বলা বাহুল্য, ওঙ্গ কমিটির ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্যই কমিটি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং রিপারেশন কমিশনও তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, কাজেই জার্ম্মাণিকে বাধ্য হইয়াই এই ব্যবস্থা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইয়ং কমিটির ব্যবস্থানুযায়ী আন্তর্জ্জাতিক

* উপরোক্ত বিষয় লেখা হইবার পরে আজ কয়েক দিন হইল হেগ সহরে রিপারেশন কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই কনফারেন্সে জার্ম্মাণির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ডক্টর সাপ্‌ট গত ১০ই জানুয়ারী প্রস্তাবিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ককে নিজের ব্যাঙ্কের তরফ হইতে কোনও প্রকার আনুকূল্য বা সহযোগিতা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাহার কারণ ইহা নয় যে, তিনি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন কিংবা আছেন; তাঁহার এই অসহযোগের কারণ যুদ্ধঋণ সম্বন্ধে ইয়ং কমিটির তথা রিপারেশন কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত তাঁহার মতে জার্ম্মাণির পক্ষে ক্ষতিকর এবং যতদিন পর্য্যন্ত না এই বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা হয়, ততদিন তিনি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সহায়তা করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও সমর্থন না পাইয়া ডক্টর সাপ্‌ট তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের অমতে তাহাদ্বারা কোনও কার্য্য করাইতে গভর্ণমেণ্টের কোনও ক্ষমতা নাই; সেই জন্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, আইনানুসারে ভবিষ্যতে যাহাতে ডক্টর সাপ্‌টের ন্যায় অন্য কোনও ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচরণ করিতে না পারেন সেইজন্য সেই সেই বিষয়ে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করাইবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টকে দেওয়ার জন্য বর্ত্তমান আইন সংশোধন করা হইবে। কিন্তু নানাবিধ বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছেন এবং এই স্থির করিয়াছেন যে, আপাততঃ কেবল মাত্র রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্ককে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সহিত যোগদান করিতে বাধা দিবার জন্য তদর্থে একটী নূতন ধারা বর্ত্তমান আইনে যোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইলে যেমন ট্রাস্টকার কমিটির সার্থকতা থাকে না, সেইরূপ রাইথ্‌স্ ব্যাঙ্কে এই বিদেশী প্রভাবেরও কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না; এবং সেই জন্যই উক্ত ব্যাঙ্ককে এই প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্য একটী সংশোধনী আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৫)

ব্যাঙ্কের গঠন সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথা বলিয়া ইয়ং কমিটি বিস্তারিত ব্যবস্থার ভার একটি সংগঠন কমিটির হাতে অর্পণ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পরামর্শানুযায়ী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালী, বেলজিয়াম, জাপান ও আমেরিকা এই সাতটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের "গভর্ণরগণ" কর্ত্তৃক মনোনীত (প্রত্যেক দেশের ২ জন করিয়া) ১৪ জনকে লইয়া যে সংগঠন কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল, কিছু দিন হইল সেই কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

সংগঠন কমিটি সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল সহরকেই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের কার্য্যালয়স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য কমিটি আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পত যুদ্ধকাল সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারের বন্দোবস্ত করা ছাড়া, বিভিন্নদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা এবং আন্তর্জ্জাতিক টাকাকড়ির লেনদেন-সম্পর্কিত সমস্ত ব্যবস্থা করার ভারও কমিটি এই ব্যাঙ্কের উপর দিতে চান।

দুই লক্ষ অংশে মোট ৪০ কোটি সুইজারল্যাণ্ডীয় ফ্রাঙ্ক ব্যাঙ্কের মূলধন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অবশ্য পরে দরকার মনে করিলে ব্যাঙ্কের পরিচালক সমিতি সাধারণ সভার অনুমতি লইয়া এই টাকা বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারিবেন। অন্ততঃ ১ লক্ষ ১২ হাজার অংশে প্রতি অংশ বাবদ শতকরা ২৫৲ টাকা আদায় হইলেই ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। ইতিমধ্যেই বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালী, জাপান এবং নিউইয়র্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এই মূলধনের সমস্ত টাকা সমানভাবে তুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন—এবং ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে যদি এই টাকা বাহির হইতে আদায় না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এই টাকা নিজেরাই দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের পরিচালক সমিতি অনাদায়ী অংশগুলি অন্য দেশের ব্যাঙ্কের নিকটও বিক্রি করিতে পারিবেন। কিন্তু কমিটি এই বিষয়ে সমিতিকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দেন নাই। কেবলমাত্র সেই সব দেশের ব্যাঙ্কের নিকটই অংশ বিক্রি করা হইবে, যাহারা গত যুদ্ধের ঋণের টাকা আদায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট অথবা যে সব দেশে স্বর্ণমান (গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড) অথবা স্বর্ণ-বিনিময় মান (গোল্ড এক্সচেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড) প্রচলিত আছে; এবং এই সব কোনও দেশেই ৮,০০০ অংশের বেশী বিক্রি হইতে পারিবে না। পরিবর্দ্ধিত মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৫৫ অংশ উল্লিখিত সাতটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমান অংশে গ্রহণ করিতে পারিবেন। বাকী ভাগ উপরোক্ত প্রকারে অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের নিজ নিজ অংশের সমস্তটাই কিংবা কতক অংশ জনসাধারণের নিকট বিক্রি করিতে পারিবে। কিন্তু অংশীদারমাত্রেই ব্যাঙ্কের পরিচালনা-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহে। অংশীদার দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিংবা তাহা কর্ত্তৃক মনোনীত অন্য কোনও ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কাহারও এই বিষয়ে অধিকার নাই। তবে পরিচালক সমিতি ইচ্ছা করিলে যে সব অংশীদার দেশে কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই, সেই সব দেশের কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্ককে এই অধিকার দিতে পারেন।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর এই ধারার গুরুত্ব লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ এই ধারানুসারে কালে ভারতবর্ষও এই ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে পারিবে। কারণ ভারতবর্ষ যুদ্ধকাল-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও ভারতে বর্ত্তমানে স্বর্ণবিনিময় মান প্রচলিত আছে। কাজেই আইনতঃ ভারতবর্ষের এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পক্ষে কোনও বাধা নাই। তবে যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে একটী প্রকৃত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন বোধ হয় আমাদের এই ব্যাঙ্কে যোগ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। কেননা তাহা হইলে

ভারতীয়দের অপেক্ষা ভারতপ্রবাসী বিদেশীরাই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কে বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার এবং বেশী প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পাইবে।

ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার প্রথমে বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইতালী, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র এই সাতটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রধান পরিচালক (গভর্ণর) অথবা তাঁহাদের মনোনীত কেহ, এবং ব্যবসাবাণিজ্যশিল্প ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত পরিচালকগণ কর্ত্তৃক মনোনীত আরও সাতজন (ইঁহারা স্ব স্ব নির্ব্বাচন-কর্ত্তার স্বজাতীয় হইবেন), সর্ব্বসুদ্ধ এই চৌদ্দজন কর্ত্তৃক গঠিত এক সমিতির উপর থাকিবে। যুদ্ধ-স্থগনসংক্রান্ত ব্যাপার না মেটা পর্য্যন্ত জার্ম্মানি এবং ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি ইচ্ছা করিলে আরও দুই জন (প্রত্যেকে একজন করিয়া) সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। উপরোক্ত সাতটী ছাড়া অন্য যে সব দেশ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সভ্য হইবে, সেই সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির গভর্ণরগণ প্রত্যেকে চারিজন করিয়া যাহাদের নাম পাঠাইবেন, তাহাদের মধ্য হইতে পরিচালক সমিতি অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা আরও নয় জন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। কাজেই পরিচালক সমিতির সভ্যের ন্যূনতম সংখ্যা ১৪ হইলেও, আইনতঃ আরও ৯ জন অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ২৩ জন ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।

(৬)

ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে সংগঠন কমিটি নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বর্ণমুদ্রা এবং সাধারণ সোণা (নিজের তরফেই হউক কিংবা কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফেই হউক) বেচাকেনা, কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে নিজ কোষে সোণা গচ্ছিত রাখা, সোণা, বিল অব্ এক্সচেঞ্জ, কিংবা অন্যান্য স্বল্পকালস্থায়ী সওদাসরী কাগজ (শর্ট ডেটেড কমার্শিয়াল পেপার) প্রভৃতির বদলে কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিবে, কিংবা কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিতে পারিবে। কিন্তু যখনই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কার্য্যের ফলে কোনও দেশের আর্থিক অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হওয়ার আশঙ্কা হইবে এবং সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আপত্তি করিবে, তখনি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের আর সেই কাজ করিবার অধিকার থাকিবে না।

ব্যাঙ্কের কার্য্যের পরিধি আরও কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। আমাদের দেশে যেমন গভর্ণমেণ্ট নোট বাহির করেন এবং সেই নোট সর্ব্বত্রই চলে, প্রায় সব দেশেই এই নোট বাহির করার ক্ষমতা সেই সব দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত থাকে; সংগঠন কমিটি এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ককে এই নোট বাহির করার ক্ষমতা দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিল অব্ এক্সচেঞ্জ ডিস্কাউণ্ট করা অর্থাৎ তাহার বদলে টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইলেও তাহা অ্যাক্সেপ্ট করার অর্থাৎ তাহা সহি করিয়া এবং তদ্দ্বারা নিজের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ইহার কালপূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত বাজারে প্রচলিত করার অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইংল্যাণ্ডের এবং আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এই ব্যবসা বহুল পরিমাণেই করিয়া থাকে।

উল্লিখিত আইনকানুনের কতকগুলি পরিবর্ত্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের সাধারণ সভার তত্ত্বাবধানে পরিচালনা সমিতির উপর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি, যথা ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থান, উদ্দেশ্য, মূলধন বৃদ্ধি করা, পরিচালনা সমিতি গঠন করা প্রভৃতি ব্যাপারে যে সব দেশ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কে যোগদান করিয়াছে সেই সব দেশ এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় যে দেশে অবস্থিত সেই দেশের অর্থাৎ যুইজারল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্টের সম্মতি আবশ্যক। অবশ্য পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারগণও করিতে পারেন, কিংবা বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টও করিতে পারেন। ইহা কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার পরিচালনা সমিতির উপরই দিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহারা সাধারণ সভাতেও কোনও ক্ষমতা দেন নাই। কিন্তু সংগঠন কমিটি তাঁহাদের (অর্থাৎ ইয়ং কমিটির) এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া উপরোক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আগেই বলা হইয়াছে যে, যদিও একটি আন্তর্জ্জাতিক

ব্যাঙ্ক করার প্রস্তাব অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি-সমস্যা বর্ত্তমান আকার ধারণ না করিলে বোধ হয় বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা হইত না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা কমিটি কিংবা সংগঠন কমিটি ব্যাঙ্কের কার্য্য কেবল মুদ্রাস্ফীতি পরিচালনাতেই পর্য্যবেসিত করেন নাই। অন্যান্য নানাপ্রকার আন্তর্জ্জাতিক টাকাকড়ির লেনদেন এবং বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং চেম্বার অব্ কমার্সের গত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় যে সভাপতির অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ভারতের বৈদেশিক ঋণ ইংল্যাণ্ড হইতে গ্রহণ না করিয়া আমেরিকা হইতে গ্রহণ করিলে নানাভাবে আমাদের উপকার হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত স্থান নহে; কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকা হইতে ভারতের ঋণ গ্রহণ করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় দুই দেশের পরস্পরের মধ্যে বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। এবং এই অবস্থায় বৃহৎ পরিমাণ টাকার লেনদেন অনেক প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। এই সমস্যার একমাত্র মীমাংসা করিতে পারে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক। এবং এই কারণেই এই ব্যাঙ্কের গঠন সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

জীবন-বীমা ও ভারতের আর্থিক সমস্যা

শ্রীশ্যামাচরণ বসু, এম, এ, বি, এল

অনেকের ধারণা ব্যাঙ্কই দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের বিস্তারে বীমা আফিস যে কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিনা। ব্যাঙ্কের টাকা বেশীর ভাগ প্রত্যক্ষ ভাবেই কোন শিল্প বা ব্যবসায়কে গড়িয়া তোলে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় ব্যাঙ্ক ছাড়া কোন কারবার চলিতে বা উন্নতি করিতে পারে না। বীমা আফিস সেরূপ ভাবে নিজের টাকা ব্যবসায়ে খাটায় খুব কম। ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া শিল্পের উন্নতিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য কোন দেশের বীমা আফিস বড় একটা করে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

এখানকার বীমা আফিসগুলি সাধারণতঃ কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। কেননা উহাতে টাকা মারা যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু যাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী তাহারা ঐরূপ নির্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বেশী সুদ বা লাভের প্রত্যাশাও করে। তাহা না করিলে ব্যবসায়ে উন্নতি-লাভ অসম্ভব। বিদেশী বীমার কারবারগুলি আমাদের দেশীয় কারবার অপেক্ষা বেশী উন্নতিশীল কেন তাহা আমরা নিম্নের হিসাব হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

১৯২১ সনে বীমা আফিসে মূলধন খাটান

	ভারতে (শতকরা)	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (শতকরা)
কোম্পানীর কাগজ		
ঘরিদ	৬৩·১	
পলিসি গ্রহীতাকে ঋণ		
সম্পত্তি বন্ধক		

আমেরিকার বীমা আফিস বন্ধকী কারবারেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূলধন খাটায়, গভর্ণমেণ্টের ঋণের উপর ভরসা রাখে না। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত দেখিতে পাই, এবং সেই জন্যই আমাদের বীমা আফিসগুলির উন্নতি এত কম। বাস্তবিক পক্ষে একটু সাবধানতা অবলম্বন করিয়া যদি বন্ধকী কারবারে ঐ টাকা খাটান যায়, তাহা হইলে উহা কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের তুলনায় কোন অংশেই ক্ষতিকর হইবে না, বরং সুদহিসাবে কোম্পানীর কাগজের অপেক্ষা অনেক বেশী লাভজনক হইবে।

বীমা আফিসের মূলধনের টাকা খাটানোর উপর দেশের কৃষিশিল্পের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। গত ১৯২৬ সনে আমাদের দেশে বীমার কারবারের মূলধন ছিল মোট ১২,৫৮,০০,৭৪০৲ টাকা। এই বিপুল অর্থের মধ্যে ৭,২৮,৬৪,০২৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিতে। এই টাকা যদি দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইত। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে কিরূপে বীমার টাকা খাটাইয়া কৃষি-শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে তাহা দেখিলে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়।

সাধারণতঃ, কৃষি বা শিল্পে টাকা খাটাইতে গেলে অধিক সময়ের জন্য টাকা আবদ্ধ রাখিতে হয়। এরূপ দীর্ঘকালের জন্য টাকা দিতে বীমা আফিস সহজেই পারে। কারণ বিশেষ করিয়া দেখা গিয়াছে, মৃত্যু-সংখ্যা যত বেশীই হউক, মূলধনের অতি সামান্য অংশই কোন এক সময়ে "ক্লেমের" জন্য আবশ্যক হয়। এই হিসাবে মূলধনের শতকরা ৫০ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত অনায়াসে কৃষি, শিল্প প্রভৃতিতে খাটান যাইতে পারে। বাকী টাকা কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া বা মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিকে ঋণ ইত্যাদি দিয়া খাটান চলিতে পারে। এইরূপ করিলে দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করা হইবে এবং বীমার কারবারেও যথেষ্ট লাভবান হইতে পারা যাইবে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় কৃষকের ঋণের ভার লঘু করিবার ও কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অনেক কৃষি ব্যাঙ্ক ও বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। এইসকল ব্যাঙ্ক জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয় এবং অনেক সময় বড় বড় বন্ধকী সম্পত্তির নামে বণ্ড গোটার বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির করে। এইসকল বণ্ড কোম্পানীর কাগজ হইতে কোন অংশে কম নিরাপদ নয়। এই উপায়ে কৃষক বহুদিনের মিয়াদে টাকা ধার পায় এবং মূলধনিগণও নির্ব্বিঘ্নে বেশী সুদ ভোগ করে। ঐ সকল দেশে গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট সহায়তা করে।

আমাদের দেশেও দরিদ্র কৃষককে ঋণমুক্ত করিতে এবং কৃষির উন্নতি সাধন করিতে ঐ প্রকার ব্যাঙ্কের বিশেষ আবশ্যক। যদিও সমবায় সমিতি দ্বারা কৃষকের কষ্টের লাঘব অনেকটা হইয়াছে, তথাপি ভারতের ন্যায় বৃহৎ দেশের পক্ষে উহা অতি সামান্যই বলিতে হইবে। এদেশে যত কৃষি ও বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু যতদিন না উহা স্থাপিত হয়, ততদিন বীমা কোম্পানীগুলি যদি এই দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে অধিক সুদ লাভ করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি হইতে পারে।

শিল্পের সম্বন্ধেও আমাদের দেশে এমন খুব কম ব্যাঙ্ক আছে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে কারখানা বা কারবার বন্ধক রাখিয়া অধিক দিনের জন্য টাকা ধার দেয়। বীমা কোম্পানী অনায়াসে ঐ প্রকার ঋণ দিতে পারে। অবশ্য বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া সহজে ও সুচারুরূপে হইতে পারে। তাহা হইলে বীমা কোম্পানীগুলিই ঐ বন্ধকী ব্যাঙ্কের সহযোগে সহজেই বন্ধকী কারবারে আপন মূলধন খাটাইতে পারে। যাহা হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় বীমা কোম্পানীকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন নিজেরা অধিক লাভবান হইতে পারিবে, অন্যদিকে তেমন দেশের কৃষি-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধনও হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক সমস্যারও অনেকটা সমাধান হইবে।

কলিকাতার পথে দুর্ঘটনা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি, এ

কলিকাতার পথে দুর্ঘটনা ও উহার কারণ সম্বন্ধে গত বৎসরের 'আর্থিক উন্নতি'তেও আলোচনা করিয়াছি। এই বৎসরের দুর্ঘটনার বহরটাও পাঠকের নিকট হাজির করিতেছি। বৎসরের পর বৎসর এই বিষয় লইয়া আলোচনা করি শুধু এই মতলবে যে, দেশের লোক দুর্ঘটনার তথ্য জানিয়া আমাদের দেশে দুর্ঘটনা থামাইবার পক্ষে বর্ত্তমান আইন ও ব্যবস্থা যথেষ্ট কিনা তাহা ভাবিতে শিখেন, এবং দুনিয়ার বড় বড় সহরের দুর্ঘটনা থামাইবার হালের আইন ও ব্যবস্থার তুলনায় আমাদের দেশের আইন ও ব্যবস্থার কোন সংস্কার প্রয়োজন কিনা তাহাও আলোচনা করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের দুর্ঘটনার হিসাব এখনো পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই বৎসরের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর এই ১১ মাসের তথ্যই হাজির করিলাম।

	ট্রামের দরুণ		ট্যাক্সির দরুণ		অন্যান্য মোটর গাড়ীর দরুণ		অন্যান্য যানবাহনের দরুণ		বাসের দরুণ	
	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা
জানুয়ারী	২	৭	৪	৭২	৬	৭১		৩	২	২১
ফেব্রুয়ারী	২	৮	২	৫৪	৭	৮৪		৪	৫	৩৪
মার্চ্চ		১১	৪	৬৬	৯	৮২		১	৩	২৮
এপ্রিল		২০	১	৫৯	৯	৯১		৩		৪৬
মে		১৬	৮	৭৩	১	৮১		৪		৩২
জুন		৬		৬৫	৫	৮৯		৬		২৩
জুলাই		২৫	৫	৭১	৫	৮৫		৫		৩৭
আগষ্ট		১৮	৩	৬২	৬	৬৬		২		৪৪
সেপ্টেম্বর		১৩	৫	৫৪	৭	৯২	৩	১৭	৪	১৬
অক্টোবর		১৮	৬	৭২	৭	৯৩	১	৪	২	২৬
নভেম্বর	৪	২০	১	৪১	৩	৭৮	৩	১০	৫	২৯
মোট	১০	১৬৪	৩৬	৬৯৯	৬৫	৯১২	১৪	৫৯	৪৪	২৯৭

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের চেয়ে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হতাহতের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সনে ট্যাক্সির দরুণ মৃত্যু হইয়াছিল ১৩ জনের, আর ১৯২৯ সনের এগার মাসেই ট্যাক্সির আঘাতে মরিয়াছে ৩৬ জন। অন্যান্য যানবাহনের দরুণ মৃত্যু-সংখ্যাও এই বৎসর বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সনে বাসের দরুণ মৃত্যু হইয়াছিল ১৭ জনের, আর এই বৎসর এগার মাসে বাসের আঘাতে মরিয়াছে ৪৪ জন। বাসের ফলায় আহতের সংখ্যাও ২৬৩ হইতে ২৯৭তে উঠিয়াছে।

গত তিন বৎসরের আহত ও মৃতের মোট সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা
১৯২৭	১৩৫	১,৮২০
১৯২৮	১০৭	২,৩৪৯
১৯২৯	১৬৯	২,১৬৩

গরুর কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ

গরু খারাপ হইবার কারণ

আমাদের দেশের গরুর জাত খারাপ হইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইতেছে। এখনও আমরা যদি গরু ভাল করিতে পারি, তবে এই ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারা যায়। গরুর উন্নতি করিতে হইলে, গরু খারাপ হইল কেন, তাহা জানা দরকার। খারাপ হইবার কারণ দূর করিতে পারিলেই গরু ভাল হইবে।

গরু খারাপ হইবার দুইটী প্রধান কারণ আছে। একটী কারণ হইতেছে খারাপ জাতের ষাঁড় দ্বারা বাচ্চা উৎপাদন করা। আর একটী কারণ হইতেছে গরুকে ভাল করিয়া খাইতে না দেওয়া।

সংখ্যা কমাইয়া গুণ বাড়ানো আবশ্যক

আমার যে জমি আছে তাহাতে যদি একটি গরুকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারি, অথচ আমার যদি পাঁচটি গরু থাকে, তবে আমি সকলগুলিকে কেমন করিয়া ভালভাবে খাওয়াইব? আমাদের গরু আছে বেশী, অথচ জমি সে পরিমাণ নাই; কাজেই গরুগুলি পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, এবং ফলে রোগা, দুর্বল ও আকারে ছোট হইয়া যায়। যদি গরুর সংখ্যা কম করিতে পারি, তবে সবগুলিকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারা যায়, আর গরুও ভাল হয়। কেহ হয়ত বলিবেন, আমার পাঁচটি গরুর দরকার, গরু কম করিলে চলিবে কেন? আমি তদুত্তরে একটি মোটা হিসাব দিতেছি। ধরুন আপনার পাঁচটি গাই গরু আছে, পাঁচটিতে মিলিয়া গড়ে আপনাকে পাঁচ সের দুধ দেয়। আপনি পাঁচটি গরুর জায়গায় যদি ভাল দুইটি গরু রাখেন, তবে গড়ে আপনি ঐ পাঁচসেরের দুধই পাইবেন, অথচ পাঁচটির বদলে মাত্র দুইটি গরুকে খাইতে দিতে হইবে। তাহাতে খরচ কম, অথচ দুধ সমান। পাঁচটির বদলে দুইটি গরু গোয়ার হাঙ্গামাও কম, গরু রাখার জায়গাও লাগিবে কম। আবার খারাপ জাতের পাঁচটি গরুর যে বাচ্চা হইবে, তাহারাও খারাপ জাতেরই হইবে, বেচিতে গেলে দাম কম, রাখিতে গেলেও খাইতে দিতে হইবে বেশী, অথচ কাজ পাওয়া যাইবে কম। অন্যদিকে ভাল গরুর বাছুর বিক্রি করিলে দাম পাওয়া যাইবে বেশী, রাখিলে কাজ পাওয়া যাইবে বেশী, অথচ খরচ কম, হাঙ্গামা কম। সরকারী লোকেরা গণিয়া দেখিয়াছেন, আমাদের এই জলপাইগুড়ি জেলায় গাই গরু আছে তিনলক্ষ আট হাজার। আমরা যদি গরুর জাত ভাল করিতে পারি, তবে উহার অর্দ্ধেক, কি তিন ভাগের একভাগ পরিমাণ গরু রাখিলেই চলিতে পারে। তিনলক্ষ আট হাজারের জায়গায় দেড়লক্ষ কি একলক্ষ ভাল গরু হইলেই চলে। তেমনি বলদ আছে তিনলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার। সেই জায়গায় এক লক্ষ একুশ হাজার ভাল বলদেই বেশ ভাল ভাবে কাজ চলে। বাচ্চা আছে দুই লক্ষ ছয় হাজার। সেই হিসাবে বাচ্চার সংখ্যাও কম হইয়া একলক্ষ তিন হাজারে আসিতে পারে। তাহা হইলে দেড় লক্ষ গাই, এক লক্ষ একুশ হাজার বলদ এবং এক লক্ষ তিন হাজার বাছুর রাখিলে আমাদের বেশ কাজ চলে, অথচ গরুগুলিও পেট পুরিয়া খাইতে পায়, গরুর জাতও ভাল হয়।

তারপর, আমাদের এ জেলায় ষাঁড় আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। অতগুলি ষাঁড়ের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের গাই গরুর সংখ্যা তিন লক্ষ আট হাজার। প্রত্যেক ষাটটি গরুর জন্য একটি ষাঁড় হইলেই যথেষ্ট। সে হিসাবে মাত্র পাঁচ হাজার ষাঁড়ের বেশী লাগে না। পঁয়তাল্লিশ হাজার ষাঁড় অর্থাৎ বহু ষাঁড় দরকার তার অনেক অনেক বেশী রহিয়াছে। ষাঁড়

বেশী থাকার আরও বিশেষ দোষ আছে, সে সব কথা পরে বলিব। পূর্ব্বপ্রদত্ত হিসাবানুযায়ী—

গাইগরু	
বলদ	
বাছুর	
ষাঁড়	৪৫,০০০
মোট	৪,১৯,০০০

মোট এই চারিলক্ষ উনিশ হাজার গরু অথবা বেশী পোষা হইতেছে; অথচ তাহাদিগকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারা যাইতেছে না এবং তাহাদের দ্বারা ভাল কাজও পাওয়া যাইতেছে না। ফলে গরুর জাত ক্রমে খারাপ হইতেছে।

অতএব দেখা গেল আমাদের দেশে গরুর সংখ্যা খুব বেশী অথচ অত বেশী গরুকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা নাই। আর যত গরু আছে তত বেশী গরু না থাকিলেও চলে।

উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের আবশ্যকতা

ভাল ষাঁড়ের দ্বারা ভাল গরু জন্মাইবার চেষ্টা আমাদের দেশে মোটেই হয় না। ভাল ষাঁড়ের দ্বারা ভাল গাইতে বাছুর জন্মাইলে সে বাছুরও ভাল হয়, সঙ্গে সঙ্গে দুধও বাড়ে। মন্টগোমারি ও হিসার ষাঁড় খুব ভাল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, দুই সের দুধওয়ালা বেশী গাইতে ঐ ষাঁড় দ্বারা বাছুর জন্মাইলে সেই প্রথম বারের বাছুরের দুধ দুই সের হইতে চার সেরে উঠিয়াছে এবং আবার সেই বাছুরের পেটের বাছুরের দুধ সের দুধ হইয়াছে।

খারাপ ষাঁড় ও খারাপ গাইয়ের বাছুর হইলে সে বাছুরও খারাপ হয়, দুধও কমে; ভাল ষাঁড় ও খারাপ গাইয়ের মিলনে বাছুর কিছু ভাল হয়, দুধও কিছু বাড়ে; আর ভাল ষাঁড় ও ভাল গাইয়ের মিলনে বাছুর খুবই ভাল হয় এবং দুধও খুব বেশী হয়।

অনেক ভাল গাই খারাপ ষাঁড়ের দ্বারা বাছুর জন্মাইবার ফলে একেবারে খারাপ হইয়া যায়। সেই জন্য প্রথম লক্ষ্য রাখা উচিত যেন ভাল ষাঁড় ভিন্ন অন্য ষাঁড়ের দ্বারা বাছুর না হয়। আমাদের দেশে যত ষাঁড় থাকা উচিত তার অপেক্ষা নয় দশ গুণ বেশী ষাঁড় আছে। এই সকল ষাঁড় বেশীর ভাগই রোগা, দুর্ব্বল ও আকারে ছোট। অনেক স্থলেই এই সব খারাপ জাতের ষাঁড়ের দ্বারাই বাছুর জন্মিতেছে, কাজেই গরুর জাত অতি তাড়াতাড়ি খারাপ হইয়া পড়িতেছে। গরুর জাত ভাল করিতে হইলে ষাঁড়ের দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত, কেন না একটী গাই বছরে একটী মাত্র বাচ্চা দেয়, কিন্তু একটী ষাঁড় এক বছরে সত্তর পঁচাত্তরটী বাচ্চার জন্ম দিয়া থাকে। কাজেই গ্রামে গ্রামে যে সকল খারাপ ষাঁড় আছে, সেগুলিকে বলদ করিয়া দেওয়া উচিত; বর্ষের ষাঁড় হইলে সেগুলিকে পিঁজরাপোলে পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে, এইসকল নিকৃষ্ট ষাঁড়ের দ্বারা আর গরুর জাত খারাপ হইতে পারিবে না।

অন্য ষাঁড়গুলির এইরূপ ব্যবস্থা করার পর ভাল যেগুলি থাকিবে, সেগুলিকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে হইবে এবং ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। গ্রামবাসীরা ইচ্ছা করিলে ভাল জাতের সুস্থ এঁড়ে বাছুরগুলি জেলা বোর্ডকে দিয়া দিতে পারে অথবা বিক্রি করিতে পারে। ভবিষ্যতে ভাল ষাঁড় হইবে এমন এঁড়ে বাছুর জেলা বোর্ড কিনিয়া লইতে পারে এমন ব্যবস্থাও থাকা উচিত। জেলা বোর্ড, ছাড়া ইউনিয়ান বোর্ড, কৃষি সমিতি, পিঁজরাপোল, সমবায় সমিতি প্রভৃতি ভাল ষাঁড় রাখিয়া এবং আরও নানা উপায়ে গরুর উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে। এঁড়েগুলি আড়াই বৎসর তিন বৎসরের হইলে তবে উহাদের দ্বারা জনন কার্য্য করান উচিত, তৎপূর্ব্বে নহে।

জেলার সদরে, জেলখানায়, সরকারি অথবা বে-সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে ভাল ষাঁড় রাখা হয়। এই রকম দুই চারিটি জায়গায় ভাল ষাঁড় রাখিলেই গরুর জাতের উন্নতি হইবে না, অথবা দুধ সরবরাহ বাড়িবে না। একটা গাই ১৪।১৫ মাস পরে একটি বাচ্চা দেয়। যত বাছুর জন্মে, সাধারণতঃ তার অর্দ্ধেক বাচ্চা ও অর্দ্ধেক বাচ্চি হইয়া থাকে। যদি বাচ্চাগুলি যত্ন করিয়া পালন করা যায় তবে বর্ত্তমানের মন্দ জাতের ষাঁড়গুলি সরাইয়া দিয়া, অতি তাড়াতাড়ি গরুর

জাতের উন্নতি করা যাইতে পারে। একটি ভাল ষাঁড় এক বৎসরে অনায়াসে অন্ততঃ ২০টি বাচ্চা ও ২০টি বাচ্চির জন্ম দেয়। এই কুড়িটি বাচ্চা আবার তিন বছর বয়স হইলে আরও কুড়িটি বাচ্চা ও ২০টি বাচ্চির জন্ম দিতে পারে। তাহা হইলে একটি ষাঁড় হইতে দশ বছরে কমপক্ষে ১০০০ ভাল গাই ও ১০০০ ভাল ষাঁড় পাইবার আশা করা যায়। কিন্তু একটি গাই হইতে এই দশ বছরে মাত্র ৮টি বাচ্চা ও ৮টি বাচ্চির বেশী পাওয়া যায় না। কাজেই ভাল ষাঁড়ের দিকে আমাদের খুবই নজর দেওয়া উচিত।

আমাদের জলপাইগুড়ি জেলায় যত গাই আছে, তাহাতে পাঁচ হাজার ষাঁড় হইলেই খুব ভাল চলিতে পারে। পাঁচ হাজার ভাল ষাঁড় উৎপাদন করিতে মাত্র এক বৎসর সময় লাগে। কিন্তু জেলার সর্ব্বত্র যদি এক সঙ্গে চেষ্টা হয়, তবে আরও অল্প সময়ে পাঁচ হাজার ষাঁড় উৎপন্ন করা যায়।

আমাদের চা বাগান সকল এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। প্রতি চা বাগানে অনেক গরু থাকে। ঐ সকল বাগানে গাই গরুর সংখ্যানুসারে মালিকেরা যদি ২।১টি করিয়া ভাল ষাঁড় রাখেন, তবে গরুর অতি দ্রুত উন্নতি হইতে পারে এবং দুগ্ধ-সমস্যা দূর হইতে পারে।

একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একই ষাঁড় এক বাগানে তিন বৎসরের অধিক সময় রাখা উচিত নহে। কেননা, তিন বৎসর বয়সে সকল বকনাই গর্ভ ধারণের যোগ্য হইয়া উঠে, তখন সেই পূর্ব্বের ষাঁড় যদি বাগানে রাখা হয়, তবে পিতা ও পুত্রীতে মিলন হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে বংশের অবনতির বিশেষ আশঙ্কা। জন্ম-বিজ্ঞানের ইহা একটি প্রধান সূত্র। তিন বছরের পূর্ব্বেই বাগানে বাগানে ষাঁড়গুলি অদল-বদল করিলে আর এই আশঙ্কা থাকে না।

ইউনিয়ন-বোর্ডগুলিও ঠিক এই প্রণালীতে কাজ করিতে পারে। এই কাজ করিতে পারিলে, ইউনিয়ন বোর্ডের খুব বড় একটা কাজ করা হইবে।

ষাঁড়কে যদি সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখা হয়, তবে সেই ষাঁড় জনন-কার্য্যে কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করে। কাজেই ষাঁড়কে গরুর দলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে দেওয়াই ভাল। আবার ষাঁড় যদি দেখিতে খুব বড় হয়, তবে গাই তাহাকে দেখিয়া ভয় পায়, অনেক সময় গাই ষাঁড়কে দেখিয়া ভয়ে শুইয়া পড়ে। কিন্তু ষাঁড় দলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলে কোন পক্ষেরই ভয় থাকে না। বেড়ানোর দরুণ ষাঁড়ের একটু অঙ্গ-চালনাও হয়, আর চরিয়া যা খায় তাহাতে বাড়ীর খাওয়ার পরিমাণ কম পড়ে, সুতরাং ষাঁড় পোষার খরচও কম হয়।

পূর্ব্বে ঘণ্টগোমারী ও হিসার ষাঁড়ের দ্বারা বাচ্চা উৎপাদনের কথা বলিয়াছি। সরকারী লোকেরা ঢাকা রংপুর প্রভৃতি স্থানে দেশী গরুতে এই সকল ষাঁড় দ্বারা বাছুর জন্মাইয়া কিরূপ ফল পাইয়াছেন নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে :—

যে স্থানের গাই	প্রতিদিন যত দুধ দেয়	যত দিন দুধ দেয়	একবার বিয়ানে যত দুধ পাওয়া যায়	গাইয়ের দৈর্ঘ্য
১। দেশী গাই (মণ্টগোমারি ষাঁড় দ্বারা)			৪৮০ সের	৫২ ইঞ্চি
২। ঐ গরুর বাছি			১৬০ „	৬০
৩। ২ নম্বরের বাচ্চি			১৬৮০ „	৬৪ „
(ক) দেশী গাই (হিসার ষাঁড় দ্বারা)	৩ „		৮১০ „	
(খ) ঐ গরুর বাচ্চি	৫ „		১৩৫০ „	
(গ) 'খ'এর বাচ্চি	৮ „		২১৬০ „	৬৬ „

কয়েক বৎসরের মধ্যে দুধে এবং গরুর আকারে কত পরিবর্ত্তন, কত উন্নতি! অনেকে বলেন, বন্টগোয়ারি অথবা হিসার ষাঁড় এদেশে বেশী দিন টেকে না। কথাটা মিথ্যা নয়, আবার মিথ্যাও বটে। এই সকল শক্তিশালী গরু অযত্ন, অবহেলা এবং খাওয়ার কষ্ট মোটেই সহিতে পারে না। কিন্তু তাহাদিগকে যদি উচিত মত যত্ন করা যায় ও রীতিমত খাইতে দেওয়া হয়, তবে তাহারা এদেশের বেশ টিকিয়া যায়।

গাভীন হইবার উপযুক্ত বয়স

গরুর জাত খারাপ হইবার আরও একটি কারণ আছে। বকনাগুলির তিন বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে কিছুতেই তাহাদের 'গাভীন' হইতে দিতে নাই। কারণ উহাতে বকনাগুলিও আর বাড়ে না এবং উহাদের পেটে যে বাছুর জন্মে সেগুলিও খুব ছোট এবং দুর্ব্বল হয়। ভাল খাইতে পাইলে দুই বৎসর বয়সের সময়ই অনেক বকনার প্রথম 'ডাক' আসে। ঐ বয়সে বকনাগুলির দেহ পুষ্ট হয় না; কাজেই সে সময় যাহাতে ষাঁড়ের সহিত উহাদের দেখা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য বকনাগুলির বয়সের হিসাব রাখা বিশেষ আবশ্যক। অনেক স্থলে বকনা কিংবা এঁড়ের বয়সের হিসাব রাখা হয় না। কিন্তু গরুর জাত ভাল করিতে হইলে এই বিষয়ে নজর রাখা উচিত। এঁড়ের অস্ত্রচালনোপযোগী বয়স সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

গরুর খাদ্য

কম খাইতে দিয়া বেশী গরু রাখিলে গরুর জাত খারাপ হয়। আমাদের দেশে তাহাই হইয়াছে। কম গরু থাকিলে উহারা খাদ্য বেশী পায়। যে সকল জায়গায় গরু কেবল চরিয়া খাইয়াই বাঁচে, সেখানে গো-চারণ ভূমি অপেক্ষা গরু বেশী হইলে, সমস্ত গরুরই খাওয়া কম হয় এবং ক্রমে ক্রমে সব গরু মরিয়া যায় অথবা বেয়ারামে ভুগিয়া ভুগিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। সেই সকল আবলেটা খাওয়া গরুর দ্বারা কোন কাজ পাওয়া যায় না, তাহারা দুধও দেয় না, আর যদিই বা দুধ দেয়, তাহা এত অল্প যে উহা না দেওয়াই সামিল। যদি চরিয়া খাইতে না পায় তবে প্রত্যেক ষাঁড় প্রত্যেক গাই ও প্রত্যেক বলদকে প্রতিদিন দশ সের পরিমাণ ধানের পোয়াল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খাইতে দিতে হয়, আর তার সঙ্গে গরু পিছু এক সের করিয়া খইল আর এক সের ভাসা দিতে হয়। গরুর পেট ঠাণ্ডা থাকিলে তাহারা অনেক বেশী কাজ করিতে পারে আর বাঁচেও অনেক দিন। আবলেটা খাওয়া বলদ চার পাঁচ বছর পরেই অকেজো হইয়া পড়ে; কাজেই চার বছর পরে কৃষকদিগকে নূতন বলদ কিনিতে হয়। কিন্তু যদি বলদগুলিকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারা যায় তবে আট দশ বছরের মধ্যে আর বলদ কিনিতে হয় না। কাজেই, যতগুলি গরুকে বেশ ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারা যায়, ততগুলি গরুই রাখা উচিত, তাহার বেশী কখনই রাখিতে নাই; তাহাতে কোন লাভ নাই, কেবল লোকসান। দশটি গরু রাখিয়া উহাদিগকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে না পারিলে গরুগুলিরও কষ্ট নিজেরও ক্ষতি। সেই জায়গায় পাঁচটি গরু রাখিলে, গরুগুলিও ভাল থাকে নিজেরও লাভ হয়। তাহাতে গরুর মালিকও যথেষ্ট দুধ পায়, এবং বাড়ার ভাগ দুধ বিক্রি করিয়া পয়সা পায়। এইরূপে যাহাদের গরু নাই তাহাদের ও দুধের কষ্ট দূর হয়। ভাল গরু রাখিলে, উহার প্রতিপালনের খরচ পোষাইয়া লাভ হয়, আর মন্দ গরুর দুধের দ্বারা উহার খাওয়ার খরচই পোষায় না। মন্দ গরু রাখা কেবল একটা লোকসানের ব্যাপার।

ভাল করিয়া চরিয়া খাইতে না পাইলে, প্রতিদিন প্রতি গরুকে নিম্নলিখিতরূপ খাদ্য দেওয়া উচিত :—

ষাঁড়ের জন্য	
পোয়াল (ভাটা)	১০ সের
খইল	১ ,,
ভাসা (কলাই)	১ ,,
চালের খুদ কুঁড়া	১ ,,
লবণ	১ ছটাক

ষাঁড়ের দ্বারা যদি খুব বেশী করিয়া জমি চাষ করাইতে হয়, তবে আরও আধ সের ভাসা বেশী করিয়া

দিতে হইবে। খুব কুঁড়োর অভাবে দানা এক সের বেশী দিলেও চলিতে পারে। এ ছাড়া প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করিয়া চরিতে দিতে হয়।

বলদকেও ঠিক ষাঁড়ের মতই খাওয়াইতে হয়। তবে যে বলদ কাজ করে না, তাহাকে দানা এবং চালের কুঁড়ো দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

প্রতি গরু যে পরিমাণ ঘাস খাইবে তার দুই আনা অংশ যদি কাঁচা হয় তবে খুবই ভাল হয়।

দুধওয়ালা গাইকেও উপরের তালিকা মতই খাইতে দিতে হয়, তবে পোয়াল ছাড়া অন্য জিনিসগুলি একটু বেশী দিতে হয়। কলাই সিদ্ধ ও ভাতের ফেন খাইতে পাইলে গরুর দুধ খুব বাড়ে। দুধওয়ালা গাই গরুকে নীচের তালিকা মত খাইতে দিতে হয় :—

পোয়াল (কাটা)	৮ সের
খইল	১½ „
দানা	১½ „
ভাতের ফেন	১০ „
মাষ কলাই	½ „
লবণ	২ ছটাক

দুধাল গাইকে কাঁচা ঘাস যত দেওয়া যায় ততই ভাল। সকালে এবং বিকালে চরানি দেওয়া চাই। খোলাগুড় দিতে পারিলে দুধের পরিমাণ এবং গুণ উভয়ই বাড়ে।

যে গাই দুধ বন্ধ করিয়াছে তাহার জন্য :—

পোয়াল	৮ সের
খইল	৩ পোয়া
লবণ	২ ছটাক
ভাতের ফেন	৮ সের

ইহার পর চরানি যত হয় ততই ভাল।

বাছুরের (এক মাসের বেশী বয়সের) জন্য—

পোয়াল (খুব ছোট করিয়া কাটা)	৩ সের
খইল	১ পোয়া
ভাইল খোসা	১ ঐ
লবণ	২ ছটাক

আর মায়ের দুধ যত দেওয়া সম্ভব দিতে হয়।

বাছুরগুলি যাহাতে ভালভাবে খাইয়া বেশ বড় হইয়া উঠে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। কেন না বাছুর ভাল না হইলে গরুর জাত ভাল হইতে পারে না। পঞ্চাশ সের কি এক মণ ওজনের একটি বাছুরের জন্য দিন ৩ সের ৪ সের দুধের প্রয়োজন; উহা পাইলে তবেই বাছুর ভালভাবে বাড়িতে পারে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশের অনেক গরু তিন চার সের দুধই দেয় না; কাজেই বাছুর শুকাইয়া মরে। যে সামান্য দুধ বাঁটে থাকে, তাহা ছাড়িয়া লওয়া হয়, বাছুর শুধু ঘাঁট চাটে। দুধের বদলে বাছুরকে আর কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থাও নাই, ফলে না খাইয়া না খাইয়া অল্প দিনেই বাছুর মরিয়া যায়।

গোচারণ ভূমির অবস্থা

উপরে যে খাদ্য তালিকা দেওয়া হইল সেই মত খাদ্য কোন গরুই বড় একটা পায় না। অনেক সময়েই গরু কেবলমাত্র শুকনা পোয়াল চিবাইয়া কোন রকমে বাঁচে। গরুর সংখ্যার তুলনায় চরানি জমির পরিমাণ খুব কম; কাজেই চরানিতে যাইয়া গরুর খাওয়া কিছুই হয় না, কেবল নড়াচড়া দ্বারা শরীর-চালনা হয় মাত্র। চরানিতে গরু যে সামান্য ঘাস পায়, এবং সেই সামান্য ঘাসে যে যৎসামান্য সার পদার্থ থাকে, তাহা ঘাস হজম করিবার জন্য যে শক্তির আবশ্যক হয়, সেই শক্তি যোগাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, শরীর বাড়াইবার, শরীরে জোর করিবার মত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তারপর চরানি জমিতে বেশী ঘাস না থাকায় জন্য গরু কেবল অনবরত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; শরীরের মধ্যে দুধ তৈয়ারির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা এই ছোটাছুটিতেই নষ্ট হয়, দুধ তৈয়ারি আর হইয়া উঠেনা।

ঘাসের আবাদ

গরুকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে হইলে ঘাসের আবাদ করা উচিত। রংপুর অঞ্চলে কোন কোন জায়গায় ঘাসের আবাদ করা হয়। ঘাসের আবাদ খুব লাভের

যাবনা। কোন কোন ঘাস বছরে তিনবার হইতে ছয়বারও কাটা চলে। সরকারি কৃষি-বিভাগের লোকদের বলিলে, তাঁহারা এই ঘাসের বীজ আনাইয়া দিবেন এবং কেমন করিয়া এই ঘাসের আবাদ করিতে হয় তাহাও বলিয়া দিতে পারিবেন। রহনাগুড়িতে কৃষি-বিভাগের যে লোক আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অথবা চিঠি লিখিয়া সমস্ত কথা জানা যাইবে।

ঘাসের জমি করিতে হইলে তিন বিঘা জমিতে ১৫০/০ মণ গোবর সারের প্রয়োজন হয়। একটি মাত্র গরু হইতেই বছরে ১৫০/ মণের অনেক বেশী গোবর পাওয়া যায়। তিন বিঘা জমির আবাদের খরচ বছরে ১৫০৲ টাকার বেশী নয়। কিন্তু এত টাকা খরচ করিয়া ঘাসের আবাদ করিলে কৃষকের পোষাইবে কিনা সে সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

মনে করুন চারিটি গরু কেবলমাত্র চরাণি খায়; তাহাদের কোন দিন সামান্য কিছু পেট ভরে, আবার কোন দিন তাও ভরে না। এই মত চারিটি গরু হইতে বছরে ১০০০ সের দুধ কোন রকমে হয়ত পাওয়া গেল। এক হাজার সের দুধের মোট দাম, টাকায় চার সের হিসাবে ২৫০৲ টাকা। কিন্তু যদি আমি তিন বিঘা জমিতে ঘাস আবাদ করি, তবে ছয়টি গরুকে খুব ভাল করিয়া খাইতে দিয়া রাখিতে পারিব। এই ছয়টি গরু বছরে কম সে কম ৭৫০০ সের দুধ দিবে; টাকায় চার সের হিসাবে এই দুধের দাম ১৮৭৫৲ টাকা। দানা ও খইলের জন্য আরও খরচ হইবে বছরে ৩৫০৲ টাকা। তাহা হইলে ঘাস আবাদের খরচ ১৫০৲ আর দানা খইলের খরচ ৩৫০৲ টাকা, মোট খরচ ৬০০৲ টাকা; অথচ দুধ বিক্রি করিয়া পাইলাম ১৮৭৫৲ টাকা। তাহা হইলে লাভ থাকিল ১২৭৫৲ টাকা। আরও বেশীর ভাগ ছয়টি খুব ভাল বাছুর পাওয়া গেল। কিন্তু ঘাসের আবাদ না করিয়া যদি জমি পতিত রাখিয়া চরাণি খাওয়ান হইত, তবে মাত্র ২৫০৲ টাকা পাইতাম, গরুর পেট ভরিত না, আর যে চারিটি বাচ্চা হইত, তাহারাও অতি মন্দ জাতের হইত।

আলোচনার সারমর্ম্ম

আমরা যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখা গেল গরুর উন্নতির জন্য আমাদের দুইটি কার্য্য অবশ্য করা উচিত—

১। গরুকে খুব ভাল করিয়া খাইতে দেওয়া,

২। উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের দ্বারা বাচ্চা উৎপাদন করা।

গরুকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে হইলে আবার—

(ক) কম গরু রাখিতে হইবে, এবং

(খ) ঘাসের চাষ করিতে হইবে।

ভাল ষাঁড়ের দ্বারা বাচ্চা জন্মাইতে হইলে—

(ক) গ্রামে গ্রামে উৎকৃষ্ট ষাঁড় রাখা দরকার,

(খ) মন্দ ষাঁড়গুলি দুই বৎসর বয়সের সময়ই খসন করিয়া দেওয়া উচিত, এবং

(গ) ষাঁড়গুলি যাহাতে আড়াই বছর তিন বছর বয়সের পূর্ব্বে প্রজনন কার্য্য না করে, এবং বকনাগুলি যাহাতে তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে 'পাভীন' না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

১০৭ নং বেহুবাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীহরিদাস দাস, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

ফাল্গুন—১৩৩৬ ৪র্থ বর্ষ—৮৯শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান_উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৬

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

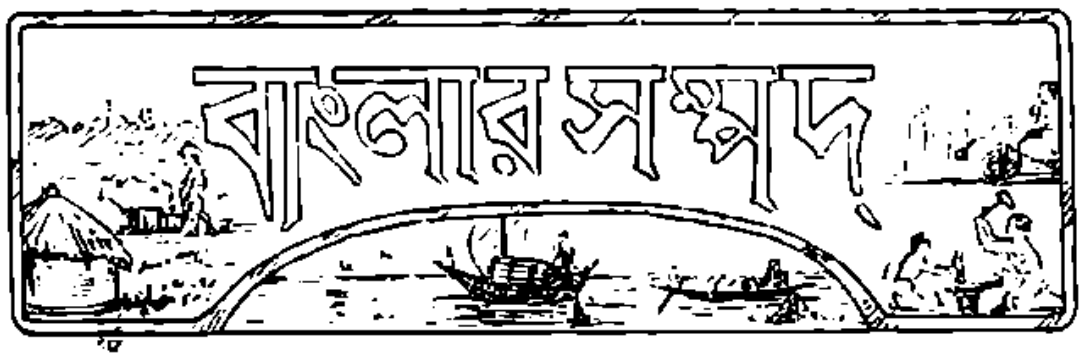

বাংলা দেশের বাসন-শিল্প

কাঁসা-পিতলের বাসন-নির্ম্মাণ বাংলার এক অতি প্রাচীন শিল্প। ধনী দরিদ্র সকলে এই বাসন ব্যবহার করে বলিয়া এই শিল্প বহু লোকের জীবিকার উপায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বাংলায় এক কাপড় বোনা ছাড়া আর কোন গৃহশিল্পে এত লোক নিযুক্ত থাকে না। প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটী টাকার বাসন বাংলার কাংস্যশিল্পীরা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে।

প্রায় সকল জেলাতেই সহরে ও গ্রামে কাঁসা-পিতলের বাসন নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ঢাকা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বাঁকুড়া—এই জেলাগুলিই এই শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক উপায়ে কাঁসা, পিতল ও তরণের বাসন প্রস্তুত হয়। একটিকে 'পেটাই' ও অপরটিকে 'ঢালাই' বলে। পেটাই প্রণালীতে পরিশ্রমও বেশী লাগে এবং ইহার গঠন-কার্য্যেও যথেষ্ট শিল্প-কৌশল আছে; এই সকল কারণে ইহাতে খরচও বেশী পড়ে। পেটাই প্রণালীতে প্রথমে খুঁটকে বা কাঁসাকে গুড়া করিয়া মুচির মধ্যে পুরিয়া গলাইয়া লওয়া হয়; পরে সেই গলিত কাঁসা মাটির পাত্রে সামান্য তৈল দিয়া ঢালা হয়। পরদিন উক্ত খুঁটকে অর্থাৎ কাংস্যপিণ্ডগুলি হাপোরে পোড়াইয়া ৬ জন হইতে ১০ জন হাতুড়ীর ঘা দ্বারা 'পাহানা' করিয়া খুটিকে ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া পাত প্রস্তুত করে। পরে কাংস্য-শিল্পীকে উক্ত পাতগুলি যত্ন-সহকারে পুনরায় হাপোরে লাল করিয়া পোড়াইয়া ধীরে ধীরে হাতুড়ীর সাহায্যে গঠনকার্য্য সমাধা করিতে হয়।

পরিশ্রম ও খরচের দিক্ দিয়া ঢালাই প্রণালী পেটাই প্রণালী অপেক্ষা ভাল। ইহাতে ছাঁচে করিয়া গলিত পিতল বা রাংতামা ছাঁচে ঢালিয়া বসিয়া ঠাণ্ডা ও

কুড়িয়া লইলেই হইল। কিন্তু এখন যে ভাবে চালাইয়ের বাসন তৈয়ারী হয় তাহাতে এগুলি পাতলা বা হাল্কা হয় না। ওজন ভারি বলিয়া এগুলি অল্প দামেও বিক্রয় করা সম্ভব হয় না।

বাংলার বাসন-শিল্প ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে। এলুমিনিয়ম্ ও এনামেলের বাসন সস্তা বলিয়া অনেকে কাঁসা ও পিতলের পরিবর্ত্তে এগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৩-২৪ সনে শুধু উত্তার এলুমিনিয়ম ধাতু ও উহাতে তৈয়ারী জিনিষপত্র আমাদের দেশে আসিয়াছিল তাহার প্রায় দেড়গুণ মূল্যের ঐ সকল জিনিষ গত বৎসর ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে। কাঁসার বাসন যাহারা তৈয়ার করে তাহাদের নিজেদের অবস্থা ভাল নহে। দারিদ্র্যের জন্য ইহারা নিজেরা মাল কিনিয়া জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারে না। মহাজনেরা ইহাদের জন্য মাল ক্রয় করে, এবং পারিশ্রমিক আগাম দেয় সুতরাং তৈয়ারী জিনিষের মূল্যও তাহারাই ঠিক করে, লাভের অংশও তাহারাই পায়। কাংস্যশিল্পীরা এখন অধিকাংশ স্থলে মাসিক ১৫৲ হইতে ১৫৲ টাকা বেতনের সাধারণ শ্রমিকে পরিণত হইয়াছে।

কাংস্যশিল্পকে উন্নত করিতে হইলে নূতন পন্থায় সুন্দর মজবুত ও হাল্কা জিনিষ তৈয়ারী করিতে হইবে। কিছুদিন হইল বাংলার ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনিয়ারের চেষ্টায় চালাই প্রণালীতে কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ারীর এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কয়েকটী স্থানে পরীক্ষায় এই নূতন উপায়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। কাঁসা ও পিতলের বাসনের সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট, এই নূতন পন্থা সকল দিক্ দিয়া সুবিধাজনক হইলে তাহাদিগেরই ইহা অবলম্বন করা উচিত।

কাংস্যশিল্পের উন্নতির জন্য কাংস্যশিল্পীদের সমবায় সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে শুধু যে এই সকল শিল্পীর আর্থিক অবস্থাই ভাল হইবে তাহা নহে, নানা ভাবে শিল্পের উন্নতির জন্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতে পারিবে। বাংলায় কাংস্যশিল্পীদের কয়েকটি সমবায় সমিতি আছে। কিন্তু নানা কারণে এগুলি আশানুরূপভাবে বাড়িতে পারিতেছে না। ঢিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাঁসারীদের যে সমবায় সমিতি আছে, গত বৎসর তাহা ছাড়া এইরূপ শিল্পীদের অন্য কোন সমিতি তেমন ভালভাবে চলে নাই।

কাংস্যশিল্পীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া, সমবায় সমিতি গঠন করিয়া, নূতন উপায়ে হাল্কা ও সস্তা বাসন তৈয়ারীর চেষ্টা করিয়া এই শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। তাহা না হইলে এই শিল্প বাংলার অন্যান্য অনেক গৃহ-শিল্পের মত ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। বাংলার শিল্পবিভাগ এ বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে প্রস্তুত। নূতন চালাই প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে লিখিলে যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যাইবে।

(অনুবাদ)

বাংলার পাট

পূর্ব্বে বাংলা দেশ হইতে পাটজাত দ্রব্যই রপ্তানি হইত, কাঁচা পাট রপ্তানি হইত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতে কাঁচা পাট রপ্তানির সূত্রপাত হয়। ১৮৩৮ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক হাজার টন কাঁচা পাট নমুনা-স্বরূপ বিলাতে প্রেরণ করে। কিন্তু কোম্পানী এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও, কাঁচা পাটের নিয়মিত রপ্তানি কারবার প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৫ সন হইতেই আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে কাঁচা পাটের রপ্তানি কারবার ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে। এই সময়ের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে ভারতের বাহিরে কেবলমাত্র বিলাত, ফ্রান্স এবং আমেরিকায় কাঁচা-পাট রপ্তানি হইত। ইহা ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন বন্দরেও সামান্য পরিমাণে রপ্তানি হইত। এই সময়ে বাংলা দেশ হইতে যে পরিমাণ কাঁচা পাট রপ্তানি হইত তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সন	হন্দর
১৮৩৫—৩৬	১৫ হাজার
১৮৩৬—৩৭	১৬৫
১৮৪৫—৪৬	২১২

সন	বস্তা
১৮৫৫—৫৬	৮৮১ হাজার
১৮৬৫—৬৬	৩৪৭২
১৮৭২—৭৩	৭২৫৫

উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কাঁচা পাটের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে বোঝা যাইবে।

১৯০৯—১০	মোট	৪০৮১ হাজার গাঁইট
১৯১৪—১৯	"	৫৫৫৯ "
১৯১৯—২৪	"	৬৫২৮ "
১৯২৫—২৬	"	৩৮২৪ "
১৯২৬—২৭	"	৩৯৬৪ "

এক গাঁইটের পরিমাণ ৪০০ পাউণ্ড (প্রায় ৪ মণ)।

নিম্নে কোন্ দেশে কি পরিমাণ কাঁচা পাট রপ্তানি হয় তাহার হিসাব দিয়ে দেওয়া গেল।

	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
ব্রিটেন	১৭৭	২০৮ হাজার গাঁইট
জার্মানি	৮১০	১০২৫ "
আর্জেন্ট	৩৮৮	৪৯১ "
ফ্রান্স	৪৯৬	৫০৪ "
ইটালী	২৭৫	৪৫০ "
বেলজিয়াম	১৮৪	১৮৪ "
স্পেন্	১৬৭	১৮৭ "
অন্যান্য দেশ	৩২৩	২৯০ "

বর্তমানে জার্মানিতেই পাটের সর্বাপেক্ষা বড় বাজার। অন্যান্য দেশের মধ্যে জাপান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাপান উত্তরোত্তর যেরূপ অধিক পরিমাণে কাঁচা পাট ক্রয় করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে জাপান কাঁচা পাটের বড় বাজার হইবে।

কলিকাতার পাটের বাজার

গত ২০শে জানুয়ারী কলিকাতার পাটের গাঁইটের বাজার খুব নরম ছিল। ক্রেতাদের আদৌ আগ্রহ দেখা যায় নাই, বিক্রেতারা নিম্নলিখিত মূল্যে মাল বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল।

"ফাট"	জানুয়ারী ডেলিভারি	৪৪৫০
"লাইটনিং"	ঐ	৪০৲
"হাট"	"	৪২৫০

ঐ দিন বোম্বে পাটের বাজারও নরম ছিল, ঐ তারিখে সেখানে "ফোর" ৯৫০ মূল্যে অনেক ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল। কলওয়ালারা কেহই পাট ক্রয় করে নাই।

ঐ তারিখে হাটখোলাতে—

আমদানি	১৭০০০ মণ
রপ্তানি	১৬০০০ "
মজুত	৭৮১০০৬ "

ঐ দিন বেলাডাঙ্গা ৭৫০ হইতে ১১৫০ মূল্যে ১৩৫০০ মণ এবং মিলওয়ালারা ৮৫/০ হইতে ৯৷০ মূল্যে ২৫০০ মণ পাট ক্রয় করিয়াছে।

গত বৎসর এই তারিখে আটের মূল্য ৯৷০ হইতে ১০৷৵০ ছিল।

গো-সাপ-বহু লাভালাভ

বোয়ালী সহরে ও সহরের নিকটবর্তী গ্রামসমূহে গো-সাপ মারিয়া তাহার চামড়া বিক্রয় করিবার একটা সুন্দর ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছে। গো-সাপ বিষধর সর্পের ভিম ও ছানা খাইয়া থাকে। তাহাতে বিষধর সর্পের সংখ্যা হ্রাস পায়। বোয়ালীর মত সর্পবহুল স্থানের পক্ষে গো-সাপ যে কত উপকারী, এই ব্যবসায়ীরা তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা পয়সার লোভে অনবরত হইতে শত শত গো-সাপের চামড়া আনিয়া আমাদের চক্ষের উপর বিক্রী করিতেছে।

যাহাতে ইহারা গো-সাপ বধ করিতে না পারে, আমরা তজ্জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি।

(বোয়ালী মিটরেন্স)

জলপাইগুড়িতে জলের কল

জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ বহুদিন

গভর্ণমেণ্টের নিকট জলের কলের যে স্কিম দাখিল করিয়াছিলেন তাহা অনুমোদিত হইয়াছে।

স্কিমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রতিদিন ১০২,৫০০ গ্যালন জল সরবরাহ হইবে। মোট ব্যয় পড়িবে ১৫০০০০৲ টাকা। ৫ ইঞ্চি পরিধির দুইটী টিউব-ওয়েল হইতে জল সংগৃহীত হইয়া সহরের মধ্যস্থলে উচ্চে স্থাপিত ৩৫০০০ গ্যালন-জল ধরে এমন একটি চৌবাচ্চায় রক্ষিত হইবে। এইখান হইতে রাস্তায় এবং বাড়ীতে বাড়ীতে জল প্রদত্ত হইবে।

সরকার ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। বাকী ১ লক্ষ টাকা নিম্নলিখিত ভাবে সংগৃহীত হইবে: সরকার হইতে ঋণ ২৫০০০৲, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ৩০০০০৲, গৃহে জল স্থাপনের খরচ বাবদ প্রাপ্য ৩০,০০০৲, সাধারণ চাঁদা ১৫০০০৲। বাৎসরিক চলতি খরচ ৮৫৭৪৲ টাকা পড়িবে। মিউনিসিপ্যাল বোণ্ডিংএর বাৎসরিক মূল্যের উপর শতকরা ৪৲ টাকা হারে করদাতাগণকে জলকর দিতে হইবে। সহরের অধিবাসীকে জন প্রতি ১১ আনা ৯ পাই অতিরিক্ত কর দিতে হইবে।

(হিতোক্তা)

বঙ্গের লবণ ব্যবসায়

ভারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত লবণ ব্যবসায়ের উন্নতি করা সম্ভবপর কিনা, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য এতদিন পরে শুল্ক সমিতির উপর ভার পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের বাজার বিদেশী লবণে পরিপূর্ণ। স্পেনের লবণ, লিভারপুলের লবণ, এডেনের লবণ, পোর্টসৈয়দ হইতে আমদানি লবণ ও অন্যান্য বিদেশজাত লবণে ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। এদিকে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের ও উড়িষ্যার লবণ ব্যবসায় একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৃটিশ শাসনকালেই ভারতের লবণ-ব্যবসায়ের ধ্বংস আরম্ভ হয়। ক্রমে এদেশে যত লবণ আমদানি হইত, তাহার শতকরা ৮০ অংশ দাঁড়াইয়াছিল লিভারপুলের বিলাতী লবণ। এখন বিলাতী লবণের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শতকরা ১৫ ভাগ হইয়াছে। বিদেশী লবণের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া দেশে লবণ প্রস্তুতের অনুমতি প্রদান করিলে এখনও ভারতের লবণ-শিল্প পুনরায় মাথা তুলিতে পারে।

(শান্তিবার্ত্তা)

কুমিল্লায় চাউলের দর

কুমিল্লার বাজারে উৎকৃষ্ট চাউল ৮৲ টাকা, মাঝারি ৫৸০ আনা ও নিকৃষ্ট ৫৷০ আনার অধিক নহে। রোয়া ধানের ফসল আশানুযায়ী হওয়ায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দক্ষিণ অঞ্চলেরও প্রায় সর্ব্বত্রই চাউলের বাজার একটু নামিয়াছে।

পাটের চাষ

দেশে দিন দিনই পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। যে কৃষকের ১ হোল জমি আছে সে ৸০ কানিতে পাট ও বাকী ৸০ কানিতে ধান দিতেছে। ধানের চাষ অপেক্ষা পাটের চাষে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় অনেক অধিক। তথাপি অজ্ঞানের কৃষকগণ পাটের চাষে সময় ও পরিশ্রম নিয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। কয়েক বৎসর যাবৎ পাটের বাজার যেরূপ নামিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহারা লাভবান্ হওয়া দূরে থাকুক বরং ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে। বৎসরের পর বৎসর তাহাদের ঋণের ভার বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিকিরদিক চারি বৎসর পূর্ব্বে কি কারণে জানি না, পাট কোম্পানী একবার তাঁহাদের হাতের মুঠো খুলিয়াছিলেন, সেই বৎসর পাটের চাষে বিস্তর লাভ পাওয়ায় আমাদের সরলবিশ্বাসী কৃষকগণের মোহ এত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই আর তাহা কাটিতেছে না। অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয় থাকিবে, মহাজনের তাড়না সহ্য করিয়াও আরও নূতন ঋণ করিতে হয় করিবে, তথাপি ধানের চাষ বাড়াইয়া পাটের চাষ কমাইবে না। আবার পাট কোম্পানীর "কটক জল"-বর্ষণে তৃষিত কণ্ঠের পিপাসা জুড়াইবার প্রত্যাশায় তাহারা প্রতিয়া রহিয়াছে। এই মরতায় কৃষকগণের ও দেশের ভবিষ্যৎ শুভ হইবে কি অশুভ হইবে তাহা দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

আমাদের মনে হয়, বিদেশ হইতে টাকা আনিয়া দেশের ধনধন বৃদ্ধি করিবার জন্য পাট ভিন্ন দেশে অন্য পণ্য নাই। যদিও পাটের টাকার অধিকাংশই আমাদের বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়া যাইয়া বিদেশীয়ই হাতে পড়িতেছে, তথাপি পাটের প্রসাদেই আমরা টাকার মুখ দেখিতেছি। পাট দুর্লভ টাকাকে অনেকটা সুলভ করিয়া দিয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও ৮।১০ গ্রাম অনুসন্ধান করিলে ২।৩ সহস্র মুদ্রার মালিক হয়ত একজন মিলিত। তিনিই "ধনকুবের" বলিয়া ওঞ্চলের সর্ব্বত্র পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। বর্ত্তমানে ২০।২৫ হাজার টাকাওয়ালা ধনী প্রায় প্রতি গ্রামেই ২।৩ জন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আরও পারিপার্শ্বিক কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, পাটকেই দেশের মূলধনের প্রধান বাহনের পদ দিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, নির্ব্বিঘ্নতার দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে পাটের পক্ষে ইহাই বলা যায় যে, অতিবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতিতে অন্যান্য ফসল একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই সমস্ত কারণে পাট সমূলে বিনষ্ট হয় না। প্রকৃতির যে কোনও প্রতিকূল অবস্থায় পাতিত হইয়াও পাটের চাষ কৃষকের পরিশ্রমকে অন্যান্য পরিমাণে সফল করিয়া থাকে। (উদ্ধৃত)

কলিকাতায় মোটরের সংখ্যা

কলিকাতায় মোটরের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। আগে মোটরের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কলিকাতার মোটরের সংখ্যার সাম্প্রতিক হিসাব নিম্নরূপ : প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা ২৬,০০০ হাজার, ট্যাক্সী এবং লরী ৬০০০ কিংবা ৭০০০ হাজার হইবে।

হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স

স্বদেশী যুগে বাঙ্গালীর টাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কিত যে কয়টী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটী তাহাদের অন্যতম। উক্ত কোম্পানী গত বৎসর এক কোটি টাকার অধিক জীবন বীমার কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীর মধ্যে একমাত্র ন্যাশন্যালকে বাদ দিলে আর কোন কোম্পানীই কোন সময়ে এক বৎসরে এক কোটি টাকার কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে দেশীয় লোকের পরিচালিত বীমা কোম্পানীর মধ্যে আর মাত্র ৩।৪ টী কোম্পানী বৎসরে কোটি টাকার কাজ করে। হিন্দুস্থান বীমা-জগতে বাঙ্গালীর কার্য্য-দক্ষতা ও ব্যবসায়-বুদ্ধির সাফল্য প্রমাণিত করিয়াছে।

১৯২৮-২৯ সনে কোম্পানী ১,৩৮,৪৭,২৪০ টাকা মূল্যের ৬৮২০খানি আবেদন-পত্র পাইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫২৮৪ খানি আবেদন-পত্রের জন্য ১,০১,৯০,৭৪০ টাকার বীমাপত্র বা পলিসি প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মোট বীমার পরিমাণ ৩,৮৭,৪৭,৪৮৪ টাকা। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটী মৃত্যু বা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় জন্য ২,০২,৫০১ টাকা দাবী বা ক্লেম রূপে প্রদান করিয়াছে। এ বৎসরের মোট আদায়ী প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১৭,৪৫,০১২ টাকা এবং প্রাপ্য সুদের পরিমাণ ৪,৬০,৬৮০ টাকা। সমস্ত খরচ বাদে ৫,৪৬,২৫১ টাকা বীমা তহবিলে জমা হইয়াছে। বর্ত্তমান বীমা তহবিলের পরিমাণ ৮২,৩২,৭০৩ টাকা। সোসাইটীর সমস্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় এককোটি টাকা।

হিন্দুস্থান ভারতের সর্ব্বত্র, সিংহলদ্বীপে, ব্রহ্মদেশে এবং এমন কি সুদূর বৃটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকাতেও শাখা বিস্তার করিয়াছে।

(জীবন বীমা)

ঢাকা জিলার ইউনিয়ন বোর্ড

ঢাকায় ১৯২৮-২৯ সনে ৩০৭টী ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। ইহাদের উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল ১০৯১৫৬ টাকা, খোয়াড় হইতে আয় হইয়াছিল ১১৮৮৯ টাকা, খেয়া ঘাটের আয় হইয়াছিল ৪৯১ টাকা। এই সকল ইউনিয়ন বোর্ড আলোচ্য বর্ষে ৩৭ (ক) ধারায় ৩২৬৯০৬ টাকা ও ৩৭ (খ) ধারায় ১৩৬৪৩৯ টাকা ইউনিয়ন রেট আদায় করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঐ বৎসর সাহায্য বাবদ প্রদান করিয়াছেন ৯৪২৭ টাকা। জিলা বোর্ড পল্লী স্বায়ত্ত শাসন আইনের ৪৫ ধারায় ৩০৫১১ টাকা ও ৩৩ ধারায় ৬১৯০ টাকা বোর্ডসমূহে দান করিয়াছেন। দান ও অন্যান্য

বিষয় আলোচ্য বর্ষে ২১০৪৪ টাকা আদায় হইয়াছে। পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ৪১ ধারা অনুসারে জরিমানা আদায় হইয়াছে ৮০৬ টাকা। ঢাকা জিলায় ১৯২৮-২৯ সনে বেঞ্চ ও কোর্ট হইতে যথাক্রমে আয় হইয়াছে ১৪২৯৬ ও ৩৭৫৩৯ টাকা। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্ব মোট আয় হইয়াছে ৭৫৮২৬ টাকা। এই বৎসর চৌকিদার ও দফাদারের জন্য বোর্ডসমূহকে ব্যয় করিতে হইয়াছে ২৭২৪৭১ টাকা। ইহাদের পোষাকের জন্য গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইয়াছে ১১৩০২ টাকা। রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত্-বাবদ ব্যয় হইয়াছে যথাক্রমে ৩৫১২১ ও ৪৮৩০৫ টাকা। জল-সংস্থানে ব্যয় হইয়াছে ৭৫৮৩১ টাকা। শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৩২৫১৩ টাকা। চিকিৎসার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৮৯৬৯ টাকা।

বাংলার জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী

১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ আক্টে অনুযায়ী বাংলায় সর্ব্বসমেত ৯১,০৮,০০০ টাকা অথরাইজ্‌ড্ মূলধন লইয়া কতকগুলি নিবন্ধিতসংখ্যক অংশে ভাগ করিয়া মোট ৩৫টি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১২টী ব্যাঙ্ক অফিস্	৮,৪৮,০০ টাকা।
৫টী লোন অফিস্	১,০০,০০০
২টী জীবন, অগ্নি ও সমুদ্র বীমা	২০,০০,০০০
১টী মোটর সংক্রান্ত বিনিময়পত্রের ব্যবসায় ও উৎপাদন	
১টী বাস চলাচল সংক্রান্ত	
১টী ছাপা, পুস্তক প্রকাশ ও খনিহারী	
১টী লৌহ ইস্পাত ও জাহাজ নির্ম্মাণ	
২টী এজেন্সি (ম্যানেজিং এজেন্ট কোম্পানী ঘটিয়া)	৪০,০০০
২টী অন্যান্য ব্যবসায় ও উৎপাদন-বিষয়ক	৫,৫০,০০০
১টী কাপড়ের কল	১৫,০০,০০০
২টী চা চাষ বিষয়ক	১৫,০০,০০০
১টী অন্যান্য চাষ বিষয়ক	৫০,০০০
২টী কয়লার খনি বিষয়ক	
১টী সম্পত্তি, জমি ও ঘরবাড়ী বিষয়ক	
৯টী হোটেল, থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক	১২,০০,০০০ ,,
মোট	৯২০৮০০০ টাকা

জল সেচের ফলাফল (১৯২৭-২৮)

বর্ষার অবস্থা

১৯২৭ সনে বর্ষা ঠিক সময়েই নামে। বর্ষাতে দেশের কৃষির কিছু দিয়া উন্নতিও মন্দ হয় নাই। দেশের সর্ব্বত্রই বারিপাত প্রায় সমান ছিল। আসাম, সিন্ধু প্রদেশ, রাজপুতানার পশ্চিমাংশ, গুজরাট ও মাদ্রাজের উত্তরোপকূলে বারিপাত সাধারণ অপেক্ষা কিছু বেশী দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, বিহারে, পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং সীমান্ত প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে সাধারণ অপেক্ষা বারিপাত কিছু কম দেখা যায়। তাছাড়া দেশের সর্ব্বত্রই সাধারণ অবস্থার (বর্ষালের) শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যেই আলোচ্য সনে বারিপাত ছিল। আলোচ্য বৎসরে দেশের সর্ব্বত্র গড়ে সাধারণ অবস্থার তুলনায় শতকরা ৪ ভাগ কম বৃষ্টি হয়।

সিঞ্চিত জমির পরিমাণ

১৯২৭-২৮ সনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মোট ২৭½ মিলিয়ন একর জমিতে জল সেচ করা হয়। ১৯২২-২৩ সনে আলোচ্য সন অপেক্ষা ৪ ভাগ বেশী জমিতে অর্থাৎ মোট ১৮½ মিলিয়ন একর জমিতে জল সেচ হয়। এই বৎসরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমিতে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে জল সেচ করা হয়।

পূর্ব্ব তিন বৎসরের সহিত তুলনা

কয়ন রাজ্যগুলি বাদ দিয়া বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আলোচ্য বৎসরে কত জমিতে জল সেচ করা হইয়াছে, গত তিন বৎসরের গড় হিসাবের সহিত তাহা তুলনা করিয়া নিম্নে দেখান হইতেছে।

প্রদেশ	১৯২৪-২৭ সনে সিঞ্চিত জমির গড় হিসাব	১৯২৭-২৮ সনে সিঞ্চিত জমির হিসাব
মাদ্রাজ	৭,১৭৮,৪৫৭	৭,১৯০,১৩১
বোম্বাই	৪৩৭,০০০	৪১১,০০০
সিন্ধু প্রদেশ	৩,৫৪২,০০০	৩,৩৪৩,০০০
বাঙ্গালা	৯৫,৪১৮	১০২,২৪৩
যুক্ত প্রদেশ	২,৬৭৮,১৭৮	২,৩৩২,৮০৩
পাঞ্জাব	১০,৩৪৯,১২১	১০,৩৮১,৪৩৭
ব্রহ্মদেশ	১,৮৭১,৯৫৫	১,৯৪০,৪৩৩
বিহার ও উড়িষ্যা		
মধ্য প্রদেশ		
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৫৭,৩২৫	৩৯১,৬১৩
রাজপুতানা	২৩,২৭২	৩১,৪৪২
বেলুচিস্থান	২২,০৮৯	২৩,৬৬৩
মোট	২৭,৮৮৬,৭৮৮	২৭,৫১৪,৩৪৮

সিঞ্চিত জমি হইতে আয়

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবে সব চেয়ে বেশী জমিতে সেচ কার্য্য হয়। আলোচ্য বৎসরের সংখ্যা ১০৪ মিলিয়ন একর। এই সংখ্যা

১৯২৪-২৩ সনের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ১০৬ মিলিয়ন একর হইতে মাত্র প্রায় ৯ মিলিয়ন একর কম দেখা যাইতেছে। ইহার উপরেও ৬৬৫,০০০ একর জমিতে কৃত্রিম নালা হইতে জল সেচ করা হয়। ভারতীয় করদ রাজ্যের ভিতরকার খালগুলি হইতে উক্ত নালাগুলিতে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঞ্জাবের পরেই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। সেখানে ৭·২ মিলিয়ন একর জমিতে জল সেচ করা হয়। ইহার নিম্নে সিন্ধুপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ; এই দুইটী প্রদেশে আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ৩·৪ ও ২·৩ মিলিয়ন একর জমিতে জল সেচ করা হয়।

জল সেচ ও নৌ-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত খরচ বাবদ ১৯২৭-২৮ সনে বৎসরশেষে অসমাপ্ত কাজগুলি ধরিয়া মোট ১১৫০১ লক্ষ টাকা খোক ভাঙ্গা হয়। বৎসরে মোট ১২১০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়, ইহার মধ্যে খরচ বাবদ ৬৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। সুতরাং মোট খোক খরচের উপর আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৬·৩৭ আয় হয়।

প্রদেশগুলিতে জমির উর্ব্বরতা বাড়াইবার জন্য যত পুঁজি ঢালা হইয়াছে আলাদাভাবে তাহার হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ঢালা পুঁজির উপর আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবেই আয় বেশী হইয়াছে।

সিঞ্চিত জমির তুলনায় ফসলী জমির পরিমাণ

১৯২৭-২৮ সনে বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সিঞ্চিত জমির কতখানিতে ফসল পাকিয়াছিল এবং মোট কত জমিতে চাষ হইয়াছিল তাহাই আলাদা করিয়া নিম্নে দেখান হইয়াছে :—

	মোট কত জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে	গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে যত জমিতে সেচ হইয়াছে	বোনা জমির তুলনায় যত জমিতে সেচ হইয়াছে	১৯২৭-২৮ সনের শেষে মোট খরচ (লাখ টাকা)	করদ রাজ্যের অধীনে সিঞ্চিত জমিতে প্রাপ্ত ফসলের মূল্য (লাখ টাকা)
মাদ্রাজ	৩৮,৫৫৮,০০০	৭,১৯১,০০০	১৮·৬৫	১,৪৩৭	৩,৮৩৭
বোম্বাই	২৫,৯৭৪,০০০	৪১১,০০০	১·৬	৯৯১	৪০৫
সিন্ধু প্রদেশ	৪,২৬৬,০০০	৩,৩৫৩,০০০	৭৬·৮	১,২৭৭	৮৫৬
বাঙ্গালা	২৬,০৬১,০০০	১০২,০০০	·৪	৪২৯	৯৭
যুক্ত প্রদেশ	৪২,৭৭৬,০০০	২,৩৩০,০০০	৫·৫	৪,১২৩	১,৪৭৫
পাঞ্জাব	২৯,৪৭০,০০০	১০,৩৮১,০০০	৩৫·২	৩,০৯৬	৪,৪৭৩
ব্রহ্ম প্রদেশ	১৮,১০৭,০০০	১,৯৪০,০০০	১০·৭	৫৯৮	৮০৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯,৫৯৪,০০০	৯৪১,০০০	৩·২	৬২৮	১৯৫
মধ্য প্রদেশ (বেরার ছাড়া)	২০,৪১৯,০০০	৪১৫,০০০	২·০	৪৯৭	৪২৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২,৫৬৯,০০০	৩৯২,০০০	১৫·৩	২৮৮	২২৮
রাজপুতানা	৪৭৫,০০০	৩১,০০০	৬·৫	৩৫	১৪
বেলুচিস্থান	৩১৯,০০০	২৪,০০০	৬·৩	৩২	৬
মোট	২৫৮,৭৬৮,০০০	২৭,৫১৪,০০০	১১·৫	১১,৫৩১	১৩,২৪৮

ভারতে গম উৎপাদন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্য হইতে প্রাপ্ত বিবরণীর সারমর্ম লইয়া নিম্নোক্ত হিসাব দেওয়া হইল। ভারতের গম চাষের মোট জমির শতকরা ৯৮ ভাগের খবরই এ হিসাবে আছে। কাশ্মীর বাদে ভারতের আর সমস্ত বড় বড় গম-উৎপাদক স্থানের হিসাব এই সঙ্গে আছে। ১৯২৯-৩০ সনের জানুয়ারীর প্রথম পর্যন্ত যে সব জমিতে গম বোনা হইয়াছে সাধারণতঃ তাহার হিসাবই পাওয়া গিয়াছে।

সর্বসুদ্ধ মোট ৩৯,০১৯,০০০ একর জমিতে ১৯২৯-৩০ সনে গম বোনা হইয়াছে। পূর্ব বৎসর ৩০,৪০৪,০০০ একর জমিতে গম বোনা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৪ ভাগ কম জমিতে গম বপন হয়। গম বুনিবার সময় আবহাওয়ার অবস্থা তেমন ভাল না থাকিলেও শেষ পর্যন্ত ফসল মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

প্রদেশ ও রাজ্যগুলির উৎপাদনের বিস্তৃত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল :—

প্রদেশ অথবা রাজ্য	১৯২৯-৩০ প্রথম অনুমান (হাজার একর)	১৯২৮-২৯ প্রথম অনুমান (হাজার একর)	১৯২৮-২৯ শেষ সংখ্যা (হাজার একর)
পাঞ্জাব	১০,৭৮১	১০,৭৪৭	১১,২১৯
যুক্ত প্রদেশ	৩,৮২১	৮,৮৮৪	৯,২১৮
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৩,০২০	৩,৪৭৪	৩,৩১০
বোম্বাই	১,৮৮৪	১,৯৪৬	২,৫০১
বিহার ও উড়িষ্যা	১,১৯৬	১,২১০	১,২১৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,০২০	৯৩২	১,০৬৮
বাঙ্গালা	১৪০	১২২	১২৩
দিল্লী	১৮	৪১	৪১
আজমীর মাড়োয়ার	১৯	১৭	৩১
মধ্য ভারত	১,০২৮	১,৪৭৬	১,৮৮৯
গোয়ালিয়র	৭১৬	১১,৯৫	১,০২১
রাজপুতানা	৮৭৮	১,০৬৫	১,০৯৫
হায়দারাবাদ	৯৬৮	১,০১২	১,১০২
বড়োদা	৪৭	৭১	৮৮
মহীশূর	৩	২	৩
মোট	২৯,৩১৯	৩০,৪০৪	৩২,০১১

কলিকাতার বিদেশী বাণিজ্য

১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে বিদেশের সহিত কলিকাতার বাণিজ্য পূর্ব মাসের মত উন্নতিশীল দেখা যায় নাই। ইহার কতকটা কারণ এই যে, আলোচ্য মাসে ছুটীর সংখ্যা বেশী ছিল। আমদানি মালের পরিমাণ ৭·৮৪ কোটি টাকা হইতে ৫·৫৯ কোটি টাকায় নামিয়া গিয়াছে। আর রপ্তানির পরিমাণ ১৩·৫৪ কোটি টাকা হইতে ১১·৩০ কোটি টাকায় নামিয়া গিয়াছে। পূর্ব বৎসরের ঠিক ঐ সময়ের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, আমদানি ও রপ্তানির

পরিমাণ যথাক্রমে ১·৩২ ও ১·৭৩ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

আমদানি

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যার সহিত আলোচ্য মাসে বিদেশ হইতে কলিকাতায় প্রধান প্রধান মালের আমদানি-সংখ্যা তুলনা করিয়া নিম্নে যোগ ও বিয়োগের চিহ্নদ্বারা কত কম বেশী তাহা দেখান হইয়াছে।

	লক্ষ টাকার হিসাব
সুতির মাল	১·৬৯ (—২১)
কলকারখানা ও মিল	৪১ (—৫)
লৌহ ও ইস্পাত	৪৫ (—৩৮)
চিনি	৩৭ (—১৪)
খনিজ তৈল	২২ (+৭)
অন্যান্য ধাতু	১৯ (+২)
শস্য, ডাল ও ময়দা	১৪ (—৩১)
লৌহ-নির্ম্মিত আসবাব	১৪ (+১)
বিজলী-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	১৩ (সমান
খাদ্য দ্রব্য	১১ (—২)

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, বিদেশী মালের আমদানি বাড়্‌তির মধ্যে এক খনিজ তৈলই উল্লেখ-যোগ্য। এ ছাড়া আর প্রায় সমস্ত মালের আমদানিতে ভাটা পড়িয়াছে দেখা যায়। সুতির জিনিষের বাজার বরাবরই মন্দা ছিল। পাকান ও আলগা সুতির আমদানির পরিমাণ ১,১১১,০০০ পাউণ্ড হইতে ৭১৫,০০০ পাউণ্ডে নামিয়াছে এবং মূল্য ১৬ লক্ষ টাকা হইতে ৯ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। পিস্ গুড্‌সের আমদানির পরিমাণ ৬৮ মিলিয়ন গজ হইতে ৬৬ মিলিয়ন গজে নামিয়াছে, মূল্য ১·৬৯ লক্ষ টাকা হইতে ১·৫৪ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। এই কমতির প্রধান কারণ আলোচ্য মাসে সাদা কাপড়ের কম আমদানি এবং সুতার ও রঙিন কাপড়ের মূল্য-হ্রাস। লৌহ ও ইস্পাতের সমস্ত রকমের মালের দামই কমিয়া যাওয়ায় মোটের উপর মাসকাবারে মূল্য ৩৬ লক্ষ টাকা কম দেখা গিয়াছে। চিনির আমদানিও অসম্ভবরকম কম দেখা গিয়াছে। চিনির আমদানির পরিমাণ ৩০,০০০টন হইতে ২৩,০০০ টনে নামিয়াছে, এবং মূল্য ৪৮ লক্ষ টাকা হইতে ৩৫ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। খনিজ তৈলের আমদানিতে যদিও তেমন সামঞ্জস্য ছিল না, তবু আমেরিকা ও ইষ্টইণ্ডিজের কণিয়া বাদে আর সমস্ত দেশ হইতে খুব বেশী পরিমাণে কেরোসিন আমদানি হইয়াছে। শস্য, ডাল ও ময়দার আমদানি এত বেশী কমিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ এই যে, গত বৎসরের এই মাসের তুলনায় আলোচ্য মাসে গমের চাহিদা অনেক কম ছিল। বৎসরের ডিসেম্বর মাসে গমের চাহিদা অত বেশী থাকার কারণ এই ছিল যে, ঐ সময়ে দেশী গমের ফসল ভাল হইয়াছিল না।

রপ্তানি

আলোচ্য মাসে প্রধান প্রধান রপ্তানি মালের সংখ্যা ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া কম অথবা বেশী রপ্তানির পরিমাণ নিম্নে যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন দিয়া দেখান হইয়াছে :—

	লক্ষ টাকা
পাট-জাত মাল	৪·২৯(+৪৩)
কাঁচাপাট	২·৮০(—৯০)
চা	১·৫১(—৭৭)
গালা	৫৬(—২১)
কাঁচা ও শুকনো চামড়া	২৯(—১৪)
শস্য, ডাল ও ময়দা	১২(—২)
লৌহ ও পিগ	১১(—১)
তিসি	১২(+৩)
ম্যাঙ্গানিজ	১১(—২)

রপ্তানির অবস্থা আমদানি অপেক্ষা বিশেষ ভাল ছিল না। অন্যান্য জিনিষের রপ্তানি কমতির তুলনায় পাট-জাত মাল ও তিসির রপ্তানির বাড়তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। চটের চাহিদা বেশ ভালই ছিল। বরাবরের মত এক যুক্তরাষ্ট্রই আলোচ্য মাসে কলিকাতার অধিকাংশ চট লইয়াছে এবং বিলাত লইয়াছে চটের থলিয়াগুলি।

কাঁচা পাটের অধিকাংশ বিলাতে গিয়াছে। বিলাত আলোচ্য মাসে কলিকাতার চায়েরও বড় খরিদ্দার। কলিকাতার গালা ও কাঁচা চামড়ার বেশীর ভাগ লইয়াছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্‌নো চামড়ার খরিদ্দার জার্ম্মাণি। "শস্য, ডাল, ও মহুয়া" দফার মধ্যে চাউল রপ্তানিটাই বেশী হয়। এই চাউল বেশী যায় সিংহলে। জাপান আগা-গোড়াই কলিকাতার পিগ্‌ লোহার প্রধান খরিদ্দার। অষ্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সেই তিসির চালান বেশী যায়। ম্যাঙ্গানিজ বেশী যায় বেলজিয়ামে।

বি, বি, এণ্ড সি, আই রেলওয়ে		৪০৮	৪১৩	+৫
বর্ম্মা	"	১৮৩	১৭৪	−৯
ই, বি,	"	২৪১	২৪২	+১
ই, আই	"	৫২৯	৬৪৩	+৪৪
জি, আই, পি	"	৫৭১	৫৯০	+১৯
এম্‌ এণ্ড এস্‌ এম্‌	"	২৬২	২৬৬	+৪
এন্‌ ডাব্লিউ		৬৩৭	৬৭৭	+৪০
এস্‌ আই	"	১৮০	১৮৯	+৯
		৩,৪৯৯	৩,৮৭২	+১৭৩

ভারতীয় রেলের ব্যয়

	১৯২৮ খৃঃ ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১৯২৯ খৃঃ ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	হ্রাসবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)
ই, বি, রেলওয়ে	৬৮	৭৬	
বি এন্‌	৩৪০	৩৯২	

পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয়

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মোট ৫৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে। ১৯২৮ সনে এই মাসেই যে সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছিল তাহার মূল্য হইয়াছিল ৩৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। ১৯২৭ সনে ডিসেম্বর মাসে সার্টিফিকেট বিক্রয়ে আয় হইয়াছিল ৩৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

ভারতীয় ফসলের পূর্ব্বাভাষ (১৯২৯-৩০)

ফসল ও তাহার হিসাব	আবাদী জমির আনুমানিক পরিমাণ (একর)	১৯২৮-২৯ সনের আবাদী জমির হিসাব (একর)	আনুমানিক ফলন	পূর্ব্ব বৎসরের ফসলের পরিমাণ
পাট (৪র্থ হিসাব)	৩,৩১৭,০০০	৩,১৪৪,০০০	৯,৭৮৭,০০০ বেল	৯,৯৪৬,০০০ বেল
তুলা (তৃতীয় হিসাব)	২৩,৫০৬,০০০	২৬,৪৮৪,০০০	৪,৩২০,০০০ বেল	৫,৬০৮,০০০ বেল
আখ (দ্বিতীয় হিসাব)	২,৫৩৫,০০০	২,৫৭৯,০০০	•	২,৭৩৫,০০০ টন
ধান (দ্বিতীয় হিসাব)	৭৬,৭৪৫,০০০	৮২,১২৬০০০	•	৩১,৬৮৪,০০০ টন
গম (প্রথম হিসাব)	২৯,৩১৯,০০০	৩২,০১১,০০০	•	৮,৫০৭,০০০ টন

(• হিসাব অসম্পূর্ণ)

ভারতবর্ষে দেশী তুলার ব্যবহার

(১) বৃটিশ ভারত

	১৯২৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের কাটতি	১৯২৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের কাটতি	১৯২৯সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কাটতি	১৯২৮সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কাটতি
বম্বে	১০,৫০০ (৪ শত পাঃ বেল)		১১৯,৮১৩ বেল	৮৬,০৩৭ বেল
আমেদাবাদ	২৮,৬৮০		৮৯,০০৩	৭৫,৪৮০

	১৯২৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের কাটতি	১৯২৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের কাটতি	১৯২৯সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কাটতি	১৯২৮সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কাটতি
বম্বে প্রদেশ	১১৫,৩৫২	৯৩,৮৯৭	৩৩৯,৪৫৬	২০৩,০৫১
মাদ্রাজ প্রদেশ	১৭,৯৯৪	১৫,৪৪৪	৫৩,৩২৪	৪৬,৭৭৫
যুক্তপ্রদেশ	১৮,৩২৬	৯৩,৫০৮	৫৪,৬৪৬	৪৩,০১৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১০,৮৬২	৯,৪৫২	৩১,০৭১	২৮,৭৭০
বাংলা প্রদেশ	৮,৫৪৯	৭,২৮০	২৩,৩৯৪	১৮,০১৯
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৪,৪৮০	৪,৫০৬	১৬,৯১০	১৩,৭৯৭
অন্যান্য স্থান	১,৯৫০	১৭৪০	৫,৫২২	৫,০০৭
বৃটিশ ভারত	১৭৮,৫১৩	১৪৬,৮১৭	৫২৪,৩২৩	৩৫৮,৪৪৪

(২) দেশী রাজ্যসমূহ

রাজ্যের নাম	১৯২৯ খৃঃ নভেম্বর মাসের কাটতি	১৯২৮ খৃঃ নভেম্বর মাসের কাটতি	১৯২৯ ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কাটতি	১৯২৮—১লা সেপ্টেম্বর হইতে কাটতি
হায়দ্রাবাদ রাজ্য	১,৫২১ (৪ শত পাঃ বেল)	১,৩২৯ বেল	৪,৬২২ বেল	৪,১৫১ বেল
মহীশূর রাজ্য	৩,৮৫০	৩,৭১৯ „	১১,২৯০ „	১০,৭৮১ „
বড়োদা রাজ্য	৪,৪৪০	৪,০২৩ „	১২,৮৫৩ „	১১,৯৭৯ „
গোয়ালিয়র রাজ্য	৩,৫০৮	২,৭২০ „	১০,৫২৯ „	৮,৬২৬ „
ইন্দোর রাজ্য	৬,৮০২	৬,০৬৪ „	২০,২৮১ „	১৭,৭১৭ „
অন্যান্য রাজ্য	৪,৭৭২ „	৪,৪৬৯ „	১৪,৬৮৬ „	১৩,৫০০ „
মোট	২৪,৮৯৩ „	২২,৩২৪ „	৭৪,২৬১ „	৬৬,৭৫৪ „

কয়লা উত্তোলন ও স্থানান্তরে প্রেরণের হিসাব (১৯২৯ নভেম্বর এবং ডিসেম্বর)

প্রদেশ ও খনি	নভেম্বর মাসের চরম হিসাব		ডিসেম্বর মাসের মোটামুটি হিসাব	
	উত্তোলন (টন)	প্রেরণ (টন)	উত্তোলন (টন)	প্রেরণ (টন)
আসাম	২৬,৪১৯	২৪,৭৬৪	২৮,৫৯০	২৫,০৪৮
বেলুচিস্থান	৫৪২	৩৮৭	৫৩২	৪১৬
বাংলা—রাণীগঞ্জ ক্ষেত্র	৩৯২,৯৪৯	৪২৭,৪৬৪	৪৭১,৭৮৯	৪৭৮,০৪৫

	সপ্তেম্বর মাসের চলন হিসাব		ডিসেম্বর মাসের মোটামুটি হিসাব	
	উত্তোলন	প্রেরণ	উত্তোলন	প্রেরণ
বেহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ—				
রাণীগঞ্জ ক্ষেত্র	৪৯,৮৮৬	৪৪,১৪২	৬৫,৯৮১	৬২,৫৯২
ঝরিয়া „	৭৩৩,৪২৪	৭৫৪,১৮৮	৮৯২,১৫১	৮৫৪,০২৬
বোকারো „	১৮৫,৮৭২	১৮১,৮৫২	২০৯,২০৫	২০৪,৪৪০
গিরিধি „	৩৭,৬২৭	৩৭,৪৫২	৫০,৫৪৯	৪৪,০৩৫
জৈন্তী „	৩,০৭৯	৩,০০৬	৪,১৭৭	৩,১৯১
ডাল্টনগঞ্জ খনি	১২১		১৩৪	
রামপুর খনি	২,৭৭২	১,৮৬৪	৩,৫৯৫	২,৪৭১
কারাণপুরা খনি	৪৩,০৪২	৪২,০২০	৪৩,০৩৪	৪৩,০৭৯
বিহার উড়িষ্যা মোট	১,০৪৫,৮২৩	১,০৭৬,১২৪	১,২৬৯,৬৬৪	১,২৪৪,৮৪২
মধ্যপ্রদেশ	৩১,১৮৮	৫১,৬৯২	৭২,২৮৩	৬৮,২০৭
পাঞ্জাব	৩,৬৯৪	২,৯৬২	৩,৬১২	৩,১৯৬
সর্ব্বসমেত	১,৪৪০,৭১৫	১,৫৯১,৩১০	১,৮৪৫,২৮০	১,৮২৯,৭২৭

বিলাতের মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কিং

বিলাতে কয়েক বৎসর হইতে মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ দেখা গিয়াছে। বার্মিংহাম মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কই বিলাতে এই ধরণের সর্ব্বপ্রথম ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্ক বাস্তবিকই সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহার দেখাদেখি আরও প্রায় ১৯টী মিউনিসিপ্যালিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য দরখাস্ত পেশ করিয়াছিল; কিন্তু বিলাতের রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই।

রক্ষণশীল দল যে এইরূপ মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাহার কারণ আছে। প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে বার্মিংহাম মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় কমসে কম এককোটি পাউণ্ড। পাছে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ভাত মারা যায় অর্থাৎ বড় বড় পুঁজিওয়ালাদের আর্থিক লেনদেনে অসুবিধা ঘটে, এই ভয়ে রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কিংএর একটা বিরোধী হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের ভয় যে নিরর্থক এবং স্বার্থপ্রণোদিত তাহা বার্মিংহাম ব্যাঙ্কের কয়েক বৎসরের কর্ম্মকাণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

বার্মিংহাম মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক

এই ব্যাঙ্কটী ১৯১৬ সনে স্থাপিত হয়। [illegible] স্বার্থসাধনের জন্য নূতন উপায়ে অর্থের সংস্থান করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮০, ১২৯জন অর্থাৎ ১৯২৮ সনের চেয়ে ২৫,১৯৬ জন বেশী। ঐ তারিখে ডিপোজিটারদের ক্রেডিটের তরফে অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,২৭৪,৬২৫ পাঃ। বারমাসে মোট বাড়তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২০৩,১৮৪ পাঃ। বিলাতের সেভিংস ব্যাঙ্ক-জগতে এ একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। একটী সহরের মারফতে কোন সেভিংস ব্যাঙ্কে এত অর্থ এত শীঘ্র কোন কালেই জমা হইতে দেখা যায় নাই।

আলোচ্য সনে এই ব্যাঙ্কে কিরূপ লেনদেন হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল :—

আমানতের পরিমাণ	৪,৫৯৪,৭০৩ পাঃ
তুলিয়া লওয়া অর্থের পরিমাণ	৩,৭০৪,৫৬২ পাঃ
লেনদেন কারবারের সংখ্যা	১,৫৯৪,৮২৪

১৯২৮ সনে মোট মুনাফা দাঁড়ায় খরচপত্র বাদে ২৮,৩১৭ পাঃ। এই অর্থ ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কটী প্রকৃত পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সনে। তাহার পরে ১৯২৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্ক ৮,৮০৮টী বাড়ী বন্ধক লইয়াছে এবং আগাম দাদন করিয়াছে ২,৯০৯,৪২৯ পাউণ্ড।

বার্মিংহাম মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কের প্রায় ৩০টী ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চগুলি সহরের নানা স্থানে অবস্থিত। ব্যাঙ্ক হইতে গৃহস্থালীর উপযোগী ছোট ছোট সেফ্ দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। এই ধরণের সেফের চাহিদাও যথেষ্ট। ব্যাঙ্কের যে সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট ব্রাঞ্চ আছে, ডিপোজিটরগণ ঐ সমস্ত ব্রাঞ্চের দ্বারা কর্পোরেশনের জল, গ্যাস ও বিজলীর ট্যাক্স শোধ দিয়া থাকে।

বার্মিংহামবাসীর ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয়

এই মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থ প্রধানতঃ আমানতকারিগণকে বাড়ী তৈরী করার জন্য ধার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া যাহা বাঁচে তাহার অর্দ্ধেক ট্রাষ্টিজ সিকিউরিটিতে খাটান হয়, এবং অর্দ্ধেকখানা অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট সিটি কর্পোরেশনের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। কর্পোরেশন শতকরা ৩ হারে আমানতকারীদের সুদ দেয়। ব্যাঙ্ক পরিচালনের খরচ পড়ে ½%; কর্পোরেশন খাটায় ৪% হারে, সুতরাং দেখা যাইতেছে, কর্পোরেশন ১% হিসাবে অর্থাৎ মোট ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয় করিতেছে। বার্মিংহামবাসী করদাতাদের পক্ষে ইহা কম সুবিধার কথা নহে। বার্মিংহামের দেখাদেখি বিলাতের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির এবং তথা গোটা বিলাতবাসীর মাথায় টনক নড়িয়াছে। কিন্তু প্রমাদ গণিতেছে বেসরকারী ব্যাঙ্কওয়ালাগণ। সাধারণের চোখ ফুটিলে আর রক্ষা নাই। আর এমন বেহায়া কে আছে যে ৩% হারে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া আবার নিজেরাই দল বাঁধিয়া কর্পোরেশনের তরফ হইতে ৪% কিংবা ৫% হারে সেই ব্যাঙ্কের নিকটই ঋণ লইতে যাইবে।

বার্মিংহাম মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী দেখিয়া বেশ টের পাওয়া যাইতেছে যে, এই ধরণের ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতা কত বেশী। কিন্তু তবু যে গভর্ণমেণ্ট কেন মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। জাতির তাগা নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রেডিট দ্বারা; সেই ক্রেডিট জাতি নিজেই নিজের হাতে লইতে চায় এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহা লইবেও।

আধা-মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক

মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ দেখিয়া বিলাতে আর এক প্রকার আধা-মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক গজাইয়া উঠিতেছে। এই ধরণের প্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ষ্টকপোর্টের অন্তঃপাতী কার্কিটিলক সহরে। কার্কিটিলকের পরীক্ষা সফল হইয়াছে এবং এই সাফল্য দেখিয়া অন্যান্য স্থানেও এই ধরণের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ফলে বিলাতে এই ধরণের অনেক আধা-মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

এই ধরণের ব্যাঙ্ক নিতান্ত সাদাসিধে ব্যাপার। সাধারণ ব্যাঙ্কের মত নানা ধরণের লেনদেনের কারবার এই ব্যাঙ্কে চলে না। গচ্ছিত অর্থের লেনদেন কারবার মাত্র চলে এবং তার জন্য সুদ দেওয়া হয়। এই ব্যাঙ্ক হইতে সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যালিটির ঋণ পরিশোধ করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলটিকে একটি লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। কাউন্সিলের অফিসারগণ নিজেদের নামে জমা লইয়া থাকে। এই উপায়ে কার্কিটিলক মিউনিসিপ্যালিটীর সুদ বাবদে ১৯২৮ সনে ৫০০ পাউণ্ড বাঁচিয়াছে। ব্যাঙ্ক স্থাপনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এই সহরের প্রায় ৩,১৮৭ পাউণ্ড বাঁচিয়াছে। দেখিতে গেলে প্রতি পাউণ্ডে ১৷ পেনি কম সুদ লাগিয়াছে।

বেসরকারী ব্যাঙ্কের অসুবিধা

দি কর্পোরেশন অ্যাণ্ড সিকিউরিটীজ লিমিটেড্ নামক ব্যাঙ্কটি বিলাতের অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটীকেই ঋণ দান করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কটীর পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল ছাটীগুপের উপরে। ছাটীগুপ সম্প্রতি ফেল মারিয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটীর বিষম আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। একটী মিউনিসিপ্যালিটীর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩০০,০০০ পাউণ্ডের উপরে। বেসরকারী জীবের উপর আর্থিক ব্যবস্থার কর্তৃত্বের ভার থাকিলে ফল যে কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহা ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে। ফলে বিলাতে বেসরকারী ব্যাঙ্ক-প্রচেষ্টার উপর মানুষের আস্থা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, এবং অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যাহাতে জনসাধারণের কর্তৃত্ব কায়েম হয় সেই দিকেই সকলের আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

[illegible]র আর্থিক অবস্থা

[illegible]র রাইখ্স্ ব্যাঙ্কের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু গত বৎসর জার্ম্মানির সিলের অবস্থা তত ভাল ছিল না।

নূতন পুঁজির সংস্থান করা জার্ম্মাণির পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে অত্যন্ত বেশী। সুতরাং অল্পদিনের মেয়াদের ঋণ পাওয়া জার্ম্মাণির পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

জার্ম্মাণির উৎপাদন-ক্ষমতা অটুট

বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক, তবে জার্ম্মাণির তরফে পাওনা আদায় সম্বন্ধে এখনও সাম্য অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। জার্ম্মাণির সিল্কার বাজারে খুব টানাটানি। তবে এ অবস্থা কতকটা দূরীভূত হইতে পারে উত্তমর্ণগণ যদি ঋণ আদায় সম্বন্ধে একটু কম তাগাদা করেন তবে। কিন্তু উত্তমর্ণগণ একেবারে নাছোড়বান্দা। এ সত্ত্বেও কিন্তু জার্ম্মাণির উৎপাদন-ক্ষমতা অটুট। তবে একটা আশঙ্কার কথা এই যে, দেউলিয়া হওয়ার অনেকগুলি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণিতে ২০৫টী দেউলিয়া হইয়াছে এবং ৩৩৮টী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছা-ক্রমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে পুঁজির অপচয় ঘটিয়াছে যথাক্রমে ১,৮০০,০০০ এবং ১৪,০০০,০০০ মার্ক।

শিল্প-ব্যবস্থার রূপান্তর সাধন

জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নূতন ব্যবস্থা কায়েম করা হইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে জার্ম্মাণির আর্থিক দুরবস্থা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিতেছে। উৎপাদন বাড়িতেছে। উৎপাদনের খরচ, কলকারখানা পরি-চালনের খরচ কমান হইতেছে। কিন্তু উৎপাদন-শক্তি এখনও কেন্দ্রীভূত হয় নাই। ইহার উপরই জার্ম্মাণির ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। মার্কিণ, বিলাতী, ফ্রান্স প্রভৃতি উৎপাদক দেশগুলির সহিত জার্ম্মাণি সিন্ডিকেটে সম্পর্ক পাতাইতেছে।

দুনিয়ার বাজারে জার্ম্মাণির স্থান

কয়লা, লিগ্‌নাইট, পটাশ, ঢালাই লোহা, ঢালাই ইস্পাত, পিটান ধাতুর জিনিষ,—এইগুলিই জার্ম্মাণির শিল্প। দুনিয়ার বাজারে এই সমস্ত জার্ম্মাণি জিনিষের স্থান এখন অটল রহিয়াছে। মোটা ইউরোপের ২৪·৯% কয়লা জার্ম্মাণিতে উৎপন্ন হয় এবং জার্ম্মাণির লিগ্‌নাইট উৎপাদন মোটা দুনিয়ার ৭৭·৮%।

দুনিয়ার রবার ব্যবহারকারী দেশগুলির মধ্যে জার্ম্মাণি এখন তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জার্ম্মাণির সড়কে সড়কে ১,২৪০,০০০ মোটর গাড়ী চলাচল করিতেছে।

রাজস্ব বৃদ্ধি

শুল্ক, তামাক, বিয়ার, সুরাসার এবং চিনি হইতে ১৯২৮ সনে রাজস্ব আদায় হইয়াছে ২,৮৫২,০০০,০০০ মার্ক। এই সমস্ত খাতে ১৯২৯ সনে ২,৮৭০,০০০,০০০ মার্ক আদায় হইবার কথা। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য, বিনিময়পত্রের ব্যবহার বাড়িবার ফলে এবং ট্যাক্সের হার বাড়াইয়া দেওয়ায় রাজস্ব বাড়িয়াছে। শুল্ক আদায় সম্বন্ধে এমন নীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, যাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে রাজস্ব-হ্রাসের কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে যদি দেশের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্য বেশী উৎপন্ন হয়, কিংবা দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা কাহিল হইয়া পড়ে, তবে অন্যথা ঘটিতে পারে।

মদ এবং তামাকের ব্যবহার

১৯২৪ সন হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে তামাকের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। চুরুটের ব্যবহার বাড়িয়াছে৩৩%, সিগারেটের ৪৪%, কাটা তামাকের ১৩%। মদের কাটতিও বাড়িয়াছে খুব; ১৯২৪ সনে যেখানে মদ কাটিয়াছিল ৩১,৭০০,০০০ হেক্টোলিটার, ১৯২৯ সনে সেখানে কাটিয়াছে ৪৪,৬০০,০০০ হেক্টোলিটার। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাজস্ব বাড়িয়াছে ৭০%। স্পিরিট কাটতি হইয়াছে ১৯২৯ সনে একদম অস্বাভাবিক, অর্থাৎ ২,৮০০,০০০ হেক্টোলিটার।

জার্ম্মাণির রেলপথ

১৯২৩ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে জার্ম্মাণির রেলপথ-

গুলির অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। রেলগাড়ীগুলিতে যাত্রী এবং মাল দুইয়েরই চলাচল বাড়িয়াছে। ১৯২৯ সনে জার্ম্মাণির রেলপথগুলিতে মোট আয় হইয়াছে ৫৩৭ কোটী মার্ক, অর্থাৎ ১৯২৮ সনের চেয়ে ৪% বেশী; মোট ব্যয় ৪৪৪ কোটী ১০ লক্ষ মার্ক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোট লাভ হইয়াছে ৯১ কোটী ১০ লক্ষ মার্ক। এই উদ্বৃত্ত অর্থে রেল কোম্পানীর যেন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অংশ, সত্যাংশ, ১৯২৯ সনের রেলপথ বিস্তার ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ৮ কোটী মার্ক মজুত তহবিলে জমা হইবে। এই অর্থ লইয়া মোট মজুত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫০ কোটী মার্ক।

জার্ম্মাণ রেলপথের আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ

১৯৩০ সনে জার্ম্মাণ রেলওয়ে কোম্পানীর আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য নূতন নূতন আয়ের সন্ধান করার দরকার হইবে। রেলওয়ে কোম্পানী এইজন্য অনন্যোপায় হইয়া টারিফ বাড়াইবার কথা বলিতেছে। ইয়ং প্ল্যান অনুসারে এই সন হইতে রেলপথগুলির ট্যাক্স আদায়ের ভার পড়িবে 'রাইখ্'এর উপর। কিন্তু রাইখ্ নিজের আর্থিক গোলযোগেই অস্থির, সুতরাং টারিফ বাড়ান ছাড়া উপায় নাই।

মোট কথা ১৯২৪ হইতে জার্ম্মাণির রেলওয়ে কোম্পানীর অবস্থা বেশ ভালই। বেশ ঝাঁসিয়ার হইয়াই রেলপথের খরচপত্র চালান হয়। জার্ম্মাণির শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি-বিধানই জার্ম্মাণ রেলপথের চরম লক্ষ্য। রেল কর্ম্মচারীদের আর্থিক উন্নতির দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়; কারণ ইহাদের কর্ম্ম-নিষ্ঠার উপরেই রেলপথগুলির প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করে।

নবীন মার্কিণের নিকট বুড়া ইয়োরোপের শিক্ষা

উৎপাদনের পটুতায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপের সকল দেশকেই হটাইয়াছে। কলকব্জা যন্ত্রপাতির সাহায্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত ইয়োরোপেও উৎপাদন চলে, তবু ইয়োরোপ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হার মানিতেছে কেন? ইহার তিনটী কারণ দেখানো যাইতে পারে—প্রথম, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে কেবল যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয় তা নয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়া একই সঙ্গে অনেক মাল তৈরী করে। বড় বড় ট্রাষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-জগতে সর্ব্বত্র দেখা যায়, ইয়োরোপে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান খুব অল্প। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কিস্তিবন্দি প্রণালীতে প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় চলিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি এই যে, কাহারও কোন জিনিষের অভাব বোধ হইলে তখনই তাহা পূরণ করা দরকার। তখনই দাম দিবার ক্ষমতা তাহার না থাকিতে পারে, কিন্তু জিনিষটা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে সে দামটা শোধ দিবার চেষ্টা করিতে থাকুক। সত্বরই জিনিষটা পাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, তখনই সেটা সংগ্রহ না করিলে পরে তাহার সেটা পাইবার ইচ্ছা আদবেই না থাকিতে পারে। তাহার ফলে ব্যবসাদারেরা একটা জিনিষ বেশী বেচিবার সুযোগ হারাইয়া ফেলিবে। ইয়োরোপের বিক্রয়ের নীতি কিন্তু অন্য প্রকার। যাহার দাম এখনই দিবার ক্ষমতা নাই, সখ পুরাইবার জন্য তাহার তখনই জিনিষ কিনিতে যাওয়া ইয়োরোপের মতে হইতেছে অপব্যয়ীর লক্ষণ। এই দুই পন্থার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পন্থাই যে শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ এই যে, যুক্তরাষ্ট্র কিস্তিবন্দি প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় চালাইয়া এই অল্পটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে যে, উহাতে কদাচিৎ কখনও লোকসান হইলেও, অধিকাংশ সময়ে লাভই থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও জনবল কম নয়। আর এই বিরাট দেশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্থিক বিভাগে বিভক্ত নয়। ইয়োরোপের অন্তর্গত অনেকগুলা রাষ্ট্রই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অনেক প্রাদেশিক রাষ্ট্র অপেক্ষা ছোট। অথচ ইয়োরোপের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইলে রাহবাহু শুল্ক-অফিসের কর্ম্মচারীদের দ্বারা মাল পরীক্ষার হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে একবার ঢুকিলে ৪৮টা প্রাদেশিক রাষ্ট্রে সুখে স্বচ্ছন্দে চলা-ফিরা চলে। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সীমার বাহিরে যাইতে হইলেই যা মাল পরীক্ষার হাঙ্গামা পোহাইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ছোট প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলা সংরক্ষণ-শুল্কের বেয়াল তুলিয়া স্ব স্ব শিল্পগুলা উন্নত করিতে চেষ্টা করিলে কোন কোন প্রাদেশিক

রাষ্ট্রের ধরত খুবই ঐশ্বর্য-বৃদ্ধি ঘটিত, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এখন যেরূপ বিরাট বিরাট কল-কারখানা ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কোম্পানী দেখা দিয়াছে, তাহা কখনই দেখা যাইত না। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ধনৈশ্বর্যের বর্ত্তমান বিরাটত্বও জগতে দেখা দিত না।

ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের উদ্যোগ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাফল্যের কারণটা প্রাচীন ইয়োরোপের মস্তিষ্কে এতদিনে প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্য ইয়োরোপে বড় বড় ট্রাষ্টের সংখ্যা বাড়িতেছে। কিস্তি-বন্দিতে কেনাবেচাও বাড়িতেছে। আরও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, একটি ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। লীগ অব্ নেশন্স এবিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আগামী সনে এবিষয়ে একটা খস্ড়া তৈরী হইতে পারে। ১৯৩১ সনে সেই খস্ড়া অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলার সীমার সীমার শুল্কের যে উচ্চ প্রাচীর আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কি ফল দাঁড়াইবে? প্রথমতঃ, ইয়োরোপীয়েরা ইয়োরোপের মধ্যে উৎপাদন ও বিক্রয়ের আরও একটা বিরাট ক্ষেত্র পাইবে। তাহাতে অধিক উৎপাদন ও আরও অধিক ক্রয়-বিক্রয়—ঐশ্বর্য-বৃদ্ধির অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। শুল্ক প্রাচীরগুলার বদলে হইলে ইয়োরোপের মধ্যেই এখন আরও বেশী উৎপাদন, আরও বেশী কেনা-বেচা সম্ভব হইবে। একজন বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন যে, উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অন্ততঃ তিন গুণ বাড়িয়া যাইবে।

ইহাই হইল প্রথম সুফল। ইহা ছাড়া আর একটা সুফলও আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন ইয়োরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইয়োরোপের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপের বাজারে বাজারে মাল পাঠাইয়া যথেষ্ট টাকা লুটিতেছে, অথচ তার যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক দেয়ালের জন্য ইয়োরোপের মাল সহজে ঐ দেশে ঢুকিতে পারিতেছে না। ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলা বিরাট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একক ভাবে লড়িতে পারিতেছেনা, লড়িবার শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্যই তাহারা আজ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে প্রস্তুত।

বৃটিশ সাম্রাজ্য কোন্ দলে যোগ দিবে?

এই ইয়োরোপ আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমস্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থান কোথায়? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেমন ইয়োরোপের আর্থিক শত্রু, বৃটিশ সাম্রাজ্যও অনেকটা তদ্রূপ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যেমন ইয়োরোপকে যুঝিতে হইতেছে, তেমনি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের সকল ঐশ্বর্য্যের মূল এই বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গেও ইয়োরোপকে যুঝিতে হইবে। এই সব আর্থিক সমস্যার্থে বিলাত কোন্ দলের সঙ্গে যোগ দিবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আর্থিক হিসাবে বড় করিতে চেষ্টা করিয়া তাহারই কেন্দ্র হইয়া থাকিবে, না ইয়োরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলার সহিত যোগ দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে হারাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা একই সঙ্গে দুই পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি ও প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি লোপের আয়োজন করিবে? সমসাময়িক ঘটনাগুলা দেখিয়া মনে হয়, বিলাত শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করিবে।

ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য দুটা জিনিষের দরকার—প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও জনবল। ইয়োরোপের তাহা আছে কি? ইয়োরোপে দুয়েরই অভাব নাই। কয়লা, লোহা, পেট্রল ও কাঠ এই কয়টা প্রধান মাল ইয়োরোপে এখনও যথেষ্ট আছে। ইয়োরোপের লোক-সংখ্যা রুশিয়াকে বাদ দিলে ৩৫ কোটি, রুশিয়াসুদ্ধ ৪০ কোটি। তা ছাড়া, ইয়োরোপের লোকগুলা এখনও বেশ জোয়ালো ও তেজী। সুতরাং ঐশ্বর্য-বর্দ্ধনের মূল উপাদানগুলা ইয়োরোপে পাওয়া যাইবে যথেষ্ট।

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিচয়

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের গতি কোন পথে চলিয়াছে তাহা স্থির করিতে হইলে ১৯০৪ সন হইতে এই দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব খতাইয়া দেখিতে হইবে। জাপানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের খতিয়ান পাঁচ পাঁচ বৎসরের হিসাব লইয়া গঠিত। সুতরাং ১৯০৪ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত এই ২৫ বৎসরের ব্যাপার দেখিতে হইলে এই

সময়টাকে পাঁচটী অধ্যায়ে বা যুগে ভাগ করিয়া দেখিতে হইবে।

আমদানি এবং রপ্তানির মোটামুটি হিসাব লইলে দেখা যায়, মোট কারবার হইয়াছে প্রথম যুগে (১৯০৪ সন হইতে ১৯০৮ সন) ৮১৬,০০০,০০০ ইয়েনের, দ্বিতীয় যুগে (১৯০৯ সন হইতে ১৯১৩ সন) ১,০৩৯,০০০,০০০ ইয়েনের, অর্থাৎ ২৭% বৃদ্ধি, তৃতীয় যুগে (১৯১৪ সন হইতে ১৯১৮সন) ২,১১৬,০০০,০০৯ ইয়েনের, অর্থাৎ ১০৪% বৃদ্ধি, চতুর্থ যুগে (১৯১৯ সন হইতে ১৯২৩ সন) ৩,৬৭৬,০০০,০০০ ইয়েনের, অর্থাৎ ৭৩% বৃদ্ধি এবং পঞ্চম যুগে (১৯২৪ সন হইতে ১৯২৮ সনে) ১৯% বৃদ্ধি।

রপ্তানি বাণিজ্যের বেলাও দেখা যায়, প্রথম যুগে ৩৭৫,০০০,০০০ ইয়েনের কারবার হইয়াছে এবং দ্বিতীয় যুগে মাল রপ্তানি বাড়িয়াছে ৩২%, তৃতীয় যুগে ১৪২%, চতুর্থ যুগে ৩৯% এবং পঞ্চম যুগে বাড়িয়াছে ২১%।

এখন জাপানের আমদানি বাণিজ্য খতাইয়া দেখা যাক। প্রথম যুগে ৪৪১,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল আমদানির স্থলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম যুগে যথাক্রমে ২৩%, ৬৯%, ১১৮% এবং ১৮% মাল আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপরের এই সমস্ত মাপজোক খতাইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯১৮ সন পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরের মধ্যে জাপানী রপ্তানি-বাণিজ্য আমদানি-বাণিজ্যকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৯১৯ সনের পর হইতে জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের ধারা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দেশের আলোচ্য ২৪ বৎসরের বহির্ব্বাণিজ্য লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমদানি এবং রপ্তানি উভয় প্রকারের বাণিজ্য ঠিক একই হারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

১৯২৩ এবং ১৯২৪ সন জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ সময় গিয়াছে। এই দুই বৎসরে দুর্য্যোগও দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের অতীতের অবস্থা তলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই।

পল্লী-সংস্কারে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ

সুরুল পল্লী-সংস্কার সম্মেলনে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি করিয়াছেন :—

ছোট বেলা হইতেই দুইটি জিনিষ আমাকে গভীর ভাবে বেদনা দিয়াছে। আমাদের শিক্ষা যাহার মধ্যে কোনই প্রাণশক্তি নাই এবং যাহা জ্ঞান ও কৃষির উৎস হইতে কোনই প্রেরণা দেয় না। আর একটী হইতেছে আমাদের পল্লী-জীবন, যাহার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন একদম নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে কৃষি-জীবনের দুর্ব্বহ, একঘেয়ে, আনন্দ ও শক্তিহীন বৈচিত্র্য-শূন্যতায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষা-জীবনের কেন্দ্র হইতেছে সহর এবং সমাজ-জীবনের কেন্দ্র হইতেছে গ্রাম; কিন্তু উভয়ই আজ প্রাণশক্তি-ক্ষতিহীন, ফেনপুঞ্জ-পূর্ণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। এই অবস্থা একদম ভিন্ন আমাদের দুইদিকের ধনী ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। কিন্তু ক্রমে গৌণভাবে কর-নির্দ্ধারণের মাত্রা এরূপ বাড়িয়া যাইত যে, উহা প্রায়ই অতিরিক্ত হইয়া পড়িত। তখন সম্পত্তি ব্যক্তিগত অধিকারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রকৃতপক্ষে সমাজেরই অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং সমাজ-সেবা বা সামাজিক মর্য্যাদার আদান-প্রদানের জন্য প্রভুতা দাতার নিকট হইতে দান-গ্রহণের করুণ অপমান বোধ করিতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এক্ষণে যাহারা সমাজকে সাহায্য করিতে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য, তাঁহারা সহরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং পল্লীর মঙ্গলসাধনের স্বাভাবিক বৃত্তি এখন এমন একটি ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। আজিকার দিনে ধন-সম্পত্তি এমন ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করিয়াছে যে, মাঝে মাঝে উহা হইতে যে সাহায্য

ভিতর হইতে যাহাতে ইহার জীবন সঞ্চারের কার্য্য হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া দীর্ঘকাল অবিরত পরিশ্রমের ফলে এই অঞ্চলের গ্রামসমূহ সুস্পষ্টের এই কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিবার জন্য আমাদিগকে বহুদিন শ্রম করিতে হইয়াছে এবং যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের মঙ্গল-সাধন ভিন্ন অন্য কোন মতলব লইয়া আমরা তাহাদের বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করি নাই, তখন তাহারা আমাদের সহিত যোগ দিল এবং ম্যালেরিয়া দূর করা, রাস্তার উন্নতিসাধন করা, যৌথ ব্যবস্থায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা এবং অন্যান্য নানা প্রকার গঠনকার্য্যে তাহারা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিল।

আগেকার দিনে আমাদের গ্রামগুলি নিজেদের মঙ্গলের

পাওয়া যায়, তাহাতে উহার উদ্দেশ্যকে হীন এবং দাতাকে দানশীলতার বিলাসিতার মধ্যে পতিত করিয়া তুলিয়াছে।

কাজেই গ্রামবাসীকে এখনে বর্ত্তমান যুগের ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের মন যুক্ত এবং উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা জীবনসংগ্রামে তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে।

আমাদের ব্রত হইতেছে ঐ সমস্ত লোককে উৎসাহ দেওয়া, তাহাদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়াইয়া তোলা এবং সুবিবেচনার দ্বারা চালিত হইয়া নিজেদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য নিজেদের বাহুবলকে শক্তিসম্পন্ন করা। আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন জীবনকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য নগর ও পল্লীর বৈষম্যকে দূর করিবার জন্য এবং শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে ভেদ ঘুচাইবার জন্য যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার মধ্যে আমরা কোন পক্ষপাতিত্ব কিংবা কোন শত্রুতার ভাব পোষণ করি না। যিনিই তাঁহার দুই বাহু আমাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিবেন, আমরা সাগ্রহে তাঁহার সেই স্নেহকে বরণ করিয়া লইব।

আমরা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি উহার ভবিষ্যৎ পরিণতি অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও আমরা সাহায্য পাইবার যোগ্য।

বাঙ্গালীর শক্তি ও তাহার অপচয়

বাঙ্গালীর শক্তি ও তাহার অপচয় বিষয়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নরূপ :—

গত ২০ বৎসর এই বিষয়টি আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। অল্পসময়ের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবন আজ মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের এই ভীষণ প্রতিযোগিতার সকল অবাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালী পরাজিত হইতেছে।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে সকল কার্য্যে—রাজসরকারের দপ্তরখানায় ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, বাঙ্গালী চতুর, ইহাই শুনিতে পাই; কিন্তু "যত চতুর তত কতুর", তাই ধন-সম্পদে বাঙ্গালী আজ কতুর হইয়াছে।

সেদিন এক ভদ্রলোক—তিনি না কি আমার ছাত্র—তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ছেলেটি তিনবার বি এস্-সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে। পরীক্ষকমণ্ডলীকে বলিয়া কহিয়া যাহাতে তাহার পাশের ব্যবস্থা করিতে পারি এজন্যই তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাই না কি তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার একমাত্র উপায়। ইহাই দেখা যায় প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রের জীবনোপায়ের আদর্শ। ছাত্রদের আশা আজ বি এস্-সি, উকীল-ডাক্তার-হওয়ায়। আলিপুরে ৮০০ উকীল। তবু বৎসর বৎসর সেখানে কত নূতন উকীল ভর্ত্তি হয়। মেসো ও মহকুমা সর্ব্বত্রই এইরূপ।

ছোট ঘর ভাড়া লইয়া পুরুষানুক্রমে অশিক্ষিত লোক বিদ্যুতের যোগে গবেষণা কল চালায়। কলিকাতার গলিতে গলিতে এই প্রকার কল আছে। ইহারা মাসে ৫০৲।৭৫৲ টাকা উপার্জ্জন করে। চতুর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বিশিষ্ট বাঙ্গালীর সন্তান এই ব্যবসায় করে না। মূলধনের অভাবে না কি বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসায় সম্ভব হয় না। অথচ এই অতি সামান্য মূলধনেরই প্রয়োজন হয়।

কলিকাতার কাঁসারীপাড়া, কড়েয়ার ঝুরিহিত পাইকার, লোহাপট্টীর ঝুপড়া, টালাইলের কাগমারী প্রভৃতি কারিগরীর ভবনগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অধুনা এলুমিনিয়মের আসন বাঙ্গালীর সংসারে স্থায়ী করিতেছে। কেবল পূজা পার্ব্বণে উহা ব্যবহৃত হয় না। বিদেশী বস্তু বলিয়াও কেহ কেহ আপত্তি করেন; কিন্তু এই সকল আপত্তি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। এই বাসন আমেরিকা ও সুইডেন হইতে আমদানি চাদর দ্বারা তৈয়ারী হয়। অতি সহজ এই কাজ। অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে কত তাতিরা ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থে এলুমিনিয়মের কারখানা খুলিয়া বর্ত্তমানে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী হইয়াছেন। চালাই করিতে হয় না, জোড়াতাড়া দিয়া বানাইতে হয় না; প্রথমে চাকতির আকারে কাটিয়া

পেষণ (ষ্ট্যাম্পিং)-যন্ত্রে যথাবিহিত আকার দান করা হয়। এই ভাটিয়াগণ ভারত ও রেঙ্গুনে এলুমিনিয়মের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছে। ইহারা পয়ের দুঃখ মোচনে বহু টাকা দান করিয়া থাকে, স্বভাবেও নিতান্ত অনাড়ম্বর। এই সকল ভাটিয়া বাঙ্গালার নানা ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। আর আমার হাতে তৈয়ারী বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত এম এস্-সি, ডি এস্-সি-গণ বেকার বসিয়া থাকিয়া এক বড় অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে।

রসায়নের সাহায্যে কাঁচা মাল হইতে বাণিজ্যদ্রব্য তৈয়ারী করিয়া বিদেশীরা এদেশ হইতে প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে; কিন্তু এদেশে রসায়নের শিক্ষার বিফলতা দেখা যাইতেছে।

আমি চোখে যাহা দেখি তাই বলি। আমার পরীক্ষায় যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহাই প্রকাশ করি। আমাদের দেশের নানা স্থানে তামাক জন্মে। রংপুরে যে খুব ভাল তামাক হয় সে সংবাদ রংপুরের ছেলেরা রাখে না। অথচ সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে এই তামাকের সন্ধানে লোক আসে। সেদিন হাবড়ার ওপারে রামেশ্বর চৌবাকে ভার্জ্জিনিয়া নাম দিয়া এক শিল্পী যুবক সিগারেটের কারখানা খুলিয়াছেন। তামাকের রাসায়নিক পদার্থের বিষয় জানিবার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যত সিগারেট এদেশে খরচ হইতেছিল, বর্ত্তমানে তাহার ছয় গুণ সিগারেট খরচ হইতেছে।

আমি সিগারেট খাওয়ার পক্ষপাতী নই। বিড়ি আমাদের দেশেই তৈয়ারী হয়। সত্য হইয়া বিড়ি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশজাত সিগারেট খাইয়া বহু অর্থ বিদেশীকে দিতেছি, এই কথাটা তামাক-সেবনকারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কথাটী বাঙ্গালার পক্ষেই বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

নাগপুরের-পথে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডিয়া নামক রেল ষ্টেশনে প্রকাণ্ড বিড়ির কারখানা দেখিয়াছি। অল্প বয়সের বালকগণ ১৲ টাকা ১৷৷০ সিকা এই বিড়ির কারখানায় উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এইসকল স্থানে কুটীরে কুটীরে গৃহকর্ম্মের অবসরে বিড়ি তৈয়ারীর কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকারে নাগপুর অঞ্চলে ৫০ হাজার দরিদ্র ও অনাথা বিধবার অন্ন-সংস্থান হয়।

কলিকাতাতেও বিড়ির ব্যবসায় চলে, কিন্তু তাহা অবাঙ্গালীর হাতে। ভারতবর্ষে ১০।১২ লক্ষ টাকার মোহিনী বিড়ি বিক্রয় হয়। এই অতি সহজ ব্যবসায়টীও বাঙ্গালী কোনরূপেই গ্রহণ করিতে পারে নাই।

কলিকাতায় দুধ মিলে না; অল্প যাহা কিছু মিলে পশ্চিমদেশীয় গোয়ালার দয়ায়। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে অত বড় মাঠ, মাঠে সবুজ নধর ঘাস,—সেখানে কয়জন পশ্চিমা গোয়ালাকে অনুনয় করিয়া আমিরী রাখিয়াছি। বাঙ্গালী গোয়ালা পাওয়া যায় নাই। ইহারা দেখি মাসে ২০০।২৫০ টাকা উপার্জ্জন করে।

খুলনার জেলা বোর্ড বাঙ্গালীর। সেখানকার খেয়াঘাট-গুলি এই বাঙ্গালীরা পশ্চিমা মাঝিদের হাতে দিয়াছেন। বাঙ্গালীদের হাতে দিয়া উপযুক্ত অর্থ পাওয়া যায় নাই।

রাজগোপালাচারী ও যমুনালাল বাজাজের সঙ্গে শ্রীহট্টে খদ্দর প্রচারার্থ গিয়াছিলাম। সেখানকার খেয়াঘাট দেখিলাম সেবীভাবে সজ্জিত। সংবাদ লইয়া জানিলাম খেয়ার মালিকের নাম রায় বাহাদুর ব্রজপতি সিংহ। ইনি সামান্য অবস্থায় খেয়াঘাটের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের প্রায় সকল খেয়াঘাটের ইজারাদার হইয়াছেন। ইনি বহু ধনের মালিক, এবার শ্রীহট্টের বন্যায় অজস্র অর্থ দান করিয়াছেন।

বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ী হইতে বলিতেছি। কেহ কেহ আমাকে বলেন, তবে কি বিদ্যাবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া মাড়োয়ারী হইব? কলিকাতা প্রিন্স কোং'র লর্ড কর ১০০৲ টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এনড্রু ইউল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁর ডেভিড্, ইউল ভারত হইতে ৩০ কোটী টাকা লইয়া গিয়াছেন। ইহারা অশিক্ষিত ছিলেন না। এডিসন প্রায়োফোনের আবিষ্কার করিয়া প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অদৃষ্টে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও ঘটে নাই। তিনি আপন চেষ্টায় বিজ্ঞান শিখিয়াছেন। ফোর্ডের পিতা কৃষক ছিলেন। পিতার আহ্বান সত্ত্বেও ফোর্ড কৃষি-ব্যবসায়

গ্রহণ না করিয়া সামান্য দেবাপড়া শিখিয়াই নিজ অনুসন্ধিৎসার গুণে যন্ত্রের কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করেন এবং নিজ ব্যবসায়ে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন।

সাবানের ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ ধনী লেবার ব্রাদার্সের মিঃ লেবার বালককালে মুদিখানার কাজ করিতেন। জগতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এনড্রু কার্ণেগী প্রথম জীবনে টেলিগ্রাফের পিয়ন, পরে কলের মজুররূপে জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ধনী ইস্কুল কলেজ গ্রাজুয়েট ছিলেন না। যাঁহাদের নাম করিলাম ইঁহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করেন নাই। ডিগ্রীর ছাপ নাই বলিয়াই কি ইঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিব?

অন্বেষণকারী তাতা বিজ্ঞান জানিতেন না,—মস্তিষ্ক ছিল, তাহারই প্রভাবে টাটার লৌহ কারখানার উদ্ভব হইয়াছিল। এক্সপার্ট বলিয়া একটী কথা চলিত আছে। আমরা ইহাদের বড়াই করি। ইহারা টাকার বিকার। কলিকাতার নিকটে হুকুমচাঁদ জীন ওয়ার্ক চলিতেছে। হুকুমচাঁদ বিজ্ঞানবিদ নহেন, একজন সাহেব ম্যানেজার ও বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়াছেন। তব হুকুমচাঁদ একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। ইহার উদ্যোগের এই সব এক্সপার্ট!

ডিগ্রীর মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। আমাদের জ্ঞান অর্জ্জন হইতেছে না, ডিগ্রী অর্জ্জিত হইতেছে। ইতিহাস ও ভূগোল অপ্রয়োজন—যেন উহা জানা অতিরিক্ত মাত্র—ফাঁকি দিয়া পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেশ্য। এই জন্যই আমি বলিয়া থাকি ডিগ্রী অন্ধতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র।

কলিকাতার কলেজ হষ্টেলে ছাত্র থাকে। মাসে ৪০।৫০ টাকা অভিভাবকের নিকট হইতে লইয়া আদায় করে, রেস্তরাঁয় খায়, সিনেমা যেয়ে, টাইপিনিং এ কাপড় কাচে, ফেয়ার কাটার দ্বারা চুল কাটায়, অবকাশের সময় দিনের বেলা ঘুমায়, আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করে। এইরূপে পরম আলস্যে ইহাদের দিন কাটে। পরের গলগ্রহ হইয়া এইরূপ ভাবে কালাতিপাত করা লজ্জার বিষয়।

আমেরিকায় অনেক ছেলে নিজের খরচের কিয়দংশ নিজ উপার্জ্জন হইতে বহন করে। এমন কি চীনেও তাই। দুইটী লক্ষটি আমাদের ছেলেরা যখনে কাটায় আর চীনের ছেলেরা এই সময় স্বদেশের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য বক্তৃতা দান ও জিনিষ ফেরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে লিপ্ত থাকে। এইরূপে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিতে সক্ষম করিয়াছে এবং বহু স্থানে সফলকামও হইয়াছে।

শুধু বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাদান করিয়াই চীনারা ক্ষান্ত হয় নাই, অর্থোপার্জ্জনের নব নব পথও তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে ৮৬টি পাটের কল; একটীও বাঙ্গালীর নহে। সকলই ইয়োরোপের ছিল, সম্প্রতি মাড়োয়ারীর ২।৩টী হইয়াছে। বাঙ্গালী নিশ্চল।

বার্লি ব্রিজ্‌এর মজুমদের ঠিকাদার অবাঙ্গালী। ইঁহার নাম রায় বাহাদুর জগদল রাজা। ইনি কচ্ছদেশীয়। কোথাকার লোক কোথায় আসিয়া অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এই প্রকার কচ্ছ দেশীয় মেমনগণ মগরাহাট অঞ্চলে রেলি ব্রাদার্সএর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল বিদেশে রপ্তানি করে। আবার কলিকাতার অদূরীয়া সিন্ধি। পূর্ব্বে কেরাণীগিরি বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল, তাহাও মাড়োয়ারীরা দখল করিয়া লইতেছে।

কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি প্রায় সকলেই শিখ। বাঙ্গালায় আসিয়া সকলেই সোণা পায়; শুধু বাঙ্গালীর হাতে উঠেনাকি; তাহারা উপবাস করিয়া মরে।

চিত্তরঞ্জন এভেনিউ অত বড় রাস্তা—দুই পার্শ্বে কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ২।১টি ছাড়া সকলের মালিক অবাঙ্গালী।

উপাধিধারী বাঙ্গালী উপরিউক্ত ইংরেজী অনভিজ্ঞ মাড়োয়ারী ইত্যাদির নিকট টাইপিষ্ট ও কেরাণী হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে।

বাঙ্গালার জমিদারের হাতে টাকা নাই। অপরিমিতব্যয়ী বলিয়া ইঁহারা ঋণগ্রস্ত। কোন দুর্দ্দিনে কোন জমিদারের

যদি টাকার দরকার হয়, তবে মাড়োয়ারী ছাড়া আর কে ধার দিতে পারিবে? বাঙ্গালার জমিদারী মাড়োয়ারী-দের হাতে যাইবে। কেবল চাকুরীর আশায় তাহারাই পথপানে চাহিয়া হা-ভাতের মত অবস্থায় বাঙ্গালী দিন কাটাইতেছে। (ভারতবর্ষ)

নিখিল বঙ্গ প্রজা কন্‌ফারেন্স

বিগত ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী তারিখে কিশোরগঞ্জে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা কনফারেন্সে'র অধিবেশন সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন জিলার প্রতিনিধি ও দর্শকে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল।

কনফারেন্সে গৃহীত কতিপয় প্রস্তাব

অন্যান্য বহু প্রস্তাবের মধ্যে কনফারেন্সে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

১। যেহেতু এ, বি, রেলওয়ে কোম্পানী ভৈরবের নিকটস্থ মেঘনা নদীতে পুল নির্ম্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মহমন-সিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ঢাকা জিলার প্রজাসাধারণ প্লাবন, বন্যা, ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রাদুর্ভাবে সমূলে ধ্বংস হইবার আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত পুল নির্ম্মাণের প্রস্তাব উঠাইয়া নিবার জন্য এই কনফারেন্স রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, প্রেসিডেন্ট হোমবোর্ড লণ্ডন ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে। এবং যে স্থলে পুল হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা তদন্ত করিবার ও প্রজাগণের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য মিঃ আব্দুর রহিম সি, আই, ই, মৌঃ শাহ আব্দুল হামিদ, মৌঃ আসরাফ উদ্দিন চৌধুরী, মৌঃ আব্দুস চৌধুরী ও বাবু জিতেন্দ্রমোহন বর্ম্মণ প্রমুখ সভ্যের সমবায়ে একটি বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হউক।

২। যেহেতু বঙ্গের প্রজাসাধারণ অত্যধিক সুদের চাপে পড়িয়া দিন দিনই রিটায়াড-সুদ হইয়া দরিদ্র হইতেছে, সুতরাং এই কনফারেন্স গভর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে, বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকার অধিক যেন সুদের হার না হয়, এইরূপ আইন করা হউক।

৩। বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই কনফারেন্স গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

৪। বঙ্গের পাট রপ্তানি শুল্ক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়ার জন্য এই কনফারেন্স ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছে।

৫। দেশীয় জিনিষ পাইতে বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ না করিতে এবং লুপ্ত স্বদেশী শিল্পের উদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হইতে বঙ্গীয় প্রজাসাধারণকে এই কনফারেন্স অনুরোধ করিতেছে।

৬। প্রজাগণ যাহাতে তাহাদের এক-চতুর্থাংশের অধিক জমিতে পাট বপন না করে তজ্জন্য এই কনফারেন্স বঙ্গের প্রজাগণকে অনুরোধ করিতেছে।

৭। বঙ্গের প্রজাসাধারণ বঙ্গের বাহির হইতে গরু খরিদ করিয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মাড়ওয়ারী বাবদ রেল কোম্পানীকে ও অন্য প্রকারে বিদেশে দিতেছে। সুতরাং গো-পালন ও গো-জাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান হওয়ার জন্য এই কনফারেন্স প্রজাদিগকে অনুরোধ করিতেছে।

(পঞ্চায়েৎ)

বোম্বাই মিলের দুরবস্থা

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ করমুজা গাজুলী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ১লা মার্চ্চ হইতে বোম্বাইয়ের বহু মিল কার্য্য বন্ধ করিতে আরম্ভ হইবে। ফলে আনুমানিক ১৫।১৬ হাজার শ্রমিককে বেকার হইতে হইবে। এই সকল মিলের দুরবস্থার কারণ মিঃ গাজুলীর মতে প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ ১ শিফ্‌টিং ও দোক্তা রেশমের নিষ্কারণ ও গবর্ণমেণ্টের বয়নশিল্প রক্ষার জন্য নিশ্চেষ্টতা এবং দ্বিতীয়তঃ জাপানী বস্ত্রের বহুল আমদানি।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

কলিকাতা ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এম, সি, গান্ধী ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পূর্ব্বাপর অবস্থা

পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

সরকার মাঝে মাঝে এই শিল্পের উপর কড়াদি স্থাপন করিলেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিনষ্ট হয় নাই। ভারতীয় বস্ত্র যাহাতে বিলাতে রপ্তানি হইতে না পারে, এজন্য তথায় কঠোর করভার স্থাপিত আছে এবং ভারতেও শুল্ক চাপান হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, টাকার মূল্য বাড়ান হইয়াছে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের রক্ষাকল্পে সংরক্ষণ নীতি প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থায় এ শিল্পকে উক্ত নীতি দ্বারা রক্ষা না করিলে ইহার অবস্থার উন্নতি হইবে না। সরকারের প্রবর্ত্তিত বাট্টানীতি নিতান্ত অনিষ্টকর হইয়াছে। বাট্টার পূর্ব্বপ্রচলিত হার অর্থাৎ এক টাকার পরিবর্ত্তে ১ শিলিং ৪ পেন্স পুনরায় প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত এই শিল্পের রক্ষাকল্পে সংরক্ষণ-কর স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। উক্ত উপায় অবলম্বন না করিলে জ্যাপান ও ইটালির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প দাঁড়াইয়া উঠিবে না।

সরকার এখনও যদি সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই শিল্পকে রক্ষা করিবার আর কোনও উপায় থাকিবে না।

(পঞ্চায়েৎ)

প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও প্রিন্টিং স্কুল

দেশে শিক্ষা বিস্তৃতি ও বিভিন্ন আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে মুদ্রণ ব্যবসায়েরও ক্রমোন্নতি হইতেছে একথা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অথচ এই ব্যবসায় পরিচালনের জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষিত ও কর্ম্মঠ লোকের অভাব আমাদের দেশে খুবই বেশী। কলিকাতায় যাঁহারা ছাপাখানায় কাজ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত ও খুব অল্পলোকই আধুনিক প্রণালীর ছাপাকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই জন্য সুন্দর ও মনোরম ছাপা আমাদের দেশে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রতিবৎসর আমাদিগকে বিদেশ হইতে বহু টাকার ছাপার কাজ করাইয়া আনিতে হয়।

এই অভাব দূর করার জন্য বিগত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে লিনোটাইপ হাউসে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার মিঃ ওয়াটসনের সভানেতৃত্বে মুদ্রণব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় কলিকাতার বহু প্রিন্টার যোগদান করিয়াছিলেন। বহুক্ষণ আলোচনার পর মুদ্রণ-ব্যবসায়ের উন্নতি-বিধানের জন্য কলিকাতায় একটী প্রিন্টিং স্কুল ও প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। প্রিন্টিং স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট আর্থিক সাহায্য ও পরামর্শ লাভের জন্য একটী ডেপুটেশন পাঠান হইবে বলিয়া সভায় ঠিক হইয়াছে; এবং প্রিন্টার্সদিগকে স্কুল ও অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(সংসঙ্গী)

বাঙ্গালার জলপথ-সমস্যা

বাঙ্গালার ইঞ্জিনিয়ার সমিতি এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার জলপথ-সমস্যার সমাধানের জন্য পৃথক জল-বিভাগ প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক। উপযুক্তরূপ অর্থাদি ও কর্ম্মী পাইলে উহা দ্বারা বর্ত্তমানে সেচ বিভাগ জলপথ-সমস্যার সমাধান করিতে পারে। বর্ত্তমান সেচ বিভাগে কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনানুপাতে অতি অপ্রচুর; অভিজ্ঞ কর্ম্মীর একান্ত অভাব এবং অর্থেরও অভাব। সমিতির অভিমত এই যে, ১০।১২ বৎসরের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগকে শিক্ষালাভের জন্য ইয়োরোপে ও আমেরিকায় পাঠাইয়া দেওয়া দরকার। নদীর মধ্যে বাঁধ তুলিয়া পোল তৈয়ারীর জন্য নদীপথের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। সমিতির মতে বাঁধ তৈয়ারী, পয়োনালী নির্ম্মাণ ও জলপথের উন্নতি-বিধানের জন্য যাবতীয় ব্যয়-ভার প্রাদেশিক সরকারের বহন করা কর্ত্তব্য।

ষ্টীমার কোম্পানী ওয়ার্কশপের শ্রমিকদের সাধারণ সভা

সংপ্রতি বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের-খরিসাল শাখার

সভাপতি নবাবজাদা সৈয়দ মহম্মদ হোসেন সাহেবের বাড়ীতে বরিশাল ষ্টীমার কোম্পানী ওয়ার্কশপের শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়।

পূর্ব্বে শ্রমিকদের নিয়মিতভাবে মাসে ২১ দিন কাজে উপস্থিতির জন্য কোম্পানী শতকরা ১০৲টাকা হিসাবে ভাতা দিত। সম্প্রতি ওয়ার্কশপের বড়সাহেব উক্ত ভাতা ২৫ দিন নিয়মিত উপস্থিতির উপর ধার্য্য করেন। ওয়ার্কশপের নিয়মানুসারে ২৬ দিনে এক মাস ধরা হয়। ইহার মধ্যে ২৫ দিন উপস্থিত থাকিতেই হইবে, নতুবা যে অনুপস্থিত হইবে—সে আর উক্ত ভাতা পাইবে না। সকলের রীতিমত ভাবে ২৫ দিন উপস্থিত থাকা অসম্ভব, সুতরাং অনেকেই এই ভাতা হইতে বঞ্চিত হইত।

শ্রমিকগণ প্রথমে স্থানীয় ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত মহাশয়কে জানায়। তিনি বেঙ্গল মেরিন্যাল ইউনিয়নের সম্পাদক আবদুল হক সাহেবের নিকট শ্রমিকদের এই অভিযোগ তারযোগে জ্ঞাপন করেন। সম্পাদক মহাশয় তার পাইয়া বরিশালে আসেন এবং বড় সাহেবের সহিত এই ২৫ দিন উপস্থিতির বিরুদ্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করেন। অবশেষে বহু বিতণ্ডার পর বড় সাহেব পূর্ব্ববৎ ২১ দিন নিয়মিত উপস্থিতিতে ভাতা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

নবাবজাদার সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় এই ২১ দিন উপস্থিতিতে ভাতা পাইবার বিষয় জানাইয়া দেওয়া হয়।

(বরিশাল)

খাদ্যে ভেজাল

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার গত ৯ ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে অন্যতম সভ্য কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় একটী বিল পেশ করেন, তাহাতে ১৯১৯ সনের বঙ্গীয় খাদ্যে ভেজাল আইনের সংশোধন প্রস্তাবিত হইয়াছে। দুইটি প্রধান বিষয় তাহাতে আছে। প্রথমটী বিলাতী জমাট দুধের প্রচার নিরোধ; দ্বিতীয়টি ভেজাল উপাদানে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন নিষেধ। বর্ত্তমান আইনে আছে ঘৃত বা তৈলে ভেজাল প্রমাণ হইলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইতে হয়, কিন্তু উক্ত তৈল বা ঘৃতে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আইনের এই ত্রুটির সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। এই বিলখানি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।

জি, আই, পি রেলের ধর্ম্মঘট

পূর্ব্বের ঘোষণা মত জি, আই, পি রেলওয়ের প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টার সময় ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মাতুঙ্গা পারেল, কুরলা, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, নাগপুর ও ইটারসির কারখানা ও ষ্টেশনগুলিতে কোন শ্রমিক ও কেরিম্যান কাজে যোগদান করে নাই। ঠীনারাও ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে।

৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রমিক-সঙ্ঘ হইতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, প্রায় ১৪০০০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

শ্রমিকগণ ১৬টি দাবী উপস্থিত করিয়াছে। কার্য্য হইতে অন্যায়রূপে বরখাস্ত, বর্ণ-বৈষম্য, ও অতিরিক্ত জরিমানার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল দাবী করা হইয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী জি, আই, পি রেলপথের এজেন্ট ধর্ম্মঘটিদের উদ্দেশে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিলেন যে, তাহারা ৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কাজে যোগদান না করিলে তাহাদের স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করা হইবে।

ঐ তারিখ শ্রমিকদের ইউনিয়ন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারত সচিব মিঃ বেয়েজউড বেন ও মিঃ ব্রকওয়ের নিকট নিম্নলিখিতরূপ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন—

"গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে জি, আই, পি, রেলপথের ১ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের দাবী জীবনধারণোপযোগী সর্ব্বনিম্ন পারিশ্রমিক, ইউনিয়নের লোকজনকে শাস্তি না দেওয়া, বর্ণপার্থক্য ও ডাক্তারী পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া, পুরাতন শ্রমিকদের চাকরীর স্থিরতা। শ্রমিক-মালিক বিরোধ-নিষ্পত্তি আইন অনুসারে ধর্ম্মঘট মিটাইবার ব্যবস্থা করুন।"

৮ই ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে অনেক নূতন লোক নিয়োগ করিয়াছেন। পিকেটিং করিবার জন্য আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবক ইউনিয়নের আফিসে নাম লিখাইয়াছেন। রেলওয়ে কর্মচারী ছাড়াও অনেকে স্বেচ্ছাসেবক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

জি, আই, পি, রেলওয়ের এজেন্ট তাঁহার বর্ণনায় জানাইতেছেন—সুবারমান মেন লাইনে প্যাসেঞ্জার এবং মালগাড়ী রীতিমত সময় চলাচল করিতেছে। চরমপত্র বাহির করিবার ফলে কর্মচারীদের মধ্যে কতজন কাজে যোগদান করিয়াছে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আশাপ্রদ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শুরুপদগুলিতে নূতন লোকের নিয়োগ-কার্য্য পুরাদমে চলিয়াছে। বক্তৃতায় এবং সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। জনসাধারণকে আমি এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। সাধারণের অবগতির জন্য আমি প্রত্যহ এই সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ-সম্বলিত বর্ণনা-পত্র প্রকাশ করিব।

(ষ্টাণ্ডার্ড)

জামালপুরে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে জনসাধারণের উদ্যোগে একটি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, এস, দত্ত উহার উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলেন—দেশের শতকরা ৯০ জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। পল্লীর উন্নতিই জাতীয় উন্নতির মূলে। আজ পল্লীগুলি অজ্ঞানতা, রোগ, দারিদ্র্য ও দলাদলিতে সমাচ্ছন্ন—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। জাতির উন্নতি তখনই হইবে যখন পল্লীগ্রামসমূহের অজ্ঞানতা দূর হইবে, লোকে কাজ পাইবে এবং সকলে একতাবদ্ধ হইয়া আনন্দ উপভোগ করিবে। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামসমূহে যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেশের সর্ব্বত্র হিতসাধন সমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা দূর করা যাইবে। আগামী বৎসরে এই মহকুমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষিজাত জিনিসের জন্য তিনি একটী ৫৯ টাকার পারিতোষিক দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশে বেকার-সমস্যা

মধ্যপ্রদেশ কাউন্সিলের প্রস্তাব-অনুসারে মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রধান সেক্রেটারীকে সভাপতি করিয়া সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা কতদূর গুরুতর হইয়াছে, উহার কারণ কি এবং কি ভাবে উহার প্রতিকার করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে কমিটি অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবেন।

পরলোকে মিঃ পি, ব্যানার্জ্জি

বাঙ্গালার জীবন-বীমা ব্যবসায়ের অগ্রদূত মিঃ পান্নালাল ব্যানার্জ্জির মৃত্যুতে ভারতীয় বীমা-জগৎ হইতে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির তিরোধান হইল। স্বর্গীয় পান্নালাল ব্যানার্জ্জি সাধারণের নিকটে মিঃ পি, ব্যানার্জ্জি নামেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আগরপাড়া নামক স্থানে ১৮৬৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কলিকাতার হিন্দুস্কুল এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রতিভা নানা দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি কর্ম্মপ্রবণতার আধারস্বরূপ ছিলেন। প্রথম বয়সেই তিনি বীমার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং লণ্ডনের স্যান লাইট এশিওরেন্স সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে কাজ আরম্ভ করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে জনসাধারণের মনে বীমার ব্যবসায়ের সম্বন্ধে নানা প্রকার উদ্ভট ধারণা বর্ত্তমান ছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জি এই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, বলিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষে জীবন-বীমাকে প্রচলিত করিয়া তোলেন। স্যানলাইট ভারতবর্ষে কাজ করা বন্ধ করিয়া দিলে তিনি নর্থ বৃটিশ ও মার্কেন্টাইল বীমা কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং এই কাজেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন।

কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী। স্বদেশী যুগের ভাবধারায় যখন দেশে নানাবিধ স্বদেশী কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সাড়া

পড়িয়া যায়, সেই সময়ে মিঃ ব্যানার্জ্জি বিদেশী কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত প্রচুর আয়ের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া ১৯০৬ সনে বাঙ্গালা দেশে এই জীবনবীমা কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ ব্যানার্জ্জির পরিচালনাধীনে আজ এই কোম্পানী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। এই কোম্পানীতে বর্ত্তমানে বৎসর বৎসর এক কোটী টাকার মত জীবন বীমা হইতেছে এবং বীমা তহবিলও সওয়া কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এত বড় একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার মূলে মিঃ ব্যানার্জ্জির অসামান্য প্রতিভাই কার্য্য করিয়াছে। বিগত ১৯২১ পর্য্যন্ত তিনিই এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উহার পর তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙ্গালী কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারে না—এই প্রকার একটা বদনাম আছে। মিঃ ব্যানার্জ্জির সাফল্য এই ধারণার একটা মস্ত প্রতিবাদ। ভারতীয় জীবন-বীমা-ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য কর্ম্মদক্ষতা এ ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন বহু লোকের অন্ন-সংস্থানের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, সেই প্রকার অন্যদিকে ব্যবসায়-জগতে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

গন্ধবণিক্ সম্মিলনীতে গৃহীত ব্যবসায়-সংক্রান্ত প্রস্তাব

(ক) বিগত চতুর্থ মহাসম্মিলনীতে স্থাপিত গন্ধবণিক্ বাণিজ্য-সঙ্ঘের (গন্ধবণিক্ চেম্বার অব্ কমার্স) সহিত সহর ও মফঃস্বলের গন্ধবণিক্ ব্যবসায়ী মাত্রেই যোগদান করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

(খ) স্বজাতীয় ব্যবসায়িগণ যতদূর সম্ভব পরস্পরের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করুন।

(গ) ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনার্থ গন্ধবণিক্ সমবায়-সমিতি ও যৌথ কারবার এবং এইরূপ যে সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে, তাহাদের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হউন।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুত সলিল মোহন পাল মহাশয় বলেন—

প্রস্তাবের (ক) অংশটি সম্বন্ধে প্রথমে বলিতেছি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান বৃত্তি। বাণিজ্যের অভাবই আমাদের অবনতির কারণ। বাণিজ্য আমাদের সহজসাধ্য এবং স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু সৎস্বভাব ও সৎ শিক্ষাই বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। গন্ধবণিক্‌জাতির যাহা কিছু প্রাচীন কীর্ত্তি ও বাণিজ্য-গৌরব তাহা এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইদানীং ব্যবসায়ের প্রসার ও জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি উভয়েরই অভাব উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া স্বজাতীয় বাণিজ্য-সঙ্ঘের বিশেষ আবশ্যকতা বিবেচিত হওয়ায় বিগত ৪র্থ মহাসম্মিলনীতে বাণিজ্য-সঙ্ঘের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, এবং একটী সব্ কমিটি মনোনীত হইয়া ইহার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী পৃথকভাবে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। সঙ্ঘটী স্থাপিত হইয়াছে তাহাও আপনারা জানেন। বাস্তবিক এই সঙ্ঘের আশা ও উদ্দেশ্য অতীব মহান; কিন্তু যতদিন না প্রত্যেক গন্ধবণিক্ ব্যবসায়ী উহাতে যোগ দেন এবং উহার স্বার্থের ও প্রসার-কল্পে আত্মনিয়োগ করেন, ততদিন উহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। কলিকাতায় ব্যবসায় বাণিজ্য আমাদের স্বজাতীয়গণের (গন্ধবণিক্) মধ্যে কতক কতক এখনও আছে। এরূপ অবস্থায় সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইলে সঙ্ঘটীর সম্যক্ পুষ্টিসাধন হইবে এবং স্বজাতির স্বার্থ-রক্ষার্থ একটী মহৎ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। ২।১০ জনের চেষ্টায় এরূপ বৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আশা করি সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে এই সঙ্ঘটী অচিরে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং বাণিজ্য-জগতে আমাদের প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করিবে।

প্রস্তাবের (খ) অংশ সম্বন্ধে বলিতে হইলে আমার অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে ছোট বড় সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার যুগে ধনী ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর স্বার্থে যেরূপ আঘাত দিতেছে তাহাতে, অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

এরূপ সময়ে যদি স্বজাতীয়গণ সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৎপর হন, তাহা হইলে সকলে উন্নতিলাভ করিয়া নিম্ন স্তর হইতে ক্রমে উচ্চ স্তরে উঠিয়া গন্ধবণিক্ জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবের (গ) অংশটীর বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমতঃ সততার বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। সততা লইয়া যৌথ কারবার অবলম্বন করিলে বড় বড় ব্যবসায় হস্তগত হইতে পারে। আপনারা প্রত্যেকেই এক একটী ছোট ছোট ব্যবসায় করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। ইহাতে ব্যবসাতে একচেটিয়া হইতে পারে না। যৌথ কারবার দ্বারা বিদেশীয় বণিকগণ বড় বড় ব্যবসায় হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে এবং ফেলিতেছে। ফলে আমরা হটিতেছি এবং নিঃস্ব হইয়াছি। অতএব সাধুতা অবলম্বন করিয়া গন্ধবণিক্ সমবায় সমিতি ও যৌথ কারবার স্থাপন করা ও প্রতিষ্ঠিত কারবারের উন্নতি-কল্পে সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ দে মহাশয় বলেন :—

আমরা বৈশ্য জাতি, ব্যবসায় আমাদের উপজীবিকা। বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে যাহা আবশ্যক, সেগুলি আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জাহাজে করিয়া দেশ-বিদেশে গমন করিতেন এবং ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া অপর সকল জাতি অপেক্ষা আমাদিগকে বড় করিয়াছেন। সে সকল ভুলিয়া এখন আমরা সামান্য মুদীগিরি করি। বাণিজ্য করিতে আমরা জানি না। একজনের সামর্থ্যে যদি না কুলায়, তবে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যৌথ কারবার করিলে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারা যায়। ব্যবসায়ের ভিতর দিয়া ইংরেজ রাজ্যলাভ করিয়াছে। তাহাদেরও ব্যাঙ্কিং-সঙ্ঘ আছে। ইহারা যে কার্য্যকলাপ নির্দ্ধারিত করিয়াছে, তাহা সকলে মানিয়া চলে। আমরা তাহা করি না। যদি উন্নতি করিতে হয়, অন্যান্য জাতির সঙ্গে যদি প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে যৌথ কারবার করিয়া তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে কার্য্য চালাইতে হইবে। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া মাড়োয়ারীরা সামান্য অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া মহা মহা ধনী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদেরও চেম্বার অব্ কমার্স সভা আছে। যৌথ কারবার করিতে আমি সকলকে অনুরোধ করিলাম। তাহাতে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় একটী ব্যাঙ্কের পরিচালক। সেই ব্যাঙ্কের যেন কোন ক্ষতি হইতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। গন্ধবণিক্ ব্যাঙ্কের যাহাতে উন্নতি হয়, আমরা সে চেষ্টা করি না—খুব অল্পসংখ্যক লোকেই তাহা করেন। যদি সকলে চেষ্টা করেন, তবে যে কেবল ব্যাঙ্কেরই উন্নতি হইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উন্নত হইব। স্বজাতীয় ব্যাঙ্ককে যদি আমরা জীবিত রাখিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সহায়তায় ইংরেজ ও মাড়োয়ারীর মত আমরাও উন্নত হইতে পারিব।

কলিকাতায় অনেক বড় বড় গন্ধবণিক্ ব্যবসায়ী আছেন, মফঃস্বলেও আছেন। আমরা তাঁহাদের কাছে গেলে তাঁহারা আমাদের সাহায্য করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকস্থলে তাহা হয় না। আমার অনুরোধ, তাঁহারা যদি স্বজাতি বলিয়া দয়া করিয়া কিছু সুবিধা করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন, গন্ধবণিকের দোকানে বা ব্যবসায়ে যাহাতে বেশী ভাগ কর্ম্মচারী গন্ধবণিক থাকে তাহার উপায় যদি করেন, তাহা হইলে অনেকে প্রতিপালিত হইতে পারে এবং আমাদিগকেও অপরের দ্বারে যাইতে হয় না। সেটা গৌরবের কথাও বটে।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

* (গন্ধবণিক্)

জলপাইগুড়ি টী মার্ট সম্বন্ধে "জনমত"-সম্পাদকের কথা

জনমতে উক্ত "টী মার্ট" সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার পরে, আমার সহিত বন্ধুলোকে আমার কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে উৎসুকতা প্রকাশ করিয়া আমাকে প্রশ্ন করায় আমি বাধিত হইয়াছি, এবং ব্যক্তিগত উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া সংক্ষেপে একটা সাধারণ উত্তর দিতেছি।

বাংলার একটা কথা আছে "জেলের পরণে তেনা, নিকারীর কাণে সোণা", অর্থাৎ জেলে মাছ ধরে, অথচ সে ছিন্ন বসন পরিধান করে এবং সঙ্ঘবদ্ধ নিকারী তাহারই ধরা মাছ বিক্রয় করিয়া কাণে সোণা দেয়। আমাদেরও তাই। আমাদের চা কলিকাতায় ছোট ছোট যে সব 'নিলাম' হয়, আমাদেরই বাগানের ডাই ব্রুইপিংস্ প্রভৃতি লোকে ক্রয় করিয়া লাভবান হয়; কিন্তু আমাদের ছেলেরা বেকার। যদি আমরা এক বাক্স পর্য্যন্ত ছোট ছোট বিক্রয় করি তবে অনেক সুবিধা। জলপাইগুড়ির বাজারে ১৲ টাকার কমে চায়ের পাইও নাই। যদি এক বাক্স ৷৶০ দরে ক্রয় করিয়া দিনাজপুর বা রঙ্গপুর যাইয়া দোকানদারের নিকট বিক্রয় করা যায়, তবে খরচ বাদে পাইও প্রতি অন্ততঃ ৶০ লাভ থাকিতে পারে অর্থাৎ মণকরা ৮৲ টাকা। প্রতি সপ্তাহে দুই মণ করিয়া বিক্রয় করিলে সপ্তাহে ১৬৲ টাকা লাভ হইতে পারে, আর মূলধন লাগে একমণের দাম ৪৪৲ টাকা। অর্থাৎ ৫০৲ টাকা মূলধনে মাসে স্বাধীনভাবে ৭০৲ টাকা অর্জ্জন করা যাইতে পারে। তারপর ধরুন কেহ দশ মণ চা লইয়া চাকায় গেল—মূলধন ৫০০৲ টাকা। লাভ লইল ৮০৲ টাকা। আসিবার সময় চাকাই কাপড় আনিল, খরচা পোষাইয়া গেল। লাভ বেশী হইল। এরপর হয়ত এজেন্সি সৃষ্টি হইলে বাড়ী বসিয়াই কাজ চলিতে পারে। ২০ বাক্স চা লইয়া কাশী যাও; বিক্রয় করিয়া কাশী সিল্ক, শাড়ী, তৈজস-পত্র লইয়া আইস, লাভ হইবে; হয়ত দুই রকম ব্যবসায় চলিবে। সঙ্ঘবদ্ধ হইলে আরও ভাল হইবে। মাড়োয়ারী-বণিক দুয়ারে টাকার তাগাদা করিতে যায়, সঙ্গে পাঁচটা ছাতা পাঠাইয়া থাকে। হাটে বিক্রয় করিয়া যাতায়াত খরচ পোষাইয়া লয়। আমরা ছোটবেলায় দেখিয়াছি কুণ্ডুদের পালোয়ার নৌকা ডাইল ও নারিকেল বোঝাই দিয়া কমলাঘাটে আইসে ও ধান পাট বোঝাই করিয়া চলিয়া যায়। বাংলা, বিহার প্রভৃতি সর্ব্বত্রই চা চলিতেছে। সুতরাং এই পুচরা ব্যবসায় আমাদের ছেলেদের হাতে থাকিবে না কেন? তারপর ডাই ব্রুইপিংস্ প্রভৃতি এই খানেই বিক্রয় হয়, সেটাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইলেই ত 'মার্ট'এর সৃষ্টি হয়, বিলাতের ক্রেতারা না হয় এখানে না-ই আসিল। দেশী বাজারের খরিদ্দার এখানে আসিবে না কেন? তাহারা জানিতে পারিলেই এখানে আসিবে। কলিকাতার 'মার্ট'এ তাহারাত চোরের মত থাকে দেখিয়াছি। সাহেবদের সঙ্গে মিলিতে পারে না, ফিস্ ফিস্ করিয়া অতি সন্তর্পণে আত্ম-মর্য্যাদা হারাইয়া কথা কহিতে হয়। আমি নিজে কলিকাতার মার্টে গিয়া দেখিয়াছি আমাদের দেশী বড় বড় হোমরা চোমরাদের কি অবস্থা। সেখানকার ভেতরী ত বোঝাই যায় না; বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেখিবে দারওয়ান। এখানে আসিয়া যে যতই গল্প করুন না কেন, ব্যাপার এই। এই ছোট প্রচেষ্টা সফল হইলে ক্রমশঃ সাহেবরাও হয়ত এখানে আসিবে। ভারতীয় চা-কর সমিতি খুলিয়াছিলাম কত বিরুদ্ধ, কত উপহাসের ভিতর দিয়া। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও যদি সফল হয় তবে পরে হয়ত অনেক কর্ম্মধার মিলিবে। তবে সফল না হইলে অবশ্য ফল অপদস্থ। কিন্তু সেটার জন্য বিশেষ ভাবনা নাই, কারণ সেটা অঙ্গের ভূষণ।

ষ্টীমার কোম্পানী সংক্রান্ত আইন

ভারতের নদীপথে দেশীয় ষ্টীমার কোম্পানীগুলি যাত্রী ও মাল বহনে বিলাতী কোম্পানীগুলির অসাধু প্রতি-যোগিতায় কি প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কোন লাইনে কোন দেশী ষ্টীমার কোম্পানী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেই বিলাতী কোম্পানী ভাড়ার হার অত্যধিক হ্রাস করিয়া দেশী কোম্পানীগুলির ব্যবসায় নষ্ট করিয়া থাকে। এই উপায়ে বঙ্গদেশের স্বদেশী কোম্পানীগুলিকে যে কতবার ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইয়াছে এবং কত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা বঙ্গদেশের অনেকেই অবগত আছেন। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মিঃ কে, জি, নিয়োগী, যাহাতে কোন ষ্টীমার কোম্পানী ইচ্ছামত ভাড়া কমাইতে বা বাড়াইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থা পরিষদ দ্বারা একটী আইন পাশ করাইয়া লইয়াছেন। এই আইন অনুসারে, বড়লাট কোন লাইনের মাইল প্রতি মাল ও যাত্রী বহনের সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ মাশুল স্থির করিয়া দিতে

পারিবেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে সরকার পক্ষ এই বিলে আপত্তি না করায় ইহা আইনে পরিণত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে এই আইন কি প্রকারে প্রতিপালিত হয়, তাহা না দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা চলে না।

(শান্তিবার্ত্তা)

বায়স্কোপ কমিটির রিপোর্ট

১৯২৯ সনের মে মাসে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট বোম্বাই চেম্বার অব্ কমার্সএর নিকট একখানি পত্র প্রদান করেন। সিনেমা-শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য দুইটী বিষয়ে চেম্বারকে অনুসন্ধান করিতে বলা হয়। প্রথমতঃ (ক) ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীন উপদেষ্টা কমিটি সম্বলিত একটি কেন্দ্রীয় বিউরো গঠন সম্বন্ধে, (খ) এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় বিউরো পরিচালনের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি কিভাবে ভারত-গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবে সে সম্বন্ধে। এতদর্থে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটি সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটিও গঠিত হয়। কমিটি কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে রিপোর্টও প্রকাশ করেন। চেম্বার এই কমিটির রিপোর্ট পাঠে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু-শিল্প সম্পর্কে অন্যান্য সভ্যদেশেও এইরূপ কেন্দ্রীয় বিউরো আছে। এই দেশেও এইরূপ বিউরো স্থাপনের উদ্দেশ্য টেক্‌নিক্ এবং আর্ট সম্বন্ধে ছবির ঘাতলানো ত বটেই, উপরন্তু ব্যবসায় পরিচালন সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগানোও আছে। চেম্বারের মতে এদেশে ও সব খাটিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু-শিল্পে ওস্তাদি খাটাইবার আগে যাত্রা-থিয়েটার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার দরকার। আর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ সাধিত হইতে পারে একমাত্র যদি গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং কিন্তু-শিল্প পরিচালনের ভার লন তবেই। জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে এইরূপ ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্টকে রীতিমত টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। সরকারী সাহায্য বিনা এই ব্যবস্থা টিকিতে পারিবে না। আর শুধু ব্যবসায় পরিচালনের উপদেষ্টা হিসাবে বিউরো স্থাপন করা চলিতে পারে; কিন্তু এক সঙ্গে আর্ট, টেক্‌নিক্ এবং ব্যবসায়-পরিচালনা ইত্যাদি সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এমন বিউরো স্থাপন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার, বিশেষ করিয়া এদেশের পক্ষে। সুতরাং কিন্তু-শিল্প সম্বন্ধে বে-সরকারী প্রচেষ্টাই যথেষ্ট বলিয়া ধরিয়া লওয়া দরকার। কারণ এই জাতীয় বিউরো স্থাপন করিয়া রীতিমতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইলে, সরকারকে অনেক টাকা ঢালিতে হইবে, এমন কি এজন্য বিশেষ ট্যাক্সও বসাইতে হইবে। কিন্তু দরীব দেশ এই ট্যাক্স বহন করিবে কেমন করিয়া? ভারতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্যই যখন অর্থের অসদ্ভাব, তখন কিন্তু-শিল্পের মত লৌখীন ব্যবসায়ের জন্য টাকার শ্রাদ্ধ করিতে গভর্ণমেণ্টকে বলা যায় না।

এই সমস্ত আপত্তি ছাড়া চেম্বারের মত এই যে, এদেশে এইরূপ বিউরো স্থাপনের সময় আসে নাই। কিন্তু-শিল্প এক অভূতপূর্ব্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কারণ শীঘ্রই কথোপকথনহীন চলচ্চিত্র বাহির হইবে। সুতরাং এখন যদি কোন নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইবে। সুতরাং চেম্বার বিউরো গঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহার মতে যাহাতে কিন্তু-শিল্পে জনসাধারণের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিকর দোষ না ঢুকে সেজন্য আইন প্রণয়ন করা চলিতে পারে। অন্যান্য বিষয় বেসরকারী ব্যবসাদারদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

ক্যানাডা দেশে কিন্তু-শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য যেরূপ "ক্যানাডিয়ান মোশান পিক্‌চার বিউরো" স্থাপিত হইয়াছে, কমিটির মতে ভারতবর্ষেও অনুরূপ ব্যবস্থা বেশ চলিতে পারে। এই ক্যানাডিয়ান বিউরোটীর মুখ্য উদ্দেশ্য চলচ্চিত্র-শিল্পকে ক্যানাডার সর্ব্ববিধ উন্নতির বাহনরূপে ব্যবহার করা। ক্যানাডাদেশের জাহাজী কোম্পানী এবং রেলওয়ে কোম্পানীগুলির কার্য্যকলাপ কিভাবে চলিতেছে, তাহার পরিচয় দিয়া ক্যানাডার চলচ্চিত্র গৃহগুলি এক পক্ষে ঐ সমস্ত কোম্পানীর বিজ্ঞাপনদাতার কাজ করিতেছে। ক্যানাডার বায়স্কোপগুলি গভর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে, কারণ জনসাধারণের বিজ্ঞান-বিষয়ক এবং ব্যবহারিক

শিক্ষা সম্বন্ধে চলচ্চিত্রগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিল্মের প্রবর্ত্তন দ্বারা এদেশের লোককেও শিল্প, স্বাস্থ্য, কুটীরশিল্প ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। রেলপথগুলির কার্য্যকলাপ চলচ্চিত্র-সাহায্যে জনসাধারণের চোখের উপর ধরিয়া দিলে, রেলপথগুলিও ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের প্রিয় সামগ্রী হইয়া উঠিবে। মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই অবশ্য এইরূপ চলচ্চিত্র প্রবর্ত্তনের ভার পড়িবে; কিন্তু একক কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ কাজ করা সম্ভবপর নয়। এর জন্য গভর্ণমেণ্টের সহায়তা অত্যাবশ্যক। মধ্যে, জি, আই, পি, এবং এন, ডাব্লিউ রেল কর্তৃপক্ষগণ এরূপ চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করেন; মাদ্রাজ সরকারও কৃষি-সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য এইরূপ চলচ্চিত্র দেখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ভারত-গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক এবং রীতিমত পরিদর্শনাদি করাও দরকার।

শর্করা অনুসন্ধান কমিটি

সরকারী কৃষি-গবেষণা-বিভাগ কর্তৃক একটী 'শর্করা অনুসন্ধান কমিটি' গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় চিনি-শিল্পের উন্নতি-বিধান করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে এই কমিটি অনুসন্ধান করিবে।

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের গঠন ও কার্য্যাবলী

১৯২৫ সনে ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের যে আইন জারি হইয়াছে তদনুসারে এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং ইহাকে বিদেশী বাণিজ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যিনি এই বিভাগের পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদের বৈঠকেও সভাপতি এবং যাচিয়পূর্ণ স্থান। ইহার সভ্যেরা হইতেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের এবং ভারতবর্ষের হাই কমিশনার, বিভিন্ন উপনিবেশের এবং গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন উপনিবেশের রাজপ্রতিনিধি। এছাড়া কতকগুলি উপরি সভ্যও আছেন তাঁহারা শুধু দুনিয়ার বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিষয়গুলির স্বার্থ দেখিয়া থাকেন।

ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যাবলী

ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের সব চেয়ে বড় কাজ হইতেছে ইহার ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ। এখানে সকল রকমের খবরাখবর সংগ্রহ করা হয় এবং তাহা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। সাম্রাজ্যের কাঁচা মাল কলকব্জা এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত সকল প্রকারের তদন্ত এবং খোঁজ খবর করাও এই হাউসের অপর কাজ।

১৯২৫ সনের আইনের প্রথম খণ্ডে এই ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নরূপ বলা হইয়াছে:—

১। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবসায় ও শিল্প সংক্রান্ত সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতিসাধন করা।

২। নিম্নলিখিত খবরগুলি সংগ্রহ ও প্রচার করা:—

(ক) নূতন কাঁচা মালের এবং অর্দ্ধসম্পন্ন মালের উপযুক্ত ব্যবহার এবং ইহাদের বাজার সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর।

(খ) যে সমস্ত কাঁচা মাল বা অর্দ্ধসম্পন্ন মাল পূর্ব্ব হইতেই বাজারে চলিত আছে, তাহাদের সম্বন্ধে নূতন ব্যবহার ও তাহাদের বাজারের খবরাখবর।

(গ) কাঁচা মাল ও অর্দ্ধসম্পন্ন মালের উৎপত্তি-স্থান, উৎপাদন, সরবরাহ, মূল্য, কাটতি এবং ব্যবহার সম্বন্ধে খবরাখবর এবং ইহাদের সম্বন্ধে নূতন কোন আইন কানুন বাহির হইলে তাহার সংবাদ।

(ঘ) সাম্রাজ্যের মধ্যে উপরোক্ত প্রকারের মালের সরবরাহ-বৃদ্ধি এবং মালের সরবরাহের উপায় বাহির করিবার উপযোগী সকল প্রকারের সংবাদ।

(ঙ) উপরোক্ত প্রকারের মালের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এবং তাহাদের বাজারে পাঠাইবার উপযোগী সমস্ত খবর।

(চ) সাম্রাজ্যের ভিতরের শিল্পসম্বন্ধীয়, যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত ও বৈজ্ঞানিক খবর।

৩। সাম্রাজ্যের মধ্যে কাঁচা মালের উন্নতিসাধন করিয়া যাহাতে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

৪। এই ইন্‌স্টিটিউটের ল্যাবরেটরীতে সমস্ত প্রকারের কাঁচা মালের প্রাথমিক গবেষণা চালান এবং দরকারমত অন্য একটী বৈজ্ঞানিক এবং টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশন স্থাপন করিয়া এই সমস্ত মালের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করা।

৫। শিল্প ও ব্যবসায়ের উপযোগী সমস্ত কাঁচা মালের নমুনা সংগ্রহ করা।

৬। সাম্রাজ্যের মধ্যে এই প্রকারের উন্নতিকল্পে গঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিতভাবে কাজ করা।

৭। সাধারণের খবর এবং উপদেশের জন্য ইনষ্টিটিউটের প্রদর্শনীতে সাম্রাজ্যের সম্পদ্ এবং উন্নতি বিষয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি রাখা। এই ছবিগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যের ভাল ভাল দৃশ্য এবং সাম্রাজ্যবাসীর সাধারণ জীবন-ধারণ বিষয়ক অনেকগুলি ছবি থাকিবে। মাঝে মাঝে অন্যান্য আবশ্যক এই ভাবের অস্থায়ী প্রদর্শনী খোলা।

৮। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি কাজে লাগাইতে যদি অন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা দরকার হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

বর্ত্তমান পরিচালনী

ইন্‌স্টিটিউটের কাজ চালাইবার জন্য দুইটী প্রধান বিভাগ খোলা হইয়াছে। একটী উদ্ভিজ্জ ও জান্তব মাল সংগ্রহ বিভাগ, অপরটী খনিজ সম্পদ্ বিভাগ। বিভাগগুলির প্রত্যেকটীতে বিভিন্ন প্রকারের মাল-সংগ্রহ-সংক্রান্ত কাজের জন্য একটী করিয়া অ্যাড্‌ভাইসরি কাউন্সিল (পরামর্শদাতা সমিতি) গঠিত হইয়াছে।

অ্যাড্‌ভাইসরি কাউন্সিলের কাজ হইতেছে সাম্রাজ্যের এই দুইটী কাঁচা মালের ব্যবহার সম্বন্ধে ইন্‌স্টিটিউটকে পরামর্শ দেওয়া, এবং ইহার কাজ চালাইতে কোন্ কোন্ উপায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহাও বাত্‌লাইয়া দেওয়া। কার্য্য-পরিচালনার আরও সুবিধার জন্য এই কাউন্সিল কতকগুলি টেক্‌নিক্যাল কমিটি গঠন করিয়াছেন। ইহারা শুধু বিভাগের বিশেষ বিশেষ ব্যাপারগুলির পরিচালনার ভার লইবে।

সংবাদ বিভাগ

সাম্রাজ্যের উদ্ভিজ্জ ও জান্তব কাঁচা মালের উৎপাদন, ব্যবহার এবং বাজারে পাঠান বিষয়ে সকল প্রকারের ব্যবসায়-সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করা এই বিভাগের কাজ। তা ছাড়া ঐ সব কাঁচা মাল বিষয়ক কোন খবর কোথাও প্রকাশিত হইলে, এবং সে খবর যদি উপরোক্ত বিভাগের কোন কাজে লাগিতে পারে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সে সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দরকার মত সাজাইয়া রাখাও এই সংবাদ বিভাগের কাজ।

তদন্ত বিভাগ

এই বিভাগের কাজ হইতেছে সাম্রাজ্যের সমস্ত রকমের কাঁচামালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া ইহাদের ভিতর কি কি জিনিষ আছে তাহা দেখা, ইহাদের দাম স্থির করা এবং ব্যবসায় হিসাবে ইহাদের ব্যবহার নির্ণয় করা।

প্রচার

সাম্রাজ্যের কাঁচা মালের উৎপাদন এবং ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্ত প্রকারের খবর প্রচারের জন্য ইন্‌স্টিটিউট্ একটী ত্রৈমাসিক সংবাদপত্র বাহির করেন। ইহাতে সাম্রাজ্য, উপনিবেশসমূহ এবং ভারতের জন্য ইম্পিরিয়াল ইন্‌স্টিটিউটে যে সমস্ত বড় বড় গোছের তদন্ত চালান হয়, তাহারই সমস্ত বিবরণী দেওয়া হয়। এ ছাড়া ইহাতে আরও থাকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কৃষির উন্নতি এবং খনিজ সম্পদ্ বৃদ্ধি ও সর্ব্ব প্রকারের কাঁচা মালের শিল্পে ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

সাধারণ গ্যালারি

ইন্‌স্টিটিউটের সাধারণ গ্যালারিতে সাম্রাজ্যের, ভারতের

এবং উপনিবেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ভাল ভাল সুদৃশ্য ছবি সাজান আছে।

ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের খরচ চালাইবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ১,২০০ পাউণ্ড করিয়া চাঁদা দেন।

ইন্‌ষ্টিটিউট্ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতও তাহার সম্পূর্ণ অধিকার পাইবে আশা করা যায়। ইন্‌ষ্টিটিউটের কাউন্সিল ও কমিটিগুলা সাম্রাজ্যের সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন অথবা কোন দ্রাব্য বা উদ্ভিজ্জ মালের নমুনার জন্য অনুসন্ধান আসিলে তাহা তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করেন।

গভর্ণমেণ্টের যে সমস্ত বিভাগ এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যের মাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তদন্ত করিয়া থাকেন, এই ইন্‌ষ্টিটিউট তাহাদের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন এবং বিশিষ্ট অনুসন্ধানগুলা গবেষণার জন্য তাড়াতাড়ি উপযুক্ত গবেষকের নিকট পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

এই ইন্‌ষ্টিটিউটের সহিত যাঁহারা জড়িত আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একান্ত ইচ্ছা এই যে, সাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়।

অতিরিক্ত রেল ভাড়ায় শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার রেলওয়ের ফিনান্সিয়াল কমিশনার মিঃ এ, এ, এল, পার্সন্সএর সম্মুখে বিগত ৭ই জানুয়ারী উক্ত চেম্বারের সভায় নিম্নোক্তরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন :—

গত ছয় বৎসরে ভারতের গভর্ণমেণ্ট-শাসিত রেলওয়ের যাবতীয় খরচ, ডিপ্রিসিয়েশন, সুদ ইত্যাদি বাদ দিয়া মোট ৬০ কোটী টাকা লাভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে সাড়ে বাইশ কোটী টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইয়াছে, ত্রিশ কোটী সাধারণ রাজস্বে দেওয়া হইয়াছে, বাকী ৮।৯ কোটী নূতন রেল লাইন খোলায় ব্যয় করা হইয়াছে। রেলওয়ের সমস্ত খরচ বাদে যখন এই ৬০ কোটী টাকা বাঁচিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে রেলওয়ে এই টাকাটা সমস্ত যাত্রী, সওদাগর, ও মালোৎপাদন-কারীদের নিকট হইতে তাহা বহন-খরচের উপরে অতিরিক্ত আদায় করিয়াছে। সুতরাং এতগুলা টাকা দেশের শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে অথথা আদায় করা হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব, যদিও বর্ত্তমানে করদার মত কতকগুলি মালের উপর অপেক্ষাকৃত কম ভাড়া আদায় করা হয়, এবং কতকগুলি রেলওয়ে সময় সময় যাত্রীদের ভাড়া বিশেষ কারণে কমাইয়া থাকে, তবু সমস্ত রেলওয়ের সর্ব্বপ্রকারের ভাড়া আরও কমাইয়া দেওয়া একান্ত দরকার।

এ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ফণ্ডে ২২ কোটীর উপর টাকা জমিয়া গিয়াছে। এই ফণ্ডে উর্দ্ধসংখ্যা কত টাকা জমান দরকার তাহারও কোন সীমা-নির্দ্দেশ নাই। রিজার্ভ ফণ্ডে যেরূপ টাকা জমিয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক আগেই সর্ব্ববিষয়ের রেল-ভাড়া কমান উচিত ছিল। প্রথম যখন রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা জমাইবার কথা হয়, তখনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে মালের ও যাত্রীর ভাড়া কমানো। পূর্ব্বে একবার সমস্ত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে মালের ভাড়া কমাইবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রস্তাবের উত্তরে ১৯২৩ সনে রেলওয়ের কমার্শিয়াল বোর্ড বলেন যে, রিজার্ভ ফণ্ডে এত টাকা জমে নাই, যাহাতে মালের ভাড়া কমাইবার কথা উঠিতে পারে। গত বৎসর হইতে যে ভাড়া কমান সুরু হইয়াছে তাহাও তেমন উল্লেখযোগ্য বলা যাইতে পারে না। এমন কি বিলাতে, যেখানে সমস্ত রেলওয়েগুলি কেবল নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোকের সম্পত্তি এবং কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত, সেখানেও ১৯২১ সনের রেলওয়ে অ্যাক্ট অনুসারে রেলওয়ের উদ্বৃত্ত টাকার শতকরা ৮০ ভাগ দেশের ব্যবসাদারদের সুবিধার জন্য সমস্ত মালের ভাড়া কমানোতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এদেশের রেলওয়েগুলির মালিক ও পরিচালক গভর্ণমেণ্ট হইলেও তাঁহারা এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ভারতীয় রেলওয়ে অ্যাক্ট ১৮৯০ সনে প্রথম গঠিত হয়। সে আজ ৪০ বৎসরের কথা। তারপর হইতে এযাবৎ এ আইন আর ভাঙ্গাগড়া হয় নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গভর্ণমেণ্ট এতদিনে এদিকে মনোযোগ

করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে ভাড়া কমানোর কথা বলা হইয়াছে তাহা শুধু পূর্ব্বের আইনের নির্দ্দিষ্ট হারের মধ্যেই কমান সম্ভব। কিন্তু এই হারগুলি বাঁধিবার সময় অসম্ভবরূপ চড়া করিয়া বাঁধা হইয়াছে। এই আইন ভাঙ্গিয়া গড়িবার সময় রেলের ভাড়ার হারগুলি আরও কমাইয়া বাঁধা একান্ত দরকার। নতুন করিয়া আইন গড়িবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিলে ভাল হইবে :—

(ক) রেল-ভাড়ার হারের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দুই সীমা আইনতঃ বাঁধা আছে। রেলের কর্ত্তৃপক্ষ এই সীমার মধ্যস্থিত যে কোন হার তাঁহাদের সুবিধা ও ইচ্ছামত বাহাল করিতে পারেন। গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে এবং এমন কি তাহার পূর্ব্ব হইতেও এই সীমানার কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বর্ত্তমান ভাড়ার অধিকাংশ হারই দম-মাইল হিসাবে, এবং বাঁধা সীমানার সর্ব্বোচ্চ হারই ধার্য্য করা হইয়াছে। দূরগামী মালের উপর "টেলিস্কোপিক" হারের পরিবর্ত্তে দম-মাইল হারে ভাড়া থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অত বেশী ভাড়া দিয়া বেশী দূরে মাল পাঠান সম্ভব হয় না। এতে যে রেলওয়ের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না, দম-মাইল হার বাহাল করিবার সময় কর্ত্তৃপক্ষ সেকথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশে, যেখানকার মালপত্র বহুদূরের পাল্লায় রেলযোগে পাঠান নিতান্ত দরকার, সেখানে ভাড়ার হারগঠনে এরূপ ত্রুটি বাস্তবিকই নিন্দনীয়। আমেরিকায় এই সমস্ত অসুবিধা অনুভব করায় সাধারণের সুবিধামত মালের ভাড়ার হার গঠন করা হইয়াছে। আমেরিকাবাসী ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে যে, প্রত্যেক মালের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ভাড়া ঠিক করা দরকার যাহার বেশী সে মালের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। ফলে বেশী দূরত্বের দরুণ এ সব মালের ভাড়া বড় বেশী বাড়িতে পারে না। সেখানে গমনশীল মালের দূরত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কোন মালের ভাড়া কত কমান যাইতে পারে শুধু তাহাই দেখা হয়। এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় বলিয়া মার্কিণ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা রেলওয়ে হইতে যথেষ্ট সুখ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। এতদিন ধরিয়া ভারতের সমস্ত রেলওয়ে শুধু কয়লা প্রেরণ সম্বন্ধেই "ক্লিউমুলেটিভ" হারের সুবিধা দিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য মালের উপরেও এই সুবিধাজনক হারে ভাড়া বসাইলে রেলওয়ের পক্ষে কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমন অনেক মাল আছে (যথা বস্ত্র) বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে যাহার প্রচুর আমদানি হয়; এই প্রকারের মালের উপর এক নাগাড়ের চালানে একটা বাঁধা "লু" হারে ভাড়া বসাইলে যেমন দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বাড়িবার সুযোগ পায়, তেমনি রেলযোগে বহুদূরগামী মালের পরিমাণও অনেক বাড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেশী শিল্পকে বাড়িবার অনেক সুযোগ দেওয়া হয়।

(খ) বর্ত্তমানে ভাড়ার হারের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন যে সীমা আইনতঃ বাঁধা আছে, তাহাতে বিভিন্ন রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ মালের ভাড়া ইচ্ছামত নামাইতে উঠাইতে খুব বেশী সুযোগ পান, ফলে দেশের শিল্প উপযুক্তরূপে বাড়িয়া উঠিতে অনেক বাধা পায়। ঝরিয়া হইতে কয়লা আমেদাবাদ পাঠাইবার বেলায় টন প্রতি মাইল পিছু ২·১৬ পাই হারে ভাড়া আদায় হয়। অথচ আলানি তৈল উপরোক্ত পথের সিকি রাস্তা বোম্বাই হইতে আমেদাবাদ পাঠাইবার বেলায় টন প্রতি মাইল পিছু ১২·৫৬ পাই হারে ভাড়া আদায় করা হয়। এই প্রকারের আরও অনেক অসামঞ্জস্য আছে। যেমন কৃষি-সংক্রান্ত কল-কব্জা হাওড়া হইতে কাণপুর এই ৬০৩ মাইল দূরে চালান দিবার সময় মণকরা ১৩ আনা ১১ পাই ভাড়া লওয়া হয়, অথচ ঐ একই জিনিষ কলিকাতা হইতে কটেগড় চালান দিবার বেলায় মাত্র এই ৪৮৬ মাইল রাস্তায় ভাড়া প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশী অর্থাৎ মণকরা ১ টাকা ৩ আনা ১১ পাই ধরা হয়। আজকালকার দিনে বাণিজ্যের সমস্ত পণ্যের উপর খুব সস্তা হিসাবে দাম না ফেলিলে প্রতিযোগিতায় টেকা কঠিন। টনপিছু মাত্র এক পাই দাম বেশী ফেলায় দরুণ অনেক সময় অনেক মালের বাজার হারাইতে হয়।

(গ) বর্ত্তমান সময়ে ভাড়ার হার বেশী বাণিজ্য অপেক্ষা বিদেশী বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক করিয়া গড়া হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝা

যাইবে। রেলপথে বোম্বাই হইতে কলিকাতার দূরত্ব মাত্র ১২৩১ মাইল এবং "পিল্ গুড্‌স"-র ভাড়া এই পথে মণকরা মাত্র ছেড় টাকা ধার্য্য হইয়াছে। বোম্বাই হইতে রেলপথে রাঁচির দূরত্ব ১১৭৪ মাইল, কিন্তু এই টাকার ভাড়া মণকরা ২৮৶০। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, দূরত্ব ৫৭ মাইল কম হওয়া সত্ত্বেও ভাড়া ডবলেরও বেশী। আবার বোম্বাই হইতে কলিকাতা হইয়া রাঁচির ভাড়া মণকরা ২৮/৯ পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে এ ভাড়া বোম্বাই হইতে রাঁচির ভাড়া অপেক্ষাও কম। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শিল্প-বাণিজ্যকে মাত্র সহর-বন্দরে কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে এগুলিকে রাখিয়া নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখাই যেন ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

মালের ভাড়া হইতে আয় যথাসম্ভব বাড়াইবার জন্য বর্ত্তমান প্রণালীতে রেলওয়েগুলি এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে গমনশীল মালের উপর ভাড়া যথাসম্ভব কমাইয়া ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এবিষয়ে বেশী আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এজন্য দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির সঙ্গে অনেক সময় ঠকাঠকি বাধে। অনেক সময় কোন কোন জিনিষের উপর রেলওয়ে টারিফ, কাষ্টম্‌স্ টারিফের মত একটা ক্ষতিপূরক শুল্ক (কম্পেন্‌সেশন ডিউটি) আদায় করা হয়। রেলওয়ে আইন নূতন করিয়া গড়িবার সময় এই প্রকার রেলওয়ে টারিফ শুল্কের হার জাতীয় কৃষি ও শিল্প-বৃদ্ধির অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট করা দরকার।

ভারতের জাতীয় শিল্প-বৃদ্ধির অনুকূলে রেলের ভাড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা-প্রসঙ্গে ইন্‌চ্‌কেপ্‌ কমিশন বহুপূর্ব্বে অনেক বলিয়া গিয়াছেন। ভারতের ফিস্‌ক্যাল কমিশনও এবিষয়ে সম্পূর্ণ মত দেওয়া সত্ত্বেও রেলওয়ে বোর্ড তাহাতে কোন মনোযোগ দেন নাই। নূতন করিয়া আইন গড়িবার সময় জাতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তায় রেলওয়ে ভাড়ার হার স্থির করা একান্ত আবশ্যক হইবে।

(খ) আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। অন্যান্য দেশের মত এখানকার ভাড়ার হার স্থির করিতে গিয়া সব অবস্থার দিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে নজর রাখা হয় নাই। শুধু ব্যবসার দিক্ বিচার করিয়া, যে হারে ভাড়া ফেলিলে রেলওয়ের ঠিক ন্যায়সঙ্গত লাভ থাকে, সেই হারেই সমস্ত রেলওয়ের ভাড়া স্থির করা উচিত। এমন কি ইংলণ্ডেও, যেখানে রেলওয়ের উপর গভর্ণমেণ্টের আর্থিক হিসাবে কোন হাত নাই, সেখানেও একটা সাধারণ পর্য্যায় সমস্ত রেল-ভাড়ার হার বাঁধা এবং রাজত্বেরও একটা সাধারণ সীমা-নির্দ্দেশ আছে। সেখানকার চালানি মালের ৮-টী শ্রেণীর ছইটী বাদে আর সব গুলারই ভাড়ার হার একটা সাধারণ সর্ব্বনিম্ন স্তরে বাঁধা।

এখানকার রেলওয়েগুলি যখন একই গভর্ণমেণ্টের অধীন তখন মাল-চলাচল ও ভাড়া-নির্দ্দেশ বিষয়ে রেলওয়ের পরিচালনা অর্থনীতির দিক্ দিয়া আরও দক্ষতার সহিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে রেলওয়ের মুনাফা হইতে গৃহীত রাজস্বের একটা সাধারণ সীমা নির্দ্দেশ করিলে কাজ অনেক সহজ হইয়া পড়ে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যাহাতে ক্ষতি না হয় সেই মত হারে মালের উপর ভাড়া ফেলিয়া শুধু সেই অর্থেই এই রাজস্বের পুরণসাধন হওয়া উচিত। এই রাজস্বের সকল টাকা উঠাইতে মালের ভাড়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য "রেলওয়ে রেট ট্রিবিউন্যাল" গঠিত হওয়া আবশ্যক। রেলওয়ে বোর্ডের একতিয়ারের বাহিরে থাকিয়া এই স্বার্থহীন লক্ষ্যকে ভাড়ার হার নির্দ্দেশের সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইবে। বহুপূর্ব্বে একবার অ্যাকোয়ার্থ কমিটি ভারতের রেলওয়ের তরফ হইতে এই প্রকারের একটী লক্ষ্য-গঠনের জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন এবং জাতীয় স্বার্থ ও রাজস্বের দিক্ দিয়া বিচার করিয়াও ইণ্ডিয়ান ফিস্‌ক্যাল্ কমিশন এই লক্ষ্য-গঠনের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ও বিলাতে, যেখানে রেলওয়ে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোকের স্বার্থ লইয়া গঠিত, সেখানেও বহুপূর্ব্বে এই প্রকারের সঙ্ঘের হাতে সমস্ত রেলওয়ের পূরা ভার ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। আর ভারতবর্ষে এক গভর্ণমেণ্টের হাতে সমস্ত রেলওয়ে থাকিলেও এ বিষয়ে কোন উন্নতিই সাধিত হইতেছে না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। নূতন করিয়া আইন গড়িবার

সময় এই প্রকারের সঙ্ঘ-গঠনের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

(৪) চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিনিধিরা যাহাতে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কনফারেন্স এসোসিয়েশন এবং শুড্‌স ক্লাসিফিকেশন কমিটীর সহিত সম্পূর্ণ যোগাযোগে থাকিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও নূতন আইনে করা দরকার। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন বহুপূর্ব্বে এ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজ ১২ বৎসরের মধ্যে তাহা কাজে লাগান হইল না।

(৫) আজকাল চালানি মাল সম্বন্ধে পথের মাঝে বিপদ-আপদের কোন ঝুঁকি রেলওয়ে গ্রহণ করে না, সমস্ত ঝুঁকি প্রেরকের ঘাড়ে রাখিয়া তাহারা মাল চালান দিয়া থাকে। অ্যাকোয়ার্থ কমিটী এ নিয়ম তুলিয়া দিতে বহুপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন। নূতন অ্যাক্টে এ নিয়ম যাহাতে উঠিয়া যায় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজর থাকা দরকার।

রেলওয়ের আয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ দেখিয়া রেলওয়ে বোর্ডের পরিচালনার অযত্ন খুব বাহাদুরী দিতে হইবে, কিন্তু বৎসর অনেক হইল ইঁহারা নতুন ও নানা লাইন খুলিবার জন্য যে পরিমাণ টাকা চালিতেছেন তাহা মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়। গভর্ণমেণ্টের একটা সাধারণ অধিবেশনের পর যখন গভর্ণমেণ্টের অর্থ বিভাগ হইতে রেলওয়ের অর্থ বিভাগ আলাদা হইয়া যায়, তদবধি ভারত এ বিভাগের উপর হইতে গভর্ণমেণ্টের আধিপত্য উঠিয়া গিয়াছে। ফলে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্ত কাজে অনিয়ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রেলওয়ের আয় যেমন বাড়িয়াছে, ভারতীয় রেলওয়ের অর্থবিভাগ তেমনি অনেক-গুলা অর্থসংক্রান্ত দায়িত্বও ঘাড়ে নিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত মোট আদায়ের পরিমাণ একশত কোটি টাকায় উঠিয়াছে। ইহা হইতে উপরোক্ত দায়িত্ব-বাবদ সমস্ত খরচ ধরিয়া ৬০ কোটী টাকার উপর দিতে হয়। এই টাকার মধ্যে শুদ্ধ সুদের বাবদই ২৮ কোটী টাকা দেনা। সুতরাং এতগুলা টাকার অভাব পূরাইতে গতবৎসর ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। রেলওয়ের ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচারের জন্য এই প্রকারে অর্থাভাব ঘটায় এবং বাজারে ধারে দালপত্র তেমন না মিলায় গত বৎসর হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের ও লণ্ডনের টাকার বাজারে ধারের পরিমাণ খুব বাড়াইয়া দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট যদিও তাঁহাদের ধারের সুদের হার ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া দিতেছেন, এবং ধারের সর্ত্তও উত্তমর্ণদের অনেক অনুকূলে করিয়া দিয়াছেন, তথাপি বাজারে ধার করা দিন দিন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই সুদের হার দিন দিন বাড়াইয়া দেওয়াতে সমস্ত কোম্পানীর বাহিরে লগ্নি টাকার মূল্য দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। "গিল্ট এজ" (বাঁধা টাকার) বাজারও অনেক পড়িয়া গিয়াছে, ফলে বাঁধা সিকিউরিটির মূল্য সাংঘাতিক রকম পড়িয়া যায় ও ব্যাঙ্ক এবং ইন্সিওরেন্স কোম্পানী-গুলাকে ব্যবসায়ে চালা টাকার উপর মোটা রকমের 'ঘাব' খাওয়াইতে হয়। এই সমস্ত কারণবশতঃ, এমন কি নিজেদের ও নিজ অর্থ বিভাগের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বোর্ডকে অনুরোধ করা উচিত যে, যতগুলি নূতন লাইনের কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে, তাহাদের কাজের লাভ-লোকসান ভাল করিয়া যতাইয়া না দেখিয়া যেন তাঁহারা আর নূতন লাইন খোলার কাজে হাতে না দেন।

অধিবেশনের পর হইতে রেলওয়ে বোর্ডের হাতে যে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া 'থোক খরচে' জলের মত টাকা চালিতেছেন। অতগুলা টাকা খরচের ভার রেলওয়ে বোর্ডের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার ফলাফল কি হইয়াছে তাহা নীচের হিসাব হইতে বেশ বুঝিয়া লওয়া যায়। নূতন নূতন রেল লাইনের কাজ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইঁহারা মতলবই করিয়াছেন যে, বৎসরে অন্ততঃ হাজার মাইল নূতন রেল লাইন খুলিতে হইবে। নীচের উদাহরণে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

যাতায়াতের জন্য খোলা হইয়াছে	৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে লাইনগুলির কাজ চলিতেছিল	অনুমোদিত লাইন
	২,৫৫১.৪৪	
	৩,৬২৮.৭৮	

১৯২৭-২৮ সনের মধ্যে যতগুলি খোলা হইয়াছে ও হইবে তাহার পরিমাণ—১১০০।

১৯২৯-৩০ সনে খোলা হইবে ৬০০ মাইল, এবং নূতন প্রতিষ্ঠিত হইবে ২,৭২১ মাইল।

১৯১৪-১৫ সন হইতে দশ বৎসরে মোট ৩,৩৮২ মাইল নূতন লাইন খোলা হইয়াছে, অথবা ঐ দশ বৎসরের প্রতি বৎসরে গড়ে ৩৩৮ মাইল করিয়া নূতন লাইন খোলা হইয়াছে। উপরের হিসাব এই সংখ্যার তুলনায় খুবই অসাধারণ রকমের তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি গঠন-খরচাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে এই খরচ নির্ব্বাহের জন্য পুঁজিও অনেক বেশী পরিমাণ তাগিদে হইতেছে।

নূতন লাইন খুলিতে কর্ত্তৃপক্ষের যখন এত বেশী ঝোঁক দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহাদের এটাও দেখা দরকার যে, লাইনগুলি খুলিতে যে পুঁজি ঢালা হইয়াছে, তাহার ডিভিডেণ্ড যেন লাইনের আয়েই কুলাইয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে রেলওয়ের খরচ আরও বাড়াইতে হইলে এটা দেখা দরকার যে, উক্ত খরচে রেলওয়ের আয় বাড়িবে কিনা। রেলওয়ের ব্যবসায়ের দিকটা যদিও এখন কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পড়িয়াছে এবং যদিও উপযুক্ত আয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে নূতন লাইন খুলিবার প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন না, তবুও যে সমস্ত নূতন লাইন ইতি-পূর্ব্বে খোলা হইয়াছে তাহাদের আয় কতদূর বাড়িবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এ বিষয়ের উদাহরণস্বরূপে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের নাম করা যাইতে পারে। এই রেলওয়েটী প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতে লোকসান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, নূতন লাইন খুলিতে যা এষ্টিমেট লইয়া কাজ আরম্ভ হয় প্রকৃত পক্ষে খরচ তদপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া যায়, এবং এই নূতন লাইনগুলা পূর্ব্বে প্রধান লাইনের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়ায় ইহাদের আয়ও আলাদা করিয়া দেখান হয় না। ফলে নূতন লাইন হইতে যে আয় আশা করিয়া লাইন খোলা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইল কিনা ধরা যায় না এবং আশানুরূপ মাল চলাচল হইল কিনা তাহাও ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং নূতন লাইন হইতে লাভ হইতেছে কি লোকসান হইতেছে তাহা বুঝিবার কোন উপায় থাকিল না। এ ব্যাপারটা যে কতদূর সাংঘা-তিক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচার এষ্টিমেটের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়াও নূতন লাইনের কাজ কমাইয়া দেওয়া উচিত। নূতন কারখানেলি রেলওয়ের উদাহরণ দেখাইলে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের এঞ্জেলির হাত দিয়া এই নূতন রেলওয়েটীর প্রতিষ্ঠার জন্য ১,৩৪ লক্ষ টাকা এষ্টিমেট করা হয়। পরে যখন দেখা গেল এষ্টিমেটের টাকায় খরচ কুলাইতেছেনা, তখন ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে পূর্ব্বের এষ্টিমেট বদলাইয়া ২১৭ লক্ষ টাকার আর একটী নূতন এষ্টিমেট তৈয়ারী হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে গোড়ার এষ্টিমেট হইতে ৮৩ লক্ষ টাকা বেশী লাগিয়া গেল। যতদূর শুনা যাইতেছে তাহাতে মোট খরচ আরও বাড়িয়া ৩০১ লক্ষে গিয়া ঠেকিবে। সোরদুর নীলাম্বর রেলওয়ে নূতন প্রতিষ্ঠা করিবার সময় ৬২ লাখ টাকা এষ্টিমেট করা হয়, পরে কাজে নামিয়া ঐ টাকায় সমস্ত খরচ কুলায় না দেখিয়া নূতন এক এষ্টিমেট করিয়া ৮৪ লক্ষ টাকা খরচের বাবদ অনুমোদন করিয়া লওয়া হয়। এই ভাবে তাড়াতাড়ি সব কাজ সারিতে যাওয়ায় সাধারণের পয়সা অনেক নষ্ট হইতেছে।

ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচার যখন এত বেশী হইতেছে, তখন রেলওয়ের আয়ের পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়া দরকার। ছয় বৎসর পূর্ব্বে রেলওয়ের আয় ছিল গড়ে শতকরা ৫'৮৫ ভাগ। ১৯২৭-২৮ সনে সেইখানে আয়ের পরিমাণ শতকরা ৫'৪০তে ঠেকিয়াছে। ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ের আয় নাকি আরও কম ছিল। মোট লাগান পুঁজির উপর এই কমতির হিসাব করিলে দেখা যায় রেলওয়ের আয় ৩৫ কোটী টাকা কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯২৭-২৮ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ৩০০০ মাইল নূতন লাইন বাড়ান, মাল চলাচলের পরিমাণ-বৃদ্ধি, রেলওয়ে বোর্ডের প্রচারকার্য্য বৃদ্ধি, কারখানাগুলির আধুনিক ধরণে পরিবর্ত্তন করিয়া

মেরামতি খরচ যথাসম্ভব কমান, নানা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ের খরচ কমিয়া যাওয়া, মালপত্রের মূল্য অনেক কমিয়া যাওয়া প্রভৃতি অনেক ঘটনা অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও মোট ভাড়া পুঁজির অনুপাতে রেলওয়ের আয় দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

রেলওয়ের আয় দিন দিন কমিয়া যাইতেছে বলিয়া আমাদের উদ্বেগ ইহা নয় যে, একবার হইতে সমস্ত ক্যাপিটাল একস্‌পেণ্ডিচার বাদ দিয়া দেওয়া হউক। বিষয়টা ঠিকমত বিচার করিবার সময় ইহাও দেখা উচিত যে, ক্যাপিটাল খরচের মধ্যে যে টাকা "ওপন লাইন" খুলিয়া পূর্ব্বের মাল চলাচলের আরও সুবিধা করিয়া দিবার জন্য যায় হয়, তাহার ফলও তদ্বিপ কিছু করিয়া যায়। যাত্রী ও মাল চলাচলের সুবিধার জন্য এই প্রকারের ক্যাপিটাল খরচ নিতান্ত দরকার হইয়া পড়ে। এবং যেখানে এই প্রকারের "ওপন লাইন" খোলার ফল রেলওয়ের আয় বাড়িয়া যায়, এবং অনেক লোকসান বাঁচাইয়া দেয়, সেরূপ ক্ষেত্রে এই ক্যাপিটাল খরচ অর্থনীতির দিক্ দিয়া খুবই সঙ্গত। বড়ই সুখের বিষয় ভারতের রেলওয়েগুলিতে এই প্রকারের "ওপন লাইন" খুলিয়া মাল ও যাত্রী চলাচলের অনেক সুবিধা করিয়া দিবার দিকে কর্তৃপক্ষের আজকাল বেশ নজর পড়িয়াছে দেখা যায়। কিন্তু রেলওয়ের "নিউলাইন" খুলিবার জন্য এত তৎপরতা সব ক্ষেত্রে সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। বিশেষতঃ, এ কাজের টাকার সংস্থানের জন্য গভর্ণমেণ্ট বাজার হইতে দিন দিন যে বেশী সুদে ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেজন্য ধারের বাজারের দিন দিন যে দুর্দ্দশা হইতেছে, সে সমস্ত বিবেচনা করিলে গভর্ণমেণ্টের একাজকে কোন মতে সমর্থন করা যায় না। রেলওয়ের ক্যাপিটাল খরচ মাত্রেই যে দোষের সে কথা বলা হইতেছে না; তবে এই খরচের মধ্যে যেগুলি এমন সমস্ত নূতন লাইন খুলিতে নিয়োজিত হইতেছে, যাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া দিলেও রেলওয়ের বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সে সমস্ত খরচ আপাততঃ বন্ধ রাখা উচিত। বরং সে টাকা দিয়া মাল ও যাত্রীর ভাড়া কমাইবার ব্যবস্থা করিলে সাধারণের ও দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইবে।

জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা

[ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহিত আমার কথোপকথনের সারমর্ম্ম।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

প্রঃ—আজ জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—বেশ, কি শুনতে চাও?

প্রঃ—জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি?

উঃ—আছে। প্রথম সে সম্বন্ধেই কিছু বলছি শোন। জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করবে যে, এদেশের 'রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্ক' ছাড়া অন্ততঃ আরও চারটে ব্যাঙ্ক নোট বের করছে।

প্রঃ—'রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্ক'ই ত জার্ম্মাণির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক?

উঃ—হাঁ, এটা যে কতবড় শক্তিমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তা এই থেকেই বুঝতে পারবে যে, জার্ম্মাণিতে এই একটা ব্যাঙ্কেরই পঁচিশ শাখা অফিস আছে। এ ছাড়াও যে কোন আলাদা ব্যাঙ্ক নোট বের করতে পারে তা দেখে মনে একটু খটকা লাগছে নিশ্চয়ই?

প্রঃ—তা ত বটেই।—আচ্ছা, আর কোন বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, জার্ম্মাণিতে গভর্ণমেণ্ট নিজেই সব বড় বড় ব্যাঙ্ক চালাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলির কারবার ঠিক এক রকম নয়, আর এরা টাকাও ধার দেয় বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে।

প্রঃ—তবে কি জার্ম্মাণিতে বেসরকারী ব্যাঙ্ক নেই?

উঃ—বেসরকারী ব্যাঙ্কও অনেক আছে এবং তার মধ্যে অনেকগুলি বৃহৎ যৌথ প্রতিষ্ঠান।

প্রঃ—এরা কি করে?

উঃ—এদেরও কাজ হচ্ছে কৃষি, বাণিজ্য কিংবা শিল্পের জন্য টাকা ধার দেওয়া।

প্রঃ—জার্ম্মাণির ব্যাঙ্কগুলি কি ভাবে কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পের সহায়তা করছে সে সম্বন্ধে আলাদা করে আলোচনা করলে হয় না?

উঃ—এদেশের ব্যাঙ্কগুলি কি রকম বিস্তৃতভাবে শিল্পের সহায়তা করছে তা এখন প্রায় একটা প্রবাদের মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জার্ম্মাণির সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিই দেশের শিল্পোন্নতির জন্য টাকা যোগাচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করছে।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—যৌথ-ব্যাঙ্কগুলি অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অনেক শেয়ার কিনেছে, তার ফলে এরা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতিগুলিতে কয়েকজন সদস্য নির্ব্বাচন করে পাঠাবার ক্ষমতাও লাভ করেছে। আবার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালক সমিতিরও কেউ কেউ ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনায় তার অন্ততঃ পরিচালক নির্ব্বাচিত হয়েছে। এতে উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানই গোটা কয়েক মাত্র লোকের শাসনাধীন হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের এ রকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা ভাল হয় কি? ব্যাঙ্কপরিচালকরা এ রকম সুবিধা পেলে, তাঁরা যে সব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনেছেন, নির্বিচারে তাদেরই শুধু ধার দিতে চাইবেন যে। এ রকম লোকের হাতে অংশীদারের টাকা রাখা ও নিরাপদ নয়, শিল্পগুলি যদি শেষ পর্য্যন্ত না টেঁকে তবে ত অংশীদারদেরই টাকা মারা যাবে?

উঃ—যুক্তির দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে একথা খুবই খাঁটি, সন্দেহ নেই। তবু ব্যাঙ্কের সঙ্গে এ রকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলেই জার্ম্মানির বিবিধ শিল্প এত অল্পদিনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। শিল্পবিস্তারে জার্ম্মানি কাজ সুরু করেছে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। জার্ম্মানরা এই সময়েই প্রথম কৃষি ছেড়ে শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করে। আর আজ জার্ম্মানির শিল্পবিস্তার পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে বলেই হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে,—সে শুধু জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কেরই কেরামতিতে। এরা অকাতরে স্বদেশিকতার অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পগুলিকে কর্জ্জ দিয়ে সাহায্য করেছে। অন্ততঃ টাকাপয়সার জন্য তাদের কোন অসুবিধা হয় নি।

প্রঃ—কিন্তু দেশের বিশেষ কয়েকটা শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করলেই হত, সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি এদের টাকা ধার দিতে গেল কেন?

উঃ—তারও একটা কারণ আছে। যৌথ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠা করবার আগে জার্ম্মানিতে যেসব ব্যাঙ্কির প্রতিষ্ঠান ছিল, তারা পূর্ব্বেই অন্যান্য ব্যাঙ্কির কারবার হাত করে নিয়েছিল। এক কৃষির দুনাই কৃষি-ব্যাঙ্ক, বন্ধকী-ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন শিল্পের জন্য টাকা ধার দেওয়াই তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। বর্ত্তমানে এদেরই মধ্যে চারটে ব্যাঙ্ক বিস্তৃতভাবে জার্ম্মাণ শিল্পের পোষকতা করছে। তাদের "ডি" ব্যাঙ্ক বলা হয়।

প্রঃ—এরকম অদ্ভুত নামকরণ হবার মানে কি?

উঃ—তার কারণ এই চারটে ব্যাঙ্কেরই নামের আদ্য অক্ষর হচ্ছে জার্ম্মাণ (বা ইংরেজি) "ডি"। এখন জার্ম্মাণ "ডি" ব্যাঙ্ক বলেই এই চারটে ব্যাঙ্ক বোঝায়।

প্রঃ—এই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কি শুধু শিল্পোন্নতিরই সহায়তা করে থাকে, না এদের অন্যান্য কারবারও আছে? শিল্পের সহায়তা করাই যদি এদের বড় কাজ হয়, তবে এদের কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কই বা বলে কেন?

উঃ—এরা ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সহায়তা করে থাকে—আর এদের পরিচয়ও ঠিক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নয়,—এদের নাম হচ্ছে 'ক্রেডিট' ব্যাঙ্ক অর্থাৎ টাকা আমানত নেওয়াও এদের কারবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার।

প্রঃ—তা'হলে এরা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প—সব কিছুর জন্যই টাকা ধার দেয়?

উঃ—হাঁ, এদের কারবার ঠিক একমুখী নয়। এরা ইংরেজীতে যাকে বলে "মিক্সড্ বিজনেস" অর্থাৎ পাঁচমেশালি কারবার—তাই করে থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা, জার্ম্মাণ শিল্পের টাকা এরা একলাই সম্পূর্ণ কর্জ্জ দিতে পারে কি?

উঃ—না, তা এরা দিতে পাচ্ছে না বলেই ইদানীং কতকগুলি খাঁটি শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি "মাইনিং" অর্থাৎ খনিজ শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক, কতকগুলি "ইলেকট্রিক্যাল" অর্থাৎ "বৈদ্যুতিক কারখানার অর্থ-সরবরাহকারী" ব্যাঙ্ক—আর কতকগুলির নাম "টেক্সটাইল্ ব্যাঙ্ক"—তারা বস্ত্র-শিল্প কারখানাগুলিকে টাকা ধার দেয়।

প্রঃ—জার্ম্মানিতে গভর্ণমেণ্ট-পোষিত কোনপ্রকার শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক নেই কি?

উঃ—সম্প্রতি এ রকম ব্যাঙ্ক বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা চলছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "গ্যারেন

লাণ্ডেস্‌কাস্ত ব্রিফ্‌ আনস্টাল্ট" নামক ব্যাঙ্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ব্যাঙ্কের মূলধনের অর্দ্ধেক রাইখ্‌স্‌ মার্ক জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের দেওয়া। তা ছাড়া অনধিক ৫ কোটি রাইখ্‌স্‌ মার্কের ডিবেঞ্চর বের করেও এই ব্যাঙ্ক টাকা সংগ্রহ করতে পারে।

প্রঃ—একটা রাইখ্‌স্‌ মার্কের মূল্য কত?

উঃ—প্রায় বার আনা।

প্রঃ—আচ্ছা, জার্ম্মাণির কমার্শিয়াল অর্থাৎ ক্রেডিট ব্যাঙ্কগুলি দেশের শিল্পকারখানাগুলিকে আদৌ টাকা ধার দেয় কি করে?

উঃ—তার একটা কারণ এই যে, এরা দীর্ঘকালের জন্য স্থায়ী আমানতে টাকা জমা নিয়ে থাকে—সে জন্যই শিল্পকারখানাকে ধার দেওয়া সম্ভব হয়। তা ছাড়া এদের মূলধনেরও বিলক্ষণ জোর আছে। এদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্কের নাম হচ্ছে "ড্যাচ ব্যাঙ্ক" এই ব্যাঙ্কটা ত বিদেশে টাকা কর্জ্জ নিয়েও দেশের শিল্পগুলির সহায়তা করে।

প্রঃ—বুঝেছি, এবার জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলি দেশের কৃষি-শিল্পের কি রকম সহায়তা করছে সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—শুধু জার্ম্মাণির শিল্পই নয়, জার্ম্মাণির কৃষির উন্নতির জন্যও সে দেশের ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এই প্রসঙ্গে "জার্ম্মাণ রেন্টেন ব্যাঙ্ক ক্রেডিট আনস্টাল্ট"এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কটী প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্ম্মাণির কৃষি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করছে। এটা একটা সরকারী অনুষ্ঠান বল্লেই চলে—এর ওপর জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট শাসন-ক্ষমতা রয়েছে।

প্রঃ—জার্ম্মাণির কৃষক-সম্প্রদায় এই ব্যাঙ্কের কাছেই টাকা ধার পায়?

উঃ—না, কৃষকদের সঙ্গে এর সোজাসুজি কোন সম্পর্ক নেই; জার্ম্মাণির যত সব কৃষি-সহায়ক ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর কারবার। সেখানকার "লাণ্ডস্যাফ্‌টেন" অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টপোষিত বিশেষ বিশেষ কৃষি-ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গেই এর সর্ব্বপ্রধান সম্বন্ধ। যে সব ব্যাঙ্ক জমিবন্ধকী কারবার করে তারাও এর কাছে টাকা ধার পায়। এ ছাড়া কৃষির উন্নতি এবং বিস্তারে সহায়তা করবার জন্য আরও যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদেরও এই ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিয়ে থাকে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্ক তার মূলধন পায় কোথায়?

উঃ—নানা উপায়ে এই ব্যাঙ্ক তার মূলধন সংগ্রহ করেছে। "রেন্টেন ব্যাঙ্ক" নামক একটা পূর্ব্বতন ব্যাঙ্ককে পুনর্গঠিত করে এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তার ফলে রেন্টেন ব্যাঙ্কের প্রায় ২½ কোটি রাইখ্‌স্‌ মার্ক মূলধন এর হাতে এসে পড়েছে। তারপর এই ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত বিদেশে কর্জ্জ নিয়েও টাকা সংগ্রহ করে। বন্ধকী বণ্ড বা প্রতিজ্ঞা-পত্র বের করেও টাকা সংগ্রহ করবার ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কের আছে। এ রকম বণ্ড বের করে এই ব্যাঙ্ক যে টাকা সংগ্রহ করেছে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তার সংখ্যা পরিমাণ হয়েছিল ২৭ কোটি রাইখ্‌স্‌ মার্ক। শুধু তাই নয়,—জার্ম্মাণির "গোল্ড ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কের" সঙ্গে এর এমনি একটা বন্দোবস্ত আছে, যার ফলে অনধিক ২৫ কোটি মার্কমূল্যের বণ্ডের দায় এ "গোল্ড ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কে"র ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরেছে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কটী পরিচালন করছে কে?

উঃ—সে জন্য একটি বিশেষ পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়েছে। তার অর্দ্ধেক সদস্য জার্ম্মাণির ব্যবস্থা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়, বাকী অর্দ্ধেক জার্ম্মাণির কৃষক-সঙ্ঘ এবং সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোল" বা নিয়ন্ত্রণ-সমিতি নির্ব্বাচন করে থাকে।

প্রঃ—আপনি "লাণ্ডস্যাফ্‌টেন"এর কথা বলছিলেন,—সেগুলি কি রকম ব্যাঙ্ক?

উঃ—এ সব ব্যাঙ্ক দীর্ঘকালের জন্য জমিবন্ধকী কর্জ্জ দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে দু'টী পৃথক শ্রেণী আছে।

এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ভূস্বামীদের কর্জ্জ দেয়,—এরকম ব্যাঙ্ক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে; আর এক শ্রেণীর "লাণ্ডসাফ্‌টেন" কৃষক সম্প্রদায়কে ধার কর্জ্জ দিয়ে সাহায্য করে থাকে,—এদের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম শ্রেণীর অনেককাল পরে। সবগুলি "লাণ্ডসাফ্‌টেন"ই গভর্ণমেণ্ট-পোষিত ব্যাঙ্ক। এক দিকে এদের সবাইকে সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান বলা চলে।

প্রঃ—এদের পরিচালনা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—প্রত্যেক ব্যাঙ্কের জন্যই একটি পরিচালক সমিতি রয়েছে। ব্যাঙ্কের শ্রেণী অনুসারে সমিতির সদস্যগণ ব্যাঙ্কের ব্যবসা-ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত কৃষক-সঙ্ঘ অথবা ভূস্বামী-সঙ্ঘের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে। ব্যাঙ্কের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণও এইসকল সঙ্ঘের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হয়।

প্রঃ—এ সব ব্যাঙ্কের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কি রকম সম্বন্ধ রয়েছে?

উঃ—আর্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই এদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করছে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলি তাদের মূলধন পায় কি করে?

উঃ—এদের কোন অংশ-মূলধন নেই। টাকা সংগ্রহ করবার জন্য এরা বণ্ড বা ঋণ-স্বীকার-পত্র বের করে থাকে। পত্রবাহককে নিয়মিতভাবে নির্দ্ধারিত সুদ দেবার বন্দোবস্ত আছে। ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণে বন্ধকী কর্জ্জ দেয় শুধু সেই পরিমাণ মূল্যেরই বণ্ড বের করতে পারে, তার বেশী নয়।

প্রঃ—এ পর্য্যন্ত এরা কত মূল্যের বণ্ড বের করেছে?

উঃ—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় তার মূল্য হয়েছিল ৬৬ কোটি ৮০ লক্ষ রাইখ্‌স্ মার্ক।

প্রঃ—বন্ধকী জমির যা দাম, তার কত অংশ পর্য্যন্ত ধার দেওয়া হয়?

উঃ—সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। কম পক্ষে অর্দ্ধেক,—কখন কখন মূল্যের ৪ ভাগ পর্য্যন্তও ধার দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রঃ—কর্জ্জের টাকা আদায় করবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়?

উঃ—সে বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। দেনাদাররা ইচ্ছা করলে স্থায়ী ভাবেই ব্যাঙ্কের কাছে ঋণী থাকতে পারে। দেনার টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করবার জন্য তাদের বাধ্য করা হয় না। দেনার একটা নির্দ্দিষ্ট শতাংশ পরিমাণ কয়েক বৎসর কিস্তিতে দেবার পর তারা পরিশোধের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে; তবে সুদের টাকাটা দেবার জন্য তারা বাধ্য থাকে, বটে। এ রকম রীতিমত সুদ দিতে থাকলে দেনাদারেরা শেষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাদের দেনার জের টেনে নিতে পারে। কিন্তু পরিশোধ কাল পর্য্যন্ত তাদের জমি ব্যাঙ্কের কাছেই বন্ধকচুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। শুধু তাই নয়, কোন কোন ব্যাঙ্কে দেনার শতাংশের দশভাগ পরিশোধ করবার পর নূতন করে কর্জ্জ নেওয়াও চলে।

প্রঃ—জমি বন্ধক দেওয়া ছাড়া আর কোন রকমে কৃষকদের কর্জ্জ পাওয়া সম্ভব নয় কি?

উঃ—সে রকম কর্জ্জ দেবার জন্য আর্ম্মাণির বহুস্থলে বিস্তর সমবায় সমিতি আছে, তবে তারা দীর্ঘকালের জন্য ধার দেয় না। বর্ত্তমানে এ দেশে সমিতির সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশী হবে। আর্ম্মাণরাষ্ট্রের প্রুশিয়া প্রদেশে "প্রুশিয়ান সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" সমগ্র প্রদেশের সমবায় সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে তাদের কার্য্য পরিচালন করছে। এই ব্যাঙ্ক নিম্ন স্তরের মধ্যে সমস্ত সমবায় সমিতি এমন কি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কৃষি-সহায়ক "লোন আফিস"গুলিকেও টাকা কর্জ্জ দিয়ে সাহায্য করে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কটি তার মূলধন পাচ্ছে কোত্থেকে?

উঃ—এর মূলধনের অর্দ্ধেকই গভর্ণমেণ্টের দেওয়া,—বাকী অর্দ্ধেক এর অধীন সমবায় সমিতিগুলি যুগিয়েছে, সেও প্রায় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ রাইখ্‌স্ মার্ক হবে।

প্রঃ—এ রকম আর কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নেই ?

উঃ—হাঁ, অন্যান্য প্রদেশেও সমবায় সমিতির সহায়তা করবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে। এতক্ষণ প্রুশিয়ার ব্যাঙ্কের কথা বলেছি শুধু দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই।

প্রঃ—আচ্ছা এত সেল কৃষিমূলক ধার-কর্জ্জের ব্যাপার। অনাবাদী জমি বন্ধক দিয়ে ধার পাবার কোন উপায় নেই ?

উঃ—তাও আছে। জার্ম্মানিতে কতকগুলি বে-সরকারী বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। এগুলি সবই যৌথ প্রতিষ্ঠান। বে-সরকারী হ'লেও কারবার চালাবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এদের অনুমতি নিতে হয়। গোড়ায় এসব ব্যাঙ্ক কৃষিকার্য্যের সহায়তা করবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ইদানীং এরা মফঃস্বল ছেড়ে সহরেই জমি বন্ধকী কারবার চালাতে সুরু করেছে। পঞ্চাশ বছর আগেও এদের সহরে কারবার তেমন প্রসার লাভ করে নি। বর্ত্তমানে এ রকম কুড়িটা ব্যাঙ্ক এই কাজের জন্য আশ মূলধন বাবদই প্রায় কুড়ি কোটি রাইখ্‌স মার্ক খাটাচ্ছে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নানাপ্রকার দেশী কারবার চালাচ্ছে,—এরা গৃহ-সম্পত্তি বন্ধক রেখেও টাকা ধার দেয়।

প্রঃ—যৌথ ব্যাঙ্কগুলি শুধু তাদের অংশ-মূলধনের জোরেই কাজ চালায় ?

উঃ—না, এদের নিজ নিজ আদায়ী মূলধনের বিগুণ পর্য্যন্ত বণ্ড বা ডিবেঞ্চর বেচ করবার ক্ষমতা আছে। ইদানীং কোন কোন বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চর বণ্ড বিদেশেও বিক্রী হতে দেখা যাচ্ছে।

প্রঃ—বন্ধকী সম্পত্তির উপর কি হারে ধার দেওয়া হয় ?

উঃ—সাধারণতঃ তার মূল্যের ½ ভাগ ধার দেওয়া হয়। 'ব্যাভেরিয়া' প্রদেশের ব্যাঙ্কগুলি অর্দ্ধেক মূল্য পর্য্যন্ত কর্জ্জ দেয়।

প্রঃ—এ রকম ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন আইনকানুন নেই ?

উঃ—এরা সকলেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বন্ধকী ব্যাঙ্ক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

প্রঃ—জমি বন্ধকী বা কৃষিসহায়ক আর কোন রকম ব্যাঙ্ক আছে কি ?

উঃ—হাঁ, আর এক রকম ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। "লাণ্ড সাক্‌টেন ব্যাঙ্ক"এর মতই আর এক প্রকার ব্যাঙ্ক আছে, তার নাম "ষ্টাড্‌স্‌ সাক্‌টেন।" প্রুশিয়া প্রদেশে এ রকম ১১টা ব্যাঙ্ক আছে, অন্যান্য প্রদেশে এ প্রকার ব্যাঙ্কের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশী নয়। এদের কারবার হচ্ছে ভূস্বামিকারীদের সমবায় সমিতিগুলিকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া। পতিত জমির উন্নতি করবার জন্যও এরা কর্জ্জ দিয়ে সাহায্য করে। বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট হারে পরিশোধ টাকা দিয়ে এদের কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এই প্রকার ব্যাঙ্ক জার্ম্মানিতে এখনো খুব বিস্তৃত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সেখানকার প্রথম "ষ্টাড্‌স সাক্‌টেন" স্থাপিত হয়েছে।

প্রঃ—আপনি গোড়ায় জার্ম্মানির কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কথা বলতে তারা কি রকম ভাবে জার্ম্মাণ শিল্পের সহায়তা করছে সে কথাই বিশেষ করে বলেছেন,—এদের সম্বন্ধে আর কিছু জানবার নেই কি ?

উঃ—বর্ত্তমান জগতে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বৃহত্তর ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করবার যে ব্যাপার চলছে, জার্ম্মানিতেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। তার ফলে এখন জার্ম্মানির অনেক ব্যাঙ্কই ৭টা "গ্রোস ব্যাঙ্ক" বা বৃহৎ ব্যাঙ্কের তাঁবে এসে পড়েছে। তার মধ্যে ৪ টাই হচ্ছে "ডি" ব্যাঙ্ক,—এদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই ৭টা বৃহৎ ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ হবে প্রায় ৫৪ কোটি ৯০ লক্ষ রাইখ্‌স মার্ক,—এদের তাঁবে যে সব ব্যাঙ্ক রয়েছে তাদেরও মূলধন প্রায় ২০ কোটি মার্ক হবে। ইদানীং এদের মধ্যেও কোন কোন ব্যাঙ্ক পরস্পর যুক্ত হবার চেষ্টা করছে।

প্রঃ—এই ৭টা ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য স্বাধীন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সংখ্যা কত হবে ?

উঃ—সংখ্যা হিসেবে এ রকম ব্যাঙ্ক বিস্তর রয়েছে,—সব মিলে প্রায় ৩ হাজার হবে। তবে এদের কারবারের আয়তন খুব বেশী নয়। এদের কয়েকটা ব্যাঙ্ক ছাড়া আর সবগুলিরই মূলধনের পরিমাণ ৪০ লক্ষ রাইখ্‌স মার্কের কম।

প্রঃ—তারপর ?

উঃ—আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল এই যে, এসব ব্যাঙ্ক আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে আমানতি টাকা গ্রহণ করছে। জার্ম্মাণিতে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে এরকম ভাবে টাকা সংগ্রহ করা অনেক কাল একটা প্রথা-বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল। "ডাচেচ ব্যাঙ্ক" প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আমানতে টাকা নেবার পথ দেখিয়েছে। তারপর থেকে এখন অনেক ব্যাঙ্কই এই নূতন কারবারে হাত দিতে সুরু করেছে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—ডাচেচ ব্যাঙ্ক এ ছাড়া আর একটা বিষয়েও নূতন পথ দেখিয়েছে। জার্ম্মাণির অন্যান্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি চিরকাল শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় এবং শিল্পের সহায়তা করে এসেছে। ডাচেচ ব্যাঙ্কই প্রথম বিদেশে শাখা প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে জার্ম্মাণির সঙ্গে আমদানি রপ্তানি কারবার চালাবার জন্য আয়োজন করেছে। এসব শাখা প্রতিষ্ঠার আগে ইংলণ্ডের "ষ্টার্লিং বিল" অর্থাৎ ইংলণ্ডে আদায়ী বিল দিয়ে জার্ম্মাণির সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন চলত। ডাচেচ ব্যাঙ্ক বিদেশে শাখা বিস্তার করেই নিজ দায়-স্বীকার-পত্র বেচে করে সোজাসুজি জার্ম্মাণির সঙ্গে লেনদেন করবার সুবিধা করে দেয়। অল্প দিনেই এই ব্যাঙ্ক এমন খ্যাতিলাভ করেছিল যে, বিদেশী রপ্তানিকারক এর দায়-স্বীকার-পত্র পেলেই জার্ম্মাণিতে মাল চালান দিয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ডাচেচ ব্যাঙ্কের বিদেশী কারবার ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল,—লড়াই বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই এই কারবার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে পূর্ব্বতন জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের শাখাগুলি আবার তাদের বিদেশী কারবার গুছিয়ে নেবে,—এ রকম আশা করা যেতে পারে।

প্রঃ—ব্যবসা-সংক্রান্ত বিল ভাঙ্গানো সম্বন্ধে এসব ব্যাঙ্কে কি বন্দোবস্ত রয়েছে ?

উঃ—এ সম্বন্ধে একটা ব্যাপার দেখে মনে খটকা লাগবে যে, জার্ম্মাণিতে কোন বিল-দালাল নেই। কাজেই সেখানকার বৃহৎ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাই বিল এবং অন্যান্য সিকিউরিটি কেনা বেচার মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তবুও জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইন ও প্রথাগুলি এ বিষয়ে অনুকূল না হ'লে ব্যাঙ্কগুলি বিল কেনা-বেচার ব্যাপারে হাত দিতে পারত কিনা সন্দেহ।

প্রঃ—কি রকম ?

উঃ—একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবে। জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার "নিগোসিয়েব্‌ল্" ধরণের—অর্থাৎ বিক্রেতা বা দাতা স্বাক্ষর সহ হস্তান্তরিত করলেই গ্রহীতা শেয়ারের পাকা স্বত্বাধিকারী হন। এজন্য রেজিষ্টারী করা কি অন্য কোন নিয়ম মেনে চলবার দরকার হয় না। জার্ম্মাণিতেই শুধু এ রকম ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। তারপর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জার্ম্মাণির বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, সেটাও জার্ম্মাণিরই একটা বিশেষত্ব বলতে হবে। এই সমস্ত অবস্থার যোগা-যোগের ফলেই এই দেশের "প্রোম ব্যাঙ্ক"গুলি দেশের আভ্যন্তরীণ শেয়ারের বাজার এবং সেই সঙ্গে টাকার বাজারও নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রঃ—কেন, জার্ম্মাণিতে টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়নি কি ?

উঃ—সে কথাই বলতে যাচ্ছি। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার চার বৎসর পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের নাম "রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক"। এর আগে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে কোন রকম ঐক্যসূচক সম্বন্ধ স্থাপন

করবার চেষ্টা করেনি। তখন বন্ধ করে ত্রিশটা ব্যাঙ্ক স্বাধীনভাবে নোট বের করতে পারত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং আইনের ফলে এরকম ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমে গিয়ে মাত্র চারটা ব্যাঙ্কের নোট বের করবার ক্ষমতা বজায় থাকে। কিন্তু এই চারটা ব্যাঙ্ক যে নোট বের করে তারও পরিমাণ খুব বেশী নয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এক ব্যাঙ্কিং আইন দিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, এরা ১৯ কোটি ৪০লক্ষ রাইখ্‌স মার্ক মূল্যের বেশী পরিমাণ নোট বের করতে পারবে না।

প্রঃ—আপনি এই পরিমাণ নোটকে খুব বেশী নয় বলছেন কেন?

উঃ—বলছি এই জন্য যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককে পুনর্গঠিত করবার পর এই ব্যাঙ্ক গোড়াতেই একলা যে নোট বের করেছিল, তার পরিমাণ হবে প্রায় ১৯৪ কোটি ১০ লক্ষ রাইখ্‌স মার্ক।

প্রঃ—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককে পুনর্গঠিত করবার মানে কি?

উঃ—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে যে ব্যাঙ্কিং আইন কায়েম করা হয়, তাতেই একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, যে সনন্দপত্রের জোরে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, তা শুধু দশ বৎসরের জন্যই প্রবল থাকবে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই ব্যাঙ্ককে তার সনন্দপত্র পরিবর্ত্তন করে নিতে হবে,—এবং সে সময় যা সংশোধন করা দরকার তাও করা চলবে। তারপর থেকে এ পর্য্যন্ত রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের সনন্দপত্র নিয়মিতভাবেই সংশোধিত হয়ে আসছে। কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আগে কোন সংশোধনের ফলেই খুব বড় রকমের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণির লড়াই সংক্রান্ত দেনা বণ্টন করবার জন্য এক আন্তর্জ্জাতিক কমিশন নিযুক্ত করবার পর, সেই কমিশন এবং জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়, তার ফলে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের জন্য এক নূতন সনন্দপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পত্রের ব্যবস্থায় রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের কারবারে অনেক রকম ওলটপালট হয়ে গিয়েছে।

প্রঃ—তার ফলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কি কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে?

উঃ—রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের পরিচালন, তার নোট বের করবার ব্যাপার এবং দৈনন্দিন ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনদেনের জন্য হিসাব কষে টাকা পচ্ছিত রাখা—এ সবের জন্যই বিশেষ কতকগুলি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছে এই যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থার ফলে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের পরিচালনা ও তার নোট বের করবার ব্যাপারে এখন কতকগুলি বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রভাব খুব বেশী করে লক্ষিত হচ্ছে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কের পরিচালনের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—বর্ত্তমান ব্যবস্থায় জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব্বে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টই এই ব্যাঙ্ক পরিচালন করেছে বলা যেতে পারে। ব্যাঙ্কের পরিচালক সমিতি গঠনের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত ছিল—অংশীদারদের প্রকৃত পক্ষে কোন রকম পরিচালন-ক্ষমতাই ছিল না। এখন চারটী পৃথক সমিতি ও সেই সঙ্গে "কমিশনর" পদবীওয়ালা একজন অসাধারণ ক্ষমতাবান কর্ম্মচারী মিলে এই ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা করছে:—প্রথম জেনারাল কাউন্সিল বা সাধারণ পরিষৎ, দ্বিতীয় "ডাইরেক্টরেট" বা পরিচালক সমিতি, তৃতীয় কমিশনর, চতুর্থ অংশীদার-বর্গের সাধারণ বৈঠক, পঞ্চম অংশীদারবর্গের কেন্দ্রীয় সমিতি।

প্রঃ—এদের মধ্যে কার কি ক্ষমতা রয়েছে?

উঃ—শোন, এক এক করে সবই বলছি। সাধারণ-পরিষদের মেম্বর-সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৪। তার মধ্যে ৭ জন জার্ম্মাণ, আর ৭ জন ইংলণ্ড, ফরাসী, ইতালি, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে। এর প্রত্যেক দেশ

থেকেই ১ জন করে মেম্বর নেওয়া হয়। বিদেশী ৭ জন মেম্বর প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষতিপূরণ দাবি নির্দ্ধারক কমিশনের গঠন-সমিতি কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিল।

প্রঃ—যদি কোন মেম্বর তার পদ ত্যাগ করে?

উঃ—তা হ'লে বর্ত্তমান বিদেশী মেম্বরেরা যে দেশের মেম্বর পদত্যাগ করবেন সে দেশ থেকেই আর একজন মেম্বর নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরামর্শ নেওয়া হয়।

প্রঃ—পরিষদের ৭ জন আর্থাণ মেম্বর নির্ব্বাচন করবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—এরা ব্যাঙ্কের আর্থাণ অংশীদারবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে।

প্রঃ—বুঝেছি; আচ্ছা ব্যাঙ্কের পরিচালন সম্বন্ধে এই পরিষদের কি ক্ষমতা রয়েছে?

উঃ—এই পরিষৎ ব্যাঙ্কের 'প্রেসিডেন্ট" বা সভাপতি নির্ব্বাচন করে। তাকে কর্ম্মচ্যুত করবার অধিকারও এই পরিষদের হাতে রয়েছে। মানে অন্ততঃ একবার এই পরিষদের বৈঠক হয়। তাতে পরিষদের মেম্বরগণ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট কিংবা কমিশনরের প্রস্তাবিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন। পরিষদের ১০ জন মেম্বর একমত হলেই কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হতে পারে। তবে প্রেসিডেন্ট এবং কমিশনর যদি একমত হন তবে তাঁদের কোন প্রস্তাব অর্দ্ধেক মেম্বরের স্বীকার পেলেই পাশ হ'তে পারে।

প্রঃ—পরিচালক সমিতির কাজ কি? এই সমিতির মেম্বর নির্ব্বাচন সম্বন্ধেই বা কি নিয়ম করা হয়েছে?

উঃ—ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজ সম্বন্ধে পরিচালনার ভার এই সমিতির হস্তে ন্যস্ত হয়েছে। এর কোন নির্দ্দিষ্ট মেম্বর-সংখ্যা নেই। তবে সব মেম্বরই জার্ম্মাণ হওয়া চাই। মেম্বরগণ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকে; প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে কোন মেম্বরকে পদচ্যুতও করতে পারেন। কিন্তু এসবের জন্য সাধারণ পরিষদের অনুমোদন থাকা দরকার। এই পরিচালক সমিতি ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেবার পদ্ধতি এবং এই ব্যাঙ্কের কাছে যে বিল ভাঙ্গানো হয় তার উপর আদায়ী বাটার পরিমাণ ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করে। তা ছাড়া এরা রীতিমত ব্যাঙ্কের আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবরণী প্রস্তুত করে নির্দ্দিষ্ট সময় মত গভর্ণমেণ্টের কাছে দাখিল করতে হয়।

প্রঃ—কমিশনর তা হ'লে কি করে?

উঃ—ব্যাঙ্কের নোট বের করবার ব্যাপার এবং এই কমিশনরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। পরিচালক সমিতির সঙ্গে এর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কমিশনর ইচ্ছা করলে সমিতির সভায় যোগদান করতে পারেন। নোট-সংক্রান্ত ব্যাপারে কমিশনর সমিতির পরামর্শ নিয়েই কাজ করে থাকেন।

প্রঃ—কমিশনরের নিয়োগ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—ইনি সাধারণ পরিষদের বিদেশী মেম্বরদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন।

প্রঃ—আচ্ছা, অংশীদারদের যে কেন্দ্রীয় সমিতি রয়েছে তার কর্ত্তব্য কি?

উঃ—এই সমিতিকে ব্যাঙ্কের কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি—শুধু পরামর্শ দেওয়াই হল এর কাজ,—অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের "ফেডারেল কৌন্সিলের" মত।

প্রঃ—এই সমিতি গঠনের রীতি কি?

উঃ—পরিচালক সমিতির অনুমোদন অনুসারে ব্যাঙ্কের সাধারণ অংশীদারবর্গ এই সমিতির মেম্বর নির্ব্বাচন করে থাকে। এর মেম্বর-সংখ্যা ২১; কিন্তু জার্ম্মাণির ব্যাঙ্কিং, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি স্বরূপ আরও ২১ জন লোক এই সমিতিতে যোগদান করে থাকে। প্রত্যেক মেম্বরই জাতে জার্ম্মাণ হওয়া চাই।

প্রঃ—বুঝেছি, আচ্ছা এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান মূলধন কত? এর মূলধন সম্বন্ধে কোন আইনকানুন আছে কি?

উঃ—ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ তিন কোটি রাইখস মার্ক। প্রত্যেক শেয়ারের দাম একশ' মার্ক, আর

তাতে একটা মাত্র ভোটের অধিকার আছে।—তাও কোন একজন লোকের শেয়ারের পরিমাণ যাই থাকনা কেন, তাকে তিনশ'র অতিরিক্ত ভোটের অধিকার দেওয়া হয় না। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কের সনন্দপত্র পঞ্চাশ বৎসরের মেয়াদে প্রদত্ত থাকবে।

প্রঃ—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থায় আর কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটেছে?

উঃ—একটা খুব বড় পরিবর্ত্তন ঘটেছে ব্যাঙ্কের নোট বের করবার ব্যাপারে। পূর্ব্বে এই ব্যাঙ্ক কোন প্রকার রিজার্ভ রক্ষা না রেখেও ৪০ কোটি মার্ক মূল্যের নোট বের করতে পারত। দরকার হলে তারও বেশী নোট বের করবার ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কের ছিল,—শুধু অতিরিক্ত পরিমাণ নোটের জন্য তাকে শতকরা ৫ মার্ক হারে ট্যাক্স দিতে হ'ত। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থায় এসব রীতি রদ হয়ে গিয়েছে। এখন চলতি নোটের জন্য তার সমষ্টি পরিমাণের শতকরা ত্রিশ ভাগ সোণা মজুত রাখতে হয়। নোটের সমষ্টি পরিমাণের শতকরা দশভাগ "ডিভিজেন"এও গচ্ছিত রাখা চলে।

প্রঃ—"ডিভিজেন" কি?

উঃ—১৪ দিনের অনধিককাল স্থায়ী কোন চেক কিংবা ব্যবসা-সংক্রান্ত বিলকে ডিভিজেন বলা হয়। বিদেশে দৈনন্দিন দাবী মাত্র আদায়ী টাকার কর্জ্জ-মূলক স্বীকারপত্রকেও ডিভিজেন তালিকা-ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রঃ—তার পর?

উঃ—এত গেল নোটের জন্য শতকরা চল্লিশ ভাগ রিজার্ভ মজুত রাখবার ব্যবস্থা। বাকী ষাট ভাগের জন্য তিন মাসের অনধিককাল স্থায়ী সাধারণ বিল বা হুণ্ডী গচ্ছিত রাখলেই চলে। এর বেশীও বিল রাখা চলতে পারে—যদি তার জন্য সাধারণ পরিষদের অনুরোধ থাকে।

প্রঃ—কিন্তু বিলের পরিমাণ বাড়াতে যাওয়ার মানেই ত সোণা কিংবা ডিভিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া?

উঃ—তাত বটেই, কিন্তু এরই জন্য এমন ছুটো ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত মজুদ বিলের পরিমাণ খুব বেশী হতে পারে না। প্রথমতঃ, দীর্ঘকালের জন্য এ রকম বিল বাড়াবার দরকার হলে অতিরিক্ত বিলের জন্য তার পরিমাণ অনুযায়ী ব্যাঙ্ককে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক তার কর্জ্জের উপর আদায়ী সুদের হার যথেচ্ছ বাড়াতে পারলে এ রকম ভাবে বিলের পরিমাণ বাড়িয়ে নোটের পরিমাণ বাড়ানোর পক্ষে খুব সুবিধা হবার কথা নয়। সে জন্য আরও একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, রিজার্ভে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত বিল যত দিন থাকবে ততদিন ব্যাঙ্ক শতকরা ৫ মার্কের বেশী সুদ আদায় করতে পারবে না।

প্রঃ—বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির নোট বের করবার ব্যাপারটা তা'হলে অনেক পরিমাণে বিদেশী প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে?

উঃ—নিশ্চয়ই, কমিশনরের নিয়োগ এবং সাধারণ পরিষদের গঠন-রীতির ব্যাপার থেকেই তা অনেকটা বুঝে থাকবে।

প্রঃ—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থায় আর কি পরিবর্ত্তন করা হয়েছে?

উঃ—পূর্ব্বে নোটের জন্য রিজার্ভ রাখবার কথা বলেছি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থা এই ব্যাঙ্ক তার আমানতি টাকার জন্য কি পরিমাণ টাকা মজুত রাখবে সে সম্বন্ধেও পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দিয়েছে। এখন এই ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ টাকা আমানত হিসেবে গ্রহণ করে তার জন্য একে শতকরা চল্লিশ ভাগ রিজার্ভ ফণ্ডে মজুদ রাখতে হয়।

প্রঃ—রিজার্ভ ফণ্ডের সবটাই কি সোণায় মজুদ থাকে?

উঃ—না, এই ব্যাঙ্কের যদি অন্য কোন দেশী কিংবা বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা আমানত থাকে, তবে সেই পরিমাণ টাকা কিংবা অন্য ব্যাঙ্কের দাবীস্বীকারমূলক কোন চেক অথবা ত্রিশ দিনের অনধিককাল-স্থায়ী ব্যবসা-সংক্রান্ত বিল,—এ সবও রিজার্ভ ফণ্ডের হিসেবের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়।

প্রঃ—আচ্ছা রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক কি কি রকম সিকিউরিটি কিনে রাখতে পারে?

উঃ—এই ব্যাঙ্কের অনেক রকম সিকিউরিটি কেনবার ক্ষমতা আছে, তার মধ্যে কতকগুলির নাম করছি শোন: সকল রকম দাবী এবং লোকসানের দায়-মুক্ত শেয়ার, জার্ম্মাণ রেল কোম্পানীগুলির সর্ব্ব-প্রধান দায়সূচক প্রতিজ্ঞাপত্র, গভর্ণমেণ্ট-গোষিত কৃষি-ব্যাঙ্ক কিংবা বন্ধকী-ব্যাঙ্কগুলির ডিবেঞ্চর—এই সমস্ত সিকিউরিটি কেনবার ক্ষমতা রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের আছে। এ ছাড়া জার্ম্মাণ কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বণ্ড, কি কোন মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চর অথবা অধিকারী মাত্রকেই সুদ দেয় এরূপ চুক্তিমূলক কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বণ্ড,—এ সবও এই ব্যাঙ্ক কিনে রাখতে পারে।

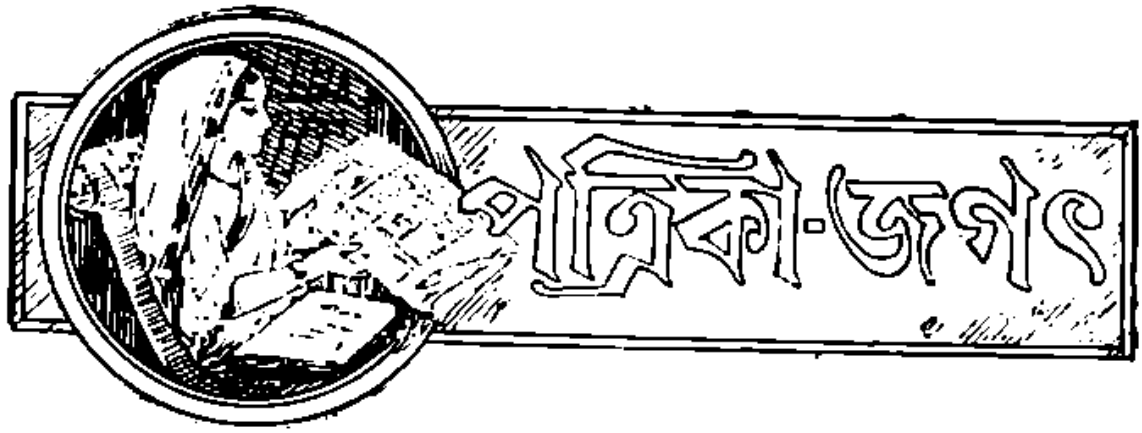

"কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট"

কলিকাতা ও বোম্বাই—তুলনামূলক পর্য্যালোচনা

[অধ্যাপক ভূজঙ্গ ভূষণ মুখার্জ্জির লেখা প্রবন্ধের সারমর্ম্ম।]

কলিকাতাই ভারতবর্ষের প্রধান সহর; বোম্বাইয়ের স্থান কলিকাতার অনেক পিছনে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা সহরের প্রাধান্য স্থিরীকৃত হয়।

১। লোক-সংখ্যা : কলিকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠতম এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর বলিয়া পরিগণিত। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম সহর লণ্ডনের পরেই কলিকাতার স্থান। ১৯২১ সনে সহরতলী সুদ্ধ কলিকাতা ও হাওড়ার লোক-সংখ্যা ছিল ১,৩২৭,৫৪৭ এবং ঐ সনে বোম্বাইয়ের লোক-সংখ্যা ছিল ১,১৭৫,৯১৪। লোক-সংখ্যা হিসাবে দুনিয়ার প্রথম ১২টী সহরের মধ্যে কলিকাতার স্থান দেওয়া যায়। সে হিসাবে বোম্বাইয়ের স্থান অনেক নীচে।

সাউথ ওয়ার্ক যেমন লণ্ডনের হাওড়া তেমনি কলিকাতার শিল্পপ্রধান সহরতলী। বোম্বাই সহরের মত কলিকাতার ভিতরেও অনেক বড় বড় কল-কারখানা আছে। কলিকাতায় গঙ্গার ধার দিয়া সহরতলীর অনেক দূর পর্য্যন্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকসমূহের বসতি বেশী। এ সমস্ত হিসাব করিলে কলিকাতার লোক-সংখ্যা বোম্বাইয়ের লোক-সংখ্যার দ্বিগুণ বলা চলে। কলিকাতার সংলগ্ন স্থান ছাড়া একটু দূর হইতেও অনেক লোক কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া সহরের লোক-সংখ্যা আরও বাড়াইয়া থাকে। ১৯২০ সনে এই প্রকার বার্ষিক টিকেট্ কাটিয়া কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় যাহারা আসে তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৯১,৪৮৩। ১০ বৎসর পূর্ব্বের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে আলোচ্য সনের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে। লোক-সংখ্যার এইরূপ বাড়তির মুখে সহরের মধ্যে সকলের স্থান না হওয়ায় সহর আরও বাড়ান দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সহরতলীতেও লোক-সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইতেছে ও ফলে চারিদিকের সহরতলীর সীমানাও দিন দিন প্রসারলাভ করিতেছে। সুতরাং লোক-সংখ্যা হিসাবে কলিকাতাকে ভারতের প্রথম সহর অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

২। বন্দর। দুনিয়ার সেরা সেরা বন্দরের মধ্যে কলিকাতার স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ইহার শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা—সমস্ত বিষয়েরই দুনিয়ার যে কোন বড় সহরের শিল্পাদির সঙ্গে তুলনা হইতে পারে। রেলওয়ে, খাল, রাস্তা, নদী প্রভৃতি দ্বারা ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরের সহিত কলিকাতা সুন্দরভাবে সংযুক্ত। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে কলিকাতার মত বোম্বাই সর্ব্বপ্রকারের সুযোগ সুবিধা পায় না। কলিকাতার এক দিকে গঙ্গাতীরের সমতল ভূমি, অন্য দিকে ব্রহ্মপুত্রের সমতল ভূমি বিদ্যমান থাকায় এবং গোটা ভারতের মধ্যে এই দুইটী সমতল ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় ইহার ফসলের দ্বারা কলিকাতার সম্পদ্ আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার স্থানীয় অঞ্চলের মধ্য হইতে এ দুইটী সমতল ভূমি ১২০ মাইলের ভিতর অবস্থিত। বন্দর-হিসাবেও বোম্বাই কলিকাতার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। কলিকাতার নীচের হুগলী নদী বরাবরই মনুষ্য-শাসনের

বাহিরে, ইহার গর্ভে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সহর বিলীন হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক নদীর উপরে অবস্থিত থাকিয়াও বন্দর-হিসাবে কলিকাতার এত উন্নতি খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। চিরকালই এই হুগলী নদী অতি দুরন্ত। ইহার তীরে কত রাজা সাম্রাজ্য গড়িতে গিয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সুন্দর সুন্দর সহর এই নদীর পালির ও কাদার নীচে চাপা পড়িয়া আছে। কিন্তু হাণ্টার তাঁহার বিবরণীতে বলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র কলিকাতা নগরীই এই দুরন্ত নদীর সর্ব্বপ্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে কেবল বিজ্ঞানের সাহায্যে এতকাল জয়ী হইয়াই আসিয়াছে। একদিকে যেমন প্রকৃতির শক্তি অতুলনীয়, অন্য দিকে তেমনি বিজ্ঞানও খুব কম নয়। মানুষ প্রকৃতির বিপুল শক্তির সহিত বিজ্ঞানের সাহায্যে সমানভাবে যুঝিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির শক্তিকে জয় করিতে না পারিলেও, তাহার সহিত সমানে সমান লড়িয়া আসিয়াছে। নদীর সমস্ত দুরন্ত শক্তির সহিত বিজ্ঞান-সাহায্যে লড়িয়া মানুষ আজ পর্য্যন্তও অনেক বড় বড় জাহাজ এই হুগলী নদীতে চালাইতেছে। দুনিয়ার মধ্যে ইহা বেশ একটা আশ্চর্য্যজনক কাজ সন্দেহ নাই।

আজকাল সমস্ত বন্দরকেই সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখিতে হয়। দিন দিন জাহাজের আয়তন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত জাহাজকে বন্দরে রাখিবার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থাও করিতে হয়। জাহাজ আয়তনে বড় হইলে বন্দরের ডকও সেইমত বাড়ান দরকার হয়। এইজন্য বন্দরের ইঞ্জিনিয়ারদিগকে সর্ব্বদা জাহাজ-নির্ম্মাতাদের কাজের উপর নজর রাখিয়া বন্দরেরও অনুরূপ উন্নতিসাধন করিতে হয়। সম্প্রতি কলিকাতা বন্দরে যে নতুন কিং জর্জ্জেস্ ডক্ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে বন্দরের লাজমণ্যার যে উন্নতিসাধন হইয়াছে, তাহার ফলে এক্ষণে দুনিয়ার সেরা বন্দরগুলির মধ্যে ইহার স্থান দেওয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া এত বড় দুরন্ত নদীর মধ্যে যে যেরূপ পাইলট সার্ভিস্ দিনরাত্রি সমানভাবে জাহাজে যাত্রী আনানেওয়া করিতেছে তাহাও দুনিয়ার একটা বড় প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

এই কলিকাতা বন্দরের সাহায্যে ভারতের অনেক-খানি জায়গার ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিয়া থাকে। প্রাচ্য দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের এরূপ বিশাল কেন্দ্র আর নাই। বাঙ্গালা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং যুক্ত প্রদেশের কতক অংশ—এই সাড়ে চারিটী প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য এক কলিকাতা বন্দরের সাহায্যে চলিয়া থাকে। এক কলিকাতার ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতিবিধি দেখিয়া এই প্রদেশগুলির ব্যবসায়-বাণিজ্যের বহর বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে বন্দর-হিসাবে বোম্বাই কলিকাতার অনেক নীচে স্থান পায়। কারণ বোম্বাইয়ের নিকটস্থ চাষের জমি কলিকাতার নিকটস্থ জমির মত অত উর্ব্বরও নয় আর অত বিস্তৃতও নয়। এ বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে তফাৎ কতটা তাহা নীচের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে :—

১৯২৭-২৮ সন	কলিকাতা (টাকা)	বোম্বাই (টাকা)
পোর্ট ট্রাষ্টের আয়	৩৩৮ কোটি	২৮১ কোটি
খরচ	৫·০২	২·৭৩
মোট দেনা	২০·০৩ „	২২·৫ „
জাহাজী মালের টনেজ	৪৮ মিলিয়ন (১৯২৮-২৯)	৪৮ মিলিয়ন (১৯২৭-২৮)

জাহাজী মালের দিক্ দিয়া কলিকাতা হইতে বোম্বাই বন্দরের সুবিধা কিছু বেশী। বোম্বাই একটা বড় জায়গায়। পশ্চিম হইতে আগত জাহাজের পক্ষে ইহাই প্রথম বন্দর এবং ইয়োরোপের সমস্ত জাহাজই প্রথমে এই বন্দরে আসিয়া লাগে। অষ্ট্রেলিয়া যাইবার পথেও এই বন্দর পড়ে। এই সমস্ত কারণে এই বন্দরের দিকেই জাহাজ-গুলির ঝোঁক বেশী। কলিকাতাকে ভারতের পূর্ব্ব দিক্কার সীমান্ত-বন্দর বলা চলে। বোম্বাই যেমন তাহার অবস্থানানুযায়ী পাশ্চাত্য দেশীয় সমস্ত সমুদ্র-গামী পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য শাসন করিবার সুযোগ পায়, কলিকাতাও তেমনি প্রাচ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে। আজকাল আবার করাচী বোম্বাইয়ের

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের প্রধান ডাক-বন্দর হিসাবে করাচী বোম্বাইকে শীঘ্রই ছাড়াইয়া উঠিবে এটা খুবই সম্ভব। সৈন্য-চলাচলের পক্ষে করাচী বন্দরের সুবিধা ও প্রাধান্য পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। এডেন হইতে করাচী অনেক নিকটে। এডেন হইতে বোম্বাই অপেক্ষা করাচীর দূরত্ব ২০০ মাইল কম। সুতরাং করাচী পশ্চিমগামী যাবতীয় জাহাজের পক্ষে যাতায়াত বাবদ ৪০০ মাইল সমুদ্রযাত্রা কমাইয়া দেয়।

৩। ব্যবসায়-বাণিজ্য : ভারতের অন্যান্য বন্দর অপেক্ষা কলিকাতার ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশী। ১৯২৬-২৭ সনের দেশী ও বিদেশী মোট ব্যবসায়ের পরিমাণ ২৫৮ কোটি টাকা। ঐ সনে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ২০৫ কোটি টাকা। নদী-বাণিজ্যেও কলিকাতা দুনিয়ার সেরা। মোট কথা বাণিজ্যের কৃপায়ই কলিকাতা নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার উপরেও পোষ্ট আফিসের ভিতর দিয়া একটা বড় রকমের ব্যবসায় অপ্রকাশ্যভাবে চলিতেছে; উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে ইহার অঙ্ক ধরা হয় নাই। এক্ষণে খরিদ্দারের ও ব্যবসায়-কেন্দ্রের মধ্যে যত দূরত্বই থাকুক না কেন, সে নিজের ঘরে বসিয়া পোষ্ট আফিস যোগে সমস্ত মাল হাজির পায়। পোষ্ট আফিসের ভি: পি: পার্শেলের সংখ্যা ও মূল্য হিসাব করিলে কলিকাতার এই অপ্রকাশিত বাণিজ্যের পরিমাণ কতখানি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এ বিষয়েও বোম্বাইয়ের স্থান কলিকাতা হইতে অনেক নীচে।

কালে কলিকাতার আরও অনেক উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাংলার অন্যান্য স্থানের সহিত কলিকাতার নৌ-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নূতন একটী গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক খাল কাটিবার মতলব চলিতেছে। তারপর, ভবিষ্যতে ইতোবর্দ্ধা রেলওয়ে বিস্তার, নতুন বালি-সেতু নির্ম্মাণ, কয়লা চালানের জন্য কলিকাতা কর্ড রেলওয়ে স্থাপন, অন্যান্য রেলওয়ের নূতন নূতন উন্নতি-সাধন, উত্তর ভারতের খাল—বিশেষতঃ সারদা খাল খনন, বর্দ্ধমান গ্রাণ্ডকর্ড রেলওয়ের দ্বিতীয় বিস্তার, কলিকাতার নূতন সুড়ঙ্গ রেলওয়ে ও কেন্দ্র রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মাণ, নূতন হাওড়ার পুল নির্ম্মাণ, কলিকাতার সহরতলীতে বিজলী-সরবরাহ, হাওড়ায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট স্থাপন, খসড়া অনুযায়ী বন্দরের নূতন ডক্ নির্ম্মাণ (ইহার কাজ কিছুদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে), ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক সহরের দিন দিন উন্নতি-সাধন প্রভৃতি সমস্ত কাজ যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখন কলিকাতা যে প্রাচ্যের আদর্শ বাণিজ্য ও মাল সরবরাহ কেন্দ্র হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। সম্পদ : এই দিক্ দিয়াও কলিকাতাকে ভারতের সেরা সহর ধরা যাইতে পারে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কগুলিতে বিভিন্ন বৎসরে কত টাকার চেক্ ভাঙ্গান হইয়াছে দেখা যাউক্।

বৎসর	কলিকাতা (টাকা)	বোম্বাই (টাকা)
১৯০৪	১৭৫ কোটি	১০৯ কোটি
১৯১৫	৩২৩ „	১৬৭
১৯২৫	১,০১৮ „	৫১৪
১৯২৭	১,০২৩ „	৩৯৮
১৯২৯ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহের গড় হিসাব	৭৬৬ „	৬৮২ „

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের সংখ্যার তফাৎ দেখিয়া দুইটী সহরের মধ্যে কোনটী বেশী সম্পদশালী তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

১৯২১ সনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া প্রথম স্থাপিত হয়। তাহার পূর্ব্বে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় সহরেই প্রত্যেকের অর্থসংক্রান্ত কাজকর্ম্মের মাপাযোখন প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক মোতাবেক ছিল। ঐ সময়ে এই ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্বন্ধে উক্ত উভয় সহরের হিসাব-সংখ্যা পাশাপাশিভাবে দেখিলে সহর দুইটীর মধ্যে সম্পদে কোনটী বড় তাহা বেশ ধারণা করিয়া লওয়া যায়।

	কলিকাতা (কোটি টাকা)	বোম্বাই (কোটি টাকা)
পুঁজি	২	১
রিজার্ভ		১·২

	কলিকাতা (কোটি টাকা)	বোম্বাই (কোটি টাকা)
গভর্ণমেণ্ট জমা	৪·৩	৩·৪
অন্যান্য জমা	৩৪·০	২৭·৪

কিছু দিন যাবৎ বোম্বাইএ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য হ্যাল মিণ্টের একটী শাখা ছিল। ইহা প্রথম স্থাপিত হয় ১৯১৭ সনে; ১৯১৯ সনের এপ্রিল মাসে এ শাখা টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর হইতে এখন আর বোম্বাইএ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয় না। বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায় কোথায় কত টাকার মুদ্রা প্রস্তুত হয় দেখা যাউক।

	কলিকাতা (লক্ষ টাকা)	বোম্বাই (লক্ষ টাকা)
	১৩	১৩
	৬২	—
	৩৯	১০
	৩২	১৩
	২৬	৩৭
	৩৫	১৫
মোট	২৮৭	১৪৮
শুদ্ধ হিসাব	৪৮	২৪

একটা বিষয়ে বোম্বাইয়ের কিছু সুবিধা আছে। এই সহর ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বুলিয়ন মার্কেট। এখানকার বুলিয়ন মার্কেট এত জোরাল হইবার কারণ এই যে, মহীশূরের অধিকাংশ সোনা এই বাজারে আসে এবং ইংলণ্ডের চালানি অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত সোনা বোম্বাই হইয়া যায়। আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে বোম্বাই সর্ব্বদা খুব বাড়াবাড়ি রকমের স্পেকুলেশন করিয়া থাকে। কলিকাতার ঠিক উল্টা। এই বাড়াবাড়ির দরুণ বোম্বাইকে প্রায়ই অর্থবিষয়ে অনেক নাড়া-চাড়া খাইতে হয়। এই নাড়াচাড়াতে অর্থ ও বাণিজ্য উভয় হিসাবে সহরের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

৫। রেলওয়ে: কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের এলাকায় রেলওয়ের মাইলেজ ও পুঁজি নীচে দেখান গেল:—

কলিকাতার এলাকায়	মোট মাইলেজ	পুঁজি (কোটি টাকা)
ই, আই, আর	৪০১১	১৪১
ই, বি, আর	১৭৪০	৬৮
বি, এন, আর	৩৪১২	৭০
মোট	৯১৬৩	২৫৯
বোম্বাইয়ের এলাকায়		
জি, আই, পি, আর	৫৬৫৬	১১৭
বি, বি, সি, আই	৩৮৩১	৭৬
মোট	৭৪৮৭	১৯৮

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের প্রধান প্রধান রেলওয়ে ও রাস্তা বোম্বাই হইতে কলিকাতার এলাকায়ই বেশী।

৬। বিমান পথ: ভারতের উপর দিয়া অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত প্রাচ্যের যে ইম্পীরিয়াল বিমানপথ প্রস্তুত হইবে, কলিকাতাকেই তাহার কেন্দ্র করা হইবে। এই বিমান-পথের খসড়ায় বোম্বাইকে ধরা হয় নাই। বোম্বাই সমুদ্র-পথে ভারতের দ্বারস্বরূপ হইতে পারে। কিন্তু ভারতের বিমানপথের সঙ্গে এ সহরের কোন সম্বন্ধ নাই।

৭। প্রাসাদ: কলিকাতা প্রাসাদ-নগরী বলিয়া অভিহিত। বোম্বাই সহরেও অবশ্য বড় বড় অনেক দালান-কোঠা আছে এবং এ বিষয়ে বোম্বাইকে দুনিয়ার যে কোন সহরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু বড় বড় প্রাসাদে ও প্রাসাদ-নির্ম্মাণ নিয়ে কলিকাতার গর্ব্ব করিবার অনেক কিছু আছে।

৮। রাজনীতি ও চিন্তাশীলতা: এ বিষয়ে কলিকাতাকে ভারতের কেন্দ্রস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতায় থাকার দরুণ এ সহর ভারতের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানচর্চ্চায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

তবে কলিকাতা হইতে বোম্বাই এক বিষয়ে খুবই বড়। বোম্বাইকে ভারতের সর্ব্বপ্রধান মাল-উৎপাদনকারী সহর বলা হয়। এ বিষয়ে কলিকাতা বোম্বাইয়ের অনেক পিছনে। বোম্বাইয়ের প্রধান পণ্য তুলা, আর কলিকাতার

প্রধান পণ্য পাট। বোম্বাই যেমন ভারতের তুলা-সংক্রান্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্র, কলিকাতাও তেমনি পাট-ব্যবসায়ের কেন্দ্র। কয়লার প্রাধান্য ও পাটের একচেটিয়া ব্যবসায়ের সাহায্যে কলিকাতা ক্রমে ক্রমে উৎপাদনকারী সহরে পরিণত হইতেছে এবং শীঘ্রই এবিষয়ে উন্নতির চরমে উঠিবে আশা করা যায়। তবে বোম্বাইকে দেশের পক্ষে এক বিষয়ে কলিকাতা হইতে বড় বলা যায় যে, ইহার অধিকাংশ শিল্প ও ব্যবসায় ভারতবাসীর অধীনে, আর কলিকাতার ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় সবই ইয়োরোপবাসীর অধীনে। কলিকাতার শিল্প-বাণিজ্যের অতি ক্ষুদ্র অংশই দেশবাসীর একচিয়ারে। কলিকাতার পাটের ব্যবসায় স্কটল্যাণ্ডবাসীর হাতে, চা ইংরেজের একচিয়ারে এবং কয়লাও প্রধানতঃ ইংরেজেরই হাতে। এ বিষয়ে কলিকাতাকে বোম্বাইয়ের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় সহর বলা যাইতে পারে।

বসতির দিক্ দিয়া দেখিলেও কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ের বসতি অনেক ঘন। প্রতি বর্গ মাইলে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের লোক-সংখ্যা কত তাহা পাশাপাশি রাখিয়া নীচে দেখান হইল :—

	১৯১১	১৯২১
কলিকাতা সহর	—	৪০,২৩১
সহরতলী সমেত কলিকাতা	২৪,৮৪১	২১,১১২
বোম্বাই	৪২,৪৮৫	৫৮,৯১৬

আগেকার দিনে বোম্বাইয়ের বসত বাড়ীর তেমন উন্নতি না থাকায়, অথচ লোক-সংখ্যা অপরিমিত থাকায়, স্ত্রীলোক ও শিশুদের গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া পুরুষেরা রাস্তায় শুইত। বোম্বাইয়ের সামাজিক জীবনের পক্ষে এ একটা কলঙ্কের কথা বটে। অত্যধিক লোক-সংখ্যাই বোম্বাইয়ের আর্থিক ও সামাজিক অবনতির কারণ। ইহাতে সহরবাসীর শারীরিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে; ফলে সর্ব্ববিষয়ে তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। মজুরদের মধ্যে এই বাস-সমস্যা এত প্রবল যে, ইহার ফলেই তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি দেখা দেয়। বোম্বাইবাসীদের সামাজিক জীবনের পক্ষে আর এক বিঘ্ন হইতেছে প্লেগ। এই মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে কলিকাতা কতকটা মুক্ত আছে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতাকে ভারতের অন্যান্য সহরের তুলনায় অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থান বলা যাইতে পারে।

কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় সহরই ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের দৌলতে দিন দিন বেশ উন্নতি লাভ করিতেছে। এই ট্রাষ্টের উদ্দেশ্যই হইতেছে সহরকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়িয়া তোলা। বর্ত্তমানে দুইটী সহরেরই সীমানা বাড়াইবার খুব দরকার হইয়া পড়িয়াছে। উভয় সহরেরই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বিজলী-সরবরাহ ও উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা দরকার। মজুরদের বাসের নিমিত্ত যথেষ্টসংখ্যক গৃহ নির্ম্মাণ করা ও উপযুক্তরূপ বাসের ব্যবস্থা করা উভয় সহরের পক্ষেই দরকার। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষের সাম্যের অসামঞ্জস্য দূর হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে কলিকাতার পশ্চিমে নদী ও পূর্ব্বে জলাভূমি থাকার দরুণ এ দুইটী দিকে সহর বাড়াইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং ইহাকে বাড়াইতে হইলে উত্তরে ও দক্ষিণে বাড়াইতে হইবে। ইহাতে সহরের দৈর্ঘ্যই কেবল বাড়িয়া যাইবে। এজন্য সহরের মধ্যে সস্তা অথচ দ্রুতগামী যানের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। বর্ত্তমান হাওড়ার পুলের পরিবর্ত্তে আধুনিক ধরণের নূতন একটা পুল নির্ম্মাণ করাও একান্ত দরকার। এ ছাড়া কাঁকিনাড়ার নিকটে গঙ্গার উপরে আরও একটা ভাসমান পুল হইলে ভাল হয়, তাহাতে সহরের লোক-সংখ্যাও ভাগ হইয়া কিছু ওধারে চলিয়া যাইতে পারে। কলিকাতার ট্রাম ও বাস গাড়িরেরও অনেক উন্নতিসাধন করা দরকার। উভয় সহরের রাস্তাতে মোটর গাড়ীর চলাচল শাসন করিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ঠাওরান দরকার এবং সেই সঙ্গে পথিকদের সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নতার দিকেও যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রাস্তার দুর্ঘটনা উভয় সহরেই দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে সহর দুইটাতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা যে চরমে পৌঁছিয়াছে তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে, এখন সহর হইতে সমস্ত ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী বিদায় করিয়া দিলে ভাল হয়। মোটর যোগে যাতায়াত যেমন সস্তা তেমনি দ্রুত হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের রাস্তায় গাড়ী-

চলাচলের শাসন-প্রণালী বরং কলিকাতা অপেক্ষা ভাল। সহরের মধ্যে এমন অনেক রাস্তা আছে যাহা ট্রাম ও বাস সার্ভিস্ দুই-ই চালাইবার পক্ষে নিতান্ত সরু। সে সমস্ত রাস্তা হইতে মন্দগামী ট্রাম তুলিয়া দিয়া তথায় দ্রুতগামী বাস্ সার্ভিস বহাল রাখিলে ভাল হয়।

আর একটী বিষয়ে বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতা অনেক ভাল। বোম্বাইয়ের তুলা-শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সবই সহরের মধ্যে অবস্থিত। ইহার দরুণ মজুর প্রভৃতির সংখ্যা বোম্বাইয়ে এত বেশী যে সহরের বসতি অত্যন্ত ঘন হইয়া গিয়াছে। ফলে সহরের স্বাস্থ্যও অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা এ দোষ হইতে অনেকটা মুক্ত। তাহার পাটশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সবই নগর সীমানার বাহিরে। প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সহরের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইত, তাহা হইলে অবশ্য আকার ও লোক-সংখ্যা হিসাবে কলিকাতা অনেক বড় হইয়া যাইত; কিন্তু তাহাতে সহরের বসতি এত ঘন হইয়া যাইত যে, সহরবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্যা বর্ত্তমানের তুলনায় শতগুণ বাড়িয়া যাইত।

কলিকাতার একটা মস্ত ত্রুটি হইতেছে উপযুক্তরূপ পানীয় জল-সরবরাহের অভাব। ইহার তুলনায় বোম্বাইয়ের জল-সরবরাহ-প্রণালী অনেক ভাল। কলিকাতার অধিকাংশ লোকই উপযুক্ত পরিমাণ জল পায় না। জল যেটুকু সরবরাহ হয়, তাহাও সকলের জন্য সমান ভাবে হয় না। এ-বিষয়ে উন্নতিসাধন খুবই আবশ্যক সন্দেহ নাই; তবে সহরবাসীরও এটুকু লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে জলের অসদ্ব্যবহার অথবা অপচয় না ঘটে। সহরের ভিতর ময়লা জল সরবরাহ বাস্তবিকই ক্ষতিকারক। পরিষ্কার ও ময়লা দুই প্রকারের জল সরবরাহের নিয়ম তুলিয়া দেওয়া উচিত।

কলিকাতার আর একটা জিনিষের উন্নতিসাধন খুবই আবশ্যক—সেটী হইতেছে "খাপামেদ"। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহরের ময়লা সরাইবার এ ব্যবস্থা বাস্তবিকই নিন্দাজনক। যত শীঘ্র এ প্রণালী দূর হইয়া নূতন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলবৎ হয় ততই মঙ্গল। বিদ্যাধরীর ব্যাপারটারও যত সত্বর সম্ভব একটা কিনারা করিয়া ফেলা উচিত।

সুতরাং দেখা গেল নিম্নিষ্ট কয়েকটী ধরা বাঁধে কলিকাতা বোম্বাই অপেক্ষা প্রতি বিষয়েই শ্রেষ্ঠ।

"দি ন্যাশনাল রিভিউ"

নবেম্বর, ১৯২৯। মাসিক পত্রিকা। প্রতিমাসে ১৫০ পৃষ্ঠার অধিক প্রবন্ধ ইত্যাদিতে পূর্ণ থাকে। রক্ষণশীল ইংল্যণ্ডকে বুঝিতে হইলে এই কাগজখানা নিয়মিতভাবে পাঠ করা চাই। সম্পাদকের নাম এল্ জে ম্যাক্সে। বাৎসরিক চাঁদা ৩৬ শিঃ। প্রাপ্তির ঠিকানা ৮ জন ষ্ট্রীট, এডেল্ফি, লণ্ডন।

(১) মাসের ঘটনাবলী। প্রতিমাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা-সমূহের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। এই মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে। (ক) যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাকডোনাল্ড—পরোপকারই আমেরিকানদের জীবনের একমাত্র ব্রত নহে; তারা প্রকাশ্যতঃ ইয়োরোপকে, বিশেষতঃ ইংল্যণ্ডকে ঘৃণা করে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া ম্যাকডোনাল্ডের এরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নৌ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য যাওয়া ঠিক হয় নাই। ফরাসীরাও ইহা ভাল চোখে দেখিতেছে না। (খ) কানাডায়—ম্যাকডোনাল্ড ২৩শে অক্টোবর দেশের দিকে রওনা হইয়াছেন। সানডে টাইম্স্ ২০শে অক্টোবর এক খবর ছাপাইয়াছে—বৃটেন না কি উদারীন জাহাজ খানাতল্লাসী করিবার অধিকার দাবী করিবে না, ওয়াশিংটনে স্থিরীকৃত হইবে কে আক্রমণকারী। ম্যাকডোনাল্ড যদি এরূপ কথা দিয়া থাকেন ত অন্যায় করিয়াছেন। ইংরেজরা তাদের নৌ-বলকে মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে। বিশেষ করিয়া অক্টোবর মাসে ইংরেজরা সামুদ্রিক প্রভুত্বের কাছে ঋণ-স্বীকার না করিয়া পারে না। (গ) ট্রাফালগার বাৎসরিক উৎসব—১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর ইংল্যণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌ-সেনাপতি নেলসন কর্ত্তৃক সব চেয়ে বিখ্যাত নৌযুদ্ধে জয়শ্রী অর্জ্জিত হয়। যুদ্ধ জিতিবার খবর পাইবার পরমুহূর্ত্তে তাঁর মৃত্যু হয়। বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের অনেকে বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, আর্শ্বাগদের

প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, তাঁরা যে নেলসনকে যথোচিত সম্মান দেখাইবেন না, তা বিচিত্র নয়। কিন্তু তা বলিয়া সমগ্র জাতি এই বীরকে প্রতি বৎসর ঐ দিনে পূজা দিতে ভুলিবে না, ইহা নিশ্চয়। (৭) হার ষ্ট্রেসেমান—গত ৩রা অক্টোবর জার্ম্মাণির পররাষ্ট্র-সচিব ষ্ট্রেসেমানের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মিয়া তিনি যৌবনে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে বিষয়ে গবেষণা করিয়া ডক্টর হইয়াছিলেন তা হইতেছে—"খোতলবদ্ধ বিয়ার মদ্যের ব্যবসা।" তিনি বিসমার্কের খুব ভক্ত ছিলেন। যুদ্ধে উৎসাহ ও নবরাজ্য জয় করিবার প্রেরণা তিনি জার্ম্মাণিকে দিয়াছেন। জেনেভায় তিনি প্রাক্-খৃষ্টিয় সকলের সহিত এমন ভাবে মিশিতে পারিতেন যে, কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া তিনি আপন কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক গগনে আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর স্বদেশের প্রতি ভক্তি এরূপ প্রবল ও উগ্র ছিল যে, তাঁকে বাজে আন্তর্জাতিকতাবাদী বলিয়া গণ্য করিলে অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। তিনি কখনও যদি আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা শুধু জার্ম্মাণির উন্নতে উপকার হইবে বলিয়াই দিয়াছেন (৮) লর্ড রথার-মিয়ারের প্রবন্ধাবলী—সম্প্রতি লর্ড রথারমিয়ার মোটরে জার্ম্মাণিতে অনেকখানি ঘুরিয়া আসিয়াছেন। এই ভ্রমণের ফলে তিনটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ "ডেলি মেল" নামক দৈনিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। ডেলি মেলের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, ইহা কোন দলের মুখপত্র মাত্র নয়, আর বাজে কথার বুজরুকীতে ভরা থাকে না। লর্ড নর্থক্লিফের মত লর্ড রথারমিয়ারও সকল রকম মতবাদী লোককে জানিতে চেষ্টা করেন। তাঁর নিজের মতের বিরুদ্ধে কথা বলিলেও তিনি কান পাতিয়া শোনেন। তাঁর মন সর্ব্বদাই কুসংস্কার-মুক্ত। তিনি জার্ম্মাণিতে অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইয়োরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণি যে মস্ত বড় একটা শক্তির সহায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন, "জার্ম্মাণি যে শান্তি চায় তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যুদ্ধ সফল হয় নাই, কিন্তু তার দফা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, শুধু তার উপায়-নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।" তার অর্থ এই নয় যে, জার্ম্মাণি কম বিপজ্জনক হইয়াছে, কিন্তু ঠিক উল্টা। ১৯১৪ সনে জার্ম্মাণির পাশবিক আক্রমণে ইয়োরোপের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু এখন তিলে তিলে জার্ম্মাণি অ-জার্ম্মাণ পৃথিবীর স্বার্থকে যেরূপে ধ্বংস করিতেছে, তাতে তার চেয়েও ঢের বেশী ক্ষতি হইবে। জার্ম্মাণি যুদ্ধে হারিয়াছে, কিন্তু সেজন্য কাঁদিতে বসে নাই। তাঁর খ্যাতি ও প্রভুত্বকে সে শিল্প ও আর্থিক জগতে খাটাইতেছে। এইখানে ইংরেজ ও জার্ম্মাণে মস্ত বড় প্রভেদ। (৯) ব্যাঙ্কের হার—সেপ্টেম্বরের শেষে ব্যাঙ্কের হার বাড়িয়া ৬½% হইয়াছে। তার মানে ব্যবসার উপর অসহ্য ভার চাপান হইয়াছে। বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ মোডেন ৩রা অক্টোবর তারিখে ব্রাইটনে মজুর কংগ্রেসকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ ব্যাপারে ট্রেজারির কোন হাত নাই, ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ড একমাত্র দায়ী। অথচ তিনিই আবার পরে বলিয়াছেন যে, "ট্রেজারি ও ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ড গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্কার। ট্রেজারির হইয়া একে অনেক বড় বড় আর্থিক ব্যাপারে হাত দিতে হয়,—প্রতি সপ্তাহে ৩ কোটি পাউণ্ড মূল্যের ট্রেজারি বিল বাজারে ফেলিতে হয়, টাকা বদল করিতে হয়। এই সব কার্য্যোপলক্ষে ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারির মধ্যে অনবরত কথাবার্ত্তা ও আদানপ্রদান চলে।" মোডেন এক মুখে দুই রকম কথা বলিয়াছেন। আর্থিক নীতির যে ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব রহিয়াছে, তা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? ১৯২৫ সনে চার্চ্চিল স্বর্ণমান অবলম্বন করেন। আমরা তখন হইতে বরাবর ইহার কুফল সম্বন্ধে লোককে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। এক আলফ্রেড্ মন্ড (এখন লর্ড মেলাচট্) ছাড়া আমাদের কথায় কেহ কাণ দেয় নাই। মোডেন প্রকাশ্যভাবে স্বর্ণ-প্রত্যাবর্ত্তনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন যেন মনে হয়, তাঁর মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে, কারণ তিনি পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতার এক জায়গায় বলিতেছেন, "যেন স্বর্ণমান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে আমাদের মনে আশঙ্কা ছিল যে, কাজটা বড় তাড়াতাড়ি হইতেছে।" চোদ্দ

পালাইলে বৃদ্ধি বাড়ে। এখন ছোডেন উল্টা গাহিতে সুরু করিয়াছেন। যুদ্ধের পর ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌গণ যে সব কাজে হাত দিয়াছেন, তার কোনটাই এই বর্ণনানের মত অমঙ্গলজনক নয়। (ছ) নূতন পেন্সন বিল—১৭ই অক্টোবরের টাইম্‌স্ পত্রে প্রকাশ যে গবর্ণমেণ্টের "বিধবা, অনাথ ও যুদ্ধের পেনসন বিল" প্রায় হইয়াছে। ১৯২৫ সনে বিধিবদ্ধ আইনের অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য না কি এই নূতন আইন। ইহা দ্বারা ৩,৭২,৫০০ লোক উপকৃত হইবে। পুরাতন আইনে ছিল যে, ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইবে। তারপর দশবৎসর ধরিয়া বৎসরে ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান বিলের ব্যবস্থা অনুসারে বরাদ্দের পরিমাণ এখনই ৪০ লক্ষ হইতে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড উঠিবে, তারপর প্রতিবৎসর ১০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া বাড়িয়া চলিবে। সুতরাং ১৯৩২-৩৩ সনে ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৩-৩৪ সনে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৪২-৪৩ সনে ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে। এখনে ট্রেজারি পেনসন একাউণ্টের হকায় হাতে জমা আছে ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৪৫-৪৬ সনে থাকিবে মাত্র ৬ লক্ষ পাউণ্ড। প্রথম ৬ বৎসরে অতিরিক্ত খরচ বাবদে যাইবে ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ বৎসরে গড়ে প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। সুচতুর গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যসচিব এই ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, উপকৃত লোক-সংখ্যার তুলনায় খরচের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী সন্দেহ নাই। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য ব্যবসায়কেই এই সমুহ ক্ষতি সহ করিতে হইবে। ভোটদাতাদের এই ঘুষ দেওয়ার অর্থ বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ইংরেজকে অসমর্থ করা। (জ) ব্যাটারসী পাওয়ার ষ্টেশন—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যাকার কলকারখানা শুধু ইংল্যণ্ডের শোভা ও স্বাস্থ্য নয়, ইহার অনেক মূল্যবান্ সম্পত্তিও নষ্ট করিতেছে। ব্যাটারসীর নবনির্ম্মিত পাওয়ার ষ্টেশন পার্লামেণ্ট ভবনদ্বয়, ওয়েষ্টমিনষ্টার সিবি ও চিত্রশালাসমূহের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ঘর, মাঠ, বাগান, গাছপালা ঘাস, ফুল ইত্যাদির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহার প্রতীকার চাই। (ঝ) ইংলণ্ডের গ্রাম দেশ—শুধু দেশ নয়, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র গ্রামগুলি এইরূপ হতশ্রী হইতেছে। কল-কারখানার অত্যাচার ত আছেই তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের ছড়া-ছড়ি, কুৎসিত চা-পান-পুর ইত্যাদির কদর্য্যতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। পেট্রল ষ্টেশন দরকার তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু পাম্পগুলি বীভৎস। বাংলো উঠাইয়া দিবার কথাও কেহ বলিবে না। কিন্তু ইংলণ্ডের বাংলোগুলি তাদের চারিপাশের সঙ্গে খাপ খায় না। কেহ কেহ বলে সৌন্দর্য্য অনুভবের চর্চ্চা এবং শিক্ষাদানের দরকার। কিন্তু এদিকে যে শিক্ষালাভ করিতে করিতে জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয় হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং দরকার—শিক্ষা, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এক সঙ্গে চলিবে। (ঞ) অষ্ট্রেলিয়ার নির্ব্বাচন—১২ই অক্টোবরের অষ্ট্রেলিয়ার নির্ব্বাচনে ব্রুসের মন্ত্রিত্ব খতম হইয়াছে। নির্ব্বাচন-ফল এইরূপ :—

মজুর	
ভাশানালিষ্ট	
কাটি বা গ্রাম্যদল	
স্বাধীন	৪
গ্রাম্যদল—উন্নতিশীল	১

ব্রুস স্বয়ং হারিয়া গিয়াছেন। ডিওয়স্ তাকে মনোনীত করে নাই। সোটা অষ্ট্রেলিয়ার করদাতাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন ভোট দিয়াছে। অন্যান্য দেশের মত অষ্ট্রেলিয়াও কথার বড়াই অত্যন্ত করিয়াছে। মজুর-দলের দলপতি স্কালিন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ব্রুস ও স্কালিন দুজনেই ঘোষণা জারি করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রচালিত ব্যবসায় ইত্যাদিতে অনেক খরচ করিতেছে। চড়া টারিফ ও চড়া দরের ফলে অষ্ট্রেলিয়া দুনিয়ার বাজারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই ইত্যাদি সত্য কথা তিনি অষ্ট্রেলিয়াকে শুনাইতে ভয় পান নাই। ব্রুসের পরাজয়ে সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সৌহার্দ্দ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনৈতিক গগনে স্কালিন তত পরিচিত নহেন, বরং তাঁর সহকারী হিওডোরের নাম অনেকে জানেন। (ট) মিলনার কোট—লর্ড মিলনার

তাঁর সম্পত্তি হইতে ক্যান্টারবারির কিংস্ স্কুলকে ঘর, বাগান ও ৭০ একর জমি দান করিয়া গিয়াছিলেন। গত ৪ই অক্টোবর এইখানে স্কুলটী স্থানান্তরিত হইয়াছে। মিলনারের স্মৃতি-রক্ষার পক্ষে এটি খুব সুন্দর জিনিষ হইয়াছে। রডিয়ার্ড কিপ্লিং এই উপলক্ষ্যে এক অভিভাষণ পাঠ করেন। (৯) আমাদের মৃত বীরগণ—শান্তি স্থাপনের দিনে (১১ই নভেম্বর) জাঁকজমক কম করিবার পরামর্শ বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। তা তাঁরা দিতে পারেন। কারণ বিগত যুদ্ধে এঁরা কেহ যোগদান করেন নাই। বৎসরে একদিন মাত্র সেই মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করা হইবে, যাঁরা আপনার রক্তদ্বারা আমাদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিয়াছে। তাতেও কার্পণ্য কেন? গবর্ণমেণ্ট সম্মান দেখাক্ বা না দেখাক্ দেশের লোক এই দিনের মর্য্যাদা যে রাখিবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। (৬) বিশ্বের গঠন—গত বৎসর স্যর জেম্‌স জীন্‌স জ্যোতির্বিদ্যা, ও আকাশতত্ত্ব নামে এক কেতাব লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তা সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা সহজ নয় বলিয়া এ বৎসর "আমাদের চতুর্দ্দিকের বিশ্ব" নামে খুব সহজ এক বহি লিখিয়াছেন। এ কেতাব সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবে, অথচ বিষয়গুলি খুব চমৎকার। ৬টী পরিচ্ছেদের নাম :—

আকাশ আবিষ্কার বা বিশ্লেষণ
অণু " " "
সময় "
বিশ্ব খুঁজিয়া পৃথক করা
তারা "
আরম্ভ ও শেষ।

সূচনায় তিনি বলিয়াছেন—

পৃথিবীর বয়স	প্রায়	২০০ কোটি বৎসর
পৃথিবীতে প্রাণের বয়স	"	৩০ "
পৃথিবীতে মানুষের বয়স		৩ লক্ষ
জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স		৩ হাজার "
দূরবীণাত্মক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স		৩০০ বৎসর

স্যর জেম্‌স মানুষকে খুব আশার কথা শুনাইয়াছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সবেমাত্র উষাকাল, এখনও মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

(২) ভাইকাউণ্ট মিলনার—রডিয়ার্ড কিপ্লিং।

(৩) খুড়ো শ্যামের দুই বুড়ি—এক এল স্মিথ নামক জনৈক লেখক টোরোণ্টোর (কানাডা) স্টারডে নাইট পত্রিকায় ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই নামের এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৯২৯ সনের গোড়ার দিকে নিউইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেণ্ট মি এইচ সিমন্‌স্ প্যারিসে গর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিনের ভোজে এক বক্তৃতা দেন। এই প্রবন্ধে লেখক সেই বক্তৃতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ সম্বন্ধে আমেরিকার জনমত দুই প্রকারের। সিমন্‌সের বক্তৃতার মোদ্দা কথা এই যে, যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে ফ্রান্সের শত্রুর আক্রমণ-বিভীষিকা বুঝিতে পারিবে না। হাজার হাজার মাইল ধরিয়া কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা মিলিয়া রহিয়াছে; অথচ এই সীমান্ত রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা কেহই কোন চেষ্টা করে না। কিন্তু ফ্রান্সকে তার চারিদিকে সর্ব্বদা সশস্ত্রভাবে পাহারা বসাইয়া রাখিতে হয়। এরূপ অবস্থায় একের মনের ভাব অন্যের বুঝা সম্ভব নয়। লেখক বলেন, নৌ-বলে সমতারক্ষার কালে এই কথা মনে রাখা দরকার। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে যেমন যুদ্ধের সময় প্রকৃতই সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক, সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রে বোরা ও হেফলের মত লোকেরও অভাব নাই। স্মিথ প্রবন্ধোপলক্ষ্যে একজন বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদপত্র-পরিচালক কর্ত্তৃক এক কানাডিয়ান বন্ধুকে লিখিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। আমেরিকানটীর উক্তির সারমর্ম্ম এইরূপ :—

"জগতের উন্নতির জন্য গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা যে একান্ত আবশ্যক তা অনেক বড় বড় আমেরিকান স্বীকার করেন। কিন্তু এরূপ আমেরিকানের সংখ্যাও কম নয়, যারা বৃটিশ-বিরোধী না হইলেও বৃটিশ সহানুভূতি-সম্পন্ন নহে। এরা পৃথিবীর অবস্থা উন্নততর হোক্ ইহা কামনা করে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য একযোগে প্রভুত্ব করুক তা চায় না, তারা চায় যে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সকলের উপরে

থাকুক। এই মনোভাব-সৃষ্টির জন্য আমেরিকার ধনগুলি কতক পরিমাণে দায়ী, কিন্তু আমেরিকার পত্রিকা ও ছাপাখানাও কম দায়ী নয়। সত্য-প্রচারের চেষ্টামাত্র না করিয়া অধিকাংশ কাগজে শুধু লোকরঞ্জনের চেষ্টা করা হয়—যাতে কাগজের কাটতি বেশী হয় সেদিকে দৃষ্টি থাকে। সেজন্য একদিন বৃটিশের বিরুদ্ধে ও অন্যদিন স্বপক্ষে লিখিতে তাদের আটকায় না। ১৯১৪ সনে নিউ ইংলাণ্ডের লোকেরা এক বিশিষ্টতা দেখাইয়াছিল—তারা শুধু মিত্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না, তারা বিশেষ করিয়া বৃটিশ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। অন্য কারো কারো মিত্রদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তাদের দরদ ফ্রান্সের বা বেলজিয়ামের প্রতি, তারা বৃটিশকে কটূক্তি করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। বৃটিশের ভাল দিকটা দেখিবার মত লোক আমেরিকায় ঢের আছে। কিন্তু তার বিপরীত ধরণের লোকের সংখ্যা কম নয়। যে সব বৃটিশার খুব সহজে বিশ্বাস করে যে, আমেরিকানরা অধিকাংশে বৃটিশের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, তারা ভুল করে। তাদের মাথার থেকে এ ভাব দূর করা দরকার। বিষয়টা জটিল। খোলা মনে তথ্যের সমুখীন হওয়া চাই ও অবস্থার পরিবর্তন করা চাই।"

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আমেরিকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ করা দরকার। অথচ ইংরেজের সকল দলের মধ্যেই ওয়াশিংটনের খোসামোদ করিবার এমন একটা বদ অভ্যাস জন্মিয়াছে যে, জাতীয় সম্মান, আত্মমর্যাদা বোধ আর বজায় থাকে না। বৃটিশ কাগজগুলিও ঐরূপ। কথায় কথায় ওদের মুখের দিকে চাহিলে কি চলে? তার ফল কি হইয়াছে দেখ। উইন্স্টন চার্চিলের পরম বন্ধু উইলিয়াম র‍্যাডাল্ফ হিয়ার্ষ ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জকে বৎসরে ১৩,০০০ পাউণ্ড মাহিনা দিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলেন হ্যানালি কল্চুইনকেও ঐ ভাবে কিনিতে পারিবেন। সেজন্য গত নির্ব্বাচনে কল্চুইন হারিবার পর ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে সাহস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সবাই ত আর লয়েড্ জর্জ্জ নয়। কল্চুইন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টকে সমালোচনা ও আক্রমণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু পার্ল্যামেণ্ট প্রাটফর্ম্ম ওজন্য আছে। বিদেশে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রধান মন্ত্রীরূপে রাজ্যের কোন কোন গোপনীয় সংবাদ তিনি এমনভাবে জানেন যে, তাঁর পক্ষে সে সব ব্যবহার করা কোনরূপেই সমীচীন হইবে না। সাধারণভাবে প্রবন্ধ লেখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হইবে না। কারণ রাজনৈতিক কাজে তাঁর সমস্ত সময় ব্যয়িত হইবে। কল্চুইনের এইরূপ নির্ব্বীকতার ফলে হিয়ার্ষ-চালিত ২৭টি আমেরিকান কাগজ একযোগে তাঁকে দিনের পর দিন আক্রমণ করিতে থাকে। বলা বাহুল্য তাতে মোটেই বৃটিশ-প্রীতি প্রকাশ পায় না।

(৪) ইংলাণ্ডের চেহারা বদলাইতেছে—নেবওয়ার্থ। যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইংলাণ্ডে দুইটি জিনিষ খুব স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। একটাকে রাজনৈতিক বা বাহ্য প্রবণতা ও অন্যটাকে সামাজিক অথবা আভ্যন্তরীণ প্রবণতা বলা যাইতে পারে। এই দুইটী পরস্পর এরূপ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত যে, কোন্‌টা কাকে কিরূপভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে নির্ণয় করা সহজ নয়। বর্ত্তমান কালে পার্ল্যামেণ্টারি মজুরদলের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতাদ্বয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ডিস্রেলি কোন স্থানে বলিয়াছেন যে, ভদ্রলোকের স্বভাব হইল চালনা করা বা দলপতি হওয়া। ডিস্রেলি ভদ্রলোক কথাটা সেকেলে ও বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁর মতে ভদ্রলোক ভদ্রলোকই, তা তিনি যে কাজই করুন বা যে রকম স্বভাবেরই হউন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডে এই প্রকারে ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে দুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—(১) তারা আর নেতৃত্ব করে না, (২) তাদের নেতৃত্ব কেহ চায় না। এর কোন্‌টা কারণ আর কোন্‌টা ফল তা বুঝবার দরকার নাই। কিন্তু শিল্প-নিষ্ঠ ইংলাণ্ডে নেতা হিসাবে ভদ্রলোকেরা খুব দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। যুক্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভদ্রলোকেরা শিল্প-নিষ্ঠ ইংলাণ্ডকে গড়ে নাই, এমন কি শিল্প-নিষ্ঠ ইংলাণ্ডের উপর সভাপতিত্ব করে না। কিন্তু যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তা হিসাবে, লিমিটেড লায়েবিলিটি কোম্পানী-সমূহের ডিরেক্টর হিসাবে লণ্ডনের প্রধান ব্যক্তি ও ব্যবসা

মুরুব্বীরূপে সভাপতিত্ব করিয়াছে, কেহ কেহ শিল্প-আইনের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টে বসিয়াছে, তাঁরা ভদ্রলোক বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। এই সব ভদ্রলোক নেতারূপে বিশেষ অকৃতকার্য্য হইয়াছে। তারা অনেক স্থলে তাদের কর্ম্মচারীদের অথবা ভোটদাতাগণের বিশ্বাস হারাইয়াছে। প্রত্যেক বড় শিল্প-কেন্দ্রের লোকবল ভদ্রলোকের নেতৃত্ব হইতে ট্রেড্ ইউনিয়ানসমূহের কর্ত্তা-ব্যক্তিদের ও স্থানীয় মজুরদলের সেক্রেটারী ও পরিচালকদের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আধুনিক ইংল্যণ্ডের মধ্যশ্রেণি শিল্পীরা ভদ্রলোকের নেতৃত্ব অথবা অস্তিত্ব চায় না। গ্রামের অবস্থা অবশ্য এখনও এরূপ শোচনীয় হয় নাই। ইংল্যণ্ডের গ্রামবাসীরা আজও ভদ্রলোককে বিশ্বাস করে ও ভোট দিয়া পার্লামেণ্টে পাঠায়। কিন্তু সহরগুলি ভদ্রলোকদের ছাটিয়া ফেলিয়াছে; আর আজিকার ইংল্যণ্ডের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বলিতে সহরগুলিই বুঝিতে হইবে।

ভদ্রলোককে তার অন্যান্য সব প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু নেতৃত্ব করিতে দেওয়া হয় না। তার বিচার-বুদ্ধি বা বিষয়বুদ্ধি গ্রহণ করা হয় না এবং নির্ব্বাচন ফলের সময় তার নাম সকলের নীচে দেখা দেয়। ভাবিয়া দেখা যাক্ মজুর কি করিতে পারে। শিল্প-নিষ্ঠ লোকবলের বিশ্বাস যদি উৎপাদন করা যায় ত ভাল কথা। ছাঁটাই-নিয়ন্ত্রণের অর্থ যদি অধিকতর কাজ, অধিকতর উন্নতি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হয়, তবে ছাঁটাই-নিয়ন্ত্রণ চাই। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাতে মনে হয়, মজুর গভর্ণমেণ্ট শিল্পনিষ্ঠ ইংল্যণ্ডের মস্ত রক্ষক। মেগ'এ ষোডেনের সাহসিক কার্য্যাবলী দেশশুদ্ধ লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। যদি সার অষ্টেন চেম্বারলেন বা ষোডেন ঐরূপ কিছু করিতেন তবে আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী মজুরদের আপত্তি শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া যাইত। কিন্তু যেহেতু ষোডেন মজুর-প্রতিনিধি, অতএব শিল্পনিষ্ঠ ইংল্যণ্ড ষোডেনের তারিফ করিতেছে। যেখানে ভদ্রলোকের পরাজয় হইয়াছে, সেখানে মজুর কৃতকার্য্য হইতে পারে। কে সফলকাম হইল বা হইল না তাতে কিছু আসে যায় না, আসল উদ্দেশ্যটা সফল হইলেই হইল। উদ্দেশ্য শুধু আভ্যন্তরীণ কুটিল-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি নয়, কুটিলের সম্মান, আত্ম-মর্য্যাদা, সাহসের সহিত সংসারের সম্মুখীন হইবার ক্ষমতার বৃদ্ধিও বটে।

অতএব রাজনৈতিক যা বাহ্য প্রকৃতা হইতেছে ভদ্র-লোকের পরাজয় ও মজুরের আগমন। অথচ ইংল্যণ্ডে সব কিছু ভালভাবে চলিতেছে না, যদিও ভালভাবে চলা উচিত ছিল। অমঙ্গল ও ভবিষ্যৎ উদ্বেগের মাঝখানে কতকগুলি প্রণালী অনুসৃত হইতেছে—কি প্রণালী বুঝা যায় না। আজিকার ইংল্যণ্ড একটা অস্থায়ী অবস্থার ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইংল্যণ্ডের বর্ত্তমান মজুর ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে এক চিন্তায় পাইয়া বসিয়াছে—সব চেয়ে অল্প খাটিয়া কি করিয়া সব চেয়ে বেশী উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। ভিক্টোরিয়া যুগে লোকে কাজ করিয়া আনন্দ পাইত ও গর্ব্ব অনুভব করিত। এখনে লোকে স্থায়ী বেতনভোগী হইতে চায়, সকল রকম পীস কাজ অপছন্দ করে। কিন্তু বেতনভোগী চাকুরেদের কোন লোক কোন দিন ধনী হইতে পারে নাই। বেতনভোগী মজুর কোন দিন কোন ভাল কাজ করিতে পারে নাই। আজ গ্রেট ব্রুটেনের সমর্থ শ্রমিকদের ভিতর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আত্মমর্য্যাদা-বোধ খুব কম, আর এই শ্রমিকদের সংখ্যাই প্রতিদিন বাড়িতেছে। মানুষের কৃতকার্য্যতায় মানুষের গর্ব্ব-বোধ অন্তর্হিত হইয়াছে।

উপনিবেশ স্থাপনের দিকে লক্ষ্য করিলেও সেই একই নিস্তেজভাব দেখা যাইবে। অনেক বৎসর ধরিয়া বিদেশগামী ইংরেজদের সাহায্য করিবার জন্য একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর যা খরচ করা যাইতে পারে, তা ত কোন বারই খরচ হয় নাই, অধিকন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে এদের সংখ্যা যত ছিল এখন তার চেয়েও কমিয়া গিয়াছে। যারা যায় তাদের অনেকে ক্ষতসর্ব্বস্ব হইয়া ফিরিয়া আসে। অথচ এরা সেই জাতির লোক যে জাতি একদিন পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই যেখানে যাইতে ভয় পাইয়াছে বা কোন প্রকার কষ্ট বা ভয়ের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। এদের

পূর্ব্বপুরুষেরা কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কোথায় কানাডা, কোথায় আফ্রিকা—সর্ব্বত্র উপনিবেশ গড়িয়াছে। ইংরেজের যে চরিত্র গঠিত হইয়াছিল তা ভাঙিয়া গিয়াছে।

বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রবণতাদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টা কারণ আর কোন্‌টা ফল বলা বড় শক্ত। ট্রেড্ ইউনিয়ন অনেক ভাল কাজ করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সব চেয়ে কম কাজ করিয়া বেশী মজুরি পাইবার জন্য উৎসাহ দিয়াছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জায়গায় সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতা ব্যক্তির অনেকখানি ক্ষেত্র অপহরণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে তৃতীয় একটি প্রবণতাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। নিম্নে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

যুদ্ধের সময় হইতে স্ত্রীলোকের প্রভাব খুব বাড়িয়াছে। আগেও হয়ত এই প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু এখন ইহা যেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আগে আর কোনদিন তেমন হয় নাই। আজ নারীরা খোলাখুলিভাবে ঘরে ও বাহিরে কর্তৃত্ব করিতেছে। তারা শুধু সংখ্যায় বেশী নহে, শক্তি-সামর্থ্য এবং প্রাণবত্তায়ও বড়।

নারীর প্রভাব প্রধানতঃ দুই প্রকারে দেখা দিয়াছে। (১) মা, (২) অবিবাহিত বালিকা। বাড়ীতে আজ মায়েরা সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মায়ের প্রিয়পাত্র হইল রোগা ও সুকুমার ছেলেটি। তার জন্য অমুক অমুক পথ্য চাই, অমুক অমুক রূপ ঘর চাই, এই কথা ইংরেজ মা ভাবিতে ভালবাসে। কোন্ স্কুলে তাকে পাঠান হইবে তা নিয়াও তার চিন্তার অন্ত নাই। মেয়েকে হয়ত কোন বোর্ডিং স্কুলে পাঠান হয়, সেখানে সে এখন ফুটবলের পরিবর্ত্তে হকি খেলিতেছে। ছেলেটি যখন বড় হইয়াছে ও কার্য্যোদ্দেশে দূরে গিয়াছে, তখন মা হয়ত বলিয়া বসিবে, "বছর দুই হইল সে ভারতবর্ষে গিয়াছে, এখন সে বাড়ী কিরিয়া কোন কাজকর্ম করুক; তখনো আর সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি?" জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রভাবের ফলে পারিবারিক বন্ধন বাড়িয়াছে ও সময় উত্তীর্ণ হইবার পরও জড়াইয়া রহিয়াছে। অনেক যুবক যাদের সংসারের বাহির হইয়া পড়া উচিত ছিল ও অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করা উচিত ছিল, তারা বাড়ীতে থাকিয়া হয়ত খুব সামান্য উপার্জ্জন করিতেছে। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকের ইচ্ছায় উপনিবেশে বাধা পড়িতেছে।

বাহিরে স্ত্রীলোকের প্রভাব আরও বেশী স্পষ্ট। ইংলণ্ডের যেখানে বালকবালিকাকে একত্র দেখা যাইবে, সেখানেই দেখা যাইবে যে, বালিকা নেতৃত্ব করিতেছে। তার শক্তি-সামর্থ্য ও প্রাণবত্তা যুবকের চেয়ে বেশী। সাঁতারে, নাচে, খেলায় সর্ব্বত্র আজ ইংরেজ নারী জিতিতেছে। মেয়েরা দেখিতেছে, ছেলেদের যে সব কাজকর্ম একচেটিয়া ছিল, তা তারা বেশ ভালভাবে চালাইতে পারিতেছে। সেজন্য আজ তারা প্রশংসা করে ও চায় সেরূপ যুবককে যে তার চেয়ে নিকৃষ্ট। এইরূপে নারীর ইচ্ছায় পুরুষের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

১। "রিসার্চ ইন্ দি সোশ্যাল সায়েন্সেস্ : ইট্স্ ফাণ্ডামেণ্টাল মেথড্স্ অ্যাণ্ড অব্জেক্টিভস্ (সমাজ-বিজ্ঞান লইয়া গবেষণা : গবেষণার আসল প্রণালী ও তদ্বিষয়ে আপত্তিসমূহ)। সম্পাদক ডাব্লিউ পী। নিউ ইয়র্ক, ম্যাকমিলান। ১৯২৯। পৃঃ ১০+৩০৫।

এই কেতাবে নিম্নলিখিত ৯টি রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

(১) সোশিয়োলজি বা সমাজ-তত্ত্ব—আর ই পার্ক।

(২) অর্থশাস্ত্র—এ এ ইয়ং।

(৩) নৃতত্ত্ব—ডক্টর ক্লার্ক হিস্‌লার।

(৪) সংখ্যাবিজ্ঞান—অধ্যাপক আর ই চ্যাডক।

(৫) মনস্তত্ত্ব—অধ্যাপক আর ই উডওয়ার্থ।

(৬) জুরিস্‌প্রুডেন্স বা আইনতত্ত্ব—ডীন পাউণ্ড।

(৭) ইতিহাস—অধ্যাপক এ এম্ শ্লেসিঙ্গার।

(৮) দর্শন—অধ্যাপক জন ডিইবি।

(৯) রাষ্ট্রতত্ত্ব—ডক্টর সি এ বিয়ার্ড।

উপরের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে, অল্প পরিসরের ভিতর কত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সকল প্রকার সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে এই পুস্তকের মূল্য অনেক। ইহা আমাদের দেশের প্রত্যেক কলেজে রাখিবার মত বই।

অধ্যাপক ইয়ং আর্থিক গবেষণা সম্বন্ধে নিম্নপ্রকার মন্তব্য করিয়াছেন। ফেডারেল লোকগণনা রিপোর্টগুলা আমাদের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে যেরূপ অসংখ্য তথ্যপূর্ণ এরূপ আর কোথাও নয়। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক অর্থশাস্ত্রী এগুলি লইয়া কোন প্রকার গবেষণার চেষ্টা করিয়াছেন। আর্থিক সমস্যার সংখ্যা অনেক, কিন্তু কেহ যদি রীতিমত সুপ্রণালীবদ্ধভাবে লেন্‌দেনের মামলা লইয়া কোন বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি যে অনেক মূল্যবান সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে বিউরো অব্ লেন্‌দেনের অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটি (ইহা আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন ও আমেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়) প্রস্তাব করে যে, বিউরো কতকগুলি মনোগ্রাফ প্রকাশ করুক, প্রত্যেকটি একজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত হইবে ও তাহাতে লোকগণনার তথ্য ও তালিকা ব্যাখ্যা করা হইবে। বিউরো এযাবৎ ৭টি মনোগ্রাফ ছাপাইয়াছেন, আরও কতকগুলি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। যে কেহ এগুলিতে চোখ বুলাইবেন তিনিই এগুলির গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন। এই প্রকার পঠন-পাঠনের অনেক অবসর রহিয়াছে, কারণ তথ্য-তালিকা ফুরাইবার কোন আশঙ্কা নাই। দরকার শুধু এই বিষয়ে ধনীর সাহায্যদান। ইয়ংএর মতে আমেরিকানরা লোকবল-সমস্যা লইয়া আলোচনা করে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ইয়ং ব্যাঙ্কিং প্রসঙ্গে ক্রেডিট সম্বন্ধে গবেষণার কথা বলিতেছেন, "ব্যাঙ্কিং ইতিহাসের জন্য অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে ব্যাঙ্কিং আইনগুলা আরও বেশী করিয়া জানা অথবা ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী প্রভাব বুঝা বিশেষ দরকার নয়। তার চেয়ে বেশী দরকার ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম বাস্তবিক কি ভাবে হয় ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্রেডিটের প্রচলন কিরূপ তাহা জানা। ছোট হোক্ বড় হোক্ কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের কয়েক বৎসরের রেকর্ডগুলি খুব মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে অর্থশাস্ত্রের উপর অনেক নূতন আলোকপাত

সম্ভবপর হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই প্রণালীতে অনেক কাজ করা যাইতে পারে।"

লোকবল ও ক্রেডিট গবেষণা সম্বন্ধে ইয়ংএর কথাগুলি আমাদের দেশে আরও বিস্তৃতভাবে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ, আমাদের সেন্সাস রিপোর্টগুলি সর্ব্বথা সন্তোষজনক নহে। দ্বিতীয়তঃ, যা আছে তা লইয়াও আমাদের অধ্যাপক-ছাত্র-মহলে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয় না। বহুর মধ্যেকের ভিতর আবার লোকগণনা হইবার কথা। আমরা এদিকে অর্থশাস্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের দেশে সম্প্রতি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীরভাবে তদন্ত চলিতেছে। কিন্তু বিশেষ কোন ব্যাঙ্ক বা অন্য প্রতিষ্ঠান লইয়া তথ্য-মূলক আলোচনা করিতে আমরা এখনও শিখি নাই। অথচ এই প্রকার বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য ও অঙ্কের রাশি জোগাড় করিতে না পারিলে আর্থিক ভাবের ঘরে কোন প্রকার সম্পদ্ দানের কথা ভাবাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মোটে হাতে খড়ি হইতেছে।

২। "দি ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক" (ফরাসী ফ্রাঙ্ক), ১৯১৪-১৯২৮। ই এল্ ডুপে। নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান। ১৯২৯। পৃঃ ৩৬+৫৭০।

৩। "দি প্রসেস্ অব্ ইন্‌ফ্লেশন ইন্ ফ্রান্স" (ফ্রান্সে কি ভাবে ইন্‌ফ্লেশন বা ফাঁপ হইয়াছিল), ১৯১৪-১৯২৭। জেম্‌স এইচ্ রোজার্স। নিউইয়র্ক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। ১৯২৯। পৃ ১০+৩৭৮। ৪ ডলার।

উভয় কেতাবেই ফরাসী ফ্রাঙ্কের কয়েক বৎসরের ইতিবৃত্ত আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু দুয়ের ধারা বিভিন্ন। প্রথম পুস্তকখানি সহজভাবে লিখিত। দ্বিতীয়খানি বেশ একটু বুঝিয়া পড়া দরকার।

কেতাব নং ১এর চারিটি প্রধান অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে: (১) ডিপ্রিসিয়েশন বা 'হঠকারে'র অর্থ; (২) ডিপ্রিসিয়েশনের ইতিহাস। ইহা ৪টি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; (৩) ডিপ্রিসিয়েশনের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও ব্যাঙ্ক কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিফল হইয়াছিলেন, সিক্কার আস্তর ও বাহ্য ডিপ্রিসিয়েশন, দরের উপর প্রভাব, জাতীয় ঋণভারের অবস্থা ও বিনিময়, ডিপ্রিসিয়েশনের উপর তার প্রভাব আলোচিত হইয়াছে; (৪) দিক ফেলিবার বিভিন্ন প্রকাশসমূহ।

আসলে কেতাবখানির বিষয় দুইটি মাত্র। মিস্ ডুপে'র এই পুস্তকখানির ভূমিকায় স্বর্গীয় অ্যালিন এ ইয়ং ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁর কথা এই, "প্রথমতঃ এটা একটা ইতিহাস। এতে বর্ত্তমান ফ্রান্সের বর্ত্তমান ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনার—অনেকগুলি ঘটনার—হিসাব পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, এটা আর্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এক রচনাবিশেষ।"

ইতিহাস ভাগটা খুব নিখুঁতভাবে লিখিত হইলেও ইহাতে এমন কোন কথা নাই, যা সকলে মানে না। বিষয়টা বেশ চিত্তাকর্ষক ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজান হইয়াছে, এই মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগটা অর্থাৎ আর্থিক তত্ত্বের অংশটা বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। বিভিন্ন আর্থিক তত্ত্বগুলিকে দলিল দস্তাবেজ-জাত প্রমাণের মধ্যে ফেলিয়াই যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। মুদ্রার পরিমাণ-তত্ত্ব ও ক্রয়-ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব উভয়কেই খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। লেখিকার মতে এই দুই তত্ত্ব বিভিন্ন প্রবক্তার কর্তৃক যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে তার কোনটাই ফ্রান্সের বেলায় খাপ খায় না। ১৯১৪ হইতে ১৯২৮ সন অবধি দরের উঠানামা, ফ্রান্সে ক্রেডিটের পরিমাণ, বিনিময়ের পরিমাণ বুঝিতে হইলে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়, তা তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। ফটকা, এবং বিনিময়ের উঠানামার উপর ফটকার প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। তাতে বিনিময়ের উঠানামা শুধু নয়, দরের গতিও বুঝা সহজ হইয়াছে।

কেতাবখানি সর্ব্বত্র যুক্তিপূর্ণ ও সুলিখিত। এই পুস্তকখানি হাতে করিলে বুঝা যাইবে, আমেরিকার অর্থশাস্ত্র কিরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। একটা জটিল বিষয়কে সহজ অস্তি করিয়া বুঝান হইয়াছে। তাও করিয়াছেন একজন স্ত্রীলোক। আর আমাদের দেশের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকেরা আজও ঘুমাইতেছেন। মাতৃভাষায় তাঁদের

চিন্তারাশি আজও দেখা দেয় নাই। কাজেই দেখা দিলে কি আকার ধারণ করিবে কেহ বলিতে পারে না।

১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায় নিউইয়র্কস্থিত ব্যাঙ্কারস ট্রাষ্ট কোম্পানীর ডিরেক্টর ই ডিস্‌ক উইগর রোজার্স লিখিত দ্বিতীয় পুস্তক খানির এক সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁর কথার ভিতর দিয়া কেতাব খানিকে বুঝা যাইবে।

ইন্‌ফ্লেশন বা ফাঁপ কাকে বলে? উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন "বেশী খরচ করা হেতু জিনিষের দর চড়িয়া যায় অথচ ক্রয় করিবার জিনিষের পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না এমন অবস্থাকে ফাঁপ বলা চলে" অন্যত্র তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন, "ফাঁপের যথোচিত সংজ্ঞা কোথাও দেওয়া হয় নাই; কিন্তু দর, চলন, বিনিময়ের হার প্রভৃতির প্রসারকে বুঝাইবার জন্যই ঐ কথা ব্যবহার করা যাইতে পারে।" এখানে তিনি দর, চলন ও বিনিময়-হারকে "বিভিন্ন স্তরের ফাঁপের মান" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; নচেৎ তাঁকে ভ্রমে পড়িতে হইত।

ডিস্‌ক বলেন রোজার্স ফাঁপের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তা ঠিক হয় নাই, তথাপি ১৯১৪ সন হইতে ফ্রান্সের প্রকৃত অবস্থা তিনি বেশ নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বেশী বেশী কেনা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের বেশী অর্থব্যয়, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোকের বেশী খরচ অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিক্রেয় দ্রব্যের পরিমাণ তদনুপাতে না বাড়া—এইগুলির মধ্যে ফাঁপের হেতু খুঁজিতে হইবে। কথা হইতেছে এই যে, টানে যদি বৃদ্ধি হয়, অথচ যোগানে অনুরূপ বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দর চড়িয়া গেলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু ইহাকে কি ফাঁপ বলে? ডিস্‌ক বলেন ইহা ফাঁপ নয়।

গ্রন্থকার ফরাসী ব্যাঙ্কি-প্রথা ও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথাটা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ফ্রান্সের সরকারী ঋণ সম্বন্ধে ও এই ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ফলে দরের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কতকগুলি পরিচ্ছেদে খুব শক্ত টেক্‌নিকাল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এগুলি দর বিনিময় ও ক্রেডিট গঠনের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যাঁরা চর্চ্চা করেন তাঁদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। ডিসারের বিনিময় সমীকরণ ও কেইনসের আর্থিক সমীকরণকে ভিত্তি করিয়া খুঁটিগত বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে, আপন রাজস্ব সীমার বাহিরে খরচ মিটাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া যদি ঋণ করিতে হয়, তবে ফাঁপের ভিত্তি তৈরী করা হয়। অধিকাংশ অর্থ-শাস্ত্রী এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন। যে আকারে ঋণ গ্রহণ হয় সেই আকার দ্বারা ফাঁপের প্রভাবও নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্যাঙ্ক ঋণের ফলে আমানত বাড়ে এবং গভর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইলে সাধারণতঃ নোটের পরিমাণ বাড়ে। যদি তার ফলে দ্রব্যাদির উৎপাদন তাড়াতাড়ি ও যথেষ্ট পরিমাণে না বাড়ে, তবে ফাঁপ অনিবার্য্য।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে দর, চলন ও বিনিময় হারের গতি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার পর দেখা গিয়াছে যে, চলার বিনিময় হারের ও পাইকারী দরের গতির ভিতর খুব নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সে গৃহস্থালী দ্রব্যাদির দরের গতি চলার বিনিময় হারের পশ্চাতে বলিয়া মনে হয়। ডক্টর রোজার্স ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই: পরিবর্ত্তনশীল বিনিময়-হার ফ্রাঁর আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের সহিত দরের খাপ খাওয়াইয়া দিতেছিল। চলনের বহু সময় ব্যাপিয়া দরের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার কারণ তিনি এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন: নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার অনেক সপ্তাহ বা মাস পূর্ব্বে জিনিষের কেনা বেচা হয়। ক্রয়কালে বাজারের অবস্থা যেরূপ থাকে তার উপর দর নির্ভর করে, কিন্তু মাল ডেলিভারি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রেতাকে মূল্যশোধের সামর্থ্য দান করিবার জন্য বেশী ক্রেডিট সুগমতা দরকার হয় না; ক্রেতা গভর্ণমেণ্ট হইলেও কিছু সময় মাঝে থাকে।

দরের উত্থানই হোক্ আর পতনই হোক্ সকল সময়ে দরের যতখানি পরিবর্ত্তন হয়, চলতি মুদ্রার পরিমাণে তার চেয়ে ঢের কম পরিবর্ত্তন হয় এবং দরের উঠানামা যত তাড়াতাড়ি হয়, মুদ্রা-চলনের সঙ্গে দরের অনুপাতেও তত বেশী বিকার ঘটে।

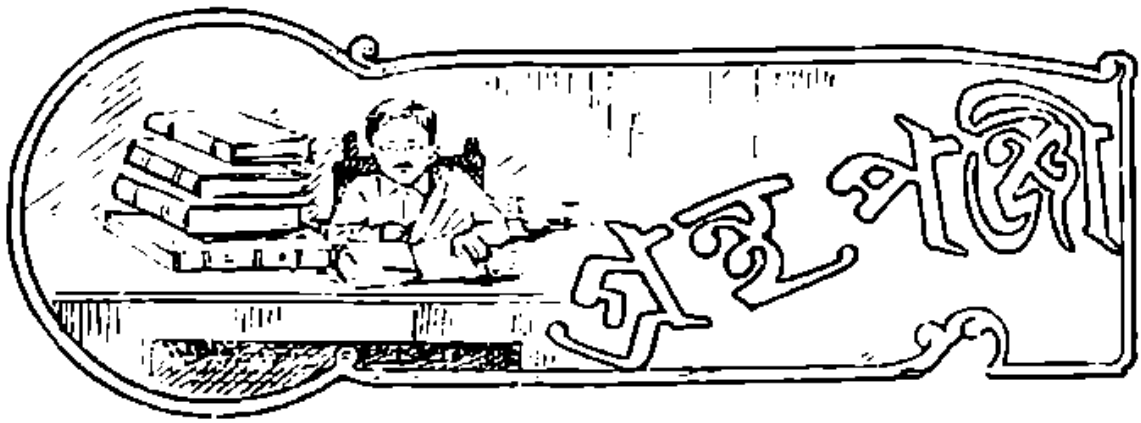

১। "দি গ্রোথ অব্ ফিলসফিক র‍্যাডিক্যালিজম" (দার্শনিক বিপ্লব-তত্ত্বের জন্ম) এলি হালেভি। অনুবাদক মেরি মরিস্। নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান। ১৯২৮। পৃঃ ১৭+৫৫৪। ৮·৫০ ডলার।

২। "দি ইন্ডাস্ট্রীয়াল রিভলিউশন, ১৭৫০-১৮৫০। অ্যান ইন্ট্রোডাক্টরি এসে" (শিল্প বিপ্লব ১৭৫০-১৮৫০। গোড়ার কথা) এইচ এল বিবেস্। নিউইয়র্ক ও লণ্ডন লংম্যান্স্ অ্যাণ্ড গ্রীন। ১৯২৮। পৃঃ ৮+৯০। ·৭৫ ডলার।

৩। "বোডার্নে ইন্ডাস্ট্রীয়েল ইম্ ট্রোপিশেন আফ্রিকা। আইনে হিস্টরিশাকটস্ জিওগ্রাফিশে ইুডি" (গ্রীষ্ম আফ্রিকার বর্ত্তমান ব্যবসাবাণিজ্য। ভৌগোলিক বিশ্লেষণ) এইচ্ মুইনেক-মিনি। লাইপৎসিগ্ ও বার্লিন টাবনের। ১৯২৮। পৃঃ ৫+১০৩। ৫·৬০ মেট মার্ক।

৪। "ফ্যাক্টরস্ অব্ ইকনমিক জিওগ্রাফি" (আর্থিক ভূগোলের মাল-মসলা) জেড্ সি ট্রেপ্লস্ ও জি এম ইয়র্ক। সিনসিনাটী সাউথ ওয়েষ্টার্ণ পাব-কো। ১৯২৮। পৃঃ ৫৯৮। ১·৭৫ ডলার।

৫। "ইন্ডাস্ট্রীয়াল জিওগ্রাফি: প্রডাকশন মাানুফ্যাক-চার, কমার্স" (শিল্প-ভূগোল: উৎপাদন, নির্ম্মাণ ও বাণিজ্য) আর এইচ হুইটবেক্। নিউইয়র্ক ও সিনসিনাটি আমেরিকান বুক-কো। ১৯২৯। পৃঃ ৬০৮।

৬। "পেট্রোলিয়াম অ্যাণ্ড কোল: দি কী টু ফিউচার" (পেট্রোলিয়াম ও কয়লা: ভবিষ্যতের চাবি) ডব্লিউ টি টদ। প্রিন্সটন, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। ১৯২৯। পৃঃ ১৮+২২০। ২·৫০।

৭। "দি কো-অপারেটিভ প্যাটার্ণ ইন্ কটন" (তুলার সমবায় নমুনা) রবার্ট এইচ মন্টগোমারি। নিউইয়র্ক ও ম্যাকমিলান। ১৯২৯। পৃঃ ১৮+৩৩৫। ২·৫০ ডলার।

৮। "কো-অপারেশন ইন এগ্রিকালচার" (কৃষিতে সমবায়) এইচ সি ফিলে। নিউইয়র্ক, উইলে। ১৯২৯। পৃঃ ১১+৪৬৮। ৪ ডলার।

৯। "আওয়ার ওয়ার্লড ট্রেড ইন্ ১৯২৮: ভ্যালু অ্যাণ্ড ভল্যুম অব্ প্রিন্সিপাল এক্সপোর্টস অ্যাণ্ড ইম্পোর্টস বিটুইন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স অ্যাণ্ড টীন ফরেন মার্কেট্স" (আমাদের বিশ্ববাণিজ্য ১৯২৮: অন্যান্য প্রধান দেশের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান আমদানি রপ্তানির দাম ও পরিমাণ) ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের চেম্বার অব্ কমার্স। ১৯২৯। পৃঃ ৩১।

১০। "কমোডিটি এক্সচেঞ্জেস্" (পণ্য-বিনিময়) জে আর বেয়ার ও জি পি উল্ফ। নিউইয়র্ক, হার্পার। ১৯২৯। পৃঃ ১২+৩১৯। ৪ ডলার।

নারী ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

শ্রীসুষমা সেনগুপ্তা, এম, এ

স্বাধীনতা জিনিষটা পুরোপুরি থাকতে হলে দুটো জিনিষের একান্ত প্রয়োজন,—এক হল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র এক শান্তিরক্ষা ছাড়া কোন বিষয়েই হাত দিত না। তখনকার দিনে এক রাজধানী কি বড় বড় নগর ছাড়া সুদূর পল্লীগ্রামে রাজার শাসন বড় একটা পৌঁছত না। তাতে রাষ্ট্রাধিকার না পেয়েও লোকে যার যার কর্মক্ষেত্রে কতকটা পরিমাণে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারত। কিন্তু রাজার শাসন প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাছে না পৌঁছলেও রাজা ইচ্ছা করলেই তাদের সে স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিতে পারতেন। সেইখানে তাদের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে রাষ্ট্রও ততই ব্যাপক হয়ে উঠছে এবং মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছে। মানুষ এখন দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া পরা বেড়ান সব কিছুর মধ্যেই রাষ্ট্রের অধিকারের স্পর্শ অনুভব করছে। কাজেই যে বিরাট যন্ত্র প্রত্যহ গভীরভাবে তার জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করছে, তার চালনায় হাত না থাকলে মানুষের জীবনের স্বাধীনতা-বোধ কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই রাষ্ট্রযন্ত্র চালনার ভার যাতে প্রত্যেকের হাতে থাকে তার উপায় বের করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শাসন-প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, তার খুটিনাটি আলোচনা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

দ্বিতীয় কথা হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে থাকতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দরকার। যেখানে একজনকে তার সব রকম আবশ্যকীয় জিনিষের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, সেখানে কখনো সমতা বোধ হতে পারে না, যে নির্ভর করে তারো মনে হয় না, যার উপর নির্ভর করে তার ত হয়ই না। এ জিনিষটা যে কি সেটা বোধ হয় অনেকেই নিজের জীবনে অনুভব করেন। ছেলে যখন বড় হয়ে উঠে, যখন তার মধ্যে আত্মিক-বোধ জাগে কিন্তু স্বাবলম্বনের ক্ষমতা হয় না, তখন প্রায়ই তার বাপের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে। সেই রকম স্বামি-স্ত্রী সম্পর্কেও; স্ত্রীর গৃহস্থালী সম্পর্কে যতই স্বাধীনতা থাক না কেন, স্বামীর যে একটু উচ্ছন্ন সে কথা স্বামীর মন থেকেও যায় না স্ত্রীর মন থেকেও যায় না। মেয়েদের মনের এই যে ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স (নীচত্ব বোধ) এটা দূর করবার জন্যও মেয়েদের কিছু রোজগার করা দরকার। অবশ্য একথা ঠিক, শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেই যে যুগ-যুগান্তের পুরুষের প্রাধান্য একদিনে কমে যাবে তা নয়; কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সমতা আনবার পক্ষে এটা একটা প্রধান উপায়। কিন্তু নারীর সম্পর্কে আর্থিক স্বাধীনতার কথা উঠলেই এমন কতকগুলো জটিল প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, যাতে হয়ত সমাজকেই প্রায় ভেঙ্গে গড়ে তোলবার দরকার হয়ে পড়ে, আর উপস্থিত কতগুলো চলিত আদর্শও ভাল করে বানিয়ে নেওয়ার দরকার হতে পারে।

আমাদের সমাজের এখনকার যা বিধি-ব্যবস্থা তাতে পুরুষেরা রোজগার করে নিয়ে আসে, মেয়েরা ঘরের সকলের খাওয়া পরা, শোওয়া বসা ইত্যাদি যাতে আরামে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করে ও সন্তান পালন করে। মেয়েরা যদি বাইরে যায় কাজ করতে, তবে ঘরের যে কাজগুলো তারা করে সেগুলোর কি উপায় হবে? এখনকার ব্যবস্থার ঠিক উল্টো হলে অর্থাৎ মেয়েদের কাজ পুরুষেরা এবং পুরুষদের কাজ মেয়েরা করলে এ অবস্থায় প্রতীকার হবে না। এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করা দরকার, যাতে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা এবং ছেলেরা উভয়েই কাজ করবে, অথচ তাতে সন্ততির অবহেলা ও হবে না এবং মানুষের খাওয়া পরাটাও ঠিকমত চলবে। অনেকে আছেন, যাঁরা

এমন ব্যবস্থার কথা শুনলে চমকে উঠবেন। ভেবেরা যাবেন কাজ করতে অন্য কারো হাতে সন্তানের ভার দিয়ে! এটা তাঁদের পক্ষে একটা অভাবনীয় প্রস্তাব। তাঁদের সমালোচনা শুনে মনে হয় যে, এখনকার সমাজের ব্যবস্থাটাই যেন মানুষের সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসছে।

যখন প্রথম এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হল তখন পুরুষ বুঝেছিল যে, তাকে বাইরে যেতে হবে অন্নসংগ্রহের জন্য। তখন তার মনে ছিল যে, শুধু অন্ন সংগ্রহ করলে চলবে না, সেটা প্রস্তুত করার ও অন্যান্য পারীরিক আরামেরও দরকার। সেজন্য কর্মবিভাগের সময় তাঁরা নারীর হাতে অচ্ছন্দে সে ভার ন্যস্ত করতে দ্বিধা বোধ করে নি; নারীও নির্দ্বিবাদে সে ভার গ্রহণ করে এতদিন চালিয়ে এসেছে। আজ নারীর মনে আত্মচেতনা জেগেছে, সে বুঝেছে যে, কেবল অন্ন প্রস্তুত এবং মুটিমেয় পরিজনের সব রকম আরামের ব্যবস্থার মধ্যেই মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ নেই। আত্মার ক্ষুধা নারী মেটাতে চায়, সে চায় জ্ঞান, সে চায় আনন্দ, তার আত্মা চায় মুক্তি। এ মুক্তির জন্য তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, চাল ডাল, তেল নুন, হাতা খুন্তির প্রাচীরের বাইরে, আত্মীয়-পরিজনের কটু সমালোচনা-মিশ্রিত বিদ্বেষ-দৃষ্টির বাইরে। যে রাষ্ট্রের ও সমাজের সে অন্ন তাকে তারও একটা কিছু বিশিষ্ট দান করবার আছে। রাষ্ট্রের সভ্যকারের একটা প্রাণবান জ্ঞানবান অঙ্গ যদি সে হতে চায়, তবে তার মস্তিষ্কেরও একটি অংশ দিতে হবে রাষ্ট্রচালনায়, তার পরিশ্রমের একটি অংশ দিতে হবে রাষ্ট্রের সম্পদ-উৎপাদনে।

সে যে একটী পরিপূর্ণ মানুষ এটা তার বুঝতে হবে। নিজের ভার তার নিজের মাথায় তুলে নিতে হবে। অহিংসসংসারের সকল সংগ্রাম সকল কলাঘাতের বাইরে নিভৃত ঘরের কোণে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় থেকে সব শুরুতর দায়িত্বের ভার পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, তার সঙ্গে সমান আসনের দাবী করলে, সে দাবী কোনদিনই গ্রাহ্য হবে না।

মানব-সমাজে তার মনুষ্যত্বের এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজের চিরাচরিত প্রথাগুলোকেও সঙ্গে সঙ্গে একটু বদলে নেওয়া দরকার। একথা সত্য যে, যদি ঠিক এখনকার ব্যবস্থাই থাকে—গৃহস্থালী খুঁটিনাটির সমস্ত ভার, সন্তান-পালনের সমস্ত ভার যদি নারীর ঘাড়েই থাকে—তবে তার পক্ষে অন্য কিছু করা একপ্রকার অসম্ভব। অবসর হয়ত তার হয়, কিন্তু শুধু বাইরে বের হওয়া তার হয়ে ওঠে না। এজন্য দরকার সমগ্র সমাজের এগিয়ে এসে নারীকে সাহায্য করা।

এখন দেখা যাক্ কি ভাবে তাকে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে। প্রথমতঃ, নারীর একটা প্রধান কাজ যত শীঘ্র ছেলেপিলে আসা। এজন্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে নার্সারি স্কুল (যেখানে কচি শিশুদের ভার নেওয়া হয়), কিণ্ডার গার্টেন (যেখানে ৩।৪ হইতে ৮।৯ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের ভার নেওয়া হয়) প্রভৃতি থাকে, যেখানে মাতা নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সন্তানকে রেখে কার্য্যক্ষেত্রে যেতে পারেন, এবং সন্তানকে অষ্টপ্রহর আগলে রাখবার দায়িত্ব থেকে মা মুক্তি পান। সব সময় মায়ের স্নেহদৃষ্টির মধ্যে থাকলেই যে ছেলেপিলের মঙ্গল হয় এমন কোন কথা নেই। যে মা শিশু-পুত্রকে সেট ভরে দুধ খাওয়াতে পারে না, সে যদি কোথাও কাজ করে তার পুত্রের দুধের যোগাড় করতে পারে এবং সেই সঙ্গে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে সন্তানের যত্নের ত্রুটি হচ্ছে না, তবে সেটা কি খুবই কাম্য নয়? তা ছাড়া এই সমস্ত স্কুলে যে সব নার্স বা শিক্ষয়িত্রী থাকবেন, তাঁরা হবেন এই সব বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিতা। মায়ের শুভেচ্ছা সন্তানকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকলেও শুধু সেই ইচ্ছাটুকু দিয়েই সন্তানের শুভ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

নারীর দ্বিতীয় কাজ গৃহস্থিত সকলের খাওয়া দাওয়া দেখা শোনা করা। আমাদের দেশে এখন যা অবস্থা তাতে অনেকেই বাইরে খাবার কথা ভাবতেই পারেন না। বাস্তবিক সকলের ব্যবহারোপযোগী যথেষ্ট পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর হোটেল আমাদের দেশে নেই বলেই লোকের বাইরে খেতে রুচি হয়না (ছোঁয়াছুঁয়ির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম)। কিন্তু ভাল খাবার জায়গা খোলা একটা চেষ্টার অসাধ্য ব্যাপার নয়। পাশ্চাত্য দেশের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। সকলের চেষ্টা ও উৎসাহে

সস্তায় যেই ধরণের ভাল খাবার পাওয়া যায় এমন হোটেলের সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। এই রকমে ক্রমে নারীর যে কাজ এখন তার সঙ্কীর্ণ গৃহস্থালীর মধ্যে আবদ্ধ, জনসমাজ এগিয়ে এসে তার সেই নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। এই রূপে যে কাজ এখন এক একজনে বার বার নিজের জন্য করছে, সকলে মিলে সমবেতভাবে করলে তাতে সকলেরই লাভ হয়, জিনিষটাও ভালভাবে সম্পন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে জেগে ওঠবার সুবিধা পায়। নারী যে শুধু অর্থ উপার্জ্জন করতে, দেশের সম্পদ-উৎপাদনে সাহায্য করতে বা পরিবারের সাহায্য করতে পারে তা নয়, সংসারের কাজে যদি ২৪ ঘণ্টা আটক না থাকতে হয় তবে সে তার মনের অনেক উচ্চ বৃত্তির উন্নতিসাধন করতে পারে।

এই ব্যবস্থায় যে শুধু মেয়েদেরই সুবিধা তা নয়। পুরুষদেরও যথেষ্ট সুবিধা। প্রথমতঃ, একার ঘাড়ে পরিবার-প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করা থেকে সে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়তঃ, তার জীবন-সঙ্গিনী নারী একটা অর্দ্ধ-চেতন, জড়পিণ্ডমাত্র না হয়ে তার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, সুখে দুঃখে তার প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ নারীকে তার ঘাড়ের বোঝার মত চির-জীবন বয়ে বেড়াবার দরকার হবে না। পুরুষের উন্নতির পথে সে একটা অনাবশ্যক বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ পরস্পরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই রকম স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারলে নারীও নিজের মূল্য বুঝতে পারবে, সমাজ আর তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। শত অত্যাচার, শত নিষ্পেষণেও তার একমাত্র অবলম্বন পুরুষের আশ্রয়কে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে থাকবার দরকার হবে না। তার বন্ধ আত্মা পাবে মুক্তি, জোর করে তাকে আটকে রাখা চলবে না।

অবশ্য একথা ঠিক যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে পেছনে চাই সহানুভূতি-সম্পন্ন রাজশক্তি। আমাদের তা নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের নিজেদেরও প্রস্তুত হতে হবে, মনকে সংস্কার-মুক্ত করতে হবে, ভাবতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যানুসারে আপনাপন শক্তি যতটা সম্ভব কর্ম্মে নিয়োজিত করতে হবে।

শ্রমিক-সমস্যা

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু, এম, এ, বি, এল

আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলন

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়; কিন্তু ইতি মধ্যেই এই আন্দোলন এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে ইহা প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনের সকল সমস্যাকেই পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিবে। পাশ্চাত্য দেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই শ্রমিক-আন্দোলন বেশ সুসংবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠে এবং ঐ শতাব্দী শেষ হইতে না হইতেই ইহা দেশের ও জাতির গণ্ডী ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীতেই আপনার প্রভাব বিস্তার করে। ভারতও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত রহে নাই; ভারতের শ্রমিকও এই বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে আপনার স্থান বাছিয়া লইয়াছে। তবে ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন।

এই আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রমিকদিগের কার্য্যের সময়, অবসর, ক্ষতিপূরণ, স্ত্রী ও শিশু

শ্রমিকদিগের কার্য্য-পদ্ধতি, কারখানা প্রভৃতিতে দুর্ঘটনা নিবারণের উপায়-উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করা এবং যাহাতে সেই আইন সকল দেশে প্রচলিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা।

সর্ব্বপ্রথম এই উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৮১ সনে সুইস গভর্ণমেণ্ট কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে ১৮৯০ সনে ফলিগা বাধে ইউরোপের অপর চৌদ্দটী দেশ সুইস গভর্ণমেণ্টের আর এক আমন্ত্রণে বার্লিনে মিলিত হয়। তৎপর ১৮৯১ সনে জুরিকে এবং ব্রুসেল্‌সে ঐরূপ সম্মেলন হয়। পরে ১৯০০ সনে প্যারিসে এক শ্রমিক আইন সমিতি (এসোসিয়েশন ফর লেবার লেজিস্‌লেশন) গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে আইন দ্বারা শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা এবং ইহা বর্ত্তমানে ২২টী বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য লাভ করে। ইহা বাসেলে ১৯০১ সনে, কলোনে ১৯০২ সনে পুনরায় বাসেলে ১৯০৪ সনে বৈঠক করে, এবং ১৯০৫ সনে বার্ণ নগরে সুইস গভর্ণমেণ্টকে দিয়া আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিল। এই সম্মেলনে সাদা গন্ধকের দিয়াসলাই ব্যবহার ও রাত্রিকালে স্ত্রী-মজুর খাটানো নিষেধ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। ১৯০৬ সনে বার্ণে এই আইন দুইটী সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মানিয়া লওয়া হয় এবং ১৯১৯ সনে ওয়াশিংটনে জাতি-সঙ্ঘের অধীনে যে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের অধিবেশন হয়, তাহাতেও ঐ আইন দুইটী স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

১৯০৮ সনে লুসার্ণে উক্ত শ্রমিক সমিতির এক অধিবেশনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র লইয়া ১৭টী দেশ যোগদান করে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়, যথা—অল্পবয়স্ক মজুরদের রাত্রিতে কাজ, গৃহের কাজ, বৈদেশিক মজুরদের জীবন-বীমা, এবং অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার, আইন দ্বারা মজুরীর সময় নির্দ্দেশ, শিশু-মজুরদের কার্য্য-নির্দ্দেশ, এবং শ্রমিক আইন কার্য্যে পরিণত করা। ১৯১০ সনে লুগানোয় ও ১৯১৪ সনে জুরিকে ঐ সমিতির অধিবেশনের ফলে ১৯১৩ সনে বার্ণ নগরে সহকারী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের এক অধিবেশন হয়। তাহাতে ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক মজুরদের রাত্রিতে কাজ নিষিদ্ধ করা এবং স্ত্রী-মজুর ও শিশু-মজুরদের কাজ ১০ ঘণ্টার অনধিক করা সম্বন্ধে আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। ঐ আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য ১৯১৪ সনে একটী অধিবেশনের সময়ও হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় ইহা কার্য্যে পরিণত হয় না। যুদ্ধের পর ঐ খসড়া ওয়াশিংটন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘে পেশ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী যাহাতে কাজ না করিতে হয় সেই জন্য যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সমস্ত সমিতি ও সঙ্ঘ কেবল নামেই শ্রমিক-সমিতি ছিল। শ্রমিকের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ইহাদের খুব কমই ছিল। যুদ্ধের সময় হইতেই শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের কার্য্যপদ্ধতির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় মালমশলার এত চাহিদা হয় যে, শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-মজুর নয়, স্ত্রী ও অল্প বয়স্ক শিশু-মজুরদিগকেও বহুক্ষণ-ব্যাপী পরিশ্রম করিতে হয়। রাত্রে এবং রবিবারে কাজ করা সম্বন্ধে বার্ণ সম্মেলনে ১৯০৬ সনে যে মত দাখাস্ত হইয়াছিল, তাহা তখন আর কেহ মানিয়া চলা প্রয়োজন মনে করিত না, এবং যাহাতে যুদ্ধের উপকরণাদি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে, শ্রমিক সমিতির সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এইভাবে ক্রমশঃ ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি শ্রমিক-সঙ্ঘ দেশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রণা-সভাতে পর্য্যন্ত স্থান পায়। এইরূপ অবস্থা শুধু গ্রেটব্রিটেনে হয় নাই—সকল দেশেই সরকার শ্রমিকের প্রাধান্য স্বীকার করে। ইহার ফলে ১৯১৭ সনে পুনরায় বার্ণ নগরে এক সম্মেলন হয় এবং তাহাতে স্থির হয় যে, যুদ্ধের শেষে যখন শান্তি-স্থাপনের জন্য সন্ধি হইবে তখন সেই সন্ধিতে সকল দেশের শ্রমিকদের স্বার্থ-সংরক্ষণ-বিষয়ক আইনের ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। এই প্রস্তাব শত্রু-মিত্র সকল দেশের শ্রমিকদের প্রতিনিধিই একবাক্যে সমর্থন করে। বলা বাহুল্য, এই সময় যুদ্ধ শান্ত হয় নাই।

১৯১৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ শ্রমিক সম্মেলন

যুদ্ধের পর কি করা উচিত সেই বিষয়ে এক মত প্রচার করে। সেইমত আমরা লয়েড জর্জ্জ ও প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৯১৮ সনের প্রসিদ্ধ বক্তৃতাগুলিতে প্রতিধ্বনিত দেখিতে পাই। এবং এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, এই বক্তৃতার সারমর্ম্মই বিগত যুদ্ধের সন্ধির বিখ্যাত চৌদ্দটী সূত্রে সন্নিবেশিত আছে। যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯১৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে যে মিত্রজাতি-সঙ্ঘের শ্রমিক সম্মেলন হয়, তাহাতে এই প্রস্তাব হয় যে, সন্ধির মন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গেই একটী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৯১৮ সনের নভেম্বর মাসে জার্ম্মাণির সহিত যুদ্ধ স্থগিত হয়, এবং ১৯১৯ সনের ১৮ই জানুয়ারী প্যারিসে যে শান্তি সভা বসে তাহাতে যে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়, তাহা মোটামুটি এই :—

লিগ অব্ নেশনস্ বা জাতি সঙ্ঘের অধীনে এবং তাহার সহিত একযোগে শ্রমিকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে সন্ধান লইবার জন্য এবং আন্তর্জ্জাতিকভাবে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হউক। সেই কমিশনে পাঁচটী প্রধান শক্তির পক্ষ হইতে দু'জন করিয়া এবং শান্তিসভায় যে যে জাতিসমূহ উপস্থিত আছে, তাহাদের পক্ষ হইতে পাঁচটী সদস্য থাকিবেন।

১৯১৯ সনের ৩১শে জানুয়ারীই এই কমিশন নিযুক্ত হয়। ইহাতে বুঝা যায় শ্রমিক-সমস্যা তখনই কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। কমিশনের সর্ব্বসুদ্ধ ৩৩টী বৈঠক হয় এবং ১৯১৯ সনের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে দুইটি অংশে ইহার কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়। প্রথম অংশে প্রস্তাব করা হয় যে, শ্রমিক সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক আইন প্রণয়ন করিবার জন্য একটি স্থায়ী সমিতি থাকিবে। দ্বিতীয় অংশে ছিল শ্রমিক সম্বন্ধে যে সকল মূলনীতি কমিশন কর্ত্তৃক সন্ধির সর্ত্তে সন্নিবেশ করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা। প্রথম অংশের প্রস্তাব-অনুযায়ী স্থায়ী সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগে ২৪টি সভ্য থাকিবার কথা হয়; এবং যদিও সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে একজন সভ্য থাকিবে স্থির হয়, তথাপি অন্যান্য উপনিবেশের মত ভারতবর্ষেরও একটা পৃথক অস্তিত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার করা হয়। যাহা হউক অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর এই ব্যবস্থা সন্ধির সর্ত্তে দেওয়া হয় নাই।

১৯১৯ সনের ১১ই এপ্রিল এই কমিশনের রিপোর্ট শান্তিসভায় পেশ করা হয়। এই সভায় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য যেসব দেশে শ্রমিকের অবস্থা পাশ্চাত্য দেশের অনুযায়ী নয় তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংশোধিত প্রস্তাব স্বীকৃত হয় :—

"সাধারণভাবে প্রয়োজ্য আইন প্রণয়ন করিবার সময় এই সভা, যে সকল দেশের শিল্পের অবস্থা দেশের জলবায়ুর জন্য বা অপেক্ষিত উন্নতির অভাবে, অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পৃথক, সেই সকল দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন এবং সেইরূপ অবস্থার অনুযায়ী আইনের সংশোধন করিবেন।"

এই প্রস্তাব ভারতের পক্ষ হইতে লর্ড সিংহ স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু বিকানীরের মহারাজা বলেন যে, বৃটিশ ভারতের জন্য তৈয়ারী কোন আইন দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত হইবে না।

স্থায়ী সমিতির গঠন সম্বন্ধে পরিশেষে স্থির হয় যে, ইহা জাতি-সঙ্ঘের অনুযায়ী হইবে। রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে শ্রমিকদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব হয়, তাহা অনেক বাদানুবাদের পর শান্তিসভা কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের সহিত মূল সন্ধি সর্ত্তের মধ্যেই সন্নিবেশিত হয় এবং ১৯১৯ সনের ২৮শে জুন জার্ম্মাণি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। ইহা ছাড়া শ্রমিক সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

"জাতি-সঙ্ঘের সভ্যগণ নিজ নিজ দেশে, এবং যে সকল দেশের সহিত তাহাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক আছে তাহাতে, পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু শ্রমিকদিগের জন্য ন্যায্য এবং সুবিধা-জনক ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিবেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আন্তর্জ্জাতিক সমিতি গঠন করিবেন।"

মোটের উপর ১৯১৯ সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে শান্তি-সভা কর্ত্তৃক শ্রমিক সমিতির যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে এই স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে একটি আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতি গঠিত হইবে। জাতি-সঙ্ঘের সভ্যগণ (অর্থাৎ এক একটি দেশ) ইহার সভ্য হইবেন এবং ইহা জাতি-সঙ্ঘেরই

একটি বিশেষ অঙ্গ হইবে। ইহার দুইটী বিভাগ থাকিবে, একটী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন এবং অপরটী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তর (ইণ্টার ন্যাশনাল লেবর কনফারেন্স এও ইণ্টারন্যাশানাল লেবর অফিস)। এই সম্মেলনে প্রত্যেক দেশের পক্ষ হইতে ৪ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে গ্রেটব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ, নিউজিলাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা—ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক প্রতিনিধি থাকিবেন। সভার প্রস্তাবানুযায়ী ১৯১৯ সনের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটন নগরে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়।

কলিকাতা বন্দর ও কিং জর্জ্জেস ডক্ *

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল্

মহাসমারোহে "কিং জর্জ্জেস ডক"এর উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত সাড়ে আট কোটি টাকা, বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষের তের বৎসরব্যাপী মানসিক উদ্বেগ ও বার হাজার লোকের আট বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে। জনসাধারণ চমকিত চিত্তে শুনিয়াছে যে, এই ডকের কেরামতিতে কলিকাতা বন্দর নাকি প্রাচ্যের সর্ব্বপ্রধান বন্দর কয়টীর মধ্যে অন্যতম স্থান লাভ করিবে। সম্প্রতি লিভারপুলে যে "গ্লাডষ্টোন ডক" নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহাও এই ডকের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিং জর্জ্জেস ডকের মধ্যস্থ জলভাগের পরিধি গ্লাডষ্টোন ডকের মধ্যস্থ জলভাগের শতকরা চল্লিশ ভাগ বেশী। এই ডক গঠনের ফলে সমগ্র বন্দরের মধ্যে কলিকাতা বন্দরের নাম উল্লেখ করা যাইবে; পৃথিবীর বৃহত্তম বারটি আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বন্দরগুলির মধ্যে ইহা যে সেরা পাঁচটির মধ্যে থাকিবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইহার পরেও যে এই ডক সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে পারে, তাহা মনে না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির চোখে বাহিরের এই জলুস কোন বন্দরেরই সঠিক আত্মপরিচয় দিবে না। অর্থনীতির আইন অনুসারে সুচারু নির্ম্মাণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিবার জন্যই কোন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না,—তাহার জন্য 'তাজমহল' 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' আছে। বন্দরমাত্রেরই আয়তন নির্দ্দেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম দেশ-বিদেশের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাপ করিয়া লইতে হইবে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, কোনপ্রকার রাজনৈতিক চাল না থাকিলে সকল বন্দরই ব্যবসাই-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাদের আয়ব্যয়ের একটা ধারা-নিয়ম আছে। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ আয়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, কি পরিমাণ ব্যয় সঙ্গত হইবে ইহাদের তাহা নির্ণয় করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে কোন রেলপথ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধিকাংশে রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার সময় নানাদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমতঃ, ইহা দেখা দরকার যে, যে সকল স্থান রেলপথের দ্বারা সংযোজিত হইবে সেখান হইতে যাত্রিসংখ্যা কিরূপ হওয়া সম্ভব এবং তথায় কি পরিমাণ মাল আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও দেখা আবশ্যক যে, এই সকল স্থান হইতে অন্যত্র মাল পাঠাইবার জন্য কোন প্রকার যান-বাহনের সুবিধা আছে কিনা;—তা ছাড়া বর্ত্তমান কোন রেলপথের সহায়তায় এই সকল স্থানে যাতায়াত করা সম্ভব হইলে ইহাও ভাবিয়া

* ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে বঙ্গীয় বনবিজ্ঞান পরিষদের ৯ম অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক আলোচিত বিষয়ের সারমর্ম্ম।

দেখা দরকার যে, তাহা কোনরূপ প্রতিযোগিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে কিনা। এতগুলি ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথের গোড়াপত্তন করিতে হয়। এবিষয়ে রেলপথ এবং ডকের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। উভয়ের কার্য্য-পদ্ধতি একই কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যবসায়ের মধ্যে যে সকল বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যেও ঠিক তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অপেক্ষা ইহাদের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব উভয়ই অনেক বেশী। দায়িত্বের দিক্ দিয়া ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অপেক্ষা এই সকল অনুষ্ঠানে মূলধন খরচের পরিমাণ অনেক বেশী, অথচ এই প্রভূত ব্যয় করিবার ফলে যে সম্পদ সৃষ্ট হয় তাহা সাধারণ ব্যবসায়-সম্ভারের মত সহজে বিক্রয়সাধ্য নহে,—এমন কি ইহা স্থানান্তরিত করাও অসম্ভব। এত বিপত্তি ঘাড়ে তুলিয়া লওয়া সত্ত্বেও ঠিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতই ইহাদের ব্যবসায়ের দায়িত্বও মানিয়া লইতে হয়। সাধারণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে যেমন চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি আছে, তাহাদের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ যেমন হ্রাসবৃদ্ধি পাইয়া থাকে,—ইহাদের যেমন নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা আত্মপোষণ করিতে হয়, রেলপথ এবং বন্দর সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ আয়ের উপর নির্ভরশীল হইতে না পারিলে প্রতিষ্ঠান-বিশেষ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এইসকল দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

গুরুত্বের দিক্ দিয়াও রেলপথ কিংবা ডকের ন্যায় অনুষ্ঠানগুলির প্রভাব সাধারণ শিল্প-ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশী। রেলপথ কিরূপে একটি দেশের শিল্প-বিপ্লব ঘটাইতে পারে ভারতবর্ষে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আবার ইহাই যে কি পরিমাণে শিল্প-সহায়ক হইতে পারে তাহারও দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্ম্মানির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে। ডক মাত্রেরই নির্ম্মাণ-ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণ-খরচ মিটাইবার জন্য আমদানি রপ্তানি মালের উপর নির্ভর করিতে হয়। উভয় প্রকার খরচই আমদানি রপ্তানি মাল সম্বন্ধে অনেকাংশে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ মালের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, এই খরচগুলি থাকিবেই। ডক নির্ম্মাণ করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহার উপর বার্ষিক সুদ বৎসরকালের উপার্জ্জন হইতে মিটাইতে হয়,—তা ছাড়া আসল টাকাটাও কর্জ্জের স্থিতিকাল অনুসারে প্রতি বৎসর কিছু কিছু পরিমাণে শোধ করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর ডক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হয়, তাহাদের বেতনাদি ইত্যাদি বাবদ খরচ আছে, এগুলিও অপরিহার্য্য। ডক নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, ব্যবসায়িক আয় হইতে এই সকল খরচ মিটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে কিনা। যদি আমদানি রপ্তানি মালের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া যায়, তবেই কেবল সহজভাবে এই খরচ মিটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে, নতুবা পূর্ব্বাপর যে পরিমাণ মাল আমদানি রপ্তানি হইতেছে, ডকের কর্ত্তৃপক্ষ তাহারই উপর আদায়ের হার বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ শুল্ক-বৃদ্ধির ফলে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বহুল ক্ষতি হইতে পারে। সেজন্য এই ভাবে আয় বৃদ্ধি করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে ডকের একচেটিয়া দখলে থাকিবার জন্য ব্যবসায়িবর্গ অনন্যোপায় হইয়া চড়াহারে শুল্ক দিতে বাধ্য থাকে বটে, কিন্তু তাহার ফের শেষ পর্য্যন্ত দেশবাসীরই ঘাড়ে চাপিবার উপক্রম হয়, কারণ ব্যবসায়িবর্গ শুল্কবৃদ্ধির জন্য স্ব স্ব ক্রয়-বিক্রয়ের মালের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন ডকের ভালমন্দ যাচাই করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ধন-বিজ্ঞানের এই নির্দ্ধারিত মাপকাঠির সহায়তায় কিং জর্জ্জেস ডকের মূল্য যাচাই করিয়া দেখা যাইতেছে। সে জন্য কলিকাতা বন্দরের পূর্ব্বতন ইতিহাস মোটামুটি জানা দরকার। এই ইতিহাস আলোচনা করিলে কিং জর্জ্জেস ডক নির্ম্মাণ করিবার কি কারণ হইয়াছিল এবং সত্যই কোন কারণ হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে অনেক খবর মিলিবে।

* * * *

বিশ্বত ইয়োরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে কলিকাতা বন্দরে নীত জাহাজের সংখ্যা এবং আমদানি রপ্তানি মালের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই বন্দরে আর স্থান সঙ্কুলান হইবে না এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ ঘটিতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ তখন বন্দরের উন্নতি করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এক বিশিষ্ট বন্দরপ্রসার অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি আপাততঃ গার্ডেন রীচ এ নদীতট সংলগ্ন চারিটি ঘাট নির্ম্মাণ করিবার জন্য উপদেশ দেন এবং এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, অনতিবিলম্বে পৃথক এমন একটি ডক গঠন করিতে হইবে যাহাতে কলিকাতা বন্দরে বিদেশ বাণিজ্যের জন্য স্থায়ী ভাবে সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ এই কমিটির উপদেশের প্রথমাংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চারিটি ঘাট নির্ম্মাণ করিবার কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধ বাধিবার পর বাণিজ্যের আয়তন হ্রাস পাইবার জন্য এই কাজ কিছুকাল স্থগিত থাকে। পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল ঘাট নির্ম্মাণ শেষ করা হইয়াছে। ইহার সমষ্টি ব্যয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা হইবে।

পৃথক ডক নির্ম্মাণ করা উচিত হইবে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য পুনরায় এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই কমিটি ইংলণ্ড এবং ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশের বন্দরগুলির গঠন-কৌশল, কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ইয়োরোপে গমন করেন এবং নূতন ডক নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বিস্তারিত এক রিপোর্ট তৈয়ারী করেন। কিন্তু নূতন ডক নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হইবে মনে করিয়া কেহ কেহ তৎপূর্ব্বেই তাহার বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন এবং বন্দরের উন্নতি করিবার জন্য এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, বিদিরপুর ডকের যথেষ্ট প্রসার এবং নদীতট-সংলগ্ন ঘাটের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া দিলেই যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রকার মতে আস্থাবান হইতে পারেন নাই। প্রায় এক বৎসর কাল পূর্ব্বে কলিকাতা পোর্ট কমিশনর সভার চেয়ারম্যান মিঃ (অধুনা স্যর) ইুয়ার্ট উইলিয়মস্ রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটীর সভ্যবৃন্দ সাধারণ বক্তৃতা দিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলেন, • • "পুরাতন ডকের যথেষ্ট প্রসার করিয়া দেওয়া মোটেই সম্ভবপর হইবে না এবং কলিকাতায় বোটের সংখ্যা বাড়াইয়া দিলে মহাজন-সংলগ্ন স্থানগুলির স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি"।[৩] বিদিরপুর ডকের কোন উন্নতি করা সম্ভব ছিল কিনা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সে সম্বন্ধে কাহারও কোন মত দিবার অধিকার নাই। কলিকাতায় বোটের সংখ্যা বাড়াইবার ফলাফল সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচনা করাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আলোচ্য বিষয় এই যে, এই সকল মতামত খণ্ডন বা প্রত্যাখ্যান করিয়া যে ডক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, অর্থনীতির তুলাদণ্ডে তাহার ওজন কতখানি।

বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ এইভাবেও ডক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ ইুয়ার্ট উইলিয়মস এই বিষয় আলোচনা করিতে নূতন ডক নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নরূপ :—কলিকাতা বাংলার বৃহত্তম বন্দর। তিনটী প্রধান রেলপথ এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের অনেকাংশ কলিকাতার সহিত সংযোজিত করিয়াছে। ই, বি, রেলওয়ে বাংলার উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য-সম্ভার আকর্ষণ করিতেছে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, বেরার ও উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের অনেক স্থানকে কলিকাতা বন্দরের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার বন্দর এবং আসামের চায়ের কোম্পানী-গুলির কলিকাতার মাল আমদানি রপ্তানি করিয়া থাকে। সুতরাং কলিকাতা বন্দরের প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে, এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। এই মতব্য সমর্থন করিবার জন্য মিঃ উইলিয়মস কলিকাতা বন্দর-সেবিত স্থান সমূহের বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যে যে প্রদেশের সহিত কলিকাতা বন্দরের সম্বন্ধ আছে তাহার বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে।—

	বিস্তৃতি (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (লক্ষ)
বঙ্গদেশ	১৬,৮৪৩	৪৬৬
আসাম	৫৩,০১৫	৬৭
বেহার এবং উড়িষ্যা	৮০,১৬১	৩৪৪
যুক্তপ্রদেশ	১,০৩,২৯৫	৪৬৮

উপরোক্ত প্রদেশগুলির কোন কোন স্থান কলিকাতা বন্দরের উপর নির্ভরশীল নহে, সেজন্য মোটামুটি এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, কলিকাতাবন্দর যে সকল স্থানে মাল সরবরাহ করিয়া থাকে তাহার মোট বিস্তৃতি ন্যূনকল্পে দুই লক্ষ বর্গমাইল হইবে এবং তাহাদের লোক-সংখ্যা প্রায় দশ কোটি। অতঃপর কলিকাতাবন্দরের প্রাধান্য নির্দেশ করিবার জন্য মিঃ ষ্টুয়ার্ট দেখাইয়াছেন যে, ফ্রান্স এবং জার্মানি একত্র করিলে তাহাদের বিস্তৃতি চারি লক্ষ বর্গমাইল হয়, এবং তাহাদের লোক-সংখ্যার সমষ্টি যাহা দাঁড়ায় তাহা দশ কোটির খুব বেশী নহে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট আরও বলেন যে, কলিকাতা বন্দরে নীত বাণিজ্য-সম্ভারের পরিমাণও এই সকল ব্যাপার হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের বাংলার বহির্বাণিজ্যের সমষ্টি মূল্য হইয়াছিল ২২২কোটি ২৭লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে এক কলিকাতা বন্দর লইতেই ২১১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ সমষ্টি মূল্যের শতকরা ৯৫·৭ভাগ) মূল্যের মাল আমদানি রপ্তানি করা হইয়াছে। এই পরিমাণের যথেষ্ট পরিচয় দিতে হইলে ইহা অবশ্য বলা দরকার যে, ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশই কলিকাতা বন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-বন্দরের যে পরিমাণ আমদানি রপ্তানি হইয়াছে তাহা মহা-সমরের পূর্ববৎসর অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যের আয়তনকে অতিক্রম করিয়াছে।

তারপর কলিকাতা বন্দরের প্রাধান্য কিরূপ স্থিতি এবং বর্দ্ধনশীল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আরও অনেক কথা বলা হইয়াছে। এই বন্দর হইতে বাংলা এবং আসামের পাট এবং চা রপ্তানি হইয়া থাকে। বাংলার সবগুলি পাটকলই কলিকাতার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসকল মালের রপ্তানি কলিকাতা বন্দরের সহায়তা লইবেই। তা ছাড়া বাংলা এবং বেহারের কয়লা রপ্তানি করিবার পক্ষেও কলিকাতা নিকটতম বন্দর হওয়ায় বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে কলিকাতা বন্দর হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ চা রপ্তানি হইয়া থাকে,—এবং সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এই বন্দর হইতেই সবচেয়ে বেশী কয়লা চালান দেওয়া হয়। আমদানি মালের পক্ষেও ইহার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে। এই বন্দর হইতে কলিকাতা এবং তাহার সহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। ইহাদের প্রয়োজনীয় বিদেশীপণ্য কলিকাতা বন্দরে আসিবেই। তা'ছাড়া সমগ্র উত্তর পার্শ্বস্থ জনবহুল স্থান-গুলিতেও এই বন্দর মাল সরবরাহ করিতেছে। এই সকল কারণে কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যের আয়তন যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার কারণ নাই। কাজেই কিং জর্জেস ডকের প্রয়োজনীয়তা, উন্নতি এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদ খণ্ডন করিবারও কোন হেতু নাই। মিঃ ষ্টুয়ার্ট তাঁহার গবেষণার ফলে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট কলিকাতা বন্দরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই বন্দরের বাণিজ্যের আয়তন তীক্ষ্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অন্যরূপ প্রতীয়মান হইবে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অনুসন্ধান কমিটিও কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার পর দীর্ঘ পনের বৎসরের মধ্যেও কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যের আয়তন বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। মহাসমরকালীন কয়েক বৎসরের ঘটনা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, এই বন্দরের বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দরে যত জাহাজ ভিড়িয়াছিল তাহার সংখ্যা এবং নিট টনেজ (অর্থাৎ টন ওজনে মাল বহিবার ক্ষমতা) ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা এবং নিট টনেজ অপেক্ষা কম।

	১৯১৩—১৪			১৯২৬—২৭		
	জাহাজের সংখ্যা	টনেজ		জাহাজের সংখ্যা	টনেজ	
		জাহাজের ওজন সহ	নিট		জাহাজের ওজন সহ	নিট
যত জাহাজ আসে						
১। বিদেশী	৭৪৭	৩,৭৮১,০১৬	২,৩২৮,৭৩১	৭২৭	৪,৪৬২,২১৬	২,৭১৮,৮২৪
২। উপকূলবাহী	৮৩৯	৩,১৪৫,৮০১	১,৮৫৮,২৪৬	৫৪৭	২,৪১০,২০০	১,৪৫৮,২২৪
মোট	১,৬৫০	৬,৯২৬,৮১৭	৪,২৪৬,৯৮৭	১,১৭৪	৬,৯১২,৪২৬	৪,১৭৭,১১৮
যত জাহাজ যায়						
১। বিদেশী	৭৪২	৩,৭৯৭,১১৬	২,৩৮৬,৫৮৮	৭৭৭	৪,৬৬৯,১২৭	২,৮৭১,৫২০
২। উপকূলবাহী	৯০৬	৩,১৬০,৮৯৯	১,৮৯৬,১৯১	৫০৪	২,২৯১,২৪৪	১,৩২৮,৭৪৫
মোট	১,৬৪৮	৬,৯৬১,০১৫	৪,২৮২,৭৭৯	১,২৮১	৬,৯৬১,১৭১	৪,২০০,২৭৫
সর্ব্বসমেত	৩,৩০৮	১৩,৮৮৭,৮৩২	৮,৫৩৯,৭৬৬	২,৫৫৫	১৩,৯০৩,৫৯৭	৮,৩৭৭,৩৯৩

উপরের তালিকার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, মাত্র দুইটী বৎসরের বাণিজ্যের আহরণ দ্বারাই বন্দরের ঠিক উন্নতি হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি স্বাভাবিক, এবং নিরর্থক নহে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই, যখন মিঃ ইুয়ার্ট বলেন যে, ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যের আহরণ ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের আহরণকে অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাহাতেও খুব উৎফুল্ল হইবার কারণ থাকিতে পারে না, কারণ ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের আহরণ যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা ঠিক স্থিতিশীল হইবে কি না বলা কঠিন। এই বৎসরে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের হঠাৎ প্রসারলাভ করিবার অনেক কারণ ছিল। প্রথম, এই বৎসর নিয়মিত বৃষ্টিপাত হইবার জন্য ফসলের কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই, তাহার ফলে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে রপ্তানিবাণিজ্য স্বভাবতঃই বাড়িয়াছে। তারপর এক্সচেঞ্জের হার বৃদ্ধি পাইবার ফলে আমদানি বাণিজ্য কতখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহাও চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। বলা বাহুল্য, এই সকল কারণ পরবর্ত্তী কালেও যে বিদেশী বাণিজ্য পুষ্ট করিতে থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; বরং না করিবারই কারণ রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র একটি বৎসরের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাবান নিশ্চিত হইলে ভুল হইবে। তবে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের সহিত ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের হিসাব তুলনা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘ ১৩।১৪ বৎসরেও কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য-বিষয়ে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। এই দুই বৎসরের মধ্যকালে কোন বৎসরেই এই বন্দরের বাণিজ্য ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যের পরিমাণকে অতিক্রম করে নাই, ইহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে?

তারপর কেবলমাত্র উপরোক্ত দুই বৎসরের হিসাব বাদ দিলেও দেখা যাইবে যে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। নিম্নের তালিকায় ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দ এবং ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ এই দুই বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি বৎসরের গড়পড়তা হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

		টনেজ	
১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি বৎসরের গড়পড়তা হিসাব	জাহাজের সংখ্যা ৩,০৭৪	জাহাজের ওজন সহ	নিট
১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি বৎসরের গড়পড়তা হিসাব	২,৪১৪	১২,৮৭৯,৪০৩	৭,৭২৭,৪৯৪

উপরের তালিকা অনুধাবন করিলে পূর্ব্বের সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য এই দীর্ঘ-কালেও কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মিঃ ষ্টুয়ার্ট অনেক প্রমাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া কঠিন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য বাড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সেই সঙ্গে কলিকাতার সমীপস্থ চিটাগং এবং ভিজাগাপটাম এই দুই উন্নতিশীল বন্দর ক্রমশঃ কলিকাতার প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হইলে কলিকাতার বাণিজ্য আংশিকভাবে এইসকল বন্দরে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। এই প্রসঙ্গে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্যর জর্জ্জ বুকানন চিটাগং বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কলিকাতা বন্দরের সহিত চাটগাঁ বন্দরের নিজস্ব সুবিধাগুলি তুলনামূলকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) চা চালান দিবার পক্ষে চাটগাঁর সুবিধা এই যে, বাগিচার সন্নিকটস্থ 'রেলওয়ে সাইডিং'এই বাগিচার শকট হইতে চা মালগাড়ীতে বোঝাই করিয়া দিয়া একেবারে চাটগাঁ বন্দরের কেটিতে পৌঁছান হয়। তথায় সেড অর্থাৎ ছাউনীতে কিছুকাল থাকিবার পরেই ইহা জাহাজে চালান দেওয়া হয়। এইরূপ করিবার ফলে অর্থাৎ বারুবার গাড়ীবদল না করিবার দরুণ মালের কোন ক্ষতি হয় না। বিশেষজ্ঞ মাত্রই এখন এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, লণ্ডন সহরে চাটগাঁ বন্দর হইতে প্রেরিত চা কলিকাতার চা অপেক্ষা ভাল অবস্থায় গিয়া পৌঁছে।

কিন্তু চাটগাঁ অঞ্চলের যে চা কলিকাতায় চালান দেওয়া হয় তাহার নানারূপ অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, ইহা বাগিচার শকট হইতে রেলগাড়ী কিম্বা ষ্টীমারে বোঝাই করা হয়। যে সকল চা রেলগাড়ীতে বোঝাই করা হয় তাহা চাঁদপুর ষ্টেশনে নামাইয়া ষ্টীমারে তুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে একাধিকবার মাল উঠানামা করিতে হয়,—একবার রেলগাড়ীতে, তারপর ষ্টীমারে। তারপর যেসকল চা আগরতলা রেলপথে কলিকাতায় আসে, তাহা আবার 'মিটার গেজ' রেল হইতে চওড়া গেজ রেলে উঠাইয়া দিতে হয়। এই চা কলিকাতায় পৌঁছিবার পরেও কিছুকাল গুদামে পড়িয়া থাকে। শেষে পোর্টট্রাষ্টের গাড়ীতে বোঝাই হইয়া ছাউনিতে নীত হইলে সময় মত জাহাজে চালান দেওয়া হয়।

(২) পাট সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পাট গাঁট বাঁধিবার পর ফ্ল্যাটে বোঝাই হইয়া মাত্র একদিনে চাঁদপুরে পৌঁছে এবং সেখান হইতে সোজা রেলপথে একেবারে চাটগাঁ বন্দরের ছাউনীতে লইয়া যাওয়া হয়। অপরদিকে কলিকাতায় যে সকল পাকা গাঁট চালান দেওয়া হয় তাহা হয় জলপথে কলিকাতায় আসে, নতুবা গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ষ্টীমারে আনাইয়া শেষে রেলপথে কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। পাকা গাঁটগুলি বিদেশে চালান দিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এইভাবে পাট চালান দিবার জন্য রেল এবং ষ্টীমার উভয় পথেই নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কারণ কলিকাতার চটকলগুলির ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ খোলা পাট বা কাঁচা পাটের গাঁট চালান দেওয়া হয় তাহা রেল এবং ষ্টীমারের অধিকাংশ স্থানই দখল করিয়া লইবার ফলে রপ্তানি পাট চালান দিবার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হইয়া থাকে। • • • •

স্যর জর্জ্জ বুকাননের এই সকল মন্তব্য হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বাংলা, আসামের পাট এবং চায়ের বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিলে তাহাতে চাটগাঁ বন্দরই ক্রমশঃ লাভবান হইবে। ইতিমধ্যেই এই বন্দর যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এখন হইতে যে ইহা ক্রমশঃই অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তারপর ভিজাগাপটাম বন্দরও ক্রমশঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছে। এই বন্দর উন্নতি করিতে থাকিলে বর্ত্তমানে কলিকাতা বন্দরে বি, এন্ রেলওয়ে কর্ত্তৃক আনিত পণ্য এবং মধ্যপ্রদেশের রপ্তানি বাণিজ্য যে ভবিষ্যতে আংশিকভাবে নূতন বন্দরের আশ্রয় লইবে এরূপ মনে করাও যুক্তিহীন নহে।

এবার ক্ষেত্রে মিঃ ইুয়ার্টের চা এবং পাট বিষয়ে কলিকাতা বন্দরের উন্নতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধীয় উক্তিগুলি অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। তারপর করলার বহির্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নহে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় করলার বিদেশী চাহিদা একেবারে নষ্ট হইয়াছিল বলিলেই চলে। তারপর এই চাহিদা অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু একবার যে বাজার বেহাত হইয়া গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে ফিরাইয়া পাওয়া আদৌ সম্ভব হইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে সেরূপ হইবার কোন ক্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে ইহাই বলা হইবে যে, কিং জর্জেস ডকের অনুপাতে কলিকাতা বন্দরের বহির্বাণিজ্যের আয়তন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

তারপর এই ডক নির্মাণ করিবার ফলে কলিকাতা বন্দরের আর্থিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাপার। বিশ্ব যুদ্ধের পর হইতে কলিকাতা বন্দরের আয় অনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক বৎসর মাত্র ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এইরূপ হওয়াধিকা হইবার ফলে কর্তৃপক্ষ বন্দরের 'রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ড' অর্থাৎ পূর্বের অন্যান্য বৎসরের লভ্যাংশের সঞ্চিত পরিমাণ টাকা হইতে খরচ মিটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকার খরচ দোষাবহ নহে, কারণ অপ্রত্যাশিত ক্ষতির দায় মিটাইবার জন্যই এইরূপ ফণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে ইহাও ঠিক যে, একাধিকবার এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে খুব যে নূতন অনুষ্ঠানের জন্য অনেক পরিমাণ মূলধন খরচ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা তাহা প্রথমেই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বন্দরের আয়ব্যয় হিসাব পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় খরচ মিটাইবার জন্য এই বন্দরকে নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। একাধিকবার মাশুলের হার চড়াইয়া দিতে হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, আদায়ের চড়া একসূত্রেজনিত আকস্মিক লাভ, রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ডের আধারী মূল, এমন কি নানাবিধ লিকিউইডিটির বাজার চড়িয়া যাইবার জন্য তাহার মূলাবৃদ্ধির পরিমাণ অন্যান্য থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ঘরে লিখিয়া আয়ের ঘর পুষ্ট করিয়া দেখাইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই সকল আকস্মিক বা আনুষানিক লাভের উপর আস্থাবান হওয়া উচিত নহে কারণ, যে কোন বৎসরে এই প্রকার অপ্রত্যাশিত লাভের ঠিক বিপরীত অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হওয়াও সম্ভব। সেই জন্যই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীরা এইসকল আকস্মিক লাভের পরিমাণ টাকা সাধারণ ব্যবসায়-সংক্রান্ত আয়ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া তাহার দ্বারা একটী পৃথক হিসাব গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। নিম্ন তালিকায় কলিকাতা বন্দরের ৮ বৎসরের আয়ব্যয় হিসাব বিশেষ উল্লেখে লেখক কর্তৃক একটু নূতন ধরণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উপরের কথাগুলি স্মরণ করিয়া এই তালিকা পর্যবেক্ষণ করিলে ইহার তাৎপর্য বুঝা যাইবে।

(ক) বৎসর	(খ) পূর্ব বৎসরের শেষ	(গ) বৎসরের সাধারণ ব্যবসায়িক আয়	(ঘ) বৎসরের টাকার অঙ্কে আয়ী সুদ,	(ঙ) নগদী আয়	(চ) বৎসরের সাধারণ ব্যবসায়িক আয়	(ছ) সুদের বাদ ●	(জ) নগদী আয়	(ঝ) ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত অঙ্ক
	(টাকা)	(টাকা)	ও চক্‌তি এবং সঞ্চয়	(টাকা)	(টাকা)	(টাকা)		
			দিকিউরিটিজ বাবদ বৃদ্ধি		দিকি: সংস্থার জন্য			
			সাধারণ রিজার্ভ ফাণ্ড		আদায়			
			হ্রাস বাদ দিঃ বৃদ্ধি লাভ					
	২,২০,১১,৫১৬	(১,২৯,৩০,৯৯ (ক্র) ৮২,৯১৩	২,১৩,৫৫,৬১৪					
		২,১৮,০৯৯						
১৯২০-২১	২,৬৫,২৯,৩৫০	২১,৬৭৩			২,৫৩,০০,৮৪০	৬১,৩০,৩৪৫	২,৫৩,৩২,২০৫	+২০,৫৪,৪৯০
১৯২১-২২	২,১৯,৯৮,০০৭	১,১৯,০০০			২,৭৪,৮৪,৪১৯	৬৪,৫১,৯৫৬	২,৪০,১৯,৫৬৩	— ২,০৫,৮৮৯
১৯২২-২৩	২,৫৯,০৬,১১০	২৫,৪৯,০০০			২,৭১,৯৩,৮০০	৬৪,৫১,৯৫৬ (ক্র) ৬,৩০,৩৪৫ (খ) ৭০,৮২,৩০১	২,৬১,৪৭,৪১৩ (গ) ৩৪,৫০,৩৪৪ ২,৬৬,৭৭,৭৬৩	—২২,২৯,৭৩৩
							৮৮,৮৯,৫৯৮	
১৯২৩-২৪	৩,৫১,৩১৯			৫,৩৫,৩৩৩	৩,১২,০৩,৮৯৮	৩৪,৭১,৯৫৬	৩,৫৮,৮৮,৫৬৩	৩৩,৩৯,৩৩৩
১৯২৪-২৫	৪,২৪,৭৭৯			৫০৩,২৯,৮৮৩	৩,৫৮,৭১,২৮৩	৩৪,৫১,৯৫৬	৩,৮৩,২৯,৮৩৯	৩৪,৩৯,৩৩৩
১৯২৫-২৬	—			৪৯৯,১৯,৮৯০	৪৯৯,১২,৮৯০	৩৪,৫১,৯৫৬ (ক্র) ৩,৩০,৩৪৫ (খ) ৭০,৮২,৩০১	৩৩৫,৮৯,৮৯৩	৩৩,৩৯,৩৩৩
							৩৩৫,৮৯,৮৯৩	
							৩৩৫,৮৯,৮৯৩	

● (ক) এবং (গ) চিহ্নিত অঙ্কের যোগ হইতে (খ) চিহ্নিত অঙ্কের বাদ দিয়া এই অঙ্কে পাওয়া গিয়াছে।

(ক) সিকি কম ও সুদ। (খ) ডেভিডেণ্ড।

উপরের তালিকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতা বন্দরের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নহে। ভবিষ্যতে এই বন্দরের বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ না করিলে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এযাবৎকাল ডক নির্ম্মাণ করিতে যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার উপর আর্থ সুদ "ক্যাপিটাল্ একাউন্টে" অর্থাৎ ডক উন্মোচন করিবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত হাওলাতি মূলধনের হিসাবে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ডক, রেলওয়ে ইত্যাদি নির্ম্মাণ বিষয়ক হিসাব-বিজ্ঞানে এইরূপ করিবার বিধি আছে। কিন্তু এখন হইতে অর্থাৎ ডক উন্মুক্ত করিবার পর হইতে আর এরূপ করা চলিবে না। এখন হইতে বাৎসরিক আয় হইতেই এই সুদের খরচ মিটাইতে হইবে। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ সেজন্য কয়েক বৎসর হইতেই রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ডটী যথাসাধ্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ এই সুদের দাবী মিটাইতে হইলে কিছুকাল সাধারণ বাৎসরিক আয়ের দ্বারা সঙ্কুলান হইবে না। অতঃপর বন্দরের বাণিজ্য সামান্য পরিমাণ বাড়িলেও নূতন ডক নিয়ন্ত্রণের জন্য খরচও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু অনতিবিলম্বে এই বন্দরের বাণিজ্য বিশেষরূপে বাড়িয়া যাওয়া দরকার, নতুবা রিজার্ভ ফণ্ডের টাকাও নিঃশেষ হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে। সেরূপ ঘটিলে হয় কর্জ্জ করিয়া এই সুদের দাবী মিটাইতে হইবে, নতুবা শুল্কের হার চড়াইয়া দিতে হইবে। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে রেভেনিউ রিজার্ভ এবং কারার ইনভিওরেন্স ফণ্ডের টাকা প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ হইয়াছে। ডক নির্ম্মাণ ব্যয়ের সুদ এবং 'সিঙ্কিং ফণ্ড' অর্থাৎ কর্জ্জ পরিশোধক ফণ্ড বাবদ প্রতি বৎসর যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে তাহার মোট পরিমাণ ৩৩.৩৪ লক্ষ টাকা। এমতাবস্থায় বৎসরের বাণিজ্য-বৃদ্ধির দরুণ আর নূতন ডক নিয়ন্ত্রণজনিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক না হইলে বড় জোর ৩৪ বৎসর রিজার্ভ ফণ্ডের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহার পর বাণিজ্যবৃদ্ধির সহায়তায়ই ডক নির্ম্মাণের সুদের দাবী মিটাইতে হইবে। কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বন্দরের কি করা কর্ত্তব্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহা আর উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নহে—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ডক বা রেলওয়ে সাধারণ পণ্যের ন্যায় বিক্রয়যোগ্য বস্তু নহে। খরচ যাহা হইবার তাহা করা হইয়াছে এবং সেজন্য দেনাও থাকিবে। এই দেনা মিটাইতে হইলে, হয় আয় বাড়াইতে হইবে, নতুবা ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে হইবে। বন্দরের আয় নির্ভর করে বহির্ব্বাণিজ্যের আয়তনের উপর—যাহা মোটেই বন্দর-বিশেষের শাসনাধীন নহে; বিশেষতঃ কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। শুল্কবৃদ্ধির সহায়তায় আয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করাও প্রশস্ত নহে। এরূপ অবস্থায় যতপ্রকারে বন্দরের ব্যয়-সংক্ষেপ করা যাইতে পারে কর্ত্তৃপক্ষকে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

জাপানের বয়ন-শিল্প

শ্রীসত্যনাথ সরকার, এম, এ

নানা প্রকার কাপড়-চোপড়ই জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের মোটা অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৯২৮ সনে জাপানের মোট ১,৯৭১,৯৪৫,০৫২ ইয়েন মূল্যের রপ্তানি-বাণিজ্য হয়। এর মধ্যে কাপড়-চোপড় রপ্তানি হইয়াছে ১,০১৩,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের। ১৯০৪ সনে বয়ন-জাত দ্রব্য মোট রপ্তানি-বাণিজ্যের ৪৪·৪% অধিকার করিয়াছিল, ১৯১০ সনে এই বাণিজ্য দাঁড়ায় ৫৬·৮% এবং ১৯২৮ সনে ৬১%। এই সমস্ত মাপজোক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় জাপানের বয়ন-শিল্প কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে।

(ক) কাঁচা রেশম শিল্প

জাপানে তুঁতের চাষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলি[illegible]

আসিতেছে। সুতরাং জাপানের রেশম-শিল্পও অতি প্রাচীন। আজকাল নূতন নূতন কলকারখানা এই শিল্পে কাজে করা হইয়াছে। কিন্তু নূতন নূতন কল-কারখানা এমন কায়দায় কায়েম করা হইয়াছে যাহা একমাত্র জাপানের পক্ষেই উপযোগী।

কাঁচা রেশম জাপানে দুই প্রকারে উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ষ্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে, দ্বিতীয়তঃ কৃষকগণের কুটীরে হস্ত-চালিত যন্ত্রের দ্বারা। শেষোক্ত উপায়ে কৃষকগণ অবসর-সময়ে অতিরিক্ত উপার্জ্জনের পথ পাইয়াছে। জাপান হইতে বিদেশে যত কাঁচা রেশম রপ্তানি হয় তাহার মোটা অংশ কৃষকগণেরই শ্রম-লব্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোটা জাপানের সর্ব্বত্রই রেশম-শিল্পের বেওয়াজ আছে।

১৯২৫ সনে মোটা জাপানে মোট কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয় ৮,২৮৪,০২৯ কোয়ান, মূল্য ১৪৬,০৪১,১৮৭ ইয়েন; ১৯২৭ সনে হয় ৯,৮৮০,৩৪৮ কোয়ান, মূল্য ৭৯৮,৮০০,৪৭১ ইয়েন। কাঁচা রেশম উৎপাদনের প্রধান আড্ডা নাগানো। এই স্থানে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২,৪৮৪,৪১৯ কোয়ান। নাগানোর পরে যথাক্রমে আইচি, গোম্মা, সইতামা, ইয়ামানাশি, ফুকুশিমা, এমিমী, এবং মাই প্রভৃতির স্থান।

জাপানের কাঁচা রেশমের ৭০% বিদেশে রপ্তানি হয়। এই সমস্ত রেশম ২০০,০০০ কুটীর-কারখানাতে প্রস্তুত হয়। মাত্র ৩৫% দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত রেশমী বস্ত্রের কারখানা প্রধানতঃ কিয়োটো গোম্মা, ইশিকোয়া, টোকিয়ো, আইচি, ইয়ামাগাটা, ইয়ামানাশি, টোচিগি, নিগাটা, ফুকুশিমা এবং কানাগোয়া প্রভৃতি সহরে অবস্থিত।

(খ) রেশম-জাত বস্ত্র-শিল্প

দুনিয়ার যে সকল দেশ কাঁচা রেশম উৎপাদনের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে, জাপান তাহাদের অন্যতম। এই জাপান-দেশে অতি উৎকৃষ্ট ধরণের খাঁটি রেশমী কাপড় এবং সূতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাপানের এই শিল্প অতি প্রাচীন। পৌরাণিক যুগের ঐতিহাসিক যুগের আমল হইতে এই শিল্প জাপানে বর্ত্তমান। জাপান সম্রাট মনচুর আমলে (৬৯৭ খৃঃ অঃ—৭০৭ খৃঃ অঃ) কাওয়াচি প্রদেশে ৩৫০টি রেশমের কারখানা বর্ত্তমান ছিল।

১৮৯০ সনে জাপান হইতে সর্ব্বপ্রথম ঝাবুতাই ক্রেপ এবং অন্যান্য প্রকার রেশমী কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়। এই সময়ের পর হইতেই জাপানের কারখানাওয়ালাদের দৃষ্টি পড়ে বিদেশে রপ্তানি করার দিকে। কারখানার মালিকগণ এজন্য প্রাণপণ যত্নে মাল ভাল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বিদেশে রপ্তানি করিয়া লাভ করিবার আশায় ইহারা ভালভাবে কারখানা পরিচালন করিতেছে। তজ্জন্য ইহারা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতেছে এবং উৎপাদনের খরচ যতদূর সম্ভব কমাইয়া ফেলিয়াছে। দেশের গভর্ণমেণ্টও এজন্য ইহাদিগকে বিস্তর সাহায্য করিতেছে। সরকারী সাহায্য পাইয়াই জাপানের রেশমী বস্ত্র-শিল্প সাগরপারের বাজারগুলিতে এমন খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে।

জাপানের এই শিল্প যে কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

জাপানের রপ্তানি-মার্কিক রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন

	মূল্য (ইয়েন)
১৯২৬	৪৬,৯০৫,৮০১
১৯২৭	৪১,৭৮০,৫৭১
১৯২৮	৫০,৯৯১,৯৯৪
১৯২৯	৬৩,১৭০,২৫৫
১৯৩০	৮৩,২৯১,৩৭০
১৯৩১	১৬০,৩০৮,৮০৩
১৯৩২	২১৪,৭৪৫,৫৮৩
১৯৩৩	১৭২,২৯৮,৩৭৫
১৯৩৪	১০৯,০১৫,৯৭৪
১৯৩৫	১০৭,৮৭৭,৫৪৪

বৎসর	মূল্য (ইয়েন)
১৯২৩	১১১,৩৪২,৩৪৫
১৯২৪	১৩১,৩৮০,০০২
১৯২৫	১৪৫,৬২১,৫৯০

১৯২৭ সনে উৎপন্ন রেশমীবস্ত্রের মোট মূল্য ৪৬১,৪০৮,৮১১ ইয়েন, কারখানাওয়ালার সংখ্যা ৮৩,৭৮৪, তাঁতের সংখ্যা ২১০,৭৯৯, নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২১১,৭৭১, তন্মধ্যে পুরুষের অনুপাত ১৩%। খাঁটি রেশমী বস্ত্র ৮৮% (মূল্য ৪১১,১০০,৯০৪ ইয়েন), তুলামিশ্রিত রেশমী বস্ত্র ১২% (মূল্য ৪৮,০০৪,৮৭৭ ইয়েন)। কারখানা হিসাবে কিয়োটোর স্থান সর্বোচ্চে। এই সহরের উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য ৯৭,২৫৯,১৮৪ ইয়েন। কিয়োটোর পরে ফুকুই, গোম্মা, ইশিকাওয়া, টোকিয়ো, এবং নিগাটার স্থান।

লড়াইয়ের আগে জাপান হইতে হাবুতাই রেশমই রপ্তানি হইত সব চেয়ে বেশী। মোট রপ্তানির ৯০% ছিল এই রেশম। কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যে ক্রেপ, কেব সিল্ক, সাটিন এবং ফুজি রেশমেরও রপ্তানি আরম্ভ হয়। বর্তমানে ফুজি রেশমই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হাবুতাইর স্থান এখন দ্বিতীয়।

নিম্নের তালিকা দেখিলে জাপানের বর্তমান রেশমী বস্ত্র রপ্তানির পরিচয় মিলিবে :—

জিনিষ	১৯২৮ (ইয়েন)	১৯২৭ (ইয়েন)	১৯২৬ (ইয়েন)
ফুজি সিল্ক	৩৫,৬৮০,৮২৮	৪৪,৪৬৯,৫৬৮	৩৮,১৭০,০০০
সোমি	১২,৮৭৬,৭১৫	১৩,২৭৮,৬২৬	১৪,৪১৬,০০০
হাবুতাই	৩০,০৩৯,৬০২	৩৮,১৪৯,৭২২	৩৬,৬৭৫,০০০
কেব্ ও ক্রেপ্	৩৫,৭১০,২৩৬	৩২,০৬৭,৪৭০	২৭,৪৬৬,০০০
সাটিন	৬,২১৪,৯২৮	৭,০৭০,৭৬৮	৮,৭৫০,০০০
ট্যাফেটা ও পপ্লিন	৪,০১০,১৪৬	১,১৭৬,৪২৪	১,৩০২,০০০
অন্যান্য	৬,৪৭২,৮৬০	২,১০২,৬২৮	১,২২১,০০০
মোট	১৩৪,০৫১,৩২৩	১৩৯,৬১৫,২০৬	১৩৪,০৭০,০০০

সাধারণ রেশমী বস্ত্র রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে রঙীণ এবং অন্যান্য প্রকারের রেশমী বস্ত্রের চাহিদাও বাড়িয়াছে। সম্প্রতি এই ধরণের কাপড় রপ্তানির বহর বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

প্রাপ্তিস্বীকার

জার্মাণির কীল সহরের অধ্যাপক এডগার সালিন তাঁহার নবপ্রকাশিত "ডস ক্রিগ্সেক্সপ্ রেয়েন" নামক গ্রন্থ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের নিকট পাঠাইয়াছেন।

১০৭-এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা এডিকেটাল প্রেসে শ্রীঅনুকূল পাল, বি এ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।